পঞ্চাশটি গল্প

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

এক বিশিষ্ট সমালোচক বলেছিলেন, স্বপ্নময়ের গল্প আমাদের শেকড় খোঁজার কোদাল। তাঁর এই মন্তব্যে অতিশয়োক্তি নেই। সত্তরের দশকে তিনি যখন গল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন, তখন সাহিত্যের অঙ্গনে নয় চেনা বস্তাপচা ছক, কিংবা বামপন্থী দর্শনের ঘূর্ণি।

স্বপ্নময় সেইসময় নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ধ্বংসস্তূপের ভেতর হারিয়ে যাননি, বরং তৈরি করেছিলেন নতুন বাচনভঙ্গি।

পক্ষপাতহীন চরিত্ররা আসছে গল্পে, লেখক নিজে কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছেন না। উপরন্তু পাঠককে টেনে আনছেন, জড়িয়ে ফেলছেন কাহিনির মায়াজালে।

প্রায় প্রথম গল্প থেকেই তিনি এক স্মার্ট গদ্যভঙ্গির অধিকারী। একাকিত্ব, যন্ত্রণা, শ্রেণীসংগ্রাম, ভালবাসা, যন্ত্র-সময়ের প্রেম-নৈতিকতা, ফ্যান্টাসি, সমাজবীক্ষণ, রিপোর্টাজ, ইতিহাস, লোককথা, মিথ ইত্যাদি মিশে যায় তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে, মিশে যায় গল্পের শরীরে। সিরিয়াস বিষয়ের মধ্যে থাকে তীব্র স্যাটায়ারের ইঙ্গিত। নির্মাণ-বিনির্মাণের চিহ্ন এদের ভাষায়, প্রকাশরীতিতে তাঁর প্রতিটি গল্পই নতুন স্বাদের—কি বিষয়বস্তুতে, কি আঙ্গিকে। বিশেষত নতুন নতুন আঙ্গিক উদ্ভাবনে তিনি অক্লান্ত। তাই সমালোচক নির্দ্বিধায় বলেন, স্বপ্নময় এক কলমে দু'বার লেখেন না। লেখকের এই নবতম গল্পসংকলনে গৃহীত গল্পগুলি আধুনিক বাংলা কথাশিল্পের পরম নিদর্শন।

ISBN 81-7756-576-1

পঞ্চাশটি গল্প

পঞ্চাশটি গল্প

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

আনন্দ

পঞ্চাশটি গল্প/স্বপ্নময় চক্রবর্তী

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৬
চতুর্থ মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৪

© স্বপ্নময় চক্রবর্তী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-576-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নিউ রেনবো ল্যামিনেশন
৩১এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০১৪
থেকে মুদ্রিত।

PANCHASTI GALPA
[Stories]
by
Swapnamoy Chakraborty

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

৪০০.০০

কবি ও কথাকার জয় গোস্বামী বন্ধুবরেষু,
যে আমার অনেক বোবা সময়ে কথা ফুটিয়েছে

দু-একটি কথা

যে-কোনও বৃষ্টিফোঁটার গভীরে একটা ধূলিকণা থাকবেই। মুক্তোর ভিতরেও থাকে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাঁকর, আর কাঁকর ঢুকে যাওয়া বেচারা ঝিনুকটির অবিরল অন্তঃস্রাব। রোজ কত কী ঘটা যাহা তাহার মধ্যে কিছু কিছু ঢুকে যায় চেতনায়।

গল্প তৈরি হয়।

গত তিরিশ বছর ধরে লিখছি বলা যায়। দুশোর উপর গল্প লেখা হল। এই সংকলনের বেশ কিছু গল্প অন্য কোনও সংকলনে নেই, অগ্রন্থিত। বাকি গল্পগুলি অন্যান্য সংকলনে ছিল, কিন্তু এখন ছাপা নেই। 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র অন্তর্ভুক্ত কোনও গল্পকেই এই সংকলনে ইচ্ছে করেই রাখিনি।

এই সংকলনের প্রথম গল্প 'শকুন' একেবারেই প্রথমদিকের লেখা। শেষ গল্প 'ডাকিনিতন্ত্র' আমার শেষতম লেখা হলেও গল্পের বিন্যাসে কালানুক্রম অনুসৃত হয়নি।

দ্বিতীয় গল্প 'রাধাকৃষ্ণ' থেকে 'রাক্ষসায়ন' পর্যন্ত গল্পগুলি হাল আমলের লেখা।

বিভিন্ন সম্পর্ক নিয়েই তো গল্প। মানুষে মানুষে, মানুষে মাটিতে, মানুষে ধর্মে, মানুষে জন্তুতে, মানুষে যন্ত্রে...। চেষ্টা থেকেছে সমধর্মী গল্পগুলিকে একগুচ্ছে রাখবার। 'রাক্ষসায়ন' থেকে 'মানুষ ও বেগুন' পর্যন্ত গল্পের ফোকাস যন্ত্রায়ন। যেন ওই পাঁচটি গল্প মিলে একটি গল্প। 'ধর্ম' থেকে 'দর্পচূর্ণ পালা' পর্যন্ত চারটি গল্পে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এসেছে, 'সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পরে...' থেকে '১১ই সেপ্টেম্বর' পর্যন্ত গল্পগুলিতে যেন সমসময়ের রাজনীতি মথিত মানুষ। 'নারী হওয়া' থেকে 'যে মেয়েটি মোহময়ী হতে চেয়েছিল' গল্প ক'টিতে মিলে যেন একটি কথারই কোরাস।

কোনও কোনও গল্প বহুদিন ধরে মাথার ভিতরে লেখা হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষারও দরকার হয়েছে। পাঠকের ভাল লাগলে আমারও ভাল লাগবে। শুধু একটা কথা সবিনয়ে জানিয়ে রাখতে চাই যে, কেবলমাত্র সময় কাটানোর জন্য এই বই নয়, সময় ব্যবহারের জন্য পড়ুন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

সূ চি প ত্র

শকুন ১
রাধাকৃষ্ণ ৭
মোবাইল সোনা ১৯
সুখীরাম ২৫
নতুন রান্না ৩৬
এক টুকরো সুন্দর ৪৪
আর্সেনিক ভূমি ৫২
ঝড়ের পাতা ৬১
গ্রামপ্রধানের ছেলে ৬৯
চক্ষুদান ৭৯
রাক্ষসায়ন ৮৫
গণেশ ৯১
মানুষ কিংবা কোলবালিশ ১০৩
যন্ত্রপাতি ১১৩
মানুষ ও বেগুন ১২১
অনন্তবালা ১২৮
রেখে আসা ১৩৩
পূর্বজন্মের ভাই ১৪১
দুলালচাঁদ ১৪৬
ভাবের গান ১৫৩
ডাক্তার ১৬১
যৌবন বারিধি ১৭১
একটি সামাজিক পালার নামকরণের সমস্যা ১৭৮
নারী হওয়া ১৮৫
মেয়েমানুষ অথবা কলাগাছ ১৯৬
যে মেয়েটি মোহময়ী হতে চেয়েছিল ২০৬
ডিপ ফ্রিজ ২১৪
ধর্ম ২২৩
দীন-ইলাহি ২৩১
তাল্লাক ২৩৮
দর্পচূর্ণ পালা ২৪৮
কার্তিক ২৫৫
জার্সি গোরুর উলটো বাচ্চা ২৬২
নৈশপর্ব ২৭০
উদ্বাসন কাব্য ২৭৮
ভগীরথ ২৮৯
পুরোহিত দর্পণ ২৯৬
মধুদার বাড়ি যাব ৩০৫
শোকগাথা ৩১৬
গন্ধকাঁথা ৩২৫
ডলার ৩৩২
মানুষ রতন ৩৩৭
কল ৩৪৫
ঢোঁড়া উপাখ্যান ৩৫২
পেপসি আনে গাঁয়ের আলো ৩৬৫
কালীবাবু ও কালু ৩৭৩
সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পরে ৩৭৮
রামযতনের বাগান ৩৮৩
১১ই সেপ্টেম্বর ৩৯২
ডাকিনিতন্ত্র ৩৯৯

শকুন

এ হচ্ছে বিষ্টু ঘোষের পুকুর। গত মাসে পুকুরের সব মাছ মরে গিয়ে ভেসে উঠেছিল। সবাই বলাবলি করেছিল কে না কে ফলিডল মিশিয়ে দিয়েছে পুকুরে। মার কাছে শুনেছে আলোমণি, আকাশের তারা খসে পুকুরে পড়লে নাকি এ রকম হয়। মাথার বোঝাটা পুকুর পাড়ে রাখে আলোমণি, কয়লার আঁচের মতো গন্ গন্ করে জ্বলে চরাচর। রুটি তৈরির চাটুর মতো তেতে গেছে পিরথিমি। আলোমণি দুই ক্রোশ পেরায় হেঁটে এসেছে, পায়ে আর বশ নাই। 'দণ্ডে দণ্ডে ভিজায়ে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা'—আলোমণির বচন মনে পড়ে। আলোমণি তাই পা ভেজাতে পুকুরে নামে, ঘাট বাঁধানো পুকুর। ভালই হল, জলও খিয়ে লিব; পা ভিজিয়ে লিয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে, একটা বিড়ি খিয়ে নিলেই খাটুনি তরল হয়ে যাবে। আলোমণি জলে নামে...হেইররে—একটু পেছলে পড়লেই হয়েছিল। কচির মাথার চুলের মতো পুরু শ্যাওলা জমেছে সিঁড়িতে। ভর পোয়াতি আলোমণি সাবধানে জলে নামে। চারিদিকে ধু-ধু রোদ্দুর। রোদ্দুরে নারকেল গাছগুলো কাঁপছে, কেউ নেই। আলোমণি অনেকদূর পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে দাঁড়ায়। শরীর ঠান্ডা হোক। জলও গরম, তবুও আরাম লাগে ওর। কলমি-শুশনির ঝোপের ছায়ায় ফড়িং বসে থাকে, চোখকুনি মাছ শুড়শুড়ি দেয় আলোমণির উরুতে।

হাতিয়াড়ার হাট থেকে দশ কিলো চাল চাপিয়ে দিয়েছে ওর সোয়ামি আলোমণির মাথায়। যা বাগুইআটিতে বেচে আয়,—সাবধানে যাস, সাড়ে তিন টাকার কমে বেচবিনি, পুলিশে ধরলে পায়ে উলটি খেয়ে কাঁদবি, ফিরতি আসার সময় মহিমের দোকান থিক্যে আমার জন্য চার বান্ডিল লালসুতোর বিড়ি লিয়ে আসিস।

হাজারি সামন্ত চালের কারবারি, তেনার বাড়ির পুকুর কাটার সময় মুনিষ খেটেছিল আলোর সোয়ামি নারায়ণ। সেই খাতিরে ধারে চাল পায় নারায়ণ। আলোমণি কিলোয় চার আনা লাভ করলে দশ কিলোয় আড়াই টাকা হবে।

হপ্তায় দু'বার করে পেরায় পাঁচ মাস যাবৎ আলোমণি এই কারবার করে। প্রথম বার চাল নিয়ে যাবার আগের দিন নারায়ণ শানের মধ্যে বাটখারার পোঁদ অনেকক্ষণ ধরে ঘষেছিল, তাতে বাটখারার ওজন একটু কমবে, প্রতি পাল্লায় যদি একমুঠি চাল ওজনে মারতে পারে, তবে দশ কিলো চালে একজনার একবেলার খোরাকি উঠে আসে। একটু বুদ্ধি খরচা করিস মাগী,—এই আমার মতন, বুকে চাপাটি মেরে বলেছিল নারায়ণ।

আলোমণি পুলিশের ভয়ে পাকা রাস্তা ধরে না। মাঠ পেরুলেই খাল, তারপর খাল ধার দিয়ে চলে যাবে বাগুইআটি, মাঠের পাশে তাকাতেই ধাঁধা লাগে দুই চক্ষে—কী রোদ—মাগো।—

ধুর তাতে কী। শালগেরাম চিবিয়ে খেনু, চালতা আছে বাকি। বোশেখ মাসে কতবার এই পথ পেইরেছি, এ ত ভাদর মাস।

খোঁচা খোঁচা শন পায়ে বিঁধে যায় আলোমণির, চোরকাঁটা সারা শাড়িতে আটকে গেছে। মাথার উপর দশসেরি ভারে একটু পর পরই হাঁপি লাগে। ধম্মশাস্তরের হনুমান কী এক পব্বত মাথায় করে মস্ত লম্ফ দিয়েছিল, আহা আলোমণি যদি পারত, এক লাফেই পৌঁছে যেত বাগুইআটির বাজার। আজ আড়াই টাকা লাভ হলে আলোমণি চার আনা পয়সা নুকিয়ে রাখবে। বাচ্চাটা হলে মিছরির জল খাওয়াবে। আগের বাচ্চাটা ছ'মাসে মরল, আটা গোলা সইতে পারেনি, পেট ছাড়ল আর ধরল

না; লাইন দিয়ে হাসপাতালের লাল ওষুধ খাইয়েছে, তাতে কমল না, তারপর পাঁচির কথামতো গ্যাঁদালিপাতায় লোহা পোড়া দিয়ে খাইয়েছে, পির মোছলমানের ফুঁ দিয়েছে, কমল না, তারপর সেই শীতকালে বাবুদের বাড়ির ছাতে রোদে শুইয়ে বাসন মেজে চ্যান করে যখন খোকার কাছে গেল, তখন দেখল গু-রক্তের মধ্যে মাখামাখি করে চক্ষু মুদে আছে তার 'কচি' আর ভন্ ভন্ করতেছে শ্যালদার ভিড়ের মতো মাছিরা সব।

সেই সন্তানের বাপ ছিল কানাই ডোম। কলকাতার বেলগাছিয়ার খালপুলের পাশে মস্ত হাসপাতালে কাজ করত কানাই। কানাই এর কথা ভাবলে এখনও ডর লাগে আলোমণির, বুকে কাঁপন আসে। আলোমণির উঁচু পেটে হাত বুলোতে বুলোতে কানাই বলেছিল, তোর পেটের বাচ্চাটা এখন উল্‌টে আছে, তার পেটটা মোটা, হাত দুটো সরু সরু, চোখ ফোটেনি এখনও। বলত, আলো, তোর ধুকপুকির যন্তরটা এই—এইখেনে, তোর নাইকুণ্ডুলির তলায় এইখানে জমছে তোর গু। বলেই ফিক ফিক হাসত কানাই ডোম।

কানাইয়ের হাত ছিল এক মস্ত শুঁয়োপোকার মতো, মুখে মদের গন্ধ। কানাই পেটের উপর কান চেপে বলত, দেখি দেখি আমার ব্যাটার ধুকপুকি শোনা যায় কি না, ভয়ে সিঁটকে যেত আলোমণি, রা কাড়ত না। কানাই ছিল হাসপাতালের ডোম। মরামানুষ কাটত, হাড়গোড় চুরি করে এনে বাড়িতে রাখত আর দাদাবাবু-দিদিমণির কাছে বিক্রি করে মদ খেত। ঘিন্নেপিত্তি ছিল না শরীলে। মা গো—একদিন একটা ফ্যাকাশে মাংসের দলা এনে নাড়তে নাড়তে বলেছিল আলোমণিকে—দ্যাখ দ্যাখ—এই হচ্ছে জন্ম যন্তর, এর থেকেই আমরা বেরুই, তোর পেটেও যেমন আর ঘড়ি চশমাপরা ইংরিজি বলা ছুঁড়িদের পেটেও তেমন; আলোমণি ভয়ে মুখ ঢাকলে খ্যাক খ্যাক হেসে উঠত কানাই। লোকটাকে বড় ডরাত আলোমণি, লোকটা বেবুশ্যে বাড়িতেও যেত, আলোমণিকে ঠ্যাঙাত মাঝে মধ্যে, আলোর ইচ্ছে করত না লোকটার ঘর করতে; তবু আলোমণি ঘরের কোনার কলসির মতো চুপ করে থাকত। খেতে তো দেয় তবু যা হোক।

খালধারের কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলে আলোমণি। একটু একটু বাতাস দিচ্ছে, এখানে ওখানে বক বসে আছে খাল ধারে, আলোমণির কেমন গা গুলোয়, একটু জিরেন দিতে পারলে হত। কাছাকাছি গাছগাছালির ছায়া নেই। কী আর করবে। আলোমণি হাঁটে,—জোরে জোরে পড়ে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস। কে বেঁধেছে গোরুটাকে এখানে, কী আক্কেল বলদিকি, মোটে ঘাস নাই এদিকে, গোরুটা খুঁটি ছিঁড়বার জন্য টানাটানি করতিছে, দূরে যাবে যেখানে সবুজ রং আছে, খাবার আছে।

আলোমণিদের গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল পেরায় তিন বচ্ছর। সেবার সন্দেশখালিতে বন্যা হল, হু হু করে গাঙের জল ঢুকল গেরামে। তারপর বন্যা থেমে গেলে খাবার নেই, ওলকচু সব পচে গেল, কলাগাছ, পেঁপেগাছ কিছু রইল না, মাঠের মধ্যে শুধু কচুরিপানার বংশ। আলোমণির মা-বাবা মুনিষ খাটত পরের জমিতে, আলোমণি আর ভাইবোনেরা কলমি শাপলা ওলকচু খুঁজে আনত। আর-বছর কচুর লতি তুলতে গিয়ে পগারের ধারে সাপে মেরেছিল আলোমণির দাদাকে। তাই খুব ডর লাগত আলোমণির, বাঁশের ডগা দিয়ে না খুঁচিয়ে ঝোপে হাত দিত না। বন্যার পর মুনিষ খাটার কাজ নেই, রুজি-রোজগার বন্ধ এক্কেবারে। মগরাহাটে সড়ক তৈরির জন্য গেরামের কেউ কেউ কাজ পেয়েছিল; আলোমণির বাবাও গিয়েছিল কাজের জন্য, কিন্তু সেবার হাঁপির টান এত বেশি হয়েছিল যে সড়ক তৈরির বাবুরা কাজটা দিল না আলোর বাপকে। তাই হারাধনের বাপ-মার সাথে সাথে আলোমণির বাপ-মাও সপরিবারে পাটি, বঁটি, দুটো থালা আর একটা পুঁটলি নিয়ে কলকাতা চলে এল। বাঁশের মাচাটা আর পা ধোবার কালো শানটা ভারী বলে আনতে পারেনি। সেই পেরথম রেলগাড়িতে চড়ল আলোমণি। টিকিট কাটেনি। হারাধনের বাপ আগেও কলকাতা এসেছে। খালধারের পাটগুদোমে কুলির কাজ করত, থাকত খালপুলের নীচে। সেইখানে গেল ওরা। কী আশ্চর্য, পুলের তলা তখন মানুষে ভরতি, মোটা মোটা নলগুলোর ভিতরে পর্যন্ত মনিষ্যি; শেষকালে একটা নলের উলটো ধারে ওরা বাসা বাঁধল। ভারী রগড় লাগত, একটা নলের একদিকে এক

পরিবার, অন্যদিকে আরেক পরিবার—মাঝখানে একটা ছালা টানাবার উপায় নেই নলটাতে। লোহার, তাতে পেরেকও পোঁতা যায় না, ফুটোও করা যায় না। নলের ভিতর কথা বললে গম্‌গম্‌ শব্দ হত। পেরথম দিন শোবার সময় মনে হয়েছিল, নলটা যদি গড়িয়ে যায়?

আলোমণির মা বাবুদের বাড়িতে কাজ পেয়ে গিয়েছিল। আলোমণিও মায়ের সঙ্গে কাজে যেত, আর আলোর বাপের হাঁপির টান বাড়তেই লাগল, কাজকম্ম কিছুই করতে পারত না। খালধারে বসে বসে নারকোল শলা তার দিয়ে বেঁধে ঝাঁটা বানাত, একশো বাঁধলে আট আনা মুজুরি। আর কোলের ভাইকে হাগাত, ঘুম পাড়াত।

কানাই ডোমের সাথে খাল পাড়েই আলাপ। সেদিন পাইপের উপর শুকোচ্ছিল আলোমণির শাড়ি, ইট চাপা দেওয়া ছিল যাতে না উড়ে যায় দমকা বাতাসে। মায়ে-ঝিয়ে মালসায় সেদ্ধ করছিল শাকপাতা, পিঁয়াজ আর খালধারের মরা কাঁকড়া। লোকটা কখন পাইপগুলোর পাশে গ্যাঁজা খাবার দলবল নিয়ে এসে গেছে রোজকার মতো, কখন যে পটাপট কাপড় চাপা ইটগুলো উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বসবার পিঁড়ে বানিয়ে ফেলেছে লোকটা, আলোমণি জানতেই পারেনি। হঠাৎ ওঠা দমকা বাতাসে যখন শুকুতে দেয়া কাপড়টা উলটি খেয়ে হামলে পড়ল রাস্তায়, তখন হেইরে বলে আলোমণি ছুট মারে, ততক্ষণে একটা কাদামাখা লরি কাপড়টাকে পিষ্টে দিয়েছে। আলোমণির যেন কোলের বাচ্চা চাপা পড়েছে, এমনভাবে দলাপাকানো কাপড়ের উপর হামলে পড়ে রক্ত পোছানোর মতো কাদাগুলোর উপর হাত বোলাতে গিয়ে দেখে সবটাই ছিঁড়ে গেছে। তখন কাপড়ের দলাটা বুকে চেপে ধরে—মা গো কী হল গো—বলে আর্তনাদ করে উঠলে পুলের থেকে দুটো শকুন উড়ে যায়। তারপর বটগাছের তলায় ইটের উপর ঠানা ধরে বসে থাকা লোকটাকে দেখে, বোঝে ইটগুলো কে সরিয়েছে, তখন লোকটার উপর অসম্ভব রাগে-ক্ষোভে আর ঘেন্নায় লোকটার দিকে হঠাৎ-ওঠা ধুলোঝড়ের মতো ছুটে যেতে যেতে বলে—হারামির পো! কেন তুই আমার ইট সইরে লিইচিস। মর! মর! আবাগীর ব্যাটা—দ্যাখ আমার কাপড় ছিঁড়ে নিইচিস, তুই দ্যাখ। তুই রক্ত উঠে মর, এক্ষুনি মর। তুই এইখেনে মর।

থাম। চিল্লাচিল্লি করে মেজাজ খারাপ করাসনি, উলটো সোজা হয়ে যাবে। আগে তোর বুকের কাপড় ঠিক করে লে। ততক্ষণে আলোমণির গোটা পরিবার জড়ো হয়ে গেছে।

কানাই ডোম তারপর বলেছিল—আমনাদের বাত বাত্তেলার দরকার নেই, আরেকটা কাপড় দিয়ে দেব কাল। ব্যস।

কানাই একটা ডুরে কাপড় দিয়েছিল আলোমণিকে।

আলো কি তখন জানত, ওটা মরা মেয়েমানুষের কাপড়।

কাপড়টা পেয়ে বড় খুশি হয়েছিল আলো। আগের কাপড়ে না হোক তার ছ'টা গেরো ছিল। এটা একটুও ছেঁড়েনি। পরদিন শাড়িটা পরে আলো জুতোর দোকানের কাচে নিজের অঙ্গ দেখে নিজেরই সোহাগ করতে ইচ্ছে হল, ইচ্ছে হচ্ছিল এই সময় লোকটা তাকে এক চোখ দেখুক। আলোমণি তাই হাসপাতালের ওখানটায় ঘোরাঘুরি করছিল। কিন্তু বিড়ি খেতে খেতে লোকটা আসতেছে দেখেই আলোমণি ঝেঁকে পালিয়েছিল তার ডেরায়।

কানাই ডোমের বউ পালিয়ে গেছিল প্রায় ছ'মাস আগে। সব বিত্তান্তি বলেছিল আলোমণির মাকে। আর এও বলেছিল আলোমণিকে তার মনে ধরেছে।

আলো যখন পাকাপাকি ভাবে কানাই ডোমের ঘরে যায় তার কিছুদিন পরেই আলোর বাপ মরে যায়। হাসপাতালে ভরতির ব্যবস্থা করেছিল বটে, কিন্তু পেরমায়ু ফুরুলে বেম্মার বাপেরও সাধ্যি নেই, তাই আলোমণি বেশি কান্নাকাটি করেনি। শ্মশানে পুড়োতে আবার পয়সাকড়ির ঝামেলা, তাই কানু ডোম বলেছিল হাসপাতাল থেকেই বাপের মড়া নষ্ট করে দেবে, চিন্তার কিছু নেই, তাই আলোর মা সিঁদুর ঘষে স্বামীর গায়ে খালের জল ছিটিয়ে পেন্নাম করে চলে এসেছিল। ওটাই গঙ্গা। খাল তো গঙ্গারই ছা।

আলোর পেটে ততদিনে খোকা এয়েছে। তার কিছুদিন পরে কানাই ডোম একরাশ হাড়গোড় ঘরে নিয়ে আসে। পোয়াতি মেয়ের ঘরে এসব থাকল্লে অমঙ্গল হয়, অনেক বুঝিয়েছে আলো। কানাই বলেছিল, আর সাত দিন সবুর কর, সব বেচে দেব। একদিন এক ছোকরা এসে নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সব হাড়গোড় কিনে নিয়ে গেল! সেদিন পাঁঠার মাংস কিনে এনে কানাই বলেছিল, খা—আমার ব্যাটা যেন পুরুষ্টু হয়, ভাল করে খা।—

তখন কি আলোমণি জানত ওই সমস্ত অস্থি-কঙ্কাল তার বাপের, তার বাপের হাড় বেচে পুষ্টির খাবার খাচ্ছে আলোমণি?

কচিটা হবার পরই কী যে সর্বনেশে রোগে ধরল আলোমণিকে। কেবল রোগা হতে লাগল, বুকের দুধ পেরায় বন্ধ, মাথার জট ছাড়াবার সময় উঠে আসে শুকনো পচা কচুরিপানার মতো কালো চুল। মা বলেছিল নাড়িপচা রোগ, সদাসব্বদা ঝিমঝিম করত মাথা, যেন চব্বিশ ঘণ্টা টেরাম চলতিছে মাথার ভিতরে। কানাই ডোম যা চাইত আর পেত না সে মরা ইন্দুরের মতো আলোমণির শরীরে। একদিন আলোমণি রাগের চোটে লাথি মেরেছিল, কানু ডোম খুব ঠেঙিয়ে সেই রাত্তিরেই বিদেয় করে দিল আলোমণিকে। কোলের কচি নিয়ে মার কাছে ফিরে গেল, দু'দিন পর আলো আর আলোর মা অনেক বিনয়-মিনতি করলে কানুর পা চেপে, কানাই বললে, এমন মাগ এই শালার দরকার নেই, পয়সা ফেললেই বহুত যন্তর মিলবে।

বাচ্চাটা মরার কিছুদিন পরেই নারায়ণের সঙ্গে বে হল আলোমণির। নারান হাতিয়াড়ার বাসিন্দে, এয়েছিল খাল চওড়া করার সময় মাটি কাটতে। ওদের বে হলে দুটিতে একসঙ্গে একদিন বাইস্কোপের খেলা দেখেছে। সেদিন ফিরতি পথে আলুর চপ খেয়েছে ওরা। খুব ইচ্ছে করছিল আলোমণির, এই সময় কানাই ডোম একবার ওদের দেখুক, দেখুক কানাই ডোম তাড়িয়েছে বলে আবার ভাতার জুটল কি না! আলোমণির কল্পনায় তখন কানাই ডোম ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে আর আলোমণি বলছে, তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব।

মাটিকাটার জনমনুষ্যরা খালধারে ঝুপড়ি বেঁধেছে। আলোমণি নারানের ঝুপড়িতে চলে গেল, বেশিদিন থাকতে হল না। মাটিকাটার কাজ শেষ হয়ে গেল দিন সাতেকের মধ্যেই। নারান বলেছিল—এখন দেশে যাই আলো, হাঁড়ি ডেকচি আর্শি চিরুনি কিনে লিই তারপর তোকে লিয়ে যাব। পুরুষ মানুষকে বিশ্বেস করা আর সাপ বিশ্বেস করা—তাই আলোমণি নারানের কাছ ছাড়তে চায়নি। নারান আলোর চুলে বিলি কেটে বলেছিল, দ্যাখ তোকে পিরিত করে বে করেছি, তোকে ছাড়া থাকতে পারবনি। তোকে এসে লিয়ে যাব মাইরি। মাসখানেক সবুর কর শুধু।

পেটটা টনটন করে ওঠে আলোমণির। কেমন খিঁচুনির মতো লাগে। সামনেই অশ্বত্থ গাছ আর বিশ-পঁচিশ পা মাত্তর। ওখানে একটু বিশ্রাম করবে। আলোমণি নিশ্চিন্তি যে এ ব্যথা গভ্ভ-বেদনা নয়। পৌষে ভাদরে আট মাস। ওর এখন আট মাসের বেশি হতেই পারে না। কচি পেটের ভেতরে বোধহয় পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করতিছে কিংবা একটু খেলা করতিছে তাই জন্য অমন একটু লাগবেই তো। এর পর আর কারবারে যাবে না আলোমণি। আলোমণি গাছতলায় এসে চালের বস্তাটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ে। গাংচিলের চিৎকারে কী দুঃখু। হঠাৎ হঠাৎ বাতাসে কী দুঃখু। অশ্বত্থপাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে চুঁয়ে পড়া রোদ্দুরে কী দুঃখু।

আলোর ছেলে হবে সেয়ানা। বড় হলে একটা কলের গান কিনবে। তক্তাপোষে তোষক পেতে শুবে। আলোমণির বড় শখ বাবুদের বাড়ির মতো মুখে ঢুকিয়ে দেয় গোটা রসগোল্লা, বড় শখ পেলেট আর চামচে দিয়ে চিংড়ি মাছের ল্যাজ বার করা চ্যাপটা চ্যাপটা বড়া খায় মরিচগুঁড়ো ছিটিয়ে, আহা কী আহ্লাদে ঢুকে যাবে মুখের ভিতরে বেগুনি লম্বা পিঁয়াজের আঁশ। আর দু'মাস, খোকা হোক, আর বারো বছর, খোকা সেয়ানা হোক তারপর তো—চনমন করে ওঠে পেট, যন্তরনায় একটা খালি পা ধুলোয় ঘষে, বাঁ হাতে দুব্বো ছিঁড়ে নেয় একরাশ। গভ্ভ যন্তরনা নয়তো, সন্দেহ আলোমণির।

সোয়ামি জানে না সে বেত্তান্ত, লজ্জার মাথা খেয়ে বলবে বলবে করেও বলতে পারেনি—নারানরা দেশে যাবার পর এক রাত্তিরে একদল ফুলপ্যান্টলুন পরা ছেলে ওকে টেনে বার করেছিল যেমন খাঁচা থেকে মুরগি টেনে বার করে। ছেলেগুলোকে পাড়ায় দেখেছে আগে। শুধু আলোমণিকে নয়, সমস্ত পাইপের ভিতরের গোটা পাঁচ-ছয় যুবতী মেয়েমানুষের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আলোমণি লাথি মারতেই চকচক করেছিল ছোরার ফলা টর্চ লাইটের আলোয়, আলোমণির মা-ভাই, ছোটবোন শুধু দাঁড়িয়ে দেখেছে। কতকাল পর জানে না, আলোমণি আর মদের গন্ধ পায় না, তখন সারাগায়ে বিচুটি পাতার চুলকানি, মানে খামচির জ্বালা, আলোমণি তখন খালের নোংরা জলে স্নান করে এসে ভেউ ভেউ কেঁদেছিল, আলোমণির ইচ্ছে করেছিল আকাশ-নক্ষত্র-তারা-রেলপুল-দোতলা বাস, সবকিছু লাথি মেরে ভেঙে দেবে, ধম্মশাস্তরের সতীর মতো লণ্ডভণ্ড করে দেবে স্বর্গ-নরক-বিশ্বচরাচর—সেই ইচ্ছেগুলো বর্ষার মাছের ঝাঁকের মতো কিলবিল করে শুধু কান্না এনে দিচ্ছিল। আলোমণি দেখেছিল সেই রাত্তিরে পুলিশ সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খইনি খাচ্ছিল। আলোমণির গায়ে একটা নোক ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে আলোমণি চিৎকারে বলেছিল পুলিশকে—তোমরা রাজার নোক হয়েও বাঁচাবে না গো—

সকালে শুনেছিল পাশের পাইপের ময়নাকে পুলিশে নিয়ে গিয়েছিল পুলের পিছনে।

আলোমণির মা পরদিন বাবুদের বাড়ির মাকে খুলে বলে সব বেত্তান্ত। বাবুদের বাড়িতে দু'দিন রাত্তিরের আশ্রয় চায় আলোমণির জন্য। আলোমণি ছাতের সিঁড়ির তলায় আশ্রয় পায়।

দ্বিতীয় রাত্তিরেই শকুন এসেছিল। মানে কানাই ডোম, মানে ছোরাহাতে গুণ্ডা, মানে পাঞ্জাবি পরা ছোটবাবু। আকাশে তারা নক্ষত্র চন্দ্র সব ঠিকমতো আলো দিচ্ছিল, একতলায় ঠিকমতোই পাহারা দিচ্ছিল নেপালি দারোয়ান। ছোটবাবুর মুখে মদের গন্ধ ছিল না, ছিল ফুলের গন্ধ, মাথার চুলে ফুলের গন্ধ, ছোটবাবুর হাতে ছোরা ছিল না, টাকা ছিল। ছোটবাবু চেঁচিয়ে বলেনি, ফিসফিস করে বলেছিল—কোনও কথা বলবি না, টাকা দেব। টাকা চাই না, ছেড়ে দিন বাবু, আমি বে-হয়ে যাওয়া বউ—ছোটবাবু ভদ্দর লোকের মতো আস্তে বলেছিল 'নিকুচি করেছে'—তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত নক্ষত্র তারা আর চন্দ্রের আলো দেখতে পায়নি আলোমণি। আগের বার গু সরিয়ে খালের জলে চান করতে পেরেছিল, ছোটবাবু চলে যাবার পর স্নানও করতে পারল না, শুধু গুটলি পাকানো দু'টাকার নোটের উপর থুকথুক করে থুথু ছিটিয়ে শেষ পর্যন্ত রাত্তিরের দিকে খুঁটে বেঁধে নিয়েছিল।

যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল আলোমণি, কাছ দিয়ে দু'জন মানুষ চলে গেল, জোরে ডাকতে গিয়েও ডাকল না, চালের বস্তাটা আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর ভাবল ডাকলে হয় এবং ডাকল, কিন্তু যত জোরে ডাকা উচিত ছিল তত জোরে ডাকতে না পারায় ওরা শুনতে পেল না।

ক্রমশ যন্ত্রণা বাড়তে লাগল। আলোমণির মনে হল এ নিশ্চয়ই গভ্ভ যন্তরনা, আট মাসে হয় কী করে? তবে কি হিসেবের ভুল, তবে কি ছোটবাবু? তবে কি পুলিশ? নাকি ছোরাহাতে গুণ্ডা,—নাকি—সোয়ামি গো, আমায় ক্ষমা করে দিয়ো...

যন্ত্রণায় দু'ভাগ হয়ে যাবে মনে হল, পেটটা হাপরের মতো লাফাচ্ছে। আলোমণি একবার পাশ ফিরল, তারপর চিত হয়ে শুল, পা দুটো হাঁটুর কাছে বেঁকিয়ে নিতে একটু স্বস্তি বোধ হল।

আলোমণি শুয়ে থাকে, শুকনো মাটিতে ঘষে পায়ের গোড়ালি। হে ভগবান, আমার স্বামীকে একবারটি এনে দাও। ফড়িংরে ফড়িং, আমার স্বামীকে একবার খবর দিবি ফড়িং, আমার কচি আসছে, খোকা আসছে। গাংচিলের ডাকে আর দুঃখু নেই, আনন্দ! হঠাৎ-ওঠা ধুলোঝড়ে দুঃখু নেই, আনন্দ, আনন্দ! অশথপাতার ফাঁক দিয়ে চোয়ানো হলুদ রোদ্দুরে আনন্দ! কোথায় ফোটে বিকেলের মালতী রে, যোগিনী আশা?—কোথায় আছ শিবঠাকুর, আমার অশথতলায় আঁতুড়ঘরে এসো। কোথায় ভাঙছ ঢেঁকিতে চাল ঘরের বউ, এসো, একবারটি এসো গো। কোথায় গোবর দিচ্ছ ধাই মা, আমার খোক্কার কাছে এসো, গোরুর খুঁটো তুলতে বিকেল হলে যে আসবে, সে একবারটি আমার কাছে এসো।

আলোমণির নজরে পড়ে গাছের মরা ডালে শকুনেরা বসে আছে, আলোমণি আঁতকে ওঠে। আলোমণি একবার উঠে বসে, খালের ওপারে কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে, আলোমণির ইচ্ছে হয় নিশেন উড়িয়ে ডাকে। একবার চিৎকার করে ডাকে—এদিকে এসো না গো কেউ। হু হু করে মনখারাপের বাতাসে জোলো গন্ধ। বিকেল হল, কেউ কি আসবে না! বেহুলা মা, সাবিত্রী মা, কাউকে পাঠিয়ো মা গো, শকুন, শকুন ভাই, কাউকে পাঠিয়ে দে ভাই মাইরি, পাঠিয়ে দে ভাই। কোথায় যায় খালের জল, গঙ্গাসাগরে নাকি? কোথায় যায় বাতাস, কোথায় যায় গাংচিলের শব্দ? হায়রে। আমার খোকা আসছে—ওকে আমি মিছরির জল খাওয়াব। সন্দেশখালির পাকা রাস্তায় দুটো তালের আঁটি পুঁতেছি আমি। এক পুরুষ রোয় আঁটি, পর পুরুষ খায় পরিপাটি। আমার খোকা খাবে তাল হলে, আমার খোকার হবে কলের গান, খোকা দেবে দই সন্দেশ—ওঃ আরতির ঢাকের শব্দ সারা শরীলে বাজে সারা শরীলে ঢং ঢং কাঁসর ঘণ্টা সারা শরীলে শাঁখের আওয়াজ। ফড়িংরে ফড়িং, মাইরি যা না একবার উড়ে গিয়ে বলে আয়...

আলোমণি চোখ বন্ধ করে। আলোমণি জানে না তার শরীরের ভিতরে, শিরা-উপশিরায় আগমনীর সুরের মতো সেতারের সুরে সুরে তখন জটিল আলোড়নে, এক আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে চলেছে।

তার স্তনে দুধের প্রবাহ, বাৎসল্য স্নেহ মমতা রক্তের সঞ্চারণে সঞ্চারণে তরঙ্গিত হচ্ছে সারা শরীরে। এক মায়াবী সুড়ঙ্গপথে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে এক নতুন মানুষ। সে সন্তানের পিতা কে, তার সঠিক প্রমাণ নেই। আলোমণি তার মা, আলোমণির শ্রমে, স্বেদে, রক্তে, অভিমানে, স্নেহে তার জীবন প্রতিষ্ঠা। আলোমণির সারা শরীরে ঢাক বাজে।

দু'হাতে তালি মেরে মরা ডালে বসে থাকা শকুন তাড়ায় আলোমণি—যাঃ দূর যাঃ—।

ভূমিসূত্র
রচনাকাল ১৯৭৫

রাধাকৃষ্ণ

আহা, বসন্তকাল। শিমুল তুলো উড়ছে ফাটা বালিশ থেকে, ফ্যানের হাওয়ায়। প্লাসটিকের বালতি উপছে পড়ছে লাল লাল তুলো আর ব্যান্ডেজের কাপড়ে। রক্তমাখা। হোলিতে রং দেওয়া নিয়ে মারপিটের জের। নার্স, ওয়ার্ডবয়, গ্রুপ ডি-দের ঘাড়, গলা, মাথায় পোস্ট-রং খেলা ছোপ। কে জানে কোন ওয়ার্ড-এর ছাত থেকে ভাঙা গলায় চিল্লাচ্ছে ই এন টি পেশেন্ট কোন কোকিল। 'হাসপাতালে রেডিয়ো চালিয়ো না' বলা সত্ত্বেও কার্ড লেখার ঘরে রেডিয়ো চলছে। বসন্তের গান দিয়েছে কোন এফ এম চ্যানেলে—

আজি এ বসন্ত দিনে

বাড়ি ফেরো মাংস কিনে...

গতকাল দোল গেছে। আজ বোধহয় হোলি। হিন্দি বেল্টে আজই ফেস্ট। এইমাত্র লাল সাবানে হাত ধুয়ে ডক্টরস রুমে গেলাম। এক তৃণমূল নেতার সাদা পাঞ্জাবিতে লাল রং দেওয়া নিয়েই কেলো। বোধহয়, হোলিতে সবুজ রং দিলে এই আনহোলি রক্তপাতটা ঘটত না।

লাইজল-লাইজল গন্ধমাখা ঘরে একটু বসলাম। নতুন কোনও পেশেন্ট এলেই আবার উঠে যেতে হবে। অনেকেই ছুটি নেওয়ায় আমার একটু টানা ডিউটি পড়েছে। মিউচুয়ালি। ভুল ফ্রিকোয়েন্সিতে কোকিল ডেকেই চলেছে।

এমন বসন্ত দিন, নাই রং খেলিবার সিন

একটানা দুই দিন চলিছে ডিউটি।

ডিউটির সঙ্গে কী মেলে? বিউটি। বিউটি হলেই পিয়ালিকে জুড়তে হবে। এমন সময় বুক পকেটে পিং পিং। পিয়ালি কলিং। একটা এস এম এস পাঠিয়েছে পিয়ালি।

এনি wrong যদি খেলি রং উইথ সুতনু?

একটা জুতসই জবাব খুঁজছি। চিন্তা করলেই আমি মাথার চুল পাকাই। তখনই এমার্জেন্সিতে নতুন পেশেন্ট। আমি পেশেন্ট অ্যাটেন্ড করার আগেই পিকপিক করে লিখলাম—অং বং চং কেন এত ঢং বলো মুনু? ঠিক পছন্দ হল না। আবার নতুন করে লিখব ভাবছি, এমন সময় জগদীশ ডাকল। 'জলদি আসুন, বাঘে কামড়ানো কেস।'

আমি আমার এই ইনটার্নিশিপ-হাউসস্টাফশিপে সাপে কাটা পেশেন্ট পেয়েছি, বিছে, কুকুর, বেড়াল, এমনকী বউ কামড়ানো পেশেন্টও পেয়েছি। কিন্তু বাঘে কামড়ানো কেস কখনও পাইনি। গিয়ে দেখি, পা-জামা আর হাওয়াই শার্ট পরা একটি লোক শুয়ে আছে ট্রলিতে। ওর ডান হাত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। কব্জির উপরে বেশ খানিকটা চামড়া ফাঁকা। মাংস বেরিয়ে পড়েছে, আর্টারিটাও ছিঁড়ে গেছে। জামা-পাজামায় রক্ত। গলায় তুলসী মালা। বৈষ্ণবদের যেমন থাকে। লোকটা কাতরাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করি, কী করে হল?

বাঘ।

বাঘে কামড়েছে?

আজ্ঞে।

বাঘ কী করে কামড়াল?

আদর করতেছিলাম...

বাঘকে আদর করতে গিয়েছিলে? কোথায়?

চিড়িয়াখানায়।

বাঘ তো খাঁচায় ছিল। তা, তুমি আদর করলে কী করে?

হাত ঢুকিয়ে।

তারপর?

খপ করে কামড়ে দিল।

ও। সঙ্গে কেউ আছে?

না।

চিড়িয়াখানা থেকে এলে কী করে?

একটা টিক্‌সি করে চিড়িয়াখানার লোক হাসপাতালে ছেড়ে দিল।

ওরা কোথায়?

ছেড়ে দিয়ে, হাসপাতালে কী বইলতে হবে শিখিয়ে দিয়ে ওরা পলায়ে গেল।

দেখি কী, হাতের উপর সবুজ সবুজ কী যেন। জিজ্ঞাসা করি এসব কী? লোকটা বলল, গ্যাঁদা পাতা চিবিয়ে থুপে দিয়েছিলাম।

দেখলাম রেডিয়াল আর্টারিটা ছিঁড়ে গেছে। মনে হল আলনার হাড় আর কারপাস-এর হাড়গুলো ভেঙে গেছে। ক্ষতস্থান ধুয়ে, কয়েকটা সেলাই দিয়ে, ব্যান্ডেজ করে এক্সরে করার জন্য লিখে দিলাম। এক্ষুনি ইলেকট্রোলাইট এবং কিছুটা রক্ত দেওয়াও দরকার।

আবার জিজ্ঞাসা করি, সঙ্গে কে আছে?

কেউ নাই।

নাম?

কানাইচন্দ্র সাফুই

বয়স?

পঁচিশ-তিরিশ হয়ে যাবে।

ঠিক বয়েসটা বলো।

মনে নাই।

কত লিখব, সাতাশ লিখি?

লিখেন যা খুশি।

ঠিকানা বলো।

খিদিরপুরের পেয়ারা বাগান।

কার্ডটা লিখলাম নিজেই। দুটো জরুরি ইনজেকশনও দিয়ে দিলাম। বললাম, বাইরে থেকে কয়েকটা ওষুধ আনাতে হবে। বাড়ির লোককে খবর দিতে হবে। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, দোকানের ওষুধ? অনেক দাম?

তা একটু দাম তো আছেই। তিনশো টাকার কম নয়। এরপর তো আরও খরচ আছে। বাঘকে আদর করতে গিয়েছিলে কেন খামোকা? লোকটার চোখ স্থির হয়ে যায়। চোখ বুজে ফেলে। আমি ওর ভাল হাতটার কবজিতে আঙুল রাখি। পাল্‌স রেট কম মনে হয়। ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছে। লোকটার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে বলি জগদীশকে। গায়ে ঠেলা দি। কোনও লাভ হয় না। ভাবছি ডেকাড্রন টেকাড্রন চালিয়ে দেব কি না, একটু আগেই তো দিব্যি কথা বলছিল। হঠাৎ কী হল রে বাবা? টাকা খরচার কথা শুনেই অজ্ঞান হয়ে গেল? মিনিট দুয়েক পরে চোখ খুলল কানাই সাফুই। চোখ খুলেই জড়ানো গলায় বলল, আমাকে ছেড়ে দ্যান ডাক্তারবাবু।

আমি ইতিমধ্যেই ব্লাড সুগার দেখার কিট্‌স বার করে ফেলেছি। ব্লাড সুগার নেমে গেলেও এরকম ব্ল্যাক আউট হয়। রক্তপাতও অনেক হয়েছে। সেটাও কারণ হতে পারে। লোকটার ছেড়ে

দেবার আবেদন শুনে ওকে বলি, ছেড়ে দিলে এবার কাকে আদর করবে বাবা? গণ্ডারকে? গণ্ডারকে সুড়সুড়ি দেবে? ও তো তিন দিন পরে হাসবে।

লোকটা মাথা নাড়ে।

তবে কাকে!

আরতিকে আজ্ঞে।

গলাটা জড়ানো জড়ানো। পোস্ট ফিট্ ডেলিরিয়ামের মধ্যে, আরতি, রাধারানি রাধারানি বলে বিড়বিড় করে। আরতি শব্দটার 'র' ও একটু জোর দিচ্ছিল বলে শব্দটা আর্তির মতো শোনায়। আমি লোকটার কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আরতি কে হয় তোমার?

রাধা হয়। সাধ্যসাধন।

এখন আর বকিয়ে কাজ নেই, আমি ভাবি। লোকটা একটু বিশ্রাম পাক, বডিতে একটু ইলেকট্রোলাইট পড়ুক, পটাশিয়াম কমে গেলে এরকম বকে। ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মনে হচ্ছে হাতের অবস্থা জন্ডিস। আজ কিছু হবার সিন নেই। কাল হাড্ডি ঘোষ, মানে আমার স্যার ড. তমাল ঘোষ আসবেন, তাকে ভাল করে দেখিয়ে নিতে হবে। কিন্তু কাল আমার অফ। পিয়ালির সঙ্গে প্রোগ্রামও ফিট করে রেখেছি নলবনে। পিয়ালি বলছিল সকালবেলাই বেরুবে। ওর নাকি সল্টলেকে রিকশা করে উলটো পালটা ঘুরতে খুব ভাল লাগে। দুপুরে ট্যাংরায় চাইনিজ খেয়ে নলবন।

ভালই খসবে কাল। হাউসস্টাফশিপে কতইবা পাই। পিয়ালি মাঝে মাঝে কনট্রিবিউট করতে চায়। আমি বলি ছেড়ে দে। আসলে পিয়ালি তো সবে এম এস সি পাশ করেছে। এখনও কিছু পায়নি। কাল সকালের প্রোগ্রামটা অফ করাতে পারলে হয়। খামোকা এক গুচ্ছ রিকশা ভাড়া। মস্তিটা তো হবে বিকেলে নলবনে। একটা ঢপ দেব। জরুরি পেশেন্ট পড়ে গেছে রে, সকালে হচ্ছে না। সত্যি বলতে কী, আজ বিকেল পর্যন্ত ডিউটি করে আবার কাল সকালে বেরুনোটা একটু স্টেরয়েড হয়ে যাচ্ছে। এমনিতে অবশ্যি কাল হাসপাতালে আসার সিন নেই। কার্ডে সব লিখে দেওয়া আছে। যা করার ওরা করবে। এনটার্নিগুলো আছে। কাল সকালে অনেকক্ষণ গড়াব। মোবাইলে ফোন করে পিয়ালিকে বলব হাসপাতালে আছি রে...। এর আগে কেসটাকে তৈরি করে নিতে হবে। আমি পিয়ালিকে ফোন করলাম।

পিলু, তোর ঘিলু নড়ে যাবে যদি একটা আজব কেস বলি। বাঘকে আদর করতে গিয়েছিল এক পাবলিক, বাঘ হাত কামড়ে হাতের হাড্ডি চানাচুর করে দিয়েছে।

ভ্যাট।

স্যোয়ার। না হলে বলছি কেন? চিড়িয়াখানার খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে বাঘকে আদর করতে গিয়েছিল।

বোঝ তবে, আদর করার কত রিস্ক।

সে তো বাঘকে আদর করতে গেলে হবেই।

তবে মানুষ যদি বাঘ হয়ে যায়, শুনেছি কামড়ে ফামড়ে দেয়। অ্যাই, তুই একটু বাঘ হ' না মাইরি।

সামলাতে পারবি? সাঁতার জানো তো তুমি ছেলে?

হয়েই দেখ না।

আচ্ছা, বলছিস যখন, হব। আপাতত সুতনুর সঙ্গে রং খেলগে যা।

তুই এটা রং নিচ্ছিস, না ভড়ং করছিস?

আমি আবার রং নেব কেন?

নিজে কত লিবারাল প্রমাণ করতে চাস, সেই রং।

ধুর, রাখিরে, পেশেন্ট এসেছে।

আবার কানাই সাফুইয়ের কাছে গেলাম। ওর খুব ব্যথা হচ্ছে। কাতরাচ্ছে। এবার ব্যথাটা ক্রমশ বাড়ার কথা। ব্যথা কমাবার জন্য ওষুধ দেওয়া হয়েছে যদিও, তাতে কতটা কমবে? এবার একটা

সিডেটিভ ইনজেকশন করা উচিত। এখন কোনও স্যার নেই। আমাকেই ডিসিশন নিতে হবে। ঘুম পাড়িয়ে দেবার আগে কতগুলো ব্যাপার জেনে নেওয়া উচিত। অন্তত বাড়ির লোককে তো খবর দিতে হবে। আমি কানাইয়ের কাছে যাই। বলি,

খুব ব্যথা হচ্ছে?

আজ্ঞে।

তুমি কী করো?

কীর্তন করি।

এসব করে সংসার চলে?

সংসার নাই।

তবে আরতির কথা বলছিলে যে? কে ও?

কানাই চুপ। আবার জিজ্ঞাসা করি, কিছু বলে না। স্যালাইনের ফোঁটা পড়ছে, ওদিকে তাকিয়ে থাকে।

বলো, আরতি কে তবে?

রাধা।

ওই রাধা ছাড়া তোমার আর কে আছে?

ভগবান।

মা, বাবা, ভাই, বোন...

কেউ নাই।

তোমার কীর্তন কি রোজ হয়?

না।

কীরকম হয়?

মাসে দু-চার দিন। অষ্টপ্রহর হলে বেশি।

অন্যসময় কী করো?

জন খাটি।

কোথায় জন খাটো!

গোয়ালার। গো-সেবা করি। কৃষ্ণ করতেন।

বাবা। তোমার নাম কানাই ঠিকই আছে। তবে সাফুই না হয়ে যাদব হওয়া উচিত ছিল। লালুপ্রসাদ যাদবের নাম শুনেছ?

না আজ্ঞে।

পড়াশুনো?

উহু।

কীর্তনের গান পড়ো কী করে?

আমি গান করি না। ধুয়া দি। হরিবোল করি। আর বাঁশি বাজাই। কৃষ্ণযাত্রাতে কৃষ্ণ যখন বাঁশি বাজাচ্ছে দেকছেন, তখন কৃষ্ণ মিছামিছি ফুঁ মারে। আসল বাঁশিটা আমিই বাজাই।

তোমার বাঁশিটা কই!

উখানেই পড়ে আছে। লেয়া হয়নি।

কোথায় পড়ে আছে!

বাঘের খাঁচার সামনে।

চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলে কেন?

ঘাস কাটতে।

ঘাস কী হবে?

গোরু খাবে।

কোন গোরু!

গোয়ালার।

যেখানে কাজ করো?

হুঁ।

ওর কথা বলার ধরন দেখে বুঝতে পারছি ও বেশি কথা বলতে চাইছে না। কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে পারছি। তবু মনে হল কথাগুলো জানা দরকার, এতে চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হবে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা বাইরের ওষুধ। একবার তো খরচাপাতির কথা তুলে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করি—

রাধা কী করে?

ময়লা ফেলে।

মানে?

মানে ডেরেন। নোংরা। নর্দমা।

তোমার খরচাপাতি ও দিতে পারবে তো?

ও কী করে দেবে, নিজেরই ঠিকমতো খাওয়া জোটে না...

তুলসী মালার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গলার ক্যারোটিড আর্টারিটা যতটা ফুলে উঠল বলার সময়, গলার স্বরে ততটা জোর না থাকলেও আমি ওর প্রতিবাদটা বুঝলাম। ওই আরতি ওরফে রাধার কাছ থেকে কোনও পয়সা নেওয়া যাবে না। সুতরাং বাইরের ওষুধ লেখা চলবে না। দেখতে হবে হাসপাতালে কী আছে। নইলে মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদের কাছ থেকে পাওয়া স্যামপেল ফাইলগুলোর পাত্তা লাগাতে হবে। হাতের যা অবস্থা। যদি অপারেশন করতে হয়, আন্ডারটেকিং লাগবে। পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার দরকার হবে। আয়া রাখার পয়সা নেই, সুতরাং রাধার পাত্তা করা দরকার।

আমি বলি, তোমার রাধাকে খবর দেওয়া যাবে?

কানাই সাফুইয়ের মুখের কেমন একটা পরিবর্তন হল। আনন্দ হলে মুখের যে মাস্‌লগুলো হাসি ফোটায়, সেই মাস্‌লগুলোই কান্নার মুখ তৈরি করে। কানাই সাফুইয়ের কষ্টভরা মুখটা কেমন পালটে গেল। শুধু একটা নাম এভাবে পালটে দিতে পারে ফেসিয়াল মাস্‌ল?

বলো, রাধাকে কী ভাবে খবর দেব।

ওর উপরের ঠোঁটের উপর তলার ঠোঁটটা উঠে গেল। এর মানেটা হচ্ছে 'কে জানে'।

রাধাকে ফোনে খবর দেওয়া যায়!

ফোন?

মানে আশেপাশে কারুর...

নাই।

তো, কোথায় থাকে? লোক পাঠিয়ে খবর দেব।

চার নম্বর গেট।

কোথায় ওটা!

খিদিরপুর। মেথরপট্টি।

এবার কানাই সাফুইয়ের রক্তে ঘুম মিশিয়ে দি। সুচের ভিতর দিয়ে।

এসব কেসে পেশেন্ট পার্টির বাড়ি আমরা টেলিফোনে খবর দেবার চেষ্টা করি। অনেক সময় অ্যাকসিডেন্ট কেস আসে, পেশেন্ট অজ্ঞান, রাস্তার পাবলিক নিয়ে এসেছে, পকেট হাতড়ে হয়তো

কোনও চোতা-কাগজে কোনও ফোন নম্বর পাওয়া গেলে ফোনে যোগাযোগ করে লোকটার হদিশ নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যদি কোনও ঠিকানা পাওয়া যায়, পুলিশকে জানাই, পুলিশ সেই ঠিকানার সূত্র ধরে থানা থেকে লোক পাঠিয়ে বাড়িতে খবর দেয়। এটাই নিয়ম।

এদিকে আর একটা প্রশ্ন আসে মাথায়। কেসটা যদি চিড়িয়াখানাতেই হবে, চিড়িয়াখানার কোনও লোক এল না কেন? ঝামেলা এড়ানোর জন্য? পুলিশে ডায়রি হয়েছে কি? যতদূর জানা আছে চিড়িয়াখানার খাঁচার ভিতরে হাত-টাত ঢোকানো বেআইনি। এসব করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশ কেস হয়। থাকগে, ইট ইজ নট মাই হেডেক। শুধু পেশেন্ট পার্টির বাড়িতে খবর দেওয়া আমাদের ডিউটি।

থানায় জানাই। খিদিরপুর চার নম্বর গেট, মেথরপট্টির আরতি। ওরা আরতির পুরো নাম চায়, বিবাহিতা না কুমারী, স্বামী, বাবার নাম, বয়স এসবও চাইল। আমি বলি এসব জানি না। পেশেন্টকে ঘুমের ইনজেকশন দেওয়া আছে, নর্দমা-টর্দমা পরিষ্কার করে, এমন কোনও আরতি। থানা থেকে বলে মেথরপট্টিতে সবাই নর্দমা পরিষ্কার করে, আর ওদের মধ্যে আরতি নামটা খুব কমন। আমি বলি, কানাই সাফুই, যে পেশেন্ট, সে আরতির খুব ক্লোজ। যে-আরতি কানাইকে চেনে, সে-ই হচ্ছে ঠিক আরতি। থানা থেকে জিজ্ঞাসা করে, কানাইয়ের সঙ্গে আরতির রিলেশন? আমি বলি, ফিঁয়াসে। তখন ফোনের ওধার থেকে— 'এ্যা?' শুনেই বলি, লাভার লাভার। তখন হো হো হাসি শুনি।

পরদিন পিয়ালির সঙ্গে দেখাটেখা সব হল। কানাইয়ের গল্প করলাম। পিয়ালি বলল লোকটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। আমি বললাম, ঠিক আছে, দেখাব।

অফ ডে কাটিয়ে ডিউটিতে গেছি, দেখলাম এমার্জেন্সি থেকে সরিয়ে কানাইকে বেডে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগারোটা নাগাদ ওর বেডে গেলাম। বেডের পাশে টুলের উপর সবুজ শাড়িতে লাল-হলুদ রং লাগা একজন মহিলা কানাইয়ের মাথায় হাত বুলোচ্ছে। মহিলাটির রং শ্যামলা, তীক্ষ্ণ নাক, রোগা হাতে কাচের চুড়ি, চুল লালচে এবং রুক্ষ। আমি বুঝি এই হল কানুর রাধা। কানাই চোখ বুজে রয়েছে। আমি এসেছি ও জানে না। কানাই ওই মহিলাকে বলছে— তুই এলি বলে হাসপাতালটা বৃন্দাবন হয়ে গেল।

এ কী ডায়লগ দিচ্ছে রে ভাই। একদম পোস্ট মডার্ন। ভাঙা র‍্যাক-টুল-সিলিন্ডার-বেডপ্যান-বেড়াল শোভিত কুঞ্জবনে রাধা বলছে, আর কভি ইসব করবে না, হাঁ। কানু বলে, ও-সব ছাড়। মৃণাল তুলিবে যদি লাগিবেই কাঁটা।

রাধা বলে, মিনাল কি মছলি আছে কুছি? কানাই বলে, ধুর বোকা মেয়ে। মৃণাল মানে পদ্ম, যেমন তুই।

পদ্ম দেখতে চোখ খুলল কানাই, আমায় দেখে ফেলল। কানাই লজ্জা পেয়েছে।

জিজ্ঞাসা করি, কী খবর, কেমন অবস্থা!

ও বলে বড় ব্যথা। দেখলাম বেশ ফুলেছে হাত। কাগজপত্র দেখলাম। গতকাল এক্সরে হয়েছে। রিপোর্ট আজই পেয়ে যাব। স্যার আজ দেখবেন। মনে হল গা একটু গরম।

আমার এই ওয়ার্ডে যারা শুয়ে আছে, তাঁদের অধিকাংশরই হাতে বা পায়ে প্লাস্টার। কারুর ট্রাকশন চলছে, অধিকাংশ পেশেন্টের কমন সমস্যা হল, ডাক্তারবাবু, প্লাস্টারের ভিতরে বড় চুলকায়। এক্ষেত্রে আমার কিচ্ছু করার নেই। শুধু একটা ব্যান্ডের গান হতে পারে, যদি চুলকায় প্লাস্টার ভিতরে কী হবে উপর থেকে চুলকে। চুলকের সঙ্গে মেলে না কিছু। মূলকে হতে পারে। কী হবে উপরে কেটে বিষ গাছ, যদি যত্নে ভিতরে রাখো মূলকে।

স্যার রাউন্ডে আসার আগে এক্সরেটা আসেনি। আমিই উদ্যোগী হয়ে নিয়ে এলাম। তবু সবাই বলবে সরকারি ডাক্তাররা কাজ করে না। এক্সরেটা দেখে আমি তাজ্জব। কারপাস, লুনেট এসব তো গেছেই, আলনা-টাও ফেটে গেছে। এসব কি এমনি এমনি জুড়বে? স্যার দেখে বললেন, সব দেখছি কিমা হয়ে গেছে। কানাইকে বললেন— কী বাবা, হরিণ-টরিণকে আদর করলে হত না? এক্কেবারে

বাঘকে। খুব অ্যামবিশাস প্রেমিক মানুষ তুমি। মানেকা গান্ধী জানলে তোমায় মেডেল দেবে। স্যার আমায় বললেন, খুলে সেট করতে হবে।

মানে অপারেশন। কবজিতে সাতটা হাড় থাকে। ওগুলো এধার ওধার হয়ে গেছে। বাঘের দাঁতের কী জোর। অপারেশন করতে হবে বললেই তো হয় না, কিছু নিয়মকানুন আছে। ফ্রি বেডে ভরতি হলেও কিছু খরচাপাতির ব্যাপার আছে। এম এল এ বা কাউন্সিলারকে দিয়ে লিখিয়ে আনলে কিছু সুবিধে আছে। রাধা যদি ওসব করতে পারে...।

কানাইকে বলি তোমার রাধাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। তখনই খোপ খোপ ট্রেতে দুপুরের খাবার এল। দেখি মাংস। কমই দেয়। কানাই মাংসের দিকে তাকিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু, আরতি বাইরেই আছে। আজ ও কাজে যাবে না, দিনভর এখানেই থাকবে। ওকে ওরা হাটিয়ে দিয়েছে। ওকে একটু ভিতরে আসতে দিন, খুব দরকার আছে।

বাইরে সেই মহিলাটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ওর চোখের দিকে তাকালাম। বেশ অ্যানিমিক, ওকে বললাম, কানাই ডাকছে। ও বলে, উরা হাটিয়ে দিয়েছে, আপনি ঘুসিয়ে দেন।

আমি ওকে ওয়ার্ডে পৌঁছে দি। বলি, একটা কার্ড দিয়ে দেব, অপারেশনের পর ওর কাছে থেকো, টাকাপয়সা জোগাড় করার কথাও বলি। কাউন্সিলারের একটা সার্টিফিকেটের কথাও বুঝিয়ে বলে দি।

পরদিন পাশের বেডের লোকটার কাছে শুনলাম কানাই আমাকে দিয়ে আরতিকে ভিতরে ডাকিয়েছিল মাংসটুকু ওকে খাওয়াবার জন্য। শুধু তাই নয়, সকালের ডিমসেদ্ধটাও খাইয়ে দিয়েছে আরতিকে।

আজি এ বসন্ত হেম
মাংস খাইয়ে করো প্রেম।

কানাইকে জিজ্ঞাসা করি, কী হল, তুমি মেয়েটাকে সব খাইয়ে দিচ্ছ কেন? কানাই বলে, আমি যে আঁশ খাই না। বোষ্টম কিনা।

হ্যাট্‌স অফ। এক্কেবারে রিয়েল বোষ্টম। ওই জয়দেব আর রজকিনীর কথা শুনেছিলাম, এবার কানাই সাফুই আর মেথরিনী।

হাসপাতালে যে কতরকম আসে। যদি গল্প লিখতে পারতাম, তো অনেক লেখা যেত। কত প্লট। ক'দিন আগে এক জটাওলা সাধু এল, ওর গলায় মাছের কাঁটা আটকেছে। একবার এক মহিলা এল, ওর মাথার উকুন ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে বেছে দিত যে, সে নাকি সেই মহিলার গুরুদেব। একটা গল্প লেখার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? তা হলে তো আরও একটু মশলা জোগাড় করতে হয়।

চিড়িয়াখানায় ফোন করলাম একদিন। সোজা ডিরেক্টারকেই চাইলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, অমুক তারিখে কানাই সাফুই নামে একজন আমাদের হাসপাতালে ভরতি হয়েছে, ও বলছে ও নাকি বাঘের খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে বাঘকে আদর করছিল, তখন বাঘ ওকে বাইট করে। কেসটা একটু ডিটেল বলবেন?

ডিরেক্টার বললেন, অ্যাঁ? আমি রিপিট করি।

ডিরেক্টার অবাক হলেন। বললেন, তাই নাকি? আমি তো কিছুই জানি না। এরপর ডেপুটি ডিরেক্টারকে ধরলাম। শুনেই বলে উঠলেন, না—না—না। এসব কিছু এখানে হয়নি। বাজে কথা, বাজে কথা। কী, প্রেসকে জানিয়ে দিয়েছেন নাকি?

আমার বেশ রহস্য রহস্য লাগল। 'বাজে কথা'-টা দু'বার বললেন কেন? একবার বললেই কি যথেষ্ট হত না? তার উপর 'প্রেস'-কে জানানো নিয়ে মাথা ব্যথাটা কেন?

আমি বলি, প্রেসকে জানাতে যাব কেন খামোকা? আপনিই বা প্রেসের কথা তুললেন কেন?

উনি বললেন— না, মানে কাগজে একবার ছাপা হয়ে গেলেই আমাদের খুব ঝামেলা ফেস

করতে হয়। কাগজওয়ালারা সব কনফার্ম না করেই ছেপে দেয় কিনা, তা ছাড়া এসব গুজবে মশলা আছে কিনা...

আমি বলি— এ জন্যই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। পেশেন্ট তো নিজেই বলছে ও বাঘের খাঁচায়...

আমার কথা শেষ হবার আগেই উনি বললেন, না—না—না, আপনাদের পেশেন্টের মাথায় তাইলে গণ্ডগোল আছে।

আমি বলি, না—না, মাথায় কেন গণ্ডগোল থাকবে। আমরা ডাক্তার কিনা, ওই ব্যাপারটা বুঝতে পারি। ঘটনাটা সত্যি।

তাই নাকি? আমার নলেজে কিন্তু নেই। নমস্কার। বুঝতে পারি চেপে যাওয়ার চেষ্টা রয়েছে। পুলিশ কেসে জড়াতে চাইছেন না হয়তো।

সন্ধেবেলা, ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে, আমি কানাই সাফুইয়ের কাছে যাই। প্রথমেই চোখে পড়ল লোহার খাটের রডে আটকে আছে একটা লাল টিপ। বিছানায় কাচের চুড়ি ভাঙা দু-এক টুকরো। আমি বলি তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। তুমি চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলে কেন?

ঘাস কাটতে।

তুমি কি মাঝে মাঝেই ঘাস কাটতে যাও?

আজ্ঞে।

ঘাস কাটার জন্য ওদের পয়সাকড়ি দাও?

না।

ওরা তোমায় কিছু দেয়?

না। গোয়ালা দেয়।

কত দেয়?

এক বস্তা বিশ টাকা।

ঘাস যে কাটতে যাও, টিকিট লাগে?

না। চিনাজানা।

কী করে চেনাজানা হল?

একদিন গড়ের মাঠে ঘাস কাটতেছিলাম, মাঠে তো ঘাস নাই বেশি, তবু কাটছি, শহরে কোথা পাব ঘাস? তখন এক বাবু দেখল। বলল— শোন, চিড়িয়াখানা যাবি? মেলা ঘাস আছে। তারপর সেই বাবু আমাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়ে দিল।

এজন্য তোমায় কোনও পয়সাকড়ি দিতে হল?

মিথ্যা বলব কেন, একটা পয়সাও দিতে হয়নি।

তারপর?

তারপর মাঝেমধ্যে সেখানে ঘাস কাটি। কাস্তে দিয়েও কাটি, মিশিন ঠেলেও কাটি। ওদের ঘাস কাটার ঠেলা মিশিন আছে। কুঁচি কুঁচি ঘাস পাওয়া যায়। যে রোজদিন মিশিন ঠেলে, সে বলে, নে, মিশিন ঠেল। আমি ঠেলি। ঠেলি মানে টানি। টানতে হয় উটা। সে বসে বসে বিড়ি খায়। তারপর কুঁচো ঘাস বস্তায় ভরে নিয়ে আসি। আর মাঝেমধ্যে একজন স্যার কাগজে টিপ সই করিয়ে লেয়।

এবার বোধহয় ব্যাপারটা একটু বোঝা গেল। ঘাস কাটার জন্য একটা বাজেট থাকে। আমাদের হাসপাতালেও আছে শুনেছি। বিনে পয়সায় ঘাস কাটিয়ে একটা ভাউচার করা হয়। উপরের মহল হয়তো এসব জানে না, কিংবা জানলেও এসব ছোটখাটো ব্যাপারে চুপচাপ থাকতে হয়। বা চুপচাপ না থেকে উপায় থাকে না। এসব হয়তো আমাকেও একদিন ফেস করতে হবে।

ঠিক আছে। ঘাস তো কাটতে যেতে। তখন কি মাঝেমধ্যেই তোমার আদর পেত? খাঁচার ভিতরে হাত ঢোকাতে?

সম্মতির মাথা নাড়ে কানাই।
কেউ কিছু বলত না?
না।
খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে কী করতে?
এদিক ওদিক তাকিয়ে, মাথা চুলকে ও বলল, ননা ননা।
কাকে কাকে ননা ননা করেছ?
ও চুপ।
হাতিকে?
হ্যাঁ।
হনুমানকে?
হ্যাঁ।
আরতিকে ননা ননা করোনি?
ফিক করে হেসে জিভ কাটল কানাই।
কুমিরকে ননা ননা করেছ?
ওখানে নামা যায় না।
সিংহকে?
না।
তবে বাঘকে করতে গেলে কেন?
কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাথা নিচু করে ও বলল, বাঘের বড় কষ্ট।
এই ডায়লগে আমি ফিদা হয়ে যাই। তবু বলি, আচ্ছা, বাঘের বেশি কষ্ট, নাকি তোমার?
আমার আর তেমন কী কষ্ট। কত জায়গায় ঘুরি, বাঁশি বাজাই, কীর্তন করি।
তা তো ঠিকই। তোমার রাধার সঙ্গে ঘোরো টোরো...
কানাই গত শতাব্দীর সায়গলমার্কা লাজুক হাসি হেসে মাথা নিচু করল।
ওই রাধা, মানে আরতিকে জোটালে কোথায়?
ভগবান জুটিয়ে দিল।
নকশা ছাড়ো তো, কী করে তুললে বলো।
আপনি এমন কথা বলেন না, ডাক্তারবাবু...
যা জিজ্ঞাসা করছি বলো।
আমার কাছে ক'টা বাতাসা চেয়েছিল। কীর্তনে হরির লুট হয় না, সেইসময়। ও দুবলা কিনা, বাতাসা পায়নি। কাছে এসে বলল, বাচ্চার জন্য ক'টা দাও। তো, দিলাম। আবার পরের দিন...
বুঝেছি। পুরো পরকীয়া। ক'টা বাচ্চা ওর?
দুইটা।
ওর স্বামী কী করে?
জমাদারের কাজ। করপোরেশনে। কিন্তু কাজে মন নাই। বড় মদ খায়। সংসারে মন নাই। আরতির বুকের কাঠিতে পোকা ধরল, ডাক্তার বলেছে ভাল খাওয়া-দাওয়া দিতে, ওর স্বামীর কোনও হুঁস আছে?
বুঝলাম। পড়েছে গ্যাঁড়াকলে, পিরিতি ফেবিকলে।
চলে যাচ্ছি, এমন সময় কানাই বলল, স্যার, একটা কথা শুধাই, বাঘের এঁটো খেলে শুনেছি যক্ষ্মা সারে, সত্যি?
আমি বলি, কে বলেছে?
শুনেছি।

স্যার আমাকে এক্সরে প্লেটটা দেখালেন। বললেন, দ্যাখো কীরকম ভেঙেছে।

শুধু সেটিং করলে কি হবে? ডেলিকেট ব্যাপার। স্ক্রু-টু মারতে হবে। এখানে ওসব হবে না। কোনও ভাল জায়গায়...

আমি বলি, কোথায় আর যাবে ও। এখানেই যা হয়...

হাসপাতালে একদিন পিয়ালি এসেছিল। আমি ওকে কানাই সাফুইয়ের কাছে নিয়ে গেলাম। সে-দিন আরতিও এসেছিল। আরতি একটা নতুন বাঁশি নিয়ে এসেছিল কানাইয়ের জন্য। কানাই নাকি নিয়ে আসতে বলেছিল। অনেকদিন বাঁশি বাজাতে পারেনি ও, তাই ওর অম্বল অম্বল লাগছে। হাতের আঙুলগুলো ভাল করে নাড়াতে পারছিল না কানাই, তবু তারই মধ্যে একটু সুর তুলল। এই হাসপাতালে ওয়ার্ডের ভিতর এর আগে কোনওদিন কি বাঁশি বেজেছিল?

পিয়ালি বলল তুমি ভাল হয়ে নাও, তোমার বাঁশি শুনব। আরতি ওর অ্যানিমিক চোখে জিন্‌স পরা এম এস সি পাশ পিয়ালির দিকে অবাক তাকায়। পিয়ালি বলে, ভাল হয়ে গেলে আবার যাবে নাকি চিড়িয়াখানায়?

কানাই মাথা নাড়ে। বলে, ওখানে আর যাওয়া হবে না। চিড়িয়াখানার লোক বলে দিয়েছে আর কখুনও আসবি না। এলে ঠ্যাং...

থাক। দরকার নেই, পিয়ালি হাসে।পিয়ালি ওর ব্যাগ খুলে দুটো চকলেট বার করে। একটা কানাইকে আর একটা আরতিকে দেয়। আরতি চকলেটটা ওর পলিথিন ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়ে বলে, বাচ্চার জন্য লিচ্ছি। কানাইও আস্তে করে ওর চকলেটটা পলিথিনে ছেড়ে দেয়। পিয়ালি আবার দুটো বের করে। মোড়ক খুলে একটা কানাইয়ের মুখে আর একটা আরতির মুখে গুঁজে দেয়। ওরা তিনজনেই হেসে ওঠে। হাসপাতালে হাঁসও থাকে না, হাসিও নয়। কিন্তু সেদিন হাসির সঙ্গে একটু বাঁশি মিশে ওয়ার্ডটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল।

অপারেশনের দিন ঠিক হল। এরকম অনেক পেশেন্টেরই হয়। নতুন রোগী এল, নতুন সব কেস। হাসপাতালে যা হয়। আমার যিনি স্যার, যাঁর আন্ডারে কানাই ভরতি ছিল, ডা. সান্যাল, চলে গেলেন চণ্ডীগড়। ওখানে বোন গ্র্যাফটিং অ্যান্ড ইমপ্ল্যানটেশন অফ মেটাল ডিভাইস সম্পর্কিত একটা সেমিনারে লেকচার আছে তাঁর। এক্সপার্ট কিনা। এটার উদ্যোক্তা একটি বিদেশি কোম্পানি, যাঁরা হাড়ের অপারেশনের যন্ত্রপাতি, হাড়ের স্ক্রু, পেরেক, ক্লিপ, বাইন্ডার, এসব তৈরি করে। স্যার পুরো ফ্যামিলি নিয়ে গেছেন, ওখান থেকে ওরাই কুলু-মানালি ঘুরিয়ে দেবে। এসব অফার আমিও একদিন পাব।

যাই হোক, ওইসব ঘ্যাম সেমিনারের জন্য এইসব অপারেশন-টপারেশন থেমে থাকে না। অন্য একজন করে দিলেন। আমিও ছিলাম। হাতটা খুলে দেখি সত্যি যা-তা অবস্থা। বাঘের চোয়ালের জোর আছে বটে। উনি ও টি-তে মোবাইলটা অফ রাখেননি। কানাই সাফুই মার্কা অপারেশনে মোবাইল অফ রাখার দরকার হয় না।

কানাই জিজ্ঞাসা করছে, কবে ছাড়া পাব? আমি বলি, আর দিন দশেকের মধ্যেই ছেড়ে দেব।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের কোকিলটা টায়ার্ড হয়ে পড়েছে। রেডিয়োতে 'মরি হায় বসন্তের দিন চলে যায়' শুরু হয়ে গেছে। রাস্তায় পড়ে থাকা শিমুল-টিমুল পিষে টাটা সুমো-মারুতিরা চলে গেছে। পিয়ালিকে একদিন বললাম, স্প্রিং তো শেষ, তেমন সেলিব্রেট করা হল না। ও বলল, চল স্প্রিং চিকেন রোল খাই। স্প্রিং রোল খেতে খেতে বলল, তোর জন্য একটা গুড নিউজ। সুতনু ভিসা পেয়ে গেছে। আমি এখন ফুললি ইয়োরস্। এরপর থেকে এস এম এস-এ আমি লিখতাম Fooly Yours.

আবার ফুলেছে কানাইয়ের হাত। বলছে ভীষণ যন্ত্রণা। বোঝাই যাচ্ছে ভিতরে পুঁজ হয়েছে।

এক্সরে হল। বুঝলাম কেলো হয়েছে। ডিটেইল আর নাই বা বললাম। এক্সরে দেখে স্যার মাথা চুলকোতে লাগলেন। আমাদেরও বকাবকি করলেন। বললেন, ট্যাঁড়শ বেচো গে যাও। বললেন, এখন অ্যাম্পুট ছাড়া কিচ্ছু করার নেই। কবজির উপর থেকে বাদ দিতে হবে।

এটা খুব সেফ কেস। পেশেন্ট পার্টির ঝামেলা হবে না। পেশেন্ট পার্টিই নেই। ওই তো অ্যানিমিক আরতি। জানলাম ওর একটু টি-বি-ও হয়েছিল। খিদিরপুরে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিতে দেখায়। ওদের তো বলতে হবে। বলার আগে মুখটা গম্ভীর করলাম। কখনও কানাইবাবু বলিনি। আজ সন্ধ্যায় বললাম, কানাইবাবু, অনেক চেষ্টা করলাম, পারলাম না। আপনার ভাই, হাতটা না, কবজির উপর থেকে, ইয়ে, কেটে বাদ দিতে হবে।

বলার সময় আমার গলাটা যেন কেঁপে উঠল। কানাই কিছুক্ষণ স্তব্ধ। তারপর শূন্যতার কাছে বলল ও, তা হলে তো আর বাঁশি বাজানো হবে না, অ্যাঁ?

কথাটা শুনেই আমার মতো একটা মাকড়ার চোখ থেকে ঝপ করে দু-এক ড্রপ আনস্মার্ট জল লিক করে গেল। ওঃ, হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, পান্নালাল ঘোষ, অলোকনাথ দে... কিংবা সেই সুদাম সখা তোমরা তো জানতেও পারছ না তোমাদের ওই সাধের বাঁশি...

কানাই বিছানায় শুয়ে পড়ল একটা বাতিল রবার টিউবের মতো। দেওয়ালে ঝোলানো জন্ডিস আলোয় ওর মুখ ফাঁকা স্যালাইন বোতলের মতো। কানাই ওর ডান হাতটাকে দেখতে থাকে মমতায়। আমি ব্যাপারটা একটু হালকা করার চেষ্টা করি। বলি, বলে না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, তাই হল। এমন গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে যে... অপারেশন তো করলাম। চেষ্টা তো কম হল না। এখন যা অবস্থা, পুরো হাতটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই জন্যই একটু ইয়ে করে নিলে...

ইয়ে মানে কি কেটে ফেলা? কানাই আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে। আমি ওর চোখে চোখ রাখতে পারি না। কানাই ওর ডান হাতটির ফোলা ফোলা আঙুল দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে। ওর আঙুলে কোনও জোরই নেই, তবু মনে হচ্ছে ওর আঙুল বড়শির মতো আমার শরীরের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। আমি হাত ছাড়িয়ে নিই। কানাইয়ের বিছানার পাশে বাঁশিটা অনাথের মতো পড়ে আছে।

আরতির সেই সবুজ শাড়িটা থেকে হোলির রং ততদিনে মুছে গেছে। আরতি আমায় বলল, ডাগতারবাবু, উয়ার হাতটা লিয়ে লিবেন? আমি গলার স্টেথোটা আঁকড়ে ধরি। কোনও কথা বলতে পারি না। আরতি বলে, উ তবে কী কাম করবে? কে খিলাবে ওকে? আমি দ্রুত পাশের বেডে চলে যাই।

বাড়িতে আমার মা অনেকগুলো পুরনো শাড়ি জড়ো করেছিল বাসন নেবে বলে। আমি বেছে দুটো ভাল শাড়ি তুলে নিই। খবর কাগজে মুড়ে কানাইকে দিই। বলি, আরতিকে দিয়ো। কানাই খুশি হল। কানাইকে মাঝেমধ্যে বিস্কুটের প্যাকেট, আঙুর, এসব দিই। ও বলে, আপনার উপর শ্রীরাধার কৃপা আছে। ও বলে, হাসপাতালে তবু যা হোক ভালমন্দ পাচ্ছি। এরপর খাব কী? হাত নাই তো ভাত নাই। আমি বলি, আরতি তোমায় দেখবে না?

কানাই একটু গম্ভীর হয়। মাথা নাড়ায়। বলে, কিছু ফিরত নিবার আশা করতে নাই। তারপর বলে, আমার ভাবটা হল অহৈতুকি। মানে বুঝলেন কি না, এমনি এমনি। ম্যাঘ যেমন জল দিচ্ছে পিরথিবীর মাটিকে। মাটির কাছে ম্যাঘের কিছু পাওনা নাই। আমার হল রাধা ভাব। রাধা যেমন কিছু চায়নি কৃষ্ণের কাছে। খালি কৃষ্ণ প্রীতি লাগি বেঁচেছিল। আমি আরতিকে কৃষ্ণ ভাবি। সবার মধ্যেই রাধারানি বাস করেন। নইলে আপনি কেন বিস্কুট দেন? আঙুর?

কোন বায়োকেমিস্ট্রি বা সাইকোপ্যাথলজিতে এসব কথা বলছে ও, আমি বুঝি না। ফিলোজফির কি কোনও প্যাথলজি হয়? কে জানে? আমি আর ওকে বকাই না। আমার মধ্যে রাধা ভাব আছে শুনলে পিয়ালি খুব প্যাঁক দেবে। বরং আমি ব্যান্ডের গান ভাবি।

অ্যাম্পুটটা করে ফেলতে হল। নইলে গ্যাংগ্রিন হয়ে যেত। যে-আঙুলগুলো বাঁশির শরীরে ঘুরে ঘুরে সুর তুলত, সেগুলো রক্তমাখা তুলো-ব্যান্ডেজ-গজ কাপড়ের সঙ্গে প্লাস্টিকের নীল বালতিতে হসপিটাল ওয়েস্ট হিসেবে পড়ে রইল। মাছিও এসে গেল দু-একটা।

আর কয়েকদিন পরই ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ও থাকলে একটু চাপ পড়ে মনে। সবারই কি এমন হয়? নাকি আমার মধ্যে একটু রাধা ভাব বেশি বলে এরকম হয়।

এসব অপারেশনে ভালরকম অ্যানাসথেশিয়া দেওয়া হয়। স্যালাইন, অক্সিজেন সবই চলে। যখন ওর আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরছে, সে সময় আমি ছিলাম। শুনি, বিড়বিড় করছে হরি বাঘ হরি বাঘ বাঘ বাঘ হরি হরি। জিজ্ঞাসা করি, কেমন লাগছে? ও একবার তাকিয়েই চোখ বুজল। কথা বন্ধ করল। ঘণ্টা দুয়েক পর আর একবার গেলাম। দেখলাম গায়ে বেশ জ্বর আছে। আমি ওর মাথায় হাত দিলাম। কপালে হাত বুলোলাম। ওর চোখের পাতা খুলল। বলল, বাঘ এসেছিল?

আমি বলি— না, আসেনি এখনও। আসবার কথা আছে নাকি?

কানাই জড়ানো গলায় বলল— যদি আসে আমার কাটা হাতটা ওকে খাইয়ে দিয়ো। দিয়ে বলবে শোধ-বোধ হয়ে গেল।

ওর ডেলিরিয়ামের মধ্যে, কী তত্ত্বকথা লুকিয়ে আছে কে জানে? আমি ওর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলি কীসের শোধ-বোধ কানাই?

কানাই বলল— বাঘের অন্ন নিলাম হরি, শাস্তি দিলেন আমায় হরি।

বাঘের অন্ন কী কানাই?

বাঘের অন্ন মাংস।

বাঘের অন্ন হরণ করেছিলে?

বাঘের খাঁচায় কত খাবার। আর আবতির বুকের খাঁচায় পোকা। তখন কী করাটা উচিত? অ্যাঁ!

এইটুকু বলে কানাই পাশ ফেরার চেষ্টা করল। পারল না। আবার চুপচাপ হয়ে গেল।

ও যেদিন ছাড়া পেল, আমি ছিলাম। ও কাটা হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। বলল, অনেক করলেন, কোনওদিন ভুলব না। আমিও আমার হাত কিছুটা বাড়ালাম। দুই হাতের মাঝের শূন্যতায় স্তব্ধ হয়ে রইল কথা ও কাহিনি।

কেসটা শেষ। ওই বেডে আবার নতুন রোগী, শিমুল গাছ নতুন পাতা, মোবাইলে নতুন টিউন, পিয়ালির নতুন বয়ফ্রেন্ড, নতুন পে স্কেলের দাবিতে পোস্টার, আমার হাউসস্টাফশিপ শেষ হবার মুখে। নতুন চাকরির চেষ্টা...। এগোতে হবে না আমাকে?

একদিন হাওড়া থেকে একটা ট্যাক্সিতে উঠেছি, পার্ক সার্কাসের একটা নার্সিংহোমে যাব। একেবারে ফ্লাইওভার সফর। একটা ফ্লাইওভার থেকে নেমে আর একটা নতুন ফ্লাইওভারে উঠেছি, হঠাৎ দেখলাম নীচের ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে রাধাকৃষ্ণ। কৃষ্ণের মাথায় রাংতার মুকুট, গায়ে ব্যান্ডপার্টির কোট। রাধার গলায় কাগজের মালা। এই দৃশ্য ছাড়িয়ে আমার ট্যাক্সি দ্রুত উঠে যাচ্ছে ফ্লাইওভারে। ফ্লাইওভারে উঠে গেলে আর পিছনে ফেরা যায় না। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আর একবার রাধাকৃষ্ণ দর্শনের চেষ্টা করি। তারপর পিছনের কাচের ভিতর দিয়ে ব্যাকুল তাকাই। দৃশ্যটা হারিয়ে গেছে। রাধাকৃষ্ণকে দেখি না আর। জানি, তবু আছে নীচে কোনওখানে। দেখি, কী আশ্চর্য! একটা কাটা হাত উড়ে আসছে ট্যাক্সির পিছন পিছন।

না না, ওটা হাত নয়, কাক।

শারদীয় বর্তমান, ২০০৪

মোবাইল সোনা

টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে ম্যাক্সিপরা বুড়িরা।

আকাশ এখনও ম্যাক্সি পরতে শেখেনি। এখন আকাশের গায়ে নীল খোলের শাড়ি, মেঘের কলকা বসানো। শাড়ির পাড়ে গাছগাছালি, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর নকশা বসানো চিমনিও। গঙ্গামুখো বারান্দায় শীতসকালে দাঁড়িয়ে শোভা দেখছেন দুই বৃদ্ধা। ইজি চেয়ারগুলি চুপচাপ বসে আছে। এখন দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে। জল বয়ে যায়। পাখি ওড়ে, দু-চারটে নৌকো কেমন স্থির। চুপচাপ জলে ভাসা উদাস। আঙুরবালার গানের রেকর্ডের কথা মনে পড়ে কমলিনীর।

এখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কমলিনী মিত্র আর নমিতা মুখার্জি। আর ছটি শূন্য কাপ। সকালের চা খাওয়ার পর চারজন ঘরে চলে গেছেন। কেউ পুজো করছেন, কেউ রেডিয়ো শুনছেন। এই দু'জন এখনও দাঁড়িয়ে। কমলিনীও পুজো করবেন। ওঁর নাড়ুগোপাল আছে। কিন্তু কমলিনীর মনে হয় এখানে এমন দাঁড়িয়ে থাকাটাও একটা পুজো।

এটা একটা বৃদ্ধাশ্রম। গঙ্গার ধারে। গঙ্গামুখো ছটি ঘর। এসব ঘরের রেট বেশি।

তাঁরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ কথা কইছেন না, কিন্তু ওঁদের অনন্ত কথা আছে। প্রত্যেকেরই আলাদা জীবনবৃত্তান্ত আছে। অথচ কিছুই বলার নেই। কথাগুলো যেন সব স্ট্যাচু করে রাখা।

তবু এই রৌদ্রে, পৃথিবীর সকালবেলায়, কমলিনীর মনে হয় লিকারের ভেতরের অজানা চিনির মতোই আনন্দ অদৃশ্য থাকে। নইলে এই বিষাদও ভাল লাগে কেন।

কমলিনী হঠাৎই কথা বললেন—

এই, তোমার ভাল লাগে?

নমিতা কমলিনীর দিকে তাকান। বুঝতে চেষ্টা করেন প্রশ্নটা ওঁকে উদ্দেশ্য করেই কি না। কমলিনী তাকিয়ে আছেন নমিতার দিকে। নমিতার এই প্রশ্নটা বড় কঠিন মনে হয়। এর কি কোনও উত্তর হয়? কিছু বলবেন ভেবেই অনেকটা বাতাস টেনে ফুসফুস ভরতি করেন। কিন্তু বললেন একটিমাত্র বর্ণ।

কী?

এইসব...। বলেই ছানি চোখেই চারিদিকে তাকালেন কমলিনী। তবে কি এইসব মানে এই নদী-আকাশ-মেঘ-স্রোত-ব্রহ্মাণ্ড? নমিতা রোদ মাখতে মাখতে ছুটে যাওয়া কচুরিপানার দিকে তাকিয়ে বলেন— ঢং।

তারপর আর ওখানে দাঁড়ান না নমিতা। ঘরের ভেতরে ঢুকে যান।

কমলিনী বোঝেন এই ঢং শব্দটা শুধু ওই কচুরিপানার দিকে ছুড়ে দেননি নমিতা। কমলিনীর দিকেও।

কমলিনী মাঝে মাঝেই এরকম ঢং পান। আকাশের মেঘে দু' হাত বাড়ালে আলিঙ্গন দেখতে পান, বিদ্যুতের 'দ'-এর মধ্যে উনি দেখেন মোরে আরও আরও আরও কর দান। পাখির ডাকে শোনেন ভালবাসি ভালবাসি, এমনকী গাড়ির হর্নেও শুনেছেন তোমাকে চাই। দিন দশেক আগে তো, শীতের মধ্যে বারান্দায় ন্যাপথালিনের গন্ধ মাখা প্রাচীন ঢাকাই শাড়ি পরে বসেছিলেন অনেক রাত অবদি। পূর্ণিমা ছিল। ওই ঢং-এর কারণ নমিতাও জানেন। বিবাহবার্ষিকী। তেষট্টিতম। কমলিনীর ধারণা 'উনি' ঠিকই দেখছেন কমলিনীকে। কমলিনী আর নমিতা এক

ঘরে থাকেন। ওঁরা দু'জন পরস্পরের রুম মেট। ঘরের দেওয়ালে একটি পুরুষের ছবি। কমলিনীর 'উনি'। কমলিনী রোজ সকালে ছবির সামনে ছোট গেলাসে একটু চা রাখেন। কমলিনীর একটি নাড়ুগোপালও আছে। কুলুঙ্গিতে। ওখানে ছোট গেলাসে জল। ওরকমই একটা ছোট গেলাসে চা রাখেন। নাড়ুগোপালকে রোজ বাতাসা দেন। মাঝেমধ্যে সন্দেশ। কিন্তু ওঁর উনির ছবির সামনে এসব রাখেন না। ওঁর উনির মিষ্টি খাওয়া বারণ ছিল। হাই সুগার। তাই শুধু জল। নমিতার ওসব বালাই নেই। নমিতার গোপাল-টোপালও নেই। নমিতা বই-টই পড়েন। কমলিনী ইদানীং পড়তে পারছেন না কারণ চোখে ছানি। ছেলে বলেছে অপারেশন করিয়ে দেবে, কিন্তু সময় পাচ্ছে না। নমিতার কোনও উনি নেই। নমিতার বিয়ে করা হয়নি, ভাইদের মানুষ করেছেন, বোনের বিয়ে দিয়েছেন। ইস্কুলের দিদিমণি ছিলেন, শেষ তিন বছর বড়দিদিমণি। নিজের কথা বেশি বলেন না নমিতা। কমলিনী বলেন। ওঁর ছেলেমেয়ের কথা, নাতিনাতনি, বউমা। লাকসাম, লামডিং, আলিপুরদুয়ার স্টেশনের কথাও বলেন কমলিনী, যেখানে কমলিনীর স্বামী চাকরি করতেন, রেলে, স্টেশনমাস্টার। নমিতা জানেন কমলিনীর উনি কাঁঠালের বিচি খেতে খুব ভালবাসতেন। আর মুড়ি-চানাচুর। সজনের ডাঁটাও। যখন দাঁত তুলে ফেলতে হল, তারপরও মাড়ি দিয়ে চিবোতেন। গোঁফ ছিল। বিয়ের ফটোতে গোঁফ আছে। বিয়ের পর কমলিনী বলেছিলেন সুড়সুড়ি লাগে, তাই কেটে ফেলেছিলেন। রিটায়ার করার পর বলেছিলেন এবার রাখি? রেখেছিলেন। কিন্তু তবুও বেশিদিন রাখতে পারেননি ওঁর শখের গোঁফ। আবার কাটতে হয়েছিল। সুড়সুড়ি।

ষাটের পরেও? নমিতার প্রশ্নে কাচভাঙা হাসি হেসেছিলেন কমলিনী। নমিতা বলেছিলেন— ঢ-অ-অং।

এত কিছু বলেন কমলিনী, কিন্তু নমিতা কিছুই বলেন না। কমলিনী জিজ্ঞাসা করেছেন ওঁর ভাইপো-বোনঝিদের কথা, নমিতা বলেছেন— ওরা সব প্রতিষ্ঠিত, বিবাহিত। ব্যাস। কমলিনী একদিন ঝরঝর মুখর বাদরদিনে নমিতাকে জিজ্ঞাসা করেছেন— বিয়ে না হয় করা হয়ে ওঠেনি তোমার, কিন্তু মন দেওয়া-নেওয়াও করনি কখনও?

নমিতা মাথা নিচু করে ঠোঁট উলটে নিশ্চুপ ছিলেন। এর মানে— কে জানে? উনি বড্ড চুপচাপ। এত চুপচাপ ভাল লাগে না কমলিনীর। নমিতা তো বলতে পারতেন— প্রেম করা সই আমার হল না, কিংবা প্রেম একবারই এসেছিল জীবনে, সে তো হায়, নিরুপায়, পারিনি তো কভু তারে জানতে। না হয় রবীন্দ্রসংগীতের লাইনই বলতিস। প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে। দিইনি তাহারে আসন। দেখতে শুনতে এত ভাল নমিতা, কেউ ওর প্রেমে পড়েনি তা কখনও হয়? বুকের মধ্যে সবসময় পাষাণ চাপা দিয়ে রাখেন নমিতা। তবে শোনেন। কমলিনী একটু কথা বলতে ভালবাসেন। বয়েস হলে সবাই কথা বলতে চায়, কিন্তু শোনার লোক থাকে না। নমিতারই শুধু কথা কম, শোনা বেশি। নমিতাকে জিজ্ঞাসা করেও পেট থেকে কথা বার করা যায় না। ওঁর চিঠিপত্রও আসে না, ফোনও নয়। তবে ঠাকুরের কাছে হাতজোড় করে উনি কী বলেন? কার জন্য বলেন? কমলিনী যেমন বলেন, হে ঠাকুর, আমার বাবলুকে সুস্থ রাখো, ওকে শান্তি দাও। নতুন বউমা যেন বাবলুকে সুখে রাখে। যেন না দাগা দেয়। নাতিটাকে পরীক্ষায় ফার্স্ট করো, নাতনিটাকে একটু মোটা করো, ওর যেন ভাল বিয়ে হয়... কিন্তু নমিতার বিড়বিড়ের মধ্যে কী থাকে? কার জন্য প্রার্থনা থাকে?

আজ রবিবার। ওঁদের রোজই রবিবার। রোজই ছুটি-ছুটি। এ রকম অফুরন্ত ছুটির মধ্যেও অনেকের সময়াভাব হয়। লাবণ্য বলছিল, খবরের কাগজটাই পড়া হয় না। সময় পাই না। কমলিনী বলেছিলেন, কুকুরের যেমন, কাজও নেই, আবার অবসরও নেই।

আজ রবিবার। বোঝা যায় ইডলিতে। সাড়ে আটটায় ঢনঢনাঢন হয়। ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা। তখন নীচে নামলে গরম গরম পাওয়া যায়। নইলে ঝর্না এসে ঘরে দিয়ে যায়। নমিতা সাধারণত

নীচে নামেন না। আজ কমলিনী বললেন— চলো, গরম খাবে। কমলিনী আজ একটু বেশি উচ্ছল। কারণ আজ বিকেলে বাবলু আসবে। গতকাল ফোন করেছিল।

এ বাড়িতে একতলা দোতলা মিলে মোট দশজন। সবাই মহিলা। স্নেহলতা নামের একজন বৃদ্ধা বলেছিলেন— স্কুল করলুম দয়াময়ী। কলেজ বেথুন। বৃদ্ধাশ্রমেও কো-এডুকেশন জুটল না, এমনই বরাত।

এই বৃদ্ধাশ্রমের নাম নারীমহিমা। উত্তরপাড়ার জমিদার বংশের এক মহিলা তাঁর বাড়িটি দান করেছিলেন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এই শর্তে, যে এখানে শুধুমাত্র বৃদ্ধাদেরই জন্য একটি ওল্ড এজ হোম করতে হবে। মিস মাধবী এখন এখানেই থাকেন। এককালে ক্যাবারে নেচে কলকাতা কাঁপিয়েছিলেন। থিয়েটারেও নাচতেন। মিস শেফালি, মিস জে, মিস মাধবী— এঁরা সব ছিলেন কতজনের হার্টথ্রব। মিস মাধবীর পায়ে বাত। একতলায় থাকেন। ইনি মিস লিখতেন বটে, কিন্তু মিস ছিলেন না। মিস মাধবী বলছিলেন, আমার কর্তার ছিল বড় সন্দেহবাতিক। এখন স্বর্গে গিয়ে শান্তি পাচ্ছেন, কারণ এ বাড়িতে কোনও ব্যাটাছেলে নেই।

বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলেন কমলিনী। নিজেই। 'গঙ্গার ধারে ঘরোয়া পরিবেশে বৃদ্ধাশ্রম। কেবল মহিলাদের জন্য।' 'গঙ্গার ধারে' শব্দটাই বড় লোভনীয় ছিল। বাবলুকে নিয়েই দেখতে এসেছিলেন। প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বাবলু বলেছিল, তুমি যদি এখানে শান্তি পাও তো থাকো। বাবলু নিজে থেকে কখনওই বলেনি বৃদ্ধাশ্রমে যেতে। কিন্তু কমলিনীর তো বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। উনি বেশ বুঝতে পারছিলেন এ সংসারে তিনি বাড়তি। ওদের অসুবিধে হচ্ছে। দশ বছর আগেই যদি মরে যাওয়া যেত, তা হলে হয়তো বাবলুর সংসারটা ভাঙত না। আবার নতুন করে বিয়ের উজ্জুক করতেই কমলিনী সরে এসেছেন। স্বামীর ফ্যামিলি পেনশন আছে না? পোস্টাপিসের সুদও। মেয়েটাকে দিল্লির হস্টেলে রেখেছে বাবলু, ছেলেটাকে নরেন্দ্রপুরের মিশনে। বাবলু যখন কাজেকম্মে বাইরে যায়, নতুন বউমাও সঙ্গে যায়। বেশ তো। ভালই তো। কমলিনী এখানে না এলে নতুন বউমা কি এরকম হুটহাট যেতে পারত? ওরা সুখে থাক। ফাসক্লাস থাক। ওদের জন্য গঙ্গার জলে কড়ে আঙুলের দাগ টেনে ফাঁড়া কাটান কমলিনী। এখন আর গঙ্গায় নামতে পারেন না, উলটো দিকেই ঘাট আছে। প্রথম প্রথম ঘাটে নামতেন, গঙ্গার স্রোতেই ফাঁড়া কাটাতেন, এখন কমণ্ডলুর গঙ্গার জল বাটিতে ঢেলে ফাঁড়া কাটান। নিজের ফাঁড়াটা কাটান না। হট করে পড়ে গিয়ে, কিংবা বাজ পড়ে... বেশ হয়, সবচেয়ে ভাল হার্ট অ্যাটাক, দু' মিনিট, কাউকে ভোগাবার গপ্পো নেই, বাবলু ফোন পেল— আপনার মা...

সাদা সাদা ইডলির গা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। পাশের বাটিতে সম্বর। সেখানেও ধোঁয়া। কারিপাতার গন্ধ। নীচের অফিসঘরে টেলিফোন। রবিবার সকালে অনেকের ফোন আসে। অনেকে ফোন করেন। রবিবারই তো ছেলে, জামাই, বউমা, নাতিনাতনিরা বাড়িতে থাকে। একজন ফোনে জিজ্ঞাসা করছেন বাড়িতে, কী টিফিন হচ্ছে? লুচি? তারপর কিছুক্ষণ নিচুস্বরে কথা, ফোনটা যখন ছাড়লেন, চোখে জল। চোখ মুছলেন। কমলিনীর ফোন করার ইচ্ছে হল, কিন্তু আবার কাউকে সাধ্যসাধনা করে বলতে হবে নম্বরটা টিপে দে না। কমলিনীর চোখে ছানি বলে নম্বর দেখতে পান না ঠিকঠাক। ছায়াদি নামে একজন আছেন। তিনি আবার ফোন নম্বর ভুলে যান। ছেলের সঙ্গে কথা বলতে হলে মোবাইলে বলতে হয়। মোবাইলের নম্বরটা আবার লম্বা। তখন ম্যানেজারবাবু খাতা খুলে নম্বর বলে দেন। ছায়াদির খুব ভুলো মন। উনি আবার ম্যাক্সি পরেন না। শাড়ি। সবক'টা শাড়ির আঁচলে অনেক গিঁট। কিছু মনে পড়লেই আঁচলে গেরো বাঁধেন। কাল বিকেলে ভিটামিন বড়ি খাওয়া হয়নি, আজ খেতে হবে। একটা গেরো। ক্যালেন্ডারে দেখলাম আগামী বুধবার মাঘী ষষ্ঠী। নাতি-নাতনির নামে গঙ্গায় পয়সা ফেলতে হবে। একটা গেরো। ছ' তারিখ নাতনির জন্মদিন। ফোন করে হ্যাপি বার্থ ডে বলে গঙ্গায় এক

টাকার ছোলাভাজা ফেলতে হবে। মাছের জন্য। বাচ্চাদের জন্মদিনে মাছকে খাওয়াতে হয়। একটা গেরো। এরকম কত। কিন্তু কোনও গেরো যে কী মনে করে, সেটাই মনে থাকে না। কমলিনী ভাবলেন নমিতাকে নয়, ম্যানেজারবাবুকেই বলবেন একবারটি নম্বরটা টিপে দিতে। কিন্তু আজকাল কিছু রিকোয়েস্ট করতে ইচ্ছে করে না একটা কথা শোনার পর।

ঝর্নাই বলেছে। ম্যানেজারবাবু নাকি খাতায় নামের পাশে কিছু চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন। দুটো গোল (০০) মানে ছিঁচকাঁদুনে। দুটো দাগ (— —) মানে ঘ্যানঘ্যান করে। স্টার মানে ঝগড়াটে। সমান চিহ্ন মানে বেশি কথা বলে। প্রশ্নচিহ্ন মানে কী যেন একটা আছে। কমলিনীর নামের পাশে নাকি অনেক দাগ আছে। কমলিনী একদিন খাতা খুলে দেখেছেন ওঁর নামের বাঁ পাশে — — =? আছে। ম্যানেজারের বয়েস সত্তর। এ বাড়ির একমাত্র ব্যাটাছেলে। কিন্তু সৎসাহস নেই। এসব চিহ্নের মানে কী জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল, এসব আমাদের কনফিডেনশিয়াল ম্যাটার। এতদিনে আরও কী চিহ্ন যোগ হয়েছে কে জানে! চোখে ছানি কিনা, দেখতে পান না ভাল। কালো বোর্ডে চক দিয়ে বড় বড় করে লেখা হয়েছে আজকের মেনু। বাঁধাকপি, বরবটি ভাজা, অড়হর ডাল। শোল মাছ/ধোঁকার ডালনা। বাবলু অড়হর ডাল খেতে ভালবাসে, শোল মাছও। আজ এক্কেবারে ওর পছন্দের মেনু।

ও মা, কী আশ্চর্য, বাবলু! হ্যাঁ তো, বাবলুই তো। সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে কোট।

মা, বিকেলে একটু অসুবিধে, সকালেই চলে এলাম।

খুব ভাল করেছিস। তোর কথাই ভাবছিলাম। দুপুরে গেস্ট চার্জ দিয়ে খেয়ে যা। অড়হর ডাল, শোল মাছ...

না মা, একটু পরই হাওড়া থেকে ট্রেন ধরতে হবে। দুর্গাপুর যাব। বেশিক্ষণ থাকতে পারব না মা। চলো, তোমার ঘরে চলো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, তুই একা যাচ্ছিস যে বড়, বউমার সঙ্গে ঝগড়াটগড়া করিসনি তো? বাবলু হেসে বলে, না মা, ওসব কিছু হয়নি। ওর কি সবসময় ঘুরতে ভাল লাগে! কমলিনী নাতি-নাতনিদের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ওরা ফোন করে না। কতদিন দেখিনি ওদের। আগের বউমাকেও খুব দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে কথা বাবলুকে বললেন না কমলিনী।

বাবলু কোটের পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বার করল। বলল, মা, এটা তোমার জন্য এনেছি। আর নীচে নেমে আমার ফোন ধরতে হবে না, ফোনটা তোমার কাছেই থাকবে। মানে তোমার কাছেই থাকব আমি।

ফোনের কায়দাটা বুঝিয়ে দেয়। ফোন এলে কোনটা টিপতে হবে, আর শেষ হয়ে গেলে কী করতে হবে।

কমলিনী বলেন, এসব আমার দ্বারা হবে না রে। দাঁড়া, নমিতা আসুক। কমলিনী নমিতাকে ডাকেন। বাবলু ওর নিজের মোবাইল ফোন থেকে কমলিনীর ফোন নম্বর ডায়াল করে। কমলিনীর হাতের মুঠোয় রিংটোনে বেজে ওঠে 'বাঁধো তার তরীখানি'। আঙুরবালা। এ যে খুব প্রিয় গান কমলিনীর। বাড়িতে রেকর্ড ছিল, মিস আঙুরবালা। কতদিন শোনেননি। গানটা বেজে ওঠা মানে সেই কিশোরীবেলা। জামাইবাবুর কলের গান। শান্তিপুরের বাড়ি। তুই কী করে করলি রে এটা?

আমি কায়দা করে ভরে নিয়েছি। আমি তো জানি তুমি এই গানটা ভালবাস। কেউ ফোন করলেই এই গানটাই বেজে উঠবে।

একটা কাগজে এই মোবাইল ফোনটার নম্বর লিখে দেয়। কমলিনী বলতে পারেন না আমার চোখে যে ছানি, দেখতে পাই না, অপারেশন করিয়ে দিবি বলেছিলি, ভুলে গেলি?

আবার হইহই করে নমিতাকে বুঝিয়ে দেয় বাবলু। বাবলু মানে সৌম্যকান্ত মৈত্র। বয়স ঊনষাট। চুলে কলপ।

বাবলু চলে যায়। দোতলায় দুই বুড়ি। ট্যাক্সি থেকে হাত নাড়ে বাবলু।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ বালিশের পাশে বেজে উঠল 'বাঁধো তার তরীখানি আমি যে দাঁড়ায়ে কূলে। কোথা তুমি যাও চলি আমারে গিয়েছ ভুলে।'

বাবলু বলছি। ট্রেনে চাপলাম।

খাবি কোথায়?

সে আমি খেয়ে নেব।

সাবধানে যাস।

রাত্রে আবার গান বাজল।

হোটেলে ফিরলাম।

শীত কেমন?

খুব।

দুর্গাপুরে তো খুব শীত। কষ্ট পাচ্ছিস বাবা...

না মা।

খেলি?

এবার খাব। তুমি?

আমার হয়ে গেছে।

কী খেলে মা?

রুটি দু'খানা, কুমড়োর তরকারি। দুধও। তুই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। বেশি রাত করিস না।

আজ কেমন যেন পাগল পাগল লাগছে। আনন্দ। ঘুম আসছে না। আজ কতবার বাবলু এল। এখন বাবলু পাশে। বালিশের পাশে। বাবলুটা। বাবলুসোনা। ঘুমু কর। ঘুমু ঘুমু কর। মোবাইল ফোনটার গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে থাকেন কমলিনী।

রাত্তিরের স্টিমারের আনন্দ ভুটভুটি গঙ্গার জলে। গঙ্গার জলে আনন্দ স্রোত। রাতচরা পাখির আনন্দ ডাক। কমলিনী পাশ ফিরে শুয়ে বাবলুসোনাকে ঘুম পাড়াতে থাকেন এই আনন্দমঠে।

কমলিনীর মনে হয় বাবলুসোনার শীত করছে। ছোট্ট মুবু মুবু মুবুলু ফোনুটাকে লেপের ভেতরে ঢুকিয়ে নেন। তারপর মনে হল লেপের ভেতরে ওর কষ্ট হচ্ছে। এই ছোট্ট সোনামনাটার গায়ে এত মোটা লেপ ঠিক নয়। বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালান কমলিনী। নমিতা ঘুমুচ্ছে তো? ও টের না পেলেই হল। আস্তে আস্তে ওঠেন। খাটে যেন শব্দ না হয়। নাড়ুগোপালের কুলুঙ্গির কাছে যান। নাড়ুগোপালের ছোট ছোট সাটিনের চাদর আছে। তারই একটা চাদর ভাঁজ করে মোবাইল সোনাকে ঢেকে দেন। পাশে রাখেন, আলো নিভিয়ে দেন। সকাল হলেই চাদর সরিয়ে নেন। নমিতা দেখে ফেললেই আবার বলবে— ঢং।

ওঁরা দু'জনে সুখে নিদ্রা গেলেন। সকালবেলা কমলিনী ওঁর দেওয়াল আলমারি থেকে একটা পুরনো শাড়ি বেছে নিলেন। ওটার মাঝখান থেকে ছিঁড়লেন। অ্যালুমিনিয়ামের বাক্সটা থেকে সুতোর রিল বের করলেন। সুতোর রিলে একটা সুচও আছে। সুচ ও সুতো নিয়ে গুটি গুটি ছাদে চলে যান কমলিনী। একটা কাঁথা সেলাই করা দরকার। ছোট্ট একটা কাঁথা। বাবলু যখন পেটে, কাঁথা সেলাই করেছিলেন কমলিনী। সে কী আনন্দ! আবার, কতদিন পরে। মধুর, তোমার শেষ যে না পাই।

অনেকক্ষণ ধরে সুচে সুতো পরানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন। নমিতা কি পারবে? থাক। ওকে নয়। ঝর্নাকে বলবেন। আর কাঁথাটা সেলাই করবেন গোপনে, দুপুরে। যখন নমিতা ঘুমোবেন।

ছাদ থেকে ব্যর্থ ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দেখেন নমিতা উল বুনছেন। দুটো কাঁটার টানে একটা হলুদ উলের বল মেঝেতে খেলছে। কার জন্য? কী লো? কার জন্য?

বলতে গিয়েও বলেন না কমলিনী। নমিতা মনে ব্যথা পাবেন। নমিতার কেউ নেই। নিজের জন্যই বুনছেন হয়তো, এই বুড়ো হাতে, বুড়ো বয়সে। দুপুরে নমিতা ঘুমোলেন না। উল বুনছেন। কমলিনী ঘুমোন। বিকেলবেলা নমিতা কমলিনীর হাতে একটা এক বিঘত সাইজের উলের চাদর তুলে দিয়ে বললেন, এই নাও দিদি, তোমার মোবাইলের। কাল রাতে সব টের পেয়েছি।

ও মা! কী লজ্জা, আর কী আনন্দ। গোপন কথাটি রবে না গোপনে। মধুর, তোমার শেষ যে না পাই।

কমলিনীই বললেন— ঢ-অ-অং।

শারদীয় আজকাল, ২০০৫

সুখীরাম

এইসব অঞ্চলে ছাগলই ব্যাংক। ব্যাংকই ছাগল।

এই যে বাহাকুটরি গ্রাম, থানা বান্দোয়ান, জিলা পুরুলিয়া, এখানে আশি ঘর মানুষের বাস, আর শ'পাঁচেক ছাগল। একটা ছাগলের দাম শ'পাঁচেক টাকা ধরলেও আড়াই লক্ষ টাকা ঘুরে বেড়াচ্ছে এই গাঁয়ে। প্রায় সব ঘরেই ছাগল আছে। যার ঘরে দশটা ছাগল, তার পাঁচ হাজার টাকা জমা আছে বলা যায়। বিপদে আপদে ছাগল বেচে দিলেই হল। প্রতি সপ্তাহে এদিকে ছাগল ব্যাপারি আসে ছাগল কিনতে। ব্যাপারিরা এই অঞ্চলটার নাম রেখেছে মেরম টাঁড়। মেরম মানে ছাগল।

এই অঞ্চলের মানুষদের ছাগল অভ্যেস করিয়েছে স্বয়ম্ভর নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বুঝিয়েছে একটি ছাগল রাখলে বছর ঘুরতেই চারটে। তিন বছরে পঞ্চাশ-ষাটটা। ছাগলের জন্য খাবার কিনতে হয় না। নিজেদের খাবারের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেয়। দু-তিন কিলোমিটারের মধ্যেই জঙ্গল। কয়েকটি বাগাল ছেলে আছে যারা ছাগল নিয়ে জঙ্গলে যায় চরাতে। সন্ধ্যার সময় বাহাকুটরিতে ধুলো ওড়ে। রাঙাধুলো ওড়াতে ওড়াতে ছাগলের দল ঘরে ফেরে। নিঃশব্দ গাঁয়ে তখন আনন্দ ভ্যাঁ। ঘরে ফেরার শব্দ। ভ্যাঁ-ভ্যাঁ শব্দের মধ্যেই কোনও কোনও বাড়িতে বেজে ওঠে শাঁখ।

সুখীরামের ঘরে শাঁখ বাজে না। সুখীরামের ঘর আছে ঘরণী নেই। ছিল, চলে গিয়েছে বছর পাঁচেক হয়ে গেল। সুখীরামও সন্ধ্যার ভ্যাঁ শোনে। ও বোঝে, আজকের মতো কাজ শেষ হল ওর। বাইরে এসে দাঁড়ায়। জঙ্গলের গন্ধ মাখা ছাগলের পাল দেখে। ছাগলছানার তিড়িং বিড়িং দেখে। সুখীরামের ছাগল নেই। ও ছাগল করেনি। কী হবে ছাগল করে?

সুখীরাম হল লোহার। এই গাঁয়ে এখন এই একঘর লোহারই রয়ে গিয়েছে। আগে এই গাঁয়ে ছিল সবই খুটকাটি জমি। জঙ্গল হাসিল করা। জঙ্গলের অবশেষ হিসাবে কয়েকটা প্রাচীন বৃক্ষ রয়ে গিয়েছে এখনও। একটা বহুদিনের পুরনো কাঁঠাল গাছের ছায়াতেই সুখীরামের কামারশালা। গত কয়েক বছর ধরে কাঁঠাল আর ফলছে না তেমন। সুখীরাম ওর ছোটবেলায় দেখেছে সর্বাঙ্গে কাঁঠালের গয়নায় নিজেকে সাজিয়ে ডাল দুলিয়ে কাঁঠাল গাছ নাচছে। কাঁঠাল গাছটাকে মনে হত সাক্ষাৎ মা ষষ্ঠী ঠাকরুন। কোলে কাঁখে ধারণ করে আছে খোকা-খুকি। এখন এই গাছ রাঁড়ি। সবারই এই গতি।

সন্ধে হলেই এই কাঁঠালতলায় গাঁয়ের আলুকুড়া, পর-পঁচিয়াগুলি হাজির হবে। মহুয়ার মদ গিলবে দমে, আর চাঁই-চণ্ডুল করবে। সুখীরামও গেলে। না গিলে করবে কী? কোলেতে বাচ্চা নয়, একটা রেডিয়ো থাকে ওর। অঁকবঁক হতেই থাকে। ঝিঁঝির শব্দের সঙ্গে রেডিয়োর অঁকবঁক আর মানুষ ক'টার ভেনভেনা মিলেই তো কাঁঠালতলার সন্ধ্যারাত।

এই আড্ডায় আসে মাকু হারানো তাঁতি বিশু আর ধনা। বিশু আসলে বিশ্বকর্মা, ধনা মানে ধনঞ্জয়। ওরা এখন বাবুই ঘাসের দড়ি পাকায়। আসে নয়নচাঁদ। ও হল রুইদাস। মানে মুচি। ওর এখন দুটো পয়সা হয়েছে। ছাগলের চামড়া বেচে। পঞ্চাননও আসে। ঘর ঘর থেকে মুড়ি কিনে নিয়ে মহাজনের ঘরে দেয়। সবারই মোটামুটি ডাল ভাত জুটে যায়। এই গাঁয়ের ও-ধারে পঞ্চাশ-ষাট ঘর সাঁওতাল। সুখীরামের ঠেকে ওদের কেউ বড় একটা আসে না।

গ্রামটা পত্তন করেছিল সাঁওতালরাই। নাম শুনেই বোঝা যায়। বাহা মানে ফুল, কুটরি মানে ঘর। জঙ্গল হাসিল করে তো গাঁ পত্তন হল। চাষের জমি হল। কিন্তু চাষ হবে কী করে? কোথায় পাওয়া

যাবে লাঙল? দা-কাস্তে-কোদাল-হাসুয়া? তাই, সাঁওতালরা গাঁয়ে বসায় একঘর লোহার। লোহাররা এদিকে প্রায়শই মাহাত হয়। এই সুখীরামও মাহাত। সুখীরামের জ্ঞাতিগুষ্টিতে কেউ আর লোহার নেই। কেউ চলে গিয়েছে মেজিয়ার কয়লাখাদানে, কেউ গিয়েছে টাটায়, সুখীরামের বড়দাদা মরে গিয়েছে, ছোটভাই টাটানগর থাকে। সাইকেল সারাইয়ের কাজ শিখে এখন নিজেই ঝুপড়ি দোকান করেছে ওখানে। ওর ছেলেমেয়েরা গলায় টাই বেঁধে ইস্কুলে যায়। সুখীরাম এখন এ গাঁয়ে একা লোহার। সঙ্গে যে ছেলেটা কাজ করে, সে জাতে লোহার নয়, তাঁতি। তাঁত জানে না, এখন লোহা শিখছে। কলিতে সবই এলোমেলো।

কাঁঠালতলার সন্ধ্যারাতে একে একে এসেছে সবাই। কামারশালার কয়লার শরীর থেকে এখনও লাল আভা বেরুচ্ছে। নয়নচাঁদ দু-চারটি সক্কর কন্দ, মানে রাঙা আলু কয়লার ভিতর গুঁজে দেয়।

নয়নচাঁদ বলল, ইবার একটা ভটভটি কিনবার মন করছে। একটা সেকেনহ্যান খবর পেলে খবর দিয়ো।— শুঁড়ির ব্যাপারি পঞ্চাননকে বলে। সুখীরাম মনে ভাবে এরেই বলে কলি। মুচি ঘরের ছেলে বলছে ভটভটি কিনবে।

তুমিও একটা কিন্যে লাও তো, দুটা ভটভটি হলে ছ'জনে মিলে ঘুরে বেড়াতে পারব। পুরুল্যে শহর যাব, অযোধ্যা পাহাড়, চাই কি ডিমলা লেক..., তোমার কী আছে। এমন ভসকো মেরে থাকলে চলবে?

সুখী বলে, গরবে পরব দেখছ? ভটভট কিনব হামি? ঘর ভংভং, দুয়ারে কুলুক।

ঘর ভংভং কেন বলছ হে? ডেলি শ'টাকা উপর কামাই করো। বউএর ফুলি ত্যালের খরচা নাই, খঁকাখুকির লজেন খরচা নাই।

পঞ্চানন ফুট কাটল, আলুপটলের খরচা নাই।

একদম ইমপটেন কথা— বিশু বলল।

সুখীরাম সবই বুঝল। আলুপটলও বুঝল, ইমপটেনও বুঝল। এসব নিয়ে রাগ করে না আর। রাগ করে লাভ নেই। নিভন্ত আংরায় একটু হাপর চালিয়ে এল। রাঙা আলুগুলো নরম করতে হবে। মহুয়ার সঙ্গে দরকার।

'ইনপটেন' শব্দটা হাটের কবিরাজি ওষুধের ক্যানভাসারদের কাছ থেকে শিখেছে ওরা। লিঙ্গ লরোম, ধাত পাতলার ওষুধ ব্যাচে যারা তারা বক্তৃতায় ওই শব্দটা খুব বলে। একদিন ইমপটেন কথাটার মানে নিয়ে খুব তর্কও হয়েছিল। পঞ্চানন বলেছিল, ইটার দুটা অর্থ আছে। একটা ইস্কুলের ম্যাসটররা বলে। এই অঙ্কটা ইমপটেন বটে, এই খবরটা ইমপটেন বটে। আর একটা কবিরাজ ডাক্তারটা বলে। যন্তরটা ল্যাংপ্যাং হয়ে যাওয়াটাকেও ইংরাজিতে বলে ইমপটেন। যেমন আমাদের এই সুখীরাম।

সুখীরাম কিন্তু মনে মনে দুখীরাম। সবাই জানে ওর বউ চলে গিয়েছে কেন। সবাই জানে ওর যন্তর ল্যাংপ্যাং। ওর স্যাঙাৎরা ওকে ভোস্‌কা বলে ডাকে। কথায় কথায় ওকে শুনিয়ে ইমপটেন বলে। ওর হাতের পেশি যেন মিছামিছি। বুকের খাঁজ থেকে যে ঘাম ঝরে, সেটা যেন চোখের। এই যে হাপর টানে, শব্দ করে পুরুষ শব্দ বের হয় ফুসফুস থেকে, ওটাও মিছামিছি। লাল ওগলানো আঙারের ভিতর থেকে লোহা টেনে এনে হাতুড়ির ঘা মারে, বলে, হেই মারো ইমপটেন, শালা মারো ইমপটেন, মারো জোরে ইমপটেন...।

রাঙা আলুক'টা নিয়ে এল সুখীরাম। পঞ্চানন যে তখন বলেছিল তুমার আলুপটলের খরচা নাই, সিটা খোঁচামারা কথা। চুম মেরে থাকাই ভাল। ঢেলায় ঢেলা ভাঙার দরকার নাই। আমি আলুবাজি করি না তো তর কী? মেয়াছেলা দেখে ছঁকছঁক করা কি ভাল? গ্লাসে মহুয়া ঢালে সুখীরাম। বলে, হামার দেখি কান তলে উকুনের ডেরা। হামার পয়সার মাল খেঞে হামাকেই খঁটা দিছিস। হামার ইমপটেন তো হামি কী জানি? হেঁতরাপী ভগবান। সে যা কইরেছে সে বুঝে। ইসব উঠাসনি। হামি সুখীরাম তখন দুখীরাম বনে যাই।

নয়নচাঁদ বলে, বটে, বটে। উসব যাক কেনে। লৈতন কথা বল, ভটভটি-টডভটি সব হল গে চটপটি কথা। একটা বুদ্ধি দিছি। তুইও একটা বকরি রাখ কেনে।

হামি বকরি রাখে কী করব? হামার ঘরে কি ছুটকা-ছুটকি আছে যে দুধ লাগবে?

নয়ন বলে, তা কেনে, তুমি লিজে খাবে, তাগদ হব্যেক।

বিশু বলে, দু'বচ্ছর ঘুরলে কতগুলান ট্যাকা।

পঞ্চানন বলে, দিদিমণির লেখেন বলার কী দরকার। আসল কথাটা হল বোদা হলে উটা মেরে আমরা খাব।

কেনে? তুরা তদের ঘরের বোদাটা মারতে পাছিস না? সুখীরাম বলে।

হামদিগের যে পরিবার আছে। হামাদিগের যে হিসাব আছে। হামদিগের বোদার কেজি দর। তোর বোদা সভার ঘর।

সুখীরাম বলে, আমার অত হ্যাপার দরকার নাই। ভালা বঠি, হাপর টানি, মাল্লু খাই, বোদা রেখ্যে কাম নাই।

পঞ্চানন বলে, ওর হ্যাপা কই। এতবড় কাঁঠালগাছটা, দুটো ডাল ভাঙবি আর ছাগল বকরির খুশি দেখবি। খুশি দেখতে মন করে না? পঞ্চানন গেয়ে ওঠে—

আকাশের ওই ম্যাঘের মাঝে
হামার কিষ্টো ওই বিরাজে
বলি চন্দ্রাবলী দেখবি যদি আয়—
সুখ ফুটেছে কদম ডালে
সুখের লাউটা ঘরের চালে
বলি চন্দ্রাবলী সুখ দেখবি আয়—
হামার কিষ্টো ছাগল বাঁটে
দিঘির জলে, ধানের মাঠে
বলি চন্দ্রাবলী দেখবি যদি আয়...

কামারশালার কোদাল শাবল দিয়ে বাকিরা তাল দিতে থাকে।

এবারে নয়নচাঁদ শুরু করে দেয় ওর স্বরচিত ঝুমুর—

সুখ রয়েঁছে মাল গিলাসে
সুখ রয়েঁছে বোঁদার মাঁসে
বলি চন্দ্রাবলী কিষ্টো লিবি আয়...।

ক'দিন পর জিপ হাঁকিয়ে সুখীরামের কাছে দু'জন হাজির। এক দিদিমণি, অন্যজন একটা স্যার। এইসব দিদিমণিদের বে-থা হয়েছেন কি না-হয়েছে বুঝা যায় না। শাঁখা তো মোটে পিন্ধে না। সিঁদুর কারুর কারুর চুলের ভিতরে জঙ্গলের ভিতু খরগোশের মতো লুকিয়ে থাকে। এরা হল এনজিও দিদি। দিদিমণি বললে, কী সুখীরাম, গাঁয়ের সব্বাই ছাগল নিয়েছে তুমি নিলে না কেন?

সুখী বলল, আমার আর ঝামেলা ভাল লাগে না। ভালই তো খাকরিতেলা আছি।

না, ওসব শুনব না। সবাই নিয়েছে, তোমাকেও নিতে হবে। তোমার ছাগল কেনার পয়সা নেই— এটা বলতে পারবে না। একটা ভাল জাতের মাদি ছাগল দিয়ে যাব। মাসে একশো টাকা করে শোধ করবে।

সুখীরাম মাথা নাড়ায়।

দিদিমণি ওর গায়ে হাত দেয়। বলে, সবাই না-না করেছিল প্রথমে। এখন দ্যাখো, এ গাঁয়ের সবাই ছাগল বেচা টাকায় কেমন বোলচাল পালটে ফেলেছে। তোমার তো কিচ্ছু ঝামেলা নেই,

ছাগল চরাবার লোক আছে। আরে, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করার মতোই তো। দরকারমতো বেচে দেবে।

গায়ে একটু ঝাঁকুনি দেয় দিদিমণি। দিদিমণির গায়ের সুবাস, প্যাঁচ দিয়ে পরা শাড়ি, চশমার ভিতরের উড়িংফড়িং চোখ, সব নিয়ে বিবশ মতন হয়ে যায় সুখীরাম। চুম মেরে থাকে।

তোমার স্যাঙাৎরাই তো আমায় পাঠাল। বলল, সুখীকে রাজি করান গে যান।

সুখী সব বুঝল। ওকে মুরগি নয়, পাঁঠা করা হচ্ছে। কিন্তু দিদিমণিকে নিষেধ করতে পারল না।

দিদিমণি একটা কাগজ দিল। ওটা দেখালে সেন্টার থেকে ছাগল পাওয়া যাবে। ইচ্ছে করলে গ্রাম থেকেও মাদি ছাগল কেনা যায়, কিন্তু ওরা সেন্টার থেকেই কিনতে বলে। ওইগুলো হল ভাল জাতের পাঁঠার পাল খাওয়ানো ছাগল। ওরা বলে বটে ছাগল সেয়ানা হলে, ডাক ছাড়লে, সেন্টার থেকেই পাটনাই পাঁঠার পাল খাইয়ে আনতে। কিন্তু ওসব হয় না। ছাগল যখন চরতে যায়, তখন পালের পাঁঠারা ছাড়বে কেন?

ছ'কিলোমিটার দূরে বান্দোয়ান। সুখীরাম একটা মেয়ে ছাগল পেল। ছাগলের গলায় একটা লকেট। টিনের পাতে নম্বর। ৬৩২। সব ছাগলই কালো রং-এর। দেখতে একরকম। ছাগল যেন গণ্ডগোল না হয়, তাই এই নম্বর। আস্তে আস্তে ছাগল বাড়ি চিনে যাবে। তার পর ছাগল যখন মা হবে, তখন ছাগলের সন্তানরা মায়ের গা ঘেঁষেই থাকবে। মা ছাগল যেখানে, ছা ছাগলও সেখানে।

একট বস্তায় ভরে ছাগলটাকে রডে বসিয়ে নিল সুখীরাম। সাইকেল চলছে। গলায় গয়না পরা ছাগলটা মাথা উঁচিয়ে মিহি মিহি ডাক ছাড়ছে। মাঝে মাঝে মুখ বার করে সুখীরামের দিকে লাজুক তাকাচ্ছে। সুখীরাম বেশ বুঝতে পারে ছাগলটা বলছে, এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমুন হত তুমি বলো তো।

সুখীরাম বলল, তুমিই বলো।

ছাগল বলল— চিঁহি।

সুখীরাম ছাগলটার নাম রাখল দুলি। দুলি ওর ছেড়ে যাওয়া বউ-এর নাম।

সুখীরামের বিয়ে দিয়েছিল ওর বাবা। সুখীরামের বয়স তখন ছিল বাইশ, দুলির পনেরো বছর। রোগাপানা দেখতে, ইক্কেবারে লেদাগাছটা, কিছুই বুঝত না, জানত না। সুখীরামই ওকে বুঝা করাল, জানা করাল। যখন বুঝদার হল, তখন সে ঘুঙুরের লেখেন ঝঁপলা। তখন সে মুখড়। তার জাঙে মাস লেগেছে, ছাতি হয়েছে পদ্মফুলের লেখেন। আর সুখীরাম অবাক দেখত, ঘাঁটাঘাঁটি করত। চুমা, আদর— কিন্তু দুলির ভিতরে অঙ্গ দিতে পারত না। ওর অঙ্গ যেন লতানো পতানো।

সুখীরামের যে এরকম হবে ও জানত না। ওর তো ঠিকই ছিল। বিড়ি খাওয়ার বয়সে সবাই যা করে, সুখীরামও করেছে। তখন তো বোঝেনি কিছু। আর বিয়ের আগে কখনও কোনও মেয়েছেলের শরীরে ঘষেনি। যা কিছু বে-থার পরে।

সুখীরামের ইচ্ছাগুলা, শরীরের বাইরে বর্ষার ব্যাঙের মতোই গঙায়, কিন্তু লাফ দেয় না। দুলির তাতা শরীর যখন দরজা খুলে দেয়, সুখীরাম ঘাড় কাত করে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাউকে বলতে পারে না সুখীরাম। কাঁচা মুরগির ডিম খায়, রুইদাসদের ঘরে গিয়ে শুয়োরের মাংস খায়, হাটের জড়িবুটিও। হাটের কবিরাজের কাছ থেকে প্রতি হাটবারে ওষুধ নিয়েছে। তখনই জানাজানি হতে থাকে।

শেকড়ও বেঁধেছে কোমরে। একবার লজ্জার মাথা খেয়ে বান্দোয়ানের লাল তেকোণ আঁকা সরকারি হাসপাতালেও গেল। সেখানে ডাক্তার ছিল এক দিদিমণি। কিচ্ছু বলতে পারেনি সুখীরাম। এক বছর পর শুনল হাসপাতালে ব্যাটাছেলে ডাক্তার এসেছে। আবার গেল। লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেলল স্তিরির সঙ্গে শোয়াশুয়ি হয় না। ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল কত কিছু।

সুখীরামের সামনে পিছনে কত রুগি। সুখীরাম চোখবুজে সবই বলল। ডাক্তারবাবু বলল, তোমার মনের ভিতর ভয় আছে। ভয়টা তাড়াও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কই, ঠিক তো হল না। কীসের ভয়? নিজের বিয়ে করা বউয়ের সঙ্গে ভয় কীসের? চার বছর ছিল দুলি। ও বড় ভাল মেয়ে। ও যাবার সময় কেঁদেছিল। বলেছিল, আমি কী করি বল, মা বলছে সাঙা দেবে।

চার বছরেও দুলির কোলে কেন ছা এল না, এ নিয়ে দুলির বাপের বাড়িতে যখন কথা ঘাঁটা হচ্ছিল, তখন দুলি বলে দিয়েছিল, ও পারে না। দুলির দাদা এসে যখন জিজ্ঞেসা করল সুখীকে, সুখী 'হ' কেড়েছিল। তার পর দুলিকে নিয়ে গেল। সাঙা দিল।

দুলির সঙ্গে এরপর দেখা হয়নি। পঞ্চানন মুড়ির কারবারি। ও দেখেছে দুলিকে। দুলির কোলে ছা।

সুখী এখন জানে ও 'ইমপটেন'। ও জানে ওর আর বাপ হওয়া হল না। মকর পরবে ওকে জামা-পিরান কিনতে হয় না, মেলা পরবে নাগরদোলা মিছামিছি ঘুরে যায়। জিলিপি গজার ব্যাপারিরা মিছাই ডাকাডাকি করে। কার জন্য কিনবে ও? অ্যাসিসটেন ছেলেটাকে লোহার কাজ শেখায়, ওকে মাইনে ছাড়াও দু-পাঁচ টাকা হাত খরচা দেয়। আর কোলে রেডিয়ো নিয়ে বসে থাকে। অঁকবঁক শোনে।

বাড়িতে ছাগল এল ভ্যাবভ্যাবিয়ে। গায়ে হাত বুলিয়ে কাঁঠালপাতা খাওয়াল। ভাত রান্না করে দুটো ভাতও দিল ওকে। গলার লকেটে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

দু'দিন ওকে চরতে পাঠাল না। বাড়িতেই রাখল। তারপর বাগালকে দিল। বাগাল ছেলেটাকে বলল, দ্যাখ উকে মারাধরা করবি না। ছাগলটা সন্ধের সময় ফিরে সুখীকে তার সারাদিনের ভ্রমণ কাহিনি শোনায়।

ওর নাম দুলি রাখলেও সবার সামনে দুলি নামে ডাকে না সুখীরাম। লজ্জা করে। সবার সামনে ওকে ডাকে ভুলি। কিন্তু যখন সন্ধ্যার মাল খাওয়ার ঠেক সাঙ্গ হলে ভুলির গায়ে হাত বুলোয়, তখন ওকে দুলিই ডাকে। ছাগলটাও জানে ওর দুটো নাম আছে। একটা নাম মাঠের দুব্বোঘাস— ভুলি, আর একটা নাম কাঁঠালপাতা,— দুলি।

এই দুলি কিংবা ভুলিকে নিয়ে স্যাঙাৎদের কোনও উৎসাহ নেই। ওদের উৎসাহ ছাগলটার কবে বাচ্চা হবে, পাঁঠা হলে ফিস্টি হবে।

দুলি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। পালটে যাচ্ছে ওর জাং, ওর টুঁটি। নম্বর দেওয়া চাকতির দড়িটা টুঁটিতে আঁটো হচ্ছে। ওটা খুলে ফেলেছে সুখীরাম। ওর গলার স্বর পালটে গিয়েছে। ওর গায়ে কেমন বড়দের মতো গন্ধ হয়েছে। কড়াইদানার মতো বাঁটগুলো পুরুষ্ট হচ্ছে। ওর লেজের তলায় কী সুন্দর একটা লাড়িলুকু তৈয়ার হয়েছে। বাহারে যৈবন।

সুখীরাম এক টুকরো লোহাকে ফুল বানাল। ভিতরে ছিদ্র করে বাবুই দড়ি গলিয়ে দুলির গলায় পরিয়ে দিল। গায়ে লোহা থাকা ভাল। নজর লাগে না। দুলির সর্বাঙ্গে হাত বুলোয়। লুকুটাতেও। দুলি কিছু বলে না। আদর খায়।

একদিন ভোররাতে দুলি ডাক ছাড়তে লাগল। এ ডাকের মর্ম সুখীরাম বোঝে। একটা লম্বা দড়িতে বেঁধে দুলিকে কাঁঠালগাছে বেঁধে দিল সুখীরাম। পুলিশ গাড়ির মতো ভুস করে ধেয়ে এল এক মস্তান পাঁঠা। দুলির অঙ্গে অঙ্গ দিল। কামারঘরে বসে বসে সকালবেলায় ওই দৃশ্য দেখতে দেখতে সুখী বোঝে ওর বুকের নেহাইয়ে হাতুড়ি পড়ছে। সুখীরাম বেশ বোঝে, ওর শরীরের ভিতরে কিছু হচ্ছে। জাগছে। ওর অঙ্গ তো তবে মরেনি। আবার কি ঠিক হয়ে যাবে সব? রতিরত পাঁঠাটির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় সুখীরাম। হে রংকিনী মা, আমাকে মর্দানি দাও। তুমায় আমি বোদা চড়াব। এই দুলির গর্ভের বোদা। হুট করে মানত করে ফেলল ঈর্ষান্বিত সুখীরাম।

সুখীরাম এর আগে কখনও মানত করেনি। আজ এই রতিক্রিয়া দেখতে দেখতে মানত করে ফেলল।

রংকিনী মা নাকি খুব জাগ্রত। ওই মা রক্ত চায়। ভেড়া, পাঁঠা, হাঁস, মুরগি যে যা পারে বলি দেয় মকরের দিনে। সব মানসিকের বলি। আগে মানসিক পূরণ, পরে বলি নয়, বলি দিয়ে মানসিক করতে হয়। কত দূর দূর থেকে মানুষ যায় মায়ের পাহাড়ে। মকরের দিনে ইসপেশাল বাস যায়। এখান থেকে দু'ঘণ্টার পথ।

মানসিক যখন করাই হল, তখন প্রণাম করা হোক। দু'হাত জোড় করে প্রণাম করল। কেউ দেখে ফেললে অবাক হয়ে দেখত— রতিরত ছাগ যুগলকে ভক্তিভরে প্রণাম করছে সুখীরাম।

এক মুখ সুখ নিয়ে দুলি সুখীর কাছে এল। সকালের রোদ্দুর পড়েছে ওর গায়ে। এবার চরতে যাবে দুলি।

বাগালটা ছাগল চরিয়ে এসে বলল, তুমার ছাগল আজ পাল খিঞেছে।

সুখীরাম দুলিকে মনে মনে বলল, কীরে দুলি, আবার? দুলির চোখে সুখী পড়তে পারল— 'বেশ করেছি... করবই তো।'

সুখীরাম দুলির যত্ন করে। কাঁঠালপাতাই শুধু নয়, মাঝে মাঝে খোল খাওয়ায়, গুড়জল খাওয়ায়। দুলির ক্রমশ পেট ফুলতে থাকে।

সাত মাস গভভো ধারণ করার পর দুলি তিনটে বাচ্চা দেয়, একটা পাঁঠা, দুটো পাঁঠি।

একদিন দিদিমণিদের গাড়ি এসেছিল। বলল, কী? দেখলে তো, ছিল পাঁচশো, এখন দু'হাজার, হিসেব করছ ক'মাসে?

এসব হিসাব করেনি সুখীরাম। এসবের কি হিসাব হয়? এই যে মায়ের দুধ খাচ্ছে ছানাগুলান, এ দৃশ্য দেখলে পুণ্য হয়। এই ছানাগুলার তিড়িং বিড়িং, বিনা কারণে আনন্দ, ইসব দেখলে আনন্দ হয়। ইসব দেখলে পয়সা লাগে না, আবার পয়সায় ইসব পাওয়া যায় না। সুখীরামের মনে হল এইবার যেন একটা সংসার হল। সকালের উঠানটা যেন এক গান। প্রভাত সময়ে সুখীর উঠানে ছাগল ছানাগুলি লাফায় রে।

তিনটে ছাগলছানার একটা বোদা। সুখীরামের স্যাঙাৎদের বোদাটার দিকেই নজর। যেন পৃথিবীতে পেঁয়াজ রসুন গরম মশলার জন্ম হয়েছে পাঁঠা খাবার জন্য। ক'দিন আগে একটা ফিস্টি হল গদাধরের বোদায়। গদাধরের ছেলে মাধ্যমিক পাশ দিয়েছে। একটা মওকা হলেই হল। হায়রে, বোদাগুলির জীবন শুধু মানুষের লুলুপুসু মিটানোর জন্য।

মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি সব এক একটা বোদা। জন্ম হয়। কিন্তু বাঁচে না। মানুষই খেয়ে নেয়।

স্যাঙাৎরা বলে, কী হে সুখী, কবে হচ্ছে পাট্টি?

ভোজের নাম পালটে হয়েছিল ফিস্টি। এখন নয়া আমদানি হল পার্টি।

সুখীরাম বলে, এত ব্যস্ত কেন, গতরে মাস লাগতে দাও।

দুর্গাপুজোর টাইম এল। কালো পাঁঠার দাম চড়ল। পাঁঠার পাইকার ভাল দাম দিতে চাইল। সুখী বেচল না। বেচবে কী করে? ওটা তো রংকিনীর। স্যাঙাৎরা তাগাদা দিল। বলল, তোমার বোদা তো গায়ে গতরে ভালই হয়েছে। কচি থাকতে থাকতে খাওয়া ভাল। তা ছাড়া শীতও পড়ল। কবে হবে?

সুখীরাম বলল, ওটা রংকিনী মায়ের কাছে মানসিক করা আছে। মকরে মাকে দিই, তার পর তুদের সবার পেসাদ দূব।

রংকিনী মায়ের সঙ্গে ইয়ারকি নয়। মানসিক যখন করাই আছে, তবে বলিটা হয়ে যাক। মা তো পাঁঠাটাকে খেয়ে নিচ্ছে না। শুধু মুড়াটা ওখানে দিয়ে আসতে হয়।

স্যাঙাৎরা বলল, তোমার আবার মানসিক কী? কার জন্য? জিজ্ঞেসা করল, কীসের কারণে মানসিকটা বলো শুনি।

সুখীরাম বলল, মানসিকের কথা কি কাউকে বুইলতে হয়?

রংকিনীর মন্দিরটা ঝাড়খণ্ডের ভিতর পড়েছে। যদুগোড়ার কাছে যে রংকিনী, সেটা নয়, এটা অন্য একটা। বান্দোয়ান থেকে টাটা যাবার রাস্তায় সুটিয়া পাহাড়ের মাথায় রংকিনীর থান। পুরুলিয়া, দুমকা, সিংভুম, মেদিনীপুর এমনকী ময়ূরভঞ্জ থেকেও মানুষ আসে ওখানে। এই সমস্ত কাঁকুড়ে জঙ্গুলে মানভূম এলাকার মানুষদের জীবনযাপন, ধর্ম বিশ্বাস, গান বাজনা, খাওয়াদাওয়া, মান অভিমান যতই প্রদেশ ভাগ, জেলা ভাগ, ব্লক ভাগ হোক না, একইরকম। একইরকম জাঁত-করম-বাঁদনা-মকর। ঝুমুর-ঢুয়া-বাহা। মহুয়া-হাঁড়িয়া-কুকড়া লড়াই। এ-ধারে ও-ধারে শুধু সরকারি অফিসের মোহর পালটে যায়, আর কিছু নয়।

মকরের ক'দিন আগে থেকে গাঁয়ে টুসু গায় মেয়েরা। এ বছর একটা নতুন টুসু গান হয়েছে—

হামার টুসু এই মকরে
সিলিক শাড়ি পিনিছে
স্বয়ম্ভরের ছাগল বিকে
হাজার টাকা পেয়েছে।

গত রাত্রে সারা গাঁয়ে বাটনা বাটার শব্দ। মকরের পিঠা। বাড়িঘর সব লেপাপোঁছা। কেউ কেউ ঘরে চিতর দিয়েছে। ছোটবেলায় মকরের ভোরে ফুলপাতান দেখেছে সুখী। স্নান করে এসে দুটো ছেলে ফুল পাতান দিত। মানে দোস্তি। ইয়ে দোস্তি হম নেহি ছোড়েঙ্গে। মেয়েরা সই পাতান করত। ভোরবেলায়, যখন সূর্য উঠব উঠব করছে, পুকুরে গিয়ে স্নান করে নিল সুখী। কয়েকটা গ্যাঁদা ফুল তুলল। দুটো মালা গাঁথল। একটা নিজে পরল, আর একটা পাঁঠার গলায় পরাল। একটা কাচা কাপড় আর নতুন কেনা শার্ট পরে নিল। বোদাটাকে কাঁধে চড়িয়ে বড় রাস্তার দিকে চলল সুখীরাম। কাঁচা রাস্তা দিয়ে তিন কিলোমিটার মতো পথ হেঁটে পিচ রাস্তায় যখন পৌঁছল তখন রাস্তার মোড়ে সুফলা ইউরিয়া আর কনডোম লেখা টিনের পাত শীতের রোদে ঝিলিক দিচ্ছে।

এই পিচ রাস্তায় টাটা বান্দোয়ানের বাস চলে। আজকে ইসপেশাল বাসও আছে। সুখীরাম বাসের জন্য দাঁড়িয়ে, কাঁধে বোদা। সুখীরামের মতো আরও দু-তিন জন দাঁড়িয়ে। ওদেরও কাঁধে বোদা। ওরা ভিন গাঁয়ের।

সুখীরাম একাই যাচ্ছে। স্যাঙাৎরা কেউ গেল না। পঞ্চানন অন্য মেলায় মুড়ির মোয়া বেচবে। নয়নচাঁদের তো আজকেই দিন। পৌষ পরবে কত পাঁঠা মারা হবে। কত চামড়া পাওয়া যাবে আজ। অন্যরাও সব যে যার মতো ব্যস্ত। ওদের বলা আছে সন্ধের মধ্যে ফিরে আসবে সুখী। রাত্রে কিছুটা হবে, বাকিটা মশলা মাখিয়ে রাখা হবে। আগামিকাল আবার হবে। ওরা বলেছিল, মকরের মধ্যেই কেন ফেললি, মকরে তো এমনিতেই হয়ে যায়। তবে রংকিনী মায়ের কাছে যখন বলা হয়েই গেছে, তখন আর কিছু বলার নাই।

একটা বাস এল। বাসের কাচের গায়ে চুন দিয়ে লেখা 'জয় রংকিনী মা'। বাস ভরতি। ছাদেও লোক। পিছনের সিঁড়ি বেয়ে ছাতে উঠল। দু'জন লোক সুখীরামকে সাহায্য করল। বোদাটা ধরল।

বাসের ছাদে অনেক লোক, আর অনেক পশুপাখি। পাঁঠা, ভেঁড়া, হাঁস, মুরগি। ভ্যা, প্যাক প্যাক, কোঁকড় কো।

বাসের ছাদে যে যার জানোয়ার জড়িয়ে ধরে বসেছে। সুখীরাম ভাবে এইসব পশুপাখিদের কপালে লেখা একই দিনে মরণ।

তবে এই মরণ তো এনা-তেনা মরণ নয়। মা চাইছে তাই।

শীতের হাওয়া। বনবাদাড় অন্যরকম। কত গাছের পাতা ঝরে গেছে। জঙ্গল পাতা পড়ে যাওয়া গাছের ডালে ডালে চুপ মেরে আছে হায় হায়।

বাসের ছাদে শীতের হাওয়া একটু বেশিরকম। হাওয়া ঢুকছে চাদর ফুঁড়ে। যে যার পাঁঠাগুলিকে

আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরে। সুখীরামের পাঁঠাটিও সুখীরামের কোলে গাঢ় হয়। পাঁঠাটি চোখ বোজে।

ঢেউ খেলানো মাঠ। মাঠে এখন ধান নেই। আছে ধান কাটার চিহ্ন। মাঠ চিরে একটা পেঁচানো কালো ভাঙা রাস্তায় লাফাতে লাফাতে চলে মেলার বাস। বাস ভরতি আশা আকাঙ্ক্ষা ঠাসা।

নিজের বোদাকে জড়িয়ে ধরেছে সুখীরাম। আশা আকাঙ্ক্ষা। কামনা বাসনা। এই বোদাটা আজ মায়ের ভোগে যাবে।

বাসটা যেখানে থামল, সেখান থেকে মায়ের পাহাড় আধ কিলোমিটার মোরাম ফেলা পথ। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ যাচ্ছে মায়ের পাহাড়ে। এই রাস্তায় বাস চলে না। কিন্তু জিপ যাচ্ছে, একগাড়ি পুলিশ চলে গেল। পুলিশেরও তো কামনাবাসনা আছে।

মোরাম রাস্তার ধারে ধারে গাছের তলায় চকচকে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি সাজিয়ে মেয়েরা বসেছে। ওরাও নতুন কাপড় পরেছে। কেউবা নতুন ম্যাকসি। সুখীরামের একটু রসি খাবার ইচ্ছে হল। রসি হচ্ছে ভাত গেঁজানোর পর যে জলটা তৈরি হয় সেটা। সেই জলের মধ্যে গেঁজানো ভাত চটকে মেখে নিলে হয় হাঁড়িয়া।

বলি চড়াতে গেলে উপোস করে থাকাই ভাল। কিন্তু রসি হাঁড়িয়া খেলে দোষ নেই। উপোসে চা খেলেও দোষ নেই। বামুনরাই তো বলে। শারুল-করমে পহানরা তো টুকুস হাঁড়িয়া খেয়েই আসে। অনেকেই তো বসেছে। হাঁড়িয়া খাচ্ছে। ওদের সঙ্গেও তো বোদাটোদা রয়েছে। সুখীরাম একটা হাঁড়িয়া ঠেক পছন্দ করে নেয়। একটু পছন্দসই মেয়েরা যেখানে আছে। রসি আর নেই। শেষ। এতক্ষণ কি থাকে? হাঁড়িয়াই সই। প্রথম বাটিটা এক চুমুকেই শেষ করল সুখীরাম। টাটকা শালপাতায় দেওয়া নুনে আঙুল ডুবিয়ে জিভে ছোঁয়ায়। দ্বিতীয় বাটিটা প্রায় শেষ করে ছাগলছানাটার মুখের সামনে ধরে। ছানাটা একটু গন্ধ শোঁকে। সুখীরামের দিকে তাকায়। চোখে জিজ্ঞাসা। সুখীরাম বলে, মেরে লে, জীবনে সব কিছু করে লেয়া ভাল। ছানাটা একটু চোখ পিটপিট করে চুমুক মেরে খেয়ে নেয়। থুতনির লোম বেয়ে দু-চার ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। নাকের উপর সদ্য ওঠা গোঁফেও হাঁড়িয়া চিহ্ন। আরও দু'বাটি হাঁড়িয়া চেয়ে নিল সুখীরাম। মেয়েটা এক মুখ হাসিও দিল। পয়সা লাগে না। একবার সাজানো ছোলা মটরের দিকে আঙুল উঁচাল। সুখীরাম মাথা নাড়ল। উপোস থাকতে হয় কিনা। এবার ছানাটা বায়না করল। ছোলা খাবে। সুখী বলল, না, উপোস থাকতে হয়। বলি হবে না? বরং হাঁড়িয়া খা। দোষ নেই। ছাগটা জিভ দিয়ে চেটে চুকচুক করে হাঁড়িয়ে খেল আর একটু। মেয়েগুলি হেসে উঠল।

ছানাটাকে কোলে তুলে নিল সুখী। এগিয়ে চলল সামনে।

পাহাড়তলার মাঠে কত দোকান। পশরা। কুমোরের হাঁড়িকুড়ির পাশে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি। ওখানেই ভিড়। প্লাস্টিকের বালতি, প্লাস্টিকের গামলা। কত রং। দা-বঁটি-ছুরি নিয়েও বসেছে ক'জন। কাচের চুড়ি, প্লাস্টিকের চুড়ি। কদমতলে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে চোখে নীল চশমা পরা ঝাঁকড়া-চুলো। তেলের মধ্যে লুটোপুটি খাচ্ছে ফুলুরি-বেগুনি। মাছিরা সব পার্টির মিটিন বসিয়েছে জিলিপির উপর।

অনেক পুলিশ, দমকলের লাল গাড়ি, সাহেব অফিসারদের গাড়ি। মাইকে হিন্দিতে বলছে ঝাড়খণ্ড কা আদরণীয় বিত্তমন্ত্রী আজ মাতৃপূজা কে লিয়ে আয়েঙ্গে। সুখীরাম বুঝতে পারল কেন এত পুলিশ, এত গাড়ি। সুখী ভাবে মন্ত্রীর আবার কী কামনা বাসনা পূর্ণ হতে বাকি আছে। ও জানবে কী করে? মন্ত্রী কি ওর কামনা বাসনা জানে?

হিন্দিতে অনেক কথা বলছে মাইকে। এটা তো ঝাড়খণ্ড রাজ্য। বাসে আসার সময় কখন যে পশ্চিম বাংলা ছেড়ে ঝাড়খণ্ডে ঢুকে পড়েছে বুঝতেই পারেনি। একই তো মাঠঘাট গাছ বনবাদাড়। এখানে যারা কথা বলছে, জিলিপি দোকানে, হাঁড়িয়ার ঠেকে, তারা কেউ হিন্দি বলছে না, ছবিওলাটা হাঁকছে আসেন, আসেন, ভালেন, মাধুরী, রানি, ঐসরজ, শ'তাব্দী, জোতি বোস, অর্জুন মুণ্ডা,

বাজপেয়িজি, শাহরুক...। ও-ধারে হাঁকছে— আশ্চর্য ইলেকট্রিক মেয়াঁছেলে, হাত দিলে কারেন মারে...। কিন্তু এ-ধারের সরকারি মাইকে যা বলাবলি হচ্ছে সব হিন্দিতে। যা হোক গে যাক। সুখী এবার পাহাড়ে উঠবে।

পাথর কেটে কেটে সিঁড়ি করা হয়েছে। আঁকাবাঁকা সিঁড়ি উপরে উঠে গিয়েছে। দু'ধারে বাবলাগাছ, কুরচি, বুনো গন্ধরাজ, কেঁদ। আরও কত গাছ, সব গাছের নাম জানার দরকার কী? গাছ আলাদা, ওদের ছায়ারাও আলাদা। ছায়া মাখতে মাখতে উপরে ওঠে ওরা। অনেক লোক উঠছে। প্রায় সবার কাঁধেই একটা করে মনস্কামনা। অনেকে নামছেও। ওই তো, একটা লোক নামছে। ওর কাঁধে নেতিয়েপড়া একটা দেহ। দেহটা ভেড়ার। মুণ্ডুহীন মনস্কামনা। বলি হয়ে গিয়েছে। মুণ্ডুটা মায়ের থানে থাকে। লোকটার জামায় রক্ত। রক্তে মাছি। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়াচ্ছে। রংকিনী পাহাড়ের বাতাস চাটছে ওই রক্ত। রংকিনী পাহাড় আজ হাপুটে। আজ মায়ের উত্থান।

খাড়াই সিঁড়ি। হাঁফ ধরে। একটু উপরে উঠে একটা বড় পাথর। ওখানে একটু জিরেন করা যায়। অনেকে বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। একটু বসল সুখীরাম। একজন লোক রংকিনী মায়ের মাহাত্ম্য-কথা বলছে। বলছে রংকিনী মায়েরা হল চাইর বহিন। বড়কা বহিন রংকিনী মা। মাঝলা বহিন তারিণী মা। ঘটগাঁয়ে হল উনার থান। তিসরা বহিন কেঁড়া মা। চক্রধরপুরের কাছে উনার থান। ছোটকি বহিন আকর্ষণী। সরাইকেলার কাছে উনার থান। আজ এই পাহাড়ে চাইর বহিন এসে মিলেন। উনাদের মিতমিতানরাও সব আসেন। রাতের বেলা চাইর বহিন মিলে ঝুমুর গাইবেন। বাজা বাজাবে গাছপালা, পশুপক্ষী। আজ রাতে ঝিমা জঙ্গলের জাগন। আর মা আজ ডাহিডুলা। ভক্ত যা চাইবে 'হ' বলবেন।

তারপর একজন একটা গান ধরল, অন্যরা সবাই গানের শেষে একসঙ্গে বলতে থাকল বোড়াম।

মারাং মা, বড়কা মা
বোড়াম।
বিলান বিত্‌তা টুয়া লাগা
বোড়াম।
চেরাই মেরাই কত দুর যাই
বোড়াম।
মকর দিনে ফুলের মালা
বোড়াম।
গাই ধলা ছেঁড়ি কালা
বোড়াম।
লাল বনে চুমচুমি
বোড়াম।
বুঢ়ি আইলেন গুমগুমি
বোড়াম।
মায়ের থানে ধূপধূনা
বোড়াম।
কঁকাকুয়া হীরা মনা
বোড়াম।
লালবন ভেঙ্গে যাই
বোড়াম।
মায়ের দয়া যদি পাই
বোড়াম।

চরণ সুখী খকা খুকি
বোড়াম।
সর্ব অঙ্গ দণ্ডবতী
বোড়াম...।

পাথর চাতালে প্রণাম ঠোকে সবাই। সুখীরাও প্রণাম ঠুকতে ঠুকতে বলে, কী কারণে এসেছি মা তুমি তো জানো। ভিতরের কথা। বাবা ডাক শুনার বড় শখ।

সুখীরাম ওঠে। পাঁঠাটাকে কাঁধে তুলে নেয় ফের। উঠতে থাকে। একটু একটু পা টলছে।

পাঁঠাটা বলল, কুথা লিয়ে যাচ্ছে হামাকে বলো দেখি?

মায়ের কাছে।

কেনে?

ইখনও বুঝিস লাই? তোর বলি হবে।

পাঁঠাটা চুপ। পাঁঠাটাকে কাঁধে চাপিয়ে দু-হাতে ঠ্যাংগুলান চেপে ধরে উঠতে থাকে সুখীরাম।

গাছগাছালির ছায়া মাখানো রোদ্দুর। পাখির ডাক। কাঁঠালগাছ।

পাঁঠাটা হঠাৎ বলল, মইরতে চাহি না আমি সোন্দর ভুবনে।

বাব্বুস? কী হল রে তোর? ওইটুকুস হাঁড়িয়ে খেঁঞে ইতত বড় কথা হাঁকড়াইছিস!

বড় কথা বুলছ কেনে? ইটা ত একটা খুব ছুট কথা গো— বাঁইচব।

মরা বাঁচার হামি কী জানি? উসব তো ভগবানের হাতে।

ভগবানটা কী বটে!

মাথা চুলকোয় সুখীরাম। কী করে বোঝায়? বলে, ভগবান হলেন গিয়ে ইসব জমির জমিদার। সব গাছপালা পাহাড়ের মালিক। তোর হামার মালিক। জীবন তেনার হাতে।

কিন্তু হামার ছাগল-জীবন যে রইল পতিত, আবাদ কইরলে...

তুই আবার কী আবাদ করবি রে পাগল! তোর ছাগল-জীবন তো পরের লেইগ্যে।

এ জীবনটা কী বটে? এ জীবন লিঞে কী কইরতে হয়?

মাথা চুলকোয় সুখীরাম। বড় কঠিন কঠিন প্রশ্ন শুধাচ্ছে ছাগলটা। পাগলটা। ওহ্, ছাগল যদি তত্ত্বকথা ছাড়ে তবে হামিও ছাইড়ব।

সুখী বলে, জন্মিলে মরিতে হবে। অমর কে কুথা কবে?

ছাগল বলে, জীবন, জীবন রে। তুই ছেইড়ে পলাইলে বল সোহাগ করব কারে।

দেহটা হল গিয়ে ঢাকনা। লাউ-এর খোলার ভিতরে আছে আসল বীজ। খোলা দিয়ে টুংটুঙি হয়, ওটা কিছু না। তোর চামড়া দিঞে জুতা হবে, তবলা-ঢোলের ছানি হবে, তোর মাংস দিয়ে ভোজি হবে, পাট্টি হবে। উটাও কিছু না। পঞ্চভূত। আসল কথা তোর আত্মা যাবে সগ্‌গে।

উটা কোথায়?

অনেক দূরে। ভাল জায়গা।

সগ্‌গের কথা বলছিল বটে এক বুড়া ইঁদুর। জঙ্গলে। বলছিল, উলুখুলু পাকা ধানের জমিন থেকে দাঁতে কেটে যখন ধানের শিষ গর্তে ভরে, সেই গর্তের মধ্যে লুটাপুটি খায়, সিটাই সগ্‌গ।

— তোর সগ্‌গেও কাঁঠালগাছ আছে! অনেক কাঁঠালপাতা।

— আর তুমার সগ্‌গে?

চুপ মেরে যায় সুখীরাম। কী আছে ওর স্বর্গে? বাবা ডাক?

সুখীরাম পাঁঠাটির ঠ্যাং ক'টি চেপে ধরে পাহাড়ের উপর উঠতে থাকে। মৃত্যু উপত্যকার দিকে উঠতে থাকে।

পাঁঠাটি আবার বলে, তবে আমাকে মারতেই লিচ্ছ?

সুখীরাম বলে, হামি কে? কুছু না। হেঁতরূপী ভগবান। যার যেমন পরমায়ু তার তেমন গতি।

— বুঝলাম। পাঁঠাটি চুপ করে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, মরণ রে তু হামার কাঁঠালের পাতা।

বাঃ। বেশ মরণকে মেনে নিয়েছে পাঁঠাটা। চুপচাপ বসে আছে ঘাড়ে। মোটেই ছটফট করছে না আর।

ওই তো পাহাড়ের মাথা দেখা যাচ্ছে। ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মানুষের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। জয় রংকিনী মা শোনা যাচ্ছে, বোড়াম রংকিনী মা শোনা যাচ্ছে।

সুখীরাম পাঁঠাটার পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, হামাকে খারাপ ভাবিস না। হামি ইখেনে না আনলেও মরতিস। সাপে খালেঅ খাবেক আর বাঘ খালেঅ খাবেক। হামার স্যাঙাৎরা কি তুকে ছেড়ে দিত পাগল? তুকে দিচ্ছি মায়ের কাছে। মা খুশি হলে বাবা ডাক শুনব। বাবা ডাকে পাপ কাটে। হামারলাগি নয় টুকুস উপকারটা করলি।

পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল সুখীরাম। ওখানে একটা বিরাট বড় পাথর। সেই পাথরটাই হল রংকিনী মায়ের থান। ওই পাথরটার সামনে হাঁড়িকাঠ। হাঁড়িকাঠের সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। গলায় জবার মালা পরা 'ভলেনটার' লাইন ঠিক করছে। সুখীরামও লাইনে দাঁড়ায়। লাইন এগিয়ে যাচ্ছে হাঁড়িকাঠের দিকে। লাইনে দাঁড়ানো মানুষগুলির কোলে কাঁখে কাঁধে সেঁধিয়ে আছে যারা, তারা ক্রমশ এগুচ্ছে হাঁড়িকাঠের দিকে। রংকিনীর থান লালে লাল। হাঁড়িকাঠ থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত পাথর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচে। তারপর থ মেরে গিয়েছে রক্ত নিজেই। জমা রক্তের উপর কাক বসেছে। পাথরের এক পাশে স্তূপ হয়ে গিয়েছে পাঁঠা ভেড়া হাঁস মুরগি কবুতরের মাথা। সব মাথাগুলি মিলে একটা স্তূপ। এর মধ্যে কোনটা কালুর, কোনটা ভুলোর, কোনটা লালুর, কোনটা ছানুর বোঝা যায় না। মাথার উপরে সূর্য। হাওয়া। হাওয়ায় পাতা খসে সুখীর ছাগলছানাটার গায়ে পড়ে। ধানদুব্বো। সামনে আর দু'জন মাত্র। একটা বলি সমাধা হতে এক মিনিটও লাগে না। কোলের ছাগল ছানাটার দিকে তাকাল সুখীরাম। আর দু'মিনিট। ছাগল ছানাটা আকাশের নীলের দিকে তাকাল। কুরচি ফুলের গাছের দিকে, ঝরা পাতার ঘূর্ণি নাচের দিকে, পাহাড়ের তলার রোদ পোহানো মাঠের দিকে তাকাতে লাগল। সুখীরাম শুনতে পেল, আমার সাধ না মিটিল আশা না মিটিল সকলই ফুরায়ে যায় মা...।

জয় মা রংকিনী। হুংকার উঠল সামনে। হাঁড়িকাঠের সামনে থেকে রক্তমাখা হাত এগিয়ে এল সামনে। সুখীরাম ছাগলছানাকে তুলে দিল ওই হাতে। ছাগলছানাটা সুখীরামের দিকে তাকিয়ে ডাকল বা-বা...। একটা লোক ছানাটার পা দুটো ধরল। হাঁড়িকাঠের ভিতরে মাথাটা ঢুকিয়ে আটলটা পরিয়ে দিল। আর একটা লোকের হাতে উদ্যত খাঁড়া। তখনও আবার বাবা ডাক শুনল সুখীরাম। তীব্র, স্পষ্ট। ছানাটা চিৎকার করছে বা-ব্বা...। তখন উদ্যত খড়্গ। সুখীরাম ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সুখীরাম ফিরছে। নেমে আসছে পাহাড় থেকে। যারা নেমে আসছে, সবার কাঁধেই একটা করে কবন্ধ শরীর। শুধু সুখীর কাঁধেই একটি প্রাণ।

হাঁড়িয়ার ঠেকের কাছে এসে পাঁঠাটা কাঁধ থেকে নামায়। বলে, ছোলা খাবি? খা। আর দোষ নাই।

শারদ সংবাদ প্রতিদিন ২০০৫

নতুন রান্না

শিবুর মণিহারি দোকানের দরজায় এখন ছোট ছোট টিনের পাত সাঁটা। আলকাতরায় লেখা:

সব রকম লটারির টিকেট বিক্রয় হয়।
ফ্ল্যাট ভাড়া ক্রয়-বিক্রয় দেওয়া হয়।
বিবাহের বাড়ি ভাড়া সন্ধান দেওয়া হয়।
রান্নার হালুইকর পাচক ব্রাহ্মণ সন্ধান দেওয়া হয়।

শিবুর দোকানের বয়ামগুলো ফাঁকা ফাঁকা। একটা বয়ামের ভিতরে একটা আরশোলা মরে শুকনো হয়ে আছে। একপাশে কিছু পাউরুটি, একটা টিনে কিছু দু' নম্বরি বিস্কুট, একটা বয়ামে ঝাল চানাচুর, সন্ধের পর চানাচুরের ভাল বিক্রি।

শিবুর দোকান চিরকাল এরকম ছিল না। বছর কয়েক আগেও দোকানের রমরমা ছিল। বয়ামে বয়ামে ভরতি থাকত কত রকমের লজেন্স। চাটনি লজেন্স, জেলি লজেন্স, মৌরি লজেন্স। চকলেট ছিল, বাদাম, বিস্কুট, কেক ছিল। টিপ-চুড়ি, হার, ফিতে, ক্লিপ। বড় ভাল পজিশনে এই দোকানটা। প্রিয়বালা গার্লস স্কুলের ঠিক সামনে। সদা-সর্বদা ছিল কিশোরীদের আনাগোনা। কিশোরীদের ফাউ দিয়ে বয়ামগুলি ফাঁকা হয়ে গেল ক্রমশ। চার আনার চানাচুর কিংবা চারটে সেফটিপিন নিয়ে কোনও কিশোরী যদি বলত, শিবুদা ফাউ? শিবু ফেরাতে পারত না। হাতটা ধরে চারটে সল্টেড বাদাম কিংবা ক'টা কুচো নিমকি গুঁজে দিত। শিবুর কুচো নিমকি গুঁজে নেওয়া কত মুঠি কাজললতা ধরে বরের কাছে চলে গেল...। ফাউ গুঁজে দেওয়ার সময় কত মেয়েকে শিবু বলেছে— নখটা বড্ড লম্বা করেছিস, এবার কেটে ফেল, কিংবা তোর হাতটায় কড়া পড়েছে কেন রে? খুব কাজ করতে হয় বুঝি?

পঞ্চাদা বসে আছে শিবুর দোকানের ঠিক সামনের রোয়াকে। এই রোয়াক এখন শিবুর মাথার মতোই ফাঁকা। রোয়াকের পাশে লম্বালম্বি সাইনবোর্ডে এক সময় ইংরেজিতে লেখা ছিল জলি স্টোর্স। 'আমরা বাঙালি'র ছেলেরা সেই কবে আলকাতরা মেরে দিয়ে গেছে। ওই সাইনবোর্ডের পাশে বসে মাথা চুলকোচ্ছে পঞ্চা। পঞ্চাঠাকুর। মুখে পান।

শিবু পঞ্চাকে বলে, বুঝলে পঞ্চাদা, কয়েক হাজার টাকা হলে দোকানটা আবার ভাল করে করতাম। পঞ্চা শিবুর দিকে তাকায়। শিবুর জামায় বোতাম নেই সব ক'টা। বুকের লোম বেশ কিছু সাদা। পঞ্চা শিবুর দিকে এক পলক তাকিয়েই পিরিক করে পিক ফেলে রাস্তায়। পিক ফেলার কায়দাতেই বোঝা যায় ওর মুড খারাপ।

একবার আকাশের দিকে চেয়ে, একবার শিবুর বোতামহীন জামার দিকে চেয়ে পঞ্চা বলল, আপনি কোনও কম্মের নয় শিববাবু। এ মাসের ছয়ে কিছি কামকাজ হলানি, আটে কিছি হলানি। তেরোয় ডেট আছে। হবে যে, তারও লক্ষণ কিছি নাই। কিছি পারছেন না শিববাবু।

শিবু তখন দরজায় সাঁটানো 'রান্নার হালুইকর ব্রাহ্মণের সন্ধান দেওয়া হয়'। লেখাটার দিকে আঙুল-ইশারা করে বলে, লিখে তো রেখেছি দেখছ। বাজার খারাপ।

ঠিক তখনই দোকানের সামনে ফরসা মতো দেখতে, গোল গোল মুখ, নতুন তাঁতের শাড়ি পরা একটা মেয়ে দাঁড়াল, সঙ্গে আরও কয়েকজন গিন্নি-বান্নি। নতুন শাঁখা রুলি পরা হাতটা মৃদু ঝাঁকিয়ে

বলল, ভাল আছেন শিবুদা? এই হাতে হয়তো কোনও এক সময় অনেক কুঁচো নিমকি গুঁজেছিল শিবু। শিবু বাতাসে দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বিয়ে?

মেয়েটা বলল, হুঁ।

তক্ষুনি পঞ্চা কারুকার্যময় চোখে শিবুর দিকে তাকাল।

শিবু বলল, কবে বিয়ে?

মেয়েটা বলল। আজই তো।

ওঃ। তবে তো তোমাদের রান্নার ঠাকুর ঠিক হয়েই গেছে।

কেন?

আমি দি।

মেয়েটা আড়চোখে আলকাতরায় লেখা 'হালুইকর' শব্দটার দিকে তাকায়। ঠোঁট দুটো টিপে কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়। এটা এক ধরনের মুদ্রা। বিশেষ কোনও কথা বাক্য ব্যবহারের পরিবর্তে আজকাল এভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পাশের একজন ভারিক্কি গিন্নি বললেন, ঠাকুর কি এখনও বাকি আছে? ক্যাটারার আসছে। 'বাহাদুর ক্যাটারার'।

'ক্যাটারার' শব্দটা শোনামাত্রই পঞ্চার কপাল কুঁচকে গেল। তারপর চলন্ত গিন্নি মহিলার নিতম্বে শাড়ির কলকার দিকে চেয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, 'শালা মধুসূদন'।

মধুসূদন সাহা হচ্ছেন বাহাদুর ক্যাটারার-এর মালিক। শিবু বলল, ফালতু গাল পেড়ে কী হবে? ও ব্যবসা করবে না?

ব্যবসা? হুঃ। খালি রং-ঢং করে, রং-ঢং। ব্যান্ডপার্টির মতো পোশাক লাগায়, গলায় টাই, হাতে মোজা, আজকাল পাবলিক হয়েছে তেমন। ওরা খেতে যায় না রগড় দেখতে যায়?

শিবু দেওয়ালের টিউব লাইটের শূন্য ফ্রেমটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মধুসূদনের ওখানে কে রান্ধে জানেন শিববাবু? মনোজ আর হেমন্ত। মনোজের বাপ কে জানেন শিববাবু? কেষ্ট নাপিত। কাশী মিত্তিরের ঘাটে এখনও কামাচ্ছে। ওর ছেলে কী রান্ধিবে? কী করে রান্ধিবে? আর আমি, পঞ্চানন পণ্ডা, তিন পুরুষের কারিগর। আমার পাশে ওই মনোজ, ওই হেমন্ত সব মুষা, বুঝলেন, মুষা। ইন্দুর।

এমন সময়ে একজন বুড়ো মতো লোক আসে শিবুর দোকানে। শিবু তাড়াতাড়ি লটারির টিকিট লাগানো ক্লিপ বোর্ডটা তুলে নিয়ে বলে, চেরাপুঞ্জি আগামীকাল। ফার্স্ট প্রাইজ পাঁচ লাখ, নাগাল্যান্ড পরশুদিন, তিন লাখ বিগ বাম্পার...

বুড়ো লোকটা হাতটা মেলে ধরে বলে— থাক। আজ লটারি থাক। হাতের আঙুলে চারটি পাথর।

তবে? শিবু বলে।

বুড়োটা পাথর বসানো হাতটা বোর্ডের উপরে রাখে। তারপর অন্য হাতের আঙুল নিয়ে ইকির মিকির চামচিকির কায়দায় আঙুলের পাথরগুলি স্পর্শ করে। এই যে, এটা হরিণঘাটার দুধ। এটা স্টেট ব্যাংকের সুদ। এটা লটারিতে নাম, আর এটা ছোটমেয়েটা যায় যেন শ্বশুরধাম... হাঃ হাঃ হাঃ। ছোটমেয়েটার বে ঠিক করে ফেলেছি, বুঝলে, ছেলে স্কুলের মাস্টার, দু' বেলা বাড়িতে বাহাত্তর জোড়া জুতো জমে থাকে, বুঝলে?

শিবু যেন ঠিক উচ্ছ্বসিত হল না। শিবু কি ওই বুড়োর ছোটমেয়ের মুঠিতেও নিমকি গুঁজেছিল।

শিবু রোগীর মতো মুখ করে বলল, হয়ে গেল?

হ্যারে ভাই, হয়ে গেল। কম ভুগিয়েছে? জগা ঘটকের দ্বারা কিসসু হল না। তারপর যেই কমপিউটার ঘটকের কাছে গেলাম, উইদিন থ্রি মান্থস বিয়ে ফিক্স আপ।

কমপিউটার ঘটক কে আবার?

ওই যে, করেছে না, স্ক্যানিং সেন্টারের উপরে? দি কাপ্‌ল। লেখা আছে না, এখানে কমপিউটার দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন করানো হয়...। একটা ভাল দেখে ঠাকুর দিয়ো তো শিবু...

পঞ্চা উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমিই তো আছি।

আমার বুঝলে, আড়াইশো মতো লোক হবে। তার মধ্যে দেড়শো বরযাত্রী। ভ্যারাইটিজ রকমের আইটেম করব যেন শালাদের ইয়াদ থাকে, বলবে হ্যাঁ, নীতিশ মিত্তির আইটেম করেছিল বটে।

মিষ্টিটায় টান রাখব। ফ্রাইড রাইসে মুখ মেরে দিতে হবে। পারবে?

আইটেম কী হবে? পঞ্চা জিজ্ঞাসা করে।

ধরো রাধাবল্লভি, আলুর দম, ছোলার ডাল, ফ্রাইড রাইস, ফিস ওরলি, চিকেন মাঞ্চুরিয়ান না কী যেন বলে সেইটা...

অত ঝামেলায় কাজ কী স্যার, বলি কী, ভাল করে মাছের কালিয়া করে দি, আর বেশ মোটা করে ফিস ফ্রাই...

ফিস ফ্রাই-টাই সব পুরনো হয়ে গেছে। আমার ভাড়াটেরাই ফিস রোল খাইয়েছে। আমাকে ফিস ওরলি খাওয়াতেই হবে।

তারপর গলাটা খাটো করে বলল, তবে ভেটকি-ফেটকির নয়, আড় মাছের নয়তো ভোলার। বেশ ভাল করে মাস্টার্ড-ফাস্টার্ড স্যালাড ফ্যালাড দিয়ে... বুঝলে না

পঞ্চা মাথাটা চুলকোতে লাগল, মানে ওরলিটা ঠিক...

জানো না?

মানে, করিনি কখনও ঠিক...

আর ওই মাঞ্চুরিয়ান...?

মানে ওটাও আগে...

পঞ্চার মাথা চুলকানোর মধ্যে পরাজয় মুদ্রা। মাটিতে চোখ। চোখে লজ্জা-চিহ্ন আঁকা।

নীতিশ মিত্তির শুধু বলল, ও, বুঝেছি। তোমার স্টকে মডার্ন ঠাকুর নেই। আমি ক্যাটারার বলে নেব। তা তোমার ওই ঠাকুর পুরনো আমলের যখন, নিরিমিষ রান্নাটা ভালই পারবে মনে হয়। পঞ্চা ভাবল নিরামিষই সই।

ঠিকানা খুঁজে নন্দলাল বোস লেনের ওই মিত্তির বাড়ি গেল পঞ্চা। বিয়েবাড়ির আসল কাজটাই ধরেছে বাহাদুর ক্যাটারার। ওর কারিগর মনোজকে পঞ্চা চেনে। বিয়ে বাড়িতে জনা দশ-বারো বিধবা আছে, পুরুত আছে, বামুন আছেন, গুরুদেব আছেন, ওরা মাছ-মাংসের ছোঁয়াছুঁয়ি খাবেন না। কী রাঁধতে হবে? না মুগডাল, ফুলকপির ডালনা, মোচাঘণ্ট, এইসব। পঞ্চা বলল, ক'টা পান্তুয়া করে দিই না, একেবারে খানদানি জিনিস হবে।

বাড়ির বড়ছেলে বলল, ধুর বানিয়ো না আমাদের। ওসব কেউ আর বানায়? দোকান থেকে নিয়ে নেব।

তবে ছানার ডালনা করো। এমন করে দেব যে....

আবার ধুর বানাচ্ছ? শীতের দিনে এত সবজি থাকতে ছানা কেন? খালি ধান্দাবাজি।

ওই ক্যাটারের ঠাকুর কী আইটেম করছে? পঞ্চা জিজ্ঞাসা করল।

সে অনেক রকম। সব নতুন রান্না, ওসব তোমার দ্বারা হবে না। চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। পারো?

পঞ্চা চুপ। হে জগন্নাথ! ওই মাঞ্চু যেন নুন কটা হয়।

কাজের দিন ছাতের প্যান্ডেলে বিরাট উনুন। মনোজ আর হেমন্ত সিগারেট ওড়াচ্ছে। তিনজন জোগাড়ে। একজন চিনেবাদামের গায়ের লাল জামা খুলে বার করে আনছে। সাদা ফকফকে গায়ের রং। একজন বিশাল থালা জুড়ে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে ছড়িয়ে রেখেছে। ঘন ক্ষীরের মতো পোস্তবাটা নিয়ে ব্যস্ত অন্য একজন। বাটি ভরতি সবুজ কড়াইশুঁটি, কী আহ্লাদ। কিশমিশ ফুলে উঠেছে জলের সোহাগে। এ এক মহা সমারোহ। পঞ্চা ওখানে ঢুকে পড়ল। বলল, এসপেশাল কোন আইটেম

মনোজ? মনোজ বলল, 'চিকেন মাঞ্চুরিয়ান।' ঠোঁটে সিগারেট নাচল। পঞ্চা মেঝেতে ছড়ানো উপকরণ সমারোহে চোখ ঘোরায়। তরি-তরকারি মশলার মধ্যে কয়েকটা বোতল। সস্ নিশ্চয়ই। কয়েকটা কাগজের বাক্স। কী আছে ওতে?

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করল, কী পঞ্চাদা, তোমার ঘ্যাঁট-লাবড়া কমপ্লিট? পঞ্চা দুঃখী ঘাড় নেড়ে বলল, হুঁ। তারপর একটা কথা বলবে বলে ফুসফুসে অনেকখানি বাতাস নেয়। শ্বাসবাতাসে পেঁয়াজ-রসুন-আদা-জায়ফল। তারপর ঝপ করে বলে ফেলে, মনোজ, রান্নাটা কী করে করবি আমাকে বলে দিবি ভাই? মনোজ তাকাল না পঞ্চার দিকে। বাতাসে ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, এই নগেন, এবার রসুনগুলো বানা। এবার পঞ্চার দিকে তাকাল হেমন্ত, হাসল। বলল, এসব হল ফর্মুলার রান্না। সব মাপে মাপ। খাপে খাপ। এসব কি বলে শেখানো যায়? ক'দিন আমাদের সঙ্গে জোগাড়ে থাকো, মধুসূদনবাবুকে বলো, তারপর আস্তে আস্তে...

সাট করে ওখান থেকে বেরিয়ে যায় পঞ্চা। দোতলার রান্নাঘরে ওর নিজস্ব ফুলকপি আর কলামোচার কাছে যায়। কলামোচার গা থেকে আলতো গন্ধ ভাসছে বাতাসে। পঞ্চা ওদের কাছে মনের কথা বলে।

মাসি-পিসিরা খুব সুখ্যাতি করল। মোচায় ডালে বড়া-নারকোল পাতি। ফুলকপির তরকারিতে কড়াইশুঁটি একবারে চকচকে সবুজ। গটগট করে তাকিয়ে আছে। গলেও যায়নি, আবার কাঁচাও নেই। একজন দিদিমা জিজ্ঞাসা করল, এত সুন্দর রং কী করে করলি রে? পঞ্চা আহ্লাদে গলে গেল। পিসিরা সব চেটেপুটে খেল। পঞ্চার বড় আনন্দ হল।

পঞ্চার এই রান্নাবান্না হল দিনের বেলায়। একটু বেশি রাতে পঞ্চা পরিষ্কার জামা পরে খেতে এল। সঙ্গে নিয়ে এল ওর ছেলেকে, ক্লাস টেনে পড়ে।

টেবিলে টেবিলে তরকারি কেটে ঢং করা। বেগুন দিয়ে হাঁস বানানো, বিট-গাজরের ফুল, পেঁয়াজের পদ্ম। যারা পরিবেশন করবে ওদের গায়ে কোট, গলায় টাই, পঞ্চার ছেলে মতিলালের চোখে-মুখে ঝিরিঝিরি আলো, ও অবাক তাকাচ্ছে। পঞ্চা আসত না। মনোজের রান্না খেতে ওর বয়েই গেছে। ও আজ ওই চিকেন মাঞ্চু খাবে। খেয়ে ঠিক ধরে নেবে রহস্য। ফিস ফিঙ্গার ঠিক ধরে নিয়েছিল এরকমই এক বাড়িতে খেয়ে।

লাস্ট ব্যাচ ঠাকুর-চাকরদের। ওই মাঞ্চু শেষ ব্যাচে আছে তো? পঞ্চা মনে মনে ভাবে। ঠান্ডা রাধাবল্লভি আর আলুর দম পাতে পড়ল। মতিলাল কুড়িয়ে পেল একটা কার্ড। মতিলাল কার্ডটা খানিক পড়েই বলল, শোনো কী লিখেছে—

আজের নাটক: শুভ বিবাহ
কাহিনি, নাট্যকার ও পরিচালনা:
শ্রীমধুসূদন সাহা
প্রযোজনা: বাহাদুর ক্যাটারার
সম্পাদনা: মনোজঠাকুর ও হেমন্তঠাকুর

চরিত্র রূপায়ণে:
বিখ্যাত নায়ক ফ্রায়েড রাইস
নায়িকা চিকেন মাঞ্চুরিয়ান
সহনায়ক রাধাবল্লভি
খলনায়ক বাটারফ্রাই
উদাস বাউল স্যালাড
অতিথি শিল্পী ফিশ্ মেক্সিকান।
হাস্যকৌতুকে প্লাস্টিক চাটনি ও পাঁপড়

সুমিষ্ট গায়ক রাজভোগ
মিষ্টি গায়িকা প্রাণহরা
সংগতে আইসক্রিম
পপসংগীতে পান
অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রে লেবু, নুন, জল

মতিলাল পড়ছিল আর হাসছিল। আর চোয়াল কঠিন হচ্ছিল পঞ্চার। শেষকালে বলল, থাম।

শেষ ব্যাচ। চাকরবাকরদের ব্যাচ। কার্ডের অনেক কিছুই পাতে পড়ল না। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ান পড়ল। ও হরি। গোল গোল বড়া। মুরগির মাংস সেদ্ধ করে হাড় বাদ দিয়ে বড়া পাকানো। গায়ে গায়ে টক ঝাল ঝোল আর গায়ে গায়ে রসুন কুচো। পঞ্চা চোখ বুজে খুব মন দিয়ে ওই খাদ্যদ্রব্যটার শরীর সারা জিভে জড়িয়ে নেয়। ঝোলটা তো সস্। বোতলের স্বাদ। বড়ার ভিতরে গোলমরিচ আছে। সা-জিরে দিয়েছে নাকি? টকটক ভাবটা কি শুধুই ভিনিগারের নাকি নেবুর রসও আছে?

কী পঞ্চাদা, কেমন খাচ্ছ? মনোজ জিজ্ঞাসা করল। পঞ্চা বলল, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। মাংসের পাকোড়ার এমন খটমট নাম রেখেছে কেন?

পাকোড়া? হ্যাঃ হ্যাঃ...

এই হা হা শব্দ আর একাকী থাকল না। মনোজের তিনজন জোগাড়েও হেসে উঠল। তারপর হেসে উঠল চিনেমাটির প্লেট, কাচের গ্লাস, জলের জাগ, চামচ।

পরদিনই একটা ছোট দেখে মুরগি কিনে বাড়ি ফিরল পঞ্চা। পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো। সবাই অবাক হল। আমার নাম পঞ্চা এই বলে ব্যাগ থেকে বার করল একটা মহিলা পত্রিকা। প্রচ্ছদে প্লেটে সাজানো রান্না করা খাবার। উপরে লেখা— নতুন নতুন রান্না।

পঞ্চার মেয়েটা ওর মায়ের দিকে তাকাল, মা তাকাল মেয়ের দিকে। পঞ্চা বিড়ি ধরিয়ে ছেলেকে ডাকল, হ্যাঁরে মতিলাল, কী করছিস? মতিলাল বলল, পড়ছি। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ধর্ম। পঞ্চা বলল, শোন এদিকে। মতিলাল এলে পঞ্চা ওই নতুন নতুন রান্নার পত্রিকা ওর হাতে দিয়ে বলে, বার কর চিকেন মাঞ্চু।

মতিলাল সূচিপত্র দেখে পড়তে লাগল— কচুশাকের ঘণ্ট, দই পটল, ভেজিটেবল কাবাব, মাংসের কচুরি, লবঙ্গ লতিকা, বাঁধাকপির মনচুরি...

চিকেনের মাঞ্চুরি নেই?

না।

তবে বাঁধাকপিই পড়।

মতিলাল পড়তে থাকে,— 'শীতের শেষে বাঁধাকপি খেতে আর ভাল লাগে না। কিন্তু আমি একটা রান্নার কথা বলছি, এই ভাবে রান্না করলে খুবই ভাল লাগবে। উপকরণ বাঁধাকপি একটি। মাংসের কিমা ৫০০ গ্রাম। পেঁয়াজ দুটি। আদা ৫০ গ্রাম। কাঁচালঙ্কা ৬টি। কিশমিশ, বাদামকুচি, নুন— পরিমাণ মতো। মাখন ২৫০ গ্রাম। প্রথমে বাঁধাকপিটির ঝরতি-পড়তি পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলুন। মাংসের কিমা করিয়ে নিন। তাতে বাদাম কুচি ও কিশমিশ মিশিয়ে নিন। এবার একটু শিল্পকলা। যেমন পদ্মফুলের একটা একটা করে পাপড়ি খোলে, সেইভাবে বাঁধাকপির পাতাগুলো একটা একটা করে আস্তে আস্তে খুলে নিন। তারপর ওই কিমার আস্তরণ পাতার গায়ে দিয়ে আস্তে আস্তে পাতাগুলি আবার বন্ধ করে দিন। এবার মাখনে ডিপ ফ্রাই করে নিন। ছুরি দিয়ে কেটে গরম গরম পরিবেশন করুন।'

'মাখন' শুনেই সবাই হেসে উঠল। পঞ্চার বউ, মেয়ে... পঞ্চাই শুধু কপাল কুঁচকে রইল। মতিলাল পড়তেই থাকে। 'এই রান্নাটা এতটাই মুখরোচক যে আপনার প্রিয়জনের মনটাই চুরি করে নিতে পারবেন। তাই এই রান্নাটার নাম দিয়েছি বাঁধাকপির মনচুরি।'

বাপরে। ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারী। পঞ্চা বলল, বলে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইল। তারপর হঠাৎই বলল আমার নাম পঞ্চা। দেখাচ্ছি। অন্নপূর্ণা, বঁটি আন।

দোকান-টোকান না গিয়ে পঞ্চা মুরগি কাটতে বসল। মেয়ে আর বউকে দেখিয়ে দিল কত ছোট করে রসুনের কুচি করতে হবে। মুরগির টুকরোগুলো সেদ্ধ বসাল। পঞ্চার বউ বলল, এসব হচ্ছে কী? পঞ্চা বলল, চিকেন মনচুরি। মতিলাল এসে ওখানে বসে গেল। পঞ্চা বলল, যা, তুই ইস্কুলের পড়া কর। মতিলাল তবু থাকে। ওর ক্যাটারার হবার শখ। গলায় টাই লাগাবে, হাতে দস্তানা লাগাবে...।

রসুন কুচোচ্ছে অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণার ডান হাতে ছ'টা আঙুল। দ্বিরাগমনে ওকে নিয়ে এসেছিল ওর বর আর ফিরিয়ে নেয়নি। জামাই বলেছিল, ছ' আঙুলে মেয়েছেলে অলক্ষ্মী হয়। ক'দিন পরেই জামাই আবার বিয়ে করেছিল।

অন্নপূর্ণা রসুন কুচোচ্ছে। কুচো কুচো রসুন মাঞ্চুরিয়ানের গায়ে জড়িয়ে থাকবে। মাঞ্চুরিয়ান একটি মডার্ন খাবার। অন্নপূর্ণার স্বামী একজন সম্পূর্ণ যুবক। মডার্ন যুবক, বালেশ্বরের রেডিয়ো মিস্ত্রি। বিয়ের সময় বলেছিল রেডিয়ো ইঞ্জিনিয়ার। অন্নপূর্ণার আঙুলটা আর কাটা হয়নি। অন্নপূর্ণার একবার বিয়ে হয়ে গেছে। আঙুলটা অপারেশন হলেও একবার বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েকে আবার কে বিয়ে করবে? পঞ্চা বলেছিল আর অন্নপূর্ণা লিখেছিল, মুই চরণ ভিখারি। প্রাণনাথ, চরণের মোতে স্থান দিয় টিকে। লিখেছিল দাসীর মতো থাকব, সতীনের দাসী। উত্তর আসেনি। সেদ্ধ মুরগির হাড় চেঁছে মাংস বার করল পঞ্চা, সব লঙ্কা দিয়ে মাখল। ডিম ভেঙে নিল, ময়দা মেশাল, দু' চিমটি খাবার সোডা দিল।

মতিলাল বলল, খাবার সোডা দিলে কেন ফুলে ওঠে বলি? কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈয়ারি হয়। উহা বহির্গত হইবার সময় ফাঁপাইয়া দেয়...। পঞ্চা বলে, চুপ মার। বড়া বানাল পঞ্চা। লাল করে ভাজল। ফুলেছে বেশ। এবার পঞ্চা সয়া সস্ আর লঙ্কা সস্ ঢেলে দিল। টমেটো আর রসুনের কুচি মিশিয়ে বড়াগুলি নাড়তে থাকল।

কিন্তু বড়া ভেঙে গেল। বড়াগুলি ভেঙে যেতে থাকল। হায় হায়। পঞ্চা নিজের গালে আচমকা থাপ্পড় মারল। পারলাম নাইরে অন্ন। মাঞ্চুরিয়া হল নাই। মতিলাল একটুকরো তুলে ফুঁ দিয়ে চাখল।

কীরে মতিলাল। বল। পঞ্চার আর্তস্বর। মতিলালের মাথা নাড়তে ভয়।

কী রে। বল...

বাবাগো...

পঞ্চা খুন্তিটা দিয়ে কড়ায়ের গায়ে বাড়ি মারল। তীব্র ঠং শব্দ। মাথার চুল টেনে ধরল। তারপর উঠে গেল। অন্নপূর্ণা কড়াইটা নামাল। তখন তলায় পোড়া লেগেছে।

পঞ্চা থপ থপ করে রাস্তায় হাঁটে। রাস্তার ডাবের খোলা, শালপাতার কুচো কাগজ বলে, হল সখা? পঞ্চা বলে, উঁহু, আমি তোদের দলের না। আমি হারিনি আমি কিছুতেই হারব না। আমি বাসি ছানাকে স্পঞ্জের টুকরো করে ভাসিয়েছি ডালনায়, অমৃতির শিরার ভিতর, শরীরের ভিতর ঢুকিয়েছি মিঠা রস। গুলে মাছকেও করেছি অমৃতসমান। বড়া ভেঙে যাবে?

এঃ, নিশ্চয়ই ময়দার পরিমাণ কম হয়েছিল। নাকি কেমিকাল? এখন তো নতুন রান্নায় কেমিকাল লাগাচ্ছে সব। বেকিং পাউডার, সাইট্রিক অ্যাসিড, অজিনামটো। অজানা মতো কোনও কেমিকাল নেই তো? পঞ্চা ভাবে। ক'দিন জোগাড়ের কাজ করবে নাকি মনোজ-হেমন্তের সঙ্গে, পঞ্চা ভাবে।

না... নেহি...।

হাঁটতে হাঁটতে শ্রীভবনের সামনে পৌঁছে যায় পঞ্চা। শ্রীভবনে প্যান্ডেল। থার্মোকলের সাদা মেয়েছেলে শাঁখ বাজাচ্ছে। মাইক্রোফোন টেস্টিং ওয়ান-টু-থ্রি হচ্ছে। পঞ্চা সেঁধিয়ে যায়। এই বাড়ির আনাচ-কানাচ ও চেনে। বহু কাজ করেছে এই বাড়িতে। রান্নার জায়গাটায় চলে যায় পঞ্চা। রান্না করছে মিঠুন।

আরে পঞ্চাডা যে, ভালটো?— মিঠুনের মুখে চারশো দশ জর্দার সুবাস।
না, কিছু না, যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, ভাবলাম...
ও। পান খাও। বাজার কেমন।
আর বাজার। কাজই নাই। কী আইটেম?
বল্লভী, কাশ্মীরি, ছোলা, রাইস, চিকেন মাঞ্চুরিয়ান...
মাঞ্চু? হেই মাইরি মিঠুন, এই রান্নাটা আমায় একটু বলে দিবি? দে নারে ভাই...
আরে গুরু, বলার কী আছে।
বলনারে ভাইপো।
আরে ধুর। বাড়ি যাও তো...
মশলাগুলি বল শুধু।
অনেক মশলা আছে।
বল না।
বড্ড ঝামেলা করছ তো।
বলবি না?
উহু।

পঞ্চা উঠে যায়। রাস্তায় যায়। আবার ঘুরে আসে। হাপিস ঘুলঘুলিটার কাছে যায়। ওটা রান্নার জায়গাটা থেকে ধোঁয়া বার হবার ঘুলঘুলি। ওই ঘুলঘুলি দিয়ে ঠাকুরেরা অনেক সময় মাল পাচার করে বলে ওটার নাম হয়েছে হাপিস ঘুলঘুলি। একবার দেখে নেয় পঞ্চা। সন্ধের আগে আগে শ্রীভবনের পিছনে চলে আসে পঞ্চা। গায়ে চাদর। এইমাত্র লোডশেডিং হল। ঘুলঘুলিটার নীচে দাঁড়ায়। ইটের খাঁজে পা রেখে পাইপটা শক্ত করে ধরে। আশ্চর্য কাণ্ড। ঘুলঘুলিতে পলিথিনের ভিতরে কয়েক পিস মাছ। ছিঃ। পঞ্চা জীবনে এসব করেনি। ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা যাচ্ছে সব। ওই তো রান্না হচ্ছে। ওই তো হাড় থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া মুরগির মাংস। ঘুলঘুলির মধ্যে ওর চোখ। একজন এসে বলে গেল ঠাকুর, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ফার্স্ট ব্যাচ বসিয়ে দেব।

মিঠুন বলল, তা হলে মাঞ্চুরিয়ানটা করে ফেলি।

লোকটা বলল, সে কী, এখনও করোনি? মিঠুন বলল, চাইনিজ ফুড বানিয়ে ফেলে রাখতে নেই।

জয় হরি। ঠিক টাইমেই এসে গেছে পঞ্চা।

সাদা সাদা সেদ্ধ মাংসের মধ্যে মেশানো হল কাঁচা লঙ্কা। কুচো কুচো আদা। চিনির মতো ওটা কী ছড়াল? ও। আজিনামটো। ডিম ভেঙে ভেঙে দিতে লাগল। এবার একটা কাগজের প্যাকেট থেকে সাদা সাদা গুঁড়ো ছড়াতে লাগল মাংসর উপর। ওটা কী? ময়দা? ময়দা এরকম প্যাকেটের মধ্যে থাকবে কেন? দু' হাতে মাখতে লাগল জিনিসটা। একটু কালো সস, মেশাল। গিন্নি গোছের একজন রান্নাঘরে এল। বলল, কিছুটা কর্নফ্লাওয়ার দাও তো ঠাকুর, রেখে দি, কুলফি বানাব। মিঠুন তখন ওই প্যাকেটটা থেকে কিছুটা ঠোঙায় ঢেলে দিল। এইবার বোঝা গেল। ওই কাগজের প্যাকেটে যা আছে তার নাম কর্নফ্লাওয়ার। ওটাই মাংসে মাখাতে হয়। মনে থাকলে হয়। হা কুন্তী, হা মাতঃ, রক্ষা করো। রক্ষা করো! রথ চক্র পশি গলা ধরণী ভিতরে। কর্ণের ডায়লগ। কর্ণ মনে থাকবে না। কর্ণ, কর্ণ, কর্ণ... তখনই পঞ্চা একটা আচমকা চিৎকার শুনল— 'অ্যাই শালা, নেমে আয়।' পঞ্চা চমকে গেল। হাতটা শিথিল হয়ে গেল পাইপ থেকে। কর্ণ-কর্ণ-কর্ণ। পঞ্চা পড়ে যাচ্ছে। 'শালা মাছ চোর'— পঞ্চা শুনল। 'একেবারে হাতে নাতে ধরেছি।' পঞ্চা কী যেন ধরতে গেল। কর্ণ কর্ণ কর্ণ...। পঞ্চা পড়ে গেল। ঝনঝন করে উঠল বিশ্ব চরাচর। আস্তে আস্তে থেমে গেল জেনারেটরের ঘটঘট।

পঞ্চা হাসপাতালে। মেঝেতে শুয়ে আছে। নাকে নল। হাতের ভিতরে নুন জল ঢুকছে ফোঁটা ফোঁটা। ওর চোখ খোলা। খোলা চোখের ভিতর দিয়ে ও আবছা দেখছিল মাংস। ডাক্তার মাংস,

নার্স মাংস, ধাই মাংস। জমাদার মাংস, বউ মাংস, ছেলে মাংস। অনেক মাঞ্চুরিয়ান। পঞ্চার কপালে হাত বুলোচ্ছে অন্নপূর্ণা। ছ'টা আঙুলের মায়া-মমতা মায়া-মমতা মাখাচ্ছে পঞ্চার শরীরে।

বৃষ্টি হচ্ছে নাকি? বৃষ্টির ঝিম ঝিম শোনে পঞ্চা। অন্নপূর্ণার ছ'টা আঙুল বয়ে যাচ্ছে। কে এসে সামনে দাঁড়ায়। শিবু? কী গো শিবু? কোনও কাজ আছে? শিবুর হাতে একটা কাগজ। শিবু ঝুঁকে পড়েছে বিছানার দিকে। ঝুঁকে বলল, লটারির প্রাইজ পেয়েছ পঞ্চাদা। বিশ হাজার। পঞ্চা শুনল। ঠিক শুনল না কি ভুল? পঞ্চা চোখ বুজল। চোখ খুলেই দেখল, শিবুর গায়ে চটচট করছে সস্। শিবু আরও কী যেন বলছে। বলছে, শুনছ পঞ্চাদা, শুনছ, আমি অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করতে চাই। পঞ্চাকে সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় মতিলাল। বলল, বাবা ওই টাকা আমায় দাও। আমি ক্যাটারার হব বাবা, ক্যাটারার। মতিলালের সারা গায়ে চটচট করছে সস্। মাছি উড়ে এল। পঞ্চা দু'হাতে মাছি তাড়াল, দু'হাতে চেপে ধরল মতিলালকে, তারপর জিভ দিয়ে চাটতে লাগল ওর গা, সদ্য জন্মানো বাছুরের ক্লেদমুক্ত পরিষ্কার করছে যেন গাভীমাতা।

পঞ্চা স্থির তাকিয়েছিল। আসলে ওর বুকের রন্ধনশালায় তখন তৈরি হচ্ছিল একটা আশ্চর্যরকমের নতুন রান্না।

লাইভ বাংলা ডটকম। ২০০১

এক টুকরো সুন্দর

আজ দোলপূর্ণিমা। সুধার জন্মতিথি।

প্রিয়লাল আজ থেকেই সিগারেট ছেড়ে দেবেন।

ঘুম থেকে উঠেই বিছানার পাশের গোল টেবিলে দেখলেন ঢাকা-দেওয়া জলের গ্লাস, চশমা, ওষুধের বাক্সের পাশে সিগারেটের প্যাকেট। কাল থেকে ছবিটা পালটে যাবে।

কাল সকালে আর এটা থাকবে না।

সিগারেটের প্যাকেটটা খুললেন। গুনলেন। চারটে আছে। শেষ সিগারেটটা টেনেই প্যাকেটটা ফেলে দেবেন। ও-হো, নো-নো-নো। আজ থেকেই তো সিগারেট ছাড়ার কথা। তাই তো প্রমিস ছিল। তো হোয়াই আরেকটা আজ? নো সিগারেট টুডে। চারটেই ফেলে দেওয়া হবে। তবে সাক্ষী রেখে। বাথরুমে যাবার সময় একটু দরকার হয়। কাল রাতে শোবার আগে এসব ভেবেই জোলাপ খাওয়া হয়েছে।

এর আগেই বার চারেক সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা করেছিলেন প্রিয়লাল। কিন্তু সকালের ব্যাপারটার জন্যই ধরতে হয়েছে। কিন্তু এবার নো কম্প্রোমাইজ। ওই বাহ্য-প্রক্রিয়া না হয়ে যাবে কোথায়?

প্রিয়লালের বয়েস এখন তিরাশি। গান্ধীজির বক্তৃতা শুনেছেন, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুভাষবাবুর বক্তৃতাও। হিটলার জিতবে না চার্চিল জিতবে এ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরতেন। জাপানের আত্ম-সমর্পণের পর বাজি জিতে সাঙ্গুভ্যালিতে ফাউল কাটলেট আর ডেভিল খেয়েছিলেন। যাদের সঙ্গে বাজি ধরতেন, তারা কেউ আজ বেঁচে নাই। কিন্তু প্রিয়লালের বাঁচতে ইচ্ছে করে। বেঁচে আছেন বলেই না এই কম্পিউটার দেখে যেতে পারলেন, ঘোমটা এবং জড়তাহীন মেয়েদের, গড়িয়া অবধি মেট্রোরেলটা দেখে যাবার বড্ড শখ।

এমনিতে শরীরটা ঠিকই আছে। সুগার নেই, প্রেসারটা প্রায় ঠিকঠাক। শুধু সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে কষ্ট হয়। তা ছাড়া কাশি হচ্ছে প্রায়ই।ডাক্তার বলেছে সিগারেট ছাড়তে হবে।

প্রিয়লালের তিন ছেলে। বড়ছেলে ত্রিপুরায়, মেজো কেরালায়। ছোটছেলে অনিরুদ্ধ। এখানেই আছেন প্রিয়লাল। বাইশ বছরের পুরনো ফ্ল্যাট। নাকতলা অঞ্চলের প্রথম ফ্ল্যাটবাড়ি বলা যায়। লিফ্‌ট নেই।

এরই মধ্যে বেগ অনুভূত হল। জোলাপের গুণ। বাথরুম-পর্ব সমাধা হল সিগারেট ছাড়াই। প্রথম হার্ডল পেরিয়ে গেলেন। এবারে দাঁত মাজা। একটাও দাঁত নেই, তবু এই প্রক্রিয়াটাকে দাঁত মাজাই বলেন প্রিয়লাল। ডানহাতের তর্জনী, মানে দাঁতমাজার আঙুলে একটু টুথপেস্ট লাগিয়ে মাড়িতে ঘষলেন। ধুতির উপর পাঞ্জাবি এবং জহর কোট চাপালেন। মাফলারও। এখন ফাল্গুন। শীত কি আছে আর? গতকাল রাতে টিভি-তে শুনেছেন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমান ত্রিশ দশমিক পাঁচ, সর্বনিম্ন তেইশ। তেইশ কি ঠান্ডা? যাক, পরেই নেওয়া যাক। সর্দিকাশির ধাত। গত তিন মাসের অভ্যেস পালটাতে তো একটু সময় লাগবেই। বাঁদুরে টুপিটা বাদ দিয়েছেন দিন সাতেক হল। আস্তে আস্তে। তাই বলে সিগারেট আস্তে আস্তে নয়। ওটা হট করেই ছাড়তে হয়।

এবার দেওয়ালের দিকটায় গেলেন। দেওয়ালে একটা শ্বেতপাথরের স্ল্যাব। ওখানে সুধার ছবিটা আছে। ছবিটার সামনে একটা ছোট্ট গেলাস, একটা ছোট্ট রেকাবি। রেকাবিতে সন্দেশ রাখা হয়। সন্দেশটাকে ঘিরে থাকে কালো কালো পিঁপড়ে। কালো মোটা পিঁপড়েগুলোকে 'দ্যাশের' ভাষায়

বলে ডোমা। প্রিয়লাল রেকাবিটাকে নাড়িয়ে দিলেন। ডোমাগুলি এদিক ওদিক ধায়। ধীরে ধীরে। যেন পাশের ঘরের নিদ্রাভঙ্গ না হয়। তারপর আড়মোড়া দেওন। সাবধানে। শরীর বেশি বক্র করলে পিঠে লাগে।

প্রিয়লালের সকালটা এরকম :

পাঁচটা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ—টুথপেস্ট সহযোগে মাড়ি-মর্দন।

(দাঁতটা অকালে গেল। নো প্রবলেম। মাড়িতেই সজনে ডাঁটা খাই। আর্টিফিসিয়াল দাঁত পরি না)

ছয়টা—সিগারেট সহযোগে বাথরুমে প্রবেশ।

সোয়া ছয়টা—প্রাতঃভ্রমণে বাহির হওন। ভট্টাচার্য-মহাশয়, সরখেল-মহাশয়, মৈত্র-মহাশয় ইত্যাদির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, বাক্যালাপ। আজকে বুঝলেন, শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে, কিংবা কুয়াশাটা আজ বড্ড ঘন ইত্যাদি আবহাওয়া-সম্পর্কিত কথাবার্তার পর কারও কণ্ঠে পুত্র-নিন্দা ও পুত্রবধূ-নিন্দা শ্রবণ। যেমন—গতকাল লুচি খেতে দিল, বুঝলেন, বিকেলের করা। চামড়ার মতো শক্ত। কিংবা—গতকাল, বুঝলেন, রাতে ঘুম হয়নি। ওই জন্যই গ্যাস হয়েছে। ঘুম হবে কী করে? খুব অশান্তি গেছে যে! আমার বৌমা আমার স্ত্রীকে হিংসুটে বলেছে। স্ত্রী রাত্রে কিছুই মুখে দিল না।

সাতটা—মিঠাই দোকান থেকে সন্দেশ ক্রয়। দোকানের নাম সুস্বাস্থ্য। দোকানদারের নাম পটল। কী পটল, ভাল আছ! তোমার সন্দেশের সাইজ যে দিনে দিনে ছোট হয়ে যাচ্ছে...। ইত্যাদি।

সোয়া সাতটা—সুধারানির নৈশ পর্দা-উন্মোচন। বাসি সন্দেশটির পিঁপড়া-বিতাড়ন। সন্দেশটি নিজের মুখে দিয়ে এক গ্লাস জলপান। (আগে সন্দেশটি বাইরে কাককে দিতেন। স্ত্রীর প্রসাদ স্বামীর খাওয়া উচিত নয়, তাই। একদিন টেলিভিশনে কৃষ্ণকলি বসু প্রমুখ নারীবাদীর আলোচনা শুনে মত পালটাল। স্ত্রী যদি স্বামীর প্রসাদ খেতে পারে তবে স্বামী কেন... ইত্যাদি)

সাড়ে সাতটা—আত্মজীবনী রচনা শুরু। চা-পান। 'বৌমা, অনিকে একটু সকালে ওঠানো অভ্যেস করাও...ইত্যাদি।

সাড়ে নয়টা—'দাও, খবরের কাগজটা দাও।' খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মন্তব্য করা প্রিয়লালের অভ্যেস। 'ডিক্টেটারশিপ দরকার', 'এদের লাইন দিয়া দাঁড় করাইয়া গুল্লি করা উচিত', 'আহ-হা মামার বাড়ির আব্দার আর কী'—এইসব হচ্ছে প্রিয়লালের পেটেন্ট মন্তব্য। মন্তব্য শুনলেই খবরের বিষয় সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সামান্য জলযোগ-সহ আর এক দফা চা পান।

আজ কিন্তু ওই রুটিন-অনুযায়ী চলছেন না প্রিয়লাল। সকালবেলাতেই সুধারানির ছবির আবরণ সরিয়ে দিয়েছেন। প্রাতঃভ্রমণে গল্পগুজব করেননি। পটলার দোকান থেকে একটা নয়, তিনটে সন্দেশ কিনেছেন। ফুলওয়ালির কাছ থেকে কিনেছেন একগাছি রজনীগন্ধা আর কয়েকটা স্টিক।

প্রিয়লাল বাড়ি এসে মালাটি ছবিতে পরালেন। প্রতিবারই মালাটা দেবার সময় বিয়ের রাতের মালার কথা মনে পড়ে। তখন রজনীগন্ধার চল হয়নি। টগরের মালা ছিল। ছবির পাশে একটা পেতলের ফুলদানি থাকে। ফাঁকা। কালচে হয়ে গেছে। অনেক আগে মাঝে মাঝে কয়েকটা রোগা রজনীগন্ধা ফুলদানিতে থাকত। এখন আর থাকে না। একবার একগোছা প্লাস্টিকের ফুল ওখানে ভরে দিয়েছিল অনি। মানে অনিরুদ্ধ। প্রিয়লাল ওই প্লাস্টিক সরিয়ে রেখেছিলেন।

প্রিয়লালের পুত্রবধূর নাম অনুরাধা। ওদের স্বামী-স্ত্রী নামের ভারী মিল। অনি আর অনু। অনুরাধা, মানে অনু প্রিয়লালের ঘরে এসে দেখল যে ছবিতে মালা। ইস জন্মদিন, দু'বছর হল বিয়ে হয়েছে। গতবছরও দোলের দিন ছবিতে মালা ছিল। জিভ কাটল অনুরাধা। কাল রাত্রেই একটা ভাল মালা এনে রাখা উচিত ছিল। ওর যে কেন এসব মনে থাকে না।

চলে যাচ্ছিল অনুরাধা। প্রিয়লাল বলে—শোনো, বোসো একটু।

এখন কেন বসতে বলছেন। এখন তো আত্মজীবনী শোনার সময় নয়। অনুরাধা দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের বিছানাটার উপর শুয়ে আছে পুবের রোদ্দুর। পুব আর দক্ষিণ খোলা ঘর।

—কী হল, বোসো।

—এখন যে চায়ের জল ফুটছে...

—চায়ের জল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত। পুবের জানালায় আঙুল দেখালেন প্রিয়লাল।

—দ্যাখো, ওই দ্যাখো, বসন্ত। দ্যাখো নিমগাছের কচি পাতা।

অনুরাধা বলল, ওকে বলব বাজার থেকে কচি নিমপাতা নিয়ে আসতে।

প্রিয়লাল বললেন, না না, খাবার জন্য নয়।

—তবে?

—তবে কিচ্ছু না। তোমার শাশুড়িও বুঝত না।

অনুরাধা বুঝতে পারল না। শুধু নিমগাছ দেখবার জন্যই কি ডেকেছেন? এদিকে চায়ের জল ফুটছে, মানে গ্যাস নষ্ট হচ্ছে। অনুরাধা উঠে দাঁড়ায়।

—যাচ্ছ কোথায়? বোসো, কথা আছে।

—চায়ের জল....

জল, না?—জলকে চল। বেলা যে পড়ে এল জলকে চল/ পুরনো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে/ কোথা সে ছায়া সখী অশথতল।

কী ব্যাপার? এটা কি অন্ত্যাক্ষরী খেলা চলছে নাকি?

এই লোকটাকে মাঝেমধ্যেই কীরকম পাগলামিতে পায়। অনুরাধা হাসি হাসি মুখ করে আঁচলের কোণ আঙুলে জড়াচ্ছে।

প্রিয়লাল বললেন, শোনো, ওই ঘরে যখন থাকো, তখন আলখাল্লা-জাতীয় যে ফ্রকটা, যার অপর নাম ম্যাক্সি, সেইটাই পরো। রাত্রেও সেইটাই পরো। আবার সামনে আসনের সময় খামোকা ওইডার উপর শাড়ি প্যাচানোর দরকারটা কী? তোমার মায়ের নির্দেশ আছে বুঝি? কোনও দরকার নাই। কোনও সংকোচ নাই। তোমার যা কমফরটেবল, তাই পরবা। বুঝলা। আমাদের দ্যাশের বাড়িতে, আজ হইতে সেভেনটি ইয়ারস ব্যাক, ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু পরার মানে ছিল মেমগিরি। তোমার শাশুড়ির জন্য আমি সেমিজ নিয়া যাইতাম। গন্ধ-তেল নিয়া যাইতাম, আজকাল তো তোমরা গন্ধ-তেল ইউজই করো না, তাই না? এনি ওয়ে, সম্মান দেখানোর জন্য শাড়ি প্যাচানোর দরকার নাই। বুঝলা?

কত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল, অনি জানলই না। ঘুমুচ্ছে।

টুকুস করে পুবের জানলা দিয়ে খবরের কাগজ গলে পড়ল। ভোটের খবর। বয়েই গেল। অনুরাধা হালকা করে হাসল। নিমগাছের পাখিরা ডাকছে। অনুরাধা বলল, চা-টা নিয়ে আসি বাবা।

প্রিয়লাল বললেন, আরে আসল কথাটাই তো কওয়া হয় নাই, বৌমা, বস, বস।

অনুরাধা খাটের কোনাটায় প্রায় না-বসার মতো করেই বসে যেন মান্য করার জন্যই শুধু।

প্রিয়লাল হাসে।

তখন প্রিয়লালের তামাটে রং-এর মাড়ি, জিভ, জিভের গায়ে আবছা লেপটে-থাকা সকালের খাওয়া কড়াপাকের সন্দেশের পাতলা অবশেষও হেসে ওঠে।

প্রিয়লাল বলে বৌমা, সেবার যখন খুব কাশি হল আমার, তুমি বাসক পাতা ছেঁচে দিলে, কমল না, ক্যাপসুল খেয়েও উপকার নাই, তুমি বললে, বাবা সিগারেটটা ছাড়ুন। কইছিলা তুমি! আজ থিকা, ফ্রম ভেরি টুডে, সিগারেটটা ছাড়লাম। যাও। খুশি তো?

অনুরাধা খুশি। কিন্তু প্রিয়লাল খুশির প্রকাশ দেখতে চাইছেন। কিন্তু অনুরাধা আঁচল উড়িয়ে একপাক ঘুরে নিতে পারে না। শ্বশুরমশাই। কিংবা ভেরি গুড বলে হাতটা এগিয়ে দিতে পারে না। অনুরাধা শব্দ না করে হাসল। বইমেলাতে কেনা ৫০১ মনোহর সত্য কথায় আছে মানুষের হাসিতে ৩০৫টা পেশি কাজ করে।

কী বউমা, খুশি না?

নিশ্চয়ই খুশি। কিন্তু প্রমিসটা স্টেডি তো?

ও ইয়েস্। প্রমিস। ওই জন্যই তো। তোমায় ডাকলাম। প্রতিজ্ঞা করনের জন্য একজন তো সাক্ষী লাগে। প্রমিসটা তোমারেই করলাম। বুঝলা? গয়ায় একটা বটগাছ আছে। অক্ষয়বট। সেই অক্ষয়বটের কাছে পিতার নামে কোনও একটা প্রিয় ফল যে উৎসর্গ করে, সেই ফল জীবনে খায় না। জানো, সেই অক্ষয়বটের গল্প?

অনুরাধা উঠে দাঁড়ায়।

—ও হো, সরি সরি। চায়ের জল। যাও।

অনুরাধা যায়। ছশো নব্বই স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটে এই ঘর থেকে রান্নাঘর তো সাতখানা স্টেপ। সাত পা। প্যানে আর জল নেই। আবার জল দিতে হয়। চা তৈরি করে নিয়ে যায় প্রিয়লালের ঘরে। চা-টা চায়ের টেবিলে রাখতে গিয়ে অনুরাধা প্রিয়লালের মুখের দিকে তাকায়। হাসি বয়ে আনা ঠোঁট দুটো জোড়া লাগলেও দুই ঠোঁটের মাঝখানে তখনও হাসির ফাটল রয়ে গেছে। অনুরাধা চা রাখল। প্রিয়লালের এবার বলার কথা, অনিকে একটু সকালে ওঠা প্র্যাকটিস করাও। কিন্তু বললেন, অনি এখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। আজ ছুটির দিন...।

প্রিয়লাল আত্মজীবনী লিখছেন। প্রিয়লাল জানেন উনি কোনও ভিআইপি লোক নন। একেবারেই এনা-তেনা। এই লেখা কোনওদিন কোথায় ছাপাও হবে না। তবু এটা লিখতে ভাল লাগে। লেখা মানে পুরনো দিনের মানুষের কাছে যাওয়া, হারানো মানুষদের ফিরে পাওয়া। পুরনো দিনের সঙ্গে খেলা করা। প্রিয়লাল বড় বড় অক্ষরে লেখেন। চোখে ছানি। অনুরাধা জলখাবার দিতে এসে দেখে খাতাটা খোলা। ওই খাতায় অনুরাধারও অধিকার আছে। মাঝে মাঝে এমনও হয়, দুপুরের দিকটায়, প্রিয়লাল বলেন, অনুরাধা লেখো।

অনুরাধাকে খোলা খাতার সামনে দেখে প্রিয়লাল বললেন, আমার এখন আঠাইশ বছর বয়স চলতাছে। বুঝলা, আমি এখন কইলকাতা ক্রাউন বোর্ডিং-এ থাকি। পড়ো না বৌমা, ওইখানটা একটু পড়ো...

"আমি, নগেন্দ্র ও কামিনীকান্ত একই ঘরে থাকি। তৃতীয় তল-এ। নগেন্দ্র আমা হইতে কমপক্ষে পাঁচ বৎসরের ছোট হইলেও আমাদের সখ্য ভাব ছিল। তাহার বিবাহ স্থির হইল উত্তরপাড়ায়। সে আমাকে বাঙালদাদা ডাকিত। তাহার বিবাহে আমি সম্পূর্ণ কলকাত্তাই ভাষায় যে পদ্য ছাপাইলাম আজও তাহা বেশ মনে আছে।

কী হে ডিয়ার শুনছি নাকি
ম্যারেজ তোমার আজ
তাই মুখের কালার বদলে গেছে
হাফ হাসি হাফ লাজ...

অনুরাধা চায়ের কাপ নিয়ে এবার নিজের ঘরে যায়। অনিরুদ্ধ পাশ ফিরে শুয়েছে এবার। আজ ওর ছুটি। বড্ড পরিশ্রম ওর। সাড়ে সাতটায় ওঠে, তারপরই তাড়াহুড়ো করে পৌনে ন'টার মধ্যেই বেরুতে হয় ওকে। অনুরাধার এখন কী করা উচিত! আস্তে আস্তে জাগিয়ে দেওয়া ভাল? নাকি ঘরের পর্দাটা টেনে দিয়ে ঘরটা আর একটু আঁধার করে দেবে? কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল অনুরাধা। উঠে যাওয়া লুঙ্গিটা একটু নামিয়ে ঠিক করে দেবে? ঘুম ভেঙে যায় যদি? এভাবে যদি ভাঙে, যদি ওঠে, ভালই। তাই করল অনুরাধা। ঘুম ভাঙল না। শেষকালে টিভির উপরে নটরাজ মূর্তির কাছে পড়া থাকা চানাচুরের বয়াম আর কাচের গেলাসটা নিয়ে গেল রান্নাঘরে। ভাল করে ধুয়ে নিল। কী হবে জলখাবার? ছুটির দিনগুলোতে এরকম সমস্যা হয় অনুরাধার। কেন যে এরকম হয়। লাস্ট শনিবার ওরা শুয়েছিল রাত এগারোটার মধ্যেই। অনি ওকে টেনে নিয়েছিল। অনুরাধার তেমন সাড়া ছিল না। অনিরুদ্ধ দু-এক মিনিট পরে ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, কী হল, তোমার ইচ্ছে নেই অনু? অনুরাধা কী করে বোঝাবে তখন ওর মন ছিল অন্য জায়গায়। রাত পোহালেই রবিবার।

ও ভাবছিল রবিবারের জলখাবারের কথা। পরোটা না লুচি? পরোটা হলে আলু ডুমো ডুমো কাটা হবে। লুচি হলে ঝিরি ঝিরি। নাকি রুটি। গত রবিবার পরোটা হয়েছিল। রুটি হলে বাটি-চচ্চড়ি। মনে এইসব ভাবনা থাকলে ওইসব হয়?

সম্বন্ধ করা বিয়ে। খবর কাগজের। শাশুড়ি নেই জেনে মা বলেছিল— অনেক স্বাধীন থাকবি, কিন্তু ঝামেলাও আছে। তুই বুঝে দেখ। অনুরাধার মনে হয়েছিল কিছু ডিসিশন নিতে হবে, এই তো...

আজ নতুন কিছু করতে ইচ্ছে করছে অনুরাধার। শাশুড়ির জন্মদিন। রান্নার বইটা খুলল অনুরাধা। কচুরি করতে গেলে আগের দিন ডাল ভিজিয়ে রাখতে হয়। দহিবড়া? তাতেও ডাল ভিজোতে হয়। নান? —পাঁচশো ময়দার সঙ্গে আড়াইশো দই মেখে অন্তত ছ'ঘণ্টা রেখে দিন...। সকালে কি পকোড়া ভাল? ...সিঙাড়া... ওই তেকোনা খোলটাই করা যাবে না... উপমা...। উপকরণ সুজি, সরষে, কারিপাতা, আদা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, কাজুবাদাম...। সবই আছে, শুধু কারিপাতাটা নেই। উপমা দু-চারবার খেয়েছে অনুরাধা, সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে। আর একটা মিষ্টি করলে কেমন হয়? মালপোয়া? দুধ, মৌরি, ময়দা, ঘি সবই তো আছে। ইস, রাত্রে যদি মনে পড়ত। সব গুছিয়ে রাখা যেত।

কাল খুব খুশির দিন গেছে ওর। ওর সব কথা শুনতে হয়েছে। সব আব্দার। সব অসভ্যতা। কাল ও একটা স্কুটার কিনল কিনা! চিত্তে মহরম। বিয়ের পর থেকেই শুনে আসছে—স্কুটার, স্কুটার। 'বুঝলে অনু, পুরনো স্কুটার হার্গিস কিনব না। অশান্তি। ইনসেনটিভের টাকাটা পেলেই...'

টার্গেট ছাড়িয়ে বিক্রি না হলে ইনসেনটিভ হয় না। তাই টার্গেট ক্রস করার জন্য কয়েক মাস ভীষণ পরিশ্রম করেছে অনুরুদ্ধ। আঠারো হাজার টাকা ইনসেনটিভ পেয়েছে। বুঝলে, হুস হুস করে বেরিয়ে যাব স্কুটারে। তুমি ভয়ে জড়িয়ে ধরবে আমাকে। সল্টলেকে তোমার দিদির বাড়ি যাব। আমার বন্ধু অংশু, কী জমাটে ছেলেটা। এমন বেখাপ্পা জায়গায় থাকে, তিনবার বাস চেঞ্জ, কিন্তু দূরে নয় তেমন। একটা স্কুটার হলে...। স্কুটারটা কিনলে কিন্তু রোববার বিকেলে বেরোব। এভরি সানডে'।

সেই স্কুটার গতকাল কেনা হয়েছে। নিজে চালিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। আগে বন্ধুদের স্কুটারে চাপত। স্কুটারের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল নতুন সালোয়ার কামিজ। খুব পছন্দ হয়েছিল অনুরাধার। ফলে একদম অন্য মুডে ছিল অনিরুদ্ধ। ওর ছোটবেলাকার স্ট্রাগলের কথা বলেছিল, সাইকেল চুরি যাওয়ার পর গভীর দুঃখের কথা বলেছিল। সব নিয়ে কাল রাতটা অন্যরকমের ছিল। ভাল লাগার। ভুলে যাবারও। তাই কিছুই গুছিয়ে রাখা হয়নি।

এই গোছানো নিয়ে অনির কত অভিমান। ও তো বোঝে না ব্যাপারটা। আজকাল শুতে এলে অনি জিজ্ঞাসা করে সব 'খুচুর খাচুর' শেষ হয়েছে? খাটের তলায় চোর আছে কি না দেখা হয়েছে, ফ্ল্যাশ ট্যাঙ্কের ভিতরে নেই তো? দেখা হয়েছে? আরে বাবা, খোঁটা মারলেই হবে! দিব্যি তো লুঙ্গিটুঙ্গি পরে নীল আলো জ্বালিয়ে সিগারেট খেয়ে একদম রেডি। কিন্তু অনুরাধা কি তক্ষুনি শুতে যেতে পারে? এক্সট্রা তরকারি ফ্রিজে ঢোকাতে হয়, গ্যাস ওভেন পরিষ্কার করতে হয়, চাবি ঘুরিয়ে সিলিন্ডার বন্ধ করতে হয়, দই পাততে হয়... অনুরাধার খুচুর খাচুর আর শেষ হয় না। কতদিন অনি কোলবালিশ জড়িয়ে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে রয়েছে। গা ধরে ঠেলা দিলেও অভিমান যায় না। এতই যদি ইয়ে, তা হলে আমার সঙ্গে একটু হাত লাগালেই তো পারো। তা করবে কেন, ব্যাটাছেলে না।

মালপোয়া ভাজতে ভাজতে অনুরাধা শুনল—'ইস। এদের ইয়েটা কাইট্রা ফালাইতে হয়।' খবর কাগজ পড়ছেন বাবা। কমেন্ট। জলখাবার নিয়ে প্রিয়লালের ঘরে গেল। খবর কাগজে শ্বশুর কর্তৃক পুত্রবধূ ধর্ষণের খবরে প্রিয়লালের চোখ। অনুরাধাকে দেখে প্রিয়লাল তাড়াতাড়ি কাগজটা উলটে রাখেন। বলেন, এইডা কি মালপোয়া?

—আজ্ঞে।

—বাঃ। আর এইডা কী?

—উপমা।

—কীসের? কীসের উপঅমা?

—ঝাল সুজি।

সুধা ওর জন্মতিথির দিনে এই কাণ্ডটা করত। নতুন নতুন পাক করত। কিন্তু মালপোয়াটা করতই।

—আচ্ছা, আমি যে মালপোয়া ভালবাসি তুমি কি কইরা জানলা?

—আমি তো এটা জানতাম না...

—সত্য?

—হ্যাঁ। সত্যি জানি না। ভালই হল।

—কী কইরা জানবা। অনির দশ বছরের মাথায় ওর মায়ের মৃত্যু। ওর কি মনে আছে এইসব? মনে থাকার কথা নয়। ভাল হইছে। মালপোয়াটা ভেরি গুড। একটু ক্ষীর পড়লে আরও বেটার হইত। হাজিরা ক্ষীর ছিল বিখ্যাত। নাটাগড়ের সন্তোষ হাজরার দোকানের মাখনের মতো ক্ষীর, বোঝলা, হাজরার নাম হইতেই ওই ক্ষীরের নাম হইল হাজিরা ক্ষীর...।

অনুরাধা উশখুশ করে। এবার যাই।

শোনো, শোনো, একটা মজার গল্প।

না বাবা, পরে শুনব। ওকে চা দিয়ে আসতে হবে...

যাও।

বুড়ো রাগ করল। কী করবে অনুরাধা। নইলে ও আবার রাগ করবে। অনুরাধা বলল, হাত খালি হলেই আসছি।

অনি এফ এম-এর রেডিয়ো মির্চি শুনছে। ভাল লাগল অনুরাধার। চা নিয়ে গেলে অনি হাত ধরে টানল। ম্যাক্সির উপর প্যাঁচানো শাড়িটার বাহুল্য দূর হল। অনুরাধা বলল, এখনও সেই গন্ধ। কালকের। অনিরুদ্ধ বলল, এখনও? কাল বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম।

এরকম খেয়ো না। অনুরাধা বলল।

খাই কোথায়? দেখছ তো রেয়ার। কাল হুপে হয়ে গেছে। খুশিতে। ইনসেনটিভ কি এমনি এমনি দিয়েছে? আমাদের যে নতুন প্রোডাক্টটা, পেপসিন্‌স্‌, আমার রিজিওনে আমারই হাইয়েস্ট সেল। তা ছাড়া যত মেথোফেন হাইড্রোক্লোরাইড ফর্মুলার কাফ সিরাপ আছে, তার মধ্যে আমার এরিয়ায় আমার মার্কেট শেয়ার এখন ফর্টি পার্সেন্ট। আমাদের চিপ মার্কেটিং ম্যানেজার আমাকে পার্সোনালি কনগ্রাচুলেট করেছে। বুঝেছ! এই যে ইনসেনটিভটা পেলাম, ওটার জন্য মিত্রসাহেব ওপরমহলে রেকমেন্ড করেছিলেন। গ্ল্যাক্সোর মতন কোম্পানি ট্রাই প্রলিডাইন হাইড্রোক্লোরাইড-এর সঙ্গে মেথানল দেওয়া একটা নতুন প্রোডাক্ট এনেছে বাজারে। দারুণ বটলিং। ওরা ডাক্তারদের বোরোসিলের জার দিচ্ছে, আরও কত কী দিচ্ছে। ভেবেছিলাম ওদের সঙ্গে পারব না। আমি ডাক্তারদের কনভিন্স করলাম, বোঝালাম ট্রাই প্রলিডাইনের কোনও ফাংশন নেই...

এইসব হাবিজাবি শুনতে হয় অনুরাধাকে। বউ যে। অনুরাধা শুনছে আর মাথা নাড়ছে।

এবার অনিরুদ্ধ বলল, আজ সন্ধের সময় একটু মিত্রসাহেবের বাড়ি চলো।

মিত্রসাহেবের বাড়ি? আমি তো ওদের চিনি না। তারচেয়ে দিদির বাড়ি চলো, জামাইবাবুকে আবির মাখাব বেশ...।

না, মিত্রসাহেবের বাড়িতেই চলো। এতগুলো টাকা ইনসেনটিভ পাইয়ে দিলেন। যাওয়াটা ভদ্রতা নয়?

তো আমি কেন?

বাঃ! ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়াটাই তো ভদ্রতা।

সে তো পরে একদিন গেলেও হয়। দোলের দিনেই যেতে হবে কী মানে আছে! বরং দিদির বাড়ি চলো। জামাইবাবুকে...

ঠিক আছে। তোমার কথাই থাক, তোমার দিদির ওখানেই চলো, জামাইবাবুকে আবির মাখাও... জামাইবাবুর হাতের আবির খাও...

বেরোনো মানে তো আবার দায়িত্ব। নিজেরা না হয় দিদির বাড়িতেই খেয়ে আসব, কিংবা বাইরে কোথাও। বাবা? দুপুরবেলা কিছু ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।

এবার খবর কাগজটা অনিরুদ্ধ ভাগাভাগি করে পড়বে। তারপর দুপুরের রান্না জোগাড়।

কাগজটা আনতে প্রিয়লালের ঘরে যায় অনুরাধা। ম্যাক্সির উপর আর শাড়িটা প্যাঁচানো নেই।

প্রিয়লাল দেখলেন অনুরাধাকে। বললেন, বাঃ।

অনুরাধা মাথা নিচু করে।

প্রিয়লাল বললেন, হাতে সময় আছে একটু? উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে পড়তে লাগলেন— "সেবার দেশে যাইবার সময় একটা কৌটা হিমানী কিনিলাম। রোল্ড গোল্ডের কয়েক গাছি চুড়ি এবং এরোপ্লেন-ভাঙা হাতা-খুন্তি ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্র এরোপ্লেন-ভাঙা নামে পরিচিত ছিল। কলিকাতা হইতে ফিরিলে কী আনিয়াছি দেখিবার জন্য পাড়া-প্রতিবেশী ভিড় করিত। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল মুসলমান প্রতিবেশী। আমাদের চাষ ভাগে করিত। জহিরুদ্দিন চাচা। তাঁহার স্ত্রীকে বলিতাম বড় চাচি। তাঁর ছেলে আলিমুদ্দিন। তাঁহার সুন্দরী স্ত্রীকে বলিতাম ধলাভাবী। তাঁর স্বামী আলিমুদ্দিন আমার পিতার হোমিওপ্যাথিক ঔষধে বাঁচিয়া উঠিয়াছিল। আলিমুদ্দিন আমার পিতাকে বাপ ডাকিয়া সেই চিকিৎসার দক্ষিণা দিয়াছিল। আলিমুদ্দিন বাড়িতে খেজুর রস জ্বাল দিত। কতদিন ভাবীর হাতছানি পাইয়া কাঁঠাল পাতায় সদ্য-প্রস্তুত খেজুর গুড়ের চাঁচি খাইয়াছি। তাহারা সবাই আমি কী আনিয়াছি দেখিবার জন্য সমবেত হইলে আমি গোপনে হিমানীর কৌটাটি সরাইয়া রাখি। ব্যাগ হইতে একে একে জিনিসপত্র বাহির করি। কোনও প্রসাধন সামগ্রী না দেখিয়া আমার স্ত্রীর গোরা মুখ শুকাইয়া গেল। আমি মিঠা মিঠা হাস্য করিতে লাগিলাম। সেইদিন রাত্রে আমি হিমানীর কৌটাটি তাঁহার করকমলে প্রদান করিলাম। সে আনন্দে আপ্লুতা হইয়া গেল। তারপর হে-হে-হে...।"

অনুরাধা মুখ টিপে হাসে। বলে, এবার যাই।

রাস্তায় হোলি হ্যায় বেরিয়ে পড়েছে। পিচকিরি নিয়ে কয়েকটি বালক। অনুরাধা দুপুরের রান্না করে।

এইভাবে সন্ধে হয়। সন্ধের মুখে মুখে দুটো পাঁচতলা বাড়ির মাঝখান দিয়া চাঁদ ওঠে। প্রিয়লালের ঘরের পুবের জানালা দিয়ে ফাল্গুনের চাঁদ দেখা যায়। মৃদুমন্দ বাতাস। নিমগাছের পাতা নড়ে।

অনুরাধা সেজেগুজে ওই ঘরে আসে। বলে বাবা, বলেছিলাম না, দিদির বাড়ি যাব, এবার যাচ্ছি। আপনি ততক্ষণ টিভি দেখুন।

আজ ইচ্ছে করে না।

তা হলে গানটান শুনুন।

প্রিয়লাল বললে, বোসো, একটু বোসো। বেশি দেরি করাব না। বড্ড বোর করি, না? কাল থেকে আর করব না। প্রিয়লাল একটা ফুলস্কেপ কাগজ দেখান। কাঁপা অক্ষরে কিছু নাম। বললেন, দুপুরবেলায় বইস্যা বইস্যা একটা লিস্টি করতে ছিলাম। যাদের কাছে আমি ঋণী। এর মধ্যে অবশ্য মা-বাবাকে ধরি নাই। এক নম্বর পঞ্চানন। আমার বাল্যবন্ধু। আমাকে সাঁতার শিখাইয়াছিল। তারপর যোগেন্দ্র মিত্র। আমারে প্রথম রবিবাবুর বই পড়ায়। গোলাম মোস্তাফা। কবি গোলাম মোস্তাফা। আমারে উপদেশ দিছিলেন, অপসন দিয়া ইন্ডিয়ায় যাও। জহিরুদ্দিন, রায়টের সময় তাঁর ঘরেই...। পুলক সিংহ। আমার চাকুরিদাতা। এভাবে, পঁচিশ নম্বরে অনুরাধার নাম।

আজ একবারও ধূমপান করি নাই, বোঝলা, ওই দ্যাখো সিগারেটের প্যাকেট। সামনে আছে, তবু ফেলি নাই। তোমার সামনেই আমি এটা ফেলে দেব। এই বয়সে ক্যানসার হইলেই বা কী, না হইলেই বা কী, আর হার্ট অ্যাটাক হইলেই বা কী! আমি শুধু তোমার কথা রাখলাম।

অনির মা-ও ধূমপান ত্যাগ করার জন্য কত কইত, শুনি নাই। তোমার কথা শুনলাম। তোমার কাছে অনেক ঋণ। ঋণশোধের অন্য রাস্তা তো জানা নাই...।

প্রিয়লালের হাত অনুরাধার হাত ছুঁয়েছে। প্রিয়লালের চোখে জল।

বাইরে চাঁদ। অনিরুদ্ধ স্কুটার বের করেছে। বসেছে স্কুটারের উপর। স্টার্ট দিয়েছে। ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়। আসলে অনুরাধাকে ডাকছে।

প্রিয়লাল বলেন, এইবার তোমারে সাক্ষী রাইখ্যা সিগারেটের প্যাকেটটা ফালাইয়া দিতাছি। দ্যাখো।

অনুরাধা বলল, ঠিক আছে, শেষ সিগারেটটা খেয়ে নিন। আজই শেষ।

তাই? কইতাছ? সো নাইস অফ ইউ। তা হলে ধরাই? দিস ইজ দি লাস্ট সিগারেট। সিগারেট ধরালেন প্রিয়লাল। প্যাকেটটা বাইরে ফেলে দিলেন। বললেন, তিনটা ছিল। ধোঁয়া ছাড়লেন। মুখে হাসি।

প্রিয়লাল বললেন, বৌমা, আমারে টেপ রেকর্ড চালাইয়া গান শুনতে কইলা। তুমিই একখান গান করো না ক্যান? তুমি তো গান করতা প্রথম প্রথম। তোমারে যে দেখতে গেছিলাম, তুমি কোন গানটা গাইছিলা মনে আছে? 'ওই শুনি চরণধ্বনিরে শুনি আপনমনে।' মনে আছে? একবার গাও না বৌমা। বহুদিন শুনি নাই।

অনুরাধা জানালায় হাত দেখায়। বলে দু'মিনিট। তারপর আস্তে আস্তে গেয়ে ওঠে— 'ওই শুনি যেন চরণধ্বনিরে। শুনি আপনমনে/ বুঝি আমার মনোহরণ আসে গোপনে।'

স্কুটারের স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়।

অনুরাধার গান থামে না।

মেঝের ধুলোয় গড়াগড়ি যায় সকালের খবর কাগজ। খবরের কাগজের মন খারাপের খবর।

মাতৃশক্তি, অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৫

আর্সেনিক ভূমি

অসুস্থ অবস্থায় বাবা বলেছিলেন দেশের জন্য কিছু করিস। এখানে 'দেশ' বলতে ভারতবর্ষকে বোঝাতে চাননি বাবা, একটা ফেলে আসা গ্রাম বোঝাতে চেয়েছিলেন, নাম বাকিলা, বাদুড়িয়া থেকে কাঁচা রাস্তায় চার মাইল, গোমতী নামে একটা বাঁওড় আছে, যেখানে ইছামতীর প্রাচীন জল আটকে রয়েছে। ইছামতী ওর ইচ্ছামতো সরে গেছে দূরে, পুরনো খাতে জল রয়ে গেছে কিছু, নোনা জল, খাওয়া যায় না, কিন্তু পাখি আসে। বাকিলা গ্রামেই আমার জন্ম, আমার বাল্য ও কৈশোর কেটেছে। বাকিলার গোমতী বাঁওড়ে সাঁতার শিখেছি, বাকিলার কাঁচা রাস্তায় সাইকেল চালিয়েছি, বাকিলার প্রাইমারি ইস্কুলে পড়েছি, হাইস্কুল ছিল না, সুন্দরপুরে যেতে হত। আম পেড়েছি, মাছ ধরেছি, ঢাক বাজিয়েছি, কত সুন্দর সব স্মৃতি, আবার অনেক অপমানও লেগে আছে। নমঃশুদ্দুর ছিলাম কিনা।

দেশের বাড়িতে যাইনি বহুকাল। মনে হয় গত তিরিশ বছর যাইনি। আমেরিকা থেকে প্রতিবছরই একবার আসি, কোনও কোনও বছর দু'বারও। এত টাইট স্কিডিউল থাকে যে বাকিলাতে যাওয়া হয় না। দেশের বাড়ির সঙ্গে বাবারও সম্পর্ক নেই বহুকাল। তবু দেশে এলে দেশের বাড়ির কথা হয়। বাবা খুশিতে বলেন—গ্রামে, বুইলি, ইলেকটিক এয়েলো। কিংবা, শুনিচিস, রোড হয়ে গেল, পাকা রোড। বাদুড়ে থেকে বাকিলা এখন পাকা রোড। শুনচি বাসও চলবে। বাবার খুব অনন্দ হয়। যদিও আমাদের ওখানে আর জমিজমা নেই বহুদিন। আমাদের আত্মীয়দের সঙ্গে খুব একটা সুসম্পর্কও নেই। আসলে আমরা হচ্ছি চাষি। আমাদর খুব বেশি জমিজমাও ছিল না। আমার বাবা নিজে হাতে জমি চাষ করতেন। আমার দাদুর নাম ছিল ভোলানাথ মণ্ডল, অন্যের জমিতে চাষ করতেন। উনি নাকি গাছ-লতা-পাতা-শেকড়ের নানারকম ইউজ জানতেন। বাড়িতে হার্বাল মেডিসিনের চাষও করতেন। বামুন-কায়েতরা না এলেও অন্যরা মানে আমাদের মতো ছোট জাতের লোকেরা দাদুর কাছে আসত। দাদু নাকি খুব একটা পয়সাকড়ি নিতেন না। কোনও ডিম্যান্ড ছিল না। জামিদারের নায়েবের অর্শ সারিয়ে দিয়ে দু'বিঘা চাকরান জমি পেয়েছিলেন। তাতেই দাদুর খ্যাতি হয়ে যায়। অনেকেই দাদুকে ভোলা কোবেরেজ বলত। সবাই এটা ঠিকভাবে নিত না। কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি কালে কালে কী হল। চামচিকেও পাখি হল, ভোলাও কবিরাজ হল। আমার বাবা ছিলেন দাদুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। দাদু এরপর আরও জমি বাড়িয়েছিলেন, জলপড়া-টলপড়া দিতেও শুরু করেছিলেন। বাঁজা গোরু-ছাগলের গাভীন হবার জন্য, স্বামী নেয় না এমন মেয়েছেলের স্বামী বশ করার জন্য নানারকম তুকতাকও শুরু করেছিলেন। ভোলা কবরেজ আস্তে আস্তে ভোলা ওঝা হয়ে ওঠে। স্বামী নেয় না, এমন এক মহিলা আমার দ্বিতীয় ঠাকুরমা হলেন। সেই ঠাকুরমাকে আমি দেখেছি, কিন্তু আসল ঠাকুরমা যিনি আমার বাবার মা, তাকে আমি দেখিনি কোনওদিন, যে আম গাছটায় ঠাকুরমা গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়েছিলেন সে গাছটা আমি দেখেছি। ওই গাছের আম আমরা খেতাম না। গাছটাকে বলা হত ফাঁসের গাছ। ঠাকুরমা গলায় দড়ি দিয়েছিল ফাল্গুন মাসে। তখন নিশ্চয়ই আমগাছে বকুল ছিল, কোকিলও ডাকছিল...

আমার বাবার নাম নব মণ্ডল। ঠিক করে বলতে গেলে নবকুমার মণ্ডল। আমার পাসপোর্টে ওই নামই আছে। বাবার ডেথ সার্টিফিকেটেও। নব মণ্ডলের ছেলে আমি রামপ্রসাদ মণ্ডল। পাসপোর্টে তাই আছে, কিন্তু আমেরিকাতে আমি র‍্যাম মেনডাল। আমি সুন্দরপুর হাইস্কুল থেকে স্কুলফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করি। র‍্যাংকও করেছিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হই। স্কলারশিপ পাই।

স্কলারশিপের টাকা ছাড়াও টিউশনির টাকা ছিল। হোস্টেলে থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে দেশে পাঠাতাম। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতাম। ওখানেই শুনি লব আজকাল লবাব।

আমার দাদুর ছিল ছয় ছেলে। প্রথম পক্ষের ছেলে আমার বাবা। দ্বিতীয় পক্ষের পাঁচ কাকা। তার মধ্যে একজন বোবা। দাদুর মৃত্যুর পর জলপড়ার ব্যাপারটা একমাত্র ওই বোবা কাকুরই ক্লিক করেছিল। আই এস সি পাশ করে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হই। আমার বাবার তখন খুব খারাপ অবস্থা। আমার আরও দুটো বোন, মা মিলে চারজনের সংসার। কিন্তু ইনকাম নেই। জমি অনেক ভাগ হয়ে গেছে, যেটুকু জমি বাবা ভাগে পেল তাতে চলে না। বাইরেও কাজ পায় না। কে কাজ দেবে, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হতে চলেছে না? হোস্টেলে যখন পেটপুরে খেতাম, বোনদের কথা ভাবতাম, মায়ের কথা ভাবতাম। হোস্টেলে থাকতে হত বাইরে টিউশনি করতে পারতাম না। স্কলারশিপের টাকায় আমার হয়তো চলে যেত, কিন্তু হবু ইঞ্জিনিয়ারের বাপ-মাকে না খেতে থাকতে হত। সে এক দিন গেছে বটে। একদিন মা বলেছিলেন— তোর তো অঙ্কে খুব মাথা। ওই সব ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়ে সুন্দরপুরের হাই স্কুলে একটা মাস্টারি নিয়ে নে। আমি বলতাম, আর অল্প ক'টা দিন অপেক্ষা করো মা। মা বলতেন, এখনও কতগুলো দিন...। হোস্টেল পালিয়ে টিউশনি করেছি। যা পেয়েছি বাড়িতে পাঠিয়েছি।

পাশ করেই চাকরি পাই। দুর্গাপুরে। কোয়ার্টার পেয়েছিলাম। আমার ফ্যামিলিকে দেশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসি আমার কোয়ার্টারে। কিন্তু মুশকিল হল স্কলারশিপ পাবার পর। ইলিনয় ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টারস ডিগ্রি করার জন্য স্কলারশিপ পেয়ে গেলাম। ওদের আবার দেশে পাঠিয়ে দেব? দেশে যাবার কথা উঠতেই বোনেরা কেমন ফিউজ হয়ে যেত। ওরা তো ততদিনে ইউনিফর্ম পরে ইস্কুলে যায়, মাখনকে বাটার বলে, ডিমভাজাকে ওমলেট। আমি যা হবার হবে ভেবে একটা বাড়ি ভাড়া করলাম। না, কলকাতায় নয়, দুর্গাপুরেই। বোনেরা ওখানেই পড়ছিল কিনা। বাবা হচ্ছেন চাষি মানুষ। হাতে খুরপি নিয়ে দিনে অন্তত ঘণ্টাখানেক মাটি নিড়োতে না পারলে বাবার মন ভাল থাকে না। আমার কোয়ার্টারের পিছনে এক চিলতে জমিতে বাবা ব্যস্ত থাকতেন। ঝিঙে-ঢ্যাঁড়শের গোটা দশেক গাছ, তারপর ওই গাছগুলো উঠিয়ে দিয়ে পালং, কপি, টমেটো। একবার বললেন, একটু পাট করব ভাবচি, বীজ আনিস তো...। আমি বলি, তিন ছটাক জমিতে পাট করবে? পঞ্চাশটা ডাঁটিও তো হবে না...। বাবা বলেছিলেন, এখন পাটের সময় কিনা। ছোটবেলা থেকে করিচি, অব্যেস হয়ে গেছে। বাবা হচ্ছেন এই টাইপের লোক। দুর্গাপুরে ড্যামের কাছাকাছি সারদাপল্লিতে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। একটু জমিও ছিল। পরে ওই বাড়িটাই কিনে নিয়েছি। বাড়িটা বাড়িয়েছি, দোতলা করেছি। এখন দোলনা সমেত ব্যালকনি, দুটো ঘরে এসি বসিয়েছি। আমরা এলে গরমে কষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের ঘরেই থাকবে, বাবা-মার ঘরে এসি থাকবে না, সেটা কী করে হয়! চারটে ঘরে এটাচ্‌ড টয়লেট তার মধ্যে একটায় বাথটাব। ফাঁকা জমিটায় সাইপ্রাস, ইউক্যালিপটাস, আর ট্রপিকাল পাইন লাগিয়েছি। বাবার ইচ্ছেয় কদম। আমাদের দেশের বাড়িতে কদম ছিল। যতদিন পেরেছেন, বাবা খুরপি হাতে, নিড়ানি হাতে, কাস্তে হাতে বাগানে নেমেছেন। বাবা সব কিছু কিনেছিলেন। শাবল, কোদাল, সব। বোধহয় একটা হাল লাঙল কিনে রাখারও ইচ্ছে ছিল মনে মনে। এই আট কাঠা জমিতে একটা ধানখেত, একটু পাটের জমি। একটু পাট পচাবার ডোবা, একটু গোবর গাদা, একটু গোমতীর বাঁওড় ঢুকিয়ে রাখার ইচ্ছে ছিল মনে মনে।

দেশের জমিজমা সামান্য যেটুকু ছিল, সেটা ছেড়ে দিয়েই আসতে হয়েছিল। দেশে গিয়ে একবার সৎ ভাইদের বলেছিল ওই জমিজমার বিনিময়ে কিছু পয়সাকড়ি দিতে। আমি তখন ইলিনয় ইউনির্ভাসিটির ছাত্র। স্কলারশিপের টাকা বাঁচিয়ে দুর্গাপুরে কিছু কিছু পাঠাচ্ছি। অভাবেই ছিল ওরা। বাবা কিন্তু সম্পত্তি পায়নি। শুধু শুনেছে লব তো লবাব হয়েছিস আজকাল।

বাবার অভিমান হয়েছিল। দেশের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে দেশের বাড়িটা বুকে করে

বসে থাকতেন। কোনও মুড়িই দেশের বাড়ির মতো নয়। কোনও জলেই দেশে বাড়ির জলের স্বাদ নেই। এখানকার শিউলি ফুলের গন্ধ দেশের বাড়ির শিউলির গন্ধের মতো কিছুতেই নয়। দেশের পুকুরের পুঁটিমাছটিও অনেক বেশি রুপোলি।

আমারও হত আমেরিকায়। মেক্সিকান আম খেয়ে মনে হত ওগুলোকে কেন আম বলা হচ্ছে। মাছের কোনও স্বাদই লাগত না। কিন্তু আস্তে আস্তে আমেরিকা অভ্যেস হয়ে গেল। ওদের সব কিছুই ভাল লাগতে লাগল। এখন যখন দেশে আসি, পৃথা সুটকেস ভরে নিয়ে আসে সাবান, ক্রিম, ওষুধ, কুকিজ...। আমরা বিস্কুটকে কুকি বলি, লজেন্সকে ক্যান্ডি। পেট্রোলকে এখানে অনেক সময় গ্যাস বলে ফেলি। এখানে ওরা বোঝে না। পৃথা তো কয়েক লিটার জলও নিয়ে আসে। হট করে এখানকার মিনারেল ওয়াটার খেতে ও ভয় পায়। ইশ, কী যে হল আমাদের, জল ভীতি?

বাবা যখন অসুস্থ ছিলেন, এসেছিলাম। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কলকাতার নাম্বার ওয়ান নার্সিংহোমে বাইপাস সার্জারি করিয়ে দিলাম। ভালই ছিলেন, এরপর আবার নানা উপসর্গ। তিন মাস পর এলাম আবার। কিডনি, লিভার, লাং, কিছুরই ফাংশন ভাল নয়। ডেটোরিয়েট করছেন, ডাক্তাররা বলেই দিয়েছেন রিভাইব করার চান্স্ নেই। কিন্তু আমি কতদিন থাকব? আমার তো কাজকর্ম আছে। কিন্তু মুশকিলটা এমনই, যাব, হয়তো গিয়েই খবর পাব এক্স্পায়ার্ড। তখন আবার আসতে হবে। যাতায়াতের খরচার জন্য বলছি না, জেটল্যাগও তো আছে। তা ছাড়া স্কিডিউল র‍্যাপচার হয়ে যায়। বিছানার পাশে বসে থাকলে বাবা যখন বলতেন—এটাই আমার শেষ শয্যা, আমি বলতাম, না বাবা, ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু বলতে লজ্জা করছে, আমি মনে মনে বলতাম, যা হবার হয়ে গেলেই তো হয়। বাবার মৃত্যু কামনাই তো ওটা! বাবার পাশে বসলে বাবা মাঝে মাঝে বলতেন, দেশের জন্য কিছু করিস।

বাবার মৃত্যুর সময় আমি ছিলাম না। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আসি। বাড়িতে যা পাঠাতাম, বাবা খরচ করতেন না, জমাতেন। বাবা কোনও বিলাসিতা করতেন না। কিছুতেই সিগারেট খাননি। বিড়িই খেতেন। প্রথম প্রথম বলতেন, লজ্জা করে। পরে বলতেন, পোষায় না। মোটা ধুতি পরতেন। চালটা সরু কিনতেন। সেটাই বিলাসিতা ছিল। বাড়িতে মাঝে মধ্যে কীর্তন বসাতেন। তাতেই কিছু খরচা-টরচা হত। একটা হরিসভা আছে বেনাচিতিতে। ওখানে নাকি বেশ কিছু টাকা ডোনেট করেছিলেন। মা আমাকে বেশ কিছু কাগজপত্র বের করে দেখাল। দেখলাম বেশ কয়েক লাখ টাকা রেখে গেছেন। মায়ের সঙ্গে, আমার সঙ্গেও কয়েকটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল। আমিই বা কী করব টাকা। আমার টাকার অভাব নেই। আমার বয়েস এখন ফিপটি নাইন প্লাস। পঁয়ত্রিশ বছরের উপর স্টেট্স-এ আছি। পঁচিশ বছর হয়ে গেল ওদেশের সিটিজেনশিপ নিয়েছি। গত বিশ বছর ধরে রোটারিয়ান। দুর্গাপুরের রোটারি ক্লাবকে আমরা প্রচুর হেল্প করি। ওরা কী সব আই হসপিটাল করেছে, ওদের দশ হাজার ডলার আমি পারসোনালি দিয়েছি। ওরা স্পাসটিক্স আর হ্যানডিক্যাপড্দের জন্য কিছু একটা করতে চায়, প্রতিবন্ধী বিকাশ কেন্দ্র নাম দিয়েছে। ওখানেও আমি দশ হাজার ডলার আগেই দিয়েছি।

বাবার মৃত্যুর ছ'মাস পরে আবার এলাম। মাকে নিয়ে যাব ভাবছি। মা কিছুতেই যেতে চান না। একবারই নিতে পেরেছিলাম বাবা-মাকে। ওখানে ওদের একদমই ভাল লাগেনি। খুব অস্বস্তিকর অবস্থা। সেটা অন্য গল্প। এবার একটু বেশি ছুটি নিয়ে এসেছি। মায়ের ভিসা করাব নতুন করে। বাড়ির একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বাবার নামে কিছু চ্যারিটি করব। বাবার ইচ্ছে ছিল দেশের জন্য কিছু করা। ভাবছি দেশের বাড়িতেও যাব।

এদেশের গরম সহ্য হয় না আমার। দুর্গাপুরের বাড়িতে দুটো ঘরে এসি বসানো আছে। বাবা চালাতেন না। আমি এলেই চালাই। বাকিলা যাবার জন্য একটা গাড়ি ভাড়া নিতে হবে। পৃথার বাপের বাড়ি সল্টলেক-এ। ওখানে আমার এক শ্যালক আছে এখন। ওখানেই গেলাম। একটা গাড়ি ভাড়া করে দিতে বললাম। এয়ার কন্ডিশন গাড়ি। ওরা একটা ইন্ডিকা ভাড়া করে দিল। দু'লিটার

মিনারেল ওয়াটার নিলাম। আশা করি হয়ে যাবে। ফ্লাস্কে একটু চা-ও দিয়ে দিল অনুরাধা, মানে শ্যালকের বউ।

বহু বছর পর বারাসতের রাস্তায়। যশোর রোড একই রকম। পুরনো গাছগুলো মনে হচ্ছে কিছু কমে গেছে। রাস্তা একই রকম ভাঙাচোরা। রাস্তার দু'পাশে একই রকম টালির চালের দোকান। রোগা রোগা গোরু। বারাসত পেরুতেই ধানখেত দেখলাম। আহা ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে মনে পড়ল। কোন কবিতায় ছিল? আগের লাইনটা কী ছিল—কিছুতেই মনে পড়ছে না। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি। একটা কোরাস। গাড়ির কাচ নামিয়ে দিই। হাওয়া আসুক। ধানখেত দাপিয়ে আসা হাওয়া। কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল, কোন দেশেতে চলতে গেলে দলতে হয়রে দুর্বা কোমল...। পরের লাইনটা কী? কিছুতেই মনে পড়ছে না। কোথায় নাচে দোয়েল শ্যামা চাতক বারি যাচেরে মনে পড়ছে। শেষ লাইনে ছিল সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলারে। সব ভুলে গিয়েছি। গাছেরা নুয়ে পড়েছে। আমগাছ, কাঁঠালগাছ, আর কী সব গাছ। এইসব গাছের নাম জানতাম একদিন। পাখিদের নাম মনে নেই। আকাশে মেঘ। ওগুলো কিউমুলাস আর অল্টোকিউমুলাস। পোস্ট রেইনি-সিজন্ ক্লাউড্স্। শরৎ! শরৎ! অগস্ট মাস তো শরৎ। এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে। সকালবেলায়... কী যেন... কী যেন...। জাল ফেলে মাছ ধরছে জেলে। আমিও পারতাম, কত জাল ফেলেছি জলে। এই জলে এখন কি আমার এলার্জি হবে? গোরুর গাড়ি দেখলাম, ছাগলচরানি বালিকা দেখলাম, আলপথ দিয়ে আলতা রাঙা পায়ে হেঁটে যাওয়া ঘোমটা পরা বউ দেখলাম। সব কিউরিও দৃশ্য। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। ভালবাসি? না, এই গান গাইব না। লজ্জা করে।

এই গান গাওয়া হয় ওদেশে। বাংলাদেশিরা মাঝে মধ্যে ফাংশন-টাংশন করে, এই গানটা খুব হয়। গানটাই হয়, স্কেল মেনে, কিছুটা স্বরলিপি মেনে পৃথাও গায়। সত্তরের গোড়ায় রবীন্দ্রসংগীত না জানলে বাঙালি মধ্যবিত্ত মেয়েদের বিয়ে হত না। এখন যেমন কম্পিউটার। পৃথা গাইলে আমার মেয়েরা কিছু বোঝে না। বলে ডোনট্ ক্রাই মাম্মি ইন দি নেইম অফ মিউজিক। আকাশ থেকে জরির ঝালর ঝুলছে। সোনা রোদ। সারা আকাশ-মাঠে যেন ঢাক বাজছে। পুজোর ঢাক। আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে।

আমাদের ওই গ্রামগুলি ঢাকিদের গ্রাম। পুজোপার্বণে ওরা পিঠে ঢাক নিয়ে শহরে চলে যায়। অনেক মুসলমানও হিন্দুদের পুজোয় ঢাক বাজাত। এখনও বাজায় কি না জানি না। আমার একটা বন্ধু ছিল জয়নাল। দুটো কাঠি দিয়ে ইস্কুলের বেঞ্চিতে ঢাক বাজাত, বড় বড় কচুপাতার উপরেও ঢাক বাজাত। ও বলত, তুই যা বলবি, আমি তাই বাজিয়ে দেব।আমি বলতাম, কই মাছ কানে হাঁটে পুঁটি মাছ ফরফর, ও বাজিয়ে দিত। ওর ঢাকের ভিতর থেকে এইভাবে স্পষ্ট শুনতে পেতাম বোঁদে খাব মণ্ডা খাব খাব আলুর দম। ফেল করেছি বেশ করেছি ঢাক বাজাব বিলে। একবার মিত্তির বাড়ির দুগ্‌গা পুজোর দিনে ভটচায্যি বামুনকে ছুয়ে দিয়েছিলাম বলে মিত্তিরদের ছেলে আমাকে থাপ্পড় মেরেছিল। ওর বাবার সঙ্গে ঢাক বাজাতে এসেছিল জয়নাল। বাবার হাত থেকে কাঠি টেনে নিয়ে জয়নাল ঢাক বাজিয়েছিল। আমি যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম জয়নাল বাজাচ্ছে— একদিন আসবে একদিন আসবে আমাদের দিন।

জয়নাল, আমার কিন্তু দিন ফিরেছে। তুই কেমন আছিস জয়নাল?

বাদুড়িয়ার মোড় এল। গ্রামে ঢোকার রাস্তাটার মোড়ে বটগাছটা এখনও আছে। ঝুরি নেমেছে। গাছের গায়ে টিনের ফলকে হাজি বদরুদ্দিন ফকিরের বৈজ্ঞানিক তাবিজের বিজ্ঞাপন, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি দ্বারা নির্বিঘ্ন গর্ভপাতের জন্য ফতিমা ক্লিনিক, আর কম্পিউটার শিক্ষার নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান রাধামাধব কম্পিউটার একাডেমি। গাছতলায় একটা শনি মন্দির হয়েছে দেখলাম। একটা নীল বোর্ডে লাল হরফে লেখা দেখলাম সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নলকূপের জলে বিপদসীমার বেশি আর্সেনিক আছে। ওই জল পান করিবেন না।

তার মানে এদিককার জলে আর্সেনিক আছে বুঝি? আমি আমার মিনারেল ওয়াটারের বোতলটা আঁকড়ে ধরি।ইনটারনেটে দেখেছিলাম বটে, এদিককার কতগুলো ব্লক যেন অ্যাফেকটেড। ব্রাজিল, মেক্সিকো, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়াকেও এই প্রবলেম। আমাদের দেশের বাড়ির জলেও কি আর্সেনিক আছে? গভর্নমেন্ট কি সারফেস ওয়াটার ট্রিট করে পাইপলাইনে পাঠাচ্ছে? ব্রাজিল কিংবা মেক্সিকোতে যা হচ্ছে। কয়েকটা আমেরিকান কোম্পানি এই কাজ করে, আর্সেনিক ফ্রি জল বিক্রি করে পয়সা নেয়। কোম্পানিগুলো মুখিয়ে আছে কোথায় নতুন করে আর্সেনিক দেখা দিল। আমি ওরকম একটা কোম্পানির কনস্যালটেন্ট ছিলাম কিছুদিন। এখানকার মানুষ আর্সেনিক জলের বদলে কী জল খায়?

এই রাস্তা দিয়েই তো বাদুড়িয়া আসতাম সার্কাস দেখতে, যাত্রা দেখতে। স্কুল জীবনে বাদুড়িয়াই ছিল আমাদের অবন্তীনগর। আমি টাটা ইন্ডিকার নীল নীল কাচের ভিতর দিয়ে ফেলে আসা রাস্তাটা দেখি। রাস্তার মানুষদের দেখি। বয়স্ক মানুষ যারা, তারা আমার সময়েরই লোক। ওদের দিকে ভাল করে দেখবার আগেই গাড়ি সামনের দিকে চলে যায়। ঘণ্টা শুনলাম, ঠিক বুঝতে পারলাম ওটা আমাদের স্কুলের ঘণ্টা। মদন বাজায়। ওই তো, সুন্দরপুর কৃপাসিন্ধু আদর্শ হাইস্কুল। আমাদের এস কে হাইস্কুল। খেলার মাঠটা এখানে আছে দুটো গোলপোস্ট সমেত। ধনঞ্জয় ছিল খুব ভাল গোলকিপার। খুব লম্বা। ওকে লম্বু ডাকতাম। ও নিজেকে ভাবত সনৎ শেঠ। আমাদের স্কুল জীবনে ধনরাজ ছিল, আমেদ ছিল, উমরিগড়-মানকড়-পঙ্কজ রায় ছিল, সত্য চৌধুরী, বেচু দত্ত। হীরালাল সারখেলের গান ছিল, আর হেমন্ত মুখুজ্যে। কিশোরকুমারও। আমি যখন আমেরিকা যাই, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম পৃথিবী আমারে চায় রেখো না বেঁধে আমায়। স্কুলের মাঠে গাড়িটা থামাই।

সিমেন্ট খোদাই করা সত্যমেব জয়তের মধ্যে অনেক নোংরা জমেছে। কলতলাটার টিউবয়েলটা একটা বস্তা দিয়ে ঢেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। যে ঘণ্টা বাজায়, সে মদন নয়। হেডমাস্টারমশাই নিশ্চই অন্য কেউ, কোনও পুরনো স্যারই নেই। হেডস্যারের ঘরটা একই জায়গায় আছে, ঘরের সামনে একটা ফ্রেম লাগানো কাঠের বোর্ড, সেখানে সাদা রং-এ লেখা আমাদের প্রতিষ্ঠানের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে যাহারা:

১। রামপ্রসাদ মণ্ডল। ১৯৫৮ দ্বাদশ স্থান

২। উত্তম মিত্র। ১৯৯৮ চতুর্দশ স্থান

এই উত্তর মিত্র নিশ্চই মিত্তির বাড়ির কেউ। যে বাড়ির দুর্গাপুজোয় বামুন ছুঁয়ে দিয়েছিলাম বলে মার খেয়েছিলাম। ও বাড়ির ছেলে চল্লিশ বছর পরেও আমাকে বিট করতে পারেনি।

স্কুলটাকে দেখি। বাথরুমের বাজে গন্ধটা আসছে। চারিদিক মলিন। দেয়াল নোংরা, সিমেন্ট উঠে গেছে। ইটও বেরিয়ে পড়েছে। স্কুলটার জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করল। এক হাজার ডলার দিয়ে দিলে বোধহয় কিছুটা সংস্কার হয়। আমি হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করি। হেডমাস্টারের বয়েস আমার চেয়ে কম। আমি আমার পরিচয় দিতেই হেডস্যার দাঁড়িয়ে পড়লেন। হেডস্যারই উলটে আমাকে স্যার ডাকতে লাগলেন। বলছিলেন, আমি আগেকার স্যারদের কাছ থেকে আপনার কথা শুনেছি। আপনি এই স্কুলের শুধু নয়, এ তল্লাটের গৌরব। আমিও এই স্কুলেরই ছেলে। আপনি যেবার স্কুল ছাড়লেন, আমি সেবার ক্লাস ফাইবে ভরতি হলাম। আমার বাড়ি মহেশতলা। আপনার গাঁয়ের পাশেই। আপনি এসেছেন, আমাদের কী সৌভাগ্য! এখন তো ক্লাস হচ্ছে, টিচাররা সবাই ক্লাসে। আপনি কাউন্ডলি বসুন, আমি টিচারদের ডাকি, ছাত্রদেরও মাঠে ডাকছি। আপনি ওদের কিছু বলুন। ওরা উৎসাহ পাবে। ওরা নিজের চোখে দেখবে এই অঞ্চলের মানুষ এখন আমেরিকায় গিয়ে...

আমি বলি, ওসব করার দরকার নেই। তবে আমি এখনও আমার নিজের ঘরে যাইনি। ওখানে যাচ্ছি। চল্লিশ বছর পর বাড়ি যাচ্ছি। তবে বেশিক্ষণ থাকব না। ফেরার সময় স্কুলে নামব। কথা আছে।

হেডস্যার বললেন, চল্লিশ বছর প্রথম যাচ্ছেন? ইতিমধ্যে যাননি?

আমি মাথা নাড়াই।

—খবর-টবর রাখেন তো?

আমি বলি আমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এক কাকা মারা গিয়েছিলেন খবর পেয়েছি। খুড়তুতো ভাইদের খবর জানি না। আমি আমার ভিটেটা একটু দেখব, দেখতে ইচ্ছে করছে।

—তা হলে ওসব কিছু জানেন না।

—ওসব মানে?

—গেলেই দেখতে পাবেন।

একথা বলেই চুপ করে গেলেন হেডস্যার।

কীরকম একটা সাসপেন্স্ গায়ে মেখে গাড়িটার দিকে এগিয়ে যাই। হেডস্যারও আমার পিছন পিছন আসেন। সঙ্গে কেরানি, পিওন, আরও তিন-চারজন মাস্টারমশাই। ওরা বললেন, আপনার অপেক্ষায় থাকব। আমি গাড়িতে ওঠার আগে বস্তা জড়ানো টিউবওয়েলটা দেখি। হেডমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করি, ছেলেরা কী জল খায় তা হলে? হেডস্যার বলেন, কেন এই জলই খায়। কী করবে! বস্তাটায় কলের মুখের কাছে ফুটো করে নিয়েছে স্যার। বাড়ি থেকে জল আনলেও তো ওই একই ব্যাপার। এ তল্লাটে সব টিউবওয়েলের জলেই তো আর্সেনিক।

একশো থেকে পাঁচশো ফুট পর্যন্ত জলে আর্সেনিক থাকতে পারে। এমনিতে মাটির তলায় আর্সেনিকের যে পিরাইট্স থাকে, সেটা জলের সঙ্গে থাকতে পারে না। অক্সিজেন মিশলে আস্তে আস্তে জলে মিশতে পারে। মাটির ভিতর থেকে জল তুলে নেয়া হচ্ছে বলে মাটি একটু করে ফোঁপড়া হচ্ছে, ফলে অক্সিজেন ঢুকছে। ঢুকে আর্সেনিক পিরাইট্স্কে ওয়াটার সল্যুবল করে দিচ্ছে। এ অঞ্চলে এটাই ফেনোমেনন। মাটির গভীর পিরাইটস লেয়ার অক্সিডাইস্ড হতে পারে না, তাই সাত-আটশো ফিট তলার জলে আর্সেনিক কনটামিনেশন হয় না। স্কুলে কি একটা লম্বা পাইপের টিউবওয়েল বসানো যায় না? টাকার অভাব? আমি দেব। কিন্তু স্কুলে নয় হল। বাড়িতে?

গাড়ি এগোচ্ছে। আর একটু এগোলেই বাঁ দিকে গোমতী বাঁওড়টা দেখা গেল। অফুরন্ত সারফেস ওয়াটারের সোর্স। যদিও কিছুটা স্যালাইন, কিন্তু আয়নিক এক্সচেঞ্জের রেজিন দিয়ে স্যালাইনিটি নষ্ট করে দিতে কি খুব খরচ হবে? মিড্ল ইস্টে, আরবে সমুদ্রজল ডিসটিল করে দিচ্ছে। অথচ আমাদের এত জল। হাটতলা এল। হাটতলায় রাস্তার ধারে ঝুপড়িইগুলোর সামনে ওরা কারা দাঁড়িয়ে? দিনদুপুরে সাজগোজ করে? এরা কী রকম মেয়ে? ব্রথেল?

মিত্তিরদের বাড়ি। মিত্তিরমশাই, আমি রামু। মিলিয়ানিয়ার। আমাকে মেরেছিলেন একদিন। ভটচায্যিবাড়ি। আপনাদের বাড়িতে আমার পরিবারের লোকেরা কাজ করত। আমাদের তোলা জলে আপনারা পা ধুতেন, স্নানও করতেন, পান করতেন না। ওই বাড়ির সামনেই গাড়িটা দাঁড় করালাম।

ওখান থেকে আমাদের বাড়িটা একটুখানি হেঁটে। বাঁশঝাড়ের পিছনে।

গাড়িটা থামতেই কয়েকজন ছুটে এল। ওরা সবাই তিরিশের নীচে। আমায় দেখেনি। কী চাই? কাকে চাই জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম, কবিরাজবাড়ি যাব।

—কবিরাজবাড়ি মানে?

কবিরাজবাড়ি নামেই পরিচিত ছিল। আমার দাদু চিকিৎসা করতেন কিনা... আমি বলি মণ্ডলবাড়ি।

একটি ছেলে একটু বেশি এগিয়ে এল। ভ্রু কুঁচকাল। কিন্তু ওর ভ্রুতে চুল নেই বললেই হয়। বলল—ওই কবরেজবাড়ি যাবেন? কী কেস্? ওই বাড়ি তো ডাকাতবাড়ি। শুধু বোবা মণ্ডলের ফ্যামিলি রয়েছে, আর খাঁদু মণ্ডল। বাকিরা চলে গেছে গ্রাম ছেড়ে। কেউ কেস খেয়ে জেলে আছে। আপনি কার সঙ্গে দেখা করবেন?

আমি একটু চুপ করে যাই। আমার পরিচয়টা দেয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছি না। আমি শেষ অব্দি বলি— আমি ওদের আত্মীয়, বহুদিন পরে আসছি। ছেলেটি নিজের পরিচয় দেয়। ও নাকি মেম্বার। পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি। ওর দেড় হাজার ভোটার আছে বলতে গিয়ে ডান হাতের আঙুলগুলো মেলে গ্রাম দেখাল। তখন দেখলাম ওর আঙুলগুলোয় কালচে ছোপ। আর্সেনিকোসিস হলে যেমন হয়। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার যে ভ্রুর চুল পড়ে যাচ্ছে, নখের রং কালচে হয়ে যাচ্ছে, কেন জানেন তো?

ছেলেটা মাছি তাড়াবার মতো কালচে আঙুল সমেত হাতটা বাতাসে নাড়িয়ে বলল—জানি তো। এ অঞ্চলে অনেকেরই আছে। হাটবারে হাটে গেলি বোঝতেন।

—চিকিৎসা করানো হয় না?

—হাসপাতাল যাই। ওষুধ নিয়ে আসি। সেই কবে ইস্তক শোনছি কলকাতার মতো পাইপে জল সাপ্লাই হবে। টাকার অভাবে হয় না। টাকা চলে যায় কলকাতার ওভারব্রিজে, কিংবা ধরেন, কবিতা উৎসবে। শুনছি কী একটা ফিল্টার বসবে। বি ডি ও সাহেব বলছিল। জানি না কবে হবে। হবে না। এখানে কিছু হবে না। এখন এটা আমাদের জীবনের অঙ্গ। এজন্যই তো এ অঞ্চলের অনেকে ডাকাত হয়ে যাচ্ছে।

—আর্সেনিকের সঙ্গে ডাকাতের সম্পর্ক কী? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

ওই মেম্বার নয়, অন্য একটা ছেলে, অনেক কম বয়েস, বলল—কেন ডাকাতি করব না বলেন, এমনিও মরব, অমনিও মরব। কী দাম আছে জেবনের? ওই তো একটা নিরীহ ছেলে আটতিরিশ বছরে জলের বিষে মরে গেল। ডাকাতি করতে গেলে রিস্ক রয়িচে। লোকে পিটিয়ে মেরি দিতি পারে। কিন্তু কিছু দোষ না করে শুধু তেষ্টার পানি খেয়েও মিত্যু। তা কী করব?

ছেলেটার বয়স কত? আঠারো? আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ। স্পর্ধায় নেয় মাথা তুলবার ঝুঁকি।

—জানেন, আমাদের বে-থা হয় না। কে আমাদের গাঁয়ে মেয়ে দেবে মরার জন্য? আমাদের কিচ্ছু নেই। ঘর, সংসার, জেবন; খালি ভোট আছে। একটা করে ভোট আছে।

আমার কিছু বলার ছিল না। তবে মনে মনে একটা হিসেব করে ফেলেছি— দশ থেকে পনেরো লাখ খরচ করলে হাজার দশেক লোককে বাঁওড়ের জল ট্রিটমেন্ট করে সাপ্লাই করা যেতে পারে।

পঞ্চায়েতের মেম্বার বলল—তো কী করব বলুন। যারা চুরি ডাকাতি করছে, কী বলবেন আপনি ওদের? যেসব ইয়ং ইয়ং ছেলেরা, বে-থা করতে পারছে না, ওরা যদি হাটতলায় চুমকিদের ঘরে যায়, কী বলবেন ওদের!

ছেলেটা একটু থামে। বলে, স্যার, হাটতলায় আগে ওদের একটা-দুটো ঘর ছিল। কাদের কথা বলছি বুঝছেন নিশ্চয়ই, এখন ঘর বাড়ছে। বড় নেতারা এধারে এলে বলে ছি ছি, এসব কী, উঠায়ে দাও। আমরা বলি, আগে খাবার জল দাও, পরে উঠোচ্চি। এই মেয়েছেলেগুলান কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কেউ নয়। দূর থেকে এসেচে। এই জলই খায়। খেতে বাধ্য। জেনেশুনেই খায়।

অন্য একটি ছেলে বলে, এই পানি খেলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বুঝা যায় না কিনা, আস্তে আস্তে মারে। আপনি স্যার কোথায় থাকেন, কলকাতা নিশ্চয়?

আমি মাথা নাড়াই।

—ডাকাতবাড়ির কেমন আত্মীয় আপনি, কিছুই জানি না। আপনি কি পুলিশের লোক?

আমি বলি, একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বহুকাল আসিনি কিনা।

—সত্যি বলতেছেন?

—হ্যাঁ, সত্যি তো।

—ওদের বাড়ির একজন নাকি আমেরিকায় থাকে। সাইনটিস্ট। বোবা ওঝার সৎ ভাই-এর ছেলে। তার কুনো পাত্তা নাই। সে এলে নিচ্চই গাঁয়ের কিছু হত। ওরা আমার সঙ্গেই থাকে। ওদের

হঠাতে পারি না। মেম্বার ছেলেটি বলে—বোবা ওঝা যে, জলপড়া দিত, তার হাত নাই, দুটা হাতই নাই। কবজি থেকে কাটা।

—কেন?

—ডাকাতি করার আগে বোবা মণ্ডলের কাছ থেকে বশীকরণ ধুলো নিয়ে যেত। অনেকের বিশ্বাস ওই ধুলো ছড়িয়ে দিলে ডাকাতিতে বিঘ্ন হয় না। একবার এক ডাকাতের দল বোবা মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে গেছিল। পাঁচ বছর আগে। ও নাকি আলসে খিলেন করতে পারত। মন্তর পড়ি দিলে ডাকাতদের কেউ ধরতে পারবে না। সেবারই ধরা পড়ল। খুব পিটুনি খেল স্বরূপনগরে। ওই দলে ওই মণ্ডলবাড়ির গনা মণ্ডলের একটা ছেলে ছিল। বাচ্চু। মরে গেল। আর বোবা মণ্ডলের দুই হাত কবজির তলা থেকে চপার দিয়ে কেটে দিল। হাসপাতাল, তারপর জেল। এখন বাড়িতেই আছে।

ফাঁসের গাছটা দেখলাম। আর সেই কদম গাছটাও। উঠোনের তিন দিকে ভাঙাচোরা ঘর। বোবা মণ্ডলের সামনে আমি দাঁড়াই। আমি দাঁড়াতেই আমার কাকার মুখ থেকে অদ্ভুত কিছু শব্দ বেরুতে থাকে। ওটা যে উচ্ছ্বাসের শব্দ, আমি বেশ বুঝতে পারি। সমুদ্রের ঢেউ পাড়ে এসে ভেঙে পড়লে এরকম শব্দ হয়। কাকার কবজি কাটা দু'হাত সামনে তোরণদ্বারের মতো। আমি কাকার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে বাইরের কদমগাছ থেকে বুলবুলির শিস শুনি। কাকার কবজি কাটা দু'হাত আমার দু'কাঁধে। চোখ থেকে জলের ধারা। তারপর হাত দুটো উঠে যায়। কখনও জয়ধ্বজার মতো উপরে ওঠে, কখনও নৌকোর বৈঠার মতো দু'পাশে নড়ে। আর মুখ থেকে অনর্গল শব্দ, নানা রকমের। চল্লিশ বছরের ইতিবৃত্ত বলে যাচ্ছেন কাকা। ওঁর আর্তি, অভিমান, অভিযোগ...।

অন্যান্য ঘর থেকেও সবাই এসে গেছে। বউ, ঝি, বাচ্চারা। ওরা সবাই আমার রক্তসম্পর্কের পরিজন, অথচ ওদের কারওরই নাম জানি না। আমি ওদের কারুর কারুর দাদা কারুর জেঠু। কারুর ভাসুর, কারুর দাদু। আমি কোনও বাচ্চার চুলে বিলি কিটে দিতে যাই, ওরা মাথা সরিয়ে নেয়। কোনও বাচ্চার থুতনি ধরে আদর করতে যাই, ওরা মুখ সরিয়ে নেয়। বোবাকাকু ওদের কিছু বলেই চলেছে। আমি বাচ্চাগুলোকে দেখি। ওদের নখগুলো এখনও সাদা। হাতগুলো এখনও নরম। চোখের ভ্রূগুলো সুন্দর। বউ-ঝিরা সবাই মোটামুটি ভালই রয়েছে দেখলাম। একজনকে দেখলাম মুখ ফুলেছে। চোখের পাতায় চুল নেই, হাতগুলো খরখরে। ওর চক্ষুপলকহীন চোখের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, রামুদা আপনি এলেন? আমি নীরবে মাথা নাড়ি।

লোকটা বলল—আপনি আমাকে বিয়োগ অঙ্ক শিখিয়েছিলেন। বোবাকাকুর মুখটা তখন হাসিতে ভরে উঠল। উনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন আমাকে। ওদেরকেও চিনতে পেরেছে। ওকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ও গত ছ' বছর ধরে ভুগছে। হালে ওর কিডনি দুটো গ্যাছে। আর্সেনিক কিডনি খারাপ করে দেয়। আমি জানি। ওর নামই খাঁদু। আমার কোনও এক কাকার ছেলে। ও নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বছর আট-দশের ছোট হবে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে আমার চেয়েও বুড়ো। ও আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল। ওর হাঁটতে কষ্ট হয়। কথা বলতেও। ও জিজ্ঞাসা করল, কী মনে করে এলেন। আমি বললাম, কিছু নয়, এমনিই দেখতে এসেছি।

ওর কাছ অনেক কথাই শুনলাম। দুই কাকার ছেলেরা কী ভাবে ডাকাতদলে ভিড়ে গেল, মার খেয়ে কী করে একজন মরে গেল, দুই কাকার মৃত্যু...অনেক কথা। কিচ্ছু চাইল না। টাকা পয়সা কিছু না। বউকে বলল চা করতে। চা খেলাম। আর্সেনিক আছে, তবে একদিন খেলে কী হবে?

খাঁদুর ভাল নাম বিলাস। ও বলল দেরিতে বাচ্চা হয়েছে। একটাই বাচ্চা। বাচ্চাটা দেখলাম। সাত-আট বছর বয়েস মনে হল। ঘাড়টা হেলে রয়েছে। মুখ দিয়ে লোল গড়াচ্ছে। হাত-পা দুটো সরু সরু। স্প্যাসটিক? খাঁদু বলল, অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। বলছে সারবে না। বলছে প্লাসটিক বাচ্চা।

দুর্গাপুরের একটা সংস্থাকে আমি অলরেডি অনেক টাকা ডোনেট করেছি। ওরা বলেছিল আমি যদি কোনও স্প্যাসটিক ও প্রতিবন্ধী বাচ্চাকে রেকমেন্ড করি, ওরা নিয়ে নেবে। এই বাচ্চাটাকে ওখানে দিয়ে দিতে পারি।

আমি বলি, বাচ্চাটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি স্প্যাসটিক সোসাইটিকে দিয়ে দেব। বাচ্চাটা ভাল থাকবে। চিকিৎসারও চেষ্টা হবে যতটা পারা যায়। বাচ্চাটার ভার আমি নিচ্ছি। বলেই মনে হল এতক্ষণে দেশের জন্য বোধহয় কিছু করতে পারলাম।

খাঁদু কী যেন চিন্তা করল। তারপর বলল—নারে দাদা। সেটা হবে না। আমি তো আর ক'দিন পরেই মরে যাব। তারপর বউ কী নিয়ে থাকবে। বাচ্চাটাকে খাওয়ানো হাগানো শোয়ানো...। আমার বাচ্চাটা তো বড় হবে না কখনও...বউটা আরও কিছুদিন বাচ্চা নিয়ে থাকতে পারবে।

ফিরব। গাড়িতে উঠলাম। কদমগাছটা বলল, আবার এসো। পাখিটা বলল, সি ইউ এগেইন। একটা প্রজেক্ট কি দেব? দশ-বারো লাখ টাকার। তিরিশ হাজার ডলার। এতগুলো টাকা এই গ্রামের জন্য, যেখানে আর আসব না কোনওদিন। নাকি ইস্কুলটায় কিছু দিয়ে দি, একটা পাথরে ডোনার হিসেবে বাবার নাম থেকে যাবে...

সুন্দরপুর স্কুলের সামনে রাস্তার ধারে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। আমার গাড়িটার জন্য অপেক্ষা করছিল বোধহয়। এত কম সময়ের মধ্যে পাতা দিয়ে তোরণ তৈরি করে ফেলেছে। স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ছেলে। কাগজে লাল কালি দিয়ে লিখেছে স্বাগতম।

মনে হল ড্রাইভারকে বলি চলে চলো। এখানে নামব না। এতগুলো বাচ্চার সামনে কী বলব? আমি কি বলতে পারব তোমাদের বিশুদ্ধ খাবার জলের ব্যবস্থা করে দেব আমি? আমি একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, জন্মভূমির জন্য দশ-বারো লাখ টাকা খরচ করতে আমার দ্বিধা হচ্ছে কেন? আমার তো অনেক টাকা। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি বিশুদ্ধ জল পান করছি। আর্সেনিক আস্তে আস্তে মারে। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বিশুদ্ধ জল, জীবাণুহীন জল কি আমার আত্মাকে আস্তে আস্তে মেরেছে?

ড্রাইভারকে বলি গাড়ি থামাতে। শুনি ঢাক বাজছে।

জয়নাল জয়নাল ঢাক বাজাচ্ছে। জয়নালকে কোথায় পেল ওরা?

জয়নালের সামনে দাঁড়ালাম। ভাবা যায়? এত বছর পর। জয়লালের মুখে মুচকি হাসি। জয়নাল হাতের কাঠিটা ধরেছে মুঠো করে। যে ভাবে ঢাকিরা কাঠি ধরে ওরকম নয়। জয়নালের আঙুলগুলো ফুলে রয়েছে, চামড়া খড়খড়ে, কালচে।

আমায় দেখে জয়নাল বাজনা থামায় না। ও বাজিয়ে চলে। ওর মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছি জয়নাল জিজ্ঞাসা করছে আমায়, বল তো কী বাজাচ্ছি? জয়নাল বাজিয়ে চলেছে। আমি জয়নালের দিকে তাকিয়ে আছি। ও বাজাচ্ছে। কথা বেরিয়ে আসছে ওর ঢাক থেকে। নিবিড়, গভীর কোনও কথা। কিন্তু কী কথা বুঝতে পারছি না। এতদিনে কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে গেছে অনেক। আমি ওর বাজনার বোল বুঝতে পারতাম, এখন পারছি না। তবে ওর প্রত্যেকটা শব্দ আমার বুকে এসে লাগছে। ওই শব্দের মধ্যে ভীষণ আর্তি টের পাই আমি।

ছেলেরা সব দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষায়। ময়লা আঁচল বিছিয়ে বসে আছে আমার আর্সেনিক ভূমি। কেন চেয়ে আছ গো মা...

শারদ পরিচয়, ২০০১

ঝড়ের পাতা

রত্না যখন ওর নামটা লেখে, র, তয়ে দন্ত্যন আকার দিয়েই লেখে, কিন্তু বলে ফেলে অতনা। ঠিক মতো অতনাও বলে না, বরং অদনা। যেমন রক্তকে বলে অক্ত, রস কে বলে অস, ডোমকলের বাজারে একটা নতুন রামমন্দির হয়েছে, ওরা বলে আমমন্দির। আবার 'আমজান মাসে রোজা হয়।' ওই প্রথম-র নিয়েই গোলমাল। নইলে শাহরুক খাঁন-কে শাহরুকই বলে, সৌরভকে সৌরভ, করিম কে করিম। কিন্তু আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঠিক মতোই রবীন্দ্রনাথ বলতে পারে। ইস্কুলে তো রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কবিতা আবৃত্তির সময় বলেছে—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা বলছি। অথ যাত্রা লোকারণ্য মহা ধূমধাম...

রত্না ক্লাস এইট অবধি পড়েছে। নাইনে উঠেও ছিল। এ প্লাস বি হোলস্কোয়ার এখনও মুখস্থ। পৃথিবীর ম্যাপে ইরান-ইরাক আরব-মক্কা কোথায় আছে জানে। ধন্য আশা কুহকিনী কবিতার আটটি ছত্র এখনও বলে দিতে পারবে। কিন্তু ক্লাস নাইনে ডোমকল ইস্কুলে আর ভরতি করায়নি রত্নার মা। ওখানে নাইন থেকে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। ওখানে মেয়েরা বেশি পড়ে না, ছেলেরা বেশিরভাগই মুসলমান। রত্নার মায়ের সাহস হয়নি।

আমরা রত্না রত্না বলছি বটে, কিন্তু আসলে তো ও আদু। মানে অদনা থেকেই আদু। ও যখন ইস্কুলে পড়ত, মেয়েরা ক্ষেপাত অদনা—পাইখানার বদনা।

আদুদের গ্রামের নাম দাউদপুর। মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থেকে আট কিলোমিটার দূরে ওদের গ্রাম। যেরকম গ্রামের কথা বইতে লেখা থাকে ওদের গ্রাম ওরকমই। ওদের গ্রামে বড় বটগাছ আছে, বটগাছের তলায় পিটাই পিরের মাজার আছে, বটগাছের লাল লাল ফল মাজারের উপর পড়ে। ইস্টিকুটুম পাখি আছে, খেজুরের রস খেতে আসে, বসন্তকালে কোকিল আছে, গাইবাছুরের হাম্বা আছে, ভোরের আজান আছে, কারবালার মাঠ আছে, ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে আছে। আগে মনে হত এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। এখন টিভি দেখে মনে হয় পৃথিবীতে আরও কত কী আছে। কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি, রাস্তা, গাড়ি, বেহেস্তের বাগান, কত সুন্দর মেয়ে, বেপর্দা, তবু যেন হুরি।

দাউদপুর গ্রামে পাঁচঘর মোটে হিন্দু, বাকি সব মুসলমান। রত্নার বাবা লোহার কাজ করে। কামার। তিন ঘর কামার। দুই ঘর তাঁতি। তাঁতিরা কেউ তাঁতের কাজ করে না আর। আর কামার বলতে শুধু রত্নার বাবাই। অন্য দুই ঘর রত্নাদেরই জ্ঞাতি। একঘর সাইকেল সারাইয়ের দোকান দিয়েছে ডোমকল বাজারে, অন্য ঘরের দুই ভাই বাসের কনডাক্টার। ওদের মায়ের শ্রাবণ মাসে মনসার ভর হয়।

হিন্দু-মোসলমানে ঝগড়াঝাঁটি নেই। গুজরাটে যখন গণ্ডগোল হল, তখনও কিছু হয়নি। ইরাক থেকে ওর স্বামী ক্যাসেট পাঠিয়েছিল। তাতে বলা ছিল, দাউদপুরে তুমাদের ঘরে যদি খোদা না করে কিছু হয়, তবে উরা সবাই মিলা যেন আমাদের ঘরে এসে থাকে।

হ্যাঁ, রত্নার স্বামী মোসলমান। প্যার মহাব্বতের বিয়ে। এ নিয়ে ঝামেলা একটু হয়েছিল বইকী। রত্না মোসলমান হয়েছিল। নাম হয়েছিল রাবেয়া। রাবেয়া হলে কী হবে, ও তো আদুই। শ্বশুরবাড়ির সবাই ওকে আদু বলেই ডাকে। আদু বেস্পতিবারে সন্ধ্যার সময় জায়নামাজ পেতে মনে মনে লক্ষ্মী লক্ষ্মী করে। ওর শ্বশুরবাড়ির সবাই এটা জানে, কিন্তু কিছু বলে না। আদুকে কলমা শিখিয়েছে ওরা,

কিন্তু ওর ওসব মুখস্থ হয় না। বড় বিদঘুটে লাগে। ও নমাজ পড়ে না। ও নিয়ে কিছু ঝামেলা হয় না। রোজাও রাখে না। ওর স্বামী বলে দিয়েছে ওসব নিয়ে ওকে জোর জবরদস্তি করোনি। তবে কিছু নিয়ম মানে বইকী। জল বলে না, পানি বলে। স্নান-কে গোসল, টিফিন-কে নাস্তা বলে। ওর শাশুড়ি বলে দিয়েছে কম সে কম দিনে তিনবার আছলাম আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা করতে তো পারিস। আদু তাই করে, জোরে জোরে, সবাইকে শুনিয়ে। বলার আগে একটু অজুও করে নেয় পাক পানি তে। ও জমজমা দিঘির পানি গায়ে ছিটোয়। জমজমা দিঘিটা বেশ বড় দিঘি। পদ্ম ফোটে। কে কবে হজ করতে গিয়ে কাবা থেকে একঘড়া জমজমা কুয়োর পানি নিয়ে এসে ওই পুকুরে ঢেলে দিয়েছিল, সেই থেকে ওই দিঘির জল পবিত্র পানি হয়ে গেছে। আদুর শ্বশুরমশাই জুম্মাবারে ওই পুকুরে গিয়ে অজু করে, পলিথিনের জারিকেনে ওই পানি নিয়ে আসে ঘরে। আদু সন্ধেবেলায় ওই পানি দুয়োরে ছিটোয় আর মনে মনে বলে গঙ্গা-গঙ্গা। বাপের বাড়িতে যেমন করত।

আদুর শ্বশুর চাষি। নিজের ছ'বিঘা জমি। এখনও মাঠে যায়। বছর পঞ্চাশ বয়েস হবে। সঙ্গে নেয় স্টিলের টিফিন কৌটো আর ট্রানজিস্টার। ছোট্ট মতন, কানে ছিপি দিয়ে শোনা যায়। আদুর শ্বশুর রাজশাহি শোনে, ঢাকা শোনে। বাড়িতে ফিরে লুঙ্গি পরে হাতে ঘড়িটা লাগায়। এত ফুটুনি ছেলের জন্য। ছেলের নাম ছালু। আদুর হ্যাসবান। ইরাক গেছে। ইরাক থেকে টাকা পাঠায়। সে টাকায় ফুটুনি। ছালুর ভাল নাম ছোলেমান। ছোটবেলা থেকেই আদুর খুব পেয়ারের সই ছিল রোশেনারা। ওদের বাড়িতে যেত খুব। রোশেনারার ফুফুর ছেলে ছোলেমান। থাকে আমোদিয়া গ্রামে। তিন কিলোমিটার। রোশেনারাদের বাড়িতে ওর খুব আসা-যাওয়া। ঝাঁকরা চুল, চোখে গগলস, সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে কেরদানি করে, গলায় চেন আর সিনেমার গান, মাধ্যমিক পাশ, বলে ইস্কুটার কিনবে।

আদুর শ্বশুরবাড়িতে একটা বই আছে। 'কাছাছাল আম্বিয়া বা নবীদের কিচ্ছা।' উলটো করে পড়তে হয়। বই-এর একটা পৃষ্ঠা বের করে আদুর বর বলেছিল—দ্যাখো, আমার কথা লেখা আছে। আদু পড়েছিল—'ছোলেমান নবীর কথা।' 'ছোলেমান পশুপক্ষীর ভাষা বুঝিতেন ও পশুপক্ষীর সহিত কথা কহিতেন। দেও দানব তাঁহার বশে ছিল। আল্লাহ তাঁহাকে নিয়ামত করিতেন। মাটি তাঁর ভিতরের গুপ্তধনের কথা ছোলেমানকে বলিয়া দিত। তিনি সকালে ও বিকালে বায়ুর উপর সিংহাসন রাখিয়া ভ্রমণ করিতেন...।

আদু বলেছিল, তাই বলে তুমিও নবী নাকি! আমাদের মধ্যে নিমাই নামের কত আছে, তাই বলে কি সবাই নদের নিমাই? সবাই নবী? আদুর বর বলেছিল, কিন্তু আমার নামও ছোলেমান। আমিও পাখির ভাষা বুঝি। তখন কোকিল ডেকেছিল। ছোলেমান বলেছিল, বলো দেখি ডাল্লিং কোকিল কী কচ্ছে? বলেই, ছালুই তার উত্তর দিয়েছিল— ভাষায় নয়, ভঙ্গিতে।

ছালু মিঞার আর কোনও খবর পালে নাকি? প্রায়ই কেউ না কেউ জিজ্ঞাসা করে আদুদের বাড়িতে। আদু এখন ওর বাপের বাড়িতে। আদুর বাবাকে কেউ কেউ আবার জিজ্ঞাসা করে সাদ্দাম কি বেঁচে আছে? কী মনে হয়? আদু এখন এরোপ্লেনের শব্দ পেয়েছে। ঘর ছেড়ে বাইরে এসে আকাশে তাকায়। ওর পায়ে ঝমঝম মল বাজে। ইরাকি ঝুমুর। ওখানে বসরা নামে কী একটা শহর আছে, ওখানে তৈরি হয়। ছালু এনে দিয়েছিল। উপোর ঝুমুর। মানে রুপোর।

এখানকার আকাশে এরোপ্লেনের তেমন একটা দেখা মেলে না। এরোপ্লেনের শব্দ শুনলেই আদু আকাশ দেখে। আদুর তিন বছরের ছেলে মায়ের ম্যাক্সি ধরে জিজ্ঞাসা করে, উটায় চেপে ইবার আব্বা আসবে গো মা?

আদু ওর ছেলের মাথায় একটু হাত বোলায় শুধু। রা কাড়ে না। এরোপ্লেনের গমগম শব্দ দূর মেঘের ভিতরে মিশে যায়। ছোলেমান, ও নবী ছোলেমান, তুমি না বাতাসের উপর সিংহাসনে চড়ে ঘুরতে পারো?

কেয়ামতের সময় ইস্রাফিল নাকি শিঙা ফুকবেন। সেই শিঙার শব্দ কীরকম কে জানে? এরোপ্লেনের শব্দের মতো এরকম?

আদুর বাপঘরে টিভি নেই। ওর শ্বশুরবাড়িতে টিভি ছিল। ছালুই কিনেছিল, দু' বছর আগে যখন এসেছিল দেশে। টিভিতে অনেক কিছু দেখেছে আদু। জঙ্গলের বাঘ, হোটেলের ছুরি, বম্বের বেহেস্ত, মন্ত্রী, পুলিশ, কত কী! এরোপ্লেনও দেখেছে, যে এরোপ্লেনের ভিতরে বোমা থাকে, ঘরবাড়ি ভাঙে, আগুন জ্বালায়, জ্বলতে থাকা শহর দেখেছে। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া দেখেছে। কান্না শোনেনি, মানুষের চিৎকার শোনেনি, তখন টিভিতে মুজিক দেয়। কালো ধোঁয়া উঠছে টিরিং টুরুং। বাড়ি ভেঙে গেল, টুরুং টিরিং। ওই টিরিং টুরুং এর মধ্যে ওর স্বামী ছিল। ইরাকে। আর এখানে কাঁদছিল ওরা।

ছালু কাজ করে 'কিরকুক'-এর কাছে। খেজুরগাছের ছবিওয়ালা কাগজে ছালুর চিঠি আসত। ছালুর কাজ খেজুর কারখানায়। খেজুরের ভিতর থেকে বিচি বের করে, গুল পানিতে ভিজিয়ে, একটু রোদ খাইয়ে প্যাকেটে ভরা হয়। ছালুর কাজ ছিল ধারালো ছুরি দিয়ে খেজুরের গায়ে সূক্ষ্ম আঁচড় বসিয়ে বিচিটা সন্না দিয়ে টেনে বের করে নেয়া। 'আমি অপারেশন করিরে আদু। যন্ত্রপাতি দিয়ে সারাদিন বিচি অপারেশন। সারাদিন ঠান্ডা ঘরে বসে খেজুর আর খেজুর। খেজুরের সাইজ কী। এত কাফি খেজুর, কিন্তু মাছি নাই।'

অনেক প্যাকেট খেজুর এনেছিল ছালু। গ্রামের অনেককে বিলি করা হয়েছিল। যেই আসে খেজুর নিয়ে আসে। অনেকেই ওই প্যাকেট রোজার মাসের জন্য রেখে দেয়। ইফতারের এস্পেশাল আইটেম। অনেকেই আত্মীয়পরিজনদের দু-এক মুঠো খেজুর পাঠায়। তখন আর এটা কিরকুক-এর খেজুর থাকে না, হয়ে যায় আমোদিয়ার খেজুর। খেজুরকে ইরাকে ওরা বলে কাফ। এইসব খেজুর কারখানাগুলির নাম কাফিস্তা। এই আমোদিয়া গ্রামে তিনজন কাফিস্তানি আছে, যারা খেজুর কারখানায় কাজ করে। সবার আগে যায় জব্বার। ও বাকিদের নিয়ে গেছে, বদলে টাকা নিয়েছে। ছালু যখন যায় তখন আদুর পেটে রফিক এসেছে। রফিক পয়দা হবার ন'মাসের মাথায় ছালু এসেছিল। সঙ্গে এনেছিল ছেলের জন্য রেশমি জামা, মেওয়া, খুরমা, সুরমা, রুপোর মল, খেজুরের প্যাকেট, আর টেপ রেকর্ডার।

খেজুরই কত রকমের হয়। খেজুরকে বেটে মণ্ড করা, খেজুরের বরফি, একটা কী সুন্দর খাবার এনেছিল, ওটার নাম নাকি কেলাইচা। ময়দার মধ্যে মশলাদার খেজুরের পুর, তারপর ঘিয়ে ভাজা। সেবার শীতকাল ছিল, এদিককার খেজুরগাছে মাটির হাঁড়ি, বাঁশের ডালে ইষ্টিকুটুম পাখি। পাখি ডাকে। ছালু বলেছিল, পাখি কী বলছে বল দিনি? খাট ভাঙবি? খাট ভাঙবি? তখন ছিল পিঠে-পায়েসের দিন। পার্টিসাপটার মধ্যে আমোদিয়ার নারকোলকোরার সঙ্গে কিরকুকের খেজুরের পুর মিশিয়ে দিয়েছিল। তারপর সেই রাতে এক কাণ্ড। সেরকম কাণ্ড তো সোয়ামি-স্তিরিতে হতেই পারে, তার উপর আবার বিদেশ ফেরত। কিন্তু পরের দিন সকালে বালিশের পাশ থেকে টেপ রেকর্ডারটা বের করে ছালু সুইচ টিপে দিয়ে বলেছিল—দ্যাখো আদু, তুমি কী করেছিলে! ইশ, কী লজ্জা! আদুর নিশ্বাসের শব্দ, কত রকমের আওয়াজ, কত বাজে কথা, কী বেহায়াপনা। আদু বলেছিল, আস্তে, আস্তে, ভল্যুম কমিয়ে দিয়েছিল ছালু। কপট রাগে ছালুর দিকে তাকিয়ে স্পিকারে কান রেখে নিজের শীৎকার-শব্দ শুনছিল আদু। বলছিল কী পাজি, অ্যাঁ, কী দুষ্টু বুদ্ধি! টেপে কেউ এসব তোলে? ছিঃ।

ছালু বলেছিল, এটা আমি নিয়ে যাব। এই ক্যাসেটটাই তো তুমি হবে আমার। ওজ রাতে বাজিয়ে শুনব।

এরপর যে ক'টা দিন ছিল, আদু বালিশের তলা হাতড়ে দেখে নিয়েছে যন্ত্রটা রাখা আছে কি না। একদিন তোশকের তলায় পেয়ে গিয়েছিল। আদু সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যেদিন ছালু চলে যাবে, তার আগের রাতে আদুই বলেছিল যন্ত্রটা নিয়ে শোও। কিন্তু আদু সে রাতে কান্না ছাড়া আর কোনও শব্দ দিতে পারেনি।

ছালু বলেছিল, আসব, আবার আসব। এরোপ্লেনের পয়সা জমিয়েই চলে আসব। রফিকের জন্য কত কী নিয়ে আসব। তুমি কিন্তু আমার সঙ্গেই চললে। ইচ্ছে হলেই বাজাব। ক্যাসেটের গায়ে টোকা দিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়েছিল ছালু।

এরোপ্লেন ঘন মেঘে মিশে গেলে আদু ঘরে যায়। আদুর ম্যাক্সি টেনে রফিক বলে—আব্বা বুঝি উটার ভিতরেও নেই?

আব্বাকে রফিকের মনে নেই। ওর ন'মাস বয়েসের সময় ওর আব্বা আবার আসব বলে এখনও আসেনি। ওর আব্বার গল্প শুনেছে। ছবি দেখেছে। ওর আব্বার কথা বলে কাঁদতে শুনেছে। ও দেখেছে টিভির সামনে বসে আছে ওর মা, বু, খালা, খালু, উড়াজাহাজ দেখছে, আর ছালু ছালু বলে কাঁদছে ওর বু। ওর বাবার কথাও শুনেছে রফিক। ক্যাসেটে। আমার সোনা ছেলে রফু, আমি তোমার আব্বা। আদর নাও। আমি তোমার কথা ভাবি। তোমার কী চাই বলো। লিয়ে আসপো।

এভাবেই আব্বাকে জানে রফিক। কারণ ছালু তো ওখান থেকে ক্যাসেট পাঠাত, পার্সেলে। তাও বেশি নয়, গত দু'বছরে দু-তিন বার-ই পাঠিয়েছিল। টেপ রেকর্ডারে বাজিয়ে শুনেছে। ওর ভাইকে বলা কথা, ওর আব্বা-আম্মার জন্য কথা, আর আদুর জন্যও। আদুর জন্য যে কথাগুলি বলা তা যেন মছলা-মাছায়েল থেকে পড়া। ছেলের যত্ন আব্বা-আম্মার সেবা, এইসব। ছালু তো জানে, এই ক্যাসেট সবাই শুনবে। বউ-এর জন্য তাই কোনও চুপি চুপি কথা নেই। আদু তো পার্সেল করতে পারে না। আদুর কাছে ফাঁকা ক্যাসেটও নেই। ফাঁকা ক্যাসেট থাকলে গোপনে ছালুর কাছে কথা বলে রাখত, নাই বা পাঠানো হল, বাজিয়ে শুনত নিজেই। আদু চিঠি লিখত, ইংরিজিতে ঠিকানা লিখত ধরে ধরে—

সোলেমান হোসেন মণ্ডল। C/o ইব্রাহিম কাফিস্তা, পোস্ট-জিরিয়াম। কিরকুক। ইরাক।

এখন আর চিঠি লেখে না। সোলেমানের ঠিকানা নেই আট মাস হয়ে গেল।

তখন বসন্ত কাল। খুব কোকিল ডাকছে। তখনই ইরাকের উপর বোমা পড়ল। কতদিন ধরেই কানাঘুষো চলছিল, ইরাকের উপর বোমা ফেলবে আমেরিকা। লাদেনকে পেল না, সাদ্দামকে চাই। সাদ্দাম যদি ধরা দেয় তবে আর বোম পড়বে না। আদুর শ্বশুরবাড়িতে তখন কাকা-খালারা বলাবলি করে—সাদ্দাম মিয়াঁর অত গোঁ কেন? একজনের জন্য এত লোক মারা যাবে?

বাগদাদে যখন বোমা পড়ল, আমোদিয়া গ্রামের শিমুলগাছে তখন লাল লাল ফুল। আমোদিয়া গ্রামের মসজিদের ইমামের কাছে জব্বর, খয়রুল আর সোলেমানের বাড়ির লোকজন গিয়ে বলে, কী উপায় হবে এবার? আল্লার এ কেমন বিচার? ইমাম বলে, আল্লায় ইমান রাখো। আল্লা মেহেরবান। এবাদত করো।

বসরা, বাগদাদের পর কিরকুক। জব্বর, খয়রুল আর সোলেমানদের ঘরে টিভি আছে। ওরা সব কাফিস্তায় কাজ করে। এ ছাড়া আরও তিন-চার ঘরে টিভি আছে। ওদের বাড়িতে ভিড়। সন্ধ্যার খবরের সময় অনেক লোকজন চলে আসে। টিভির পর্দায় ভেঙে পড়া ঘর বাড়ির দিকে চেয়ে থাকে। ব্যস্ত অ্যাম্বুলেন্স, স্ট্রেচারে শোয়ানো মানুষগুলির দিকে ওদের খর দৃষ্টি। ইট-পাথরে চাপা পড়া একটা মানুষের হাত বেরিয়ে আছে। কে যেন বলে উটা খয়রুলের হাত না তো? কাফন ঢাকা দেহ থেকে একটা পা বেরিয়ে আছে। কার পা গো? যে মানুষটি ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, তাকে দেখে কে যেন বলল, আমাদের ছালুর মতন না? ধ্বংসস্তূপের সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে এক বৃদ্ধা। একটু আগেই যেখানে ওর নিজের সংসার ছিল।

বাড়ির দাওয়ায় একইরকম মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে সোলেমানের মা। পাড়াপ্রতিবেশীরা বলে, আল্লাকে ডাক ছালুর মা। বাঁচালেও সে মারলেও সে।

ছালুর মা আল্লা ডেকেছে। ডোমকল বাজারে রামমন্দিরে গিয়ে পয়সা ছুড়েছে, বটতলার শিবপাথরে হাত জোড় করে গোপনে বলেছে যুদ্ধ থামাও হে। বটবৃক্ষের কাছে বলেছে, প্রান্তরের হাহাকারকেও বলেছে। যুদ্ধ থামে না।

আর আদু? আদু কেবলই দুর্গা জপেছে। হে দুগ্‌গা, দুগ্‌গতি নাশিনী! ওকে তুমি আমার কাছে এনে দাও। সিঁথিতে একটু করে সিঁদুর দিতে থাকে আদু। সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। একদিন পিটাই পিরের দরগায় গিয়ে কবরের উপর আচ্ছা করে পিটিয়ে আসে। পিটাই পিরের অন্য কী একটা নাম ছিল। এখন সবাই ভুলে গেছে। একটা গল্প আছে ওকে নিয়ে। ওই পির নিজে একবার একটা খারাপ কাজ করেছিল। জেনা করা যাকে বলে আর কী। মেয়েছেলে ঘটিত। পরে যখন নিজের বিবেক জাগ্রত হল, তখন নিজেই তাঁর শিষ্য-মুরিদদের বললেন—আমাকে একশো ঘা বেত মারো। আমি গুনাহ্ করেছি। আল কোরান অনুযায়ী এর শাস্তি একশো বেত। কেউ ওকে মারতে রাজি হয় না প্রথমে, তারপর তিনি হুকুম করলেন। হুকুম হলে তামিল করতেই হয়। কিন্তু ওই পির একশো বেত পর্যন্ত বাঁচলেন না। কয়েক ঘা বেত পড়তেই তাঁর ইন্তেকাল হল। কিন্তু ইন্তেকালের আগে হুকুম দিয়ে গেলেন আমার মুর্দার উপরও যেন বেতের ঘা পড়তেই থাকে। তাই হল। তাঁর কবর হল। কবরের উপরও মানুষ বেত মারে। এখনও। পিরের হুকুম। ওই হুকুম তামিল করলে নেকি হয়। পুণ্য হয়। সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। আদু পিরের কবরে বাড়ি মারতে মারতে বলে হে পিটাই পির, শুয়াই থাকবা? তোমার তো বিবেক জাগল। উদের বিবেক কে জাগাবে?

তারপর যুদ্ধ থামে। বাগদাদে আমেরিকার সৈন্য মার্চ করে। রামসফিল্ড বক্তৃতা দেয়, বলে সব মিটে গেছে। আমোদিয়া গ্রামের তিন ঘরে রাতের ঘুম নেই। খেজুর কারখানার ওই তিনটি ছেলের কথা কেউ জানে না। কত চিঠি লেখা হয়, লাল বাক্সে ফেলাই শুধু। ইমাম সাহেব বলে, কী করে জানা যাবে? সাদ্দাম জিন্দা আছে কি না তাই কেউ জানে না তো লেবার....।

ওই তিন বাড়ি যাতায়াত হয়। কেউ কারুর খবর জানে কি না। ওই তিন বউ-এ কথা হয়, কখনও মুখে কথা হয় না, এ ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকে, চোখে কথা হয়। রাত্তিরে দেখা স্বপ্নের কথা বলে। দেখনু, একটা মোটরসাইকেল দাঁড়াইল, খুব হরেন মারছে, দেখি, আমার লোক, মাথায় ব্যান্ডিজ।

বর্ষা নামে। চাষের মাঠে লোক নামে। মাছের ঝারি আর আটলে কত মাছ। ল্যাটা, কই, পুঁটি, মৌরালা, ভ্যাদা...। আদু ভাবে ও কি মাছ খাবে? ও সধবা তো?

কাগজে পড়ে ইরাক স্বাভাবিক। ইস্কুলে যাওয়া ছেলেমেয়েদের ছবি ছাপে। আদু আবার চিঠি লিখতে থাকে কিরকুকের সেই ঠিকানায়। আর উত্তরের আশায় বসে থাকে। একদিন বুদ্ধি করে বুশ সাহেবকে চিঠি লেখে। খামের উপর ইংরেজিতেই লেখে জর্জ বুশ। প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা। ভিতরে বাংলায় লেখে মহাশয়, আপনি সবই পারেন। আমার স্বামীর সন্ধান দেন। আমার স্বামী কাজ করিত কিরকুকের...বুশ সাহেব ঠিকই বাংলা পড়িয়ে নেবে। উনি সব পারেন। ডোমকলের পোস্ট অফিসে ডাক টিকিট লাগিয়ে পোস্ট করল। পোস্টাপিসের লোকটা বলল—এখনও বুঝি কুন খবর পালে না বুন?

এইসব কথাগুলিই তো বর্ষা। ভিজিয়ে দেয়।

বর্ষা থামল। এসেছে শরৎ হিমের পরশ। মেঘগুলি সব আকাশে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে। ঘরের দাওয়ায় রোদ্দুর। তোমার দেখা নাইরে তোমার দেখা নাই।

এমন সময় এক ফরিস্তা এল। ডাক পিওন। খামের উপর অচেনা ডাকটিকিট। পিওন বলল ইরাকের চিঠি। আদু দেখল সত্যিই ইংরেজিতে ইরাক লেখা আছে। সাদ্দামের ছবি নেই, অন্য ছবি। গোলাপ ফুল। ইস্টিকুটুম পাখিরা ডেকে উঠল, ধান খেত দুলে উঠল। খামটা ছিঁড়ল। ও মা! এটা কার হাতের লেখা। এটা তো ছালুর হাতের লেখা নয়। চিঠির শেষে দেখে—ইতি তোমার ছালু। আবার শুরুর দিকটা দেখল আদু। পাক জনাবেষু আম্মাজান। হাজার হাজার আদাব। মাগো, বাঁচিয়া আছি। আমাদের কারখানা আর নাই। বোমায় নষ্ট হইয়াছে। আমি সে সময় কারখানায় ছিলাম। উপরের ছাদ পড়িয়াছিল। ডান হাতটি এখন নাই। হাসপাতালে কাটিয়া দিয়াছে। খয়রুলের ইন্তেকাল হইয়াছে। আমি বাম হাতে কোনও মতে লিখিলাম। জব্বারের খোঁজ করিতেছি। সে

কোথায় জানি না। আমি দেশে ফিরিবার চেষ্টায় আছি। আমেরিকা হাতটি লৈয়াছে বটে, তবে খানাপানি দিতেছে। দোয়া করিও। ঠিকানা দিয়েছে ইরবিল রেডক্রশ ক্যাম্প। ইরাক। আর একটা চিঠি আছে, মাই ডিয়ার আদু, মায়ের চিঠিতে সবই শুনিলে। গ্রান্টের জামার ডান হাত ঝুলছে। সব গেছে। দেশে ফিরবার চেষ্টায় আছি। তোমাদের কাছে গেলে বাঁচি। কিন্তু কী খাব? একহাতে কী কাজ করব? তার চেয়ে বোধহয় খয়রুলের মতো মরাই ভাল ছিল। চিন্তা করে কী করবে। তুমি বরং বাপের বাড়ি থাক। আমি আসছি ইনসাল্লা।

সেই থেকেই আদু আকাশে এরোপ্লেন দেখে। বেড়া খোলার শব্দ হলে দৌড়ে যায়। হাওয়া যখন গাছকে নাড়ায়, ওর মনে হয় সে আসছে, সে আসছে। বর্ষা গেল; এসেছে শরৎ হিমের পরশ। মেঘগুলো সব আকাশে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে। আদু চলে এসেছে ওর বাপের বাড়ি। অপেক্ষায় আছে। সকালে মুখে হলুদ বাটা মাখে। পায়ে আবার মল পরে নিয়েছে। মলের ঝমঝমে বাজে এসো গো, এসো গো।

শোনা গেল, জব্বারের ঘরেও চিঠি এসেছে। জব্বারও লিখেছে আসছি।

আদু চিঠি লিখেছিল। ইরবিল রেডক্রস ক্যাম্প। উত্তর আসেনি। সোলেমানেরও চিঠি আসেনি আর। আদুর মাঝেমধ্যে মনে হয় ওই চিঠিটা সত্যি সত্যি ছালুর তো?

আদুর বাপের বাড়িতে টিভি নেই। কিছু খবর জানে না আদু। ইরাক দেশ টিভিতেই দেখেছে। স্বামীর কাছে গল্প শুনে যে ইরাকের ছবি মনে মনে আঁকা হয়েছিল, টিভির ইরাক তো সেরকম নয়। ফুরাত নদী আর দিজলা নদীর কথা শুনেছিল। ইস্কুলের বইতে যে নদীর নাম ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস। বসরাই গোলাপের কথা শুনেছিল, খুরমাগাছ, আখরোট গাছের কথা শুনেছিল, আর কত রকমের কাবাবের গল্প। কিন্তু টিভিতে কী ইরাক দেখেছিল ওরা? আগুন, ধোঁয়া আর ভাঙা বাড়ি। মুখ থুবড়ে পড়া পুল, দেখেছিল দাউদাউ করে জ্বলছে একটা গোটা গাছ, আর উড়ছে কাতর পাখিরা। এখন কি ইরাকের আগুন নিভেছে? এখন কি খুরমা গাছের ছবি দেখায় টিভিতে? গোলাপ ফোটে? ফুরাত নদীর জলে ঢেউ হয়? সেই জলে মাছরাঙা ছোঁ মারে? মনে মনে ছবি দেখে আদু—ফুরাত নদীর সামনে একজোড়া খেজুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ছালু, মুখে দাড়ি, হাওয়ায় কাটা ডানহাতের জামাটা পতপত করছে।

আসুক না, আসুক না সে, কাটা হাতে চুমা দেবে। কাটা হাতের আদর নেবে। কেন, ভয় করবে কেন?

একদিন বিকেলবেলা সাইকেল চেপে জব্বার এল। সাইকেলের ঘণ্টি তো নয়, পুজোর ঢাক। জব্বারকে ঘিরে সবাই। জব্বার যেন দেবদূত কিংবা ফেরেস্তা। ওই মুহূর্তে দাউদপুরের আদুদের উঠোন যেন বেহেস্ত। বলো কী খবর।

জব্বার এবার খেজুরের প্যাকেট আনেনি। সঙ্গে এনেছে একটা উট। মাটির। হলদেটে রং এর। জব্বার চা খেতে খেতে বলল—এরোপ্লেন তো উড়্যাল দিচ্ছে। তো আমরা কী করব? আমরা খাজুরের কাজ করছি। ক'দিন আগে ইরাকের মেলেটারি বলে গেল কত হাজার প্যাকেট যেন চাই। তাই কাজ হচ্ছে। শুনলাম আমেরিকার মেলেটারি এদিকে আসবে না। বাগদাদ হাসিল হয়ে গেছে কাজ মিটে গেছে। এমন সময় একদিন রেতের বেলা প্রবল শব্দ। সাদ্দামের মকানে বোমা পড়ল অনেক। আমরা ব্যারাক থেকে দেখলাম। তার পরদিন সকালে আমাদের ঘরের উপর। আমি গেছিলাম বাইরে পানি আনতে, তাই রক্ষে। পাথরের ছাদ হয় কিনা, খয়রুলের মাথায় পড়ল। ছালুভাইয়ের হাতটা খুব জখম হল। ডাইন হাতটা। পাথর সরাবার গাড়ি আইল পরদিন। ততক্ষণে আমি আর কয়েকজন একটা একটা করে ইট-পাথর সরালাম। একটা খাঁজের মধ্যে এটকে ছিল ছালুভাই। আঙুলে করে মুখের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা পানি চোষালাম সারারাত। পরদিন দুপুরে রেডক্রস গাড়ি এল। এর মধ্যে কতজন মরে গেল। কালিজায় জোর ছিল বলে ছালু জান ফিরে পেয়েছে।

জব্বারকে কেউ বিস্কুট এনে দেয় প্লাস্টিকের ডিশে, কেউ বাতাসা দেয়। বাতাসও।

খায়রুল তো কবর পেল, ছালু গেল হাসপাতাল। আমি করি কী? কোম্পানি তো নাই। ভাঙা পাথরে ছড়ানো খেজুর। পাখিও নাই যে খাবে। দুই দিন শুধু খাজুর খেলাম। অনেক খাজুরে পোড়া পোড়া গন্ধ। খাজুর পোড়ার টেস্ট করলাম ওই পরথম।

তারপর ক্যাম্প বসাল। একজন পাকিস্তানি ছিল। ও ব্যাটা হিন্দি বোঝে। ও বলল, তুমি হলে ইন্ডিয়ান, পানির দেশের লোক, তোমার তো দেখছি হাত-পা সব ঠিক আছে। তুমকো দুসরা কাম দেগা। ক'দিন পাউরুটি আর টিনের মাংস খাওয়াল। তারপর পাঠিয়ে দিল বুক্সাস। জাব নদীর ধারে। নরম মাটির দেশ। মাটির রং হলুদ। সেই মাটি দিয়ে হরেক জিনিস হয়। ফুলদানি, ছাইদানি, চা-কফি খাবার পাত্তর, পশু পাখি চিড়িয়া। সেই মাটি পোড়াবার কায়দা আলাদা। সেই উট আনেছি।

ছালুরে কুথায় কোন হাসপাতালে নিল, তার ঠিকানা করতে পারি না। অবশেষে সন্ধান পালাম। সে এখন আমার কাছেই আছে। মাটি পাড়ায়। পায়ের কাজ। পা দিয়ে মাটি নরম করে। একটা ক্যাসেট দেয় জব্বার।

আদু দু' হাত একসঙ্গে জোড়ে। তেষ্টার জল খেতে গেলে যেমন আঁজলা করতে হয়, সেরকম। খাম খুললে আদু দেখল ক্যাসেটের গায়ে লেখা only for you, আদুর আর তর সয় না। জব্বার চলে গেলেই আদু মেশিনটা বের করে। ভাগ্যিস নিয়ে এসেছিল ওবাড়ি থেকে। ক্যাসেট ঢুকিয়ে অন করে। আদু, এই আদু, আমার আদু, আদরের আদু। আমি বলছি। বেঁচে আছি। খোদা বাচায়ে রেখেছে। খোদা না, ভুল বল্লাম, আমেরিকা।

অনেক কথা আছে—আদু, প্রাইভেট কথা। কেউ যেন না শোনে। শুধু তুমি।

অফ করল আদু। ইতিমধ্যেই জুটে গেছে ছোটভাই, মা।

মেশিনটা কোলে নিয়ে ছুটে বাইরে যায়। সূর্য তখন ডুবতে চলেছে। সামান্য বৃষ্টিও। পুকুরপাড় ছাড়িয়ে কালভার্ট ছাড়িয়ে মাঠে নামে। মাঠে ধান গাছ বড় হয়েছে। গোড়ালি সমান জল। ধান খেতের ভিতরে চলে যায় আদু। চারিপাশের ধানগাছে আঁধার নামছে। মেশিন অন করে আদু। তখন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

আদু, হাসপাতাল থেকে তোমায় কত মনে মনে চিঠি লিখেছি। ছাড়া পেলাম কতদিন পর। একটা হাত নেই। জামার হাত লতপত করে। সামনে দেখলাম আমেরিকার পতাকা পত পত করে উড়ছে। আমাকে এসকিউ ক্যাম্পে নিয়ে গেল। আমার কাগজপত্র পাসপোর্ট কিছু নাই। ওরা বলল, কনসুলেটে পতা করবে। এডক্রস ক্যাম্প থেকে চিঠি লিখলাম তোমাকে। তারপর তো অনেক কথা। বলতে গেলে কষ্ট হয়, আদু কত অক্ত, আতজাগা, ভুখা। আমরা তো শুধু খেজুর ফল প্যাক করতাম, আর তো কিছু নয়। কার কি খেতি করতাম গো? গেল। ওই কাজ আর করতে পারব না কুনদিন। শুন বলি, জব্বার ঠিক খোঁজ করে চলে আল। লিয়ে গেল এক লদীর ধারে। সেই লদীর নাম জাব। দু' পাশে নরম হলুদ মাটি। সিখানে হরেক কিসিমের মাটির জিনিস তৈরি হয়। সে মাটি পোড়ালে হলুদ অঙের দেখায়। আমাদের ধম্মে মূর্তি বানানো ভাল না। বালির দেশে এই ধম্ম উৎপত্তি। বালি দিয়ে মূর্তি হয়?

যেখানে নরম মাটি মিলে, সেখানেই মূর্তি গড়ে মানুষ। যে মানুষ ভাঙে সেই মানুষই আবার গড়ে। এমন সুন্দর উট, ঘোড়া, পাখি তৈয়ার হয় যেন রুহ ফুঁকে দিলেই জিন্দা হয়ে যাবে। আমি এখন উখানে মাটির তালের উপর নাচি। সারাদিন নাচি। মাটি লরম করি। সারা পায়ে মাটি লাগে, গায়ে মাটি লাগে। মাটিতে নাচতে নাচতে দেশের কথা ভাবি, তোমার কথা ভাবি আদু।

এখন একটা হাত ফেলে রেখে দেশে কী ভাবে যাব? দেশে গেলে কী খাব? কে খাওয়াবে আমাকে? যার হাত নাই তার ভাত নাই?

যুদ্ধ থেমেছে। জাব নদীর হলুদ নরম মাটিতে যেসব মিলিটারি জুতোর ছাপ পড়েছিল, রোদে শুকেছে সব। খাঁজ খাঁজ ছাপগুলি শক্ত হয়ে রয়ে গেছে। কতগুলি কমবয়সি ছেলে একদিন ছাপগুলি লাথি মেরে ভাঙল, আর ওদের ভাষায় গাল পাড়ল।

মানে যুদ্ধ থামে নাই।

আমি থাকব না ইখেনে। দেশে যাব। তোর কোলে। তোর বুকে। হাতকাটা ছালুরে দেখ্যে ভয় পাস না। যাব। ক'দিন পর। দুটো পয়সা জমুক।

আমার আদু, ছুনুমুনু একটা প্রাইভেট কথা। জব্বার আবার ফিরবে। এক মাস পর। ওকে একটা জিনিস দেবা? সেই ক্যেসেটটা আর নাই। যেখানে তোমার আর আমার ভালবাসা লেকা ছিল। যেটা শুইনতাম, এতের বেলায়, যুদ্ধ সিটা লষ্টো করে দিয়েছে। উটা আর নাই। একটা লৈতুন ক্যাসেটে আবার কয়ে দেবে গো, দুটো ভালবাসার কথা, চুমার শব্দ, আর ওইরকম আওয়াজ? পিলিজ। খাম বন্ধ করে ক্যাসেটটা পাঠিয়ো। উটা ছাড়া বাঁচব না। অনেক চুমা নাও।

অন্ধকার মাঠে ইরাক থেকে পাঠানো চুম্বনের শব্দ শোনে আদু। তারারা কাঁপে।

আজ আবার বেরিয়েছে আদু। দুপুর। ভাদ্রমাস। হাতে সেই টেপ মেশিন। নতুন ক্যাসেট ভরতে পারেনি। ছিল না। মান্না দের গানের ক্যাসেটটাই ভরেছে। মান্নাদের হিট সংগীত। প্রথম গানটিই হচ্ছে এই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি, মাঝখানে নদী ওই বয়ে চলে যায়। এই গানগুলির উপরেই ওর নতুন কথা ভাসাবে। গান মুছে গিয়ে আদুর কথা থাকবে।

আদু যায় লাল পথে, আদু যায় আল পথে। যেতে যেতে ফাঁকা মাঠে একা গাছ! গাছের তলায় শুকনো পাতা। পাতার উপর বসে আদু। চারিদিকে কেউ নেই। গোরু চরছে, হাওয়া বয় শনশন, আদু কাঁপে।

টেপ রেকর্ডারে আঙুল চাপে আদু। ওগো, আমি বলছি, অদনা, তোমার আদু। ওগো অতন আমার...। গলা ধরে আসে।

কত কী বলতে চায়। সারা শরীর থেকে কথা বেরোতে চায়, কিছুই বলতে পারে না আদু। টেপ ঘুরে যায়। হাওয়া বয় শনশন পাখিরা ডাকে। ওগো, তুমি তো ছোলেমান। তুমি পাখির ভাষা বুঝ...

যে মানুষগুলো যুদ্ধ চায়নি, তবু যুদ্ধ ওদের মেরেছে, তাঁদের জন্য শোকসভার মতো দাঁড়িয়ে আছে গাছ। নিঃশব্দে ঘুরে যাচ্ছে চুম্বক ফিতে। তুমি যা চেয়েছিলে এই নাও। এই বলে, একা বৃক্ষতলে, যোজন যোজন মাইল দূরের এক প্রিয় মানুষের জন্য চুম্বনের মুদ্রা করে আদু। কিন্তু টেপ রেকর্ড গ্রহণ করে শুধু ক্রন্দনের শব্দ। শুকনো পাতার উপর কান্নায় ভেঙে পড়ে আদু। ওর দু' চোখে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস। সোলেমান, ও সোলেমান, তুমি তো কান্নার ভাষাও বোঝো!

হাওয়া বয় শনশন। পাতারা কাঁপে।

শারদীয় বর্তমান, ২০০৩

গ্রামপ্রধানের ছেলে

তখন খুব ভোর। গাড়িটা চলেছে সিয়েম রিপ থেকে আঙ্কোরভাট-এর দিকে। কম্বোডিয়ায়। গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ছে সাজগোজ করা বাড়ি। আসলে ওগুলো হোটেল। গাছপালার আড়ালে দেখা যায় খড়ের চালের ঘর। গ্রাম। মুরগির ডাক শুনলাম। একদম বাঁকুড়ার।

আমি একটা এন জি ও-তে কাজ করি। বেশ নাম আছে। এখন বাঁকুড়ায় পোস্টিং। একটা সেমিনারে এসেছিলাম নমপেন-এ। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছিলাম এইডস প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা করতে। ভেবেছিলাম নমপেন-এ যখন আসাই হল, আঙ্কোরভাট না দেখে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না।

নমপেন শহরটা কেমন যেন বিষাদগ্রস্ত। রাস্তার আলোগুলো ম্রিয়মাণ। বাড়িগুলোয় রং হয়নি বহুকাল। বাতাসে মিশে আছে যুদ্ধশেষের দীর্ঘশ্বাস। সারাটা শহরে যেন বিছিয়ে রয়েছে গান্ধারীর শাড়ি। কত যুদ্ধের ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে দেশটার উপর দিয়ে, শহরটার উপর দিয়ে। নমপেন হল কম্বোডিয়ার রাজধানী। ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময় উত্তর ভিয়েতনামের গেরিলাবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামে যেত কম্বোডিয়া হয়ে। কম্বোডিয়াতে বোমা ফেলেছে আমেরিকা। অনিচ্ছাতেও যুদ্ধে জড়িয়েছে দেশটা। তারপর এল পলপট। সে এক বিভীষিকার সময়। সারা দেশে চুলপাকা মানুষ নেই। যাদের চুল পাকার কথা ছিল, তারা আগেই মরে গেছে। সেমিনার পরিচালনা করছিলেন যে মহিলাটি, সে কম্বোডিয়ান। বয়স ঠিক বোঝা যায় না। তার গলার সোনার লকেটের ভিতরে একটি পুরুষমানুষের ছবি। হয়তো লকেটের সূক্ষ্ম সোনার ফ্রেমের ভিতরে স্তব্ধ রয়েছিল একটা গোটা যুদ্ধ, হাহাকার আর যন্ত্রণা।

আঙ্কোরভাট দেখতে হলে প্রথমে সিয়েম রিপ আসতেই হবে। সিয়েম রিপ-এ একটা এয়ারপোর্ট আছে। নমপেন থেকে বিমানে আধঘণ্টার মতো লাগে। বাসেও যাওয়া যায়। লঞ্চেও। মেকং নদীর উপর দিয়ে চার ঘণ্টা, তারপর একটা ছোট নদী। এঁকেবেঁকে অবশেষে সিয়েম রিপ। মেকং-এর স্থানীয় উচ্চারণ অনেকটা 'মাগং'-এর মতো। আমার তো মনেই হয়েছিল মাগংগা।

এখন কম্বোডিয়ান মুরগির ডাকে স্পষ্ট শুনলাম কাজে চলো—কাজে চলো। বৃষ্টি ভেজা গাছে পাখিরা কিচিরমিচির শুরু করে দিয়েছে। নারকোল গাছের ডালে ডালে ঝুলে আছে কুয়াশা। চওড়া রাস্তা। মসৃণ। রাস্তায় হু হু করে চলছে ট্যুরিস্ট বোঝাই গাড়ি। আমি একটা কনডাকটেড ট্যুর নিয়েছি। একাই। ভারত থেকে আরও দু'জন এসেছিল, ওরা কেউ আঙ্কোরভাট দেখতে আসেনি। সিয়েম রিপ-এ যে-হোটেলে উঠেছিলাম, তারাই এই ট্যুর-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মাথাপিছু পঁচিশ ডলার। ইনক্লুডিং ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চ।

সেই ছোটবেলায় স্কুলের বইতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটা কবিতায় ছিল বোরোবুদর আর আঙ্করধাম মোদেরই প্রাচীন কীর্তি। মানে বইয়ের 'টীকা লিখ'র মধ্যে আঙ্করধাম পড়েছিলাম। সেই আঙ্করধাম-এ কখনও আসা হবে ভাবিনি আমি।

কম্বোডিয়ায় এখনও প্রাচীন ভারতের বিপন্ন অবশেষ পড়ে আছে। আগেকার ইন্দোচিন এখন তিন টুকরো। লাওস, ভিয়েতনাম আর কম্বোডিয়া। কম্বোডিয়া আসলে ছিল কম্বোজ। এখানে

এখনও রাস্তার নাম বীথি। বড় রাস্তা মহাবীথি। হোটেলের নাম নাকোরালায়া। ওটা কি নগর-আলয়? যে-হোটেলে ছিলাম তার নাম হোটেল সোভান্ন। সোভান্ন কি সুবর্ণ? আর আঙ্কর মানে কি তবে ওঙ্কার? সিঙ্গাপুর তো নিশ্চয়ই সিংহপুরই ছিল। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ—সব কিছুতেই ভারতের স্মৃতি। চম্পা দেশটা কোথায় ছিল? মলয় দেশ? ওটাই কি মালয়েশিয়া?

সব জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছিল। পুরো আঙ্কোরভাট। কেউ জানত না। ফরাসি সাহেবরা খুঁজে পেয়েছিলেন আঙ্কোরভাট। এখন সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আসে এই আশ্চর্য মন্দিরটা দেখতে। আমিও যাচ্ছি, ফেলে আসা ভারতের দীর্ঘ আঁচল-ছায়ায় যাচ্ছি।

গাড়িটায় কুড়িজন। বারোজন আমেরিকান, চারজন ফ্রান্স থেকে এসেছে। তিনজন ফিলিপিনস-এর, আর একা ভারতীয় আমি। গাইড ছেলেটি বলল—মাই নেম ইজ খেম বং। আই অ্যাম এ পোস্ত গ্রাজুয়েত স্তদেন্ত ওফ হিস্তরি। ছেলেটি জানাল আঙ্কোরভাট একটা বিশাল জায়গা। কেউ যদি হারিয়ে যায়, মোবাইলে যোগাযোগ করে নিতে হবে। সবাইকে কার্ড দিল ছেলেটি। নাম এবং মোবাইল নম্বর লেখা আছে। লেখা আছে লাইসেনস্‌ড গাইড। তারও একটা নম্বর আছে। একদম তলায় লেখা কাম এগেইন।

হাইওয়ে থেকে একটা লাল মাটির রাস্তা চলে গেছে। গাড়িটা ওই পথে ঢুকল। একটা তোরণদ্বার। কম্বোডিয়ার কোনও গ্রামে ঢুকবার পথে এরকম তোরণ থাকে। এর আগেও দেখেছি। অরুণাচলেও দেখেছি এরকম কাঠের তোরণ। শুনেছিলাম যে-গাছের তলায় শুয়ে গ্রাম্যপ্রধান সুখস্বপ্ন দেখে, সেই গাছের কাঠ দিয়েই তৈরি হয় প্রবেশ তোরণ। সে তো অরুণাচলে। এখানকার তোরণগুলোও কাঠেরই। এসবও কি স্বপ্ন দেখানো গাছের?

তোরণের সামনে এই ভোরবেলায় কয়েকটা বালক দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন মহিলাও। গাইডটির হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। দেখাতে লাগল বড় বড় নারকোল গাছ। দেখলাম গ্রামটা নারকোল গাছে ছাওয়া। দেখলাম একটা উঁচু গাছের মাথায় এক কাঁদি ডাবের সবুজে লেগেছে সূর্যের প্রথম আলো।

গাইড ছেলেটি কম্বোডিয়ার ভাষায় ওদের কী যেন বলছে। কিনহো কথাটা ঘুরেফিরে আসছে। গাইডটি একটি বছর দশেকের ছেলেকে টেনে নিল। ছেলেটি খালি গা, হাফ প্যান্ট পরা। ছেলেটির প্যান্টের খাঁজে একটা হাত দা। কাঁধে দড়ি। ছেলেটি লাফাতে লাফাতে একটি নারকোল গাছের কাছে গেল, তারপর তরতর করে উপরে উঠতে লাগল, যেন কাঠবেড়াল। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে লুঙ্গি আর ব্লাউজপরা কয়েকজন মহিলা। একটি মহিলার কালো দাঁতে হাসি ফুটেছে। সেই মহিলাটি চিৎকার করে ছেলেটিকে কিছু বলছে। আমার দিকে তাকিয়েও ওদের খমের ভাষায় কিছু বলল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম মহিলাটি বলছে আমার ছেলের মতো এত তাড়াতাড়ি কেউ উঠতে পারে না। নারকোল গাছের প্রান্তসীমায় উঠে দড়ি দিয়ে বাঁধল একটা ডাবের কাঁদি। দা দিয়ে কেটে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিল ছেলেটা। ওই মহিলাটিই এগিয়ে গেল সেই লম্বা নারকোল গাছটার তলায়। দু'হাত আকাশের দিকে তোলা, আকাশ থেকে নামছে একগুচ্ছ ডাব। আমি দেখলাম মহিলাটির পেটটা বেশ উঁচু হয়ে রয়েছে। স্ফীত পেটের উপরেই লুঙ্গিটির গিঁট। মহিলাটি দু'হাত বাড়িয়ে ধরে নিল ডাবের কাঁদি। ছেলেটা গাছ বেয়ে নেমে এসে গা থেকে ঝেড়ে নিল ভোরের পিঁপড়ে।

ডাবগুলোকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে বলল গাইড। ওই ছেলেটা হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠিয়ে দিল শিশির লাগা ডাব। গাইডটি ট্যুরিস্টদের বলল, সি, উই অফার গ্রিন কোকোনাট টু ইউ অল। নো এক্সট্রা মানি। নো আদার কোম্পানি অফারস লাইক দিস। টু কোকোনাটস ইচ।

আরও কয়েকজন বালক ট্যুরিস্টদের হাত ধরে টানাটানি করছে। ফ্রেশ কোকোনাট স্যার, ওনলি ওয়ান ডলার। ওকে স্যার, টু কোকোনাট ওয়ান ডলার। মর্নিং কোকোনাট ভেরিগুড স্যার, ফ্রেশ কোকোনাট স্যার...। গেয়ে চলেছে কথাগুলো, যেন মুখস্থ, যেন সুরও আছে ওই ভিক্ষাসংগীতে। যেন মনে হচ্ছে ভৈরবী।

গাইড ওদের খমের ভাষায় ধমক দেয়। বোধহয় বলে দেরি হয়ে গেছে, এখন আর ওসব হবে না। ছেড়ে দে সব। ছেলেগুলো মুখস্থ বলে—ওয়ান মিনিট স্যার। ভেরি কুইক। ছুকাং ছুকাং।

আমেরিকান সাহেবগুলো স্পটে দাঁড়িয়ে ডাব খাবার ইচ্ছে প্রকাশ করল। কয়েকটা ছেলে সাঁই সাঁই করে উঠে গেল গাছে। আর ওই মেয়েলোকটি, যার পেট যথেষ্টই উঁচু, সে তার কালো দাঁতের হাসি নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল।

নে হাতো পামাতে ছচকাই নেতাং ছুকাং চাইগছেং...

আমি যেন বেশ বুঝতে পারছি মহিলাটি বলছে— ওরাও গাছ বাইছে, আর আমার ছেলের গাছ বাওয়াও দেখলে। তোমরাই বিচার করো...।

ছেলেরা ডাব নিয়ে নেমে আসতেই কয়েকজন মহিলা কাটারি দিয়ে দ্রুত কাটতে লাগল ডাব। কে আগে কাটতে পারে, মুখের সামনে আগে তুলে ধরতে পারে। প্রতিযোগিতা।

আমার সামনে যে মেয়েটা দু'হাতে ডাব ধরে দাঁড়িয়ে আছে, ওর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের আধখানা নেই।

সকাল হয়েছে, পাখিরা জেগেছে, ফরসা হয়েছে চরাচর। ডাবের উপরে শিশিরবিন্দু। মনোহর? আধখানা বুড়ো আঙুলের ডগায় মাংস-গুটুলি।

আমি ডাবটা তাড়াতাড়ি দু'হাতে তুলে নিই। স্ট্র দেয়া ছিল। সাহেবরাও ডাব খাচ্ছে। ফ্যান্টাস্টিক, এথনিক, এইসব শব্দ শোনা যাচ্ছে পাখির কলকাকলির সঙ্গে মিশিয়ে। সাহেবরা ডলার বের করল। যেন কিছু নয়। আমিও যত্নের ডলার থেকে একটা এক ডলারের নোট বের করলাম। গ্রামীণ জমায়েতে ডলারানন্দ। আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে।

এতক্ষণ কোনও পুরুষমানুষকে দেখা যায়নি। বালকদের ধরছি না। এইসব অঞ্চলে মেয়েরাই বেশি কাজ করে। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া— সর্বত্রই মেয়েরাই হাটে-বাজারে-হোটেলে। যখন এই ডাবোৎসব চলছিল, পুরুষরা ঘরের ভিতরে ভোরের মিঠে ঘুমটা সেরে নিচ্ছিল। একজন পুরুষ একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঘরগুলির দেয়াল বাঁশের, রঙিন টিনের চাল। লোকটা হাফপ্যান্ট পরা, খালি গা। হইচই দেখে আবার ভিতরে গেল এবং একটা বাঁশের টোকা মাথায় পরে বেরিয়ে এল। টোকার উপর একটা পাখির পালক গোঁজা। আমাদের গাইড ওকে দেখেই হাতজোড় করে বলল, ঝেমকতে কিনহো, ঝেমকতে। লোকটা সামনে এল। বুঝতে পারলাম লোকটা গ্রামপ্রধান। লোকটা বলল গুঃ মরনিং। গাইড পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, হি ইজ কিনহো, মিনস চিফ ওফ দি ভিলেইজ। সাহেবরাও গুড মর্নিং বলল। কিনহো বলল, কাম ইভিনিং। গুড সিপিং। গুড পাইনআপেল । গুড উওমেন।

ট্যুরিস্টরা বাসে উঠল। বাসে উঠল ওই ছেলেটাও যে তরতর করে সবার আগে গাছে উঠে ডাবের কাঁদিটা পেড়েছিল। ছেলেটা একটা জামা পরে নিয়েছে। হাতে কাটারি।

আমি গাইডের পাশে গিয়ে বসলাম। মাথার মধ্যে একগাদা প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওই ছেলেটাকে গাড়িতে তুললে কেন?

হি ইজ ভেরি গুড বয়। নাইস। হি উইল কাট দি কোকোনাটস অ্যান্ড ডু আদার জব্‌স। হি উইল গেট টিপস ফ্রম ইউ। আফতার ওল দি বোয় ইজ সন অফ দি কিন্‌হো। আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল—ওই টিপস থেকে কি তোমার কোনও কমিশন আছে? কিংবা আরও তো ছেলে ছিল, ওই ছেলেটাকেই পছন্দ হল কেন? আরও তো নারকোল গাছ ভরা গ্রাম আছে, ওই গ্রামটাতেই বা গেল কেন? তা ছাড়া একজন গ্রামপ্রধানের ছেলেকে দিয়ে এরকম কাজ করানো যায়? এরকম কত প্রশ্ন। সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় না। আবার বোঝানোও মুশকিল। ওরা ইংরেজিটা ভাল জানে না। আমিও না।

গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে। পুব দিকের গাছগাছালির ফাঁকে লাল সূর্য।

গ্রামপ্রধানকে কিন্‌হো বলা হয়? কিন্‌হো? কৃষ্ণ তো মধ্যবাংলায় কান্‌হ হয়েছিল। কোথাকার

মানুষ যে কোথায় যায়, কোথাকার কথা কোথায়। আমরা পূর্ববঙ্গের লোক। আমরা কলাগাছের থোড়কে বলতাম আইল্যা। 'আইল্যা ভাজা কাল্যাই ভাইল।' মানে কলার থোড়ের সঙ্গে কলাই ডাল খেতে ভাল। বহুদিন আইল্যা শব্দটা শুনিনি। আমার পিসিমার মৃত্যুর পরই আমার জগতে একটা ডায়লেক্টের পরিসমাপ্তি হয়েছে। বহুদিন পর ব্যাংককের ফুটপাথের খাবারের দোকানে শুনেছিলাম আইলা। আইলা-চিকেন। চেখে দেখেছিলাম, হ্যাঁ, সেই আইল্যাই তো। চিকেন দিয়ে রান্না করা।

নেতা অর্থেই কি এখানে কিন্‌হো কথাটা চলে? বিভিন্ন জায়গায় আরও শুনেছি এই শব্দটা।

ওই কম্বোডিয়ার কৃষ্ণ আর একটা কী কথা বলল? কাম ইভিনিং। গুড সিপিং। সিপিং মানে কী? কী আবার। মাল খাওয়া। সিপ করেই তো খায়। উওমেনের কথাও বলে দিল ওই গ্রামপ্রধান? এই গ্রামটা তবে কী?

কী ঝড়ঝাপটাই না গেছে দেশটার উপর দিয়ে। ফরাসিদের দীর্ঘ দখলদারি। তারপর আমেরিকান বোমা। ১৯৭৫ থেকে চিনপন্থী খমের রুজ পলপট-এর শাসন। দশ লক্ষ মানুষকে মেরেছে পলপট। তারপর ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী ঢুকেছে। তছনছ হয়ে গেছে সংসার।

এইডস সংক্রান্ত ওই সেমিনারে এসব নিয়ে কথা হয়েছিল। বলা হচ্ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চলে বেশ্যাবৃত্তির সামাজিকীকরণ হয়ে যাচ্ছে। থাইল্যান্ডের বেশ কিছু মেয়ে প্রথম যৌবনের কয়েক বছর বেশ্যাবৃত্তি করে। তারপর পরিবারে ফিরে যায়। এতে ওদের বিয়ে হতে সমস্যা হয় না। এই ধরনের বেশ্যাবৃত্তিতে রাষ্ট্রেরও মদত আছে। রাষ্ট্রের যত ঝামেলা বাঁচিয়ে দিচ্ছে বাচ্চা মেয়েগুলো। বিদেশ থেকে হাজারে হাজারে যৌনতালোভী পুরুষরা আসছে। আসলে ডলার আসছে, ডলার। মেয়েদের শরীর বেচা পয়সায় হাইওয়ে, এসি বাস, বেকারভাতাও। বেশ্যাবৃত্তির সামাজিক সম্মতি থাইল্যান্ড ছাড়িয়ে অন্য দেশগুলিতেও ছড়াচ্ছে। এতে এইডস বাড়ছে কি না এ নিয়ে তর্ক হয়েছিল। কেউ বলেছিল বেশ্যাবৃত্তি যদি বেআইনি না থাকে, গোপনতা না থাকে তা হলে এইডস-এর বিরুদ্ধে লড়া সহজ হয়। এতে এইডস বাড়ে না। থাইল্যান্ডের প্রতিনিধি বলেছিল পাটেয়ার সমুদ্রের ধারের পুলিশের পকেটেও কনডোম রাখা সম্ভব হয়েছে, যদি কোনও ট্যুরিস্টের দরকার পড়ে যায়, পুলিশের কাছে চাইলেই পাওয়া যাবে। কম্বোডিয়াও কি ক্রমশ থাইল্যান্ড হতে চলেছে? ট্যুরিস্ট স্পটের আশেপাশের সেগুন-সুপুরি-নারকোল গাছ ছাওয়া গ্রামগুলির ভিতরে জন্ম নিচ্ছে ডলার প্রত্যাশী ব্রথেল?

সি, দি পিক অফ দি টেম্পল। মন্দিরের চূড়া দেখাল গাইড। আকাশ উঁচিয়ে আছে মন্দিরের চূড়া। টিকিট কেটে ঢুকল গাড়িটা। এখনও জঙ্গল। তবে প্রাচীর ঘেরা। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা।

বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল এই আঙ্কোরক্ষেত্র। প্রায় তিনশো বর্গকিলোমিটার জুড়ে ছড়ানো ছিল এই ক্ষেত্র। কম করে দুশোটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছড়ানো আছে। এর মধ্যে বেশ কিছুটা অংশ প্রাচীর ঘেরা। এর মধ্যেই দশ-বারোটা বড় বড় মন্দির। আমাদের সামনে যেটা, ওটাই আঙ্কোরবাট। বাট মানে তো বাড়ি। বাস্তু থেকেই তো বাট। এদেশে প্যাগোডাকে বলে বাট। উচ্চারণ অনেকটা ভাট, আমরা মন্দিরের সামনে এসে নামলাম। সামনে বিশাল মন্দির। মন্দিরের পিছনের আকাশে সূর্য রয়েছে বলে মন্দিরটা সিল্যুয়েটের মতো লাগছে। বিশাল তিনটে চূড়ায় কবেকার বিদিশার নিশা। দেশ-বিদেশের কত-না ট্যুরিস্ট—ছবি তুলে চলেছে ক্যামেরায়।

গ্রাম থেকে তুলে আনা ছেলেটিকে গাইড কিছু বলল। পাউরুটি, মাখনের প্যাকেট এবং পলিথিনে ভরা ডিম সেদ্ধ দেখিয়ে দিল। তারপর আমাদের বলল—আমরা দু'ঘণ্টা ধরে এই মন্দিরটা দেখব, তারপর ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট করব। এই ছেলেটা ব্রেকফাস্ট তৈরি করুক।

আমরা চললাম। মন্দিরের সামনে বিশাল জলাশয়। জলে আঁধারমাখা মন্দিরের ছায়া। তিরতির করে কাঁপছে। তার উপর ভাসছে কোকাকোলার প্লাস্টিক বোতল।

একটি বিশাল তোরণ পেরিয়ে মূল মন্দির। চারিদিকের দেওয়ালে কারুকার্যের গ্যালারি। কম্বোডিয়ার গাইড আমাদের বোঝাচ্ছে। বিষ্ণুর অনন্তশয্যা, অমৃতমন্থন। বোঝাচ্ছে রামায়ণ।

লুঙ্গিপরা সীতা, লুঙ্গিপরা রাম। লঙ্কাজয়ের পর হনুমানদের উৎসব। শুয়োর পুড়িয়ে খাচ্ছে হনুমানের দল। ওদেরও একটা অযোধ্যা আছে। শুধু কম্বোডিয়া কেন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া—সবখানেই একটা করে অযোধ্যা রয়ে গেছে। শেষকালে কম্বোডিয়ার সীতা পাতাল প্রবেশ করে না, ভেলায় ভেসে সমুদ্রে চলে যায়। হারিয়ে যায় নীল জলে।

মূল মন্দিরের বিষ্ণুমূর্তির সামনে এখন বৌদ্ধ শ্রমণ। বিষ্ণু এখন ভগবান, ভগবান বুদ্ধ।

সেই কবে ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিলেন কৌণ্ডিল্য নামে এক বিতাড়িত রাজপুত্র। এই দেশ তখনও কম্বোজ হয়নি। সেই কৌণ্ডিল্য বিয়ে করলেন এখানকার কোনও ট্রাইবাল নারীকে। এদেরই বংশধর জয়বর্মন। নবম শতকের। খমের রাজবংশ। এক চিনা পর্যটক লিখেছিলেন—খমেররা সকালে উঠে স্নান করে। পুজো করে। খেতে বসে ভাতের থালার চারিপাশে জলের ছিটে দেয়।

গাইড খেম বং মন্দিরের গায়ের দশ অবতার বোঝাচ্ছে। বামন অবতারের গল্প বলছে।

এই গাইড খেম বং-এর রক্তেও ভারতবর্ষ রয়ে গেছে, ও কি জানে?

দু'ঘণ্টার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। ছেলেটা কাগজের প্লেটে খাবার সাজিয়ে পলিথিন দিয়ে ঢেকে রেখেছে। ছেলেটির নাম জিজ্ঞাসা করলাম। নাম লিং ঝাও।

ডিম, রুটি আর একটা ফল। অনেকটা লিচুর মতোই, তবে লিচু নয়। আমাদের আশফলের মতো বলা যেতে পারে। তবে সাইজে অনেক বড়। আর ডাবগুলোকে কেটে রেখেছে অদ্ভুতভাবে। ডাবের চারদিকটা এমনভাবে কেটেছে যেন একটা ফুলদানি।

গাইড বলল এখান থেকে প্রথমে আট কিলোমিটার দূরে প্রে-খান-এ যাব। ওটা একটা সূর্যমন্দির। তারপর পঁচিশ কিলোমিটার দূরে বান্তেশ্রী মন্দির, ফেরার সময় বেয়ন মন্দির হয়ে আবার এই আঙ্কোরভাট-এ। পুবের আলোয় একটা রূপ দেখেছি, পশ্চিমের আলোয় নাকি অন্যরূপে দেখা দেয় আঙ্কোরভাট। "ইট উইল সি ভেরি ভেরি দিফারেন্ত বাই দি ওয়েস্ট ফোকাসিং সান।" ওর ইংরেজিটা এরকমই। আমাদের বুঝে নিতে হয়।

আমরা আবার গাড়িতে উঠেছি। দু'পাশে বিশাল মাপের গাছ। প্রচুর আমগাছ আছে। কাঁঠালগাছও। কোনও কোনও কাঁঠালগাছ এত মোটা যে দু'হাতের বেড়-এ কুলোবে না। এখন শরৎকাল, তাই এসব গাছে ফল নেই। যখন গাছগুলো ফলবতী হয়ে থাকে, তখন কীরকম দেখতে হয় কল্পনা করার চেষ্টা করি। প্রচুর শাল-সেগুন-অর্জুনও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের বটগাছ চোখে পড়ছে না। আকাশটা বেশ নীল এবং এখানে-ওখানে কাশফুলের ঝোপও দেখা যাচ্ছে। এক সময় সমস্ত মন্দিরগুলোকে ঢেকে নিয়েছিল জঙ্গল। আসলে, এই মন্দিরময় রাজধানী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল খমের রাজাদের। সম্ভবত বারো শতাব্দীতে। তারপর ঘোর নির্জনতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি সাহেবরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পেলেন এই ইতিহাসের অবশেষ।

লিং আমার পাশেই গুটিসুটি হয়ে বসে আছে। ওর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করল। গাইড তো বলেছিল ও গ্রামপ্রধানের ছেলে। ও কি ভবিষ্যতের গ্রামপ্রধান? গ্রামপ্রধানের ছেলে চাকরের কাজ করছে। ওর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়।

জিজ্ঞাসা করি—হু ইজ ইয়োর ফাদার।

পাদার?

ইয়েস—ইয়েস।

ছেলেটা হাসে। কী একটা যেন বলে।

আমি বলি কিন্‌হো? কিন্‌হো?

ও ঘাড় নাড়ে। বলে ইয়াঃ ইয়াঃ।

ছেলেটা ট্যুরিস্টদের সঙ্গে ঘুরে কিছু কিছু ইংরেজি শিখেছে। ইয়েস বলে না, বলে ইয়া। থ্যাংকিউ বলে, একসকিউজ মি বলে, নো প্রবলেম বলে।

ও এবার গুছিয়ে বলল, মাই পাদার কিন্‌হো সিরিলিং ঝাও।

জিজ্ঞাসা করি, স্কুল? ডু ইউ গো টু স্কুল?

নো স্কুল। নো। মাথা নাড়ায়। এক্কেবারে আমাদের বাসন্তী কিংবা পাথরপ্রতিমার ড্রপ আউট।

ক'জন ভাইবোন জিজ্ঞাসা করলাম। বোধহয় বোঝাতে পারলাম না। ও শুধু হাসল। কী খেতে ভালবাসে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করলাম, বোঝাতে পারলাম না। আমাদের গাইডটি ওর সঙ্গে কথা বলে জানাল—ওর প্রিয় খাবার ইঁদুর।

তখন গাইডটি জানাল কম্বোডিয়াতে ইঁদুর অনেকেরই প্রিয় খাবার। উইনটার র‍্যাটস ভেরি টেস্টি বিকস দে ইট প্যাডি ফ্রম ফিল্ডস। যেন এক্কেবারে বাঁকুড়ার লোধা ছেলেগুলি। অঘ্রাণের ইন্দুরে কী ত্যাল বাবু...।

গাইড বলল, শুয়োরও খুব প্রিয় খাবার, কিন্তু বড্ড দাম। আরেকটা প্রিয় খাবার আছে, স্কুইরেল। কাঠবিড়াল। কিন্তু পাওয়া যায় না। সব শেষ করে দিয়েছে।

গাঢ় সবুজের মধ্য দিয়ে আরও কিছুক্ষণ বাস চলার পর এক জায়গায় বাস থামল। একটা বিরাট মন্দির। অনেকটা রথের মতো দেখতে। খাড়াই সিঁড়ি চলে গেছে। বড় মন্দিরটার দু'পাশে দুটো ছোট মন্দির। গাইড বলল, দিস ইজ প্রে-খান। টেম্পল অফ দা সান। দুটো বিশাল গাছ মন্দিরের সামনে ছায়া ফেলেছে। গাছের নাম জানি না। গাছের ডালে কাঠবিড়ালি ঘুরছে। কাঠবিড়ালি দেখেই আমাদের লিং খুশি হয়ে উঠল—ছুকাং।

গাইড জানাল এই জঙ্গলটা প্রোটেকটেড বলে এখানে ছুকাং মানে স্কুইরেল দেখা যাচ্ছে। এখানে তবু কিছু টিকে আছে। বাইরের সব শেষ হয়ে গেছে।

সাহেব ট্যুরিস্টরা সব ক্যামেরা বাগিয়ে ছবি তুলছে মন্দিরের। আমিও আমার ডিজিটাল ক্যামেরায় একটা গাছে বসা কাঠবিড়ালিকে তাক করছি। লিং আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ক্যামেরার ফ্ল্যাট স্ক্রিনে ওই দৃশ্য দেখে কীরকম উত্তেজিত হয়ে যায়। লাফিয়ে ওঠে। আমার কাঁধেই একটা চাপড় মেরে দেয়। বলে হু-জি, ছুকাং ফিদাওনা খেতে। লিং দ্রুত ওই গাছের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে, থ্যাংকিউ, তারপর গাছে উঠতে থাকে।

সাহেবরা মন্দিরে উঠবে কী, ছেলেটার গাছে চড়া দেখতে থাকে। ভিডিও তুলতে থাকে।

গাইড বলে, ও কি কাঠবিড়ালির বাসা দেখতে পেয়েছিল জুম ক্যামেরায়? 'ছুকাং ফিদাওনা' মানে তো কাঠবিড়ালির বাসা। বাট, দ্যাট বয় ইজ হিমসেলফ এ ছুকাং। ঠিক কাঠবিড়ালির মতোই কীরকম গাছ বাইছে দ্যাখো। তা ছাড়া উঠবে নাই বা কেন? ওরা তো ঝাও, মিন্‌স হনি কালেকটার্‌স। ইনিটিয়ালি দিজ পিপল্‌স লিভড ইন মেকং দেলতা এরিয়াজ। দে আর ফ্রম মেকং দেলতাজ।

বলে কী গাইড? ওরা হনি কালেকটার্‌স? মানে মধু? মানে ওরা মৌলে? মেকং ডেলটা থেকে এখানে এসেছে? মেকং ডেলটা মানে তো মেকং-এর সুন্দরবন!

একটা উঁচু ডালকে জড়িয়ে ধরে উপরে উঠছে লিং। একটা খাঁজের উপর বসে কী যেন করছে। গাছের অন্য ডাল ঢেকে দিয়েছে ওকে। মেকং-এর মৌলে এখন কাঠবিড়ালি।

ওদেরও কি বনবিবির গল্প ছিল?

মৌ দাও মা মৌ দাও? গরান-হোগলা-গেইয়া-গোলপাতা-সুন্দরী গাছ? বিধবা গ্রাম?

ওদেরও বিধবা গ্রাম আছে? আছে। যুদ্ধে মরা পুরুষদের কারণে।

মেকং মোহানা ছেড়ে ওরা এখন ট্যুরিস্ট স্পটে। মধু নয়, ডলার শিকারি।

নেমে আসছে লিং, মুখে হাসি। লিং-এর বাবা একজন কিন্‌হো। গ্রামপ্রধান। লিং-এর বাবা ফিসফিস করে বলেছিল, কাম ইভিনিং। গুড উওমেন। ওর স্ত্রী, লিং ঝাও-এর মা-ও কি গুড উওম্যান? ডলারলাগা শরীর! আমি লিং-কে দেখতে থাকি। লিং-এর চোখ কি ততটা ছোট? নাক কি যথেষ্ট চাপা? লিং-এর হাতে একটা বড় মাপের পাতা মুড়িয়ে ঠোঙার মতো। লিং-এর সারা মুখে খুশি। ও সামনে এগিয়ে আসে। আমাকে পাতার ঠোঙাটা দেখায়। বলে ছুকাং টুচ্চি। ইঁদুরের ছানার মতো দেখতে চারটে প্রাণী। লালচে রং। লম্বা লেজ, ছোট্ট ছোট্ট চোখ, হাত-পা নড়ছে, লেজ নড়ছে।

ছুকাং টুচ্চি। ছুকাং তো কাঠবিড়ালি। এগুলো কি কাঠবিড়ালির বাচ্চা! গাইড মাথা নাড়ায়। বলে বেবি স্কুইরেল। লিং একটা ছোট্ট পলিথিনের ব্যাগ জোগাড় করে। পাতার ঠোঙাটাকে পলিথিন ব্যাগে ভরে আমায় দেয়। আমার কাঁধের ঝোলা ব্যাগের দিকে ওর আঙুল। ইশারায় বলে, ওই ব্যাগের ভিতরে যত্ন করে রেখে দাও।

আর কাউকে নয়, আমাকেই বলল লিং। আমাকে ওর নিজের লোক মনে হয়েছে। একবার ভাবলাম, বলি, কেন এগুলোকে খাবে, বড় হলে এরা গাছে গাছে ছুটত, এদের বাঁচতে দাও। কিন্তু এত কথা বোঝাতে পারব না। আমি ওর ঠোঙা ভরা কাঠবিড়ালির ছানা গ্রহণ করতে একটু ইতস্তত করছিলাম, লিং আমায় বলল—প্লিজ...। আঙুল দিয়ে কাক দেখাল। উপর আকাশের চিল দেখাল। বুঝলাম ও কী বলতে চাইছে। আমি পলিথিন ব্যাগে ঢোকালাম।

সামনেই সূর্যমন্দির। খাড়া পাথরের সিঁড়ি। গাইড বলল, দেরি হয়ে গেছে, যাওয়া যাক। আমরা যাচ্ছি। কালোপাথরের খাড়া সিঁড়ি। লিং এল না। কী সব বলল চেঁচিয়ে। গাইড বলল—ও এখন আসবে না, আরও ছুকাং টুচ্চি খুঁজতে যাচ্ছে গাছের কোটরে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। গাইড বলছে, মহারাজা জয়বর্মন তৈরি করেছিলেন এই কালোপাথরের মন্দির। এখানকার অন্য মন্দিরগুলো বেলেপাথরের তৈরি, শুধু এই মন্দিরটাই কালোপাথরের। তিনশো মাইল দূরের কোনও পাহাড় থেকে কেটে আনতে হয়েছে কালোপাথর।

সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের কাছে গেলাম। কয়েকটা ভাঙাচোরা ঘোড়া। গুনে দেখলাম পাঁচটা। একটার মুণ্ডু নেই। গাইড বলল, এক সময় সাতটাই ছিল। একটা নিয়ে গেছে লোর্ড ইন্দ্র আর একটা নিয়ে গেছে লোর্ড বুডঢা। ভিতরে একটা কালোপাথরের দাঁড়ানো মূর্তি, কোনারকে যেমন, গাইড বলল ভোরের প্রথম পুবের আলো পড়ে এই সূর্যমূর্তির মুখে। এখন রোদ্দুর পড়েছে মূর্তিটির পায়ের কাছে। এখন বেলা সাড়ে এগারোটা।

মন্দিরের ভিতরের চার দেয়ালেই পাথরের জাফরি। গাইড বলল, সারাদিনই এই মূর্তির কোথাও না কোথাও সূর্যের আলো পড়ে। মন্দিরের ভিতরে হাজার বছরের ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে আছে। এখন আর পূজাপাঠ হয় না। সূর্যদেবের কানের গহ্বরে কোনও পোকা বাসা বেঁধেছে। ঘাড়ের উপর স্তব্ধ হয়ে আছে একটা গিরগিটি, কিন্তু হাতে বাঁধা রঙিন কাপড়। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা। কারা সব মানত করে গেছে। কী একটা পোকার একটানা শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই চরাচরে। তখনই একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। একটা আর্তচিৎকার। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। আবার চিৎকার। মনে হল যেন লিং-এর গলা। খেম বং বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। আমরাও। দেখলাম একটু দূরে, একটা ঝোপের সামনে বসে আছে লিং। একটা হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে অন্য হাত। আমাদের সবাইকে দেখতে পেয়ে লিং চিৎকার করে কিছু বলল। ওটা শুনে খেম বং বলল, ওঃ, শিট। স্নেক বাইট। খেম বং সূর্যমূর্তির হাত থেকে একটা কাপড় খুলে নীচে নেমে যায় দ্রুত। কাপড়টা দিয়ে ওর ডান হাতের কবজির কিছুটা উপরে বেঁধে দেয়। ওর ডান হাতের কবজির কাছটায় সাপে কামড়েছে। লিং-এর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়। বেশ বুঝতে পারছি, ও বলছে, তোমার কিছু হবে না, ভয় পেয়ো না, এই তো তোমার হাতে বেঁধে দিয়েছি সূর্যের ডোর।

খেম বং আমাদের বলে— ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল। এই অ্যাকসিডেন্টটার জন্য আমরা তৈরি ছিলাম না। ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এখন বেলা বারোটা বাজে। দুটোর মধ্যেই আশা করি ফিরে আসব। তারপর আমরা বান্তেশ্রী যাব। লাঞ্চ নামিয়ে রাখছি, আপনারা দয়া করে খেয়ে নেবেন। ছেলেটা গাছের কোটরে হাত ঢুকিয়ে কাঠবিড়ালির বাচ্চা তুলতে গিয়েছিল। সাপে ছোবল মেরেছে। সাপও তো আসে কাঠবিড়ালির বাচ্চা খেতে। মনে হচ্ছে বিষাক্ত সাপ। জানি না, কী হবে। কেন যে ওকে আনতে গিয়েছিলাম। আমাদের ড্রাইভারের সঙ্গে একজন হেল্পার থাকে, সেই সব করে। আজ সেই ছেলেটি আসেনি, জ্বর হয়েছে। তাই ওকে এনেছিলাম আজ। আপনারা দয়া করে মানিয়ে নেবেন।

লিং আমার দিকে একবার কাতর তাকায়। আমি বাংলায় বলি—ভাল হয়ে যাবে বাবা, ভাল হয়ে যাবে। ও ঘাড় কাত করে।

জায়গাটা বেশ ভালই। নির্জন। গাছের ছায়া, পাখির ডাক, প্রজাপতি, ফড়িং, ফুল, জঙ্গলের গন্ধ। একজন সাহেব বলল, সাবধানে থাকতে হবে। এখানে সাপ আছে। একজন সাহেব বলল, মানুষ বেসিকালি ফুড কালেকটার অ্যান্ড গ্যাদারার। পয়সা আছে বলে আমরা শপিং মলে যাই, পয়সা না থাকলে তো কালেক্ট করতেই হবে। অন্য একজন বলল—বেবি স্কুইরেল খেতে কি এতই ভাল, যে এরকম রিস্ক-এর মধ্যে যেতে হয়? মাথায় গোল টুপি পরা একজন বয়স্কা মেমসাহেব বলল, এমনও তো হতে পারে, ও বাচ্চাগুলোকে ওর গ্রামের গাছে ছেড়ে দেবে ভেবেছিল। ওরা স্কুইরেল শেষ করে দিয়েছে। এই প্রজন্ম আবার এদের ফিরে পেতে চায়। এভাবে ভাবছ না কেন? অন্যরা হেসে ওঠে। বলে, কবিদের নিয়ে আর পারা যায় না। মহিলাটি বলে, থিঙ্ক পজিটিভ অলওয়েজ, বি অপটিমিস্টিক।

আমার কীরকম যেন লাগছিল। একটা বিচ্ছিরি অপরাধবোধ। আমার ক্যামেরার জুমেই তো ও প্রথমে কাঠবিড়ালির কোটর আবিষ্কার করে। ওর যদি কিছু হয়ে যায়?

চুপচাপ থাকা দু'জন ফিলিপিনো খাবারগুলো ভাগ করতে থাকে। কলা, আলু সেদ্ধ আর চিকেন বার্গার। ডাবগুলো গাড়ি থেকে নামানোই হয়নি। নামালেও কেই বা কাটত। খেতে খেতে খাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছিল। দেশ-বিদেশের খাওয়া। জাপানের অক্টোপাস, মেক্সিকোর কুমিরের ডিম, ঘানা-মোজাম্বিকের কেঁচো, রেড ইন্ডিয়ানদের কলাগাছ পোড়া ছাই....। আমি তো জানি, অহমিয়াদের প্রিয় খাদ্য ওটা, ক্ষার। কলাগাছের থোড় শুকিয়ে, পুড়িয়ে ছাই করে রাখে। রেড ইন্ডিয়ানরাও ওরকম খায় বুঝি? আমেরিকানরা একমত হল যে মঙ্গোলিয়ানদের মতো সর্বভুক প্রাণী আর নেই। কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়। আমি দেখেছি ডাঁই করে রাখা উচ্চিংড়ে বিক্রি হচ্ছে বাজারে। সাপ, সদ্য ডিম থেকে বের হওয়া রোঁয়া ওঠা মুরগির সদ্য ছানা আগুনে ঝলসে গোটা গোটা খেয়ে নিচ্ছে এরা। তবে কাঠবিড়ালির ছানাটা টু মাচ।

আরও ট্যুরিস্ট বাস এসে থামল। দেখল, আবার অন্য মন্দির দেখতে চলে গেল। আমাদের লাক খারাপ। আমেরিকানরা বলাবলি করছিল, যদি আজ সময় না পাওয়া যায়, তবে আগামীকাল আবার আসা যায় কি না। আমি আমার পকেটের ডলার এবং রিয়েল গুনতে থাকি। এক ডলার ভাঙালে ছ'হাজার রিয়েল পাওয়া যায়।

এক কাপ চা তিনশো রিয়েল, একটা সিগারেট দুশো। আজকের ট্রিপটা যদি কমপ্লিট না হয়, খেম বং কি আগামীকাল ফ্রিতে ট্রিপটা করিয়ে দেবে? নিদেনপক্ষে হাফ টাকায়? সে পরে হবে। ছেলেটা বাঁচুক।

আলোচনা হচ্ছিল এখন কী করা উচিত। হেঁটে হেঁটে ছড়ানো-ছিটানো মন্দিরগুলো দেখা সম্ভব নয়। একজন বলল, গাইডের মোবাইল নম্বর তো রয়েইছে, ফোন করেই দেখা যাক। একজন মোবাইলে ফোন করে জানল ছেলেটিকে এইমাত্র হাসপাতালে ভরতি করানো হয়েছে। ছেলেটির এখনও জ্ঞান আছে। ও আসছে।

তা হলে তো এখনই এসে পড়বে। সিয়েম রিপ থেকে এই জায়গাটা কুড়ি কিলোমিটারের মতো। আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে। এখন ঘড়িতে একটা চল্লিশ। গোল টুপি পরা বুড়িমেমটা বলল—তা হলে এই সময়টুকু আমরা এখানে ওই লর্ড সান-এর কাছে ওই ছেলেটার জন্য প্রে করতে পারি। তারপর এক অদ্ভুত দৃশ্য। বারোশো বছরের পুরনো এক মন্দিরের সিঁড়ির সামনে আমেরিকান, ফিলিপিনো, ভারতীয় মিলে একটা বিশ্ব একটা গরিব কম্বোডিয়ানের জন্য আকাশে হাত তুলল। আকাশে চিল।

গাড়িটা এল। খেম বং-এর মুখে চিন্তার ছাপ। ঠোঁটটা উলটে বলল, আনফরচুনেট।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওর বাড়ির লোকজন জানে তো? খেম বং বলল, হাসপাতালে যাবার সময় বাড়ি থেকে ওর বাবাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম।

হাসপাতাল কেমন?

সিয়েম রিপ-এর হাসপাতাল খুব ভাল। নমপেনেও এরকম হাসপাতাল নেই।

বেঁচে যাবে?

ভগবান বুদ্ধ জানেন। তবে হাসপাতালের ডাক্তার বলেছে খুব বিষাক্ত সাপ কেটেছে।

ছেলেটিকে সাপে কেটেছে, কিন্তু আমরা তো পঁচিশ ডলার করে দিয়েছি, এতদূর থেকে এসেছি, আমরা গাড়িতে উঠলাম। দেখতে যাব।

বান্তেশ্রী মন্দির। এখন আর মন্দিরের কথা বলার মানে হয় না। ফেরার সময় বায়ন মন্দির। সূর্য ডোবার আগে আর একবার আঙ্কোরভাট। পশ্চিমের আলোয় সত্যিই অন্যরকম। গোল টুপির মেমসাহেব বুদ্ধ বা বিষ্ণুর কাছে দাঁড়িয়ে টুপি খুলে বলল, ও লর্ড, সেভ দি বয়।

এবার ফিরব। আমার ব্যাগের পলিথিনে রয়ে গেছে সেই কাঠবিড়ালির ছানা। ব্যাগ থেকে পলিথিনটা বের করি। দেখি ওদের হাত-পা নড়ছে। বেশিক্ষণ তাকাতে পারি না। রেখে দি। খেম বং-কে বলি— এগুলো যে আমার কাছেই রয়ে গেল, কী করব এসব!

খেম বং বলল, ফেরার সময় ওদের ঘর হয়েই যাব। ওদের দিয়ে দিয়ো।

তখন গোধূলি। পাখিরা ফিরছে। রাঙামাটির পথ দিয়ে আমাদের ছোট বাস চলে এঁকে-বেঁকে। গ্রামে ঢুকতেই ওই স্বপ্নদেখানো কাঠের তোরণ। তোরণের তলা দিয়ে চলে যায় গাড়ি। গ্রাম ঢুকি। কান্না। সারা পৃথিবীর কান্নার ভাষা একই রকম।

আস্ত কলাপাতার উপরে শুয়ে আছে লিং। নাকে তুলো গোঁজা। ওর গায়ের উপর উথালিপাথালি ওর মা। ওকে ঘিরে বসে আছে সবাই। একটু দূরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে কিন্‌হো। সূর্যডোবা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

খেম বং মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় কিন্‌হোর দিকে। কিন্‌হোর কাঁধে হাত রাখে। কিছু বলে। কিন্‌হো দু'হাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে চায়। মাথা থাবড়ায়। তারপর সন্তানের শবদেহের মাথার কাছটায় বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে।

আমরা গাড়ির সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি। মেমসাহেবটা টুপি খুলে হাত রেখেছে। একটা সন্ধ্যা লাগা শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়ল গাড়ির বনেটে।

খেম বং আমাদের কাছে ফিরে এল। আমার কাছে হাত বাড়িয়ে কাঠবিড়ালির বাচ্চাগুলো চাইল। আমি পলিথিনের ক্যারিব্যাগটা ওর হাতে তুলে দিলাম। খেম বং ওটা নিয়ে কিন্‌হোর কাছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কান্নার শব্দটা কেমন পালটে গেল। একটা শোরগোল মতন। লিং-এর মা-ও কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ।

খেম বং বলল—ওই বেবি স্কুইরেলগুলোকে নিজের খাবার জন্য ধরেনি লিং। ওদের ক্ল্যানের গর্ভিণী মায়েদের জন্য এনেছিল। ওরা ঝাও ট্রাইব। গাছে উঠে মধু পাড়ার জাত। ওদের বিশ্বাস, যদি কোনও গর্ভিণী মহিলা কাঠবিড়ালির বাচ্চা খায় তবে আগামী সন্তান কাঠবিড়ালির মতোই গাছ বাইতে পারবে। এখন, এখানে বিদেশিদের জন্য ডাব পাড়তে হয় যে ওদের।

আমাদের দিকে এগিয়ে আসে কিন্‌হো। কথা বলতে থাকে। বিষাদ-মাখানো কথা। চোখের জল মেশানো কথা খেম বং অনুবাদ করে দেয়। বলে—আমার ছেলের জন্য আমি গর্বিত। ও কিন্‌হোর ছেলের মতোই কাজ করেছে। আগামী প্রজন্মের জন্য ও প্রাণ দিল। এই টুচ্চি ছুকাং গর্ভিণী মায়েদের বিলি করে দিতে হবে। আমার ছেলে তো এটাই চেয়েছিল। কিন্‌হো ওই পলিব্যাগ আমার হাতে তুলে দিয়ে আমার হাত ধরে ভাঙা গলায় কত কিছু বলে যায়। ওই কথাগুলোই খেম বং বলতে থাকে আমায়।

কিনহো যেন মন্ত্র পড়ছে। হে বিদেশি, তুমি গ্রহণ করো এই পবিত্র টুচ্চি ছুকাং। আমি গর্ভিণী মায়েদের কাছে এ জিনিস তুলে দেবার যোগ্য নই। কারণ আমার নিজের স্ত্রী গর্ভবতী। লিং-এর পরে দুটো সন্তান মারা গেছে। লিং-ও চলে গেল। লিং ছিল কাঠবিড়ালির আশীর্বাদ পাওয়া এক

ক্ষিপ্র সন্তান। আমার আগামী সন্তান বহন করছে আমার স্ত্রী। ও তো চাইবেই আর একটা লিং ফিরে পেতে। ওকে কী করে বঞ্চিত করব আমি? অথচ আমার গোষ্ঠীতে রয়েছে আরও গর্ভবতী মেয়ে। ওদের আগামী সন্তানদের পিতৃপরিচয় জানার দরকার নেই আমার। আমি জানি ওরা সন্তানধারক মা। ওরাও তো চাইবে ওদের সন্তানের মধ্যে থাকুক কাঠবিড়ালির অংশ। যে সমস্ত মা ওদের সন্তানদের দুধ খাওয়াচ্ছে, ওদেরও পরম আকাঙ্ক্ষার ধন ওই টুচ্চি ছুকাং। স্তন্যদান করার আগে পবিত্র মাতৃস্তন্য ছুকাং-এর স্পর্শ পেতে চায়। দুগ্ধবতী মায়ের দুধের ভিতর দিয়ে সন্তানের শরীরে চলে যায় ছুকাং-এর আশ্চর্য শক্তি। এমতাবস্থায় আমি কী করব? আমি যে কিন্‌হো। কিং করিষ্যামি? আমি কি নিরপেক্ষ থাকতে পারব? জাতস্য নিধনে দুঃখং পোষাণাদৌ ততোধিকং। অতএব হে কৃষ্ণচামড়ার বিদেশি, তুমিই, হ্যাঁ, তুমিই কৃপা করে বণ্টন করো এই পবিত্র প্রকৃতি।

আমরা যে জঙ্গল ফেলে দুটো ভাতের জন্য চলে এসেছি এই শহরে। ডাব পেড়ে খাই। হে বিদেশি, আমাদের বাঁচাও। রক্ষাংসি, রক্ষাংসি ভদ্রে...

আমাকে ওরা নিয়ে গেল একটা গাছের তলায়। ওই কিন্‌হো, আর মৃতদেহ পিছনে ফেলে আসা আরও কিছু মানুষ। গাছটা চিনতে পারলাম। কদম্ববৃক্ষ। আমার হাতে পবিত্র পলিব্যাগ। কিন্‌হো আমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছে পালক-লাগানো বাঁশের টোকা। টোকা নয়, মুকুট। আমিই কিন্‌হো। কদম্বের ডালে ডালে ঝুলছে অদৃশ্য আব্রু-আর্তনাদ। মরণকে পিছনে রেখে গর্ভবতী-দুগ্ধবতী জননীরা সব উঠে এল। আমার চারদিকে ওরা। হাত বাড়িয়েছে আমার দিকে। দশ, শত, সহস্র হাত।

কেন চেয়ে আছো গো মা, মুখপানে...।

শারদীয় বর্তমান, ২০০৫

চক্ষুদান

যমকে বাঁচিয়ে রেখেছে যদু, কারণ যমই বাঁচিয়ে রেখেছে যদুকে। যদুর হাতের পলিথিন ব্যাগে গুটিসুটি হয়ে আছে যমরাজা।

যদু চিত্রকর পটুয়া হলে কী হবে, পট আঁকে না আর। ওর বাবা আঁকত। পিলচুহাড়াম পট, সীতাহরণ পট, জগন্নাথ পট, সিধু-কানু পট, চক্ষুদান পট, আরও কত। বাবার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান গেয়ে সিধে নিত। গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে ওসব আঁকে না আর। লোকে আর পটে আমোদ পায় না। লোকে পারলে সিনেমা দেখে, ভিডিয়ো দেখে, টিভি দেখে। পুরনো সব পটগুলো ন্যাতা-কানি হয়ে হারিয়ে গেছে।

যদু চিত্রকরের হাওয়াই চটিতে এখন লাল ধুলো। জংলা রাস্তা উজিয়ে যজমান বাড়ি যাচ্ছে যদু। খবর এসেছে বুরুডি গাঁয়ের সাধু হাঁসদা মারা গেছে। যদু নিয়ে যাচ্ছে যমরাজার ছবি আর চক্ষুদান পট। সাধুর বাড়িতে গিয়ে পটে চোখ আঁকবে, তাতে মরা সাধুর মুক্তি হবে।

যম কাউকে তুলে নিলে সেই বাড়ি গিয়ে একটা যমপট দেখায় যদুরা। যম বন্দনা হলে চোখদানের পট দেখায়। যে মরল, তার চোখ দান করে। তাতে মরা মানুষের মুক্তি হয়। যমপটে গোঁপওলা যমরাজার ছবি আছে। পুরনো পটটা নষ্ট হয়ে গেছে বলে বছরখানেক আগে নতুন একটা পট আঁকিয়েছে যদু ওর ছেলে গগনকে দিয়ে। ছেলেটার পা দুটো বেঁকা কিন্তু হাত ভাল। ও এবার যমরাজার চোখে চশমা দিয়ে দিয়েছে। যদু বলেছিল, আমার দিগের চোদ্দ পুরুষ বিঁতে গেল কেউ যমরাজার চখে চশমা পসায়নি, তু কী করলি ইটে? গগন বলেছিল, যম বূঢ়া হঁইছে কিনো, চখে দিশে না ভাল, তাই পঁসাঞে দিলম।

যদুর ভাগে এখন সাতটা গ্রাম আছে। ওসব গ্রামে কোনও 'হড়' মানে মানুষ মরে গেলে যদু খবর পায়। তখন পট নিয়ে যায়। প্রথমেই পা ধোওয়ার জল পায়, পা মোছার নতুন গামছা পায়, জল-বাতাসা পায়। উঠোনে এক গাবল মানুষ জড়ো হয়, হাতজোড় করে জোহার জানায়। যদু পট দেখায়, যম দেখায়। সাঁওতালি ভাষায় বলে মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। আমাদের পিতৃপুরুষরা সব যেখানে গেছেন, সবাইকেই যেতে হবে সেখানে। সেখানে ভাল জায়গা আছে, খারাপ জায়গাও আছে। বাঘ-সাপ-পোকামাকড় ভরতি জায়গা যেমন আছে, ফলের গাছ ভরতি বাগানও আছে। সেখানে পেটভরা খাবার, মিষ্টি জলের ঝরনা, আরাম করার পাথর শয্যা আছে। যে হড়টি মারা গেল, ওপারে গিয়ে তাকে খুঁজে নিতে হবে সব ভাল কিছু। এজন্য চাই চোখ। মরা মানুষের চোখ থাকে না।

এরপর একটা মানুষের ছবি দেখায় যদু পটুয়ারা। দুটো হাত দু' পাশে ছাড়ানো। চোখ নেই, চোখের জায়গাটা সাদা।

এবার ঝোলা থেকে বের করে নিমকাঠিতে লাগানো ভেড়ার লোমের সরু তুলি। ছোট কৌটায় আনা তেল আর ভুষো কালির রং তুলিতে জড়িয়ে চোখ আঁকতে আঁকতে বলে, মেৎ তে এঞ্জেলমে। তিরপিৎ কঃ মে। গড়ো আলে মে...। চক্ষুদান হও, সম্পূর্ণ হও, আমাদের সহায় হও...।

তাই বলে যদু সাঁওতালি বলতে পারে না। কয়েকটা কথা জেনে রেখেছে শুধু। দাকা মানে ভাত, দারে মানে গাছ, দাঃ মানে জল— এরকম কিছু। চক্ষুদানের সাঁওতালি মন্ত্রটা ওর পূর্বপুরুষের কাছে শেখা। এটা মুখস্থ মাত্র। নিজের সন্তানদের শিখিয়ে যাবে, যেতে হবে।

নতুন কোনও চক্ষুদানের আগেই চোখটাকে আবার সাদা করে দিতে হয়।

যদু যাচ্ছে বুরুডি গাঁয়ে। চুনকি নদী পেরিয়ে আর এক ঘণ্টা হাঁটলে পিচরাস্তা। তারপর বাসে তিন টাকা ভাড়া দিয়ে হাতা, আবার তিন বিড়ির হাঁটাপথ।

নদী পেরুলেই ডাহি ডুংরি। ন্যাড়া রাস্তা। গাছ নেই, ছায়া নেই, ডান দিকে 'হেদান বুড়হি'র থান। হেদানবুড়ি হলেন ক্লান্তির দেবী। হেদানবুড়ি সহায় থাকলে পথ চলার কষ্ট থাকে না। রাস্তা থেকে পাথর কুড়িয়ে বুড়ির থানে ফেলে দেয় যদু। বুড়ি ক্লান্তি গ্রহণ করেন। বুড়ির থানের চারদিকে এরকম কত কষ্ট পাথর হয়ে পড়ে আছে।

লাল রাস্তাটা মিশেছে কালো পিচ রাস্তায়। ওই রাস্তা দিয়ে টাটা যাওয়া যায়, রাঁচি যাওয়া যায়। ওই রাস্তায় বাস যায়, ট্রাক যায়। ট্রাকে কাটা জঙ্গল শহরে যায়। এখানে কয়েকটা দোকান আছে। চা-নাস্তার, সাইকেল সারাইয়ের, খইনি-বিড়ি-পানের। ধোঁয়া-ভরা খড়ের চালের চা দোকানের সামনে একটা সাদা মোটরগাড়ি দাঁড়ানো। দোকানের ভিতরে পিয়ালের তক্তায় ক'জন ফরফরা লোক বসে চা খাচ্ছে।

দোকানির নাম নেতা মহাতো। যদুর সঙ্গে ওর চেনাজানা আছে। যদু বলল, গরম কি আছে গ?

নেতা বলল— গুলগুলা ভাঁজেছি। ভাল।

যদু বলল— দাও তবে এক খামচা।

শালপাতার ডোনায় খানছয়েক গুলগুলা তুলল নেতা। বলল, চখ দান করতে যাচ্ছ বুঝি?

হ।

কোন গাঁ?

বুরুডি।

হড়টা কী ছিল?

হোমগাড পুলুশ।

তবে তো কামাই ভালই হব্যে। ফিরার সময় মালপুয়া লিও।

বাবুদের একজন বলল, বাংলা বলছেন দেখছি। আপনারা বাঙালি?

নেতা মহাতো বলে— বাংলাই তো এ দিগরের কথা। কিন্তু আমরা বুইলতে পারি, পড়তে লারি, লিখতে লারি।

আচ্ছা, গুলগুলাটা কী জিনিস?

গুড়-আটার বড়া। দিব? গরম আছে। দিব?

না, থাক।

লোকগুলো যদুকে লক্ষ করতে থাকে। ওর পরনে পাজামা আর তালি দেওয়া আলখাল্লা ধরনের পোশাক। চোখ দান করতে গেলে এই পোশাকটাই পরে।

লোকটি যদুকে বলে, তুমিও বাঙালি?

পটুয়া বটি। চিত্রকর।

কী ভাষায় কথা বলো?

সব ভাষায় বলি। হিন্দি, ওড়িয়া, সাদরি, বাংলা...

মাতৃভাষাটা কী?

আজ্ঞে?

মাতৃভাষা, মাতৃভাষা। ঘরে বউ-বাচ্চাদের সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলো?

সিটা তো বাংলাই বটে।

নেতা মাহাতো বলে, ইধারে ত বাংলাই ছিল বটে। পটকা, নারানপুর, সিনি, কুমডি সব। ই সব আগে বিহার ছিল। ইখন ঝাড়খণ্ড হইছে। আগে ইস্কুলে বাংলা পড়াপড়ি হইত। ইখন নাই। ঘরে শুধু বলাবলি হয়। আপনাদিগের পরিচয় আইজ্ঞা?

লোকটি চোখ থেকে কালো চশমাটি খুলে বলে— আমরা টিভি-র লোক। টেলিভিশন। কলকাতা থেকে বদলি হয়ে এখন রাঁচিতে। আমার নাম বিক্রম রায়।

টিভি? বাপ্পুস!

সকালে টাটায় একটা কাজ ছিল। বিকেলে আপনাদের মন্ত্রী আসবেন চাইবাসায়। টিভি-তে দেখাতে হবে। এই যে ইনি ক্যামেরাম্যান।

ক্যামেরাম্যানের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল নেতা মাহাতো। বলল, আপনিই তবে আসল লোকটি বটেন। কী আজব কল। ক্যামরার খিচা ফটোক ঘর ঘর পহুচ যাইছে। ওরা দু'জনে ক্যামেরাম্যানটিকে দেখতে থাকে। ক্যামেরাম্যানের কালো দাড়ির ভিতরে সাদা হাসি ইলিকঝিলিক করে। নেতা মহাতো কাঠের বেঞ্চির উপর পড়ে থাকা মাছি বসা মটরদানাটা আর দু-চারটে ছড়ানো মুড়ি ন্যাতা দিয়ে সাফ করে দেয়। এর চেয়ে বেশি সেবা আপাতত করতে পারে না।

বিক্রমের পকেটে বাজনা বেজে ওঠে— সারে যাঁহা সে আচ্ছা। বাজনাটাকে ও বলল সিগন্যাল। এ জঙ্গুলে জায়গায় এতক্ষণ কোনও মাথা ধরার ওষুধ পায়নি, কিন্তু সিগন্যাল পেয়ে গেল বলে আনন্দ পেল। ফোনে কথা বলল, ইংরেজি আর হিন্দি মিশিয়ে। কথার মধ্যে 'পটুয়া' শব্দটা কয়েকবার ছিল। আর ছিল 'ইনডিপেনডেন্স ডে'।

বিক্রম যদু পটুয়াকে বলল— কয়েকটা পট দেখাও দেখি।

যদুটা যেন লজ্জা পেল। বলল, কিছু তো নাই আইজ্ঞা, শুধু চখদান খান আছে।

পট দেখে বিক্রম আশ্চর্য। ওটা কী?

ইটায় মরা মানুষ। চখ নাই। আমরা চখ দান করি।

কোথায় যাচ্ছ?

হাতা। তারপর বুরুডি।

আমাদের গাড়িতে যেতে পারো। আমরা হাতা হয়েই যাব।

এরকম তোয়ালে ঢাকা তুলতুলা সিটে যদু জীবনে প্রথম। বিক্রম ক্যামেরাম্যানকে সামনে বসিয়ে যদুকে পিছনে বসাল। দু'জনের মাঝে সিটের উপর কাপড় ঢাকা ক্যামেরা।

বিক্রম বলল, একটা দরকারি কথা বলি। স্বাধীনতার পট আঁকতে পারবে?

যদু অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকায়। গাড়ির জানালায় পাহাড়ের পাড় বসানো আকাশ।

স্বাধীনতা জানো তো?

হ। গোটে পরব বটে।

কী পরব?

ঝান্ডা পরব।

ওই পরব মানাও?

না আইজ্ঞা।

শোনো। একটা পট আঁকবে। পটে গান্ধীজি, নেহরু, ভগত সিং, নেতাজি সুভাষ এঁদের আঁকবে। আর ওঁদের নিয়ে গান বাঁধবে। টিভি-তে দেখাব স্বাধীনতার দিন। টাকা পাবে। পারবে?

মাথা চুলকোতে থাকে যদু।

তোমরা এসব পট আঁকো না?

মাথা নাড়ায় যদু।

বিক্রম বলে— মেদিনীপুরের পটুয়ারা এসব পারে। ওরা কতরকম পট বানায়। ভোটের পট, পোলিও পট...। তো, একটা করে দাও না ভাল করে। সিধো-কানু পটটা পারবে তো?

পারতাম।

এখন পারো না?

মাথা চুলকোয় যদু।

গাঁয়ে ক' ঘর পটুয়া আছে?

উটা তো পোটোদের গাঁ আইজ্ঞা। গাঁয়ের নামই তো হল পটকা। আমহাদিগরকে পটিকার বুলা হইত কিনা। কিন্তু ইখন কুন পটো আর পট আঁকে না আইজ্ঞা। শুধু এই চক্ষুদান পট।

পট ছেড়ে কী করো তবে?

সব গতর খাটা কাম করি আইজ্ঞা।

জমি আছে?

আমরা সব বিপলা আইজ্ঞা।

বিপলা মানে?

বিপলাদিগের রেশনে কম পয়সা লাগে।

বিক্রম বুঝতে পারল ও বলতে চাইছে, বি পি এল। বিলো পভারটি লেভেল।

আজ চক্ষুদানের কিছু বাইট নিয়ে রাখতে পারত। উপায় নেই। মন্ত্রীর কভারেজ। স্বাধীনতা দিবসের কভারেজটা ওরই এবার। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকবে পটুয়াদের গ্রামে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন। ফ্রেমটা কল্পনা করে বিক্রম। পিছনে ঝুপড়িঘরগুলো, সামনে পাথরের চাঙড়, পাথরের উপর বসে আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। পটেতে বিরসা মুন্ডা বা সিধো-কানু বা তিলকা মাঝির কাহিনি। একটা ফ্ল্যাগও দরকার। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, টিলা-পাথর থেকে সোজা আকাশে উঁজিয়েছে। পতাকাটা কিন্তু একদম গর্জাস হবে না, একটু দুবলা। বিপলা বিপলা। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাঁশিতে জনগণমন। জমে যাবে।

বিক্রম বলে, যা হোক করে একটা বিরসা বা সিধো-কানু ম্যানেজ করো। কেউ না কেউ ঠিক জানে। কী, পারবে না? টাকা পাবে।

যদু ঘাড় কাত করে কাপড় ঢাকা ক্যামেরাকে বলে, কত পাব আইজ্ঞা?

বিক্রম বলে, পাঁচশো তো পাবেই কম সে কম।

পাঁচশো শব্দটা কেমন যেন আশ্চর্য শোনাল। যেন দিনের বেলায় প্যাঁচার ডাক। তাই আর একবার শুধোল— কত বললেন। পাঁচশো?

পাঁচশো তো বটেই, চেষ্টা করব আরও দিতে, যদি আর একজন গায়।

কুকড়া ডেকে উঠল। শালফুল ফুটল। ছৌ নাচের ধামসা বাজল। হাড়িয়া-পেঁয়াজি-কটকটি-কাঁকই-লাল ফিতে সাজানো হাঁকডাক সমেত একটা গোটা হাট যেন পটের ফ্রেম হয়ে গেল। সেখানে যদু পটুয়ার হাতে একটা মস্ত বড় ঝোলায় যা মন চায়।

পরথমে বন্দন করি টিভি-র নন্দন।
পাঁচশো টাকা দিব্যে বলে পুষ্প বরষণ ॥

ওই তো, গান মরেনি! টিভি-র ছেলেটার দিকে তাকায় যদু। চাদর ঢাকা ঘুমন্ত ক্যামরার দিকে তাকায়। অঞ্জলিবদ্ধ হয় সেই ক্যামরার কাছে। যে ওর ভাত মেরেছে।

বিক্রম বলে, শোনো, আজ শনিবার তো, ঠিক আগামী বৃহস্পতিবার, মানে গুরুবার তোমাদের গ্রামে যাচ্ছি। কীভাবে যাব বলো।

যদু গাড়ি যাবার রাস্তা বুঝিয়ে দেয়।

বিক্রম হিপ পকেটের পার্স থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বলে, টাকাটা রেখে দাও। একটা ফ্ল্যাগ বানিয়ে রেখো, ঝান্ডা। দেখেছ তো?

মাথা নাড়ে যদু। তিনরঙা।

বেশ। বাঁশের মাথায় ঝান্ডা রেখো, পটও বানিয়ে রেখো। শুক্রবার আসব। রবিবার স্বাধীনতা দিবস। ক'দিন আগেই শুটিং করে নেব। রবিবার দেখাতে হবে কিনা।

হাতায় নামিয়ে দেয় যদুকে। যদু টিভি-কে নমস্কার করে।

বাইশ ঘর পটুয়ার কেউ তিলকা মাঝির গান জানে না। সবচেয়ে বয়স্ক যে, পর্বত চিত্রকর, সে উঃ, লারছি লারছি কুথায় যে হারায়ে গেল বলে দু'হাতে ছিঁড়ছে খাংলা চুল। আর একজন গুরুপদ, দু'হাত দিয়ে কল্পিত পট সামনে রেখে গান গাইছে যেন, কান্না। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ফিট রোগের পর ওর কথা বোঝা যায় না। ওই অবোধ্য ধ্বনির ভিতর থেকে কেউ যেন কিছু আবিষ্কার করে। হ! হ! সিদু মাঝি। হ, মহেশ দারোগা। পর্বত চিত্রকর হঠাৎ বলে উঠল—

সিদু কানু চাঁদ ভৈরব চারি ভাই ছিল।
ভাগলা ডিহি গ্রামে উদের জন্ম হঞে ছিল ॥

বিপিন চিত্রকর জুড়ল—

মহেশ দারোগা আসে জঙ্গল মহালে।
নানা অত্যাচার তারা করে সাঁওতালে ॥
একদিন সিদু কানু ঘরে শুঞে ছিল।
সাদা রঙা ভগবান আইসে দেখা দিল ॥
দশখানা আঙুল ছিল তাঁর প্রতি হাতে।
বিশটি কাগজ টুকরা ধরা ছিল তাতে ॥

এবার আরও দুটি কণ্ঠ যুক্ত হয়ে গেল। শোনা গেল—

তাহাতে রয়েছে লিখা দেবতার বাণী।
গ্রামে গ্রামে ইহা ক্রমে হ'ল জানাজানি ॥
সিদু বলে শুন সবে ছাড়িও না হাল।
স্বাধীন করিতে হবে জঙ্গল মহাল ॥

মাটি খুঁড়ে কন্দ তোলার মতো কথা তুলছে ওরা। যেন বালি খুঁড়ে জল। হৃদয় জুড়ে বেদনা। ওদের চোখে জল।

যদুর ছেলে গগন পট আঁকতে গিয়ে ভাবে সিদু মাঝি কার মতন হবে? ও কখনও সিদু-কানুর পট দেখেনি। সিদুকে ওর বাবার মতো আঁকে। কাঁধে রামের মতো তির ধনু। কানুকে আঁকে বিপিন খুড়ার মতো। মহেশ দারোগা যেন বংশী রজক। যে পটুয়াদের জাত তুলে গাল দেয়। আর হুলের যে পতাকাগুলো, তার রং সবুজ। সবুজ পতাকার মিছিলই তো দেখেছে ভোটের আগে। শিবু সোরেনের।

ভোটের পুরনো পতাকা পাওয়া গেল। সবুজ। সাদা কাপড়ও জোগাড় হল। গেরুয়া তো বজরংবলির কিংবা পদ্ম পার্টির। পাওয়া গেল, পলিথিনের, ওটা সেলাই হবে না। সাদা কাপড় গেরি মাটিতে ছুপে নিল। সেলাই হল হাতে।

এবার একটি নকল স্বাধীনতা উৎসব হবে। পাঁচশো টাকা পেলে পটোপাড়ায় বুঁদিয়া বিলি হবে, যদু বলেছে। সবাই জড়ো হয়েছে স্বাধীনতা থানে। যদুদের বেশ মনে হয় এটা যেন নতুন কোনও গরাম থান। যেন ঝান্ডার গায়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার ঢিল বেঁধে দেওয়া যায়। পাথর উজিয়ে ওঠা বি পি এল পতাকাটা যেন আবেগে কাঁপছে। সে কি পটোপাড়ায় বহুদিন পর গান লেখা হল বলে?

সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। পতাকার ছায়া পড়েছে পাথর শানে। ওরা রাস্তার দিকে চোখ উঁচিয়ে বসে আছে। স্বাধীনতাবাবুরা আসছে না।

পর্বত চিত্রকর হঠাৎই বলল, পতাকার চখ কই? চখ? চখ ছাড়া পতাকা তো ন্যাতা কানি।

অনেকেই সায় দিল। বটে, বটে। মাঝখানে একটা গোল মতো চখ থাকে যে...।

নিয়ে আসা হয় ভুষোকালি আর তুলি। গগন চোখ আঁকবে। গগন কালি তুলে নেয় তুলিতে। মাঝখানে আঁকতে থাকে পতাকার চক্র চোখ। যদু চক্ষুদানের মন্ত্র পড়ে— মেৎ তে ঞেলমে। তিরপিৎ কঃ মে...। চক্ষুদান হও সম্পূর্ণ হও। আমাদের সহায় হও...।

এরা অপেক্ষা করছে। ওরা আসেনি এখনও। সন্ধ্যা হবে। হাওয়া বয় শন শন, পতাকা কাঁপে।

আনন্দবাজার, আগস্ট ২০০৪

রাক্ষসায়ন

কিছুদিন ধরে সুখময় সারা গায়ে একটা লোশন মাখছে। এই লোশনটি একজন রসায়নবিদের কাছ থেকে পাওয়া। অত্যন্ত তেতো, দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিস্বাদ এই লোশন। বেশ ভালরকম টাকা খরচ করে এই লোশনটা তৈরি করতে হয়েছে জীবনের জন্য। ওর স্ত্রীর সঙ্গে ওর দাম্পত্য বন্ধ। রাত্রে দামি ফরাসি পারফিউম মেখেও জীবন-লোশনের দুর্গন্ধ তাড়াতে পারেনি সুখময়। সুখময়ের যুবতি বউ, রূপসী বউ, পাশের ক্যাম্প খাটে শোয়। সুখময়ের গায়ে রেতে মশা দিনে মাছি বসে না।

সুখময় শোবার সময় দরজা বন্ধ করে। দক্ষিণ খোলা জানালাও। খিল, ছিটকিনি, তালা সবকিছু দিয়ে শোয়। শোয়, কিন্তু ঘুমোয় না।

সুখময় এতদিন ধরে বউকে না জানিয়ে যে টাকাপয়সা জমাচ্ছিল, একদিন সেটা বউয়ের কাছে ফাঁস করে দেয়। বউকে ব্যাংকে নিয়ে গিয়ে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে। বলে ওগো, আমি মরে গেলে একদম বিধবার মতো থেকো না। মুরগিটুরগি সব খেয়ো। আবার বিয়ে করে নিয়ো। বলতে গিয়ে গলা ধরে এসেছিল।

সুখময় হল এই নব্যবিজ্ঞানকালের মানুষ। ইলেকট্রনিক্স-তথ্যপ্রযুক্তি-কলসেন্টার- জিনেটিক যুগের সন্তান। তাই তাঁর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহের প্রস্তাব নিজের প্রেয়সীকেও দিতে পারল। গলা কাঁপলেও।

সুখময়ের বাঁ হাতে একটি মাদুলি বাঁধা আছে। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ। ইংলন্ডেশ্বরী এলিজাবেথ কর্তৃক প্রশংসিত ঈশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সুযোগ্য পৌত্র, অটলবিহারী বাজপেয়ী ও ঐশ্বর্য্যা রাই কর্তৃক প্রশংসিত শ্রীউত্তমেশ্বর ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে পাওয়া। হাওড়ার জানবাড়িতে। নিজের জানের জন্যই এই কবচ পিটার ইংল্যান্ড বা ভ্যান হুসেন সার্টের তলায় ঢাকা থাকে, না, রাখা থাকে।

রসায়নবিদ প্রদত্ত ওই বিস্বাদ ও বীভৎস লোশনটিও সুখময় জানবাড়িতে গিয়ে মহারক্ষা 'ফুঁ' দিয়ে নিয়ে এসেছে। ওটাই মাখে। মাখতে হয়। জীবনের জন্য। কে না ভালবাসে জীবন?

সুখময় আজ ছুটি নিয়েছে। ও এখন যাচ্ছে এক তন্ত্রবিজ্ঞানীর কাছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে তন্ত্রকে মিলিয়ে তিনি তন্ত্রবিজ্ঞানী। নাম ডা. বি সি বটব্যাল এম ডি-এফ ডব্লু টি (ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ট্রেনিং) বৈজ্ঞানিক কায়দায় তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ করেন তিনি। তিনি কবচের বদলে ইনজেকশন দেন। তাঁর আবিষ্কৃত ইনজেকশনগুলির নাম এরকম।

মাদার টেরিজা ইনজেকশন (কোমল ভাব আনবার জন্য)।

রবি ইনজেকশন (রবিশঙ্করের নাম। উল্লেখ্য, রবিশঙ্কর সত্তর বছরেও পিতৃত্বলাভ করেছিলেন)।

লাদেন ইনজেকশন (বোঝা যাচ্ছে। ব্যাখ্যার দরকার নাই)।

মমতা ইনজেকশন (এটা কিন্তু মনের মমতাময়তার জন্য নয়। অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জির নামে। লাদেন ইনজেকশনের তুলনায় অনেক মৃদু কাজ)।

তিনি একটা ওয়েবসাইট-ও খুলেছেন। তাঁর ওয়েবসাইট খুললে কামদায়িনী ইনজেকশন নেবার পর নরনারীর কী অবস্থা হয় তা দেখানো হয়। ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ইনজেকশন, অপারেশন ও থেরাপির কথা বলা আছে। এসব পাবেন, যদি খোলেন।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকরি করেন? অথচ সন্তান দুরন্ত? তাকে শান্ত রাখার জন্য মাসে একদিন লুলুপুপু ইনজেকশনেই কাজ হয়।

লজ্জা লজ্জা ভাব? নিজেকে প্রকাশ করতে অনিচ্ছা! লালু থেরাপি। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত চনমনে থাকতে চান! জ্যোতি থেরাপি (জ্যোতিবাবুর নামে উৎসর্গীকৃত)। মেয়েরা পাত্তা না দিলেও আমরা পাশে আছি। শাহরুকামির সাবান মাখুন (শাহরুক খান + আমির খানের মিলিত ফল)। এ ছাড়া দুর্যোধন ক্যাপসুল, বুশ ট্যাবলেট, দ্রৌপদী পাউডার, নৃসিংহ অবতার ইনজেকশন ইত্যাদিরও ব্যবস্থা আছে। ওয়েবসাইটে নৃসিংহ অবতারকে দেখানো হয়। একবার সিংহের মতো মুখ ও নখ হয়ে গিয়েছিল বিষ্ণুর। নৃসিংহ অবতার হয়ে হিরণ্যকশিপুকে কোলে তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলেছিলেন। খাওয়া নয়, ভক্ষণ। খাওয়ার মধ্যে ততটা সম্মান প্রকাশ নেই, যতটা ভক্ষণে আছে।

সুখময় এখন যাচ্ছে ওই তন্ত্রবিজ্ঞানীর কাছে। কারণ ওর খুব ভয়। সবসময় মৃত্যুভয়। ও বাঁচতে চায়।

বিজ্ঞানী বটব্যাল যে-সমস্ত তান্ত্রিক কাজকর্ম করেন, আগেই বলেছি, তিনি ওয়েবসাইটে বলেছেন তার মধ্যে বিজ্ঞান ভরপুর থাকে। ঝোড়ো হাওয়া আর ভাঙা দরজাটা... ইত্যাদি তিনি পড়েননি নিশ্চয়ই, না পড়ুন, তিনি তন্ত্রবিজ্ঞানী। তিনি বলেন বিভিন্ন হরমোন, এনজাইম ইত্যাদি মিশিয়ে তিনি একধরনের পাঁচন ইনজেকশন তৈরি করেন। এই তন্ত্রবিজ্ঞানীর সঙ্গে আগেভাগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। প্রথমে মোবাইলে ওর সঙ্গে কথা বলতে হয়। কেসটা কী জানতে চান। পছন্দ হলে টেক আপ করেন। সুখময়ের কেসটা খুব জটিল। ও ফোনে বলছিল, কিন্তু তন্ত্রবিজ্ঞানী বুঝতে পারছিলেন না। ওরা ব্যস্ত মানুষ। এত সময় কোথায়? তাই সুখময়কে বললেন— কেস হিস্ট্রিটা লিখে নিয়ে যেতে। ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট পড়ে দেখবে। অ্যাসিস্ট্যান্টের পছন্দ হলে ওকে দেবে, তখন উনি দেখবেন। সুখময় তন্ত্রবিজ্ঞানীর কাছে যাবার আগে কেস হিস্ট্রিটা লিখবে। অফিসে পারেনি। এ কেসের হিস্ট্রি অফিসে বসে লেখা যায় না। বাড়িতেও নয়। বাড়িতে এসব লিখলে যদি বউ পড়ে ফেলে, তো নিদারুণ ভয় পাবে। বউ ভাবছে লোকটা পাগল হয়ে গেছে। তাই ভাবুক।

যে-লোশনটা সুখময় গায়ে মাখে, তার একটা কী যেন নাম বলেছিল রসায়নবিদ। ডাই মিথাইল মনো সালফো প্যারা হাইড্রো কুইনো কী যেন। কিন্তু ও নিজেই এই লোশনটার নিজের মতো করে একটা নাম রেখেছে। 'জীবনামৃত'। বেঁচে থাকার জন্য এটা মেখেই যেতে হবে? সারাজীবন? কিন্তু শুধু এই লোশনেই বাঁচা যাবে? আরও কিছু চাই। কিছু থেরাপি। সাহস চাই মনে। প্রতিশোধস্পৃহা চাই। কী থেরাপি নেবে ও। লাদেন না বুশ?

সেটা তন্ত্রবিজ্ঞানীই ঠিক করে দেবে।

তার আগে একটা কেস হিস্ট্রি লেখা দরকার।

একটা ছোট বার-এ ঢুকল সুখময়। লোকজন নেই। একটা বিয়ার নিল। একটা দু' নম্বর খাতায় কেস হিস্ট্রি লিখতে থাকে সুখময়...।

আমার নাম শ্রীসুখময় সাহা। বয়স ছত্রিশ বছর। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। ইলেকট্রনিক্স। আমি চাকরি করি একটি কম্পিউটার চালিত ফার্ম হাউস-এ। ওই ফার্ম হাউসে অনেক কম্পিউটার আছে। একটা মাস্টার কম্পিউটারও আছে। কম্পিউটার খারাপ হয়ে গেলে সারানোই আমার কাজ। আমাদের ফার্মে গোরু, ভেড়া, মানুষ, এইসব পোষা হয়। ওদের শরীরে বায়োটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং করা আছে। যেমন ধরা যাক ইনসুলিন গোরু। মানে কয়েকটা গোরুর শরীরে বায়োটেকনিকালি এমন করা হয়েছে, যে ওদের প্যাংক্রিয়াস থেকে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন বের হবে। এবার ওই গোরুদের মধ্যে বিট করিয়ে এমন একটা নতুন গোরু প্রজাতি করা হল যে যাদের শরীরে ইনসুলিনের প্রস্রবন। ওই গোরুর প্রস্রাব ইনসুলিনে ভরপুর। ওই গোরুর দু' ফোঁটা প্রস্রাব দু' ফোঁটা ফেলে দিলে কম্পিউটার বলে দেয় ক' পার্সেন্ট ইনসুলিন রয়েছে। এভাবে পিটুইটারির ছাগল, থাইরয়েডের ভেড়া, এড্রানালিনের মানুষ এসবও রয়েছে।

স্কুলে পড়ছে বাচ্চারা, কাবুলে বা ইরাকে বা কাশ্মীরে, বোমা ফেলতে হবে। হায়ার এড্রানালিনের মানুষ ছাড়া পারবে কেন? বুলডেজার দিয়ে ঝুপড়ি ওড়াতে হবে। চাই উপযুক্ত এড্রানালিনসম্পন্ন মানুষ। আমাদের ফার্ম বিদেশি টাকা ও প্রযুক্তির ফার্ম। কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিংটা ওসব দেশে হয় না। এসব দেশেই হয়। আমরা ওদের কাঁচা মাল সাপ্লাই করি।

টেস্টোস্টেরন পুরুষ, প্রজেস্টন নারীও আছে আমাদের ফার্ম হাউসে। এসব কাঁচা মাল বিদেশে যায়। মেয়েদেরও কৃত্রিমভাবে মাসে দু-তিনবার ঋতুস্রাব করানো হয়। তাঁদের ঋতুরক্ত থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সংগ্রহ করা হয়। সবাই মাইনেপত্র ভালই পায়। বছরে দু'বার কোম্পানি বোনাস দেয়। আপনি স্যার আমাদের কোম্পানির কথা ভালভাবেই জানেন শ্রীতন্ত্রবিজ্ঞানী, আপনি একবার আমাদের কোম্পানিতে এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের কোম্পানি খুচরো বিক্রি করে না শুনে দুঃখিত হয়েছিলেন। দু-তিন হাত ঘুরে এই দ্রব্যগুলি আপনার কাছে যায়, ফলে দাম বেশি পড়ে। আপনি স্যার আমার উপকারটা করে দিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্যাম্পল পৌঁছে দেব।

আমার কাজ, আপনাকে আগেই বলেছি কম্পিউটারের টুকটাক মেইনটেনেন্স। আমার আন্ডারে একজন হেলপার আছে। মোটামুটি ভালই। বললে কথা শোনে। স্টেটমেন্টে একটু গ্রামারের ভুল হয়ে গেল। এখানে পাস্ট টেনস্ হবে। হেলপারটি ছিল। এখন নেই। স্যাড কেস। কেন স্যাড কেস বলব। সব খুলে বলব।

বছর খানেক আগেকার একটা ঘটনার কথা বলি। কম্পিউটারে একটা স্পার্মের স্যাম্পেল দিয়ে টি ওয়াই টিপেছি, স্ক্রিনে দেখি কিছু মাছ খেলা করছে। কিউ টিপে বেরিয়ে গেলাম। আবার টি ওয়াই। আবার মাছ। রি স্টার্ট করলাম। সেই মাছ। রঙিন মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। এরকম কী করে হয়? বারো বছর ওই কাজ করছি, কখনও এরকম সমস্যা হয়নি। আমি কম্পিউটারটা খুলি। আমার যা বিদ্যেবুদ্ধি, তাতে কোনও গণ্ডগোল পাইনি। আমার উপরে একজন ইঞ্জিনিয়ার আছেন। তিনি খড়্গপুর আই আই টি-র ইঞ্জিনিয়ার। হেভি স্মার্ট। পাইপ খান। আজকাল মেয়েদের কাগজে দেখবেন 'হে পুরুষ' বলে একটা কোলাম থাকে। ওখানে মুনমুন সেন—শতাব্দী রায়-রা সব লেখেন। ওদের কলমের পুরুষ যেন তিনি। আমার বস। সুকান্ত রায়। খুব ওডি কোলন মাখেন। ওকেই আমার ভয়। ওর হাত থেকে বাঁচান। সব বলব। পরে আসছি। কিছুই গোপন করব না। যাহা বলিব সত্য বলিব।

আমি যখন কম্পিউটারটা সারাতে পারলাম না, তখন আমি রায় সাহেবকে ডাকা করালাম। উনি আলমারি থেকে ব্লু সিট বার করে দেখলেন, কম্পিউটারটা খুলে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিচ্ছু হল না। বলছেন মাছ কী করে আসবে। কোনও সফ্টওয়ারেই তো রঙিন মাছ ইম্পুট দেওয়া নেই। যে-কোনও ফ্লপি দিলেই স্ক্রিনে মাছ। যে-কোনও সি ডি দিলেই মাছ। মাছ ঘুরছে। ছোট্ট স্ক্রিনে সমুদ্রতল। অ্যানজেল, গোল্ড ফিস, গাপ্পি, মলি...।

আমিও ভাবছি এটা কী? কী করে হচ্ছে? কম্পিউটার ভাইরাসে এমন হয়? অজানা ভাইরাস? আমি ভেবেই বা কী করব? আমি ভাববার কে? বস আছেন। আই আই টি-র বি-টেক।

বস বললেন, এর লিটারেচারগুলো বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। কাল দেখব। কম্পিউটারের ডালা খোলা। আমাকে তো থাকতেই হবে। যতক্ষণ ডিউটি ততক্ষণ। কাজ না থাকলেও। আমি বসে আছি। কম্পিউটার রুমের উলটোদিকে একটা ছোট ঘর আছে। অ্যান্টি চেম্বার। ওখানে থাকে সব স্পেয়ার, ব্যাটারি, ট্রানজিস্টার, আই সি, সিলিকন চিপ্স...। হঠাৎ দেখি ওই ঘর থেকে একটা ইঁদুর এল। ইঁদুররা যেমন আসে ওরকম নয়। বেশ স্মার্টলি। এসেই টুক করে ডালাখোলা কম্পিউটারের পিছন দিকটায় ঢুকে পড়ল। কুটুস কুটুস শব্দ। আমি তাড়া করে তাড়ালাম।

এরপর ডালা খোলা রাখা ঠিক নয় ভেবে ডালাটা আটকে দিলাম। আবার চালালাম। ও মা? দেখি আগেকার মতো। কোয়াইট নর্মালি। স্পার্ম কনটেন্ট ID^{M} পার MM^{2} ...। সব ঠিকঠাক বলছে। তা হলে? তা হলে কি ইঁদুরটাই ঠিক করে দিল?

পরদিন বস এলেন। আমি বললাম— স্যার আমি আবার ট্রাই করে ঠিক করে দিলাম। বস জানতে চাইলেন কোথায় গণ্ডগোলটা হয়েছিল? কোন সার্কিটে? কোন সেকশনে? আমি ঠিকমতো বোঝাতে পারলাম না।

এরপরও মাঝেমাঝেই খারাপ হত মেশিনটা। মেশিনটা খারাপ হলে স্রেফ ডালাটা খোলা রেখে চুপচাপ বসে থাকতাম। ইঁদুরটা ঠিক চলে আসত। সারিয়ে দিয়ে চলে যেত। ভাল করে লক্ষ করে দেখছি, সবসময় একটা ইঁদুরই আসত এমন নয়। কয়েকটা ছিল। বিভিন্ন সাইজের।

একদিন দেখলাম একটা ইঁদুর একবার ডালাখোলা কম্পিউটার দেখে গেল, তারপর চলে গেল স্টোর রুমে। তারপর বেছেবুঝে একটা আই সি নিয়ে এল ঠোঁটে করে। ইঁদুর তো সোলডারিং করতে পারে না, দাঁত দিয়ে গর্ত করে... যা পারে আর কী। আমরা পরে সোলডারিং করে দিয়েছি।

এই ব্যাপারটা আমার হেলপারটাও জেনে গেল। ওর নাম বৃন্দাবন পাল। আমি বৃন্দাবনকে বলেছিলাম, কাউকে বোলো না।

যন্ত্রটা বড্ড বিগড়োতে লাগল। স্ক্রিনে কখনও মাছ, কখনও প্রজাপতি উড়ছে, কখনও সাপ কিলবিল করেছে, কখনও বললে বিশ্বাস করবেন না, বিল গেট্স বাপের জন্মে শোনেনি এমন কিছু কড়া কিয়া গন্ডা কিয়া।। ইঁদুরটা ঠিক চলে আসত। ভেরি পাংকচুয়াল। বিদেশি কোম্পানির ইঁদুর তো।

আমাদের ফার্মে জেনেটিক্স-এর কাজ কারবার চলে, আর ওইসব পরীক্ষার জন্য ইঁদুর-টিদুর লাগে। এইসব ইঁদুর হয়তো ল্যাবরেটরি থেকে পালিয়ে চলে এসেছে কম্পিউটার রুমে। কী খাচ্ছে কে জানে? বাক্সে নানা ওম্‌স্‌-এর ট্রানজিস্টার থাকে। একদিন দেখি কয়েকটা নেই। কয়েকটা খুবলে খাওয়া। কে খেল? ইঁদুরটা?

মাঝে মাঝে বস ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে একটা খেলা খেলতাম। মেশিন বিগড়োলে স্টোর রুমের দরজাটা আগে বন্ধ করি, তারপর বসকে ডাকি। উনি কিস্‌সু করতে পারেন না। আমি তখন ওঁকে জিজ্ঞাসা করতাম আই আই টি-তে বিরাট ক্যাম্পাস, তাই না স্যার? ওদের পড়াশুনোর স্ট্যান্ডার্ড জার্মানি-আমেরিকার চেয়েও উন্নত, তাই তো স্যার? ওখানে বুঝি প্রচুর অ্যাডভান্স স্টাডি হয়?

উনি মাথা নিচু করে চলে যান! পরে ফাঁক বুঝে স্টোরের দরজা খুলে দিতাম। তারপরই ইঞ্জিনিয়ার ইঁদুর সারিয়ে দিত। একদিন আমার বস আচমকা ঢুকে পড়ল ঘরে। তখন একটা নয়, দুটো ইঁদুর মেশিন সারাচ্ছিল। বস দেখলেন। বললেন, সে কী? ইঁদুর কোত্থেকে এল। আমাকে বকলেন। এসব দেখবেন তো? ইঁদুর দুটো স্টোরে চলে গেল।

বস ঝাড়ুদার বুধনকে বলল স্টোরটা পরিষ্কার করে দিতে। বুধন এল। দরজা বন্ধ করে কী সব করল। চলে গেল। সেদিন ছিল শুক্রবার। দু'দিন ছুটি। সোমবার যন্ত্র বিগড়ে গেল। স্ক্রিনে প্রজাপতি উড়ছে। বসে আছি ইঁদুরের ভরসায়। আসছে না। গোডোর জন্য অপেক্ষা। এলেন না। বস ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাব কি না ভাবছি, এমন সময় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরে ঢুকল বুধো। মানে বুধন জমাদার। বুধোর গাম বুটে নোংরা। কম্পিউটার রুমে ঢুকবার আগে জুতো খুলে আসাই নিয়ম। বুধো তা জানে, কিন্তু ও বিচ্ছিরি অবস্থায় ছুটে চলে এল। বুধো সোজা কম্পিউটারের পিছনে চলে গেল খুট খুট করে কী যেন করল, এবং বেরিয়ে গেল।

এবার চালিয়ে দেখলাম সব ঠিক আছে। আমি আর আমার হেলপার বৃন্দাবন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ব্যাপারটা কিছু বুঝলাম না। ইঁদুরের বদলে বুধো?

ক'দিন পরে যন্ত্রটা আবার খারাপ হয়ে গেলে একইভাবে বুধো এল, সারাই করল। আমি বুধোকে আটকালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, বুধো, ব্যাপারটা কী সত্যি করে বলো। বুধো বলল, কী হচ্ছে আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথায় কেমন যেন হয়, তখন চলে আসি। একটু আগে বড় সাহেবের কমোড পরিষ্কার করছিলাম, তখনই মাথার মধ্যে কীরকম বিপ বিপ শব্দ। তারপর কিছু জানি না। কীরকম যেন নেশালাগা ঘোর। এখন দেখি আমি এখানে।

বলি মেশিনের কী করলে তুমি? ও বলে, জানি না স্যার। কিছু খারাপ করলাম? মাপ করে দেন স্যার।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। সাদা হাফ প্যান্টের ভিতরে নীল শার্ট গোঁজা। পায়ে গাম বুট। বুধন। অপরাধে নিচু মুখ।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, একটা সত্যি কথা বলো তো বুধন— স্টোর রুমের ইঁদুরগুলো তুমি কী করেছ?

বুধো সরলভাবে বলল— কেন স্যার? নষ্ট করব কেন? খেয়েই নিলাম।

ইঁদুর খেলে কেন? তুমি কি জানতে ওই ইঁদুর খেলে...

স্যার, আমরা জাতে 'কোরা'। ইঁদুর তো পেলেই খাই। প্যাঁজ-রসুন-লঙ্কা...। ইঁদুর খেতে খুব ভাল স্যার। সেদিন চার-পাঁচটা বড় ইঁদুর পেয়ে গেলাম, আর গোটা কত বাচ্চা। একবেলা বেশ ভালই হল...।

হায়! একটা ইঞ্জিনিয়ার প্রজন্ম নষ্ট করে দিল বুধো...

বুধো আমাদের ফার্ম হাউসেই থাকে। একদিন খারাপ হল মেশিন, ও তখন ঘরে বসে মদ খাচ্ছিল। ওর সেদিন অফ ডে। ও টলতে টলতে এসে ঠিক করে দিয়ে গেল।

ঠিক সেইসময় আমার মায়ের হার্ট অ্যাটাক হল। মারাও গেলেন। দিন পনেরো ছুটি নিতে হয়েছিল। ফিরে এসে দেখি আমার হেলপার বৃন্দাবন পালের জয়-জয়কার। মেশিনপত্র খারাপ হলেই সারিয়ে দিচ্ছে। কোম্পানি বলছে এরকম একটা ট্যালেন্টকে সুখময় সাহা অ্যাদ্দিন চেপে রেখেছিল, ছিঃ। ও সামান্য ইলেকট্রিয়ান সার্টিফিকেট হোল্ডার হতে পারে কিন্তু অসামান্য ট্যালেন্টেড। এতদিন বোঝা যায়নি। আমি দেখলাম সত্যিই। আমার হেলপারটি খুব তাড়াতাড়ি মেশিনপত্তর সারিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বুধো নেই। বুধো নিপাত্তা।

বুধো মাঝেমধ্যে ডুব মেরে যাবে। কাউকে না জানিয়ে। কিন্তু ও খুব 'কাজের' বলে চাকরি যায় না।

বুধোর দেশের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠানোর পর বুধোর খুড়তুতো ভাই এসে জানাল বুধো আদৌ দেশে যায়নি। তার মানে বুধো নিখোঁজ।

আমি সন্দেহ করি বৃন্দাবনকে। বৃন্দাবন কি ক্যানিবাল? নাকি ক্যারিয়ার মানুষকে ক্যানিবালও করে দিতে পারে?

আমি একদিন বৃন্দাবনকে মাল খাওয়াই। মালের ঘোরে ও বলেছিল— ও বুধোকে খেয়ে ফেলেছিল। তন্ত্রবিজ্ঞানী ডা. বটব্যালের নৃসিংহ অবতার ইন্টারভেনাস ইনজেকশনের কথাও বলেছিল। বলেছিল দারুণ ইনজেকশন।

তারপর স্যার আমারও ইচ্ছে হল বৃন্দাবনকে খাই। হবে নাই বা কেন? দোষের? আমি একটা শনিবার আপনার চেম্বারে গেলাম। আমি তো জানতাম না যে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে আপনার সঙ্গে দেখা করা যায় না। আমি যেদিন আপনার চেম্বারে গেলাম, সেদিন দেখি আপনার চেম্বার থেকে ব্যস্তভাবে বের হচ্ছেন আমার বস সুকান্ত রায়। উনি কিন্তু আমাকে দেখতে পাননি। আই অ্যাম শিয়োর। তারপর দিন থেকেই বৃন্দাবন নিখোঁজ।

বৃন্দাবন তো আমার পাওনা ছিল, তাই না? আমার রাগ হয়। রাগ হলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আমি একদিন বসকে বলে ফেলি বৃন্দাবন পালের কী হয়েছে আমি জানি। আই নো হোয়াট হ্যাপেন্ড। আপনি 'নৃসিংহ অবতার'—নেননি?

বসের মুখ হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। উনি হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, আই উইল সি ইউ।

অফিসারের সি মানে কি ইট? ই এ টি? সেই থেকে আমি গায়ে দুর্গন্ধ মেখে ঘুরি। বিস্বাদ মেখে ঘুরি। শরীরে মেখেছি মৃত্যু শুধু জীবনের জন্য। শরীরে তেতো। আমার বউকে ভালবাসার ঝোঁকে চুমু খেয়েছিলাম। ওর ঠোঁটে তিন দিন তেতো লেগে ছিল।

আমার তেতো চামড়াও কি খেয়ে নেবে আমার বস! হয়তো তাও খাবে। ক্যারিয়ার স্যার। একজনকে না মারলে যে অন্যজন টিকছে না। স্যার এখন দারুণ কাজ করছেন। সব মেশিন ঠিক করে দেন। কিন্তু আমি যে লুপ্ত বৃন্দাবন কথা জানি...।

মাননীয় তন্ত্রবিজ্ঞানী, আমাকে নৃশংসতা দিন, প্রতিশোধ স্পৃহা দিন, থাবা দিন, শ্বা দন্ত দিন আমাকে...।

আমি সুখময়।

সুবর্ণরেখা, বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০০৫

গণেশ

কতদিন হল নিরুদ্দেশ?

গত হাটবার থে।

মানে কত দিন?

ধরুন চাইর দিন।

বয়স?

বন্যার সালে জন্ম।

গোঁপ উঠেচে?

এই এট্টু রেখা মতন।

আচ্ছা। চোদ্দ। ঝগড়া-ঝামেলা কিছু হয়েছিল?

না আজ্ঞা।

টাকাপয়সা চুরিটুরি...

কীই-বা আছে আমার যে নেবে?

আইডেনটিফিকেশন মার্ক আছে কিছু?

সিটা কী স্যার?

এই ধরো কোনও আঁচিল, জড়ুল কাটা দাগটাগ...

পাশ থেকে কনস্টেবলটি বলল, চিন্ন, চিন্ন, ঝা দেকি তোমার ছেলেরে চিনা যাবে।

বিজয় হাজরা তক্ষুনি বলল, আছে স্যার, আছে। ছ্যামড়ার বাঁ কানটা বড়, এই অ্যাতো পর্যন্ত, কুলোর মতন পেরায়।

নতুন আসা মেজবাবু অবাক হয়। বলে কুলোর মতো? অসুখ-বিসুখ নাকি?

কনস্টেবলটি মানেওলা হাসি মেরে বলল, আছে স্যার, এ অঞ্চলে ব্যাপার আছে। পরে জানবেন।

নতুন আসা মেজবাবু লিখলেন: ভেরি লার্জ লেফট ইয়ার।

থানায় ডায়েরি করিয়ে বিজয় হাজরা ফিরছিল। তখনই দেখল পিচরাস্তার বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিল্টার ফুঁকছে গোপীবল্লভ। চুলে টেরি, গায়ে টেরিকটন, বগলে চামড়ার ব্যাগ, আর হাতে জামাকাপড়ের পুঁটুলি। গোপীবল্লভকে আগে নাম ধরেই ডাকত বিজয় হাজরা। বয়সে ছোট। ধোপাদের ঘরের ছেলে। টেন-ক্লাস অব্দি পড়েছিল। এখন এই ড্রেসমারা অবস্থায় কী ডাকবে ভাবছিল, তার আগেই গোপীবল্লভই ডাকল, ও বিজয়...। ডাকের মধ্যেও বেশ মশলা এসেছে। বিজয় হাজরা কাছে গেল। গোপীবল্লভ বলল, কী হল, তোমার ভায়রাভাইয়ের কেসটা কী করলে? বিজয় বলল, ওসব কেস-কথা পরে। আমার ধনঞ্জয়ডারে কী করলা তুমি, কানটা ইয়া বড় হয়ি গেল, ইস্কুলের ছেলেপিলে আর পাড়ার চেটো-চ্যাংড়ারা সব ওর লম্বা কানটা ধরি টানাটানি এমন অস্থির করি তুলিল যে ছ্যামড়া খ্যাপাপনা হয়ি নিঘঘিননেতি ঘর ছাড়ি পালাল। এখন যে কতি গেচে সে...। গোপীবল্লভ আঙুলের সিগারেটসমেত হাতের পাঞ্জাটা ভোটের হাতচিহ্নের মতো বিজয় হাজরার মুখের সামনে ধরল। মানে থামো। বিজয় থামলে গোপীবল্লভ বলল, বুঝলে বিজয়, ঝারা খ্যাপাচ্ছে, ওইসব চ্যাংড়াচোটাগুলুন, ওদের মধ্যি দেকো, অনেকিরি কান বড় হবে, নাক বড় হবে, হাত বড় হবে, কিছু ব্যস্ত হবার নেই, কাজ এগুচ্ছে।

বিজয় হাজরা বলে, সি কতা নয়। বলতিচি, তুমি ত পাঁচ জায়গায় ঘাই মারো, আমার ধনার সন্ধানটা কোরো। টিভিতে ওরে দ্যাকানো যায় না?

সে দ্যাখাবে কী করি? ওর কি ছবি আচে?

হ্যাঁ, আচে বৈকী। মেলার সময় তোলা হয়েছিল, পিছনে তাজমহলের সিন...

সে তো পুরনো। কান বড় হবার পর ছবি আছে?

তা অবিশ্যি নেই।

তবে?

তাইলে ধনারে খুঁজি পাবার কী উপায়?

সে আমি দেকচিখনে। তোমার কিছু চিন্তা করার নেই। চিন্তা করবে চিন্তামণি। তোমার ভায়রার কাছে যাবার ছেল, একটা কেস আছে বলছিলে না?

সিটা মোর দ্বারা হবেনি। আমি নে যাবনি। মাথা নাড়তে থাকে বিজয়।

ঠিক আছে। আমি একাই যাব। এড্রেসটা, মানে ঠিকানাটা ত বলবে।

ওই'ত, আনন্দপুর গেরাম।

ভায়রার নাম?

মহাদেব হাজরা।

বাস এসে গেল। সিগারেটের হলুদ ফিল্টার রাস্তার ধারের সাদা ধুতরোফুলের দিকে ছুড়ে দিয়ে বাসের হ্যান্ডেল ধরল গোপীবল্লভ।

একটু টাউনে যাব। জামাকাপড়গুনু এট্টু লন্ড্রিতি দিতে হবে।

ধোপাদের ছেলে গোপী এখন জামাকাপড় কাচাতে ধোপাবাড়ি চলল।

দিন কতক পরে গোপীবল্লভ হাজির হল মহাদেব হাজরার ঘরে। গোপীবল্লভের পরনে ফাইন ধুতি। কোঁচাটা ফুল বানিয়ে পকেটে রাখা। ঠোঁট লাল। বগলে চামড়ার ব্যাগ। বলল, বিজয় হাজরা পাঠায়ি দেছে।

কী বিত্তান্ত?

কথা আছে। দরকারি কথাবার্তা আছে কিছু।

মহাদেব হাজরা খেজুরপাতার চাটাই পেতে দিল। গোপীবল্লভ চাটাইয়ে ফুঁ দিয়ে বসল। সটাস করে ব্যাগের চেন খুলল। কিছু কাগজপত্তর বার করল।

মহাদেব হাজরা বুঝে নিল কোনও দুনম্বরি ব্যাংক পার্টি। এখন নানা রকমের ব্যাংক গজিয়েছে। মা লক্ষ্মী সঞ্চয়, ম্যাডোনা সেভিং এরকম সব। টাকা খিচে হাওয়া হয়। মহাদেব তাড়াতাড়ি বলে, টাকাপয়সা মোটে নেই, ওসব দিতি পারবনি।

গোপীপল্লভ বলে, টাকাপয়সা তোমায় দিতি হবে না, বরং উলটি তুমিই পাবা। ম্যালা টাকা। আগে ব্যাপারটা মন দে শোন্যে।

একটা ফিল্টার সিগারেট ধরায় গোপীবল্লভ, আর-একটা মহাদেবের দিকে বাড়িয়ে দেয়। কমলা রঙের ফিল্টারটা মহাদেবের দিকে চেয়ে আছে। নেব না নেব না করেও মহাদেব ওটা নেয়। গোপীবল্লভ সিগারেটের সামনে গ্যাসলাইটার খিচ করে। লাইটার ফণা তুলে দেয়।

শোনো বলি। আমি একটা কোম্পানির কাছ থেকি আসছি। কামিং ফ্রম ভেরি গুড কোম্পানি। ইন্টারন্যাশনাল লেবেলিং কোম্পানি। ইন্টারন্যাশনাল জুড়ে কাজ কারবার। এই কোম্পানি মানুষের সেবার জন্যি কাজ করতিছে। নানারকমের রিসার্চ চালাচ্ছে। বুঝলে? মহাদেব মাথা নাড়িয়ে হ-হ করে। কিন্তু বুঝতে পারে না, এতবড় কোম্পানির মহাদেবের কাছে কী দরকার। সিগারেট টানতে ভুলে যায় মহাদেব।

গোপীবল্লভ বলে, আমি হলুম গে সেই কোম্পানির লোক। ক্যানভাসার। এজেন্ট। বোঝলা না?

মহাদেব এবার অন্যরকমের মাথা নাড়ায়। মানে বোঝেনি।

গোপীবল্লভ বলে, তোমার একটা ছেলে আছে না! একটু কেমন খ্যাপা মতো।

মহাদেব বলে, খ্যাপা নয়, একটু বোকা মতন। আসলে খুব সরল পোকিতির।

কোম্পানিরে ছেলেটা দ্যাও। ছ' মাস বাদ ফিরত পাবা। সঙ্গে ট্যাকা। কাগজপত্র খোলে গোপীবল্লভ।

আমি যে বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারতিছি না।

সব জলের মতো বুঝোয়ি দিচ্চি, শোনো। আমাদের কোম্পানির কিছু গেঁড়াগেঁড়ি দরকার। ছেলেপিলে। খাবে ভাল, থাকবে ভাল। এবার টার্ম কন্ডিশনগুলি শুনি নাও। আমাদের কোম্পানিই হল যে সাইন্টিফিক কোম্পানি। রিসার্চ চলতিছে, বোঝলা না। যে ছেলেদের ওখানে নেয়া হবে, তার গার্জিয়ান ভরতি করি দিলেই প্রথমে নগদ পাঁচশো টাকা পাবে। ফাইব হানড্রেড। এবার ওই ছেলেদের অঙ্গে ইনজিকশন ফোঁড়া হবে। রিসার্চের ইনজিকশন। এক একটা ছেলের একেক অঙ্গে। কার কোন অঙ্গে ইনজিকশন ফোঁড়া হবে তা কোম্পানির সাইনটিস্টরা ঠিক করবেন। ইনজিকশন ফুঁড়লি কারওর কারওর অঙ্গ বড়পানা হয়ি যাতি পারে, বোঝলা না, যদি বড়পানা হয়ি যায়, তবে ছ' মাস পরে ছেলেসমেত পাবা পাঁচ হাজার। যদি কিছু না হয়, দু'মাস পর্যন্ত ওরা দেখবে কাজ হচ্ছে কি না। যদি কাজ না হয়, দু'মাস পরে ছেলে ফিরত সঙ্গে এক হাজার টাকা।

মহাদেব বলে, ডেলি ডেলি ইনজিকশন ফুঁড়বে? ব্যথা লাগবেনি? গোপীবল্লভ সিগারেটে টুসকি মেরে ছাই ঝেড়ে বলে স্পেশাল ইনজিকশন যে। পিমড়ের কামড়ের চেয়িও কম ব্যথা। তোমার ভায়রার গাঁয়ের অনেক ছেলেপিলে আমাদের এই ইস্কিমে গিয়ে আবার ফিরে আসিচে। ওদের জিজ্ঞাসা করলি ডিটেল জানতি পারবা। সব্বাই গায়ের ওজন বাড়ায়ে ফিরি আসিচে। ওদের কাছে ইনকোয়ারি করি দেখবে ডানলোপিলো, মানে দুধির ফেনার মতো নরোম বিছানায় শুয়িচে, ভাল ভাল খায়িচে...

মহাদেব বলল, ওই যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা বললে, অঙ্গ বড় হলি তো খুঁতো হয়ি যাবানে, তার কী হবে?

তার আর হবেটা কী? তুমি তো আর মেয়েসন্তান পাঠাচ্ছ না যে একটা আঙুল ছোটবড় হয়ি গেলে খুঁতো হয়ি যাবানে, বে দিতি পারবা না। পাঠাচ্ছ তো ছেলি। সোনার আংটি আবার বাঁকা হয় নাকি। তা তোমার ভায়রার ছেলেরও ত কানটা বড় হয়ি গেছে। তয়? কী হল? বরং হিল্লে হয়ি গেল এই বেকারির যুগে।

কী হিল্লে হল?

অ! শোননি বুঝি! তোমার ভায়রার ত আমার কাছে কেঁদি-পেদি একসা। বলে ছেলে হারায়ি গেছে। আমি বললাম, অত নার্ভাস হবার নাই, আমি দেখছি। ক'দিন আগে স্বরূপনগরে এয়িচিল সার্কাস, ঝা ভেবিচি, ওখেনে জোকারের কাজে ওরে নিয়ে নেছে। তা বোঝো। এই মাত্র চোদ্দ বছর বয়সি চাকরি জুটোয়ে নিল। কানটা বড় হল বলেই না পেল। তা এখানে বলে রাখি। কোনও গ্রান্টি নেই। সবারই যে এমনধারা অঙ্গ বেড়ে যাবে তার কোনও গ্রান্টি দিচ্ছে না কোম্পানি। আসলে ইটাই হল কোম্পানির রিসার্চ। একটা ইনজিকশন দিলে কারওর কারওর অঙ্গ বড় হয়ে যাচ্ছে আবার ওই একই ইনজিকশনে কারুর কিছুই হচ্ছে না। কেন এমনধারা হয় এই হল রিসার্চ। ওসব বড় বড় ব্যাপার। বোঝবা না। এই যেমন ধরো চিংড়ি খেয়ে কারওর গায়ে চাকা চাকা ওঠে, কারুর-বা কিছুই হচ্ছে না। তা তোমার ছেলিটারে দ্যাও।

মহাদেব মাথা চুলকোয়। কিচ্ছু বলে না। একবার বলল, ধরো যদি এদিক-সিদিক কিছু হয়ি যায়?

ইদিক-সিদিক মানে?

এই ভালমন্দ কিছু?

ও, সে কথাটা বলা হয়নি। কোম্পানি সব ব্যবস্থা রেখিচে। কিচ্ছু ত্রুটি করেনি। যদি রিসার্চ

চলাকালীন একস্‌পার করে, মানে মরিটরি যায়, তবে লগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেচ্চে কোম্পানি। বাড়ি ফিরি আসার পর ওরকম কিছু হলি অবশ্য কোম্পানি দায়ী হচ্ছে না। যদি...

থাক। থাক। ওকথা বলতি হবে না আর।

তবে কী করবা?

ভেবে দেখি। পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করি।

পরামর্শ তুমি কী করবে? সে আমি কয়ে দিচ্ছি। ডাকো তোমার পরিবার।

সে তো এখন ঘরে নাই। মুড়ি ভাজতি গেছে।

আচ্ছা। তবে ছেলিডারে নে এসো, একটু দেকি।

সে বোধহয় ঘুমুচ্ছে। ও একটু ঘুময় বেশি।

বয়স কত হবানে একচুয়াল?

ধরো দশ চলচে।

নাম কী রেখিচো?

রেখিচিলাম ত গণেশ। কিন্তু ছেলেটা এট্টু বোকাসোকা ত, কথা পষ্ট বলে না, মুখ দে লাল গড়ায়, ওরে সবায় ডাকতি লাগল ক্যাবলা। এখন বলতি গেলে ওটাই নাম।

মিলিয়ি-দুলুয়ি নাম রাখিছিলে ত বেশ, মহাদেবের পুত্র গণেশ। তবু বুধবার আসি? মঙ্গলে ঊষা বুধে পা যেথা ইচ্ছা সেথা যা।

না গো, আর ক'দিন যাক। পরের মাসে এসো।

মহাদেবের ভায়রাভাই বিজয় হাজরার ঘর এমন কিছু বেশি দূর না। আট-দশ কিলোমিটার হবে। কিন্তু কথায় বলে রাজায় রাজায় দেখা হয়, ভায়রা ভায়রা দেখা হয় না। বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই ওদের। বিজয়ের ছেলে ধনঞ্জয়ের কান বড় হবার কথা শুনেছে কিন্তু একবারও চোখের দেখা দেখতে যায়নি। এবার গেল। পরামর্শ আছে। বউকে নিল না। মহাদেব তো মাগের ভেড়ো নয়, যে সব বউয়ের কথামতো চলবে।

মহাদেবকে দেখে বিজয় হাজরারা বেজায় খুশি। স্বামীস্তিরিতে যত্নআত্তি করল। মহাদেবকে মানি অর্ডারের কাগজ দেখাল। ধনঞ্জয় ডায়মন্ডহারবার থেকে পাঠিয়েছে পঞ্চাশ টাকা। তারপর খবর কাগজের ছবি দেখাল। খামে করে পাঠিয়েছে ছেলে। ছেলের ছবি উঠেছে। মহাদেব পড়তে পারল 'ডায়মন্ডহারবার টাইমস'। ধনঞ্জয়ের মস্ত কানের উপর বসে আছে একটা টিয়া পাখি। কানের মধ্যে অনেক রিং সার সার আটকানো। একটা রিঙের সঙ্গে দড়ি বাঁধা, একটা বাঁদর দড়ি টানছে। মানে দোল খাওয়াচ্ছে। ধনঞ্জয় হাসছে। তলায় লেখা জুপিটার সার্কাসের একটি দৃশ্য।

ভালই ত আছে ধনঞ্জয়।

মহাদেব বলল, ধনার সঙ্গে ত দেখা হল না। অন্য দু-একটা ছেলেপিলে দেখাতি পারো, যারা ওই ইস্কিমে গেছে। একটু তত্ত্বতালাশ নিতাম।

বিজয় তখন মহাদেবকে নিয়ে চলল কাছেই একটা ঘরে। ঘরে নতুন টিন চকচকাচ্ছে। বিজয় বলল, যদু ঘরামির ছেলের আঙুলের টাকায় নতুন টিন। মেয়ের বিয়েও দেছে। বিয়েতে সাইকেল টেপরেকট দেছে। যদু ঘরামির গাজনের সন্ন্যেসীর মতো খাংরাখাংরা চুল, মুখে দুশ্চিন্তা লেপে থুয়েছে।

যদু বলল, ভালই হল তুমি এয়িচ। তোমার কাছেই যাব মন করছিলাম। আমার ছেলেডারেও সার্কেসে ঢুইকে দাও। যদুর ছেলে এল। বছর বারোর হবে। ডান হাতের আঙুলগুলো হাতখানেক লম্বা হয়ে পায়ের গোড়ালির কাছটা পর্যন্ত নেমেছে। একবার পিঠ চুলকোল ছেলেটা। আঙুলগুলো ঢ্যামনা সাপের বাচ্চার মতো কিলবিল করে উঠল।

যদু বলল, ছেলেডারে নিয়ি বড় ঝ্যামেলায় পড়িচি। পুলিশ খুব টর্চার মার করিল। মুখটা এখনও কেমন ফুলি রয়েচে।

টর্চার মারিল ক্যানো? কী দোষ?

আর বলো ক্যানো। গোপীর কোম্পানি ঝ্যাকন ছেলে ফিরত করিল তখন ত আঙুলগুলো সব বড় বড়। যুধিষ্ঠির তখন পিছু লাগল।

যুধিষ্ঠির কেডা?

যুধিষ্ঠিরির নাম শোননি? যুধো। চোরটা। ও বলিল, তোরে আমার বড় দরকার। তোর আঙুলগুলো এমন কায়দায় হয়িচে যে কোনও যন্তরের সাধ্য নেই এর ধারে যায়। যুধো ওরে ট্রেনিং দেল। ঘরের জানালার ভিতর দি হাত ঢুকোয়ে আঙুলের কায়দায় জিনিসপত্তোর গ্যাঁড়াতি শিখাল। এর মধ্যে কবে তালবন্দির এক মুরুব্বি মাস্টারের বউয়ের গলার হার আঙুলির কায়দায় চুরি করতি যেয়ে বিপত্তি ঘটাল। মাস্টার সেদিন বাড়ি ছিল নি। পার্টি মিটিং করতি যেয়িছিল বারাসত। মাস্টারের বউ গলায় সুড়সুড়ি পেয়ি সজাগ হল, আর দেখল মুখির উপর হাত আর লম্বা লম্বা আঙুল কিলবিল করতিছে। সে ভাবল ভূত। তারপর অজ্ঞান। মাস্টার পরদিন পুলিশি খবর করল। পুলিশ ত মোর বাপধনটারে ধরি নিয়ি প্যাঁদাল। ছেলে সব স্বীকার যেছে। যুধোরে কিচ্ছু করলনি। সে দিব্বি ঘুরি বেড়াচ্ছে। এখন পুলিশ বলতেছে যদ্দিন আঙুল এরম কেঁচোর পানা লম্বা থাকবে, মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে থানায় ট্যাক্সো দিতি হবে। আমিও যেছিলাম থানায়। বললাম, এত টাকা কোত্থে পাব। মেজোবাবু বললে, ক্যানো, এতগুলো টাকা পেলে যে, কোম্পানি দেল। বললাম, সে টাকায় মেয়ে বে দেছি। বড়বাবু বললে, তাহলি আঙুল কাটি ফ্যালো। তারপর খোঁজ করি এজেন্ট গোপীবল্লভরে ধল্লাম। সে বলে, কাটতি হয় হাসপাতালে কাটাও গে যাও। কোম্পানি বড় করি দিতি পারে। ছোট করার কুনো কনডিশন নাই।

যদু ঘরামি এবার বিজয় হাজরার কাছে প্রায় হাতজোড় করে। বলে, তোমার ছেলেডারে বলিকয়ি আমার ছেলেডারেও সার্কেসে ঢুইকে দ্যাও। ছেলেডার হিল্লে হয়ি যাক।

বিজয় বলল, ছেলের ত ঠিকানা জানতি পারিনি। আসবে নিশ্চয়। আমি বলবানে।

আর একটা বাড়িতে মহাদেবকে নিয়ে গেল বিজয়। মহাদেবকে বলল, এ বাড়ির ছেলেটার খারাপ জায়গায় ইনজিকশন দেছে। বিজয় ডাকতেই ছেলেটা এল। বিচ্ছিরি ব্যাপার। ওটা ল্যাজের মতো লাগছে। মহাদেব তো অচেনা লোক, দেখেই ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর সেঁধিয়ে গেল। বিজয় বলল, থাক। লজ্জা পাচ্ছে। এরকম আরও দু-একটা ইস্কিমের ছেলেকে নিজের চোখে ইনিসপেকশন করে ঘরে ফিরল ওরা।

বিজয়কে জিজ্ঞাসা করে মহাদেব—তুমি ভাই কী পরামর্শ দাও। ইস্কিমে পাঠাব? বিজয় বলল, আমি ভাই কী বলব। নিজির পাঁঠা...।

মহাদেব সিদ্ধান্ত নিল যা টাকা পাওয়া যাবে তার তুলনায় ফ্যাচাং এমন কিছু না। আঙুল লম্বা হয়ে গেলে চোখে চোখে রাখলেই হবে যাতে যুধিষ্ঠিরদের পাল্লায় না পড়ে। আর তা ছাড়া তার ছেলে হল হাবাগোবা। যুধিষ্ঠিররা নেবেও না। আর অন্য কোনও অঙ্গ বড় হয়ে গেলে সার্কাসে না হোক মেলায় দেখিয়ে দু'পয়সা পাওয়া যাবে। সিঁদুর-টিদুর পরানো ছ-ঠ্যাংওলা গোরু দেখেছে মেলায়। পঞ্চাশ পয়সা টিকিট কেটে দেখছে সব। গোপীবল্লভকে শুধু বলবে খারাপ জায়গাটায় যেন ইনজিকশন না দেয়, এটুকু যেন দেখে। মহাদেব আরও সিদ্ধান্ত নিল যে বউকে কিছুই বলবে না। বললে, বউ কিছুতেই ছেলেকে ছাড়বে না। হাবাগোবা যাই হোক না কেন, বহু আদরের ধন এই ক্যাবলা। ক্যাবলা হবার পর আর ছেলেপুলে হয়নি। হাসপাতালেও দেখিয়েছিল। বলে দিয়েছে নাড়িতে জট লেগে রয়েছে। অপারেশন কেস। ম্যালা টাকার ধাক্কা। এই স্কিমে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় তা দিয়ে অপারেশন করিয়ে নাড়ির জট ছাড়িয়ে নেবে। গোপীবল্লভ নিতে এলে বউকে বলবে কলকাতার বড় হাসপাতালে চিকিচ্ছের জন্য যাচ্ছে। ছ' মাস পর ভাল হয়ে ফিরে আসবে। আর গোপীবল্লভকে অনেক করে বুঝিয়ে বলবে—দেখো, খারাপ জায়গাটায় যেন ইনজিকশনটা...।

সকাল থেকে মেঘ। বাতাস থম মেরে আছে। গাছের পাতা নড়ে না। বিবিধ ভারতী বাজে।

মহাদেব ওর ছেলেকে আদর করছে সকাল থেকে। ওর মুখের লালা মহাদেবের সারা গায়ে লেপটেছে। বিবিধ ভারতী বাজে। ক্যাবলা হাতের আঙুলগুলোয় আঁকড়ে ধরে আছে ট্রানজিস্টার। ক'দিন আগে কিনে এনেছে মহাদেব। ছেলে চলে যাবে। ক'দিন বাজাক। বড় শখ ছিল ছেলের।

মহাদেব ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, কী রে, ওখানে গিয়ে ভাল থাকবি ত বাবা?

ঠাকব।

আমাদের জন্য খুব ভাববি?

ভাবব।

ইনজেকশন দিলে ব্যথা লাগলে কাঁদিস না।

কাদব না।

আমাদের জন্য কাঁদবি না ত!

কাদব না।

চোখের জল ফেলবি?

ফেলব।

আসলে হাবাগোবা ছেলেটি ঠিক মতো বুঝতেই পারছে না কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কী জন্য যাচ্ছে।

মহাদেবের বউ মুড়ির মোয়া বাঁধছে। গুড় মাখানো মুড়িতে নুন মাখানো জল পড়ছে। কাল থেকেই কাঁদছে ও। বিবিধ ভারতী বাজছে।

বাইরে ঘুঘু ডাকে। এমন ঘুঘু কি রোজই ডাকে? বাতাস থম। একটা পাতা খসে গেল। ডমডম ডিগাডিগা। মায়া মমতা কষ্ট লেগে লেগে মুড়ির মোয়াগুলো গোলাকার হয়ে ওঠে ক্রমশ। একটা নিয়ে ক্যাবলার হাতে দেয়। বলে, হাসপাতালে খিদে পেলেই চেয়ি-চিন্তি খাস বাপ আমার। ক্যাবলা বলে, না—চাইব না।

আসলে ঘরে বড্ড খাইখাই করে বলে বকুনি খায় ও। ও পেট ভরলেও ঠিক বোঝে না। বমি করে ফেলে। তখন মারও খায়। 'আর চেয়ে চেয়ে খাবি' বললেই বলে আর চাইব না।

ক্যাবলার মা ক্যাবলার সারা গায়ে হাত বুলতে থাকে। বলে, কিচ্ছু দুঃখু করিসনি বাপ আমার। ভাল হয়ি ফিরবি। ইস্কুলি ভরতি হবি। হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে এমনি ধারা আরও অনেক কথা থাকে যা ক্যাবলার সারা শরীরে মিশে যায়।

ভগবান, আজ যেন গোপীবল্লভ না আসে।

গোপীবল্লভ আসে। বলে বস রেডি ত? মহাদেব 'রোসো, আর দশ মিনিট' শব্দ ক'টা উচ্চারণ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলে। ছেলেকে নতুন জামাপ্যান্ট পরানো হয়েছে। পলিথিনের ঠোঙায় নারকোল নাড়ু, মুড়ির মোয়া।

গোপীবল্লভ বলে, এসব কিছু দরকার নেই। কোম্পানি বাইরের ফুড অ্যালাউ করবে না। ওরাই যথেষ্ট ফুড দিয়ি থাকে। গণেশের মা বলে, তবু থাক। ভালবাসে।

ক্যাবলার সঙ্গে ক্যাবলার মাকে নিচ্ছে না মহাদেব। মহাদেব যাচ্ছে। ক্যাবলা ট্রানজিস্টারটা ছাড়ছে না। শক্ত করে আঁকড়ে রেখেছে। ক্যাবলার মা ক্যাবলার কড়ে আঙুল কামড়ে দেয়। মাথার আঘ্রাণ নেয়। আর একবার সর্বশরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরে। রেডিয়োতে আই অ্যাম এ কমপ্ল্যান বয় বাজে।

কলকাতা শহরে একটা বিরাট বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গোপীবল্লভ বলল, দ্যাখ, এই বাড়ি। ঘাড় উঁচু করে মহাদেব দেখল বাড়ি কী ভাবে আকাশ ছুঁয়েছে। গোপীবল্লভ বলল, এই বিল্ডিংটার চোদ্দ আর পনেরো তলায় হল আমাদের কোম্পানি। কী যে কাণ্ডকারখানা চলতেছে কোনও ধারণা করতি পারবা না। কত রিসার্চ, এক্সপিরিমেন্ট। এমন যে নিমফল-বীজ, তার পোঙায় ইনজিকশন মারি

দেছে, সেই বীজ পুঁতলি যে নিমগাছ হবে তার পাতার হবে মিষ্টি সোয়াদ। এইসব চলতিছে। ছাইনস্ যে কোথায় গিয়ে ঠেকিছে তোমরা বোঝবা না। ওরা লিফট-এর ভিতর ঢুকল, দরজা বন্ধ হল নিজে নিজে। এই প্রথম ভয় পেল ক্যাবলা। কেঁদে উঠল। চোদ্দোতলায় একটা ফুল-নকশাকাটা দরজা ঠেললেই ঠান্ডা। টেবিলের ওপাশে সুন্দরী মেয়েছেলে। মেয়েছেলের সামনে চেয়ার। গোপীবল্লভ বলল, তোমরা এখানে বোসো। নরমের ভিতরে ডুবে যায় মহাদেব। মহাদেবের কোলে গণেশ। অন্য একজন ছোটচুল সুন্দরী আসে। সামনে মেলে ধরে রঙিন কাগজ। 'সই করবেন, না টিপ?' কাঁপা কাঁপা সই করে মহাদেব হাজরা। আর একবার চুমো খায় ওর ক্যাবলা গণেশকে। ওর লালা লাগে মুখে। মেয়েটি মহাদেবের হাতে পাঁচটি একশো টাকার নোট দিয়ে মুচকি হাসে। তারপর মহাদেবের কোল থেকে ছেলেটিকে নিয়ে যায়। অন্য একটা ফুল-নকশাকাটা দরজা ঢেকে দেয় ওদের। গোপীবল্লভ মহাদেবের কানে কানে বলে, মন খারাপ কোরো না। তোমার কোনও লস নেই, উলটি লাভ। কীই-বা করতে তোমার হাবাগোবা ছেলেডারে নিয়ি? যা হোক ওই পাঁশশো থেকে আমারে গোটা পঞ্চাশ দ্যাও।

মহাদেব বাড়ি ফেরে। হাতের কবজিতে ধর্মতলা থেকে কেনা সত্তর টাকার ইলেকট্রনিক্স ঘড়ি।

এরপর আকাশে আরও ইনসাট উঠে যায়। ক্রয়োজেনিক রকেট ইঞ্জিনের নো হাউ জেনে যায় ভারতবর্ষ, কর্ডলেস টেলিফোনের উৎপাদন বাড়ে। ছয় ডিজিটের টেলিফোন নম্বর সাত ডিজিটের হয়। অনেক স্ত্রী ভ্রূণ নষ্ট হয়, ধ্বংস হয়, গৃহবধূ পোড়ে, ক্যাবলা ফিরে আসে।

ওর নাকটা লম্বা হয়ে নাভির কাছটাতে এসে পড়েছে। একটু একটু নাড়াতেও পারে। শুঁড়ের মতোই লাগে। ওর কান দুটোও বড় বড় করে দেয়া হয়েছে। ওর শরীর নাকি দারুণ সেনসেটিভ। নাকের উপর কয়েকটা ইনজেকশন দেয়ার পরই নাকটা তাড়াতাড়ি বাড়তে শুরু করেছিল। এটা একটা রেয়ার কেস। নাককে নাকি সহজে বাড়ানো যায় না। এর আগে আফ্রিকায় মাত্র একটি কেস সম্ভব হয়েছে। নাকের পর কানেও ইনজেকশন অ্যাপ্লাই করা হয়। এজন্য কিছু বেশি টাকা পার্টিকে দিয়েছে কোম্পানি। ক্যাবলার গা থেকে অনেকবার রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করেছে কোম্পানি। কী আছে ওই রক্তে। কেন এত তাড়াতাড়ি সাড়া দিচ্ছে। ওই পরীক্ষার ফল পার্টি জানে না। ক্যাবলার মাথার ভিতর থেকে নিউরোন সেল নিয়ে পরীক্ষা করেছে কোম্পানি। ওই পরীক্ষার ফল পার্টি জানে না। ওকে নানা রকমের ইনজেকশন দেয়া হয়েছে ওর শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। কী ইনজেকশন, কী হরমোন কিংবা স্টেরয়েড বা অন্য কিছু পার্টি জানে না। শুধু পার্টির স্কিম ম্যাচুয়োর করে। পার্টি প্রজেক্ট থেকে ফিরে আসে লম্বা নাক আর দুটো বড় বড় কান নিয়ে।

গোপীবল্লভ বলে, গণেশ নামটা এত দিনে সার্থক হল। একেবারে রিয়েল গণেশ করে দিয়েছে কোম্পানি। গণেশের বাপ মহাদেব। মায়ের নামটা দুর্গা করি দিলিই একেবারে ষোলোকলা পূর্ণ হয়ি যায়। তোমাদের কাঁঠালগাছে সাইনবোর্ড মারি দেবা—কৈলাশ।

ছোটবেলার মহাদেবের বাবা মহাদেবকে সং সাজাত। মাথায় ঝুঁটি বেঁধে, ঝুঁটিতে পালক গুঁজে, মুখে নীল রং করে হাতে বাঁশি লাগিয়ে কেষ্ট ঠাকুর কিংবা গায়ে ছাই মাখিয়ে মাথায় জটা বেঁধে মহাদেব। মহাদেব হলে চোখ বড় বড় করতে হত আর কেষ্ট হলে চোখ ঢুলুঢুলু করতে হত। লোকের দুয়ারে গেলে পয়সা মিলত, চাল-ডাল সিধে মিলত। এখন মহাদেব ভাবে এই সত্যিকারের গণেশকে যদি সাইকেল রিকশার সিটে বসিয়ে হাটে নেয়া যায়, কেমন হয়।

গণেশের পেটটাও আগের চেয়ে একটু বড় হয়েছে। মহাদেব ভাবে কোম্পানিতে ভাল খাওয়া-দাওয়া পেয়ে এমনটা হয়েছে। গাঁয়ের লোকজন দেখতে আসে। বলে, এক্কেবারে জ্যান্ত গণেশ গো। একদিন সন্ধ্যাবেলা মহাদেব দ্যাখে মাদুরের উপর কিছু খুচরো পয়সা ছিটিয়ে আছে। গুনে দেখে টাকা খানিক হবে।

পাশের গাঁ থেকে জীবনের মা, ভামিনীবুড়ি লাঠি ঠকঠক করতে করতে আসে। এসে বিহ্বল

তাকিয়ে থাকে। বলে, সত্যিকারের ভগমান দেখনুগো। আঁচলের গিঁট খুলে একটা আধুলি বের করে গণেশের পায়ের কাছে রাখে।

গণেশ বলে, জিলিপি খাব।

বুড়ি বলে, হ্যা-হ্যা, লিচ্চয়। লিচ্চয় আমি জিলিপি ভোগ দেব। বুড়ি লাঠি ঠকঠক করতে করতে বেরিয়ে যায়। গোটা চারেক জিলিপি নিয়ে আবার আসে। গণেশের পায়ের সামনে রাখে। নীল মাছি উড়ে আসে। গণেশের নাকের তলায় দুটি শাশ্বত ফুটো। ফুটোসমেত নাকের ডগাটা জিলিপির উপর নাড়ায়। শ্বাস ছাড়ে। মাছি উড়ে যায়। এবার শ্বাস নেয়, গন্ধ শোঁকে। গণেশ হাসে। একঘর লোক দেখে।

বুড়ি বলে, কিরপা করো বাবা গণেশ। আর পারতেছি না। জীবনের বউটা খাতি দেয় না। বড় জ্বালাতন করে। কেবল গাল মন্দ করে। উদ্ধার করো।

গণেশ মাথা নাড়ে আর জিলিপি খায়।

পরদিন ভোরবেলা কলমি শাক তুলতে গিয়েছিল জীবনের বউ। সাপে কাটল ওকে। তাই শুনেই ভামিনীবুড়ি মাথা চাপড়াতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল, হায়রে হায়। বাবা গণেশ তুমি এমন জাগ্রত বুঝতি পারিনি গো। আমি ভোকলা বুড়ি, আমার কথাই শুনলে। জীবনের এখন কী হবে।

গাঁয়ের লোক জীবনের বউকে ভ্যান গাড়িতে শুইয়ে হাসপাতালের দিকে যায়। ভামিনীবুড়ি মাথা কুটে বলে, একবারটি মহাদেব হাজরার ঘরে নে চল ওরে, দোহাই বাপাদের।

আশেপাশে ওঝাবদ্যি নেই। যে ওঝাটি ছিল মরে গেছে। তার ছেলে বিডিও অফিসের পিওন। সে কিছু কিছু বশীকরণ ইত্যাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম করে অবশ্য। কিন্তু তাকে তেমন বিশ্বাস নেই। হাসপাতালের দিকেই চলল ওরা। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আট কিলোমিটার। অনেকটা সময় লাগবে। বুড়ির কথায় কেউ কান দেয় না। বুড়ি সাইকেলভ্যানের সামনে শুয়ে পড়ে। বলে, আমার মাথা খা। বউডারে বাঁচাতে চাস ত গণেশের কাছে নে চল।

মহাদেবদের পাড়া হাসপাতালের পথেই পড়ে। জীবনের বউ ভ্যানে শুয়ে আছে। জ্ঞান আছে। ভ্যানের কোণে ভামিনীবুড়ি বাবা গণেশ বাবা গণেশ করতে থাকে। মহাদেবের উঠনে ভ্যান থামে।

ভামিনীবুড়ি ভ্যান থেকে নেমে বলে, বাবা গণেশ, একবারটি দেখা দাও। আগের দিন ঝা কয়েচি অলায্য কয়েচি। মাথার ঠিক ছিল না বাবা। এখন তোমার ঠেয়ে এনিচি। ওরে কিরপা কর।

গণেশ তখন হাগতে গিয়েছিল। এত লোক দেখে পাগুবজবা গাছটার তলে দাঁড়িয়ে পড়ে। গণেশের মা তাড়াতাড়ি জলের কাজ করিয়ে দিয়ে প্যান্ট পরিয়ে দেয়। গণেশের কপালে গেরিমাটির তিলক। শুঁড়ে একটা লাল ফিতে জড়ানো। গণেশের মা তাড়াতাড়ি পাগুবজবা গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে লাল ফিতের মধ্যে গুঁজে দেয়। গণেশ আসছে হেলতে দুলতে। শুঁড়টা একবার নাড়াল। একটু ওঠাল। ও বোধহয় ভামিনীবুড়িকে চিনতে পেরেছে। জিলিপি ভোগ দেয়া বুড়ি। বুড়ি গণেশের সামনে শুয়ে পড়ে ভুঁয়ে। বলে, বউডারে বাঁচয়ি দ্যাও বাবা, বরং আমারে পার করো।

গণেশ এদিক চায়, ওদিক চায়। কারুর হাতে কোনও শালপাতার ঠোঙা নেই। গণেশ ঘরের দিকে মুখ ফেরায়। বুড়ি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। গণেশ কী ভেবে বুড়ির দিকে চায়। বুড়ি বলে, কিরপা হবে তো বাবা!

গণেশ বলে, কিপা হবে।

বুড়ি বলে, একবারে বউডারে স্পর্শ করি দ্যাও ঠাকুর। গণেশ আস্তে আস্তে বউটার গলায় হাত দেয়। লকেটের ঝুটো পাথরের লাল চিকচিক দেখে। কে একজন ভ্যানরিকশার ঘণ্টি বাজিয়ে দেয় টিরিং।

ভ্যানরিকশাটা পিচরাস্তায় পড়ল। মাইল দুয়েক পরেই কৈবর্তহাট। ওখানে মাইক। আলুর চপ ভাজার গন্ধ। জীবনের বউ উঠে বসে। বলে, চা খাব।

চা খেয়ে অবশ্য হাসপাতালে যায়। ডাক্তার বলে, সাপে বিষ ছিল না তেমন, তবু যাহোক ইনজেকশন দেয়।

জীবন আর জীবনের বউ মুরগি নিয়ে আসে মহাদেব হাজরার বাড়ি। বলে, গণেশকে পুজো দেবে। এরপর লোকজন আসতে থাকে। পরীক্ষায় পাস, আই আর ডি পি বা জওহর রোজগার যোজনার কাজ, বন্ধ্যানারীর সন্তান লাভ, শূল বেদনার উপশম, স্বামীর সংসারে সুমতি, এইসব কামনাবাসনা বয়ে নিয়ে লোকজন আসে। প্রতিদিন সন্ধেবেলা পাড়ার ছাগলে এসে অনেক ফুল খায়, শালপাতা খায়।

ইতিমধ্যে একদিন নতুন পাম্পশু জুতোয় মচমচ শব্দ করতে করতে গোপীবল্লভ এল। বলল, কোম্পানির আফটার সেল সার্ভিস বলে একটা ব্যাপার আছে। দেকতি এলাম। শুনলাম তোমাদের দিন ফিরি গেছে।

মহাদেব হাত কচলায়।

গোপীবল্লভ গণেশের কাছ গিয়ে বলে, কী গণেশ, কেমন আছ?

গণেশ চোখ পিটপিট করে।

বলো, কেমন আছ, ভাল না?

গণেশ মাথা নাড়ে। বলে, না।

কেন? ভাল নেই কেন?

আমাল অচুক।

কে বলল, অসুখ? তোমার সুখ। তুমি এখন জ্যান্ত গণেশ। ভগবান। শোনো বলি। কেউ যদি তোমার কাছে আসে, তুমি ডান হাতখানা সামনে ধরবা। আঙুলগুলি এই এমনি করি জোড়া রাখবা। যেন ভোটের হাত চিন্ন। এটা বরাভয় মুদ্রা। কী মহাদেব, এসব শিখোয়ি দেবা ত। আর শোনো গণেশ। এই বরাভয় মুদ্রা পাইকিরি সবারে দেখাবা না। যারে মনে হবে তারে দেখাবা। নইলে ওজন থাকবে না।

মহাদেবের বউ চা করে আনে। চায়ের সঙ্গে নোনতা বিস্কুট, চানাচুর।

মহাদেবের বউ ঘোমটার ভিতর থেকে বলে—আমার ক্যাবলার মধ্যি সত্যিসত্যিই গণেশের অংশ আছে। নইলে ঠিক ঠিক গণেশ পানা হতিছে কেন? পেটটা বড় হতিছে। ঝা বলতেছে তাই হচ্চে। রোগব্যাধি ভাল হচ্ছে। লোকের মনস্কামনা পূরণ হতিছে। আমাদেরও ঘরদুয়োর হল। ওর মধ্যে যদি গণেশ নাই থাকবে, মনস্কামনা পুরে কেন? গোপীবল্লভ হাসে। বলে, গণেশের মধ্যে গণেশ যদি আসি গেছে মনে করো, ভাল কথা। ও, ভাল কথা, শোনলাম অনেকে নাকি মুরগি নে আসে? গণেশের পূজায় মুরগি পেসাদ কোথাও শুনিচ? এসব ছোটলোকদের প্র্যাকটিস। শুধু ফল-ফলাদি। নিরামিষ। বোঝলা না?

মহাদেব মাথা নাড়ে।

গোপীবল্লভ বলে, আমারেও একটু স্মরণে রেখো। আমার জন্যিই ত এইসব। আমিই ত গণেশ বানালাম। একেবারে বঞ্চিত কোরো না। বোঝলা না? আমিও গণেশের কৃপাপ্রার্থী একজনা।

জোরে জোরে হাসে গোপীবল্লভ।

মহাদেব বলে, হাসির কথা নয় বল্লভ। এই ধরো না কেন আমার নাম মহাদেব। ছেলের নাম রাখিলাম গণেশ। এরপর যে ও সত্যি সত্যি গণেশ হয়ে গেল, এখানে ভগবানের কোনও ইচ্ছা ছিল কি না কে বলতি পারে?

বল্লভ বলে, ভগবান নয়, সবই কোম্পানির ইচ্ছা।

পঞ্চায়েতের ভোট এসে গেল। পাশের ব্লকের এক প্রার্থী এসে পুজো দিয়ে গেল। জিতল সে। গণেশের ঘরে ভিড় বাড়ল।

এখন আর রোজ রোজ গণেশের দেখা পাওয়া যায় না। সপ্তাহে দু'বার। সোম আর বুধ। এখন মোকদ্দমায় জয়লাভ বা ব্যাংক লোন প্রাপ্তির জন্যও লোকে আসছে। মোপেড মোটরসাইকেলে চড়া লোক আসছে, পকেটে ক্যালকুলেটার নিয়ে লোক আসছে, হাতের কবজিতে ইলেকট্রনিক ঘড়িসমেত হাতজোড় করছে।

গণেশ এখন দর্শন দেবার সময় হাফপ্যান্ট পরে না। সিল্কের রঙিন ধুতি পরানো হয় ওকে। অর্ডার দিয়ে বানানো কাঠের সিংহাসনে সে বসে। বেশ মানায় ওকে। পেটটা আরও বড় হয়েছে ওর। মহাদেব একটা টেপ রেকর্ড কিনেছে। পঙ্কজ উধাস, অনুপ জালোটার ভজন, সঙ্গে কুমার শানু—মহম্মদ আজিজ।

মহাদেবের বউ আগে অন্যের বাড়ি ধান সেদ্ধ করতে গিয়ে বা মুড়ি ভাজতে গিয়ে দাওয়ায় বসা গিন্নিদের গপ্পোসপ্পো উঠোনে বসে শুনত। এখন মহাদেব-গিন্নি মুড়ি ভাজতে বা ধান সেদ্ধ করতে যায় না। তত্ত্বতালাশ নিতে যায়। ও এখন বসতে পিঁড়ি পায়।

কার স্বামী কী খেতে ভালবাসে, ডালের বড়া না হলে কার স্বামী খাওয়া ছেড়ে উঠে যায়, এসব শোনে। কার স্বামীর রোজই চাই, নইলে ঘুম হয় না, শোনে। কার ননদের শহরে বিয়ে হয়েছে, খাট-আলমারি-ফিরিজ দেয়া হয়েছে, কার বোনের বিয়েতে সমস্ত ইস্টিলের বাসন, প্রেসার কুকার, মশলাবাটার মেশিন, কার ভাসুর-ঝির বিয়েতে টিভি-সোফা-টেলিফোন...

অ্যাই, এটা ভাই মিছ? টেলিফোন কেনা যায় না।

কে বলল যায় না। আমি নিজে দেখলাম। মাইরি বলছি।

আবার মিছ? আমার দেওরের বারাসাতে কাপড়ের দোকান, সে কিনা পাচ্ছে না টেলিফোন। কাঁড়ি পয়সা তার। টাকা দিয়ে কেনা যেত যদি, কবে কিনত।

গণেশের মা এসব শোনে। ওরও কথা বলতে ইচ্ছা করে। গণেশের স্কিমের টাকায় ঘরে টিন হয়েছে, বাকি টাকা ব্যাংকে। গণেশের দক্ষিণার টাকায় টেপ রেকর্ট, গদিখাট, আলমারি, ঘর পাকা, লাল সিমিন্ট। ওর যদি মেয়ে হত, ও তবে দিতে পারত, বলতে পারত ওরকম আঠেরো ভরি সোনা, খাট-আলমারি-ফোঁস কুকার...। কিন্তু নাড়ির জট খোলাবার জন্য হাসপাতালে যাবার সময় হয় না ওর। ও হাসপাতালে ভরতি হয়ে গেলে ভক্ত সামাল দেবে কে?

বারাসাত থেকে লাল শালুতে লিখিয়ে আনা হয়েছে ওঁ গণেশায় নমঃ। প্রতি সোম আর বুধবারটা মহাদেব বড় ব্যস্ত। ক্যালেন্ডারের এক-দুই-তিন-চার কেটে কেটে পিছনে পিসবোর্ডের টুকরোয় আঠা দিয়ে সেঁটে কুপন করেছে। আগে এলে আগে নম্বর পাবে। কোনও নির্দিষ্ট দক্ষিণা রাখেনি মহাদেব। যে খুশি হয়ে যা দেয়। সবাই জানে এটা ইনজেকশন মারা শুঁড়। তবু আসে। এমনকী গাঁয়ের অন্য যাদের কান বড় ঠোঁট বড় হাত বড়, তারাও আসে। মহাদেবরা ভাবে সত্যিই ওর মধ্যে গণেশের অংশ আছে। মহাদেব ফিল্টার সিগারেট খায়। আজকাল মাটি কোপালে গা ব্যথা করে। সারিডন-টারিডন খেলে ব্যথা কমে।

একদিন রাতে গণেশ বলে, আজ কী বার!

কেন বাবা, রবিবার।

কাল ছোমবার?

হ্যাঁ বাবা।

গণেশ কাঁদতে থাকে। ওর চোখের জল শুঁড় বেয়ে পড়ে। বলে, কালকে আমি গণেছ হবনি।

কেন বাবা?

না। গণেছ না। আমি ক্যাবলা হব আবার।

তা কি আর হয়? ওকে বলে-কয়ে, শেষটায় জোর করে সিংহাসনে বসানো হয়। ও বেশি কথাবার্তা বলে না। কাউকে বরাভয় মুদ্রা দেখায় না। জিলিপি, সন্দেশ কিছুই খায় না।

বুধবারও তাই করল।

ও আগে ওর শরীরে যা কুলত সেইমতো পাড়ার ছেলেপিলেদের সঙ্গে একটু-আধটু খেলত-টেলত। ও গণেশ হবার পর তা বন্ধ। ভগবান কখনও মানুষের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলতে পারে না। গণেশ আজকাল নতুন বসানো জানালার দরজা ফাঁক করে বাইরের মাঠ দেখে। ছেলেদের দৌড়ঝাঁপ দেখে। নতুন বসানো লোহা শিকের শীতলতা লাগে ওর মুখে, কানে, শুঁড়ে।

নাপিতকে দিয়ে ওর বিশাল কানের লতিতে ফুটো করিয়ে ওখানে পরানো হয়েছিল দুল। তখন গণেশ কেঁদেছে। ওর কানে সাদা পাথর চকচকায়। ওর শুঁড়ে উল্কি করানো হয়েছিল। উল্কির সুচ ফুটেছিল, গণেশ কেঁদেছে। আর এখন ওর সামনে কমলালেবু আপেল সন্দেশ। আর জানালার শিকের বাইরে মাঠের সবুজে বাচ্চারা খেলছে। গণেশ কাঁদে।

বিজয় হাজরা আসে। সঙ্গে ধনঞ্জয়। ওর বড় কানটা ছেঁড়া ফাটা। বর্ষার দরুন সার্কাস বন্ধ। ধনঞ্জয় আর গণেশ মুখোমুখি চুপচাপ বসে থাকে। কেউ কোনও কথা বলে না।

পরের বুধবার গণেশকে জোর করেই বসানো হল লাল ভেলভেট মোড়া ডানলোপিলোর কুশ বসানো সিংহাসনে। বাবা, বোস বাবা। ঝা চাইবি দেবানে।

মুখে শ্বেতি-দাগ ষোলো বছরের মেয়েকে নিয়ে এসেছে ওর মা। হাত জোড় করে বলছে, আমার মেয়ের সাদা দাগ ভাল করে দাও বাবা গণেশ।

গণেশ চিৎকার করে বলে, আলও দাগ হয়ি যাক।

একজন সম্ভ্রান্ত চাষি, হাতে ঘড়ি, গায়ে টেরিকট, খবর কাগজের ব্যাংকের বিজ্ঞাপনে আমরা সর্বদা চাষিভাইদের সেবায় আছি লেখার সঙ্গে ট্রাক্টরের পাশে যে চাষির মুখ থাকে, সেরকম একজন চাষিবাবু এসে বলে, বাবা গণেশ, গত বছর পাঁচ বিঘের আলু ধসা রোগে...

গণেশ ঘাড় কাত করে বলে, আমি গণেছ না, ক্যাবলা।

মহাদেব বলল, এঁদের সব নানারকমের লীলাখেলা। গণেশ তখন টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে টগরফুলের মালা। জরির ফিতে। সিংহাসন থেকে উঠতে গিয়ে পড়ে যায়। শুঁড় বেয়ে মুখের লালা নেমে আসে গোলাপি রেশমে।

আরও সোমবার আসে, বুধবার আসে। সিংহাসনের দারু-কারুকাজে ছোট মাকড়শা নিজস্ব কারুকাজ শুরু করে। মেঘের ফাঁক দিয়ে নেমে আসা রোদ্দুর কারুকাজ করে গাছের পাতায়, জলের ঢেউয়ে; গণেশ দেয়ালের চুনবালিতে নখচিহ্ন এঁকে এঁকে কী যে... বলতে চায়... ।

গণেশের শুঁড়ের ডগাটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ও ব্যথার কথা জানায়। কাঁদে।

মহাদেব বলে, কিছু কি কামড়েছিল? ভোমরা-টোমরা, ডাঁস-ডোমা। গণেশ মাথা নাড়ে। মহাদেব বলে, নিগ্‌ঘাত কিছু কামড়েছিল। ভাল হয়ি যাবি। গণেশের মা সরষের তেল বুলিয়ে দেয়। বলে তাড়াতাড়ি ভাল হ বাবা। কিন্তু গণেশ ভাল হয় না। একদিন ধুম জ্বরে বলে, আমার ছুড় কেটি দ্যাও বাবা। আমি আবার আমি হব। খেলব, মাঠে যাব।

গণেশের শুঁড়ের ফোলা জায়গাটা অনেকটা বেড়ে গেছে। একটা মাংসপিণ্ড জেগে উঠেছে। গণেশ রোগা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কিছু খেতে চাইছে না। পেটটা ফুলে উঠছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারের কপাল কুঁচকে ওঠে। বলে, কলকাতা নিয়ে যান। ভাল ঠেকছে না।

গণেশের মা ভাবে তবে কি গণেশের মধ্যে সত্যিই গণেশ নেই। গণেশ কেন ওর নিজের রোগ ভাল করতে পারছে না? গণেশের মা একটা মাটির গণেশ কিনে নিয়ে আসে। জ্যান্ত গণেশের সামনে মাটির গণেশকে বসিয়ে দিয়ে বলে, পাখনা কর বাবা, ভাল হয়ি যাবি। গণেশ মাটির মূর্তি ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে। মাটির গণেশের শুঁড় ভেঙে গেলে মাংসের গণেশ সেই মুখ দেখে। স্মিত হাসে।

একদিন গণেশের শুঁড়ের জেগে ওঠা মাংসপিণ্ড থেকে রক্ত ঝরে। পুঁজ রক্ত ঝরে। কোথা থেকে এসে যায় নীল মাছি। মহাদেব ডাক্তার ডাকে। ডাক্তার বলে, শুঁড়টা কেটে ফেলতে হবে। গণেশ যেন খুশি হয়। বলে, তা হলি আমি আবার আমি হয়ি যাব।

মহাদেব গোপীবল্লভের কাছে যায়। বলে, কোম্পানিতে বলে শুঁড়টা কাটিয়ে দিতে। গোপীবল্লভ বলে, কন্ট্রাক্টে নেই। কোম্পানি ছোট করে না। শুধু বড় করে দেয়।

তারপর গণেশ মরে যায়। গণেশের নাকের ডগার গলিত মাংসপিণ্ডের মধ্যে দুটি গর্তের হু-হু

শূন্যতার দিকে কান বড় হাত বড়রা তাকিয়ে থাকে। একটি বালকের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো কিছু একটা ধরবে বলে কিলবিল করতে করতে ক্রমশ স্থির হয়ে যায়। চলে আসে নীল মাছি।

কোথা থেকে খবর পেয়ে চলে আসে ফটোগ্রাফারের দল, বাণিজ্যিক টিভির। তোয়ালেতে ঘাম মুছে বলে, দেরি হয়ে গেল। তিন পায়ের উপর দাঁড়ায় ভিডিও ক্যামেরা—জাপান নির্মিত। ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, জুম-টেলি ইত্যাদি সহযোগে রঙিন ছবি রকমারি ইনসাট যোগে চলে যাবে মানচিত্রের লাল-নীল-সবুজ-হলুদ নানা দেশে। শ্মশান-বন্ধুরা মরা গণেশের, গণশার, ক্যাবলার মৃতদেহ ছেড়ে ঘিরে ধরে দেখছে ক্যামেরা যন্ত্র। দেখছে, যন্ত্রের মানুষ।

এ সময়ে কীভাবে ছুটে এল ধনঞ্জয়। ধনা। ওর বড় কানটার এখানে ওখানে অনেক গর্ত। এখানে ওখানে অনেক ছেঁড়া ফাটা। সে গণেশের মৃতদেহটার উপর উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকে।

ছবি উঠছে এখন। ছবি উঠছে।

শারদ প্রতিক্ষণ, ১৯৯৪

মানুষ কিংবা কোলবালিশ

ক'দিন আগেই রাস্তায় পিচ দিয়েছে। সাইকেল ছুটিয়ে বড় সুখ, তারাদাস তাই পোঁ-পোঁ ছুটছিল। মোটর গাড়ি ওকে ওভারটেক করে সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে বের হয়ে এল একজন রোগাপানা, পাকা চুল, ফরসা মানুষ। বলল, 'শোনো তারাদাস কথা আছে।' লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি তারাদাস।

তারাদাস বলল, 'কী কথা?'

লোকটা বলল, 'তুমি উড়বে?'

'অ্যাঁ?'

'বলছি, তুমি উড়বে?'

'মাইরি আর কী!—মানুষ কি উড়তে পারে?'

'মানুষ পারে না। এতদিন পারেনি। এবার পারবে।

'ইঃ।'

'শোনো তারাদাস। তোমায় ওড়া শেখাব।'

'ওঃ।' বুঝে গেল তারাদাস। পাগল-ফাগল হবে। ও প্যাডেলে চাপ মারে।

লোকটা আবার বলে, 'যেয়ো না, কথা আছে।'

তারাদাস বলে, 'এখন আমার কথা শুনবার সময় নেই, আমার এখন দ্বারকপাটি যেতে হবে।'

'দ্বারকপাটি কার বাড়ি?'

'ভোলা ঘোষের বাড়ি। ভোলা ঘোষকে চেনেন? বাড়িতে ডেয়ারি বানিয়েছে। চল্লিশটা জার্সি গোরু। জেনারেটর আছে ঘরে। জেনারেটারে টিভি চালায়, ভিডিও চালায়...'

'আর এখন তুমি ওর জন্য ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে যাচ্ছ,—কেমন না?'

'হ্যাঁ। শোলে, ডন, আর...ইয়ে।'

'বুঝেচি। বলে যাও।'

'ওটা বেশি রাতে চলবে। ভোলা ঘোষের শালা এসেছে বাড়িতে।'

'নাও তারাদাস রেডি হও। ওড়া শেখাব। তোমার আর কষ্ট হবে না। এই চেন খুলে গেল, এই টায়ার পাংচার—টিউব লিক এসব হ্যাপা আর পোহাতে হবে না তোমার। তুমি আকাশে উড়ে...' তারাদাস এখন আকাশের দিকে তাকায়। দু'ফালি মেঘ ভাসছে। দুটো চিল উড়ছে।

গাড়ির পিছনের ক্যারিয়ার থেকে বুড়োটা কী একটা বের করে বলল, 'এই দ্যাখো ডানা। লাল ডানা।' খুলে ধরল বুড়োটা। রূপকথার বইয়ের ছবিতে পরিদের যেরকম ডানা হয়, ঠিক সে-রকম। লোকটা যাদুকরের মতো হাসছে।

'এটা তোমার পিঠে বেঁধে দেব তারাদাস।'

এঃ। মাইরি আর কী। আমাকে উড়িয়ে দিয়ে সরে পড়ো আর আমি পড়ে মরি আর কী। তারাদাস এবার বুদ্ধি করে বলে, 'আগে আপনি উড়ে দেখান তো দেখি কী রকম উড়তে পারেন তারপর নয় আমি উড়ছি।'

'আমার যে হার্টের দোষ, আমি উপরে উঠতে পারি না। তবে আমি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। শূন্যে বাঁদর পাঠিয়েছি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।' এই বলে ক্যারিয়ার থেকে বার করে আনল

একটা খাঁচা। শূন্য খাঁচা। 'এই খাঁচাতেই বাঁদরটা ছিল, সেদিন পলিয়েছে।' বুড়োটা এরপর বার করে আনল একটা কোলবালিশ। রেশমি কাপড়ে মোড়া, জরির ঝালর ঝুলছে।

বলল, 'কোলবালিশটাকে মনে করো একটা মানুষ। মানুষটা শুয়ে আছে। এইবার দ্যাখো এই মানুষটার পিঠে এই ডানাজোড়াটা বেঁধে দিলুম।'

'বাঃ কী সুন্দর কাচ বসানো ডানা।' তারাদাস দেখল কোলবালিশটার পিঠে ডানাটা বেঁধে দিতেই কোলবালিশটা প্রজাপতি হয়ে গেল।

'এগুলো কাচ নয় খোকা, এগুলোকে বলে ফোটো ইলেকট্রিক সেল। এতে সূর্যের আলো পড়লে বিদ্যুৎ তৈরি হয়, সেই বিদ্যুতেই এই ডানা নড়ে। পেট্রোল-ব্যাটারি কিস্‌সু লাগে না। দিনের আলোয় সারাদিন চিলের মতো আরামসে ওড়ে, কোনও অসুবিধা নেই। তবে রাতে বেশিক্ষণ ওড়া যাবে না। সোলার এনার্জি তো, সারাদিন ডানায় রোদ খাইয়ে তবে রাত্রেও কিছুক্ষণ ওড়া যায়, তারপর আস্তে আস্তে এনার্জি ফুরিয়ে যায়। "ডানায় রোদের গন্ধ মুছে ফেলে চিল" আছে না—জীবনানন্দের কবিতায়? তুমি তো আবার পড়নি এইসব, ওই রকম ধারা। বুঝলে না?' কিছুই বুঝল না তারাদাস। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

'এবার দ্যাখো, খাঁচাটাকে ঝুলিয়ে দিলাম। এই যে মানুষটা শুয়ে আছে, এর পেটে বেল্ট বেঁধে বাঁদরের খাঁচাটা ঝোলালাম। চাঁদে যাবার আগে কুকুর, বাঁদর এদের পাঠিয়ে ছিল না মানুষ?—তারপর তো মানুষ বিশ্বাস করে রকেটে উঠল।—তা তুমিও তো মানুষ, তাই তোমার বিশ্বাস তৈরির জন্য বাঁদর পাঠাচ্ছি। যদিও বাঁদর পালিয়ে গেছে, খাঁচাটাই পাঠাচ্ছি তাই।

'এবার দ্যাখো মানুষটার মানে কোলবালিশটার বেল্টের এই বোতামটা টিপলাম। সবুজ আলোটা জ্বলল। মানে ফুল এনার্জি। এবার সুইচ অন করলেই ডানা নড়বে। দ্যাখো তারাদাস এখানে কী করছি। এক হাজার ফিটের বোতামটা টিপে দিলাম।—কেন বলো তো? কারণ এই রেশমি জামা পরা মানুষটা তো আসলে কোলবালিশ। বোধ বুদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই। কখন থামতে হবে জানে না। কখন বাঁয়ে ঘুরবে, কখন ডাইনে ঘুরবে জানে না। এইজন্য এক হাজার ফুটের বোতামটা টিপে দিলাম। এক হাজার ফিট উঠেই আবার নেমে আসবে। আমি আমার ইচ্ছেমতো ওকে বাঁয়ে ঘোরাতে পারি, ডাইনে ঘোরাতে পারি, ওঠাতে পারি, নামাতে পারি, আমার ইচ্ছেমতো। পুরো আমার ইচ্ছেমতো।'

বোতাম টিপল লোকটা, আর কোলবালিশটার পিঠে ডানা নাড়তে লাগল। কোলবালিশটা একটা প্রজাপতি। উড়ছে। চাকতি বসানো সুন্দর ডানায় উড়ছে। শূন্য খাঁচাটা অবাধে উঠে যাচ্ছে আকাশে। তারাদাস ঘাড় উঁচু করে কোলবালিশটা দেখে। আহা। ডানা নড়ছে। প্রজাপতি। বাতাসে একটা হালকা গোঁ গোঁ শব্দ। তারাদাস ভীষণ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। একটু পরেই গোঁত্তা খেয়ে কোলবালিশ-পাখিটা নামতে থাকে। লোকটা বলে, 'দেখলে, এবার কেমন নেমে যাচ্ছে? যা বলব, ও তাই করবে।' কোলবালিশটা মাটিতে নেমে গেলে বাঁদরের খাঁচাটা ভুঁয়ে এলিয়ে পড়ে। কোলবালিশটার দিকে তাকিয়ে বুড়ো লোকটা বলে, 'এভরিথিং ওকে?' কোলবালিশের জরির ঝালর বাতাসে নড়ে।

'তারাদাস, এবার তুমি।'

তারাদাস মাথা চুলকোল। বলল, 'না। আমি পারব না।'

'বোকা ছেলে। পারব না আবার কী? সুইচটা অন করলেই তো উড়বে, আর সামনের হাতের কাছেই এটা স্টিয়ারিং। ডাইনে, বাঁয়ে, উপরে, নীচে, যেদিকে সরাবে সেদিকেই যাবে। কোলবালিশটা স্টিয়ারিং জানে না, তাই উঠেছে আর নেমেছে। কোলবালিশটার বিবেচনা নেই তাই আমি যা হুকুম করেছি ও তাই করেছে। নাও, কাছে এসো, ডানা বেঁধে দি।'

'তা আমাকেই ধরলেন কেন? আমার ভাল্লাগে না।'

'ভাল্লাগে না? তুমি বলোনি তোমার নিজের মনে মনে—যখন ছ'মাইল আট মাইল দূরে দূরে

ভাঙা সাইকেল চালিয়ে ক্যাসেট সাপ্লাই করতে যাও বা ফেরত আনতে যাও,—বলনি, হে ভগবান আমি যদি পাখি হতাম?'

'সে তো কত লোকেই বলে।'

'কিন্তু সবাই তো আর তোমার মতন নয়। তুমি তোমার মাতামহীকে অতিশয় ভালবাস। তিনি যে উপদেশ দেন তুমি তাহা পালন করো। তুমি মিথ্যা কথা কহ না। অন্যায় কর্ম করো না। যদি দৈবাৎ করো, অনুতপ্ত হও। তুমি কটুবাক্য, কুবাক্য কহ না। পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ, সেই হেতু পরের দ্রব্য লও না। আলস্যে কাল কাটাও না। ভিডিও ভাণ্ডারের মালিক নারায়ণবাবু যাহা আদেশ দেন তাহা প্রফুল্ল বদনে সত্বর পালন করো। ব্লু ক্যাসেটগুলি ঠিক ঠিক স্থানে লুক্কায়িত রাখো।'

ইতিমধ্যে তারাদাসের পেটে বেল্ট বাঁধা হয়ে গেছে। পিঠে সেট হয়ে গেছে ডানা। 'নাও স্টিয়ারিং ধরো। ওঠো, ওয়ান, টু, থ্রি।' বোতাম অন করে দিল লোকটা। ডানা নড়তে লাগল। 'স্টিয়ারিং উপরের দিকে ঠ্যালো' বুড়ো চিল্লাল। তারাদাস তাই করল। তারাদাস উপরে উঠতে লাগল। তখন চ্যাঁচায়, 'আমার সাইকেলটা দেখো...'

বুড়োটা বলল, 'সাইকেল পড়ে থাক। সাইকেল স্তর পার হয়ে গেছ তুমি। তুমি ওড়ো। উড়তেই থাকো।' তারাদাস আকাশে উঠছে। দু'ধারে বিস্তৃত সবুজ। বুড়োটা দু'বাহু উপরে তুলে বলে চলেছে—'ডানাটার সম্মান রেখো তারাদাস। এটাকে খারাপ কাজে লাগিয়ো না। ডানাটার মর্যাদা রেখো তারাদাস। মানুষের কাজে লাগিয়ো এটাকে।'...বুড়োটা বকেই চলেছে। তারাদাস ঘাড় উঁচু করে মেঘ দেখে। স্টিয়ারিং সামনে ঠেলে, পেছনে ঠেলে, উঁচু করে, নিচু করে, বাঁয়ে ঘোরায়, ডাইনে ঘোরায়, তারাদাস ওড়ে। সারাটা আকাশ নিয়ে খেলা করে। বহু নীচে কালো সুতোর মতো মদালসা নদী। ওই নদীটা পড়েছে মধুক্ষরা নদীতে। ঢেউ-কলকল মধুক্ষরা নদীটা কী শান্ত এখন। নকশি কাঁথার মতো আলপনা আঁকা মাঠ। কৃষিক্ষেত্র। চাষের মানুষেরা মিশে আছে মাঠের সবুজে, আর মাঠের সবুজ মিশেছে বহু দূরের আকাশের নীচে। কোনটা যে চম্পাহাটি, কোনটা যে সজনেহাটি বোঝা যায় না। কোনটা যে দুধসাগর গাঁ আর কোনটা যে ক্ষীরসাগর গাঁ বোঝা যায় না। তিন কাঠা তেরো ছটাকের সঙ্গে দুই কাঠা বারো ছটাকের ঝগড়ার কথা মিথ্যে মনে হয়। জনার্দনের আতাগাছের ডাল হরিপদর সীমানায় দু'হাত ঠেলে আসা মিথ্যে মনে হয়। শুধু মাঠের বিশাল সবুজ সত্যি। মদালসা নদীর দু'পাশে দুধের ফেনার মতো জমে থাকা কাশবনের সাদা রং সত্যি। আকাশের গায়ে ওড়া তুলোর মেঘ সত্যি। ওই তিন সত্যি সারা গায়ে মেখে মেঘে মেঘে লুটোপুটি খায় তারাদাস। তারপর এক সময় তারাদাস নামতে থাকে। আবার দেখতে পায় মাঠের সবুজে খোপ খোপ আলের সীমানা। সবুজের ভিতর থেকে উঠে আসে বিড়িখোর মানুষ। তারাদাস দেখে সবুজের ভিতর দিয়ে কালো রাস্তা। কালো রাস্তায় ভ্যান-রিকশা দেখে তারাদাস। তারাদাস দেখে একটা লোক সাইকেল চেপে যাচ্ছে। লোকটা ধনা-মনা-ঘনা যে কেউ হতে পারে। কে লোকটা বোঝা যাচ্ছে না। সাইকেলটা হিরো-র‍্যালি-বি. এস. এ. যা খুশি হতে পারে। কী সাইকেল বোঝা যাচ্ছে না। লোকটা সাইকেল চালিয়ে আম-জাম-পাকুড়-অশ্বত্থের ভিতরে একটা গ্রামের গভীরে মিশে যায়। তারাদাস যেখান থেকে উড়েছিল সেখানে গিয়ে দেখে ওর সাইকেলটা নেই। তখনই চিৎকার করে—'সাইকেল...আমার সাইকেল...'। নেই সাইকেল নেই। বুড়োটার কথা মনে হল একবার। তুমি সাইকেল স্তর পার হয়ে গেছ তারাদাস। তখন শ্যামল মিত্রের গানটা একবার গাইল—'যাক যা গেছে তা যাক...' তারাদাস এ-সময় দেখে কালো রাস্তা দিয়ে একটা ভ্যান-রিকশা আসছে। ভ্যান-রিকশা থেকে কথা আসছে। ভ্যান-রিকশার বডিতে মাইক ফিট করা।

আউর ক' গোলি বা?

ছে গোলি—

তেরা ক্যা হোগা কালিয়া!

আপকা নিমক খায়া সরকার।

অব গোলি খা...

শোলের ডায়ালগ। পার্বতী হলে শোলে এসেছে। শোলের কথা মনে হতেই আর্তনাদ করে ওঠে তারাদাস। ক্যাসেট?

ক্যাসেট সাইকেলের বাস্কেটে ছিল। তারাদাস কালো ফিতের মতো রাস্তাটার দিকে হতবাক তাকায়। তারাদাস দেখে একজন খালি-গা মানুষ রাস্তা থেকে কী যেন কুড়িয়ে নিল, তারপর ফেলে দিল। মাথার ঝুড়ি নামিয়ে অন্য একজন মহিলা কী যেন তুলে নিল, আবার ফেলে দিল। সাঁই করে মাটিতে নেমে এল তারাদাস। ওই তো, ওগুলোই তো ভি ডি ও ক্যাসেট। শোলে, ডন, আর ডটডট। খালি-গা মানুষদের ভাগ্যিস এসব দরকার হয় না। কিন্তু এসবে ভোলা ঘোষদের সুখ হয়। ভোলা ঘোষের সুখের খোঁজে তারাদাস অনেকক্ষণ পরে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়াল। ওগুলো কুড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল দ্বারকপাটি।

ভোলা ঘোষ তখন তার শালা, শালা-বউয়ের সঙ্গে রসিকতা করছিল। 'বলো তো—এটার উপর ওটা দিয়ে মাগ-ভাতারে রইল শুয়ে...এটা কী?' ভোলা ঘোষের শালা-বউ বলল, 'ইশ কী অসভ্য!' ভোলা ঘোষ বলল, 'তোমার মনের মধ্যে পাপ। ওটা হল খিল। দরজার খিল।' এমন সময় ঘেউ ঘেউ আর হাম্বা হাম্বা ডাক শুনে বাইরে তাকাল ভোলা ঘোষ, দেখল একটা ডানাওলা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। ভোলা ঘোষ বাইরে বেরোলে হাতজোড় করে দাঁড়ায় তারাদাস। যেন গরুড়। নারায়ণের বাহন। তারাদাস বলে, 'নারায়ণ ক্যাসেট ভাণ্ডার থেকে এসেছি। এই যে ক্যাসেট। ডন, শোলে আর ইয়ে।' কুকুররা ঘিরে ধরেছে তারাদাসকে। ভীষণ ঘেউ ঘেউ। তারাদাস চোঁ করে উপরে ওঠে। সূর্য লালচেপানা হয়ে আসছে। আর বেশিক্ষণ ওড়া যাবে না, বুড়োটা বলে দিয়েছিল। আকাশে দিক ঠিক রাখা মুশকিল। উত্তরে মধুক্ষরা নদী, দক্ষিণে গোপেশ্বরের মন্দিরের চূড়া। এবার নিজের গ্রামের দিকে যায় তারাদাস।

জনার্দন মল্লিক চেক লুঙ্গি পরে মজুর চরাচ্ছে। বগলে ট্রানজিস্টার, হাতে সিগারেট। মল্লিকবাবুর বাগানের গাছের আগায় আতা পেকে আছে। তোতা পাখির কিচির মিচির। তারাদাস যেতেই পাখিরা উড়ে পালায়। বেশ বড়ো-সড়ো একটা আতা ছিঁড়ে নিল তারাদাস। তিতু আতা খেতে ভালবাসে। তিতু জনার্দন মল্লিকের মেয়ে। জনার্দনবাবুর বাড়ির চারিদিকে মাটির পাঁচিল, দরজায় গণেশ। পাঁচিলের গায়ে লেখা: জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন। আরও আছে।

গাছ লাগান গাছ বাঁচান, গাছ হল প্রাণাধিক।
নিবেদন করিছেন শ্রীজনার্দন মল্লিক।

জনার্দন মল্লিকের ভগ্নীপতি পাশের গ্রাম ক্ষীরসাগরের পঞ্চায়েত প্রধান। জনার্দনের জমির কাছে সরকারি ডিপকল হয়েছে। এখন বছরে তিনটে চাষ। এখন জনার্দন মল্লিককে সবাই জনার্দনবাবু বলে। তিতুর খোঁপায় একদিন কাঁঠালিচাঁপা গুঁজে দিচ্ছিল তারাদাস, জনার্দনবাবু দেখে ফেলেছিল। বলেছিল, 'আর কক্ষনো এ বাড়ির দরজা মাড়াবি না হারামজাদা।' তারাদাস দরজা মাড়ায় না। সাঁই করে সোজা পাঁচিল-ঘেরা উঠোনের মধ্যিখানে নামে। তিতু যখন গুড়াখু দিয়ে দাঁত মাজছিল। হাতের মধ্যে আতাটা দিয়েই উপরে উঠে যায় তারাদাস। কদমগাছের মগডালে আনন্দে ক'বার দোল খায়। ওকে ঘিরে জড়ো হতে থাকে লোকজন। সবার চোখ উপরে। আকুল আহ্বানে বলে, নেমে এসো, কদম্বের শাখা হতে নেমে এসো ত্বরা। তারাদাস উড়ে উড়ে নেমে আসে। বাচ্চারা আনন্দে হাততালি দেয়। তিতু ভীষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। হাতে তখনও আতা। তারাদাস মাটিতে নেমে কোমরের বেল্ট খুলে ডানাটা পিঠ থেকে খুলে পাশে রাখে। মানুষজন আর তারাদাসকে দেখছে না তেমন। ডানাটাকেই দেখছে। তারপর তারাদাসকে ঘিরে মিটিং বসে। জনার্দন মল্লিক হাঁকে, 'অ্যাই তিতু, এখানে কী? যা-ঘর যা...।' তারপর তারাদাসকে বলে, 'ঝেড়ে

বল তো তারাদাস, ব্যাপারটা কী?' তারাদাস সব বলে। প্রথম থেকে সব বলে। মতিলাল ভটচাজ ফিসফিস করে হীরালাল মিত্রকে বলে, 'সিডিউল কাস্টরা সব দিক থেকেই সুবিধে পাচ্ছে হে।' জনার্দন মল্লিক সব শুনে নিয়ে কদমগাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে—

'শুন বলি জনগণ শুন সবে এক মন তারাদাস গর্ব সবাকার...'

ঠিক সেই সময় জনার্দনের উপরে গলা চড়িয়ে বলতে শুরু করল এই দুধসাগর গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান হরিপদ রায়, প্রাইমারি মাস্টার: 'বন্ধুগণ, তারাদাস একটা ওড়ার যন্ত্র পেয়েছে,—তা যেভাবেই হোক। কিন্তু তার ওই ওড়ার ফয়দা নারায়ণ বিশ্বাসকে একা ভোগ করতে দেয়া হবে না। তারাদাসের ডানার সাহায্যে নারায়ণ বিশ্বাস ওর দোকান থেকে আরও দূরে দূরে আরও তাড়াতাড়ি ক্যাসেট সাপ্লাই করে আরও বেশি মুনাফা করবে। আমরা তারাদাসকে অনুরোধ করব হে তারাদাস, তুমি তোমার ডানা জনগণের কাজে লাগাও। আমের মুকুলে মেটাসিড স্প্রে করো উড়ে উড়ে। তাতে সব মুকুলেই ওষুধ লাগবে। ক'টা বাঁদর এসে প্রায়ই জ্বালাতন করে, তাড়া করলে এ ডাল থেকে ও ডালে পালায়। তুমি রাক্ষসের মুখোশ পরে উড়ে উড়ে বাঁদর তাড়িয়ো।'

তারাদাস বলে, 'বেশ তো।'

তারাদাসের ঠাকুরমার চোখের জলে নাকের জলে একশা। বাপ-মা মরা নাতিকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'হ্যাঁরে, তোর ভয়ের কিছু নেই তো, ডানাটা বিগড়োবে না তো?' তারাদাস বলে, 'না না, কিচ্ছু ভয় নেই। ডানা চালানো ভীষণ সোজা। আমার তো এখন আর মাটিতে পা দিতেই ইচ্ছে করে না।' বুড়ি বলে, 'হ্যাঁরে, তোর মালিক এবার তোর একটু মাইনে বাড়াবে তো?' তারাদাস বলে, 'না বাড়াক। এবার মেলার সময় দেখো—কী রকম কামাব। মোটর সাইকেলের আশ্চর্য খেলা আসে না, ভোঁ-ভোঁ ঘোরে, কত টাকা কামায়। আমিও বোঁ-বোঁ উড়ব। মাইকে বলব আসুন দেখুন—উড়ন্ত মানুষ...'

নারায়ণ বিশ্বাসের হাটের নারায়ণ ক্যাসেট ভাণ্ডারের সাইনবোর্ডের তলায় আর একটা ছোট সাইনবোর্ড জুড়ে দেয়া হয়েছে। বিঃ দ্রঃ: খবর পাইবা মাত্র উড়ন্ত মানুষ দ্বারা দ্রুত অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।

এই গ্রামে ইলেকট্রিক এসেছে বছর দুই। ফোন ছ'মাস। নারায়ণ ক্যাসেট ভাণ্ডারের ফোন নম্বর দুই। প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের ফোন নম্বর তিন। আট মাইলের মধ্যে আর হেলথ সেন্টার নেই, আট মাইলের মধ্যে আর ভি ডি ও ভাণ্ডারও নেই। তারাদাসকে নতুন পোশাক দিয়েছে নারায়ণ। কালো প্যান্ট, সাদা জামা। তারাদাস ছন্দে ছন্দে ওড়ে আনন্দে।

তারাদাস পাঁচজনের উপকারও করে দেয়। এ নিয়ে ওর সমস্যা। কেউ হয়তো বলল—'তারাদাস, নারকোলগাছ থেকে দুটো নারকোল পেড়ে দিবি?' ও পেড়ে দিল,—ওর তো এক মিনিট। পরে দুখীরাম এসে বলল—'তারাদাস, আমার ভাত মারিস না। আমি এক টাকা নিয়ে নারকোল পাড়ি। তুই এসব করলে আমার কী হবে?' একদিন জনার্দন বলল, 'তারাদাস, এই কাগজগুলো ধর, আকাশ থেকে ছড়িয়ে দিবি।' তারাদাস তাই করল। হরিপদ মাস্টার তো রেগে টং। বলল, 'তারাদাস, জনার্দনের চক্রান্তে পা দিয়ো না। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। জনার্দনের ভগ্নীপতি ক্ষীরসাগর থেকে এসব করাচ্ছে। আমার কথা ছাড়া আর কোনও কাজ করবে না, এই তোমায় বলে দিলুম। আমি এই গাঁয়ের প্রধান।' তারাদাস মাথা নাড়ে।

গাঁয়ে একদিন জনার্দন মল্লিকের বাড়িতে ডাকাতি হল। পুলিশ কী করে জানতে পেরেছিল ঠিক ক'টার সময় ডাকাতি হবে, তাই পুলিশ জিপ নিয়ে এসেছিল আবার ডাকাতও জানতে পেরেছিল পুলিশ আসবে, তাই ডাকাতরা একটু আগেভাগেই এসে গিয়েছিল। পুলিশ যখন এল ততক্ষণে ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা মাঠ ভেঙে পালাচ্ছে। জিপ তো আর মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটতে পারে না, তাই আর ডাকাতগুলোকে ধরা গেল না। পুলিশ বলল, 'খবর আছে আসছে হপ্তায় হরিপদবাবুর বাড়িতে ডাকাতি হবে।' হরিপদ বলল—'সে কী? তবে তো আপনাদের অ্যালার্ট থাকতে হয়।'

পুলিশের বড়বাবু বললেন—'অ্যালার্ট না হয় থাকলাম, তবে মাঠ ভেঙে ডাকাত পালালে আমরা কী করব? মাঠে তো আর জিপ যায় না।' হরিপদবাবু তক্ষুনি তারাদাসকে ডেকে আনিয়ে বলল, 'তারাদাস, পুলিশ সাহেবকে একটু ওড়া শিখিয়ে দে ভাই, সামনের সপ্তাহে ডাকাত আসবে, আমার বাড়িতে ডাকাতি হবে, ডাকাতি করে মাঠ ভেঙে পালাবে। ট্রেনিংটা থাকলে তোর ডানাটা নিয়ে মাঝমাঠে উড়ে গিয়ে পুলিশ ডাকাতকে গুলি করে দিতে পারবে।'

এ আর বেশি কথা কী। তারাদাস রাজি হয়।

বড়বাবুর হাই-ব্লাডপ্রেসার। মেজবাবু ট্রেনিং নিতে এলেন। নাম কানাই পাত্র।

ট্রেনিং হল। তারপর মেজবাবু উড়তে উড়তে করল কী, বলা নেই, কওয়া নেই মধুক্ষরা নদীর ধারে চলে গেল। নদীর পাড়ে সুহাসিনী গ্রাম। গ্রামের ধারের পুকুরে গ্রাম্যবালারা সব কলহাস্য সহকারে স্নানরতা ছিল। তাদের বস্ত্র ছিল পুকুরপাড়ে ছাড়া। কানাই করল কী, সাঁই করে কয়েকটা কাপড়-চোপড় তুলে নিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিল। তারপর ডালে উঠে বসে রইল। কানাইয়ের হাতে মোহন বন্দুক।

ব্যাপারটা জানাজানি হল যখন সাপ্তাহিক বিষদাঁত পত্রিকায় ব্যাপারটা লেখা হল। জনার্দন মল্লিক ওর মাঠের মুনিষ-মজুরদের শোনাল—

'আরে শুন সবে মন দিয়া আজব কাহিনি
সম্প্রতি হইয়াছে ইহা লোক জানাজানি
মাস্টার হরিপদ
মাস্টার হরিপদ—কানাই পাত্র চক্রান্ত করিয়া
নারীর বস্ত্র নারীর ইজ্জত লইল যে হরিয়া
শুন সেই বৃত্তান্ত...'

হরিপদ বলল, 'তারাদাস, তোর ডানাটারই যত দোষ। যত অশান্তির কারণ। এই ডানাটা ভেঙে ফেলা হবে কি না এ নিয়ে আমরা আলোচনায় বসব।'

নারায়ণবাবু বললেন, 'তারাদাস, তোর ঠাকমা আমার হাতে পায়ে ধরে বলেছিল বাপ-মা মরা নাতিটার একটা গতি করে দিতে। বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়েই তোকে আমি চাকরি দিয়েছিলাম। শোন তুই আমার চাকরি করিস। ওসব হরিপদদের কথা শুনবি না। জনার্দনের কথাও না। আমি যা বলব তাই শুনবি, যা বলব তাই করবি। তোর ডানা কাউকে দিবি না। ওটা আমার।'

তারাদাস বলল, 'বুড়োটা ডানাটা দেবার সময় যে বলেছিল—ডানাটার অমর্যাদা হতে দিসনি, মানুষের উপকারে লাগাস...'

নারায়ণ বিশ্বাস বলল, 'বিচার করে উপকার করতে হয়। তোর ছোট্ট মাথায়, বোকা মাথায় কি এত বিচার-বিবেচনা আসে? বরং অমিই বিচার-বিবেচনা করে বলে দেব তোকে।'

নারায়ণ ক্যাসেট ভাণ্ডারে লক্ষ্মী এল। ফুলে-ফেঁপে উঠল দোকান। দোকানের নাম সামান্য চেঞ্জ। ভাণ্ডারটা হল সেন্টার। নারায়ণবাবু দোকানে রং করালেন, নতুন লাইট বসালেন, ধূমধাম করে বিশ্বকর্মা পুজো হল। ভি সি পি, ভি সি আর-এ মালা পড়ল, তারাদাসের ডানায় মালা পড়ল, চন্দন পড়ল, ধূপকাঠি গোঁজা হল স্টিয়ারিং-এর ফাঁকে। ইঞ্জিনিয়ার ডেকে নারায়ণবাবু ডানায় ওয়ারলেস সিস্টেম করালেন। স্টিয়ারিং-এর মাঝখানটায় তো একটা স্পিকার দেয়া হল। উড়ন্ত তারাদাসকে এখন নারায়ণবাবু নির্দেশ দিতে পারেন, আবার তারাদাসের কথাও শুনতে পান নারায়ণবাবু। যেমন:

'ভূদেব সামন্তর বাড়িতে পৌঁছে গেছি স্যার...'

'ইয়েস।'

'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আরও দু'দিন রাখতে চাইছে স্যার।'

'না, তা কী করে হয়; মালতীমাধবপুরে অষ্টপ্রহর হরিসংকীর্তন চলছে, ওখানে তো আজই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দিতে হবে।'

'স্যার, অবনী সাঁতরার বাড়ি পৌঁছে গেছি স্যার।'

'ইয়েস।'

'অবনী বাড়ি নেই।'

'ওনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল।'

'স্যার?'

'ইয়েস...'

'ডটডট্ ক্যাসেটের ব্যাপারে বউদির সঙ্গে কথা বলা কি ঠিক হবে?'

'এতদিনেও কায়দা শেখনি? একটু বুদ্ধি করে বল।'

তখন তারাদাস এইভাবে কথা বলে!—'তিনটে ক্যাসেট দিয়ে গেলুম বউদি, সতী সাবিত্রী, হান্টারওয়ালি আর দ্রৌপদী কী বস্ত্র হরণ। লাস্টেরটার ডবল দাম কিন্তু,—দোব?'

বউদি বললেন, 'রেখে যাও...।'

নারায়ণ তারাদাসকে কোয়ার্টার দিয়েছে বৈকুণ্ঠ ভবনের চিলেকোঠায়। বৈকুণ্ঠ ভবন নারায়ণের নতুন বাড়ি। অল মোজাইক। তারাদাসের ঠাকমা চিলেকোঠায় মনের সুখে ঝোল চচ্চড়ি রাঁধে। মুখে আর হাসি ধরে না। বলে, এবার লাতবউ আনব।

তারাদাস কাজে যাবার সময় বুড়িকে পেন্নাম করে। উড়াল দেবার আগে ডানার বোতাম টেপার সময় শোনে—'দুগ্‌গা—দুগ্‌গা।' তারাদাসের হাতে নতুন ঘড়ি, পরনে নতুন ইউনিফর্ম। বুড়ি তাকিয়ে থাকে...

তারাদাস যায়
জরির জুতো পায়
একশো টাকার জামাজোড়া
তারাদাসের গায়
মন্দা মন্দা বাতাস লাগে
সোনামণির পায়।

এদিকে জনার্দন ভার্সেস হরিপদর ঝগড়া উঠেছে তুঙ্গে। জনার্দন তো নিমিত্ত মাত্র। আসলে ঝগড়াটা হল দুধসাগরের প্রধান হরিপদর সঙ্গে ক্ষীরসাগরের প্রধান গোবর্ধনের। জনার্দনের দোষ হল গোবর্ধন ওর ভগ্নীপতি। জনার্দনের আতাগাছের ডালগুলো হরিপদর সীমানার মুখে পড়েছিল। গাছের ডাল তো আর দাগ নং জে এল নং বোঝে না। কাটলেও আবার ডাল গজায়। এ নিয়ে ঝামেলা। সালিশি হয়েছিল গাছটা কেটে ফেলতে হবে। তখনই ওই বিখ্যাত কবিতাটার জন্ম। ওই যে, জনার্দনের পাঁচিলের গায়ে যেটা লেখা আছে: গাছ লাগান, গাছ বাঁচান গাছ হল প্রাণাধিক, নিবেদন করিছেন জনার্দন মল্লিক। গাছটা সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল। এবার কাটতেই হল।

আতাগুলো ভুঁয়ে লুটোপুটি, তোতা পাখিরা সব উড়ে পালাল। জনার্দনের বোকা মেয়ে তিতুর সে কী কান্না। কান্না আর থামে না। তারাদাস বলে, কাঁদিস না তিতু, আমি, আমি তোকে...

গাঁয়ের শেষ প্রান্তে আতা বাগানের বস্তিতে যে-ছোটলোকগুলো থাকত, ওখানে আগুন লাগল। দুটো বাচ্চা পুড়ে মরে গেল। আতাগাছ যে-কটা ছিল পুড়ে কালো। আতাবাগান বস্তির লোকগুলো হরিপদর হয়ে খুব খেটেছিল ভোটে।

অনন্ত মাঝিকে পাওয়া যাচ্ছিল না। মদালসা নদীর জলে ভেসে উঠল ওর লাশ।

নারায়ণ বিশ্বাসের বাড়িতে এখন অনেকবার বাজে টেলিফোন।

নারায়ণবাবু এখন কেউকেটা লোক। চিন্তামগ্ন লোক।

নারায়ণবাবুর সঙ্গে গোবর্ধনের ফুসুর ফুসুর।

নারায়ণবাবুর সঙ্গে হরিপদর ফুসুর ফুসুর।

নারায়ণবাবুর সঙ্গে পুলিশের ফুসুর ফুসুর।

তারাদাস এখন ঘর আটকা। নারায়ণবাবু বলেন, এখন ক'দিন বাইরে বেরুতে হবে না তারাদাস। তোর ডানার দিকেই সবার নজর। পেলে কেড়ে নেবে, নয়তো ভেঙে দেবে।

বুড়ি ঠাকমা তারাদাসের ডানায় থুথু দেয়, ঝাঁটার কাঠি বেঁধে দেয়।

একদিন বৈকুণ্ঠ ধামে অনেক জুতো। বসার ঘরে দোর বন্ধ করে আলোচনা। ঘরে কে কে আছে জানে না তারাদাস। আকাশে সেদিন সকাল থেকে মেঘ।

তারাদাসের ঠাকমা খিচুড়ি চাপিয়েছে। এমন সময় নারায়ণবাবু এলেন তারাদাসের চিলেকোঠার ঘরে।

'তারাদাস, কথা আছে।'

'কী কথা?'

'একটু বেরুতে হবে তোকে।'

'আজ যে মেঘলা দিন। সূর্যের আলো না পড়লে যে আমার ডানা নড়ে না।'

'আলো আছে। আলো আছে বলেই তুই আমাকে দেখছিস, আমি তোকে দেখছি। একবার দেখ্‌না-রে ভাই তারাদাস, ভীষণ দরকার।'

'ভাই' ডাক শুনে তারাদাস গলে যায়। ডানা লাগিয়ে একবার ট্রায়াল দিল। একপাক উড়ে এল। ভাবল সত্যিই তো, আলো কী অদ্ভুত। সূর্যকে দেখতে না পেলেও সূর্য আছে চরাচরে।

তারাদাস বলল, 'কোথায় যেতে হবে?'

নারায়ণ ছাদের কোনায় ডেকে নিয়ে যায়। বলে, 'সোজা উত্তরে। মধুক্ষরা নদী পার হতে হবে।'

'ওখানে তো আমাদের ক্যাসেটের কেলায়েন্ট নেই—'

'ক্যাসেট নয়-রে, অন্য জিনিস।' নারায়ণের গলার স্বর গাঢ়। 'জিনিসটা আনতে হবে তোকে।'

'কী জিনিস?'

'পরে জানবি। শোন তারাদাস, নলখাগড়ার মাঠ পার হয়ে মধুক্ষরা নদীর পাড়ে যাবি। তারপর নদী পার হয়ে একটু গেলেই একটা মন্দির, সেই মন্দিরের পাশে নামবি। তারপর কোথায় যাবি কী করতে হবে ওয়ারলেসে বলে দেব তোকে। এই-নে চাবি। লাগবে তোর। জিনিসটা খুব সাবধানে আনবি, খুব সাবধানে।' ক্যাসেট রাখার বাস্কেটটা পেটের তলায় ভাল করে বেঁধে দেয় নারায়ণ। তারাদাস যাত্রা করে। বুড়ি ঠাকমা বলে, 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা।' নারায়ণ হাত নেড়ে বলে, 'গুডলাক।'

নদীর উপরে আসে তারাদাস। বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে নদী এখন বিশাল। তলায় তাকালে ভয় লাগে।

নদী পার হয়েই দেখল আতাবন। পাকা পাকা আতা ফলে আছে। ওয়ে ওয়ে... ওয়ে ওয়ে...। দুটো তিতুকে দেবে, দুটোর বীজ সারা দুধসাগরে ছড়িয়ে দেবে। আতা ফলগুলো বাস্কেটে পুরে নিল তারাদাস। গাছের কোটরে পেল তোতা পাখির ছানা। তুলে নিল। তারাদাস বাঁচাবে। মাউথপিসে কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তারাদাস।

'মধুক্ষরা নদী পার হয়েছ?'

'ইয়েস স্যার।'

'এবার অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলো। ওর কথা মতো কাজ করে যাও।'

'ইয়েস স্যার।'

একটা খ্যাড়খেড়ে গলায় শুনতে পায়, 'তারাদাস এখন কোথায় আছ?'

'আতাবনে। কী সুন্দর আতাবন।'

'গুলি মারো আতাবন। সামনে যাও।'

'ইয়েস স্যার।'

'চূড়ায় ত্রিশূল?'

'ইয়েস স্যার।'

'মন্দিরের পিছনে নেমে যাও।'

'ইয়েস স্যার।'

মন্দিরের পিছনের কাশবনে নেমে যায় তারাদাস। তারপর কথামতো লাল রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে যেতেই একটা একতলা বাড়ি। বাড়ির দরজায় তালা। কথামতো চাবিটা বার করে তারাদাস। তালাটা খোলে। ঘরের জানালা-টানালা সব বন্ধ। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা গন্ধ।

টর্চটা বার করে। জ্বালায়। ঘরের কোনায় চারটে প্যাকেট। টর্চের আলোয় তারাদাস খুঁজতে থাকে পদ্মফুল আঁকা প্যাকেট। তারাদাস পায় না। প্যাকেটগুলো উলটেপালটে দেখে। কোনওটাতেই পদ্মফুলের ছবি নেই। তারাদাস খুব সমস্যায় পড়ে। হনুমান কী করেছিল, হনুমান?

বিশল্যকরণী খুঁজতে গিয়ে হনুমান বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে পুরো গন্ধমাদনটাই নিয়ে এসেছিল না? তারাদাস চারটে প্যাকেটই তুলে নেয়। হেড অফিসের সঙ্গে কথা বলে:

'কোনও প্যাকেটে পদ্ম ফুলের ছবি নেই স্যার। ওভার।' আবার সেই খ্যাড়খেড়ে—'ভালো করে দ্যাখো।'

'দেখেছি স্যার, খুব খুব ভাল করে দেখেছি। ওভার।'

'সে কী?—নিশ্চয়ই আছে। ভাল করে দ্যাখো।'

'নেই স্যার।'

'সব রাসকেল। কেউ ঠিক করে কাজ করেনি। তুমি এক কাজ করো। চারটে প্যাকেটই নিয়ে এসো, আমরা পরে দেখে নেব।'

'প্যাকেটে কী আছে স্যার?'

'তা তোমার জেনে কাজ নেই। তুমি প্যাকেটগুলো নিয়ে এসো।'

তারাদাস চারটে প্যাকেটই তুলে নেয়। অজানা প্যাকেট। আকাশ মেঘলা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেল্টের বোতামটা টিপল তারাদাস। হলুদ আলো। মানে ডানায় শক্তি বেশি নেই। মধুক্ষরা নদী পার হতে পারবে তো? দুগ্‌গা বলে উড়ান দিল তারাদাস।

উড়তে উড়তে আতাবন পার হল তারাদাস। উড়তে উড়তে যেন টের পায় একটু একটু করে নীচে নেমে যাচ্ছে ও। নদীর উপরে চলে আসে তারাদাস। ডানা যেন আর তত জোর কাঁপছে না। একটু করে নিচু হয় তারাদাস। নদী মাঝ বরাবরও আসেনি। নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে তারাদাস। তারাদাস ভয় পায়। ওয়ারলেসে জানায়—'নদীর উপর দিয়ে উড়তে উড়তে আমি তারাদাস বলছি, আমি নীচে নেমে যাচ্ছি ক্রমশ। আমাকে একটু হালকা হতে হবে। একটু ওজন কমাতে হবে আমার একটা প্যাকেট ফেলে দিচ্ছি জলে...'

তক্ষুনি সমবেত স্বর:—'সর্বনাশ তারাদাস, প্যাকেট ফেলো না।'

'আমায় যে হালকা হতে হবে।'

'তা হলে পেচ্ছাপ করে দাও।'

তাই করল তারাদাস। মধুক্ষরা নদীর জলে তারাদাস পেচ্ছাপ করল।

একটুক্ষণ পরে আবার যেন নীচে নামছে তারাদাস। একটু পরেই তারাদাস আবার চিৎকার করল—'আমি আবার নীচে নেমে যাচ্ছি। এবার একটা প্যাকেট ফেলে দিচ্ছি আমি, যে-কোনও একটা প্যাকেট।'

'যে-কোনও একটা প্যাকেটের মধ্যেই আমাদের দরকারি প্যাকেটটা আছে। প্যাকেট ফেলো না। তুমি তোমার প্যান্ট খুলে ফ্যালো।'

তাই করল তারাদাস। কায়দা করে প্যান্টটা খুলে ফেলে দিল মধুক্ষরা নদীর জলে। কিছুক্ষণ ঠিক, কিন্তু, একটু পরেই আবার নীচে নামতে লাগল তারাদাস। বর্ষায় উথাল-পাথাল নদী। তারাদাস চিৎকার করল—'আবার নীচে নেমে যাচ্ছি আমি। জলে ডুবে যাব। একটা প্যাকেট ফেলে দিই আমি?'

'আর কি কিছুই নেই তোমার কাছে তারাদাস ওই প্যাকেটগুলো ছাড়া? ধারালো কিছু নেই? শরীরের কিছুটা রক্ত ঝরিয়ে দিতে পারো না তুমি?'

'আমার কাছে ক'টা আতা ফল আছে, আর তোতা পাখির ছানা।'

'আতা ক্যালানে কোথাকার! ফেলে দাও! এক্ষুনি ফেলে দাও সব।'

তখনই ডুকরে কেঁদে ওঠে তারাদাস। তারাদাস তখন ঝুড়ির ভিতর থেকে বের করে নিল একটা আতাফল। পরিপূর্ণ গন্ধ ছিল। তারপরই মুঠিতে শক্ত করে চেপে ধরল। আতা ফল ফেটে যায়, ভেঙে যায়।

একটু একটু করে জলের দিকে নেমে যাচ্ছে তারাদাস। তখন আকাশকে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মহিমাকে সাঁই সাঁই বাতাসকে বলল, 'আমাকে বাঁচাও...'

আর অল্প কয়েক হাত নীচেই তোলপাড় জল। তারাদাস চোখ বুজে তুমুল আর্তনাদ করে—'আমাকে বাঁচাও।' তারাদাসের চতুর্দিকে তখন শুধুই বৃষ্টির গুঁড়ো, আর কালো স্পিকারের যান্ত্রিক কলরব, 'ফেলে দে—ফেলে দে আতা।'

এখন তারাদাসকে বাঁচতে হলে যে-কোনও একটা জিনিস বেছে নিতে হবে। আতা কিংবা বাদামি প্যাকেট। প্যাকেটে কী আছে জানে না তারাদাস। বিষ না বীজ—না বীজাণু—না ড্রাগ—হেরোইন না নাপাম না নিউক্লিয়ার ছাই, তারাদাস জানে না। অথচ তারাদাসেরই ডানায় ভর করে চলেছে।

তারাদাসের আগে কোলবালিশটাও উড়েছিল। ওড়ানো হয়েছিল। কোলবালিশটার নিজের কোনও ইচ্ছে ছিল না। প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত ছিল না। কিন্তু তারাদাস তো কোলবালিশ নয়, ডুবে যাবার আগে ওকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

শারদ অনুষ্টুপ,১৯৯৩

যন্ত্রপাতি

প্রদীপ আর পৃথার দারুণ মিল। আশ্চর্য সমঝোতা, সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম ওরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। বউ বলেই স্বামীকে চা খাইয়ে জাগাতে হবে প্রদীপ সেটা বিশ্বাস করে না। পৃথা সপ্তাহে চার দিন সকালে উঠে চা বানিয়ে প্রদীপের মাথার কাছে ছোট টেবিলটায় আলতো রেখে, প্রদীপের প্রায় টাক-পড়া মাথায় আঙুলের নরম চিরুনি বুলিয়ে বলে, ওগো, চা। আবার প্রদীপও সপ্তাহে তিন দিন সকালে উঠে চা বানিয়ে পৃথার মাথার কাছের ছোট টেবিলটায় প্লেট সমেত ঠক করে রাখে এবং ঠক শব্দেই পৃথা উঠে যায়। বউ বলেই স্বামীর গেঞ্জি-জাঙিয়া-আন্ডারওয়ার-রুমাল ইত্যাদি কাচাকুচি করে দিতে হবে এরকম সূত্রে প্রদীপের বিশ্বাস নেই। কই, প্রদীপ তো পৃথার সায়া-ব্লাউজ-ব্রা কেচে-টেচে দেয় না। এ জন্য ওরা একটা ওয়াশিং মেশিন কিনেছে। সেমি অটোমেটিক। ওর মধ্যে গেঞ্জি-ব্রা-জামা-শাড়ি একই সঙ্গে বেশ ঘোরে। মেশিনটা অবশ্য পৃথাই হ্যান্ডেল করে, অপারেট করে, যত্ন করে।

ওদের শিশু সন্তানটি ঘন ঘন হিসে করে বিছানায়। বারবার ন্যাপকিন পালটাতে হয়। ফলে রাতে ঘুম হয় না ভাল। প্রদীপ ও পৃথা রাত জাগা ভাগ করে নিয়েছিল, ভুল বলা হল, প্রদীপ ভাগ করে দিয়েছিল। তোমার চার, আমার তিন। মানে প্রদীপ সপ্তাহে তিন দিন রাত্রে বাচ্চার ভিজে কাঁথা পালটানোর দায়িত্ব নেবে, এ ব্যাপারে পৃথার কোনও হেডেক থাকবে না। আর বাকি চার দিন ওইসব পৃথাই করবে। এই তিন দিন চার দিন ভাগটা প্রদীপ ঠিক করার সময় শনিবার রাতের ঘুমটা নিজের ভাগেই রেখেছে এবং রবিবার সকালের চা-টা পৃথার। এইসব ভাগাভাগির জন্য একটা গর্ব প্রদীপের বুকের মধ্যে সেকালের পকেট ঘড়ির মতো টিকটিক করে বাজে। এ নিয়ে ঘরে কোনও ঝামেলা হয়নি। মানে সাংসারিক ঝামেলা। সংসারে ওরা খুব ডিসিপ্লিনড। যন্ত্রের মতো। খুচরো ঝামেলাটা হয়েছিল অফিসে।

প্রদীপের শিফট ডিউটি। বাচ্চাটা হবার পর বসকে বলে-কয়ে ডিউটিটা অ্যাভয়েড করছে ও। তা একদিন এমারজেন্সি নাইট ডিউটি পড়ে গেল। রাত দুটো-আড়াইটা নাগাদ ওদের কাজ শেষ হয়ে গেলে ওরা শুয়ে পড়ে। কিন্তু বাচ্চা হিসি করেছে কি না দেখার অভ্যেস ইতিমধ্যেই রিফ্লেকস হয়ে গেছে। প্রদীপের ঠিক পাশেই শুয়েছিল ওর সিনিয়ার সহকর্মী দ্বিজেনদা। দ্বিজেনের সঙ্গে প্রদীপের আবার খারাখারি। দ্বিজেনদা সেই রাতে অন্তত তিনবার, এই, এসব কী হচ্ছে, বলেছিলেন। অফিসে চাউর হয়ে গিয়েছিল প্রদীপ পারভারটেড হয়ে গেছে, প্রদীপকে ফিসফিস করে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল, কী, ঘটনাটা কি সত্যি? শেষ পর্যন্ত প্রদীপকে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ হেডিং দিয়ে কুড়ি কপি স্টেটমেন্ট জেরক্স করতে হয়েছিল।

এই ঘটনার পর বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল প্রদীপ। পর পর ক'দিন ভীষণ মাথা ধরেছিল। পৃথা কোলের উপর প্রদীপের মাথাটা নিয়ে টিপে দিতে দিতে বলেছিল, থাক বরং আমাদের সোনার কাঁথা-টাথা আমিই পালটাব। আবার হঠাৎ হঠাৎ কখন নাইট ডিউটি পড়ে যাবে তখন আবার বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। তুমি বরং ঘুমিয়ো। প্রদীপ বলল, তা কি হয় নাকি। দু'জনের মেয়ে। যা কিছু কষ্ট-টষ্ট ফিফটি ফিফটি ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এ কথা ভাবতে ভাবতে প্রদীপের মনে হল পৃথার কোলে মাথা রেখে ওকে দিয়ে এভাবে মাথা টেপানোটা কি ঠিক হচ্ছে? এবং মাথা যখন আছে যখন-তখন ধরতেই পারে। প্রদীপ পরদিনই একটা মাথা টেপার মেশিন কিনে নিয়ে এসেছিল।

ভাইব্রেটার। প্লাগে লাগিয়ে দিলেই কাঁপতে থাকে, কাঁপতেই থাকে। একটু চায়ের জল চাপিয়ে আসি কিংবা গ্যাসটা অফ করে আসি বলে থেমে যায় না। কাঁপতেই থাকে। রেগুলেটার আছে। বাড়ানো যায়, কমানো যায়...।

পৃথা বলেছিল, কার কাছে ভাল লাগে তোমার? নিশ্চয়ই পৃথার কোলে মাথা রেখে পৃথার কাছেই প্রদীপের বেশি ভাল লাগে। কিন্তু প্রদীপের মনে হল মেশিন কী ভাববে। প্রদীপ মেশিনটার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে মৃদু বলেছিল। পৃথা একবার তীব্র তাকাল মেশিনটার দিকে। জটিল ভুরু ভঙ্গি। এবার প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাবে। এটাকে কি অভিমান বলা যায়? সেদিন কী হয়েছিল, ছুটির সকালে দোসা করেছিল পৃথা। প্রদীপের একজন বন্ধুও এসে গিয়েছিল। মিক্সিটা নতুন কেনা হয়েছে বলা যায়। মিক্সিতে বাটা হয়েছিল দোসার জিনিসপত্তর। প্রদীপের বন্ধু বলেছিল দারুণ হাত পৃথার। খুব ভাল হয়েছে। প্রদীপ বলেছিল, হাত নয়, হাত নয়, মেশিন, মেশিনে, মানে মিক্সিতে বাটা হয়েছে। প্রদীপ তখন পৃথাকে বলেছিল, হাতে বাটলে এত মিহি হত না, বলো।

পৃথা নতমুখে বলেছিল, হুঁ।

তখন কি পৃথার কণ্ঠস্বরে পরাজয় ছিল? হেরে যাওয়া ছিল? প্রদীপ বোঝেনি। প্রদীপ এর কিছুদিন পরে এক গ্রীষ্মের বিকেলে মিক্সিটার মধ্যে ঘুটিয়ে ওঠা ঘুরে যাওয়া দই ঘোলের ক্রমশ লস্যি হয়ে যাওয়া লাস্যময় হ্লাদিত ফেনিল তীব্র বুটবুটির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, পারতে পারতে তুমি এরকম? পৃথা তখন কেন যে হঠাৎ সুইচ অফ করে দিয়ে মুখ ঢেকেছিল দু'হাতে, প্রদীপ বোঝেনি। মিক্সি মেশিনটা নিয়ে আরও কথা আছে। অনেক কথা আছে। অবশ্য মিক্সি মেশিনটারও কিছু নিজস্ব কথা আছে। সব মেশিনেরই নিজস্ব কথা থাকে। যারা মেশিনের ভাষা বোঝে তারা ওইসব কথা মানুষের ভাষায় অনুবাদ করে নিতে পারে। পৃথাও ক্রমশ মেশিনের ভাষা বুঝতে পারছে, বুঝতে শিখছে। পৃথা তাই মেশিনের সঙ্গে কথা বলে। মিক্সি চালাতে চালাতে পৃথার মাঝে মাঝে কপালে সরু রেখার ভাঁজ পড়ে। ছদ্ম হাসির দাগ পড়ে। প্রদীপ লক্ষ করে, আজকাল ঠিক লক্ষ করে। কখনও দেখে দাঁতে চাপা ঠোঁট, কপালের ঘাম, ঘামের অভিমান।

এরকম ছদ্ম হাসির রেখা, কপাল ও কপালের ঢেউ, ঘাম বিন্দু তৈরি হয় পৃথার শরীরে যখন চৈতালি আসে।

চৈতালির খবর হঠাৎই পেয়েছিল প্রদীপ অন্য এক বন্ধু মারফত। এই মাইরি, চৈতালি না, ডাক্তার হয়েছে, হোমিওপ্যাথ। দমদমে বসে, হনুমান মন্দিরের উলটো দিকে...। প্রদীপ মজা করবে বলে গিয়েছিল। বাইরে কম্পাউন্ডার। ওষুধ বানায়, নাম লেখে। প্রদীপ ওর নাম লেখার রমণীরমণ ঘোড়েল। নামটা পড়েই চৈতালি হয়তো হেসে উঠবে, খুব হাসত চৈতালি। সবসময়। প্রদীপের টোকেন নম্বর দশ। বেঞ্চিতে বাচ্চা কোলে বউ-ঝিরাই বেশি। পাঁচ নম্বর চলছে। প্রদীপ চঞ্চল। পর্দার ফাঁক দিয়ে চৈতালিকে একবার দেখল প্রদীপ। পনেরো বছর পর। এর মধ্যে প্রদীপ মোটা হয়েছে, ভুঁড়ি হয়েছে, টাক হয়েছে, কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট হয়েছে। প্রদীপ ভাবছিল ওকে হয়তো চিনতে পারবে না চৈতালি। যখন জিজ্ঞেস করবে, কী হয়েছে আপনার, প্রদীপ বলবে, গোপন রোগ। কিন্তু সব ভেস্তে গেল। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চৈতালি চিৎকার করল; ডাক্তার-টাক্তাররা এরকম চিৎকার করে না। বলল, আরিব্বাস। কীরে প্রদীপ, তুই?

তারপর কী খবর কেমন আছিস কবে বিয়ে করেছিস ইত্যাদি থোড়বড়ি, এবং শেষকালে ঠিকানা দেওয়া। নেওয়া। যাব, তোর বাড়ি যাব। তোর বউকে দেখে আসব।

প্রদীপ চৈতালির হাত এবং মাথার দিকে লক্ষ করেছিল কয়েকবার। বিয়ে করিসনি?

না।

কেন?

এমনি।

তা হলে নতুন ঠিকানা কেন!

পালটেছি।

দু-তিনবার এসেছে চৈতালি। পৃথা ওর সঙ্গে কথা বলেছে, চা করেছে, আবার আসবেন বলেছে, হাসির রেখা এঁকেছে এবং আশ্চর্য ভুরু বক্ররেখা।

মিক্সি মেশিনের সঙ্গে পৃথা এরকমই কথা বলে, এরকমই ভুরু কুঞ্চিত হয় ওর। হাসির রেখাও এরকমই।

সে দিন এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। পৃথা রান্নাঘর থেকে ডাকল, এই, এদিকে দেখে যাও। বেশ উচ্ছ্বাস, বেশ আহ্লাদ। প্রদীপ গেল রান্নাঘরে। পৃথা বলল, এই দ্যাখো। ওর মুখে যেন প্রেশারকুকারের পুলক শব্দ। মিক্সির সুইচটা অন করল পৃথা।

টক করে একটা শব্দমাত্র হল। তারপর শূন্যতা। স্টিলের চক্রকাঁটা স্থির। পৃথার মুখ স্থির এবং মুখের মধ্যে স্থির পাতলা হাসির প্রলেপ।

প্রদীপ মিক্সির শরীর থেকে পৃথার আঙুল সরিয়ে দিয়ে নিজে সুইচ ঘোরাল। ওয়ান-টু-থ্রি। লো-মিডিয়াম হাই। মিক্সি স্থির। হাসপাতালের বিছানায় অসুস্থ বন্ধুর কপালে হাত রাখার মতো মিক্সির শরীরে হাত রেখে প্রদীপ পৃথার চোখে চোখ রাখল। আর তক্ষুনি পৃথার চোখের রং পালটে গেল। হাসির রেখা পালটে গেল। কপালের ভাঁজ পালটে গেল।

পৃথা বলল, ইশশ্...জিনিসটা।

প্রদীপের তক্ষুনি মনে হল—আটশো পঞ্চাশ টাকা। মনে হল গ্যারান্টি পিরিওড একসপায়ার্ড। মনে হল ভোগে।

প্রদীপ বলল, উলটো-পালটা চালিয়েছিলে?

পৃথা বলল, উলটো-পালটা চালাবার কী আছে?

প্রদীপ বলল, না-না এসব খুব ডেলিকেট।

পৃথা বলল, আমি আরও ডেলিকেট জিনিস হ্যান্ডেল করেছি।

প্রদীপ বলল, তা হলে হঠাৎ থেমে গেল কেন?

পৃথা—এদের কিছু বিশ্বাস নেই।

এভাবেই প্রাণ আরোপ হয়ে যায় মেশিনে। প্রদীপ বলে, ওকে তা হলে গজেনের দোকানে নিয়ে যাই?

গজেনের ইলেকট্রিক জিনিসপত্রের সারাইয়ের দোকান আছে।

প্রদীপের পরিচিত। আবার ওর বন্ধু শিবব্রতর হোমিওপ্যাথি চেম্বার আছে। ও ডাক্তার। কাশতে থাকা সন্তানটিকে তা হলে শিবব্রত কাছে নিয়ে যাই? বলার মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা থাকে প্রদীপের, প্রায় ততটাই যেন ঘনত্ব প্রদীপের গলায়।

নেবার ইচ্ছে হলে নাও...।

প্রদীপ পৃথার এই অদ্ভুত ঔদাসীন্য লক্ষ করল। ও তো পৃথার কাছেই থাকে। ওকে পৃথাই তো স্নান করায়, তেল মাখায়, গ্রিজ মাখায়, পরিষ্কার করে, মোছে। ওর কিছু হলে পৃথারই তো মন খারাপ হবার কথা। তা ছাড়া ও তো পৃথার কাজগুলোই করে দেয়। সংসারের কাজকর্মের যেসব ভাগাভাগি হয়েছে, বরং বলা ভাল যে ভাগাভাগি প্রদীপ করে দিয়েছে তার মধ্যে রান্না করা, মশলা বাটা পৃথার ভাগেই ছিল, ন্যাচারালি। সুতরাং সারাই করতে নেবার প্রস্তাবে পৃথার কি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবার কথা ছিল না? ওর কি বলা উচিত ছিল না এক্ষুনি যাও! এবং তখন কি পৃথার ঘাড়ের কাছের চুলপুঞ্জ খলবল করে ওঠার কথা ছিল না? তা হলে পৃথার মধ্যে এতটাই নিরুদ্দেশ কেন। মেশিনটার সঙ্গে এতদিন থেকেও কি বন্ধুত্ব সম্পর্ক তৈরি হয়নি?

অথচ অন্য মেশিনগুলোর সঙ্গে পৃথার তো ভালই বন্ধুত্ব। গ্যাসের সঙ্গে, ওভেনের সঙ্গে, ফ্যানের সঙ্গে...। ফ্রিজের সঙ্গে পৃথার বন্ধুত্বের তো জবাব নেই। প্রতি রবিবার ওর সঙ্গে অনেকটা সময়

কাটায় পৃথা। সখীভাবে থাকে বেশ। ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গেও ভাল সম্পর্ক পৃথার। যেন কিছুটা বয়ফ্রেন্ড। টিন এজার। যে সিনেমার টিকিট কেটে দেয়, ট্যাক্সি ডেকে দেয়। টিভি, ভি সি পি-ও সম্ভবত বয়ফ্রেন্ড। একটু বয়স্ক। ফ্রিজ-ট্রিজ সবাই বান্ধব। স্টিরিও সিস্টেমটাও বোধ হয় ওলো সখীর সঙ্গে কিছুটা কুচুটেপনা। ঈর্ষা। কিন্তু সবচেয়ে জটিল সম্পর্ক মিক্সি মেশিনটার সঙ্গে। পৃথা টিভি কিংবা ভিসিপির নির্জন সঙ্গ চায় মনে মনে প্রদীপ কি বোঝে না: চৈতালি যেমন বলে থাকে, আসিস রে প্রদীপ তোর বউকে নিয়ে...। 'বউ' শব্দটা যে এখানে আবরণ মাত্র প্রদীপ কি সেটা বোঝে না? পৃথার সঙ্গে যন্ত্রপাতিগুলোর সব অদ্ভুত অদ্ভুত সম্পর্ক। বাৎসল্য ভাব আছে অদ্ভুত একটা যন্ত্রের সঙ্গে। কলিং বেল। এই কলিং বেলটা কিন্তু সাধারণ কলিং বেল নয়। সেই যে ওদের বাচ্চাটার কথা বলা হয়েছিল, ওর কাঁথা ভেজানো এবং আনুষঙ্গিক সমস্যার কথা। এর ক'দিন পর একটা অদ্ভুত যন্ত্র কিনে এনেছিল প্রদীপ। প্রদীপের অফিসের এক মহিলা সহকর্মী ওই যন্ত্রটির হদিশ দিয়েছিল। একটি প্লাস্টিকের চাদরের গায়ে সূক্ষ্ম তারের কারুজাল লাগানো। এক পাশে ব্যাটারি। বাচ্চার কাঁথার তলায় ঢুকিয়ে দিতে হয়। কাঁথা ভিজে গেলেই বেল বাজবে। প্রদীপ বেল সিস্টেম কেনেনি। বেল বাজলে দু'জনেরই ঘুম ভেঙে যাবে। ওদের তো দিন ভাগ আছে, সপ্তাহে চার দিন-তিন দিন। তাই স্পিকার সিস্টেম কিনেছিল। স্পিকারের সঙ্গে একটা ছোট্ট ছিপি হেডফোন কানে গোঁজা থাকে। কাঁথা ভিজে গেলেই পিঁপিঁ শব্দ কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে। পশযন্ত্র। পৃথার যে একে খুব ভাল লাগে প্রদীপ বুঝতে পারে। পৃথা ওকে গুটিয়ে রাখে। গায়ে হাত বুলোয়, আদর করে। প্রদীপেরও ভাল লাগে ওকে। প্রদীপরা যখন বাচ্চাকে বেড়াতে নিয়ে যায়, যন্ত্রটাকেও নিয়ে যায়। প্যারাম্বুলেটারের বাচ্চাটার তলায় যন্ত্রটা থাকে। কানে ছিপি থাকে না তখন। হিসি হলেই স্পিকারে পিঁপিঁ শব্দ হয়।

পৃথার একটা হেয়ার ড্রায়ার আছে। ওর সঙ্গে পৃথার এরকম কথাবার্তা হয়।

এই হচ্ছেটা কী, পাজি কোথাকার।

কী আবার হচ্ছে।

কোনও কম্মের না। একদম জানলা দিয়ে ফেলে দেব।

ফেলুন, দেখি তো...

যেন কাজের বাচ্চা মেয়েটা। বাচ্চার দুধ গরম করতে বললে একা একা লুডো খেলে। তখন—

এই হচ্ছে কী, পাজি কোথাকার।

কী আবার হচ্ছে—

একদম অবাধ্য তুই। একদম তাড়িয়ে দেব বলেছিলাম—

দিন না দেখি...

হেয়ার ড্রায়ারটা এরকমই করে। সুইচ অন করলে কখনও চলে, কখনও চলে না। কখনও গরম হাওয়া বয়, কখনও ঠান্ডা। অথচ ওকে ফেলে দিতে পারে না।

ফ্রিজের সঙ্গে একেবারে দাস্য ভাব।

সখীভাবের সঙ্গে দাস্য ভাব মিশে গেলে কী একটা হয়। বৈষ্ণব কাব্যে আছে। এর সঙ্গে একেবারে বিগলিত থাকে পৃথা। কখনও তর্ক করে না। ক'টা কথা বলে না। ওর দিকে অপলক চেয়ে থাকে। চেয়ে চেয়ে হাসে। করস্পর্শ দেয়। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। যত্ন করে ডি-ফ্রস্ট করে দেয়। যত রকমের সেবা আছে পৃথা করে যাবে।

কিন্তু স্টিরিয়োটার সঙ্গে একটু কেমন যেন। যদিও ওটার ঢাকনি বানিয়ে দিয়েছে পৃথা, ঢাকনিতে ফুল, ধুলোও ঝাড়ে, মাঝে মাঝে ওর দিকে চেয়েও থাকে, কিন্তু ওর প্রশংসা খুব একটা করে না। প্রদীপ কিন্তু স্টিরিয়োটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হয়তো প্রদীপ বলল, মালটা দারুণ।

কী এমন দারুণ।

বেশ স্মার্ট, স্লিম দেখতে।

দেখতে দিয়ে কী হবে—
কালারটাও ভাল।
তোমাদের খালি ফিগার, কালার...
কেন পারফরমেনস কি খারাপ?
এমন কিছু নয়।
কেন এমন কিছু নয়? ওর সাউন্ড বেশ ভাল...
এমন কিছু ভাল নয়...
কেন এমন কিছু ভাল নয়?
আমি এক্সপ্লেন করতে পারব না। তবে এমন কিছু ভাল নয়, ব্যাস।

সেই ঈর্ষা ভাব। পৃথাও গান করে একটু আধটু। প্রদীপ ওর প্রথম গান শুনেছিল প্রাক-বিবাহপ্রেম চলাকালীন। আউটরাম ঘাটের সিমেন্টের চেয়ারে মস্তান আসার আগের মুহূর্তে 'সখি ভাবনা কাহারে বলে'র ভালবাসার 'ভা'তে এসে থেমে যেতে হয়েছিল। এরপর হনিমুনে অনেক গানের হাফ শুনেছে পুরীতে। হাফ এর পর পৃথা হয় যাঃ ভুলে গেছি বলে থেমে গেছে, আর যে গান পৃথা পুরো করতে পারত, প্রদীপ এমন কাণ্ড-কারখানা করছিল যে, গান থামিয়ে দিতে হয়েছিল। ও, হ্যাঁ। বিয়ের পর বাথরুম বা রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা হামিং শুনেছে প্রদীপ। লাস্ট শুনেছে সেই মাথাধরার সময়। যখন পৃথা মাথা টিপে দিচ্ছিল।

তারপর তো বলাই হয়ে গেছে যে প্রদীপ একটা মাথা টেপার যন্ত্র কিনে নিয়ে এসেছিল। টেপার যন্ত্রটা টিপে ও পৃথার প্রিয় গান কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের গলায় 'সখি ভাবনা কাহারে বলে'র ক্যাসেটটা চালিয়ে দিয়েছিল লো ভল্যুমে। প্রদীপের মানে ফানের দরকার নেই, গান হলেই হল: পৃথা এসে একবার ব্যাপারটা দেখে গিয়েছিল। হেসেছিল। ঘাড়ের ঝটকায় চুল নড়ে উঠেছিল। কোনও কথা বলেনি। একটু পরেই লোডশেডিং হলে পৃথা বলেছিল, বেশ হয়েছে। সঙ্গে একটি হাততালি ছিল। মিক্সিটা খারাপ হয়ে যাবার পর প্রদীপ বলেছিল, ওকে তা হলে গজেনের কাছে নিয়ে যাই।

পৃথা বলেছিল, তোমার ইচ্ছে হলে নাও...।

প্রদীপ মিক্সিটা থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিল। সামান্য ধাক্কা দিয়ে বলেছিল, থাক। যন্ত্রটা নড়ে উঠেছিল। আর তখন কী আশ্চর্য পৃথা হামিং শুরু করেছিল শ্যামল মিত্রের ওই গানটা... 'যাক, যা গেছে তা যাক।'

সেই থেকে মিক্সির দেহখণ্ডগুলি রান্নাঘরের উঁচু তাকটায় পড়ে আছে। মেশিনটা, পাশে দুটো জার। ধুলো পড়ছে। আজ রবিবার। রবিবার পৃথা ও প্রদীপ খুব ব্যস্ত। ওরা খুব ব্যস্ত বলেই ওদের অনেক মেশিন। আর মেশিনের জন্যও ওরা ব্যস্ত। সকালবেলা উঠে চা খেয়েই কাজে লেগে পড়তে হয়। আগেই তো বলেছি ওদের দারুণ মিল। আশ্চর্য সমঝোতা। তাই ওরা সব যন্ত্রপাতিগুলি ভাগাভাগি করে যত্ন করে। অডিও সিসটেমটাকে প্রদীপই দেখে। হেড পরিষ্কার করে। বই আলমারির ব্যাপারটাও প্রদীপের। বইগুলোকে একবার চোখে দেখা, এই একটু আধটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেয়, দু-চার বার ফুঁ দেয়া, এইসব। ওয়াশিং মেশিনটা পৃথা দেখে। তেল দেয়। কোনাটোনায় লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে দেয়। ফ্রিজটাও পৃথার। ওর জন্য অনেকটা সময় রেখে দেয়। সাপ্তাহিক আলাপ।

টিভি, ভিসিপিও পৃথার। সেলাই মেশিন আছে একটা, ব্যবহার হয় না, তবু আছে। মাঝে মাঝে তেল-টেল দিতে হয়, চাকা-টাকা একটু ঘুরিয়ে দিতে হয়। ওরাও তো ব্যবহার চায়। পৃথাই করে এটা। ওদের বাচ্চাটার কানের ফুটোয় জমে থাকা নোংরা নরম তুলোয় পরিষ্কার করতে হয়, পৃথাই করে। বাচ্চাটার কানের লতির পিছনে কিংবা উরুসন্ধিতে লেগে থাকা হালকা ময়লা পরিষ্কার করতে হয়, পৃথাই করে। এ ছাড়া গ্যাসের বার্নারের ছিদ্রগুলিকে পরিষ্কার করা, ব্যাটারি চার্জারে

ব্যাটারি ঢুকিয়ে চার্জ করে রাখা, প্রদীপের পিঠে পাউডার মাখিয়ে দেয়া, একটু আধটু খুনসুটি, চুম্বন-টুম্বন বা আরও...। টোস্টারের কয়েলের ওপর কার্বনের গুঁড়ো ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করা, অ্যাশট্রে পরিষ্কার করা, এরকম কত শত কাজ। এগুলো পৃথার।

শহরে শহরে রবিবারের সকালের একটি পৃথক শব্দ লহরী থাকে। টিভি সিরিয়ালের শব্দ, প্রেশার কুকারের ফস শব্দ, মিক্সির ভোঁ শব্দ... পাশের ফ্ল্যাটে মিক্সির একটানা ভোঁ শব্দ শুনতে লাগল প্রদীপ।

প্রদীপ বলল, বাগচিদের দোসা-টোসা হচ্ছে।

পৃথা বলল, ইচ্ছে করছে? ভেজাব!

প্রদীপ বলল, মিক্সি?

কেন?

পৃথা বলল, কেন? হাত নেই?

মাঝে মাঝে হাতের কথা ভুলেই যায় প্রদীপ। প্রদীপরা। লিফট বন্ধ হলে পায়ের কথা মনে পড়ে। চোদ্দর সঙ্গে বারো যোগ করার সময় ড্রয়ারের ক্যালকুলেটার হাতড়ায় প্রদীপ, প্রদীপরা। মাঝে মাঝে যেন কীরকম ভুল হয়ে যায়, ভুলে যায় হাত থাকার কথা, পা থাকার কথা, মাথা থাকার কথা।

তবু পাশের বাড়ির একটানা যান্ত্রিক শব্দ প্রদীপকে ক্রমাগত আহত করতে থাকে। আওয়াজটা প্রদীপের বুকের গভীরে ধাক্কা মারতে থাকে। প্রদীপ রান্নাঘরে ঢুকে যায়। হাত বাড়িয়ে মিক্সির হলুদ শরীরটা আঁকড়ে ধরে। শরীরটাকে পলিথিন প্যাকেটে জড়িয়ে নেয়, এবং বলে আমি গজেনের কাছে চললাম।

গজেনের দোকানটা ভারী অদ্ভুত। ও সব কিছু সারাই করে। রেডিয়ো, টেপরেকর্ড, হিটার, টোস্টার, মিক্সি সব। সোয়া ন'টার খবর হচ্ছে। বিহারে হরিজন খুন।

দেখুন দেখুন কেমন গাঁক গাঁক করে বাজছে। তিনটি গ্রাম পুড়ে ছাই। গাঁক গাঁক করে বাজছে। গাঁক গাঁক করে বাজছে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। খদ্দের বলল, ভেরি গুড। গজেন ধরে আছে রেডিয়োটা। কাঁটা ঘোরায়। জিসকি বিবি মোটি।

প্রদীপ মিক্সিটাকে ঠক করে টেবিলের উপর রাখে। পলিথিনের চাদর সরিয়ে দেয়।

চৈতালির কথা মনে হয়। কেন যে মনে হয়। চৈতালি খুব হাসে, পৃথা হাসে না। চৈতালি খুব কথা বলে, পৃথা গম্ভীর। পৃথার যা নেই, তা চৈতালির আছে। প্রদীপ বলে, একে ঠিক করে দিন।

গজেন একবার দেখল ওটাকে। কীরকম তাচ্ছিল্য। সে রকম বড় কোম্পানির ছাপ নেই এর শরীরে। বলল, রেখে যান। দেখি কী হয়েছে। এসব মালের কোনও গ্যারান্টি নেই।

মেশিনরাও কি মানুষদের মাল বলে?

পৃথা জিজ্ঞাসা করল, কী খবর?

প্রদীপ বলল, দিন সাতেক পর যেতে বলেছে।

ঠিক হবে?

হতে পারে।

যদি না হয়?

তবে আবার কো-অপারেটিভ থেকে টাকা তুলতে হবে।

টাকা তুলে?

আর একটা নতুন কিনতে হবে।

নতুন কেনার কথা শুনে খুব কিছু খুশি হল না পৃথা। অথচ নতুন মেশিন এলে পৃথা তো খুশিই হয়। এই তো, গত রবিবারই তো যন্ত্র-যত্ন করার সময় সমবেত যন্ত্র সম্ভারের মধ্যে উৎফুল্ল বসে ছিল পৃথা। সোফায় চারিপাশে তা তা থই থই। পৃথা বলেছিল, এরা সব আমার। প্রদীপ বলেছিল,

আমাদের। পৃথা বলেছিল, সরি, সরি, আমাদের। পৃথা তখন বই আলমারির দ্বিতীয় তাকের দিকে তাকিয়ে ছিল। চাইলড কেয়ার। মেনটেনেনস অফ ইলেকট্রিকাল গ্যাজেটস...। পৃথা বলেছিল, এদের না, এ রকম বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি নামে ডাকতে ইচ্ছে করে না। একটা করে ডাকনাম দিলে কেমন হয়!

প্রদীপ বলেছিল, যেমন!

ওয়াশিং মেশিনটার নাম চাংকি।

প্রেশার কুকুরটা?

ফচকে।

ওভেন?

অগ্নিভ।

বড্ড ভারী।

তা হলে দাহ।

যাঃ এ নামে ডাকা যায় নাকি?

তা হলে তুমি বলো।

হিটু।

বাঃ। টিভিটা?

ফিলিপস।

তা তো জানি।

একটু ছোট করে ফিলিপ?

বাঃ। ভি সি পি?

অঞ্জন।

কেন?

এমনি।

স্টিরিও?

সোহাগী।

হেয়ার ড্রায়ার?

পার্বতী, না পারুল... পরু, পারু।

আমাদের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নেই।

ইশ নেই!

প্রদীপ তখন বলল, মিক্সি? ওটার নাম?

ওটা তো হ্যানডিক্যাপড। বিকলাঙ্গ।

তবু তো আছে, আমাদেরই আছে।

ওটার নাম তুমিই দিয়ো।

প্রদীপ বলল, চৈ চৈ চৈ...

কবে কোন পাড়াগাঁয়ে ধূসর সন্ধ্যায় প্রদীপ দেখেছিল জলের ধারে দাঁড়িয়ে এক গ্রাম্য কিশোরী জলচরা হাঁসদের ঘরে ডাকছে, আয় আয় আয় চৈ চৈ...।

প্রদীপ ডাকে। মনে মনে ডাকে।

জন্মদিন। বন্ধুবান্ধবরা খাবে। পৃথা চিংড়ির মালাইকারি খুব ভাল রাঁধে। নারকোল চাই। তারপর নারকোল থেকে নারকোল দুধ। এ জন্য মিক্সি চাই।

গজেন বড্ড ঘোরাচ্ছে। কেবলই হয়নি হয়নি। প্রদীপ বলেছিল, অন্তত বলে দিন ওটা রিপিয়ার হবে কি না। গজেন বলেছিল, আমি কি যন্তর? প্রদীপ বলেছিল, বাড়িতে জন্মদিন।

আমায় ডিসিশন নিতে হবে। ঠিক না হলে নতুন কিনতে হবে। এই আমি দাঁড়ালুম। আপনি ওটা খুলুন।

অগত্যা খোলে। গজেন যন্তরের মতোই যন্তরটা খোলে। বলে, কয়েলটা পুড়ে গেসল। কয়েলটা ঠিক করে দিলুম। একবারে দু'মিনিটের বেশি চালাবেন না। চালিয়ে দেখিয়ে দিল গজেন, ঘুরছে।

প্রদীপ বলল, ঘুরছে ঠিকই, কিন্তু...

গজেন বলল, দেখে নিতে চান তো? ঠিক আছে। গজেন ওর স্টিলের টিফিন বাক্স খুলে একটা রুটি ছিঁড়ে দিল মিক্সির জারে। একটা কলা, একটু তরকারি। চালিয়ে দিল। এবং কয়েক সেকেন্ডেই পুরো জিনিসটা মণ্ড হয়ে গেল।

ঠিক আছে?

মাথা নাড়ল প্রদীপ।

আপনার কাছে কিছু আছে? দেবেন?

প্রদীপ বলল, উঁহু।

প্রদীপের হঠাৎ মনে হল ওর কাছে এখন কিছুই নেই। ঘৃণা, ভালবাসা, শোক, অভিমান, কিছুই আর তেমন ভাবে গোটা গোটা নেই। মণ্ড হয়ে গেছে।

মেশিনটা নিয়ে বাড়ি ফিরল প্রদীপ।

পৃথা! পৃথা! ঠিক হয়ে গেছে।

পৃথা বলল, যাক।

তারপর ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস।

ফ্রিজ থেকে বার করা হল চিংড়ি।

কোরানো হল নারকোল।

নারকোল ঢোকানো হল মিক্সিতে। ঘুরতে লাগল চাকা। চলতে লাগল শব্দ।

প্রদীপ বলল, চলছে চলছে।

কয়েক মুহূর্ত পরই একটা নীল স্ফুলিঙ্গ।

সাদা ধোঁয়া। থেমে গেল।

পৃথা বলল, থেমে গেছে।

প্রদীপ বলল, গজেনটা একটা মাল। ও একটা যন্তর। পুরো টুপি দিল। এখন কী হবে?

পৃথা হাসছে। নারকোল দুধ কীভাবে হবে!

কেন হাত?

দুটো হাত ছড়িয়ে দিল পৃথা। আলিঙ্গন?

প্রদীপ যন্ত্র নয়, মানুষের মতো এগিয়ে গেল পৃথার দিকে।

শারদ বসুমতী, ১৯৯৫

মানুষ ও বেগুন

কামিনীফুলের গন্ধ মাখানো বাতাসে প্রফুল্লবাবু বেগুনি ভাজার গন্ধও পেলেন। অল্প বৃষ্টির পর ঝিলিকমারা রোদ্দুর। স্টিলের ব্রাইটনেস বিষয়ক একটা সেমিনার সেরে দুর্গাপুর থেকে কলকাতা ফেরার পথে বুদবুদ নামের এই গঞ্জে একটু টি-ব্রেক। প্রফুল্লবাবু তো আসলে ড. রায়চৌধুরি। প্রফেসর, মেটালার্জি। বেগুনি-গন্ধে স্যালাইভেশন হতে থাকলেও উনি ড. রায়চৌধুরিই।

বিস্কুট নেব স্যার? ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল।

না থাক। চায়ে চিনি দিতে না করো।

পেঁয়াজ কুঁচি ছড়ানো হলুদ হলুদ মটর সেদ্ধর স্তূপে চূড়া হয়ে আছে লাল টুকটুকে চকচকে পাকা লঙ্কা। গাড়ির বনেটে একটা ছোট্ট পাখি এসে বসল। ফিঙে? ফিঙে কি এত ছোট? তবে কি বাবুই? টুনটুনি? ওদিকে বেগুনিগুলো ফুলে ফুলে উঠে তেলের মধ্যে ছুটোছুটি লাগিয়েছে যেন বাচ্চাদের ইস্কুলের টিফিনবেলা। আঃ কী গন্ধ। ঝাঁঝরি হাতায় করে ঝুড়ির মধ্যে বেগুনিগুলো রাখল।

নগেন, দুটো নাও তো।

কী স্যার?

চোখ ছোট ছোট করে অল্প আওয়াজে প্রফুল্লবাবু বললেন, বেগুনি।

সে কী স্যার? বেগুনি খাবেন?

ইচ্ছে করছে। তুমি খাবে নগেন?

না স্যার, অ্যাসিড হয়।

প্রফুল্লবাবু বেগুনিটা দাঁতে মৃদু কামড়ে ভিতরের ওই নরমে ফুঁ দিলে অতীত থেকে সেই অদ্ভুত গন্ধটা ভেসে আসে। ভীষণ আনন্দ হয়। জুল জুল করে বেগুনিটাকে দেখেন। আর তখনই লক্ষ করেন কী চকচকে শরীর।

এত চকচকে কেন হয় কেন? বেসন তো প্রোটিন-কারবোহাইড্রেট, আর তেল তো ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার। তবু কেন এত উজ্জ্বল? ঠান্ডা হলে এই উজ্জ্বলতা, এই লাশচার আর থাকে না। মৃত মানুষেরও না। বেগুনির কি প্রাণ আছে? প্রাণের বুঝি লাশচার থাকে? বার্নিশ থাকে? কীসের বার্নিশ ওই মটর স্তূপে উঁচিয়ে ওঠা লঙ্কাটার গায়ে? একটু আগে গাড়ির বনেটে বসা পাখিটার পালক থেকে আলো ঝলকেছিল কীসের কারণে? সেটা কোন সারফেস কভারিং? পলিমার? পলিমার অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস? ক্যারোটিনায়ডস নাকি স্রেফ ওয়াকস?

ছোটখাটো বাজার বসেছে। ছাপছাপ জামা, মুখে ছুলির দাগ, লালচে চুল, একটা ছেলে একটা লাল শার্ট কিনল, শার্টের গায়ে লেখা ব্লু ব্লাড।

এই বুঝি সেই কামিনীগাছটা? যার ফুল-সুবাসে বাতাস এমন ভারী। অ্যারোমা? কামিনীডালে ঝুলিয়ে রেখেছে ব্রা। উড়ছে। মাটির হাঁড়ি, কলসি। কতদিন মাটির কলসির জল খাননি পি সি আর সি।

পোড়ামাটির ওই মৃদু গন্ধটা জলের গভীরে গিয়ে মেশে। পোড়ামাটিতে অকসাইড। ফেরাস আর ফেরিক। সেই গন্ধ। কালো কুচকুচে মেয়েটা বিক্রি করছে বেগুন। মেয়েটার গা-টা শাইনিং, যেন বার্নিশ মেখেছে। মিসেস তো কত কী মাখেন। মেয়ে কুন্তলা। কত শিশি, কত কৌটো, কত টিউব। ড. রায়চৌধুরী মেয়েটার সামনে যান। সাঁওতাল? ঝলমল মেয়েটার বডি। মেয়েটা বিক্রি করছে

বেগুন। ড্রাইভার হর্ন দেয়। একটা বেগুন হাতে তুলে নেন উনি। মুঠোর মধ্যে রেখে মৃদু চাপ দেন। কী নরম। কী তাজা। কী মসৃণ। চক চক করছে।

কত করে মেয়ে?

এক টাকা।

কিলো?

হুঁ।

পাঁচ কিলো দাও।

মেয়েটা একটু অবাক হল। বলে, কীসে লিব্যান? একটা ফোলিও ব্যাগ ছিল প্রফুল্লবাবুর হাতে, গায়ে লেখা—সেমিনার অন ক্রোমিয়াম ম্যানেজমেন্ট ইন স্টিল ফর লাশচার অ্যান্ড ব্রাইটনেস। ওতে পাঁচ কিলো ধরবে না। দুই হাতে, কোটের পকেটে, সারা শরীরে বেগুন নিয়ে, বেগুনের অনুভব নিয়ে ড. রায়চৌধুরি গাড়ির দিকে চললেন, ড্রাইভার গাড়ি এগিয়ে এনে দরজা খুলে দেয়।

সারা সিট জুড়ে ছড়ানো বেগুনের মাঝখানে বসে আছেন ড. রায়চৌধুরি। হাতে একটা বেগুন। বেগুনের গায়ে হাত বুলোচ্ছেন উনি। হাতের মমতা বেগুনের গায়ে লাগে, আর বেগুনের মমতা প্রফুল্লবাবুর হাতে লাগে। কত করে নিল স্যার? ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে।

এক টাকা কেজি।

খুব চিপ স্যার।

তাজা, খুব তাজা। বোঁটার কাছটাতে এখনও কী উদ্ধত কাঁটা। কাঁটাটায় আঙুল দিলেন। কাঁটা ফোঁড়ার কষ্টের আহ্লাদ নিলেন শরীরে। এবার বেগুনটা দু'হাতে ধরে মুখের সামনে ধরলেন। গন্ধ নিলেন। কত কী মাখে পূর্ণিমা। ক'বছর হল পূর্ণিমার সঙ্গে? ক' বছর হল বেগুনের? বেগুন তো মানুষেরও আগে। বেগুন আগে, নাকি মানুষ? হোমোসেপিয়েন্স, নাকি...

টমেটো খেত থেকে টমেটো তুলবার সময় গাছেদের গা থেকে একটা গন্ধ উঠে আসে, যা নাকি টমেটোর গায়ে নেই। সেই বুনো গন্ধটা মনে পড়ে গেল একবার। মনে পড়ছে শীতের ভোরের খেজুরতলা। খেজুর রসের গন্ধ, গাছের সাদা ফেনা, রস খেতে আসা পাখি। মনে পড়ছে ধান গাছের দেহ থেকে বার করে নেওয়া সাদা রঙের পাইপ যা দিয়ে সুড়সুড় করে টেনে নেয়া যেত খেজুর রস। বেগুন খেত? মনে নেই, সেই আঁচড়চিহ্ন মনে নেই? মামিমা বলছিলেন, ছুটিসনি পলু, বেগুন কাঁটা বিঁধবে। দশ-বারো বছরের পলু ফড়িং-এর পিছনে ছুটছিল। বেগুনগুলো কেমন পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। চুপিচুপি থাকে। যেন টু-উ-কি।

খুব ভোরবেলা মামাবাড়ির উঠোনে কী সুবাস। শিশিরের তো নিজের গন্ধ নেই, কুয়াশারও নেই। লাল রোদ্দুরের? প্রভাতি বাতাসের? ভোরবেলাকার একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে, তাই না? মনে আছে, তোর মনে পড়ছে পলু, একদিন খুব ভোরবেলা উঠোনের বেগুন ঝোপ থেকে বেগুন তুলতে গিয়ে কী দেখেছিলি?—ঘন বেগুনি রং মসৃণতার গায়ে টলটল করছে দু' ফোঁটা উজ্জ্বল শিশির, মনে আছে?

আয়নায় ড্রাইভারের মুখের ছায়া। তার মানে ড্রাইভারও দেখতে পাচ্ছে তাকে এই অবস্থায়, একটা বেগুনকে গালে ঘষতে। প্রফুল্লবাবু সরে যান। বেগুনটা নামিয়ে রাখেন পাশে। রোটারি ক্লাবের মেম্বার, রিসার্চ গাইড, 'হু ইজ হু'-তে যাঁর নাম আছে, ঘন ঘন বিদেশ যান, সে কিনা বেগুন নিয়ে...নিউজপেপারটা খোলেন ড. রায়চৌধুরি। দামোদরের জলে ফার্নেস অয়েল মিশে যাবার খবরটা আবার পড়েন। জল খারাপ হয়ে গেছে। ওই জল এখন ব্যবহার করা যাবে না। দুর্গাপুরে জলকষ্ট।

সারা গায়ে বেগুন ধারণ করে লিফট-এর সামনে দাঁড়ালেন প্রফুল্লবাবু। ড্রাইভারও কিছুটা শেয়ার করেছে। সেভেনথ ফ্লোর। মিসেস রায়চৌধুরি দরজা খুললেন। বেগুন সমারোহে বড়ই আশ্চর্য। একী? এত বেগুন? ড. রায়চৌধুরি সোফায় ঢেলে দিলেন বেগুনগুলি। দু-একটা মোজাইক মেঝেয়

পড়ে অল্প বা বাষ্প করল। মিসেস রায়চৌধুরি উচ্ছ্বাসে বললেন, কী তাজা! একটু পরেই মিসেস রায়চৌধুরির ব্যস্ততা শুরু হল। মি. ত্রিবেদী ভেজিটেরিয়ান, খুব খুশি হবেন। জয়শ্রী, সুভদ্রা, শান্তা, সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হল। সবাই খুব খুশি। গ্রাম থেকে আসা ফ্রেশ বেগুন।

বেগুন কোনও নতুন ব্যাপার নয়। বাজার থেকে প্রায়ই তো আসে। হয়তো এরকমই তাজা আসে মাঝে মাঝে। তবু কী রকম ডাইমেনশন পেয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা।

মি. ত্রিবেদী টবে কাঁচা লঙ্কা ফলান। মাঝে মাঝে দুটো-চারটে দিয়ে যান। ওই ক'টা কাঁচা লঙ্কা আলাদা রাখা হয়, গরম ভাতের সঙ্গে ঘি মেখে খাওয়া হয়। খেতে খেতে হ্যাঁ তো, প্রফুল্লবাবু নিজেও বলেছেন,—অঃ কী সেন্ট, কেমিকাল ফার্টিলাইজার ছাড়া চাষ হয়েছে না? আর, এখন, পূর্ণিমা, মানে মিসেস রায়চৌধুরি উচ্ছ্বাসে বললেন, আজ বেগুন পোড়া খাব।

কুন্তলা এল। আজ একটু রাত্তির হল। নিজেই কৈফিয়ত দিল—নাটক দেখতে গিয়েছিলাম বাপি। কুন্তলা যাদবপুরে এম এ পড়ে।

পূর্ণিমা তখন খুবই ব্যস্ত। বেগুনে তেল মাখানো হয়েছে। গ্যাসে বেগুনপোড়া করা খুব ঝামেলার। কুন্তলা হেলপ করছে মাকে। কাজের মেয়েটা টিভি তে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম শুরু হতেই চলে যায় বাড়িতে। গ্যাসের আঁচ কমিয়ে রুটি সেঁকার জালের উপর বেগুনটাকে শুইয়ে দিয়ে...

মানুষের চেয়ে বেগুনের বয়স বেশি। কিন্তু বেগুন বেগুনেই থেমে আছে বলে মানুষ বেগুনকে পোড়াচ্ছে। যদি মানুষ এখানেই থেমে যায়, বেগুন এগোয়, একদিন বেগুন মানুষ পোড়াবে।...

বেগুনপোড়ায় সরষের তেল মেখে খাওয়া হল।

মাঝে মাঝে এরকম আনলেই তো পারো...কুন্তলা বলল।

আনব তো, বৈঁচিফল আনব। কোথাও দেখলেই আনব। চেনো? বৈঁচিফল?

কীরকম আবার ওটা?

চেনো না। গাব চেনো, গাব?

গাব? কী আজব নাম।

ঢেউয়া?

এবার হেসে ফেলল কুন্তলা। কী সব যা-তা বলছ না বাপি আজ...

সেই সোনালি রঙের ফল, টক-মিষ্টি, ছোট ছোট কোয়া, নরম...জানো না, তোমরা জানো না। ল্যানোলিন জানো, ও ডি কোলন জানো, জানো দাঁতের ফ্লোরাইড।

এসময় ফোন বাজে। ত্রিবেদী স্পিকিং...। বাইগন বহুত আচ্ছা। খুব ভাল। খুব মিঠা, সফট ভি। ফ্রেশ চিজ আছে না, নো ফার্টিলাইজার। মিসেসকে থ্যাংক্স জানিয়ে দিবেন।

নো ফার্টিলাইজার, অতএব টেস্টি। কী করে বুঝলেন ওরা, এই বেগুনে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করা হয়নি? ওঁরা দু'জনেই ফার্টিলাইজার করপোরেশন অফ ইন্ডিয়াতে কাজ করেন বলেই বেগুন খেয়েই এ সত্যে পৌঁছনো যায় না। আসলে এটা উইশফুল থিঙ্কিং। ক'দিনই বা এমন হল সিনথেসিস করে ইউরিয়া বানাবার কায়দা মানুষ শিখেছে, আর এখনই ফার্টিলাইজার শুনলেই বমি পাচ্ছে মানুষের, ইনসেকটিসাইট শুনলেই অ্যালার্জিতে গা চুলকোচ্ছে। প্রোটন-নিউট্রন-ইলেকট্রন শুনলেই যেন হিরোসিমার হলকা হাওয়া এসে গায়ে লাগে।

টিভিতে সে সময় চিন্তাক্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের মুখ। তাঁরা ভাবছেন। দামোদরের জলে মিশে যাওয়া ফার্নেস অয়েল এগিয়ে আসছে। পূর্ণিমা বলল, ফার্নেস অয়েল মেশা জল খেলে কি মানুষ মরে যায়? প্রফুল্লবাবু বললেন, না, ঠিক মরে না...কুন্তলা বলল, দামোদর কি আলটিমেটলি গঙ্গায় মিশেছে বাপি?

একটু বিব্রত হলেন প্রফুল্লবাবু। পশ্চিমবাংলার নদী-মানচিত্রটা ঠিক মনে গাঁথা নেই। বইয়ের তাক থেকে খুঁজে একটা বই খুললেন এবং বললেন, কলকাতা থেকে অনেকটা সাউথে পড়েছে, সেটা মরা দামোদর। কলকাতার ভয় নেই।

পূর্ণিমা আর কুন্তলা একসঙ্গে বলল, যাক।

প্রফুল্লবাবুর আজ কেন যে এরকম লাগছে নিজেই ঠিক বুঝতে পারছেন না। সোলানেসি ফ্যামিলির একটা নিরীহ প্রজাতি বেগুন মনটাকে এরকম করে দিল? রিলাকসনের নরম বিছানায় হালকা নীল আলোর ঘরে শুয়ে কেন যে ড. রায়চৌধুরির মনে হল গুহাকন্দরে শুয়ে আছে একটা অস্ট্রালোপিথোকাস। চাঁদ উঠেছে আকাশে। সরোবরে জড়ো হয়েছে তৃষিত চিত্রল হরিণ। অস্ট্রালোপিথোকাসটাও জল খেতে ওঠে। ফ্রিজ খোলে, জল খায়। ফ্রিজের ভিতরের স্বল্পালোকে বেগুন-শরীর দেখে। সেই ঔজ্জ্বল্য যেন নেই আর বেগুনগুলোর গায়ে। ফ্রিজের শৈত্যে? একটা বেগুন-দেহ বার করে আনেন ফ্রিজ থেকে। আলো জ্বালান। এবং দেখেন বেগুনের সারা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সূক্ষ্ম জলবিন্দু। বুকের মধ্যে অকস্মাৎ আনন্দভৈরবী। শিশির! শিশির! বেগুন-শরীরের মসৃণ চামড়ায় ফুটে উঠেছে বাল্যস্মৃতি।

কী গো, হলটা কী?...পূর্ণিমার ঘুম ভেঙেছে টিউব আলোয়।

প্রফুল্লবাবু শুয়ে পড়েন। মানুষের জন্ম কত বছর হল? ক' লক্ষ বছর? কলমিলতা-শুশনিপাতার সঙ্গে, ছাগলছানার সঙ্গে, রাজহাঁস-টিয়া-বুলবুলির সঙ্গে, বৈঁচিফল, নারকোল পাতার ঝিরঝির এবং শিশিরসিক্ত ফল নিয়ে, ফুল নিয়ে এই প্রজাতি গত দু' লক্ষ বছর কাটিয়েছে। গত দুশো বছরের কী এমন শক্তি আছে যে গত দু' লক্ষ বছর থেকে টেনে হিঁচড়ে আলাদা করে দেবে?

পরদিন সকালে উঠেই ফ্রিজ খুলে একটা বেগুন বার করে ব্যালকনিতে নিয়ে গেলেন প্রফুল্লবাবু। ফ্রিজের শিশির কিছুতেই ওই আসল শিশিরের মতো নয়। প্রফুল্লবাবু দেখেন বেগুনটার সারা গায়ে বিন্দু জল। আকাশ বাতাসের শিশির হল গলানো মুক্তোর মতো, দু' ফোঁটা একফোঁটা টলটল। মেশিন-শিশির কিছুতেই ওরকম নয়।

কলকাতায় কি শিশির পড়ে? কতদিন সেরকম প্রভাত দেখেননি প্রফুল্লবাবু। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর অভ্যেস। সাতটার আগে উঠতে পারেন না। এই ফ্ল্যাটের পুব দিক বন্ধ। সদ্য সকালের আলোর ঝালর ঘরে আসে না। শীতকালে সকালে উঠে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কুয়াশা জড়ানো কলকাতা দেখতে দেখতে শিশির ভেজা কালো রাস্তার গায়ে টায়ারের জ্যামিতিক জলছবি।

প্রফুল্লবাবু ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে একটা গুলিসুতো কিনলেন।

এবং রাত্রিবেলা একটা বেগুন বার করে নিলেন ফ্রিজ থেকে। তোয়ালে দিয়ে হালকা করে মুছে নিলেন, সুতো দিয়ে বাঁধলেন বেগুনের বোঁটা এবং ব্যালকনিতে ঝুলিয়ে দিয়ে গ্রিলে বেঁধে নিলেন সুতোর অন্যপ্রান্ত।

পূর্ণিমা ঘুমোচ্ছে। গা থেকে হালকা জুঁই গন্ধ। পাউডারের। ওটা সিনথেটিক। ওটা বেনজইল অ্যাসিটেট। ভোরে উঠতে হবে। শুয়ে পড়েন। আজকাল ঘুম আসতেই চায় না। ভেড়া গোনেন, ঘুমের বড়িও খান। আজ ঘুমোতেই হবে, ভোরে উঠে সবাইকে দেখাবেন। দ্যাখ কুন্তলা দ্যাখ, শিশিরের আহ্লাদ দ্যাখ।

প্রফুল্লবাবু যেন স্বপ্ন দেখেন ওঁর পিঠ বড়শিফোঁড়া, চড়কের ভক্তাদের মতন। শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে সেই বড়শি আটকানো। আর একটা জ্যান্ত বেগুন ধরে রেখেছে সেই দড়ির অন্যপ্রান্ত। প্রফুল্লবাবুকে নামানো হচ্ছে। নীচের সাদা ধোঁয়া মেঘে ডুবে গেলে প্রচণ্ড কাশি। কে যেন মেশিন-গলায় বলল, মিক গ্যাস। ভূপালের। ভাল লাগছে তো বেশ? তারপর ঝলকানো আলোককুঞ্জ। মেশিন-গলা বলল, যাও, শিব হও। সারা গায়ে মেখে নাও চেরেনোবিলের ছাই।

প্রফুল্লবাবু ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েন। সাতটা। ব্যালকনিতে যান। সুতোটা টেনে বেগুন ওঠান। শুকনো। সাতটায় কি আর শিশির থাকে?

সেইদিনই ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার সময় অ্যালার্ম ঘড়ি কিনে ফেললেন একটা। কাণ্ডকারখানা কি একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে? একটা বেগুনের জন্য নাকি এক ড্রপ শিশিরের জন্য একটা অ্যালার্ম ঘড়ি কেনা?

কোনটা বেশি বেশি আর কোনটা কম কম তার কোনও ফর্মুলা আছে? দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া 'কেন চেয়ে আছো গো মা' শুনবার জন্য একদিন এমন ইচ্ছে হয়েছিল, ছ'লিটার তেল এবং একটা রবিবার খরচা করে বারাসাত ছুটেছিল সোমেশের বাড়ি, সেটা কি বেশি বেশি? মায়ে-মেয়েতে মিলে শুধু একটা কেকের জন্য সারা দুপুর ধরে ডিমের সঙ্গে ময়দা ফেটানোটা বুঝি বেশি বেশি নয়? তা ছাড়া একটা অ্যালার্ম ঘড়ি তো দরকারই হয়। আগের ঘড়িটা সেই কবে নষ্ট হয়ে গেছে। ভোরে ওঠা তো ভালই। হালকা ফ্রি হ্যান্ড...

কলিং বেল বাজাতেই দরজা খুলে দিল কুন্তলা। কুন্তলার মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি, আর পূর্ণিমার মুখ গম্ভীর। কুন্তলা খুব মজা করে বলল, তুমি বেগুন ঝুলিয়েছিলে বাপি?

হ্যাঁ।

জানো বাপি, মা যখন বলছিল, আমি বললাম, ভ্যাট। ও মা, তারপর দেখি তোমার টেবিলে খোলা সুতো, আর একটা সুতোর গুলি, গ্রিলে গিঁট।

প্রফুল্লবাবু হাসলেন, কুন্তলার কাঁধে হালকা চাপড় মারলেন। বললেন, আবার কাল, অ্যাঁ?

পূর্ণিমা বলল, থামো। তুমি জানো ত্রিবেদী তোমার ওই বেগুন ঝোলানো নিয়ে কী যা-তা কমেন্ট করেছে? আচ্ছা, বলো তো তুমি বুড়ো বয়সে এরকম বাচ্চাদের মতো খেলা করতে গেলে?

খেলা? না-না রিসার্চ। না রিসার্চ নয়, খেলাই।

প্লিজ ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নাও। পূর্ণিমার গলায় ঝাঁঝ। আচ্ছা, একটু বলবে, বেগুন ঝোলানোর পারপাসটা কী ছিল?

শিশিরটা পড়ত কিনা বেগুনটার গায়ে।

বেশি বেশি! কী হত তাতে?

কত কী হত। মানুষ তো তার পুরনো ভিটেতে ফিরে যেতে চায়। তুমি যাও না তোমার বাপের বাড়ি? তোমার বাবা নেই, মা নেই তবু। এই যে তুমি জংলা শাড়িটা পরেছ, সারা গায়ে লতাপাতার ছাপ, পিলোকভারে এমব্রয়ডারি ফুল, তুমি কিন্তু বনবালিকাই হতে চাইছ, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছ। জানালায় মানিপ্ল্যান্টের লতা, ঘরের কোনায় খয়রিপাতার রাবার গাছ, দেয়ালে প্লাস্টিকের প্রজাপতি, আর যখন চামর দোলাও ঠাকুরঘরে, তখন তো ঘোড়ার লেজের কথাই ভাবো...

থাক। খুব হয়েছে।

রাত্রে ক্রিম ঘষতে ঘষতে পূর্ণিমা বলছিল—এমন ছেলেমানুষি করো না মাঝে মাঝে আমাদের খুব বাজে অবস্থায় পড়তে হয়, প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি হয়। জানোই তো মিসেস ত্রিবেদী কী রকম ন্যারো মাইন্ডেড, তুমি এমন করে বেগুনটা ঝুলিয়েছিলে, ঠিক ত্রিবেদীদের ব্যালকনির সামনে ঝুলছিল।

তাতে কী হয়েছে?

কী আবার হবে, যা-তা কমেন্ট করতে তো কারুর আটকাচ্ছে না, এই তো সব এডুকেটেড মহিলা।

প্রফুল্লবাবু এখন ওই বাক্যবিন্যাসে বুঝে নিতে পারেন ওটা ভূমিকা। পূর্ণিমা এখন অনেক কিছু বলে যাবে। এখন ওঘরে কুন্তলা পড়ছে। কুন্তলা এখনও শব্দ করে পড়ে। পূর্ণিমা মাথা আঁচড়ে নিল। রোজই এই সময়ে বলে কীরকম চুল উঠে যাচ্ছে। আজ বলল না ওসব। প্রফুল্লবাবু টেবিলে ছিলেন, টেবিল ল্যাম্পও জ্বলছিল। ফটাস করে টিউবল্যাম্প নিভিয়ে দিয়ে পূর্ণিমা মশারিতে ঢুকে যায়, দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শোয় এবং বলে—অদ্ভুত ব্যাপার! কী? না বেগুন ঝুলছে। বেগুন। ড. রায়চৌধুরির ফ্ল্যাটে সুতো বাঁধা, আর ত্রিবেদীর ফ্ল্যাটের সামনে ঝুলছে একটা বেগুন।

জয়শ্রীই প্রথম দেখেছিল মর্নিং ওয়াকে গিয়ে। ফেরার সময় মিসেস ত্রিবেদীকে বলে, কী ব্যাপার? তখনই ওরা নাকি দেখে বেগুনটা ওপরে উঠে যাচ্ছে। মানে, তখন তুমি জাস্ট তুলে

নিচ্ছ। মিসেস ত্রিবেদী তারপর কী বলেছে শুনবে? ওর নাকি সব মিস্ট্রি লাগছে—কী সব ব্যাপার-স্যাপার চলছে। কাঁচা বেগুন পাঠানো হল, তারপর আবার বেগুন ঝোলানো হল, নিশ্চয়ই কোনও তুকতাক চলছে। দেয়ার মাস্ট বি সামথিং। বেগুনে কোনও মন্ত্র দেওয়া আছে। আরও শুনবে? মিসেস ত্রিবেদী বলেছে আমার নাকি মি. ত্রিবেদীর উপর উইকনেস আছে। আমি তাই এই সব তুকতাক চালাচ্ছি। আর জানো, সারা বাড়িতে এটা চাউর হয়ে গেছে...

পূর্ণিমা এইবার দেয়ালের দিক থেকে সরে আসে। বলে, তোমার এই সব উদ্ভট খেয়ালের জন্য এই সবও শুনতে হচ্ছে আমাকে...

প্রফুল্লবাবু কোনও কথা বলেন না। টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় চলে যান। পূর্ণিমাকে কাছে টেনে নেন। ওর মাথার চুলে বিলি কেটে দেন। গালে হাত বুলোতে গেলে আঙুলের ডগা পায় জলের স্পর্শ। জলে কি বিদ্যুৎ খেলে? তখুনি আঙুল সরিয়ে নেন গাল থেকে।

প্রফুল্লবাবু তখন পালাতে থাকেন। লেকচাররুম থেকে, পি সি আর সি থেকে ড. রায়চৌধুরি থেকে, সেমিনার, সিম্পোসিয়াম, আটশো দশ স্কোয়ারফুটের ফ্ল্যাট থেকে পালাতে পালাতে বিশাল বিশাল জেব্রা ক্রশিং পেরিয়ে অনেক দূর চলে যান। কচুরিপানা মাড়ানোর ফটাস ফটাস শব্দ টের পান। ফড়িং ডানার ভোঁ-ভোঁ, শুকনো ডুমুর পাতা, সাদা থান পরা দিদিমার কোল, ঘুম যায়রে ঘুম যায়রে ঘুমের লতাপাতা, দুই দুয়ারে ঘুম যায়রে দুটি ডুমুর পাতা। হেঁশেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমরী...সেই কোন কবেকার...এখন ভ্রমরডানার ভোঁ-ভোঁ ছাড়া শরীরে আর কিছু নেই। এখন ঘুম চাই, ঘুম। ঘুমের লতাপাতা, আমাকে জড়িয়ে নে, জড়িয়ে নে প্লিজ। তেষ্টা পায়। জল। ফ্রিজ খুললে আবার সেই বেগুন। ঘরে গিয়ে নীল মশারির ভিতরে পূর্ণিমার দুঃখ-ঘুম দেখে নিয়ে ফের চলে যান অপ্রতিরোধ্য বেগুনের কাছে। ফ্রিজ খুললে যেন মর্গ। কয়েকটা বেগুন স্তব্ধ শুয়ে আছে। একটা বেগুনের বোঁটা ধরে ঝুলিয়ে ফ্রিজ থেকে বার করে আনেন, মেঝেতে শুইয়ে দেন। বাইরের একটা হ্যালোজেন বাতির হলদে আভা কাচের শার্সির ভিতর দিয়ে ওই নিস্তব্ধতার ভিতরে আসে। এখন সবই ঘুমোচ্ছে। আলো না জ্বালিয়ে ভীষণ সন্তর্পণে টেবিলে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে সুতোর কুণ্ডলীটা মুঠোয় নেন। না, ওই ব্যালকনি আর নয়, ডাইনিং স্পেসের জানালাটার কাছে যান, খোলেন। রাত সাড়ে বারোটার কলকাতা শহর তখনও জেগে আছে। সেভেনথ ফ্লোর থেকে নীচের সব খেলনা। দু'জন খেলনা মানুষ খেলনা মারুতি থেকে নামল। পপ গান ভেসে আসছে কোনও ফ্ল্যাট থেকে। প্রফুল্লবাবু বেগুনটার গায়ের মেশিন-শিশির তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে নিলেন। তারপর সুতোয় বেঁধে লম্বা করে ঝুলিয়ে দিলেন, যেন ত্রিবেদীদের ফিফথ ফ্লোরের ফ্ল্যাট ছাড়িয়ে আরও নীচে নেমে যায়। এরপর ঘরে গিয়ে অ্যালার্ম ঘড়িটা বের করে আনেন প্রফুল্লবাবু। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে ঘড়িতে চাবি দেন, যেন ওই চাবির শব্দ চরাচরে কেউ না শুনতে পায়। অ্যালার্মের সময় দেন সাড়ে চারটে, তারপর কাঁটাটা আর একটু ঘুরিয়ে পৌনে পাঁচটা করেন এবং ঘড়িটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়েন। সারা রাত কট কট করতে করতে ঘড়িটা একসময় চিৎকার করে ওঠে, তক্ষুনি ঘড়িটাকে থামিয়ে দিয়ে প্রফুল্লবাবু বিছানা ছাড়েন। সোজা জানালাটার কাছে চলে যান। সুতোটা ধরে টানেন, সুতোটা হালকা। শুধু সুতোটাই, আর কিছু নয়। জানালার গ্রিলে মাথা চেপে প্রফুল্লবাবু দেখেন ভোরের বাতাসে ছিন্ন সুতোর অবোধ ওড়াউড়ি। প্রফুল্লবাবু তখন ওই পা-জামা এবং গেঞ্জিপরা অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন এবং ছুটে যান রাস্তায়।

সূর্য ওঠার আগে আগে চরাচরে এক ধরনের নরম নীল আভা ব্যাপ্ত থাকে। ওরকম আলোয় বেগুনটাকে দেখতে পান প্রফুল্লবাবু। রাস্তায়।

বেগুনটার অর্ধেক পিষ্ট হয়ে গিয়ে ওর সাদা মাংস মিশে আছে রাস্তার কালোয়, আর তার উপরে ফুটে উঠেছে টায়ার-জ্যামিতি। আহত, রক্তাক্ত যে-বাকিটা ছিল, বোঁটাটা তখনও আটকে

আছে সেই বাকি শরীরে, আর, প্রফুল্লবাবু দেখেন সেইখানে, সেই বেগুনি মসৃণতার উপরে টলটল করছে, টলটল করছে একফোঁটা শিশির।

প্রফুল্লবাবুর হাতটা তখন ক্রেন। ধীরে, সন্তর্পণে তুলে নেয় বেগুন শরীর। ঢাক বাজে, উলুধ্বনি। হিরোহুন্ডা ছুটে গেল এইমাত্র পিছনে। মাথা উঁচু করে সামনে তাকালে মায়াবী পাহাড়। গুহা, গুহাকন্দর। ওখানে কে দাঁড়িয়ে? আদিমানবী? সি সিকসটিন, সেভেনথ ফ্লোর, তবে কি পূর্ণিমা? পূর্ণিমা—দ্যাখো দ্যাখো...

প্রফুল্লবাবু দেখেন পূর্ণিমার হাতও তখন ক্রেন। চোখের দিকে যায়। ও চোখ মোছে...

শিশির! শিশির!

শারদীয় আনন্দবাজার, ১৯৯০

অনন্তবালা

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে।

কদমতলায় আমি। একা একা বিড়ি খাচ্ছি বসে।

কদমের কুঁড়ি এসে গেছে। কিছুদিন পরে বের হবে রোঁয়া। ঘ্যাং ঘ্যাং ব্যাং ডাকে। পাতাপচা-পাটপচা গ্যাস বাতাসেতে ভর করে আসে। দুই-চার মশা ও মশার বাচ্চার ভনর ভনর অবিরাম। আকাশের চাঁদ যেন জিপে বসা অঞ্চলপ্রধান, 'উলস ফ্ল্যাগ' ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছেন। মেঘ হয়ে উড়ে যাচ্ছে ধোঁয়া। এ সময় কাছে এল ঘোড়া, হ্যাঁ-গো, ঘোড়া। ঘোড়া, হর্স। স্তন্যপায়ী চতুষ্পদী জীব। সাদা সাদা রং। তাগড়াই ল্যাজ। কী আশ্চর্য, ঘোড়া কোথা থেকে এল? এ গ্রামে তো ঘোড়া নেই, গাধাও নেই একটাও। খচ্চর কিছু আছে, মনুষ্য আকৃতি। ঘোড়া এল কোথা থেকে? তবে কি ঈশ্বর এলেন? ঘোড়া কোন দেবতার বাহন! মনে পড়ছে না তো। চোখটা কচলিয়ে দেখি। সাদা সাদা রং। সত্যি সাদা, নাকি চাঁদের কিরণে শালা এমন হয়েছে।

ঘোড়াটির ভয় নেই কোনও। হেবি স্মার্ট। মেজ ভায়রাভাইটি যেমন। সি আর পি-তে কাজ করে। বুট জুতো সদা খটখট। ঘোড়াটিও খটখট করে। ঘোড়ার পায়েতে থাকে ঈশ্বরের বুট। ঘোড়া বলে, হ্যালো, ভাল? আমি চিল্লিয়ে বলি, ওলো ভ্যাবলার মা, দেকে যাও, দেকে যাও কী কাণ্ড হচ্ছে এখানে। ভ্যাবলার মা নিশ্চয়ই মুখখানা ভ্যাক করে ঘুমোচ্ছে এখন। ভ্যাবলা ও ক্যাবলার মাথায় দু'হাত। স্বপ্ন দেখছে বম্বে খাট, ঢং ঘড়ি, পুরী গিয়ে তেরাত্তির থাকা মন্দিরের পাশে কোনও ধর্মশালায়। এইসব অঘটন স্বপ্ন দেখছে শুধু। অথচ উঠান জুড়ে অঘটন ঘটে যাচ্ছে স্বপ্নেও ভাবছ না তুমি ভ্যাবলার মা।

ঘোড়া এবার ল্যাজটা ওঠাল অল্প। সোজা বলল, ডিম পাড়ব। পোয়াতির লজ্জা-হাসি নেই, মুখ নিচু নেই। সোজা বলল, ডিম পাড়ব, ভাল দেখে জায়গা বেছে দাও। মাথা চুলকিয়ে বলি, পাড়বে যদি পাড়ো, গাছের তলায় পাড়ো, উঠান রয়েছে পাড়ো, পাড়ো বাঁশঝাড়ে। ঘোড়া বলে, নাকি ঘোড়ী হবে এটা। স্ত্রীলিঙ্গে ঘোড়া কী? ভ্যাবলা ঘুমোচ্ছে। ওর আছে একের ভিতরে চার। ব্যাকরণ, পত্রলিখন, ভাবসম্প্রসারণ ও রচনা। ঘোড়ার স্ত্রীলিঙ্গে কী? ঘোড়ী, ঘোড়ানী, না স্ত্রী ঘোড়া! যাই হোক, পরে দেখে নেব। এখন ঘোড়াই বলি।

ঘোড়া বলে, তুমি হচ্ছ গাধা, কিচ্ছু জানো না। একের ভিতরে চার খোলো, খুলে দেখে নাও ঘোড়ার রচনা। 'ঘোড়া দাঁড়াইয়া ঘুমায়।' তার মানে বসতে বড় কষ্ট হয় আমাদের। ভক্ করে পেড়ে দিই যদি, ডিম ফেটে যাবে। নষ্ট হবে জাতীয় সম্পদ। কত রতি, কত কুদরতি পরে প্রস্তুত হয়েছে ডিম। নরম, নরম জায়গা বলো। মন্ত্রীর চেয়ার যেমন। আমি তো নরম খুঁজি এধারে-ওধারে। ঘরের চাটাইয়ে ভ্যাবলার মা। ওর গায়ে পাড়া যায়? ও কি আর ততটা নরম? বরং গোবর গাদা ভাল হবে গোয়ালের কোণে। এই পাশে গাদা করে রাখা আছে পাট। সেই ভাল। পাটের ওপরে পাড়ো। ঘোড়া ঘাড় নাড়ে। মানে রাজি হল। বলে ও কে। অ ও কে। পাটের গাদার পাশে স্থির হয়। পোজ নেয়। পেড়ে দেয় ডিম। সোজা চলে যায়। এদিক ওদিক নাহি চায়। কী রকম মা তুমি হে ঘোড়া? নিজের ডিমের প্রতি সামান্য মমতা নেই?—মমতার কথা তুমি বোলো না মানুষ; ঘোড়েল ঘোড়াটি বলে। জন্ম দিয়ে শকুন্তলাকে, তার মা গিছিল কোথায়? স্তন দিয়েছিল? পালটেছিল কাঁথা? মালিশ করেছিল তেল? শান্তনুর গল্প জানা আছে। গঙ্গা ছুঁড়ি করেছিল কী? ম্যালা বকিও না। অ্যাত

ছ্যানাপোনা কোথা থেকে পায় মাদার টেরেসা? এই বলে মৃদু হ্রেষাধ্বনি করে ঘোড়াটি পালায়। অশ্বক্ষুরধ্বনি ঢেকে দেয় ব্যাং। আবার ঘ্যাং ঘ্যাং ঘ্যাং। ডিমটিকে দেখি বেশ চাঁদের আলোয়। আহা, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে। কী সুন্দর সাদা। বেশ বড়। বড়সড়ো কুমড়ো সমান। ঈশ্বরের কী মহান লীলা। চুপচাপ নিরীক্ষণ করি। নিরীক্ষণ শেষ হলে হাই ওঠে। পুনরায় টের পাই মশার ভনর। বিলের ওপারে ওই চলে গেল এগারোটা বাইশের ট্রেন। এবার শুতে যেতে হয়। কিন্তু কী করে ঘুমাব? আমি মাইরি না-বিয়ানো কানাইয়ের মা। ঘোড়াটা বিশ্বাস করে আমার কাছেই পেড়ে গেল ডিম। কী করে ঘুমাতে যাই! শেয়ালে খেয়ে নেয় যদি? শেয়াল কি ডিম খায়? জানা নেই। বেড়ালেও ফেলে দিতে পারে। পুরো একটা ঘোড়া নষ্ট হয়ে যাবে। তুলে নিয়ে ঘরে রাখি যদি? কী দরকার বাবা, ফাইব পাস আমি। কীসে কী অনর্থ হবে, দুষবে অন্তর্যামী, কিংবা পাবলিক। তার চেয়ে আজ রাতে বসে থাকি। কাল ভোরে, পাঁচমাথা মিলে ঠিক করা যাবে। 'আলাপ আলোচনার মাধ্যমে' ঠিক করা যাবে। এই কথা বড় চালু আজকাল। পঞ্চায়েত লোকজন, জিন্দাবাদ চ্যাংড়াচোটারা সব 'আলাপ আলোচনার মাধ্যমে' বলে। আমিও মনে মনে তাই বলে রাতে বসে থাকি। ব্যাঙেদের শব্দ ক্রমে ক্রমে ঘুমন্ত মনে হয়। রাতের তারাদের সাথে কথা বলি। কোন তারা বম্বে খাট হয়ে বসে আছে, কোন তারা আমুল মাখন, কোন তারা পুরী গিয়ে তে-রাত্তির বাস। তারাদের দেখি। জোনাকির আঁকা বাঁকা আলো। অফুরান ঝিঁঝি ডাক, বি ডি ও অফিসে যেন টিফিন হয়েছে। চাঁদ ডুবে গেলে, ঘোড়ার ডিমটির গায়ে অদ্ভুত আঁধার, আঁধারের পর্দা পড়েছে। ঠাহর হয় না কোন পাতা, কোন ঠ্যাং। ঘোড়ার ডিমটিও ঠাহর হয় না ঠিক। তবু আছে। আঁধারের ভিতরে সে সত্যি সত্যি আছে। অন্ধকার সহে গেলে, টগর ফুলটিকে যেন দেখি উঠানের কোণে। গোয়ালের গাইটিকে দেখি। ঘোড়ার ডিমটিও দেখি, যেন অল্প অল্প শিশির পড়েছে। ডিমটির শরীরে যেন আহ্লাদ আহ্লাদ।

তারপর অনন্তবালা ডেকে ওঠে। তার মানে এইবার ভোর হয়ে যাবে। পাখি সব করে রব হবে। রাতি পোহাইবে। টর্চ লাইট দেখা যায় মাঠে। ফার্স্ট ট্রেনে যাবে বলে বাহ্যে বসেছে কিছু কাজের মানুষ। অনন্তবালা ডেকে ওঠে ফের। অনন্তবালা মানুষ নয়। অনন্তবালা এক লক্ষ্মীমন্ত মুরগির নাম। চলনে বলনে তার মা-মা ভাব। অনন্তবালাই ডেকে ডেকে সূর্যকে ওঠায়। সূর্য ওঠা মানে সকাল হয়ে গেল। ঘাস বীজ দেখা যাবে মাঠে, খুঁটে নেওয়া যাবে দানা। পুব দিক লালচেপানা হল। আমিও ডাকতে থাকি। হ্যাঁগো, শুনছ ও ভ্যাবলার মা, ঘুম ভেঙে উঠোনে এসো, দ্যাখো কত বড়...অনন্তবালার মতো আমিও ডাকতে থাকি। ভ্যাবলার মার আগে আলুথালু চলে আসে হৈমবতী পিসি। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে রাত্রি রয়ে গেছে। হল কী রে, কী হল! চ্যাঁচাস কেন বাপা!

ডিমটি দেখিয়ে বলি, দ্যাখো পিসি, কত বড় ডিম। ঘোড়া পেড়ে গেছে কাল রাত্রি নিশীথে। সব বলি। পিসির কাপড় থেকে রাত্রি সরে যায়। কোমরে আঁচল গুঁজে ডিমটির সামনে দাঁড়ায়। তারপর দুই হাত জোড়া করে কী সব বলতে থাকে। কী বলছে এই হৈমবতী বুড়ি? বরণ করছে নাকি নতুন সৃষ্টিকে? নতুন বস্তু পৃথিবীতে এল বলে তার এই মন্ত্র-অনুরাগ? বুড়ি বলে, এইবার হবে। সব হবে। পৃথিবীর সব দোষ কেটে যাবে। সেই কবে, ছোটকাল থেকে শুনি আসতেছি ঘোড়ার ডিমের কথা, এতদিনে সত্যি হল। দেখে নিস, এইবারে পরি এসে নেচি যাবে ফুলের বাগানে। সব খড়চাল এইবারে এসবাসটেস হবে। এলমনি বাসনের সব ফুটো বন্ধ হয়ে যাবে। বেগুনে লাগবে না পোকা, আলুতে হবে না ধসা রোগ। ফলিডল-টলিডল খেয়ে আর মরবে না কোনও বউ।

তিন টাকা জোড়া কমলার খোসার মতো রং দেখি সূর্যের আলোর। ফোকাস মারল ঠিক ডিমের উপরে। সত্যি, যেন হয়, আহা, বুড়িটির সব কথা সত্যি যেন হয়।

এইবারে এসে গেল ভ্যাবলার মা। এখন চোখের কোণে মরে যাওয়া স্বপ্নের আঁশ। অপর কথায় তাকে পিচুটি বলে লোকে। আমি তো ডিমের কাছে। চোখের ইশারায় বলি, দ্যাখো। পাটের গাদার পরে তুলে দিই পা। পায়ের পাতায় বেশ রাজা রাজা ভাব।

মিত্তিরদের বড় ঘরে এরকম বড় ছবি টাঙানো রয়েছে। ডোরাকাটা বাঘের উপরে পা। একহাত

ছুঁয়ে আছে শুঁড় ওঠা গোঁপ। বলাই মিত্তিরের ঠাকুরদার ছবি। আমি ভ্যাবলার বাপ এখন আশ্চর্য এই ডিমের মালিক।

ডিম দেখে ভ্যাবলার মা ভ্যাবাচাকা খায়। চোখ মোছে দু' হাতের চেটোয়। চোখের পিচুটি সূক্ষ্মরেণু হয়ে মিশে যায় হাতে। এত বড় ডিম সে তো জীবনে দেখেনি। বলে কীসের? আমি গর্বভরে বলি, ঘোড়ার! ঘোড়ার! আমার কীসের গর্ব? কেন গর্ব? নিজেই বুঝি না! তবু গর্ব হয়। ঘোড়া পেড়ে গেছে ডিম, বলা যায় জোর করে। আমার অবদান নেই কোনও, তবু গর্ব। কোন গর্ব নিজেই বুঝি না। ভ্যাবলার মা হতভম্ব হল। আবার প্রশ্ন করে, কীসের? কীসের? গর্বে গম্ভীর হয়ে মৃদু উচ্চারণে আকাশে তাকিয়ে বলি, বললুম তো, ঘোড়ার। হতভম্ব ভাব কেটে গেল। হাসিই থামে না। বলে ইয়ার্কি দিচ্ছ কেন? বলো না কী ওটা? হৈমবতী পিসি বলে, বলছে তো ঘোড়ার।—ইঃ, তা আবার হয় নাকি? তোমরা সব পাগল হয়েছ? আমি বলি, ওরে ভ্যাবলা, ওঠ দেখি, খোল দেখি একের ভিতরে চার। মনে আছে? কাল রেতে পড়েছিলি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সন্ধি বিচ্ছেদ। ব্রহ্ম যোগ অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মের অণ্ড এই বিশাল পৃথিবী। পৃথিবীটা সত্যি যদি, ঘোড়ার ডিমটি তবে মিথ্যে হয়ে যাবে? নাকের ফুটোয় নড়ে ভ্যবলার মার কড়ে আঙুল। তার মানে চিন্তায় পড়েছে খুব। গভীর চিন্তা করলে ভ্যাবলার মা এরকমই করে। তারপর ডিমটিকে ছুঁয়ে দেখতে আসে। হই হই করে ওঠে হৈমবতী পিসি। করো কী, করো কী, বাসি কাপড়েই ছুঁয়ে দেচ্চ! যাও, আগে কাপড় পেলটে এসো...। ভ্যাবলার মা থেমে যায়। চোখটা নামায় মাটিতে। যেন বুঝতে পারল নিজের দোষ। তড়িঘড়ি কাপড় পালটে সে এয়ো হয়ে এল। সঙ্গে এল ভ্যাবলা-ক্যাবলা। আমি হাসি হাঃ হাঃ হাঃ। ছেলেরা অবাক। বাপের জন্মে এ জিনিস দেখেনি ছেলেরা। ক্যাবলা ছোটটার নাম। অবাক বিস্ময়ে সে মায়ের শরীরে লেপটে থাকে। কথা নেই, বার্তা নেই, ভ্যাবলাটা বলে ফেলে, ইয়া বড় মামলেট হবে একখানা। হেসে ফেলে ভ্যাবলার মা। বলে, এত বড় কড়াই কোথায়?—ক্যানো? পরথমে বালতিতে গুলে নেব, তারপরে খুব কম করে নংকা প্যায়াজ দে বেশ হবে। কতগুলি মামলেট হবে মা? ভ্যাবলার মা আমার চোখের দিকে চেয়ে বলে, এক কুড়ি হতে পারে বলো? আমি খুব রেগে যাই। চোখটা ঘোরাই গোবর গাদাটির দিকে বলি, স্ত্রীবুদ্ধি সর্বনাশী এ কারণেই শাস্ত্রে বলেছে। আরে জানো, এর মধ্যে আছে গোটা একখানা ঘোড়া। একটি ঘোড়ার মূল্য কত জানো? অঙ্ক করছিলি না একটি ঘোড়ার মূল্য দশটি গাধার সমান। একটি গাধার মূল্য এত টাকা হইলে...। তা হলেই বোঝ। এমন অবুঝ তোরা, গোটা ঘোড়াটাকে মামলেট বানাতে চাস! এই কথা শুনে সংবরণ হয়ে গেল যাবতীয় লোভ। ক্যাবলাটি নেচে ওঠে। নেচে যায়। প্রভাত সময়ে শচীর আঙিনায় কার গৌর নাচিয়া বেড়ায় রে...নেচে নেচে বলে রাজা হব... রাজা হব...। ঘোড়া চড়ে রাজা হয়ে যাব।

অনন্তবালা আসে ল্যাংচানো চরণে। চমকে চকিতে চায় ডিমটির দিকে। বিস্ময়ে কোঁকর কোঁ হাঁকে। এত বড় ডিম সে জীবনে পাড়েনি। বেচারি দেশি মুরগিটা। ছোট ছোট সাইজের ডিম পেড়ে গেছে সমস্ত জীবন। মিত্তির বাড়ির, চৌধুরি বাড়ির, দত্ত বাড়ির পুষ্টি অভিলাষী মানুষেরা হাফ বয়েল খেয়েছে কিছু কিছু। বাকি ডিমগুলি জড়িয়েছে সে নিজস্ব উত্তাপে। ওম্ দিয়ে ফুটিয়েছে ডিম। ডিমগুলি হচ্ছে সব আশা-আকাঙ্ক্ষার মতো। উত্তাপে-ভালবাসায় জন্ম হয়, ডিম ফোটে। তারপর বড় হলে কারা যেন ঠ্যাং বেঁধে, সাইকেলে উলটো ঝুলিয়ে নিয়ে হাটে চলে যায়। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা আর কামনা-বাসনার গল্প অনন্তবালা জানে। অনন্তবালা এক মুরগির নাম। হৈমবতী পিসি একে পোষে। কম ডিমে তা দেয়নি অনন্তবালার নারীজীবন। এইবার ডিমখানি ঘুরে ঘুরে দেখে। ডিমটিকে প্রদক্ষিণ করে। বিস্ময় কেটে গেলে মাতৃহৃদয় তার লজ্জা পেয়ে যায়। এত বড় ডিম সে পাড়তে পারবে না। পারবে না কোনওদিন।

সাইকেল ক্রিং চলে আসে। ওঁ হ্রীং ভট্চায্যি মশাই এসে গেছে। তার মানে এই বার্তা রটে গেছে ক্রমে। লোক জমে। ধনা-মনা-ঘনা ছাড়াও প্রাইমারি মাস্টার এসেছে। স্বয়ং এসেছে এ গ্রামের বিখ্যাত মেম্বার। হাতে টুথ ব্রাশ, ঠোঁটের কোনায় আহা মোলায়েম ফেনা।—কলিকাল সত্যি সত্যি

এসে গেল হে...ভটচায্যি মশাই বলেন। ঘোড়াতেও ডিম পাড়ছে। এবার বন্ধ্যা মাগীর অন্ধপুত্র চন্দ্র দেখতে পাবে। সবকিছু মিলে যাচ্ছে শাস্ত্রের বচন। অবাক মেম্বার বলে, বললেই হল এটা ঘোড়ারই ডিম? টুমিও যেমন, অন্য কোনও চক্কান্ত নিশ্চই। কী বলোহে অবনী মাট্টার। ঘোড়া কি ডিম পাড়ে? পাড়তে পারে কি কখনও? মেম্বারের মুখে সাদা কলগেট ফেনা। প্রাইমারি মাস্টার অবনী গুছাইত মাথা চুলকায়। বলে, ঘোড়া এক চতুষ্পদী স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী প্রাণী। সূচনা থেকে উপসংহার পর্যন্ত আটতিরিশ লাইন পুরোপরি মুখস্থই আছে। ডিম পাড়ে কি না কোথাও লেখেনি। ডিম যে পাড়ে না, এমন কথাও কিন্তু বলেনি কোথাও। এটা যে ঘোড়ারই ডিম পোমান করতে পারো? বলেন মেম্বার। কী প্রমাণ করি আমি? পোড়ামুখী ঘোড়ী, ডিম জন্ম দিয়ে তুই কোথায় পালালি? ধনা-মনা-ঘনা বলে, পোমান কঠিন কী?—ভাঙলেই হল, ভাঙলেই বেরুবে আঠা-আঠা-লাল। ভাঙলেই হল? থুক করে ফেনা ফেলল ভিলেজ মেম্বার। সাধে কি এস সি, এস টি বলে? ভাঙলে বিস্ফোরণ ঘটে যদি? জাতীয় সংহতি ভাঙে যারা হতে পারে তাদেরই এ কাজ। সিনিমা এয়েছিল বৈশালী হলে, ঘোড়ার পেটেতে ঢুকে জনাকত সৈন্য নুকেছিল। ঘোড়াটা কাঠের। সিনেমার নাম ভুলে গেছি। ভাঙতে হয় যদি তার আগে ডাকব দমকল। ইনফরম করতে হবে পুলিশের কাছে। ধনা-মনা-ঘনা বলে ওঠে, তা হলে ভাঙব কেন? ধান সিঝা যে কড়ায়ে হয়, সে কড়ায়ে চইড়ে দ্যাও ডিম, সিঝা হয়ে যাক, ভেঙে ভেঙে খাব তারপর। সে এক ভোজী হবে, বলো? ভিলেজ মেম্বার বলে, থাম। খালি খালি খাই। পাঁচ মাথা এক করে ভাবা যাক। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা যাক। তারপর সে একাই পাঁচমাথা হয়ে যায়। বলে, পুলিশে ইনফর্ম করি, রিক্স নেয়া মোটেই ভাল না।—ও বাবা পুলিশ, তা হলে তো ধরে নিয়ে যাবে, মারবে ডান্ডা। আমি ভয় পেয়ে বসে পড়ি। বলি, মা কালীর দিব্যি। চক্রান্ত কিচ্ছুটি নেই। একটি জলজ্যান্ত ঘোড়া কাল রাতে এসেছিল।—প্রমাণ রয়েছে কিছু? ভিলেজ মেম্বার বলে। আমি বলি, প্রমাণ তো ডিমটার ভেতরেই আছে। ডিম ফুটে ঘোড়াটা বেরুক, তারপর সব কিছু সমাধান হয়ে যাবে ঠিক।—ঘোড়া কি এমনিতেই হবে? অটোমেটিক বেরুবে কি ডিম থেকে ঘোড়া? কী যা তা বলো, তা দেবে কে? চিন্তা করেছ তা? ভিলেজ মেম্বার বলল একথা। সত্যিই, তবে তো চিন্তার কথা। ও রে ভ্যাবলা, জলচৌকিটা জলদি নে আয়। বসুক মেম্বার। মাথাটা ঠান্ডা করে চিন্তা করবেন তিনি। জলচৌকির উপরে বসেন ভিলেজ মেম্বার। জাতিতে নাপিত তিনি। এদিকে ভটচায্যি মশাই দাঁড়িয়ে আছেন ঠায়, ভাবেন কলিকাল সত্যিই এসেছে। গায়ে অপমান লাগে। চলে যেতে চান তিনি। ভিলেজ মেম্বার সিগ্রেট ধরিয়ে বলে, যাও কোথা? মন্ত্রে তন্ত্রে কিছু হবে? ঘোড়ার ডিম ফোটানোর মন্ত্র আছে কিছু? এই সব ব্যঙ্গোক্তি তাঁর আদৌ পছন্দ নয়। অর্বাচীন এই সভা তিনি ত্যাগ করলেন। প্রাইমারি মাস্টার বলে, কিন্তু দাদা সমস্যা রয়েছে। নম্বর ওয়ান হচ্ছে, ঘোড়াটা বেরোয় যদি স্তন খাবে কার? রচনা বইতে পষ্ট লেখা আছে ঘোড়া এক স্তন্যপায়ী জীব। ধনা বলল, বাগদি বউ সরলা তো আছে। বছর বিউনি। দত্তদের বউগুলো বডি টাইট রাখবে বলে সরলাকে ডাকে। সরলাই মাই দেয় ওদের বাড়িতে।—কিন্তু ঘোড়ার বাচ্চা যে মানুষের স্তন খাবে এমন গ্যারান্টি আছে কিছু? সন্দিগ্ধ মেম্বার বলে। পাঁচমাথা চুপ মেরে যায় এমন যুক্তির কাছে। নম্বর টু হল, ঘোড়াটা বেরোয় যদি, কে হবে ঘোড়ার মালিক?

ক্যাবলাটা বলে ওঠে, আমি হব...আমি হব...। এ জন্যই ক্যাবলা নাম তোর। যা ভাগ—যা ভাগ। আমি বলি, স্যারেরা শুনুন। আমি বাপু গরিব মানুষ। ঘোড়ার মালিক হতে চাইনি কোনওদিন। আমাকে পায়নি ঘোড়া রোগে। বড়জোর শখ ছিল ঘোড়ালেবু গাছে। জাম্বুরার মতন খানিক। ওই গাছ পুঁতেছিলাম উঠোনের কোণে, মরে গেছে। সত্যি সত্যি ঘোড়া আমি চাইনি কোনওদিন। ঘোড়া যদি ফুটেই বেরোয়, আপনারা পাঁচমাথা মিলে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা করবেন, তাতেই ভোট দেব আমি।—শোনো বলি। ভিলেজ মেম্বার মৃদু হেসে বলে, ঘোড়াটা বেরুলে পরে সেটা হবে জাতীয় সম্পদ। এলাকার কাজেই লাগবে। অশ্বমেধ যজ্ঞ তো হয় না এখন, ঘোড়াটির গায়ে আমার প্রতীক চিহ্ন এঁকে অঞ্চলে ঘোরাব। তারপর ধরো, ভোটকেন্দ্রে ঘোড়া চেপে ভোট দিতে যেতে

পারে জনসাধারণ। ধনা-মনা-ঘনা তালি মারে। কী ভালই না হবে।—তারপরে ধরো ভোটে জিতে গেলে ঘোড়ার ওপর চড়ে হবে প্রশেসন। কেমন। মেম্বার তার আঙুলে গুনছে পয়েন্ট। প্রাইমারি মাস্টার বলে সব নতুন নতুন পয়েন্ট। রচনা বইতে এর একটাও নেই। হেঁ হেঁ হেসে ওয়ার্ড মেম্বার ধোঁয়া ছাড়লেন। এবার গম্ভীর হলেন হঠাৎ। পালটে গেলে মুখের ভূগোল। গোল গোল রিং ছাড়লেন গোটা পাঁচ-ছয়। চিন্তাক্লিষ্ট হলে তিনি এমনই করেন। সুতরাং গোটা সভা চুপ। চুপ ধনা-মনা-ঘনা। এমনকী অনন্তবালা মুরগিটিও চুপ। চুপ! আদালত চলছে এখানে। মেম্বার খুললেন মুখ। মূল পয়েন্ট থেকে বহুদূরে সরে গেছি সব। শোনো বলি, আমার দিকে মুখ। মানে আমায় বলছেন। আমি মনোযোগ সহকারে শুনি। ঘোড়ার মালিকানা রিফিউজ করছ তুমি তো?—রিফিউজ মানেটা কী যেন? মানে বলে দিলে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, রিফিউজ।—ঠিক আছে, তা নয় করলে, ডিমটির মালিকানা তোমারই থাকছে এবং যাবতীয় রিস্‌ক ও দায়িত্ব। কিন্তু ঘোড়া হলে ফোটানোর ভারটা তোমার।

এ যে গুরুভার, বলি আমি। আমাদের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা রইল। বললেন তিনি। এ কী আতান্তরে পড়ে গেছি আমি। ও রে মুখপুড়ি ঘোড়ী, সর্বনাশী, ওলাউঠো, ফিরে আয় মা, ডিমটির উপরে বসে তা দিয়ে যা। আমি বলি, ঘোড়াটি ফেরার। তার ফেরার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পাশের গাঁয়ের ধোবাদের গাধাটিকে নিয়ে এলে ভাল হয়। কেননা, কোকিলের ডিমে ওম্ দিয়ে ছানা করে যাবতীয় কাক। তা ছাড়া হাঁসেদের ছানাপোনা অনন্তবালাই ফোটায়। সুতরাং...। এ সময়ে এসে গেল বলাই মিত্তির। সঙ্গে ছোটছেলে। লোকজন সচকিত হল। এমনকী খালি হয়ে গেল জলচৌকিটিও। বলাই মিত্তির বলে, শুনলুম ঘোড়া হচ্ছে, বেশ, বেশ কথা। বেশ হবে। চাবুক মারা যাবে বেশ। বহুদিন অকর্মণ্য পড়ে আছে বাবার চাবুক। চাবুক মারলে ঘোড়া জাতি কিচ্ছু বলে না। সব্বাই হে হে করে। বলাইবাবুর ছেলের প্যান্ট ও গেঞ্জিতে মনোহর শোভা। গেঞ্জির গায়ে কত চিত্র আলপনা। অবনী মাস্টার বলে, এসে গেছ ভালই হয়েছে। তুমি বাবা ভেটারনারি ফাইনাল দিয়েছ। জন্তু জানোয়ারের বিদ্যা জানা আছে ভাল। মুরগির ডিম ফোটে একুশ দিনেতে। ঘোড়ার ডিম কত দিনে ফোটে?

গেঞ্জি গায়ে ছেলেটি প্রকৃতই স্মার্ট। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, হর্স আগের বার পরীক্ষায় এসে গেছে। সাজেশনে এ বছর ইমপর্টেন্ট ছিল না মোটেই। পড়িনি। তবে আর কেই-বা আছে এই গাঁয়ে? কেই-বা বলবে ঘোড়ার বদলে গাধার ওমে ডিম ফুটবে কি না? তা ছাড়া এতদিন গাধাটাকে ছেড়ে দেবে ওরা? গাধার কি কাজ নেই? তবে ও ভ্যাবলার মা, তুমিই বসবে? চেষ্টা করে যদি দ্যাখো...

এ সময়ে হৈমপিসি আসে। কোলে তার অনন্তবালাটি। অনন্তবালাকে সে ধীরে ধীরে ডিমটির উপরে বসায়। অনন্তবালা মুশকিল আসান হয়ে বসে থাকে।

অনন্তবালা মানুষ নয়, একটি মুরগির নাম। এ জীবনে বহু ডিম থেকে সে নিংড়েছে প্রাণ। ডিম ফোটানোই তার হবি। অনন্তবালা ঘোড়ার ডিমটির উপর বসে থাকে। হৈমবতী পিসি দিল উলুধ্বনি একা। অনন্তবালা কত ছোট, ছোট্টপ্রাণীটা। এতবড় ডিমে তবু সে বসেছে। রোগা রোগা বিবর্ণ পালকে তবু কিছু ইচ্ছা পুষে রাখে। বসেছে অনন্তবালা ডিমের মাঝখানে। এ পাশের ও পাশের শূন্যতাকে দেখে। ডানদিকে বাঁদিকে তার শূন্যতার সাদা। ডানদিকে সরে গেলে বাঁদিকের শূন্যতা বড় হয়, বাঁয়ে সরলে ডানের শূন্যতা। তবু বসে থাকে এ পাশে ও পাশে...। জমায়েত ক্রমে সরে যায়। অনন্তবালা ক্রমে একাকিনী। ডিমটিকে নিজস্ব করে নিয়ে অনন্তবালা ওখানে রয়েছে।

শারদীয় আজকাল, ১৯৯৫

রেখে আসা

ছেলেটির নাম নখা। নখা শুনেই বুঝেছি ওর আসল নাম লখিন্দর, বহুদিন এসব লাইনে আছি। বলি, পুরো নামটাই বল তো, ও বলল, নখাই। ওর সঙ্গী ছেলেটি বলে, ওর নাম হল নখ্‌খিন্দর। আমি গেয়ে দি—কেলে যারে যারে তুই চম্পাই নগর/ দংশি এসোগা তুমি বালা লখিন্দর।

তখনই কী একটা ডেকে ওঠে জানালার পাশে। আমি বলি, প্যাঁচা ডাকল। নখা বলে গো-সাপ। আঁতকে উঠি। সাপ? সাপ আছে নাকি? ওরা হাসে। মুহূর্তেই সেই হাসিকে রুগ্‌ণ করে বলে, গোসাঁপ আঁইগা বড় বকা। ঘর ডং ডং দুয়ারে কুলুক। জারে আরও দুব্‌লা।

কৃষ্ণা মুখ হাত ধুয়ে এল। হাতে একটা ঢাউস গ্যাঁদা। বলল, গাছ ভরতি ফুল।

ছেলে দুটো ঘর পরিষ্কার করে দিল। ওদের চাদরের উপর আমাদের নিয়ে আসা চাদরটা পেতে দিল টানটান। এবার বলল, রান্নার হুকুম দ্যান স্যার। লক্ষ করি স্যার উচ্চারণ কী নির্ভুল।

হ্যাঁরে, মুরগি টুরগি জোগাড় করতে পারবি?

না স্যার, এই রাতে আর ইঁবেক নাই। ডিমের ঝল ভাত।

আর তক্ষুনি 'এইরে' বলে কৃষ্ণা সাত তাড়াতাড়ি ব্যাগের চেন খুলে জামা কাপড় হাতড়ে একটা পলিথিনে মোড়া টিফিন বাটি বার করল। বাটিটা খুলে গন্ধ শুঁকেই জিভ কামড়াল। ইশশ। নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি ভালবাস বলে ডিমের ওমলেট করে আলু দিয়ে মাখা মাখা ঝোল করেছিলাম, একদম ভুলে গেছি। আমি ওর মুখের দিকে একটু উদাস তাকালাম। এটা ওর কোনও নতুন ব্যাপার নয়। ভীষণ ক্যালাস ও। কতবার যে কত কিছু ভুলে গেছে আর হারিয়ে ফেলেছে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। বিয়ের পর প্রথম প্রথম কবিতা লিখে ওকে শোনাতাম, আমার তো খাতা বা ডায়েরি-ফায়েরি কিছু ছিল না, ওসব সিসটেম আমার টেমপারামেন্টে পোষায় না। আমার যখন মুড আসে, আইডিয়া আসে তখন হাতের কাছে যা কাগজপত্র পাই, লিখে রাখি। আমার কবিতা সৃষ্টি হয় ক্যালেন্ডারের ছেঁড়া কাগজে, ইনল্যান্ড কভারে, গেঞ্জির প্যাকেটে—এইরকম। বিয়ের পরপর দশ-বারোটা পদ্য ফটাফট লিখেছিলাম। ওর কাছে দিয়েছিলাম রাখতে। সোদপুরে একটা কবি সম্মেলনে পড়তে যাব, পদ্যগুলো চাইলাম, সর্বনাশ! একটাও নেই। তোশকের তলা, আলমারির লকার, ফিক্সড ডিপোজিটের প্লাস্টিকের খাম, সব খুঁজতে লাগল, কেবল বলছে, আমি খুব যত্ন করে রেখেছি। ওই ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য পরে একটা পদ্য লিখি, পদ্যটার নাম 'যত্ন ছিল'। 'যত্নে ছিল ভালবাসা কাজললতা মেঘের মধ্যে...'

আমেরিকা দেশে শুনি পুরনো হলে জিপগাড়ি, মটরগাড়ি ফেল্যে দ্যায় লোকে—ইটা সত্যি স্যার? লখিন্দরের সঙ্গী ছেলেটি আচমকা প্রশ্ন করে। কৃষ্ণা এইমাত্র টিফিন কৌটোটা পরিষ্কার করে নিয়ে এল। আমি ওই আচমকা প্রশ্নের উৎসমুখ পেয়ে যাই। রান্নাঘর থেকে লখিন্দরের গলা—ডাহা লষ্টো হয়নি বউদি, খাবা চলত। ভোর চারটের সময় উঠে রান্নাবান্না শুরু করেছিল কৃষ্ণা। সকাল সাড়ে আটটায় পুরুলিয়ার গাড়ি। ভাত খেয়েই বেরিয়েছিলাম আমরা। পুরুলিয়া থেকে বাঘমুণ্ডি। বাঘমুণ্ডিতে CADP-র জিপ রেডি ছিল অযোধ্যা পাহাড়ে উঠবার জন্য। বাঘমুণ্ডির মোড়ে আবার ক্ষিধে পেলে জিপে বসে মুড়ি আর রেপসিডে ভাজা ঠান্ডা জিলিপি খাওয়া হল। আশ্চর্য, যখন ওই বাজে জিনিসগুলো খাচ্ছিলাম, কৃষ্ণা তখন ওই কৌটোটা বার করল না কেন, অ্যাঁ? কৃষ্ণা লজ্জাগ্রস্ত বলেই কাচের গ্লাসটা পরিষ্কার করছিল। ও কি জানত না, এগুলো নখা-টখাদেরই কাজ। কেন বার

করলে না তখন? প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার হতেই কৃষ্ণার কৈফিয়তের সঙ্গে যেন অপরাধবোধ মিশে যায়।

' ...তখন এমন হয়ে গিয়েছিলাম না, ওইসব লাল রাস্তা, গাছগাছালি, কাঠবেড়ালি, পাহাড়ের রেখা...তখন ওই ওমলেটের তরকারির কথাটা না, একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

স্যার, আমরিকায় কি মেঁয়াছেল্যাদের গালে দাঁড়ি হয়? ছেলেটির আবার আচমকা প্রশ্নে আমি হাঁ। লখিন্দর বলল, ভিডোতে দেঁখাইছে মেঁয়াছেল্যার দাঁড়ি গজাইছে।

এখানেও ভিডিও আছে?

মাথা নাড়ে ও।

নাম কী তোমার?

লখিন্দর তাড়াতাড়ি নাম বলে দেয়। বলে, উয়ার নাম মিঠুন আজ্ঞা। আর তখনই দেখি ছেলেটার জুলফি কামানো।

লখিন্দর বলে, যেথা ভিডো, সেথা এই খ্যাংড়াটা। এক্কেবারে পকা।

মি. দত্ত এলেন। কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?—কৃষ্ণার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণা না না করে শুধু মাথা নাড়ল। ম্যানার্স-ট্যানার্স একেবারেই জানে না কৃষ্ণা। এখানে কত কিছু বলবার স্কোপ ছিল। আসলে মি. দত্তের জন্যেই আমরা এসেছি এখানে, এই অযোধ্যা পাহাড়ে। উনিই গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মি. দত্ত আমার এক বন্ধু অরুণের ভগ্নীপতি, এখানকার CADP প্রজেক্টের অফিসার।

মি. দত্ত বললেন, নখাটাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। এই ছোঁড়াটা রইল, যা যা দরকার ওকেই বলবেন। কাল সকালে ওকে সঙ্গে নিয়ে নেবেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে দেবে সব।

মিঠুনকে কিছু বলতে হয় না। বেতের চেয়ার পেতে দেয়, মাঝে ছোট টেবিল। আমরা বসি। দুটো খালি গেলাস এনে বলে, টেবিলে রাখব? বলি, একটা রাখো। ও জিজ্ঞাসা করে, জল দি? বলি, মহুয়া আনতে পারো? ওকে দশটা টাকা দিই। শীত রাত। কুয়াশার ওড়নার উপর চন্দ্রকিরণ পড়েছে। কৃষ্ণা শালটা জড়িয়ে নেয়। মৃদু ফুলগন্ধ। ঝিঁঝি পোকার অর্কেস্ট্রা, আর বহুদূর থেকে ভেসে আসা মাদলের শব্দ। আমি বলি, শোনো, শোনো। মাদলের শব্দ শোনো। শব্দের প্রতিবিম্ব শোনো। কৃষ্ণা কিছু বলে না।

শুকনো পাতা মাড়ানোর শব্দ নিয়ে মিঠুন এল। হাতে বোতল। করিৎকর্মা ছেলে। দু'টাকা ফেরত দেয়। দরকার নেই, তুই নে। গ্লাসে ঢালি। মহুয়া বড় ফার্স্ট ক্লাস। আঃ।

পড়ে আছে মিহিন কাচের মতো জ্যোৎস্না।
শুকনো পাতার শব্দ এমন নিঃসঙ্গ।
সেইসব পাতা ভেঙে ভেঙে ভেঙে ভেঙে চলে যেতে যেতে
যেতে যেতে যেতে
বাতাসের স্পর্শ যেন কার যেন কার?

কৃষ্ণাকে বলি, বলো তো কার?

কৃষ্ণা ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

জানে না, সুনীলদার।

তখন মিঠুন বলে, রাঙাহাড়ির। আমাদের দেবতা রাঙাহাড়ি হাওয়া দেয়, গরম হাওয়া...ঠান্ডা হাওয়া...

কৃষ্ণা মিনমিন করে বলে, বেশি খেয়ো না অ্যাঁ? কৃষ্ণাটা এই রকমই। কোথাও নিয়ে যাই না ওকে। আট মাস বিয়ে হয়েছে, ওই একবারই পুরী নিয়ে গিয়েছিলাম ব্যাস। ক'দিন ধরে বায়না করছিল—এই তো আটকে গেলাম, ব্যাস, আর তো বেরোতেই পারব না বাচ্চা হবার পর দু' বছর তো একেবারে বন্দি, চলো না, কোথাও দু'দিন ঘুরে আসি। ঠিক আছে, এলাম। শাশুড়ির সেবা-টেবা

করতে দাও, লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে দাও, জবাব নেই। কিন্তু আমার মন? মনও তো কিছু চায়। রূপ যৌবন কি সব? জামাইবাবু ছবিটা নিয়ে এল আমিও ভজে গেলাম। শ্রাবণীটা শেষকালে একটা পাইলট ছেলেকে বিয়ে করে ফুটে গেল, আমার মাল খাওয়া বেড়ে গেল। জামাইবাবু তখন উঠেপড়ে লাগল। বারোটা ছবির মধ্যে আমি কৃষ্ণাকেই পছন্দ করি। মুখটা হেভি লেগেছিল, বাংলায় এম এ। মেয়েটেয়ে দেখতে যাবার মতো ফিউডাল ব্যাপার-স্যাপারগুলো সঙ্গে কমপ্রোমাইজ করতেই হল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, প্রিয় কবি? বলল, জীবনানন্দ। নাইন্টি পার্সেন্ট মেয়ে রবীন্দ্রনাথ বলে থাকে। জীবনানন্দ বলতেই ভাবি ফিট। পরে তো জানলাম জীবনানন্দের মোট ন'টা কবিতাই পড়েছে ও, সে বছরের ইমপরট্যান্ট আর এ কে বি'র নোট জীবনানন্দের রূপচেতনা ঝাড়া মুখস্ত করেছে, তাতেই ফোর্থ পেপারে ফিফটি পার্সেন্ট।

কৃষ্ণাকে বলি, একটু খাবে? ও বলল, প্লিজ, না। আমি বলি, কাল সকালে মহুয়া গাছ দেখাব। মহুয়া ফল দেখলে অবাক হয়ে যেতে, আঙুরের মতো, আর মিষ্টি। মহুয়া নামটাই ভারী মিষ্টি। আমাদের মেয়ে হলে নাম রাখব মহুয়া।

আর ছেলে হলে?

ছেলে হলে তুমি ঠিক কোরো...

ছোঁড়াটাকে ডেকে বলি, মিঠুন, ক'টা আলু ভেজে দিবি?

ও বলে, উরা মিঠুন মিঠুন হেঁকে খ্যাপায় মোকে। মোর নাম কেঁক।

কেঁক?

হ স্যার?

কেক কী?

কেঁক দিগার।

দিগার? তোরা খেড়িয়া?

হ স্যার।

কেক নাম কেন?

বাপ একবার একটুস খিয়েছিল কেঁক। আর কেঁক-এর কিচিমিচি। তারপর বাপের খঁকা হল্যে পেরানের আল্লাদে কেঁক নাম রাখা করে দিল্যাক।

সকাল। মায়া মমতার মতো এখন শীতের রোদ মাঠে শুয়ে আছে। চল কেক, আমরা তৈরি, ঘুরে আসি অযোধ্যা পাহাড়। নারীর চেয়েও গরবিনী এই মাঠ সহস্র চোখের সামনে গায়ে নিচ্ছে রোদের আদর। তুই মিঠুন অথবা কেক চাদর জড়িয়ে নে, চল আমরা বেরোই। কৃষ্ণার কারুকাজ করা লাল চাদরটা হিমরেণু মাখা। রোদের ঝালর নাচে। কৃষ্ণার সারাটা মুখে হাসির প্রলেপ, পাদমূলে, সোনালি স্ট্রাপের কাছে সুন্দর থেমেছে। 'আহা, দারুণ' বলতে গিয়ে গলা দিয়ে বের হল অম্বল ঢেকুর। মহুয়ার গন্ধ। কেক বলল, আসুন মেমসাহেব, সীতাকুণ্ডে যাই।

লোধা-খেঁড়িয়া সম্পর্কে আমি খুব ইনটারেস্টেড। ওদের চুনী কোটালের নাম জানি। টেপটা আনা হয়নি, কৃষ্ণাকে বলেছিলাম ও ভুলে গেছে। টেপটা থাকলে ওকে দিয়ে গাইয়ে নেওয়া যেত। বেতলা গিয়ে একটা স্কোপ পাওয়া গিয়েছিল, ফরেস্ট বাংলোয় মুণ্ডাদের আনিয়ে গান রেকর্ডিং করা হয়েছিল। তারপর অনির্বাণ যখন টিভি সিরিয়ালে সাঁওতাল পরগনার পটভূমিতে একটা মাল নামাচ্ছিল, আমি অনির্বাণকে হেল্প করেছিলাম। পূর্ব পুঁটিয়ারী প্রাচীন কলাকেন্দ্রের ছেলেমেয়েদের মুখে কালো রং মাখিয়ে নাচিয়ে নিল, পিছনে আমার কালেক্ট করা মুণ্ডাদের গান। তা আমি কেককে জিজ্ঞাসা করি—গান জানো?

...হাঁ...

কী গান?

ওয়ে ওয়ে—

তোমাদের গান? লোধাদের গান?

মৃদু মাথা নাড়ে ও।

কী খেতে ভালবাসো?

ভাত—

তোমার দেশ কোথায়?

কুকড়া টাঁড়

কোথায় সেটা? ঝাড়গ্রামের কাছে?

আমার ধারণা ছিল লোধা-খেড়িয়ারা সব ঝাড়গ্রামের ধারে কাছে থাকে। এখন জানলাম বাঁকুড়া-পুরুলিয়াতেও থাকে। ওর দেশ বাঘমুণ্ডি থেকে কুড়ি কিলোমিটার দক্ষিণে।

জিজ্ঞাসা করি—তা অযোধ্যাতে তুমি এলে কী করে?

ও বলল, লুথান সাহেবরা বসাইল স্যার।

সেটা কী রকম?—আমি তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছি...

ও যা বলল, তার থেকে বুঝে নিলাম যে ওয়ার্ল্ড লুথেরান সার্ভিসের লোকজন লোধা-খেড়িয়াদের মধ্যে কাজ করত। অযোধ্যা পাহাড়ে ওদের অনেকগুলো প্রজেক্ট ছিল। এই ছেলেটাকে বাচ্চা বয়সে ওদের গ্রাম থেকে তুলে এনেছিল, এখানকার স্কুলে ভরতিও করে দিয়েছিল। পরে লুথেরান সার্ভিস উঠে গিয়ে সি এ ডি পি প্রজেক্ট হয়। ব্যাপারটা সরকারি। ছেলেটা ফোর পর্যন্ত পড়েছিল। এখন গেস্ট-হাউসের বয়। মাসে মাসে মাইনে পায়।

জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি যাস না?

বলল, মাসে একবার যায়, মাইনে পেয়ে। ওর গাঁয়ে ওরাই সবচেয়ে বড়লোক। ওদের ট্রানজিস্টার রেডিয়ো আছে।

ইটা সীতাকুণ্ড স্যার। রাম সীতা বনবাসে আঁসেছিল, এইঠানে সীতার বড় পিপাসা লাগল; বুকের ছাতি ফাটে, কুথাকে জল নাই। লক্ষ্মণ করলেক কী, মারলেক এক তির, আর ভুঁই ফাঁড়ে হুদাম জল ভকভক বাইর হল।

দেখলাম জল বুটিবুটি ফাটছে এক জায়গায়। কৃষ্ণা সেই জল আঁজলায় তুলে নিল, মাথায় ছেটাল। মেয়েরা এসেছে সব কলসি নিয়ে, জল নিচ্ছে।

অযোধ্যা পাহাড়ের উপরে হাঁটলে পাহাড় বলেই মনে হয় না। চূড়াটা প্রায় সমতল ক্ষেত্র। চাষ হয়। সি এ ডি পি জল-সেচেরও ব্যবস্থা করেছে। ভাল বীজ, সার, লোন; তাই মাটির মিহিন গুঁড়োয় টায়ারের দাগ। অনেক টায়ার, অনেক অফিসার, তাই মহুয়া গাছের তলায় গোল্ড ফ্লেকের শূন্য প্যাকেট, সীতাকুণ্ডের পাশে বোতলের ভাঙা কাচ, ব্ল্যাক লেভেল, কনডোম নিয়ে যায় কাক।

চলুন যাই সীতার চুল দেখাব।

ছেলেটা নিয়ে এল এক জঙ্গুলে জায়গায়।

দ্যাখেন স্যার, হুইয়ে, সীতা মায়ের চুল।

দেখি ওখানে কতগুলো গাছ থেকে ঝুলছে কালো কালো ফাইবার।

দ্যাখেন, দ্যাখেন গো, ক্যামন খাঁকড়িতেলা চুল...

ছেলেটি একটা গল্প বলে। আশ্চর্য গল্প। বনবাসে এসেছিলেন রামচন্দ্র। রামচন্দ্র নাকি পান্তা ভাতের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা খেতে চেয়েছিলেন। আর সীতা মা সারাটা পাহাড় ঢুঁড়েও একটা কাঁচা লঙ্কা পেলেন না। রাম তাই রাগ করে ভাতই খেলেন না। সীতা তখন রাগে-দুঃখে অভিমানে মাথার চুল ছিঁড়লেন। আর সেই চুল পাহাড়ের লতায় পাতায় জড়িয়ে রয়েছে।

কৃষ্ণা পায়ের গোড়ালি উঁচু করে ওই সীতার চুল ধরার চেষ্টা করে। হাতের নাগালে একটু পায়, হাতে জড়িয়ে নেয়, আর উঁচু বৃক্ষচূড়ার দিকে তাকিয়ে বলে, সীতার প্রতিবাদ।

ছেলেটা বলে, উঁগে লিবেন মেমসাহেব? বলে লাফিয়ে লাফিয়ে পাড়ে। একটা পাতায় মুড়ে

কৃষ্ণাকে দেয়। কৃষ্ণা ওর কাঁধ চাপড়ে বলে, বাঃ। ছেলেটা চনমনে হাঁটে, শালিখের পা।

কেক গান ধরে:

সরু সরু কানালী।
ধান লাগা করালি
জিলপি দিব বল্যে
জুনার পড়ায় ভুলালি।

ওই তো গান। গানে ধানের কথা...

ধান চাষ জানো?

কেক আনমনা হয়। থমকে দাঁড়ায়।...এ ছড়া, চা বানা, এ ব্যাটা গেলাস দে, হেই শালা, মহুয়া আন...এইসব করি স্যার। সে কারণেই গায়ে জামা, পায়ে হাবাই চটি। ঘরের খুড়া জ্যাঠার উদলা গা। খুড়া-জ্যাঠা আমাকে বলে, কাঁকড়া লক। ঘর মোকে চক ঠারছে, বাহিরে মোকে শালা হাঁকছে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকে কেক। কাঁকড় মাড়ানো শব্দ। পাতার মর্মর। একাকী পাখি। সীতার দুঃখ।

আমি বলি, কেক, কদ্দিন ঘর যাসনি?

মাসটাক হয়েছে। ইবার যাব। আলাদীর বিহা। আলাদী মোর জ্ঞাতি বুন।

ও কর গুনে বলে, আর পাঁচ দিন মাঝে। ও এবার কৃষ্ণার কাছে যায়। ভীষণ অনুনয় করে কী যেন বলে।

কৃষ্ণা আমাকে বলে পুরুলিয়া যাবার পথেই ওদের গ্রামটা পড়বে। কাল দুপুরে যখন আমরা যাবই, দত্তকে বলে একটা লিফট দিলে হয় না? পরশু থেকে ওর ছুটি করা আছে।

আমি বলি, কেক, তোদের বিয়েতে গানটান হয়?

হয়,...হয় না।

মানে?

প্যাটে দানা, তবে গান।

আমি বলি, দত্তকে বলে তোকে জিপে করেই নিয়ে যাব তোদের গ্রামেও ঘুরে আসব। গান শোনাতে হবে কিন্তু।

জিপ চলল। নীচে নামছে। যখন উঠেছিলাম, তখন প্রায় সন্ধে, চারপাশ পাহাড়ি কুয়াশায় ঢেকে আসছিল, বনরাজি-লীলা দেখা হয়নি তেমন। জিপের হেডলাইটে নার্ভাস এক খরগোশকে জুবুথুবু হয়ে থাকতে দেখেছিলাম রাস্তায়। কালো রাস্তায় সাদা খরগোশ। দারুণ লাগছিল।

এখন সদ্যশীতের হেমবর্ণ দুপুর। গাছেরা কেউ কেউ পাতা ঝরানো শুরু করেছে। এইমাত্র ঝরনা জল দেখা গেল। একটা গাছ সারা গায়ে লাল পুঁতির মালা পরে সেজেছে সুন্দর। টুকুস থামাও হে—চিৎকার করে কেক। পাহাড়ি ঢালে ইচ্ছে হলেই গাড়ি থামানো যায় না, বেচারা জানে না। ও আবার চেঁচায়। গাড়ি থামলে ছুটে যায় উপরের দিকে। ওই লাল ফল ছিঁড়ে আনে। জামাটা কেঁচড়ের মতো করেছে, তাতে ভরতি ওই লাল ফল। ও বলে চুংড়া। কৃষ্ণার কাছে একটা পলিথিন পেয়ে খুশি হয় কেক। ওর জামায় কালো কষ লেগেছে। আমাকেও ক'টা দেয়। অচেনা ফল আমি খাই না। কৃষ্ণা খায় না, ড্রাইভার খায় না। কেক ওর লোধা গ্রামের ভাইবোনদের জন্য নিয়ে যাচ্ছে।

তোরা ক' ভাইবোন রে কেক?

জড়ায় বুন, জড়ায় ভাই। আমি বড়—

দুটো দুটো?

হ স্যার।

লেখাপড়া করে? স্কুলে?

বুন জড়া ছোট। ভাই যায়।

কোন ক্লাস?

টু স্যার। ক খ গ ঘ ফটাফট হাঁইকতে পারে কোনটা ক কোনটা গ চিনে না। আমাদিগের লধা ইস্কুলে কালো কাঠ নাই স্যার।

বিয়েটা কার?

খুড়ার মেঁয়ার—

বয়স কত?

টিসি—

টিসি মানে?

ছোট—

এইভাবে ওর কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলাম ওদের বিয়ের পদ্ধতি। ওদের বরপক্ষ কনেপক্ষকে পণ দেয়। ছোট মেয়ে মানে বড় যাদের ঋতু শুরু হয়নি, তাদের পণ জাঠা, মানে বড় মেয়েদের তুলনায় বেশি। এখন কন্যাপণের পরিমাণ ১২৫ টাকা। এই টাকাটা মেয়ের বাপ পাবে। কৃষ্ণা হঠাৎ বলল, লোধা মেয়ে হয়ে জন্মালেই ভাল হত। আমি বললাম, কিছু নিয়েছি নাকি আমি? এক পয়সাও ক্যাশ? ফ্রিজ?

কৃষ্ণা আস্তে করে বলে যাচ্ছিল, রিলাকশন...বোম্বে ডাইং...ক্যাসারোল...সোফাসেট... দ্রুত সরে যাচ্ছিল গাছপালা, নদীখাত, মাঠের পাথর।

বাঘমুণ্ডি ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ যাবার পর ডান দিকের একটা সরু রাস্তা দেখিয়ে কেক জিপের পিছন থেকে জানাল ওই পথে ওর গ্রাম। ড্রাইভার নিরঞ্জন গুঁই ওকে বলল এখানে নেমে হেঁটে চলে যেতে। আমি বললাম, তা কী করে হয়? আমি ওদের গ্রামে যাব যে। গুঁইবাবু বলল—যাবে? খুব নোংরা। গাড়ি ডান দিকে ঘুরল। লাল মাটির পথ। একটা দোকানও দেখছি না যে এক প্যাকেট বিস্কুট বা ক'টা টফি কিনে নেব।

খুবলে খাওয়া জঙ্গলে বিক্ষিপ্ত ইউক্যালিপটাস গাছ আর পাথর সাজানো এবড়ো খেবড়ো মাঠ দেখতে দেখতে কুড়ি মিনিট কাটালাম। ড্রাইভার অধৈর্য। বলে, আর কতদূর রে তোতড়া, কেক বলে, হুই দ্যাখা যায়। কিন্তু সামনে তাকিয়ে কোনও গ্রামের চিহ্ন দেখতে পাই না, দেখি জঙ্গল অনেকটা ফাঁকা হয়ে এসেছে, আর ফাঁকে ফাঁকে লাল টুকটুকে এক ধরনের সরু সরু গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ভারী সুন্দর গাছ, পাটগাছের মতো লম্বা, আগাগোড়া লাল এবং ওই গাছগুলিতে ছেয়ে আছে লাল লাল এক ধরনের ছোট ছোট ফল।

কৃষ্ণা, এই গাছের শুকনো ডাল আর ফলগুলো দিয়ে কী রকম ইকেবানা হয়, বলো?

এগুলো কীরে কেক? কী গাছ? কী হয়?

ইসব কুদরুম স্যার। ডাইল কুথা পাবেক গা-গরামের লক? কত দাম। ইগুলার বীজ সিঝা খায়, আর আঁশদড়ি ব্যাচে।

পথের ধারে বিষ্ঠা, তার ভিতরে মরা মরা কৃমি। গ্রাম এসে গেছে। জিপ থামে।

গাছতলায় বেদি। বুঝি এটাই গরাম থান। গ্রামের ভিতরে যাই। ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসছে। ভাঙা ভাঙা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ভাঙা ভাঙা মানুষ, ইশশ, কী দারিদ্র্য, বলো কৃষ্ণা। ওরা জুলজুল চোখে জিপ গাড়ি দেখে, তন্তুজ শাড়ির কলকা কাজ, চটির সোনালি স্ট্র্যাপ, ফটোক্রোমাটিক চশমা।

কেক ছুটে যায়। এটা ওর ভিটে বাড়ি। ওর আত্মীয় পরিজনের কানে কানে কী সব বলে, আমরা উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকি। মুরগির ছানাগুলো আর লোধা গ্রামের ন্যাংটো শিশুরা যে যার মায়ের শরীর

ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের ভিতর থেকে আসে একটা দড়ির খাটিয়া। বসতে বলে। একজন বয়োবৃদ্ধ লোক হাতজোড় করে দাঁড়ায়; বাড়ির কর্তা। একমাত্র ওঁর গায়েই শীতের কিছু রয়েছে—একটা ছেঁড়া কাঁথা।

কার বিয়ে? মেয়েরা হাসাহাসি করে। বয়োবৃদ্ধটি বলে—ওই—উয়ার। লাতনি। আলাদি। বছর বারোর একটি মেয়ে, ইজেরের উপর গামছা জড়ানো, অন্য ছেলেমেয়েরা উদোম গা। যুবতী মেয়েরাও ব্লাউজহীন খাটো শাড়িতে শরীর জড়িয়ে রেখেছে।

একটা সদ্যশিশু স্তন খায়। হাওয়ায় শিরশিরানি। শিশুটির গায়ে কিছু নেই, হাওয়ার কনকনানি লাগলে ওর মা বুকে চেপে ধরে, আঁচলে জড়ায়।

বলি গানটান হোক না, বিয়ের গান।

ওরা হাসাহাসি করে। কেক ওদের কীসব বোঝাল, তারপর কয়েকজন মেয়ে শুরু করল গান। যে শিশুরা মায়ের ওম পাচ্ছিল, এবার ওরা ওই বুড়ো দাদুর গা ঘেঁষল, বুড়োর কাঁথার কাছে। কেউ হাত ঢোকাল কাঁথার ভিতরে।

আমার হাফ সোয়েটার ছিলই, ফুল হাতাটাও পরলে ভাল হত। লজ্জা পাই।

গান শুরু হয়। টেপ রেকর্ডারটা না আনার দুঃখের 'ইশ' ভাব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে গান শুনি—

ঝিকাশুলি মামাঘর কুকুড়া টাঁড় বাপঘর।
হল হল ধনি তর সিরাডহে শ্বশুরঘর।
তাড়ুলে তর মাসিঘর বিড়াশুলি পিসিঘর
হল হল ধনি তর সিরাডহে শুশুরঘর।
বাঘমুণ্ডির হলদ মশলা বড় বড় ধনা গো
দর শুধালে বলে দিব সিরাডহে বর গো।

আর একটা। আর একটা।

জল সাইতে গেলিরে আলাদী জল নাঁহি মিলে সাবন দিঞে গা ধবি আলাদী জল নাঁহি মিলে।

কৃষ্ণার কানে কানে বলি, দ্যাখো, জলের ক্রাইসিসের কথা, মর্মবেদনা, কেমন করে লোকসংগীতে চলে আসে।

জল সাইতে গেলিরে আলাদী জল নাঁহি মিলে এথা কথা জল পাবি শাবন মাস বিনে...

ঘড়ি দেখি। চারটে। বেশ শীত। এবার উঠতে হবে। দশটা টাকা দিই আহ্লাদীর হাতে। আহ্লাদী প্রকৃত অর্থে আহ্লাদী হয়ে যায়।

জিপ পর্যন্ত এগিয়ে আসে কেক, আর ওর পিছন পিছন ন্যাংটো শিশুর দল।

জিপ চলতেই ঠান্ডা আরও বেশি করে বুঝি। ঠান্ডাটা যেন আজই হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি এবার ফুলহাতা সোয়েটারটা চড়িয়ে দিই। কৃষ্ণাকে ব্যাগ থেকে শালটা বার করে গায়ে জড়িয়ে নিতে বলি। ও বলল, ওর উলের ব্লাউজ আছে, আর কিছু লাগবে না। বাসরাস্তায় জিপটা এল। বেশ জোরে চালাচ্ছে ড্রাইভার। পুরুলিয়া থেকে ওকে ফিরতে হবে আবার।

এরকম শর্টট্যুর মন্দ নয়, বলো?

বেশ কাটল, আমি বলি। কৃষ্ণা আরও গা ঘেঁষে বসল। হাতের মুঠোয় নিল আমার হাত। কিন্তু একটু পরেই বুঝলাম এই ঘনিষ্ঠতা ভালবাসার নয়, শীতে ও যখন ব্যাগের চেন টেনে ভিতর থেকে চাদর বের করল।

গতকাল রাতের মহুয়ার পর বমির সামান্য নোংরা চিহ্ন লেগে থাকা চাদর। আমি বলি—ইশ এটা কেন, শাল কোথায়? ও কিছু বলে না। শালটা পরছে না কেন বুঝি না। ওটা আমিই দিয়েছিলাম

জাস্ট শীত পড়তে শুরু করার আগে আগে। আমি ব্যাগ দেখি। কত কী হাবিজাবি। পাতায় মোড়া ওটা কী? সীতার মাথার চুল? শালটা?

শালটা ফেলে এসেছ, তাই না?

ও চুপচাপ। অদ্ভুত। ক্যালাস। দুশো চুরাশি টাকা দাম, জানো? কোথায় ভুলে ফেলে এলে? অযোধ্যা পাহাড়ে?

না।

তবে? তা হলে কি ওই ছেলেটার গ্রামে? ওখানে কি ব্যাগ থেকে বার করেছিলে শালটা?

হ্যাঁ।

তা হলে ওখানেই। ইশ! জিপটা ঘোরাবেন প্লিজ? না থাক। ট্রেন পাব না। কী ক্যালাস তুমি, ছিঃ এরকম ভাবে ভুলে ফেলে এলে?

ফেলে আসিনি।

তবে?

রেখে এসেছি।

মাঠ দাপানো হাওয়া শরীর ফুঁড়ছে। হাওয়ার দংশন। ও চুপচাপ বসে আছে। আহ্লাদী।

ওর চুল উড়ছে। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে যাই ওর কাঁধ। হাত গুটিয়ে নিই। চারিপাশে ছড়ানো পাথর। পাথরের সঙ্গেও আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা ছিল।

কথা রেখে আসি।

শারদীয় বর্তমান, ১৯৯২

পূর্বজন্মের ভাই

তান্ত্রিকাচার্য পণ্ডিত শ্রীবামাভূষণ চক্রবর্তী তান্ত্রিক উপায়ে সর্বরোগের উপশম করেন। মোকদ্দমায় জয়, পরীক্ষাপাশ, সুপাত্রে বিবাহ ইত্যাদির জন্য পরামাশ্চর্য 'কামদা কবচ'। নির্বাচন জয়লাভ, দৈবধনপ্রাপ্তি, পুত্রসন্তানলাভ, লটারির পুরস্কারলাভ ইত্যাদির জন্য 'স্পেশাল কামদা কবচ'। মনোমতো পুরুষ বা নারী যেই হউক না কেন, বশীভূত করিবার জন্য 'বগলামুখী কবচ', কোষ্ঠি-বিচার, যোটকবিচার, ভবিষ্যত-গণনা ইত্যাদি কার্য মহাকালীপ্রদত্ত আশ্চর্য শক্তিবলে হইয়া থাকে। শত্রুবিনাশ, নজর-লাগার প্রতিবিধান, গোপন ব্যাধির প্রতিকার হইয়া থাকে। ডি এম সাহেব মাননীয় এম এল, মুন্সেফ, যাত্রাজগতের পবনকুমার ও ঝর্ণাকুমারী, বনগ্রাম বার্তার সম্পাদক রমণীমোহন মণ্ডল এম এ সাহিত্যতীর্থ, হাইকোর্টের জজ বি সি ঘোষ, সিবিল সার্জন মি. এম এম কাঞ্জিলাল এন বি এম আর সি পি ও আরও বহু গণ্যমান ব্যক্তি-কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত।

—ভক্তবৃন্দকর্তৃক প্রচারিত।

এই হ্যান্ডবিলগুলো ঠাকুরনগরের হাটে বিলি করে নকুল। 'মাসিক বন্ধ? ভয় কী? পাঁচ মিনিটেই আরোগ্য।'—এই পোস্টারের ওপর ওই হ্যান্ডবিল আঠা দিয়ে মেরে দেয়। 'স্বপ্না সিনেমায় চলিতেছে পিস্তলওয়ালী—পরবর্তী আকর্ষণ সতীসাবিত্রী'—এই পোস্টারের চারপাশেও নকুল হ্যান্ডবিল মারে । কর্তামশাইয়ের শিষ্য নটবর হয়তো কালই আসবে, তত্ত্বতালাশ করে যাবে। নিকেশ নেবে।—কীরে নকুল, ফাঁকিবাজি শিখেছিস?—ভজার চায়ের দোকানে এত কম মেরেছিস কেন? সারের দোকানে একটাও দেখলাম না যে!

'হৈমপতি' ডাক্তারখানায় মারবে বলে নটবর যতবারই মারতে গেছে বুড়ো ডাক্তার খেঁকিয়ে উঠেছে। সামনের রুগিদের বলে—মাদুলিতেই যদি সব হবে তো আগের হাটে কর্তামশাই এখান থেকে পালসেটিলা কিনে নিয়ে গেল কেন?

হাটের কাজ সেরে, সন্ধের আগে-আগেই রিকশায় বেল মারতে মারতে ফিরে আসে নকুল। রিকশার নাম 'মায়ের খেলা'। 'ভাড়ার জন্য নহে'—বামাভূষণের প্রাইভেট রিকশা। ডবল আয়না ফিট করা। বেলও আছে , রবারের হর্নও আছে। কর্তাবাবুরাই এই রিকশা চড়েন। নকুল এদের বিশ্বাসের পাইলট।

কর্তাবাবু কাল ভোরের ট্রেনে কলকাতা যাত্রা করবেন । বড়মেয়েটির সন্তান হয়েছে—এগারো দিন হল। যাই যাই করে যাওয়া হচ্ছে না। একদিন চেম্বার কামাই মানে কত লোকসান। উকিল, ব্যারিস্টার আর ডাক্তার-জ্যোতিষী-তান্ত্রিকদের হল এই এক মহা ফ্যাচাং। বামাভূষণ চক্রবর্তীমশাই ভাত খাবার পর বজ্রাসনে বসেছেন। ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী চিত্রা নাড়িতে ঘেরণ্ড সংহিতা মতে বায়ু প্রশমিত করতে করতে ছোটমেয়ে মাধুরীকে বললেন ফর্দটা পড়ো তো মা—

মাধুরী পড়তে থাকে—

রুদ্রাক্ষ—২০০;

হরীতকী—২ কেজি;

চকখড়ি, খাম

নাক্স ভোমিকা—২০০;

থুজা—২০০; অজিনা মটো

ওটা কী বললি মা, অজীর্ণের মতো!

বড় স্টেশনারি দোকানে অজিনা মটো পাওয়া যায়, বইতে লিখেছে।

এই বইটা প্রেজেন্ট পেয়েছে মাধুরী। রকমারি জলখাবার ও চাইনিজ রান্না—প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ, বিশ্বাসদা।

বিশ্বাসদা হলেন জে এল আর ও। কর্তামশাইয়ের সাথে ভারী ভাব ওনার। কর্তামশাইয়ের ছত্রিশ বিঘা জমিতে বর্গা রেকর্ড হতে পারত, বিশ্বাসবাবু করেননি। এটা কি কম উপকার! এই রান্নার বইটা উপহার দিয়ে বিশ্বাসবাবু মাধুরীকে বলেছে—বাড়িতে এলে আর মোয়া নাড়ু ছানা ক্ষীর নয়। চাইনিজ প্রিপারেশন খাওয়াতে হবে। ওইসব আজব মশলাপাতি শহর ছাড়া মেলে না।

লিস্টি পড়ে যায় মাধুরী—

চিলি স্‌স্‌ সয়া সস ২ শিশি করে;

এগ নুডুলস চারশো গ্রাম;

হাওয়াই চটির ফিতে এক জোড়া;

কালো সুতা ২০ গজ;

তামার মাদুলি—২০০;

আর পদ্যগুলো বাঁধিয়ে আনবে মনে করে।

এই পদ্যদুটো হালে লিখেছেন শ্রীবামাভূষণ চক্রবর্তী। কিছুদিন আগে তাদের গ্রামের উপর দিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে যায়। প্রচুর ঘরবাড়ি নষ্ট হয়। ওই ঝড় তাকে এই পদ্য লেখার অনুপ্রেরণা দেয়।

বন্যা খরা ঝড়ে
পাপী তাপী মরে
বাঁচিবার উপায় শুধু একটি আছে ভাই,
দেবদ্বিজে নতুন করে ভক্তি আনা চাই।

অপর পদ্যটা হল—

আধি ব্যাধি রোগ শোক সবই গ্রহের ফল
গ্রহশান্তি হলে হয় জীবন সফল।

বামাভূষণের বালবিধবা বোন কাপড়ের মধ্যে সুতো বুনে এইসব এমব্রোডায়রি করেছেন। অক্ষরগুলো সব আলাদা আলাদা রঙের। কর্তাবাবুর বারান্দায় যেখানে লোকজন এসে বসেন সেখানে দেয়াল জুড়ে এরকম অনেক কাচবাঁধানো পদ্য আছে।

ভোরের ট্রেনে যাত্রা, নকুল খুব ভোরে এসে হাজির। ওর পা শিশিরে ভিজেছে, পায়ের আঙুলে হাজাঘায়ের ফাঁকে দু-একটা ছেঁড়া দুর্বা-ঘাস, পা চালিয়ে এসেছে তো। নকুল 'মায়ের খেলা'র লাল সিটের শিশির গামছা দিয়ে মুছে গাড়ি রেডি করল। কর্তামশাই কোষ্ঠিবিচারের শ্লেটটাতে চকখড়ি দিয়ে লিখলেন—'তান্ত্রিকাচার্য আগামী রবিবার আসিবেন।' শ্লেটটা বারান্দায় ঝুলিয়ে রিকশায় উঠলেন। মাধুরী আর বিধবা বোন দুর্গা দুর্গা করল। কর্তাবাবুর স্ত্রী থাকলে, আহা, তিনিও থাকতেন। রিকশায় এঁরা বাজারহাট যান, গণ্যমান্য লোকজন, যেমন পঞ্চায়েতপ্রধান, কালাচাঁদ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক, গোবরডাঙার জমিদারবাড়ির মেয়ে বাংলার হেলেন মিস কিটি, এঁনারা তাবিজ মাদুলি নিতে এলে ফেরার সময় নকুলই রিকশা করে স্টেশনে পৌঁছে দেয়। জে এল আর ও সাহেব মাঝে মাঝে আসেন, তেঁনাকেও নকুল পৌঁছে দেয়। সে যাই হোক।— সাবধানে থাকিস নকুল, বাড়িঘর তোর জিম্মায় রেখে গেলাম। গাড়িটা নিয়ে মাতব্বরি করিস না, দিদিমণি যা বলবে তাই শুনবি। পিছনের সিটে বসে চক্রবর্তীমশাই এইসব বলেন।

প্রাতঃকাল। শিশিরের সোহাগ রাত সারারাত পেয়েছে কাঁচা রাস্তা, তাই সাইকেল টায়ারের আলপনা রাস্তার গায়ে। পাতলা ছানির মতো পাতলা কুয়াশার আস্তরণ কেটে যাচ্ছে। স্থলপদ্মের মতো ফুটে উঠেছে গোটা চরাচর। সূর্যের আলো ডিম ফেটে সদ্য বেরিয়ে আসা নরম রোঁয়ার মুরগির ছানার মতো।

নকুল এসময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—

আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, আপনি কি ধ্যানযোগে বলতি পারবেন পূর্বজন্মে আমি কী ছিলাম ?

কেন বল দেখি,

না, জানতি ইচ্ছে করে।

পারি বইকী, পারি , মায়ের ইচ্ছে হলি মাঝে মাঝে সব বুঝতি পারি।

একবার ধ্যানযোগে বলি দেবেন তো কর্তা—। বড় জানতি সাধ যায়।

পথে জে এল আর ও সাহেব চলেছেন হেঁটে হেঁটে। শুধোলে উনি জানান, ভোরের ট্রেনে এনকোয়ারিতে চলেছেন; তবে তো কথাই নেই, রিকশায় ওঠা হোক। কলকাতায় যাচ্ছি, রবিবারে আসব, কিছু আনতে হবে নাকি স্যার?

লিস্টিতে তামার মাদুলির পরে যোগ হয় জেলুসিল ট্যাবলেট আর দাড়ি কামাবার ক্রিম।

—একটা সুসংবাদ আছে, আমি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি, জে এল আর ও সাহেব বললেন।

সেকী? কবে? কত বড় দুঃসংবাদ। মহাচিন্তা এবং উদ্বেগের কারণ হল।

চিন্তার কোনও ব্যাপার নেই. আপনার সব কাজ তো করেই দিয়েছি। রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি আপনার কোনও বর্গাচাষ নেই। পাম্পটা যাতে কুচকে মৌজার ৫৭ দাগের উপর বসে, সেরকম সুপারিশ করেছি। দেবোত্তর সম্পত্তিটা নিয়েও কোনও ঝামেলা রাখিনি।

সবই স্যার আপনার ইচ্ছা আর মায়ের দয়া।

নকুল ক'টা দিন অন্য মেজাজে থাকে। কাজ তেমন নেই। মায়ের খেলাটা করবী গাছের ছায়ায় রেখে দেয়। কখনও লাল সিটে বসে থাকলে, করবী গাছটা থেকে টুপ করে একটা করবী ফল খসে পড়লে নকুলের সাইকেলের ঘণ্টি টিং বেজে ওঠে।

তবে এরকম রাজার হালে সময় কাটানোর ফাঁক খুব বেশি পায় না নকুল। ফাইফরমাশ খাটতে হয়, জঙ্গল নিড়ানো, বেড়া দেওয়া এইসব। এ ছাড়া লোকজন এলে কর্তামশায়ের আসবার তারিখ বলে দেয়। ফিচলে ছোঁড়ারা মায়ের খেলার হর্ন টিপে পালালে নকুল মুখ খিস্তি দেয়—যাও না, বাপেরটা টেপো গে। খিস্তির লোভে ছোঁড়াগুলো বার বার হর্ন টিপে জ্বালাতন করে।

মাঠাকরুন স্বর্গে যাবার মাস দুয়েক আগে লাগিয়েছিলেন এই বাতাবিলেবুর গাছটা। নকুল বেড়া দিয়ে গাছটা রক্ষা করেছে। গাছেরা নকুল বুনোর জল নেয়, সেই জলে কচি পাতা হয়, ফুল হয়, সেই ফুল দেবতার প্রসাদে লাগে, ভগবান খায়। কিন্তু নকুলের ছোঁয়া জল কর্তামশাই খান না। নকুলের আনা জলে পা ধোয়া চলে। কিন্তু খাওয়া চলে না। নকুল গাছ থেকে ডাব পাড়লে ভক্ত শিষ্যদের সামনে কর্তামশাই মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে তবে খান। কর্তামশাই এত এত আচারবিচার মানেন বলেই না তাঁর এত শক্তি! তাঁর ফুঁ দেওয়া জলে আধি-ব্যাধি আরাম হয়।

দিদিমণি আজ নকুলকে বিকেল বিকেল ছুটি দিয়ে দিল। নকুল ছিপে কেঁচোর টোপ দিয়ে রেল লাইনের ধারের ঝিলে বসতেই একটা শোলমাছ খপাং। খাবে না বেচবে ভাবতে ভাবতে এগুচ্ছে, এমন সময় ইস্টিশনের টিকিটবাবুর সঙ্গে দেখা। মাছটা দেখেই টিকিটবাবু বললেন—বেচবি নাকি?

হাতের লক্ষ্মী হেলা করতে নেই, বলল—বেচব। টিকিটবাবু দু'টাকার দুটো নোট নকুলের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—তবে দে।

শিক্ষিত লোকের এই বিচার। বাজারে দশ টাকার কমে পাবে! নকুলের হাত মাছটাকে ঢিলে করে না।

কীরে দিবি নে?

ধরেছি যে, আট টাকা লাগবে।

মাছ তো আর আচার্যমশাইয়ের শিষ্য নয় যে নিজে থেকে ধরা দেবে, ধরতে হয়। ধরতে তো পয়সা লাগে না, পাঁচ টাকা নিস।

নকুল মাছটা দিয়ে দেয়।—'বাকি টাকাটা এখন নেই, কাল নিয়ে যাস।'

বারো আনার টিকিট বাইরের লোকের কাছে দেড় টাকায় কিনে নকুল দেখল জয় বাবা তারকনাথ। ভাবল যতই উড়োজাহাজ আকাশ ফালা ফালা করে উড়ুক কলের গান রেডিয়োর গান চালাক, যতই কলিকাল আসুক, ভগবানের মাহাত্ম্যে মানুষ হাত দিতি পারবে না। সিনেমা হলের পিছনে ফটিক সাহার দোকানে দু' গ্লাস বাংলা খেল, তারপর ঘরে ফেরার পথে বাতাসে পেল আমের মুকুলের গন্ধ।

ঘরে ফিরতে একটু রাত। বউকে সোহাগ করতে গিয়ে কাপড়ে পেঁয়াজের গন্ধ পায়।

কী রেঁধেছিস?

শুকনো মাছ, নংকা—প্যাঁজ দে।

জিভে জল আসে নকুলের। বলে—বাঃ।

আর ওমনি বাঃ শব্দটা নকুলের বউয়ের কানের লতিতে প্লাসটিকের দুল হয়ে নড়ে।

নকুলের বউ বলল—চাঁদের মাথাটা কেমন ফালি করে খাওয়া, তারপর ধরো আম-বকুলের সুবাস, এইসব দেখেশুনে আমার কেমন কেমন লাগল,—মাস্টারবাড়ি শুধোলাম,—আজ মাসের কত গো—বলে এগারো,—যা ভেবেছি সেই, আমাদের বিয়ের দিন। হাসে। হাসির শব্দটা জ্যোৎস্নায় গিয়ে মেশে। এবার নকুল পুকুরে গিয়ে মুখটা কুলকুচি করে মদের গন্ধ ধোয়, পেয়ারাপাতা চিবোয় তারপর ওকে চুমু খায়, বউয়ের আঙুলের নখকুনির পুঁজরক্ত নকুলের হাতে লাগে।

নকুল কড়া করে রান্নাকরা শুকনো মাছের তরকারি খেতে খেতে একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—আজ, জানলি তোরে রিকশা চড়াব। তুই জানলি, লাল সিটখানায় ঠ্যাং তুলে বসে থাকবি, আমি কুচকে ছাইড়ে, সুটেবাসা ছাইড়ে গোকুলি নদীর পাড় পর্যন্ত নে যাব। লাইলন মশারি দেখেছিস না বাবুদের বাড়ি, চাঁদের আলো দেখবি নাইলন মশারির মতো বিছোয়েছেন ভগবান পিরথিবীটার উপরে, আর ফুল নিয়ি আসব বাগান থে। গন্ধরাজ ফুল মাদুরে বিছিয়ে আজ শোব, ফুলশয্যা হবে। মদ খেয়েছি বলে রাগ করিসনি।

অনেক রাতে নকুল কর্তামশাইয়ের বাড়ির দিকে যায়। ঠাকুরঘরের পিছনের নিস্তব্ধ বাগান থেকে গন্ধরাজ আর কাঠচাঁপা তুলতে গিয়ে টের পায়, ঠাকুরঘরের ভিতর থেকে মানুষের গভীর নিশ্বাসের শব্দ। কান খাড়া করে শোনে। গোঙানির মতো মেয়েছেলের আওয়াজ। জানালা বন্ধ। ঠিক গোঙানি নয়, এ শব্দ অন্য রকমের, এ শব্দ শুনলে মন ঠিক থাকে না। নকুল জানালার উইপোকা খাওয়া ফোকরে চোখ রাখে। প্রদীপ জ্বলছে। ঘরে সামান্য একটু অংশ দেখা যাচ্ছে, একটা বালাপরা হাতের ওপর একটা ঘড়িপরা হাত। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। দরজা বন্ধ। দরজার গোড়ায় একজোড়া জুতো। অন্য জানলায় যায়। উই-নষ্টকরা গর্তে চোখ রাখে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নেয়। কী দেখল! ছিঃ! চোখের মাথা পড়ে যাবে না তো। নকুলের কোঁচর থেকে গন্ধরাজ ফুল পড়ে যায়। ওর কী করা উচিত এখন? কর্তামশাই মা-মরা মেয়ের জন্য পাত্র দেখছেন। বিশ্বাস সাহেবের সাথে তো আর বে হবে না, সাহেব তো আর বামুন নয়। নকুল কী করবে—লোকটাকে প্যাঁদাবে?—কিন্তু গাই-বাছুরে ভাব না থাকলে...

রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরায় নকুল—এমন সময় টর্চের আলো।—কে? না—কর্তামশাই। এত রেতে? কর্তামশাই বললেন—কলকাতার কাজ হয়ে গেল, একদিন আগেই ফিরে এলাম। ঠাকুরনগর স্টেশনে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল ট্রেন। কী—না তার চুরি গেছে। রাত আটটা-ন'টায় তার চুরি যেতে পারে? অ্যাঁ? চোরেদের এত সাহস?

গাইবাছুরে ভাব না থাকলে...

নকুল নিজের মুখে আঙুল দেয়। চুপ।

কেন রে?—গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। নকুল কিছু বলে না, বলতে পারে না।

চাঁদের আলোয় নিজেদের ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে—আমার জিম্মায় ঘরদোর দিয়ে গেছিলেন কর্তামশাই। কিন্তুক...

চুরি? চুরি হয়েছে?

ঠাকুঘরের সামনে 'জেলারো' সাহেবের জুতোজোড়া, ভিতরে তিনি—আর...আর?

নকুল কিছু বলে না। ঠাকুরঘরের ওই জানলার দিকে এগোয়। ঝিঁঝির ডাক একশো গুণ বেশি হয় চারিপাশে। কর্তামশাই নকুলের পিছনে, নকুল যেন রথের মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে কর্তামশাইকে। অম্বলের টক বমির মতো চাঁদের আলো! নকুল ওই জানালার সামনে এসে থামে। কর্তামশাই জানালার ফাঁকে চোখ রাখে তারপরই—বসে পড়ে।

নকুল, বুনো নকুল, যার ছোঁয়া জল ফেলে দিতে হয়, সেই নকুলের হাজা আর কাদায় মাখানো পা দুটো চেপে ধরে হাউ হাউ করে ডুকরে ওঠেন কর্তামশাই। বলেন, কাউকে বলিস না, নকুল আমার দিব্যি। পূর্বজন্মে তুই আমার ভাই ছিলি। আমার মুখ রক্ষা কর নকুল। নকুল সরিয়ে নেয় পা, কর্তামশাই নকুলের হাত ধরে ফিসফিস করে—বউকেও বলিসনি নকুল, তুই আমার পূর্বজন্মের ভাই, মা-মরা মেয়েটার জন্য সদ্বংশের ব্যাংকে কাজ করা ব্রাহ্মণ পাত্র দেখে এসেছি। দু'কান করিসনি নকুল।

নকুল বলে, অধৈর্য হন কেন কর্তা, আপনি কত কী জানেন—ওই বদমাইশটারে বান মেরে দেন; মুখি রক্ত উঠে মরুক, খিলেন করি দেন,—হাত পা শক্ত হয়ে যাক।

কর্তামশাই কী বিড়বিড় করে—বোঝা যায় না।

নকুল বলে, কর্তা, পূর্বজন্মে যদি আপনার ভাই হয়ে থাকি, তবে হুকুম করেন কর্তা, ওই বদমাইশটারে প্যাঁদাই। আমি নকুল। বুনো নকুল। ভয় পাই না।

কর্তামশাই বলেন—ছত্রিশ বিঘা জমি বর্গা রে নকুল, দেবোত্তর সম্পত্তি, ডিপ টিউবয়েল। মাথা ঠান্ডা রাখরে নকুল, পূর্বজন্মে ভাই ছিলি তুই, কথা দে।

নকুল মাথা ঠান্ডা করে। ঠান্ডা মাথায় জিজ্ঞাসা করে—তবে কি কর্তামশাই আপনার খিলেন, মারণ, বশীকরণ সবই মিছা?

কর্তামশাই বলেন, ওসব প্যাচালি এখন রাখরে নকুল, টিউকলে একটু পাম্প দে, জল খাব।

চাঁদের আলোয় নকুল দেখে কর্তামশাইয়ের কপালে ঘামের কুচো-কুচো ফোঁটা, নকুলের সাহস বাড়ে, নকুল নিজের গামছাটা দিয়ে কর্তামশাইয়ের ঘাম মুছিয়ে দেয়, কচুপাতা মুড়ে জল এনে একঢোঁক খাইয়ে দেয়, নকুলের সাহস বাড়ে। নকুল কর্তামশাইয়ের কানের কাছে মুখ নেয়। নকুল শাস্ত্রকথা বলে। বলে, দুঃখ ছাড়ি দেন কর্তা, সবই কলির খেলা, আরও কত কী দেকবেন। কর্তাবাবা জামরুল গাছে হেলান দিয়ে বসে আছেন। নকুল হাঁটুমুড়ে সামনে বসে। নকুলের সাহস বাড়ে। নকুল বলে, একটা রিকশা আমারে করি দেন কর্তা, নিজের রিকশা, সওয়ারি নেব, ম্যাজাজ ভাল না থাকলে আচ্ছা আচ্ছা বাবুদের মুখের উপর কয়ে দেব—এখন ভাড়া যাবনি, একটা রিকশার মালিক করে দ্যান কর্তা, ঠ্যাং তুলে বাজারের শিরিষতলায় বসে থাকব, আপনার 'মায়ের খেলার' জন্য ভাল লোক দেখে দেবনে...কর্তামশাই নকুলের গায়ে হাত দিলেন। বলেন, দেব। মাধুরীর বিয়েটা হলেই দেব।

কর্তামশাই আরও ঘনিষ্ঠ হলেন। নকুলের কানে কানে বলেন—আমি থাকলে গর্ভস্রাবটা লজ্জায় বের হবে না। তুই রিকশা নিয়ে এখানে বসে থাক, পাষণ্ডটা বের হলেই ওকে পৌঁছে দিস। যেন অসুবিধা না হয়। নকুলের মাথায় বিলি কেটে দেন কর্তামশাই—দু'কান করিসনে নকুল, আমি কথা দিলাম রিকশা করে দেব, তুই বটবৃক্ষ সাক্ষী রেখে কথা দে নকুল...।

প্রমা, ১৯৮৪

দুলালচাঁদ

দয়াময়ের দু'হাতে অনেক মাদুলি, হাঁটুর চারপাশে খোসপাঁচড়া। পাঁচড়া চুলকোলে মাদুলি বাজে ঝনঝন।

মায়ের সঙ্গে এসেছে সতীমায়ের থানে। এই আজকের দিনে মায়ের উত্থান। পরব মেলা, ফুলুরি মণ্ডা জিলিবি আর নাগরদোলা, আর বেলুনবাঁশি।

মা সেই আমগাছটা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ঘোষপাড়ার এই মাঠে কর্তাভজারা আমগাছ লাগায়। সেইসব আমগাছের তলায় মেলার সময় আসন করা হয়, সাধনভজন, ভাবের গান হয়।

পূর্বপুরুষ যে গাছটা লাগিয়েছিলেন সে গাছতলায় আসন হয়েছিল আট বছর আগে। দয়াময় তখন খুব ছোট। সেই গাছটা কই?

'হদিশ করতি পারতেছিনিরে দয়া, গাছের গায়ে কুড়ুলের তিনটি ঢ্যাড়া ছিল।'

দয়াময়ের বাঁ হাতের চেটো শুকনো। শিকনির কারণে খড়খড়ে, সেই হাতে চোখের উপর রেখে সুয্যি আড়াল করে গাছের গায়ে চিহ্ন দেখতে থাকে। আমের বকুল ফুঁড়ে ফেড়ে—গুড়গুড়ি ফুলকচি আম, কী মজা! পাখির বাসা, কাঠবেড়ালি—এইসব।

মা এমন সময় চিল্লেন দিয়ে বলে, 'গাছটা পেয়েছিরে দয়া,'...

ধপ করে কোলের বাচ্চাকে ভুঁয়ে ফেলে গড় হয় ময়নামতী।পরিপূর্ণ গড় হলে পেটে লাগে, কারণ পেটে বড় হচ্ছে আরেকটা।

দয়াময় চিহ্ন দেখতে গিয়ে দেখল—তিনটে কাটা দাগ, ক্লাস থ্রির দরমার বেড়ায় আলকাতরা মেরে তিনটে দাঁড়ি যেমন, আর দেখল টিনের পাত—'গর্ভপাতে হোমিও ডোজ। ডা. মণ্ডল, কাঁচড়াপাড়া।' গাছের গায়ে সাঁটা।

ময়নামতী লাল পাড়ের দড়িতে ঢিল বেঁধে দয়াময়কে দিল। দয়াময় ফড়ফড়িয়ে মগডালে উঠে দেখল—দুলালচাঁদের মন্দিরের লাল নিশেন সতীমায়ের ডালিম গাছ, পাঁপড়ওলা, জিলিপিওলা।

পাতার ঠান্ডা আরাম গালে গলায় লাগিয়ে দয়াময় যখন ঢিল বাঁধছিল, মা তখন গাছতলায় চোখ বুজে জোড় হাত করে কীসের বিড়বিড় করছে দয়াময় জানে। 'হে সাঁই, হে দুলালচাঁদ। হে ছিরি গৌরাঙ্গ—দয়ার বাপডারে কোথায় নুইকে রেখিচ? তেনারে ফিরি এনি দ্যাও।'

গাছ থেকে নেমে এসে দয়াময় বলল, 'ক'টা পয়সা দিবিনে মা, ঢিল বেঁধে এলাম, জিলিপির পয়সা দিবিনে মা?'

জিলিপি হাতে নিয়ে দয়াময়ের শালিখের মতো পা।

হরে কিষ্ণ বাবাজী
দশ পয়সার জিলেবী
জিলেবী খেতে মিষ্ট
পয়সা দিতে কষ্ট।

ময়নামতী ভাবের গীত গাইছিল। একজন লোক ওদের কাছে এসে শুধোল—'কোন তরফের বরাতি?'

ময়নামতী বলল—'খেলারাম গুরুর মেজো তরফের।' লোকটা বলল, 'তবে আমিই তোমাদের মহাশয় হই।' লোকটা বলল—'চলোগো—গুরু থানে লিয়ে যাই।'

ময়নামতী লোকটার দিকে চেয়ে বলল—'তিনি তো এমনি পানা নয়, মোদের মহাশয় ছ্যালো প্যাংপ্যাঙে, মুখি মায়ের দয়ার চিন্ন।'

লোকটা তখন দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল—'তিনিই আমার পিতৃদেব ছিলেন।' হাতের ব্যাগের থেকে বের করল একটা বাঁধানো ছবি।

'এনাকে চিনছ গো মা?'

ময়নামতী ছবিকে পেন্নাম করল।

লোকটা আরেকটা বাঁধানো ছবি বের করল।

'এই যে গো, আমার পিতার পদচিন্ন।' ময়নামতী দয়াকে বলল, 'আরে এই ছিমড়ে পেন্নাম কর।'

'অদ্যাবধি নিত্যলীলা করে গোরারায়।
ভাগ্যবান সেই যেই দেখিবারে পায় ॥
চৈতন্যের নিরুপণ পাইবে স্বভাবে।...

'বুঝলে গো দিদি, আমাদের খেলারাম গুরুর মধ্যে ছিল সাক্ষাৎ চৈতন্যের অংশ যা-তা গুরু তোমায় নয় তো মা,

'খেলারাম ভোলানাড়া কিনু ব্রহ্মহরি।
দেদোকৃষ্ণ দোগাকৃষ্ণ বিশু পাঁচকড়ি ॥
হটুঘোষ গোবিন্দ নয়ান লক্ষ্মীকান্ত।
ইহারাই হরিপ্রেম অতিশয় শান্ত ॥'

লম্বা দাওয়া। বাবুদের বারান্দায় সারবন্দি ফুলের টবের মতো গুরুরা বসে আছেন। মহাশয় একজন গুরুর কাছে এসে থামলেন, তাই দয়ার মা-ও থামল। আধো চোখ খোলা, মুখে আবির, স্মিতহাস্য, গলায় কাশীগ্যাঁদার মালা, সামনে থালায় টাকা পয়সা, রেকাবিতে আবির।

একমুঠো আবির নিয়ে গুরুপদে রাখেন দয়ার মা। সেই পা ছোঁয়ানো আবির নিজের মাথায় দিল, দয়াময়ের মাথায় দিল। আস্তে আস্তে বলল, খেয়েপরে গায়েগতরে থাকিস যেন গুরু দয়ায়।

গুরু নড়েচড়ে বসলেন। লুঙ্গির মতো করে পরা কাছাহীন কাপড়ের গিঁটে হাত দিলেন—এবং এ মুহূর্তের প্রয়োজনীয় কাজটি সারলেন—গিঁট বাঁধলেন। এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'ছেলেকে মন্তর লেয়াবি?' ময়নামতী বলল, 'ছেল্যা এখনও বুঝের হয়নি বাবা, ছিমড়ে বড্ড ফড়ফড়ে।'

গুরুর দুই হাত অসমান উচ্চতার দুই মাথার উপর নিবদ্ধ। 'স্থির মতি হ, ভক্তিমান হ, ভক্তিবতী হ।' রেকাবিতে কয়েকটি ঠং ঠং ঠং।

ময়নামতী পায়ের আবির নেয় পুনরায়। আর বলে, 'আমার ওঁনারে ফিরি আসবার আশীর্বাদ দেন কর্তা।'

কর্তা কপাল কুঁচকে বলল—'অ্যাঁ?'

তখন ময়নামতী মেলার কলকোলাহল, বেলুনবাঁশি, মাইকের গান, ইত্যাদির শব্দের পরিমণ্ডলের মধ্যে গলা উঁচিয়ে বলল—'আমার উনি...'

আর 'আমার উনি' শব্দটা কলকাকলিময় দ্রুত ঘুরপাক খাওয়া নাগরদোলার মতো চরাচর জুড়ে ঘুরপাক খায়, সেই অবস্থায় বলে—যেন ফিরি আসেন গ বাবা, আমি পাপিষ্টা...

মেলাতে সমস্ত বেলুনবাঁশির শব্দ, সমস্ত ভিখমাঙ্গাদের আকুলি-বিকুলি, মেলার সমস্ত এঁটো শালপাতাদের পড়ে থাকার কষ্ট এক সঙ্গে জড়ো হল ওর গলায়।

বিয়ের ক'দিন পরে আলতা পরাবার সময় ওর বড়জা বলেছিল, সে কী লো, তুই যে দেখি

খড়মঠেঙি। খড়মঠেঙিরা বড় ভাতারখাগী হয়। তার পরবর্তীকালে ঝগড়াঝাঁটির গালিগালাজের মধ্যে পোড়ামুখী বারোভাতারির সঙ্গে খড়মঠেঙি কথাটাও শুনতে হয়েছে বহুবার।

বামুনবাড়ির পাঁচিলে ঘুঁটে দিতে গেলে বামুনগিন্নি নিকেশ নিয়েছিলেন—কী লো, সোয়ামি এল? ময়নামতী মাথা নাড়লে বাবুগিন্নি বলেছিলেন—কী করে সোয়ামি রাখবি, তুই যে খড়মপেয়ে। তখন ইচ্ছে করে না, পা দুটো খচখচ করে কেটে ফেলতে? লাজের কলঙ্ক। অলক্ষ্মী, অপয়া।

দেয়াল হেনস্তা হয় বলে, শুকোলে কয়েক গণ্ডা ঘুঁটে ময়নামতী বামুনবাড়িতে বিনি মাগনায় দিয়ে আসে। একদিন বামুনগিন্নি বললেন—তাঁর মামাশ্বশুর এয়েচেন, গনকঠাকুর তিনি। দয়ার মা ঘোমটা টেনে গাগতর মুড়ে, ঠাকুরমশাইয়ের কথামতো মেঝেতে খড়ির ছককাটার একটা ঘরে নখকুনিওলা আঙুলটা রাখলে, গণকঠাকুর নাকের থেকে বের করা ছোট বুটলিটা ফেলে দিয়ে বলেছিলেন—'পশ্চিমে গেছে।'

পশ্চিম? দয়ার মা ভেবেছিল—গাঁয়ের পশ্চিমের পাকুড়গাছ ছাড়িয়ে শ্মশান, আরও পশ্চিমে কুড়মুনচণ্ডীর বিল, বিলের ওপারে কালিকাপুরের গাছ-গাছালির রেখা, তার পশ্চিমে সুয্যিদেব ডুবছেন। সেটাই কি শেষ পশ্চিম?—

গণকবামুন শুধোলেন, 'যাবার আগে ঝগড়া হয়েছিল নাকি!'

দয়ার মা কিছু বলে না। হিঙ্গলগঞ্জের ভেড়িতে নাগাড়ে পাঁচ মাস কাজ করার পর যখন ফিরে এলেন উনি, ময়নামতীর তখন গা বমি গা বমি। গালে করমচা রাখলে ভাল। দয়ার বাপ ছেনাল হলে, সোহাগের রকম সকম বাড়ালে ময়নামতী বলেছিল, 'এট্টু সামলে, পেটে আছে একটা।'

ঝাঁকি দিয়ে উঠল দয়ার বাপ, যেন গরম আঙার লেগেছে গায়ে। জলের ঘট হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

বলল, 'এবার কী গড়িয়েছিস, নত না দুল?'

ময়নামতী ডুকরে কেঁদে উঠল। 'বিশ্বেস করো, তুমি যাবার পরেই মাসিক বন্ধ হয়েছে, কালীর কিরে।'

দয়ার বাপ বলল—'আম্বলীমাসিকে খপর করি, দেখুক।' ইঙ্গিত বুঝতে পারে ময়নামতী। ভয় পায়। ছ'মাসের গবভো খসানোর ঝক্কি সে জানে। হামিদাবিবি সেদিন মরল ছ'মাসের গবভো নষ্ট করতে গিয়ে।

আধপেটা খেয়ে, মুখের ঘা, পায়ের হাজা, আঙুলের নখকুনি নিয়েও ময়নামতীর কী ভাল যে লাগে পিরথিমিটার বর্ষা—তখন কলমিলতার ডাঁটিগুলোয় জিনপরি ভর করে, তখন ওরা কেবলই হা-হা করে হাসে, ব্যাঙেরা পরবের বাজনদার হয়, কিংবা চিতেগাছের বেড়ায় কখন হঠাৎ এসে যায় লাল লাল ফুল, এক সময় খেজুরগাছেও রস আসে, এইসব কিছু, এই মাঠ দাপিয়ে আসা হাওয়া, খেজুররসের গন্ধ, কানেহাঁটা কই, হঠাৎ পাওয়া কাঁকড়া এইসব কিছুর পিরথিমিটাতে কী আহ্লাদ, মরার কথা ভাবলেই প্রাণটা শামুকমাংসের মতো ছোট হয়ে যায়। ও রাজি হয়নি।

দয়ার বাপ বলেছিল—তবে দয়াময়কে এবার লিয়ে যাব। হিঙ্গলগঞ্জের চায়ের দোকানে দিয়ে দুব। ওর রোজগারে ও খাবে তবে।

সে কী কথা, দয়াময়, হাড্ডিসার কচি, কাঁকাল দেখা যায়, পেটভত্তি কিরমি, পির ফকিরের মাদুলিতে বেঁচে আছে, ওকে ছাড়তে পারবনি।

এ নিয়ে ঝগড়া চলল ক'দিন। তারপর একদিন ভোরবেলায় 'এই সোংসারের সোগা মারি' বলে চলে গেল।

এইসব কথা তো ঠাকুরমশাইকে বলা যায় না। তাই দয়ার মা বলল, 'সোয়ামি-স্তির ঝগড়া হত বইকী। তা এখন ইনি যেথায় আছেন, কেমন আছেন ঠাকুরমশাই।'

একটা কাগজ সামনে ফেলে ঠাকুরমশাই বললেন—একটা অক্ষর ধরো দেখি। তারপর—'ধয়ে ধুতরো। তোর স্বামী সন্ন্যেসী হয়েছে।'

তবু যাক সন্ন্যেসী হয়েছে। ময়না ভাবে—একজন বলেছিল, দয়ার বাপ হাসনাবাদে শুঁটকি মাছের আড়তে কাজ করে, সঙ্গে নাকি মেয়েছেলে আছে। আবার এমন কানাঘুষোও শুনেছে ময়নামতী, হিঙ্গলগঞ্জের চিংড়ি ভেড়িতে মাছ চুরির সময় নেপালি পাহারাদারের গুলিতে নাকি দু'জন...গোর দিয়েছে নাকি পাঁকে,—তার মধ্যে একজন নাকি—ঢ্যাঙাপানা, লম্বাপানা, হলুদ জামা...না গো না, একথা যে ওলাউঠা বলে তার মুখে ঝ্যাঁটা, সন্ন্যাসীই হয়েছে দয়ার বাপ। তবু ভাল!

আজ এই সতীমায়ের মেলায় কর্তাবাবার পায়ের আবির মাথায় নিয়ে আবার বলে দয়ার মা—'ঝ্যানো ফিরে আসেন উনি, ঝ্যানো আসেন।'

'সতীমায়ের পাঁচালি শুনে হিমসাগরে চ্যান করে, ডালিমতলায় দণ্ডী কেটে যা, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে'—কর্তাবাবা বললেন। দয়াময় ভাবে বাপ যদি সাধুই হয়, তবে যেন এরকম কর্তাবাবাসাধু হয়,—ঠং ঠঙাৎ পয়সা পড়চে।

একজন গাইছে—

ফল সব কি মিঠে হয়
সুমিষ্ট সে কভু নয়।
কতক গেল রৌদ্রে পুড়ে
দু-একটা তো পচে যায়—
বিপদ নাই তার কোনো মতে
গুরু কৃপা তারে কয়।

শতকণ্ঠ বলে উঠছে—জয় সতীমা হে, জয়বাবা দুলালচাঁদ।

ভদ্দরলোকের বউয়ের মতো দেখতে একজন বউ আর ভদ্দরলোকের ছেলেদের মতো একজন বাচ্চাকে একজন মহাশয় বললে—'দুলালচাঁদ কে ছিলেন, কে ছিলেন সতীমাতা, শুনবে নাকি?'—

দয়াময় তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে নেয়—

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে গিয়া চিন্তা করে।
সৃজিবেন নব ধর্ম সবাকার তরে ॥
আইল পাগলবেশে ঘোষপাড়া গ্রামে।
বিখ্যাত হলেন তিনি আউলচাঁদ নামে ॥
প্রচার করেন তিনি করিয়া যতন।
মানুষ সবার সেরা মানুষ রতন ॥
সৃজিলেন নব ধর্ম, 'কর্তাভজা' নাম।
সেই হেতু পুণ্যমন্ত ঘোষপাড়া ধাম ॥
শ্রীরামশরণ তার শিষ্য আগে হয়।
সবাকার মন তিনি করিলেন জয় ॥
শুন রামশরণের অমর কাহিনী।
ভক্তিমতী সতীমাতা হল অর্ধাঙ্গিনী॥
শক্তিময়ী সতীমাতা সিদ্ধ হ'লে পরে।
তাহার প্রচার হল প্রতি ঘরে ঘরে ॥
তাহারই গর্ভেতে লভে শ্রীদুলাল চান্দ।
চৈতন্যেই অংশ তিনি তাতে নাই খাদ ॥

জয়। জয় দুলালচাঁদ। দুলালচাঁদের জয়।

দয়ার মা গেল হিমসাগরে ডুব দিতে। দয়া তার ছোটভাই এবং মুড়ির পুঁটলি সাপটে ওর মায়ের

পিছল পথে ফিরে আসা দেখে। কাদাজলে কাপড় লেপটে গিয়ে পেটখানা বিরাট উঁচু লাগছে। ঘাটে দাঁড়ানো যে লোকটা সিঁদুর বিক্রি করছে, তার চোখ ময়নামতীর পেটের দিকে। সে বলছে—সতীনারীগণ সতীমায়ের পুজোর জন্য লোহা-সিঁদুর নিয়ে যান গো...সতীনারীগণ...ময়নামতী একভাগ কিনে আঁচলে গিঁট দিল। ময়নামতী দণ্ডী কাটবার জন্য গড় হল। সতীনারীগণ...

দয়াময় তখনও পেটে আসেনি। বিয়ের ক'দিন পরে পরেই দয়ার বাপ চলে গেল মাছ মারতে। নাকের নোলকের পুরনো দামটার জন্য কয়েকবার ঘুরবার পর হরিপদ সেঁকরা দুপুর নির্জনে ময়নার ঘরে এসে বলেছিল, 'সব দামই যে ট্যাকায় দিতে হয় এমন কি কথা আছে, শুধু একটিবার, আপিত্য করিসনি ময়না, বহুদিনের শখ রে ময়না...'

যাকে দয়ার বাপ বলে লোকে জানে, সে তখন মাছ মারতে গেছে জলে। লোকটা ফিরে এসে শোনে সে বাপ হবে।

ময়নামতী পিছল পথে জলকাদার মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ছে, টানটান হাত—সামনে মেলা। হে সতীমা, লোকের মুখের হিঙ্গলগঞ্জের চিংড়ি ভেড়ির কথা ঝ্যানো মিথ্যে হয়, ঝ্যানো মিথ্যে হয় গুলির শব্দ, রক্তমাখা হলুদ জামাটা ঝ্যানো মিথ্যে হয়, ঝ্যানো মিথ্যে হয় ঝ্যানো মিথ্যে হয়।...

এইভাবে ময়নামতীর শরীর সতীমায়ের থানের দিকে এগিয়ে আসে। ময়নামতীর ঘাম ও লোল কাদায় মেশে, শ্রবণ ও দৃষ্টি কাদার মতো বেতাল হয়, দয়াময়ের কোলে ময়নার বাচ্চাটার মায়ের বার বার শুয়ে পড়া দেখে ভয়ার্ত তুমুল চিৎকার ময়না শোনে না, বস্তুতপক্ষে হাজার মানুষের কলরব খৈ ফোটার শব্দের মতো চিড়বিড় করে; তৃষ্ণা, শরীরটা চৈত্রের মাটি, মাথায় ঘুরছে ডাল ভাঙার জাঁতি। ময়নামতীর শরীর স্রোতের ডাব-খোলার মতো ভিড়ের মধ্যে এইভাবে অসহায় এগিয়ে চলছিল। তারপর এক সময়—'জয় সতীমা, মনের আশা পুন্নো করোগো'—এই কথা বলার চেষ্টা করে সামনের ভিড়ের উপর দিয়ে ছুড়ে দেয় লোহা-সিঁদুর। তারপর জনস্রোত ওকে নিয়ে নেয়। ওর শরীর এলিয়ে পড়ে। ও সতীমার থানের কাছে পড়ে যায়। ওর শরীর মাড়িয়ে দেয় ভিড়ের পাগুলো। জয় সতীমা শব্দের মুহুর্মুহু আওয়াজ। ময়নামতী বলার চেষ্টা করে—পেটেতে পা দিওনাগো তোমরা, বাচ্চা আছে, বাচ্চা। জনতার ছুঁড়েদেয়া সিঁদুরের দু-একটা মোড়ক ময়নামতীর গায়ে এসে পড়ে, জয়,—জয় সতীমা, হে...কতগুলো পায়ের চাপ ময়নামতীর হাতে, বুকে, পেটে, ময়নামতীর শাড়ির কাদার আস্তরণ ক্রমশ লাল হতে থাকে। কাদার সঙ্গে মাখামাখি হয় রক্তের। দু'বার মাথা ঝাঁকুনি দিল ময়নামতী।

সব ফল কি মিঠে হয়
সুমিষ্ঠ সে কভু নয়
কতক গেল রৌদ্রে পুড়ে
দু-একটা তো পচে যায়

এখন ভিড়ের বাইরে, অন্য ভিড়ের মধ্যে ময়নামতী। রক্তপিণ্ড জমাট বেঁধেছে। দয়াময় ভাই-কোলে নিশ্চুপ। ময়নামতীর খাংলাচুল সিঁদুরে সিঁদুর। সতীমা সাক্ষাৎ ভর করেছেন এঁকে। ইনি কে কি-সে সতী? মায়ের থানে লোহা-সিঁদুর উৎসর্গ করে, তবে না দেহ রাখলেন। বহু জন্মের পুণ্য চাই, তবেই না এমন ভাগ্য হয়। এই বুঝি এঁনার ছেলে, আহারে...

দশ পয়সা, পাঁচ পয়সা, সিকি...

দয়াময় একবার ভাবল মা মরে গিয়ে সাধু হয়েছে, নইলে কেন এত ঠং ঠঙাৎ পড়ছে? একজন ময়নামতীর পা মুছিয়ে দিল আঁচল দিয়ে।

ময়নামতীর সেই খড়মঠেঙী পা, ময়নামতীর সে অলক্ষ্মী অপয়া পা এখন আলতায় রাঙা। উঁচকপালী নয়মামতীর সারা কপালে সিঁদুর। সবাই পেন্নাম করছে। রক্তে, সিঁদুরে, আলতায়—

ময়নামতী এখন কী সুন্দর লাল! সতী ময়নামতী! দয়াময় শুধোয়, মা তো মরে গেছে, এখন কোথায় যাবে?

তোর মা স্বর্গে যাবে বাছা, স্বর্গে।

'এই, লাশ উঠাও, মর্গে যাবে, মর্গে।'

পুলিশ আসে। গাড়ি ছাড়ল। কালো ধোঁয়া; মর্গে গেল সতী ময়নামতী। এয়ো নারী হুলুধ্বনি দিল।

দয়াময় থ। ওর ভিখিরি মা কেমন করে ভগবান হয়ে গেল। উলু, পেন্নাম, দয়াময়ের মাথায় কে একজন হাত বুলিয়ে দিল।

'সতীমায়ের ছেলে তুই—তুই সাক্ষাৎ দুলালচাঁদ। নে বাবা, কলাটা ধর। খা!' দয়াময়কে দাঁড় করিয়ে পেন্নাম করল। কোলের বাচ্চাটা চ্যাঁচায়...অন্য একজন বলল—সতীমায়ের ছেলে কলিতে জন্মেছে গো—সাক্ষাৎ দুলালচাঁদ। চার আনা পয়সা দিল হাতে। দয়াময় ছোটভাইটাকে নিয়ে বসল একটা গাছতলায়। ভাই কাঁদছে। দশ পয়সা পাঁচ পয়সা পড়তে লাগল।

এক টাকা হলে মেলার একটা মেঠাই দোকানে গেল দয়াময়। দোকানের মালিক বলল—তোর মা মরেছে বুঝি সকালে?

হুঁ।

আহারে,—নাম কী তোর?

আমি দুলালচাঁদ।

বাব্বা দুলালচাঁদ! জব্বর নাম রেখেছে বা-মা। তুই থাকবি এই দাকানে? এই দ্যাক না, তোর মতো কত ছেলে কাজ করছে। দয়াময় বলল—আমি যে সতীমায়ের ছেলে, মেলার লোক বলেছে আমি দুলালচাঁদ।

লোকটা বলে, বুঝিচি। হাসল। দুলালচাঁদ তুই আজকে। কালকে মেলা ভেঙে গেলে তুই হাভাতে। কাজ করবি তো বল। ওই দ্যাখ, রসগোল্লা, পান্তুয়া দেখেচিস? খেতে পাবি।

দয়াময় সম্মতির মাথা নাড়ে। লোকটা বলে, তবে তোর ভাইয়ের একটা গতি করেত হয়। দোকানের সামনে বসা লাল চোখ জটাচুলের একটা লোককে ডেকে বলে, 'আছে একটা। নেবে নাকি?' আঙুল দেখায় দয়াময়ের কোলের দিকে। দয়াময় দেখে সামনের চটের উপর দুটো নুলো বাচ্চা চ্যাঁচাচ্ছে, ওদের আশেপাশে পয়সা।

দয়াময় কেন যেন ভয় পায়। ভাইকে বুকে চেপে ধরে ছুট...

শিশুভ্রাতা ক্রোড়ে লৈয়া দয়াময় ধায়
হাজার শব্দের ভিড় পার হৈয়া যায় ॥
তারপরে বসে দূরে আম্রবৃক্ষ তলে।
এমন সময় সূর্য যায় অস্তাচলে ॥
ক্রমশ আন্ধার হৈল রূপসী বসুধা।
শিশু দুটি জল চায়, দেহে লাগে ক্ষুধা ॥
এয়োস্ত্রীরা গ্রাম্যপথে ফিরিতেছে ঘরে।
মেলা হতে ক্রয়করা দ্রব্য সঙ্গে করে ॥

মানুষ যাচ্ছে। দয়াময় এবার কেঁদে ওঠে, মা গো মা...এই প্রথম মায়ের জন্য আর্তনাদ করে দয়াময়।

মহিলাদের একজন ব্যাগ থেকে টর্চ বাতি বের করে।

'আরে, এ যে দেখি সেই ছেলেটাগো, সকালের সেই...'

দয়াময় তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—আমি—দুলালচাঁদ না, আমি দয়াময়, আমি ভগবান না, আমি দয়াময়...। আমার মা ভগবান না, আমার মা মরেছে সকালে; খিদে লাগে গো মা...

পুরস্ত্রী এয়োরা সবে কথা না কহিয়া
অন্ধকারে গ্রাম্য পথে গেল যে চলিয়া
ভাবিল ভবের লীলা বুঝি কেমনেতে
গৃহে গিয়া আঁচ দিতে হবে উনানেতে।

অতঃপর দয়াময় ক্ষুধায় কাতর হয়।
বড় ভীত হয় মনে মনে
আবার মেলায় গিয়া দুরুদুরু করে হিয়া
পৌঁছায় সেই মিঠাই দোকানে
দয়াময় বলে শুন আবার এসেছি পুনঃ
এইবার দয়া করো মোরে
মালিক বলে দুলালচান্দ কেন তুমি মিছা কান্দ
নিশ্চিন্তে থাকো এই ঘরে।

দয়াময় ওরফে দুলালচাঁদ ক'বছর পরে এই মেলায় এল আবার। মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক ওকে দয়াময় নামে ডাকে না, ডাকে দুলালচাঁদ। সেবার দুলালচাঁদ দোকান থেকে এক ছপ্পরে কেটে গিয়ে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে একবার দেখে এসেছিল সতীমায়ের ঠেক, যেখানে ওর মা টসকে গিয়েছিল।

প্রমা, ১৯৮৬

ভাবের গান

নাগরদোলা ঘুরছে। হাতা খুন্তি বেলুনচাকি প্লাস্টিকের এটা-ওটা, আর মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। চটের দেয়াল, ত্রিপলের ছাউনি।

ভাইফোঁটার মেলা বসেছে বিরহীতে।

যাদের ভাই দূরে রয়েছে তারা মন্দিরের দুয়ারে বা থামের গায়ে ফোঁটা দিচ্ছে আর যমদুয়ারে কাঁটা পড়ে যাচ্ছে। ভাই মরা বোনের কড়ে আঙুলের ফোঁটা থামের গায়ে নয়, মৃত ভাইয়ের কপালে গিয়ে পড়ছে আর যাদের ভাই নেই, সেই সব বোনেরা ওই মন্দিরের দেবতা মদনগোপালকেই ভাই পাতাচ্ছে।

মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের আজকের দিনের এসপেশাল—'ভাইফোঁটা' সন্দেশ। সন্দেশের গায়ে লেখা আছে 'ভাইকে দিলাম।'

একটা বউ লক্ষ্মীঠাকুরনের মতো তার মুখ, সে রকম টানাটানা চোখ, নাকে নথ, দোকানে এল। সঙ্গে বুড়িমতো একজন।

টেবিল বয় দুলালচাঁদ অর্ডার নিতে আসে। বলুন ঠাক্‌মা, কী দোব।

কী আছে?

দুলাল বলতে থাকে—

ল্যাংচা, বোঁদে, লেডিকিনি, সন্দেশ,
রাজভোগ, রসগোল্লা, মিহিদানা দরবেশ
সরপুরিয়া, সরের নাড়ু সরভাজা,
নিমকি সিঙারা বালুসাই গজা...

বউটার মুখ থেকে হাসি ছলকে উঠতেই দুলাল থামে।

বুড়িটা বলে, অত কী হবে গো, উপোস ভাঙা মেঠাই ভাল যা আছে, দুটো করে দাও।

ক'টা সরপুরিয়া দিয়ে দুলালচাঁদ বলে, ভাল ল্যাংচা আছে, এসপেশাল সন্দেশ আছে, দুটো খান না ঠাকমা, এই ভাইফোঁটার দিনে।

'ভাইফোঁটায় আমাদের কী, ভাইফোঁটা তো তোদের।'

দুলালচাঁদের মুখখানার দিকে তাকিয়ে বুড়িটা বলল—

'তোর ভাইফোঁটা হবেনি?'

আমার কপালে কে ফোঁটা দিবে? আমার হল পোড়া কপাল।

কেন? তোর বুন নাই বুঝি?

বুন নাই, মা নাই, বাপ নাই...

এবার ওই বউটা কথা বলল। কত কথা বলল। জল নিয়ে কথা, চা নিয়ে কথা, ভাই নিয়ে কথা। বউটারও ভাই নেই। ক'বছর আগে ছুরি খেয়ে মরেছে নবদ্বীপে। এই বিরহীতে ওর মামার বাড়ি। বউমার কত্ত বড় বংশ। নবদ্বীপের অদ্বৈতাচার্যের বংশ ওরা... বুড়িমা বলেছিল।

ওই টেবিলটার সামনে এত সময় দাঁড়িয়ে থাকছিল বলে মালিক দীনবন্ধু মোদক কতবার হাঁক দিয়েছে, তবু ছল করে জল নিয়ে কতবার ওই টেবিলে গেল দুলালচাঁদ। ওই বউটা জিজ্ঞাসা

করল মা'র কথা বাপের কথা, দুলাল সংক্ষেপ সময়ে শুধু বলেছিল— বাপ-মা হারায়ে গেছে।

দু' টাকায় ভাইফোঁটা সন্দেশ আনাল বউটা। কলাপাতায় সাপটানো তেলহলুদে কড়ে আঙুল ঘসে আঙুলটা দুলালচাঁদের কপালের দিকে নিয়ে যায়, বলে, বোস একটু, এই বেঞ্চিতে। কড়ে আঙুল কপাল ছোঁয়, দুলাল চোখ বন্ধ করে আর ওমনি চেয়ার টেবিল, জলের ড্রাম সব্বাই উলুধ্বনি মারে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে— বোঁচকা, ন্যাড়া, মালিক সবাই দেখছে ওকে। ভীষণ লজ্জা করে। দুলাল পালায়।

দুলাল বড় আনমনা। খদ্দের চাইছে পান্তুয়া, দিচ্ছে রসগোল্লা।

দীনবন্ধু মোদক মাথায় নরম টোকা মেরে বলে, একটু হুঁশ লাগিয়ে কাজ করবে দুলাল... খিস্তি দিল না।

ভোগের পাড়ার ঘোষেরা এল। দোকানে হুটোপুটি, কড়াতে নতুন তেল চাপল। পাঁচুদা হেড কারিগর। নিজেই ময়দা বেলতে বসে গেছে।

ঘোষেদের একজন গান শুরু করে দেয়।

তারপর মদনগোপাল—
তারপর মদনগোপাল কলির রাখাল ঘুরিতে ঘুরিতে,
চুপি চুপি ঢুকে পড়ে ঘোষেদের বাড়িতে।
ত্যাখন গা ধুচ্ছে বউ—
ত্যাখন গা ধুচ্ছে বউ, মাচায় ঝুলছে বড় বড় লাউ—
আর রাখালরূপী মদন বলে লাউ কি খেতে পাঁউ।
লাজের মাথা খেল...
লাজের মাথা খেল বউ ওগুলো গামছা ঢাকা দিয়ে,
বলে বে-আক্কেলে ঢ্যামনা ছেলে বলগে মাকে গিয়ে,
ত্যাখন রাখাল ছেলে...

অনেকে তাল দিচ্ছে। দোকানে বসা বউ-ঝিরা আঁচল মুখে জড়িয়েছে। হাসির শব্দ আসে।

গানের মধ্যে দুলাল জানতে পারল রাখালরূপী মদনগোপাল সত্যি সত্যি লাউ আর লাউশাক খেতে চেয়েছিল, ঘোষ বউ বোঝেনি। সেই রাতে ঘোষেদের লাউমাচা ছত্রাখান, মদনগোপালের গায়ের চাদরটা পড়ে আছে সেখানে। সেই থেকে ঘোষেরা মদনগোপালকে লাউ আর লাউশাকের ভোগ দেয়।

মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে এখন ভোগের গ্রামের ঘোষেদের আমোদ আহ্লাদ।

ওরে দেরে— আরও গরম গরম কচুরি দে...

বাঁশের খুঁটিতে লাগানো চটে সাঁটানো ছড়াগুলো পড়তে থাকে ওরা, আর বেড়ে, ব্বাহা এইসব প্রশংসার শব্দ করে। একজন ওই ছড়াটাতে সুর দিয়ে গেয়ে ফেলে—

সব দই কি ভাল হয়
এমনটি তো কভু লয়
মহামায়ার দই-এর হাঁড়ির
সবক'টা দই ভাল হয়।

লোকটা বলে— বারেব্বা, দেখেছ। কর্তাভজাদের ভাবের গানের প্যারোটি হয়েছে— বলেই মূল গানটা গাইল— সব ফল কি মিঠে হয়/এমনটি তো কভু নয়/কতক গেল রৌদ্রে পুড়ে/কতকগুলো পচে যায়... বলে এ গান কে বেঁধেছে?

দুলালচাঁদ কনে বউয়ের মতো নত মাথায় বলে— আমি।

অন্যগুলি?

আমি।

হ্যাঁরে, তুই তো বেশ বড় বাঁধনদার রে, নাম কী তোর?

দুলালচাঁদ।

দুলালচাঁদ? বাব্বা, সতীমায়ের ছেলে? তুই নিজে দুলালচাঁদ হয়ে দুলালচাঁদের গানের প্যারোটি করিস? তোর মা জানলে প্যাঁদাবে।

দুলাল বলে, মাকে দাও না এনে, মায়ের হাতের প্যাঁদানিও মিঠা।

তা যা না, কাছেই তো, সতীমায়ের সঙ্গে দেখা করে আয়, মদনপুর ইস্টিশন থেকে রেলে চেপে কল্যাণী, তারপরেই ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের থান।

কতক্ষণ লাগে!

আর কতক্ষণ? একঘণ্টাও নয়, তুই কি সত্যিসত্যিই যাবি নাকি রে পাগলা?

মালিক কি ছাড়বে, আজ মেলার দিন।...

তোর বাবা মদনগোপালকে বল, মালিকের মতি ফেরাতে, তোর মা তো আবার আমাদের বাবার প্রথম পক্ষ।

সে আবার কী?

তখন এক গপ্পো শুনল দুলালচাঁদ। মদনগোপালের প্রথম পক্ষটিকে ডাকাতে কলঙ্ক করে। এ নিয়ে মদনগোপাল ঠেস মেরে কথা কয়েছিলেন তাঁর পরিবারকে। উনি তখন অভিমান করে যমুনা পেরোয়ে চলে গেলেন ঘোষপাড়া। রামশরণের পরিবারে সতীমা হলেন। আর তাঁরই ছেলে দুলালচাঁদ। হাজার হাজার লাখ লাখ লোক তেনাকে মানে...আর এদিকে মদনগোপাল বিরহে দিন কাটাতে লাগলেন। তাইতে এই গাঁয়ের নাম হল বিরহী।

সব তো ভুলেই ছিল ও। তার ঢ্যাঙাপানা বাপের চেহারাটা ক্রমশ আবছা হয়ে এসেছে। আর মায়ের কথা মনে হলেই সতীমার ডালিমতলায় ভীষণ ভিড়ের মধ্যে আলতা-সিঁদুর আর রক্তে ল্যাপটানো মায়ের ছবি ভাসে। ও তখন দুলালচাঁদ ছিল না। ওর নাম ছিল দয়াময়। দয়াময়রা কর্তাভজা। ওর বাপ-মায়ের গলায় কণ্ঠি। ওরা একসঙ্গে গান করত— ভাবের গান। একদিন খুব ঝগড়া-চেঁচামেচি হল মা-বাবায়। তবে চললাম, বলে চলে গিয়ে আর এল-না দয়ার বাপ।

দয়ার মা কত কাঁদল, চাঁদপিরের থানে গোলকচাঁপা গাছে ঢিল বাঁধল। গণকঠাকুরকে হাত দেখাল। তারপর একদিন— দোলের দিনে দয়ার মা দয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেল সতীমায়ের থানে। মায়ের দয়া হলে সব হয়।

সেদিন দয়ার এক হাতে মুড়ির পুঁটলি আর অন্য হাতে মায়ের আঙুল। লোকজন-নাগরদোলা-জিলিপি-পাঁপরভাজার ওই কোলাহলের মধ্যেও মায়ের হাতের নীল শিরাটা নিঝ্‌ঝুম রাস্তার মতো এঁকেবেঁকে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

ওর মনটা কীরকম হু হু করতে থাকে। দুপুরের দিকে একটু ছুটি চায় ও। মালিক ভিরমি খায়। এই মেলার দিনে কেউ ছুটি চায়? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মেলার মাঠের পিছনে পড়ে থাকা মরা যমুনার সোঁতায় দমকা বাতাসে পাতা ওড়ে।

মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দুলালকে পাওয়া যাচ্ছে না।

দুই

ঘোষপাড়ার আমবাগানের ছায়ায় দুলালচাঁদ ঘোরে, সামনে দুঃখিনী মাঠ, ওধারে কর্তাবাবাদের বাড়ি। কোথায় গেয়েছিল দুলালের মা, কোন আমগাছ তলায় বসে—'এক ডালেতে দুলছে দুটি ফুল ফুলের রং চিনে ফুল বেছে তোল...'

এই তো সেই পুকুরটা, এর চারপাশেই ঘুরেছে নাগরদোলা, বেজেছে বেলুনবাঁশি।

পুকুরেই চান করেছিল মা। ভেজা কাপড়ে হত্যে দিতে দিতে ডালিমতলার দিকে গিয়েছে দুলালের মা, হাওয়ায় দু'হাত, আঁচল লুটায়... জয় সতী মায়ের জয়— শব্দ ঝড়ের মধ্যে কচি গলার কান্নাটা হারিয়ে গিয়েছিল।

ডালিমগাছে সতীমায়ের উত্থান হয় দোলের দিনে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দুলালের মা মুঠোর মধ্যে লোহা-সিঁদুর নিয়ে জয় জয় গো সতীমা— বলে হাজার লোকের হাউ হাউ ভিড়ের মধ্যে চলে গেলে ভিড় ওর মাকে নিয়ে নেয়।

ডালিমগাছ সেদিন কল্পতরু। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দুলালের মা কি ডালিম গাছকে মনোবাঞ্ছা জানাতে পেরেছিল? কেননা কোলাহলের মধ্যে চিৎকার, চিৎকার ভীষণ হল, তুমুল হল, তারপর একসময় কোমল হল। ভিড় ছিত্তিছান হল, ভিড়ের মধ্যে অন্য একটা ভিড় ওর রক্তমাখা মাকে নিয়ে এল। কল্পতরু ডালিম গাছের গোড়ায় গিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল ওর মা, তারপর হাজার মানুষের পা ওই পোয়াতি শরীরে পড়েছে। কাদামাখা শাড়ি করমচা লাল মায়ের মুখের কষ বেয়ে লাল, নাক বেয়ে লাল।

এই রক্তিম শরীরটা ঘিরে এবার অন্যরকম ভিড়। ইনি যে সাক্ষাৎ সতী। ডালিম থানে দেহ রাখলেন। সতী মায়ের কৃপা আছে নির্ঘাত।

মায়ের খাংলা চুল ক্রমশ সিঁদুরে সিঁদুর, পায়ে আলতা, শরীরে ফুল। দয়াময় তখন ভীষণ শব্দে মা বলে আর্ত চিৎকার করেছিল। লোকেরা বলছিল:

এই বুঝি এনার ছেলে, আহারে কী সুন্দর দ্যাখো...সাক্ষাৎ দুলালচাঁদ।

ওগো সতীমায়ের ছেলে, একটু দাঁড়াও পেন্নাম করি।

কোথায় গেল আমার মা?

তোর মা সগ্‌গে গেল বাছা, সগ্‌গে। ওর মা মর্গে চলে গেলে দয়াময়কে মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক কাছে ডেকে নেয়। নাম রাখে দুলালচাঁদ।

সমস্ত মাঠটা এখন থম মেরে পড়ে থাকা মায়ের হাতের নীল শিরাটার মতো নিঝ্‌ঝুম। থুক করে থুতু ছিটোয় দয়াময়।

তিন

খুব ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে বিরহীর মেলার মাঠে ঢোকে দুলাল। মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হ্যাজাক জ্বলছে। সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল দুলাল, হেড কারিগর পাঁচুদা বলে— বাইরে ডাঁড়া দুলাল, সেই দুক্কুরবেলা দোকান পালিয়ে এখন এই এখন এলি! মালিক মানা করেছে। বাহ্যি ফিরে আসুক উনি, কথা কয়ে নিস।

দুলাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নখ খোঁটে। একজন খদ্দের অন্য খদ্দেরকে বলে— মালিক কেমন রসিক দেখেছেন— কেমন ছড়া লিখে রেখেছে 'রাম ভজে কৃষ্ণহরি রহিম ভজে আল্লা। রাম রহিম মিলেমিশে ভজরে রসগোল্লা।' দারুণ লিখেছে। ব্বাঃ। বাঃ শব্দটা বুলবুলি পাখি হয়ে দুলালচাঁদের কাঁধে দোল খায়। দুলাল নখ খোঁটা বন্ধ করে। দুলাল এক গামলা টগবগানো লেডিকেনির অনুভূতিতে বলে— ওইটা পড়ুন তো, ওইটা,

লোকটা পড়ে—

আসল দুধের না হলে কি
সরপুরিয়া নরম হয়
পাউডার দুধ দিলে পরে
আসল স্বাদটি নাহি রয়।

চমৎকার! তোমাদের মালিক তো সত্যিই বড় রসিক লোক হে। দুলাল মাথা নিচু করে, আঙুল কামড়ায়। কিছু বলে না, শুধু খুশি হয়, বড় খুশি হয়।

কীরে উল্লুক। ফিরলি যে বড়, যা— যেথা গেছিলি যা—

দুলালের মাথা নিচু।

কীরে শোরের বাচ্চা, কথা কইছিস না যে...

মা তুলবেন না।

ঠাস করে চড় পড়ে দুলালের গালে। আবার বড় গলা? কুচকি-কণ্ঠা সমান হয়েছে দেক্‌চি। খুব আস্পদ্দা। তোর কাজের দরকার নেই এখানে। নাই দিয়ে মাথায় তোলা হয়েছিল...ভাগ। তুই তোর মালপত্র নিয়ে এখনই ভাগ।

দুলালচাঁদ টেরা তাকায়।

বেতন? তিন মাসের?

বেতন?—নেঃ—

ছুটে গিয়ে ক্যাশ বাকশো থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট নিয়ে ছুড়ে ফেলে দীনবন্ধু। দুলাল কুড়িয়ে নেয়। চারটে।

আর?

হিসেব করে কেশনগরের দোকান থেকে নিয়ে নিবি।

আর আমার গানগুলান?

মানে? গানগুলান মানে?

আমি যে গানগুলান বেঁধেছি?

'আমার কাগজ, আমার আর্টিস, বলে কিনা আমার গান!

যাঃ তাই নেঃ' এই শব্দ ক'টা উচ্চারণ করতে যতটুকু সময় লাগে ঠিক ততটুকু সময়ের মধ্যে দীনবন্ধু ছুটে গিয়ে পিছনের চটের উপর সাঁটানো আসল দুধের না হলে কি সরপুরিয়া নরম হয় ছিঁড়ে ফেলে। চটের দেয়াল থিরথির করে কাঁপে। দুলালচাঁদ দু'হাত তুলে আর্তনাদ করে, বলে, থাক! থাক!

ততক্ষণে ওটা ছেঁড়া এবং দলাপাকানো হয়ে গেছে। দুলালচাঁদ চটের দেয়ালের ফাঁকার দিকে থাকে।

গানটা তবু থেকে গেল কিন্তুক।

দীনবন্ধু পিছনে তাকায়। চটের গায়ে কয়েকটা সাদা চল্‌টা ছাড়া কিছু দেখতে পায় না। দীনবন্ধু তখন আরও তিন-চারটে পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে। হাঁপায়।—যা— নিয়ে যা...

গান একবার দিলে আর নেয়া যায় না। দুলাল বিড়বিড় করে। চোখে জল। দুলাল ফিরে যায়।

চার

মা মরা দয়াময়টা যখন ঘোষপাড়ায় মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে এসে পড়েছিল, ও তখন নেহাৎ বাচ্চা, বাঁ হাতের চেটো শিকনিমোছার কারণে খড়খড়ে, গা চুলকোলে হাতের মাদুলি বাজত ঝনঝন। মালিক ওর নাম রেখেছিল দুলালচাঁদ। ও জানত ও দুলালচাঁদ নয়। দুলালচাঁদ শুধু একটা ইয়ারকি।

ওর গানের গলা ভাল ছিল। ওর মায়ের কাছে শোনা ভাবের গানগুলি আবছা মনে ছিল দুলালের। গাইত দু-এক কলি। আর ইয়ারকি করে গান বাঁধত পান্তুয়া নিয়ে, সিঙারা নিয়ে, দরবেশ নিয়ে, রসগোল্লা নিয়ে।

মালিকের বড়ছেলে সুধাবিন্দু গত বছর বি কম পাশ দিল। এখন ব্যবসাপত্র দেখতে শুরু করেছে একটু একটু করে। ছেলে এসে দোকানে নতুন লাইট লাগিয়েছে, নতুন আলমারি। সুধাবিন্দু একদিন দুলালচাঁদকে ডাকে। বলে, হ্যাঁরে, তুই নাকি গান বাঁধিস? দুলাল বোঝে না গান বাঁধা ব্যাপারটা ভাল না খারাপ। ও চুপ করে থাকে। পাঁচুদা বলে, চুপ মেরে আছিস কেন? দাদাবাবুকে বল না। রসগোল্লার গানটা দুলাল প্রাণে বল পেয়ে বলে।

রাম ভজে কৃষ্ণহরি রহিম ভজে আল্লা
রাম রহিম দু'জনাতে ভজে রসগোল্লা।

সুধাবিন্দু বলে, বাহ। আর একটা—

সুধাবিন্দু দুলালকে বাড়ি ডেকে নিয়ে গেল একদিন। পা-জামা পরা গালে চাপদাড়ি একজন লোক ওখানে বসে চা খাচ্ছিল। দুলালকে বলা হল দোকানের খাবারটাবার নিয়ে ও যত গান বেঁধেছে সবগুলো বলে যেতে। দুলাল তখন 'হরি চিত্ত হরি বিত্ত হরি নিত্য' গানের মতো করে 'সরের নাড়ু সরপুরিয়া সরভাজা ও সন্দেশ' গানটা বলল, 'সব ফল কি মিঠে হয়' গানটার মতো করে 'সব দই কি মিঠে হয়' বলল, 'সুধা ফেলে বিষপানে মত্ত অতিশয়' গানটার মতন করে 'ঘি ফেলে রেপসিডে ভাজা খাও মহাশয়' গাইল 'আপন হতে না পাকিলে, গাছের ফল কি মিঠা হয়' গেয়ে নিয়ে দুলাল গাইল 'আসল দুধের না হলে কি সরপুরিয়া নরম হয়, পাউডার দুধ দিলি পরে আসল স্বাদটি নাহি রয়' আর দাড়িওয়ালা লোকটা কী সুন্দর কাগজে কত রকমের রং-এ ওর গানগুলো আঁকল, দুলাল তো ভাল করে পড়তে পারে না, তাই— জানল না কোনটা ওর সরপুরিয়ার গান, কোনটা রসগোল্লার, শুধু ওর সেবেলার পড়ে পাওয়া ছুটিটা ওর গানের কথার ছবি হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে একরকম ভালই কেটে গেল।

আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকানো পোস্টারগুলো এই মেলাতেই প্রথম লাগানো হয়েছে। প্রথম দিন সুধাবিন্দু এসে লাগিয়ে দিয়ে গেছেন। দুলাল কিন্তু জেনে গেছে— কোনটা ওর রসগোল্লার গান, কোনটা সরপুরিয়ার, মেনুলিস্টির পাশে কোন গানটা লাগানো আছে।

ওইসব কিছু ছেড়ে দুলালের চলে যেতে হয়। বেলুনবাঁশির শব্দ আর পাঁপড় ভাজার গন্ধ আবছা হয়। পিচরাস্তায় বাঁক নেয় দুলালচাঁদ।

পাঁচ

বিরহী বাজারের বাসরাস্তায় সকালবেলার দিদির সঙ্গে দেখা। দুলাল অনেকটা হেসে বলল, কী গো দিদি! দিদি মুচকি হাসলেন। দুলাল পেন্নাম করার জন্য নিচু হতেই লাল চটি সরে গেল। দিদির সঙ্গে একজন লোক। ফুলপ্যান্ট-গেঞ্জি। কপালে তেল হলুদের ফোঁটা। উনিই বোধহয় দিদির মামাতো ভাই। সারাদিন দিদি তবে এখানেই ছিল। এখন বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

দুলালচাঁদ দিদির চোখের কাজলরেখার দিকে সোজা তাকিয়ে বলে— আমার কাজটা আর নাই দিদি, আমার কী হবে?

কাজলরেখা কুঞ্চিত হয়। দুলালের চোখের তলা চিকচিক করে ওঠে, জলটাকে কোনওমতেই গড়াতে দেয় না। রানাঘাটের বাস চলে আসে— হুড়মুড় করে। দিদি আর সেই বুড়িমা উঠে যায়। দিদি হাত নাড়ায়,... লোকটা হাত নাড়ায়। লোকটা দুলালকে বলে— কাজ করবি তো চল।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর আত্মীয়বংশের ছেলে বাপি গোস্বামীর ব্যাংকলোন পাওয়া জুতোর দোকান গোস্বামী সু হাউসে কাজে লাগল দুলালচাঁদ। ঝাড়ু দাও, জল আনো, হয়ে গেলে দোকানেই থাকো, চা-টা এনে দাও,— এইসব। দুলাল ধীরে ধীরে বাটারফেলাই ৬ নম্বর আছে, মোকাসিন ৭ নম্বর নেই শিখে যায়। কিন্তু কাজে মন লাগে না। সেই যে মেঠাই দোকানে, উছলানো তেলের মধ্যে কচুরিগুলোর ক্রমশ ফুলে ওঠা, টগবগানো রসে রসগোল্লার নাচ, দলদলে ছানা ফুলেফেঁপে হয়ে উঠছে রাজভোগ, আর বোঁচকা, ন্যাড়া, পাঁচুদা, আর গান বাঁধা মেঠাই দোকানের মজাই আলাদা। এই গোস্বামী সু হাউসে, একদিন দুলালচাঁদ মালিক গোঁসাইকে বলব বলব করে বলেই ফেলেছিল, একটা গান বেন্ধেছি দেওয়ালে টাঙায়ে রাখবেন বাবু?

কী গান? টেপ রেকর্ডের আর ডি বর্মনের ভল্যুম কমে।

ভোলামন...
পরে নে গোঁসাইয়ের জুতো
পাড়ি দে বৈকুণ্ঠেতে—
পাবি ধন মনের মতো...

থাম। জুতো পরিয়ে বৈকুণ্ঠ পাঠাতে হবে না। খালি পাকামি। টেপ রেকর্ডের ভল্যুম বাড়ে। জিলেলে...জিলেলে...

একদিন কী যেন হাঁক পাড়ছিল মালিক। দোকানের কোনায় বসে থাকা দুলালের তখন অন্যদিকে মন। মালিক দুলালের দিকে তাকিয়ে ধমক দিল জোরে। বলল, কতদিন বলেছি... কাজের সময় এখানে রামপ্রসাদগিরি চলবে না। টেনে অ্যাইসা থাবড়া দেব না তোর গান বাঁধা এক্কেবারে ঢুকিয়ে দেব। ধুস, বলে দুলালচাঁদ সেদিনই পালায়!

ছয়

কেষ্টনগরে ফিরল দুলালচাঁদ। হাঁটি হাঁটি পা পা-করে এগুতে থাকল মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দিকে। ও কান ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবে। দোকানের কাছাকাছি চলে এলে মুখে কাঁচুমাচু ভাব আর একপোঁচ ফ্যাকাশে রং। দূর থেকে দোকানটার দিকে তাকায়। এটাই কি সেই দোকান? চেনাই যায় না। চকচকাচ্ছে টেবিল চেয়ার, ফ্যান ঘুরছে বন বন বন, কত আলো ঝলমলায়, দোকানের ভিতরে বাহারি রং, আর ওই তো, ক্যাশে বসে আছেন সুধাবিন্দু দাদা।

দুলাল আরও দ্যাখে, দেয়ালের গায়ে, নামের গায়ে, মেনু লিস্টের পাশে কাচ বাঁধানো কিছু বাহারি লেখা ফ্রেমের গায়ে সাঁটা। অক্ষরগুলির গায়ে জরির ঝিকিমিকি। দুলাল পড়তে পারে না তাই জানে না অক্ষরগুলির মর্মকথা।

দোকান থেকে বের হল ন্যাড়া। টাকা ভাঙাতে যাচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে ন্যাড়াকে ধরে দুলালচাঁদ। ন্যাড়া ভীষণ অবাক হয়। দুলালচাঁদ— তুই?

ন্যাড়া জানায়—পুরনো কিছু নেই। শুধু ন্যাড়া আর গানগুলান।

কোন গানগুলান? দুলালচাঁদের ব্যাকুল প্রশ্ন। ন্যাড়া হাসে। তোর। দুলাল দ্যাখে কাচ বাঁধানো জরির অক্ষর।

ও তবে ছিল। গান হয়ে ছিল। এতদিন তা হলে এখানেই ছিল দুলালচাঁদ।

গান ফিরোয়ে দিতে পারেনি মালিক। জরির অক্ষর ঝিকিমিকি ডাকে। ওই তো আসল দুধের না হলে কি, ওই তো রসগোল্লার গান, ওই তো পান্তুয়ার গান...

একগাছ শিউলি ফুল ঝরঝর করল দুলালচাঁদেরই সর্বাঙ্গে, এক পুকুর শাপলা ফুটল। এক কড়াই রসে টগবগানো রসগোল্লা খিলখিল হেসে উঠল। বহে গেল ভরা জলঙ্গীর স্রোত। ও তরে ছিল। ওর গান এতদিন ছিল। ও এখানেও ছিল।

মালিক সুধাবিন্দু একবার ওর দিকে তাকায়। তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। চিনতে পারল না? নাকি ও কেউ নয় আর। ওর গানগুলো জরির অক্ষর হয়ে খদ্দের ডাকে। ও কেউ নয় আর।

তবু দুলালচাঁদ এগোয়। দোকানের ভিতরে আলো, রং আর কাচ বাঁধানো জরির অক্ষর।

দুলাল তবু এগোয়। পেরুল চৌকাঠ। বলে, এলাম গো দাদাবাবু, আবার এলাম। সুধাবিন্দুর কপাল কুঁচকে যায় আর কাচ বাঁধানো দুলালচাঁদের গান দেওয়ালে দেওয়ালে উলু দিয়ে ওঠে।

পরিচয়, ১৯৮৮

ডাক্তার

ডাক্তার পালধি চেম্বারে চল্লিশ টাকা ফি নেন। এবেলা ওবেলা মিলে গড়ে জনা পঞ্চাশ রুগি। মানে দু'হাজার টাকা। দিনে গড়ে গোটা চারেক কল, বাড়ি গিয়ে রুগি দেখা। লোকাল কেস হলে একশো।। ব্লাড টেস্ট, ইউরিন টেস্ট ইত্যাদি করিয়ে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির কমিশন বাবদ গড়ে দুশো টাকা। এক্স-রে'র কমিশনটাও মন্দ নয়। একটা সিটি স্ক্যান করাতে পারলে আড়াইশো টাকা ছাক্কা। মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়েও শ' খানেক টাকা ইনকাম হয়ে যায়। তা ছাড়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কর্মচারীদের মেডিকেল বিল আছে। ডাক্তারের ফি বাবদ ওরা সরকারের কাছ থেকে পায় মাত্র চার টাকা, কিন্তু ডাক্তারের ফি চল্লিশ টাকা। এরকম সমস্যার সমাধান অনেক ডাক্তারবাবুর মতোই পালধি ডাক্তারকেও করতে হয়। পাশের ওষুধের দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে। ফল্‌স ক্যাশ মেমো আনিয়ে নিলেই হল। অনেক সরকারি কর্মচারী অনুরোধ করেন— খরচা একটু বেশি করেই দেখিয়ে দিন। ডাক্তারবাবু অনুরোধ রাখেন। এ বাবদ বাজার চলতি কমিশন হল থার্টি পার্সেন্ট। আরও আছে। মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভরা এটা সেটা দেয়। ওষুধপত্রও তার কিছু কিছু দোকানে চালান হয়ে যায়। এটা হিসেব না করলেও দিনে সাড়ে তিন হাজার টাকা ইনকাম। পনেরো দিন চেম্বার বন্ধ রাখা মানে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর লস।

পনেরো দিনের জন্য চেম্বার বন্ধ করে নিজের দেশে এসেছেন ডাক্তার শিবতোষ পালধি। সামনেই ওঁর পিতা ৺মতিলাল পালধির জন্মশতবর্ষ। একটা অনুষ্ঠান করবেন। সি ডি এম ও-কে আসতে বলেছেন। বি ডি ও, পঞ্চায়েত প্রধান, এঁরা তো থাকবেনই। বড় শালির মেয়েটাকেও আনা করাবেন। রেডিয়ো আর্টিস্ট। আর সেইদিনই উদ্বোধন হবে মতিলাল স্মৃতি দাতব্য চিকিৎসালয়।

ডাক্তার পালধি এখন লুচি ভাজার গন্ধ পাচ্ছেন। গাওয়া ঘি। জানালার মোটা শিকে তাঁর হাত। শিকের গায়ে পাখির বিষ্ঠা শুকিয়ে আছে। কী পাখির, শালিক? টিয়া? সামনের সজনে গাছের ডালে একজোড়া পাখি দেখলেন, চেনা, নাম মনে পড়ছে না। দুটো মাহিন্দর উঠানে বসে বাসি তরকারি দিয়ে জলভাত খেয়ে নিচ্ছে। দেওয়ালের পেন্ডুলাম ঘড়িতে ন'টার ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। ডা. পালধি এই সময়ে ওঁর বেলঘরিয়ার চেম্বারে বসে যান। সকাল সোয়া আটটা নাগাদ স্নান ঘরে ঢুকে যেতে হয়। টেলিফোন-শাওয়ারটা ঘাড়ে-গর্দানে-বাহুসন্ধি উরুসন্ধিতে চলাচল করতে থাকলে ডাক্তার পালধি মন্ত্র পড়েন ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গাং প্রভাস পুষ্করানিচ তীর্থন্যেতানি পুণ্যানী স্নানকালে ভবন্তিহ। বাবার শেখানো স্নানমন্ত্র। পুকুরে স্নান করার সময় পড়তে হত। সেই প্রাচীন পুকুরটাকে দোতলার জানলার শিকের ফাঁকে আর একবার দেখলেন শাপলা সমেত। ওর বেলঘরিয়ার বাড়ির বাথরুমে একটা জানলা আছে, পুবে। স্নানটা সেরে ফট করে সূর্যপ্রণামটাও সেরে নিতে পারেন ডাক্তারবাবু। স্নান সেরে কালী এবং বাবা-মার ছবিতে মালা-ধূপকাঠি দেন, ড্রেস করেন, জলখাবার খান, তারপর চেম্বার।

শ্যালো পাম্পের ডিগ ডিগ ডিগ ডিগ শুরু হল। এই শব্দটা এখনও নতুন নতুন লাগে। ছোটবেলায় এই শব্দটা ছিল না। পিঠে সিলিন্ডার বেঁধে হাতে পাইপ নিয়ে দু'জন লুঙ্গি পরা মুনিষ। এ দৃশ্যটাও ছোটবেলায় ছিল না। একটা মাছরাঙা পাখি ছুঁয়ে গেল জল, জল কেঁপে উঠল। বহু পুরনো ছবি, তবু নতুন। কাঁঠাল গাছটার গা বেয়ে একটা কাঠবেড়ালি উঠছে। নারকোল গাছের মাথায় একটি ঘুড়ি আটকে গিয়ে বাতাসে কাঁপছে। ঘুড়িতে কাস্তে-হাতুড়ি। ডাক্তারবাবু ছবি

দেখছেন। কিন্তু ছবি দেখলে চলবে কেন? অনেক কাজ বাকি। দাতব্য চিকিৎসালয়ের চেয়ার টেবিল বেঞ্চির অর্ডার দিতে হবে, বাড়িটায় চুনকাম, বিকেলে ডাক্তারের ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলতে হবে। দাতব্য চিকিৎসালয় হচ্ছে, অথচ ডাক্তারই ঠিক হল না এখনও!

দুই

পালধিদের গ্রাম কেশরকুনি থেকে গলসি তিন কিলোমিটার। এখানেই ব্লক-প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার। হালে একটা নার্সিংহোম হয়েছে এখানে। এখন বহুত নতুন কথার আমদানি। রুগিকে বলে পেসেন্ট, ডাক্তারকে বলে এসপেশালিস্ট। খাওয়া-দাওয়াকে বলে ডায়েট, পেট খসানোকে এম টি পি, গলসি বাজারের আর এম পি ডাক্তার রসরাজ যশ পালধি ডাক্তারকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। আরে আরে, আয়, আয়, কী সৌভাগ্য। ডাক্তারবাবুর পিছনের দেওয়ালে নাড়িভুঁড়ির ছবি। আওয়ার ডাইজেসটিভ সিস্টেম। একজন রুগি, রুগি তো নয়, পেসেন্ট, টুলের সামনে জিভ বের করে বসেছিল, যশ ডাক্তার বললেন, জিভ এবার জিভের জায়গায় থাক। অন্য রুগিদের দিকে চেয়ে বললেন, 'ইনাকে চিন? কেশরকুনির শিব ডাক্তার। মস্ত ডাক্তার। কলকাতা থাকেন।'

ডাক্তার পালধি বললেন, 'তোর কাছে একটু মতলবে এসেছি রসরাজ। বাবার নামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করার ইচ্ছে ছিল, তার জন্য একটু পরামর্শ...'

পালধিকে নিয়ে 'অপারেশন থিয়েটারে' ঢুকলেন যশ ডাক্তার। একটা বেড, বেডের উপর বড় একটা আলো, একটা চেয়ার, স্যালাইন-অক্সিজেনের ব্যবস্থা, জল ফোটানোর ব্যবস্থা। ফোঁড়াটোড়া কাটা, কাটা জায়গায় সেলাই করা, এম টি পি...। অপারেশন টেবিলে উঠে বসলেন ডাক্তার যশ। বললেন— 'আগে তোর ছেলের খবর বল। পালধি বললেন— 'ছেলেকে চণ্ডীগড়ে ডার্মাটোলজিতে ভরতি করিয়েছি। যশ ডাক্তার বললেন 'ডার্মা কেন? স্কিনের ডাক্তার হয়ে কী হবে? এখন হচ্ছে হার্টের বাজার।'

পালধি বললেন, 'আমার ছেলের হচ্ছে গে সুখী সুখী নেচার। ঘুমতে বড্ড ভালবাসে। চামড়ার ডাক্তারকে রাতে কেউ ডাকে না। চামড়ার রুগি মরে না, সুতরাং হুজ্জোত হবার ভয় নেই। আর চামড়ার রোগ সারে না। কোনও রুগি একবার এলে এক বছরের জন্য নিশ্চিন্তি। তোর কেমন চলছে বল।'

যশ ডাক্তার সিগারেট ধরালেন। ক্ষোভে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'খুব খারাপ, খুব খারাপ। একটা নার্সিংহোম হয়েছে, দিনের বেলায় ওখানে স্পেশালিস্ট সেন্টার। বর্ধমান থেকে ডাক্তার আসছে। দুটো হোমিওপ্যাথ হয়ে গেছে বাজারে, তার উপর হেল্‌থ সেন্টারে এখন ডাক্তার থাকে। আমার কাছে রুগি আসবে কেন আর? বড়লোকরা নার্সিংহোম-এ যাচ্ছে, গরিবেরা হাসপাতাল।

হাসপাতালে শুনলাম ডাক্তার থাকে। ওই জন্য দেখলাম তোর চেম্বারে ভিড়টা কম কম লাগছে।— তো ডাক্তার থাকে যে বড়? কেন?

যশ ডাক্তার ঠোঁট উলটে বললেন, 'কে জানে কী মধু সেখানে। লেডি ডাক্তার। কোয়ার্টারেই পড়ে থাকে।

কুমারী?

কুমারী কি না জানি না, অবিবাহিতা। হেসে উঠলেন ডাক্তার যশ। চোখেও কারুকার্য।

পালধি ডাক্তার একটু গম্ভীর মতো হয়ে গেলেন। চিরটাকাল শুনে এসেছেন হেল্‌থ সেন্টারে ডাক্তার থাকে না। অথচ...

পালধি ডাক্তার বললেন, 'তা হলে, দাতব্য চিকিৎসালয়ে রুগি হবে না বলছ?' যশ বললেন— 'না, তা বলছি না, রুগি হবে ঠিকই, তা ছাড়া ওই লেডি ডাক্তার তো চিরকাল থাকছে না...।'

ঠিকই। লোক আসবে না, হতেই পারে না, প্রতিটি মানুষের রোগ। ওখানে ডাক্তার কাকে রাখব,

এ নিয়ে পরামর্শ করতে এসিচি। ভেবেছিলাম হোমিওপ্যাথ রেখে দেব। আমাদের গাঁয়ের অশ্বিনী রেলে কাজ করত। ডাকযোগে হোমিওপ্যাথি পাশ দিয়েছে। বলেছিল দাতব্য চিকিৎসালয় করলে ও বসবে। আমি ওষুধের খরচা পত্তরটা দেব। এখন অশ্বিনী বলছে— রিটায়ার করেছি, ভাবছি হাটের বকুলতলায় নকুলের সারের দোকানের বারান্দায় বসব। বসুক গে, ওকে আর রিকোয়েস্ট করব না। গলসিতে যারা বসে তাদের একজনকে রাজি করাতে পারবে কি?— মাসে মাসে কিছু দেব।'

যশ ডাক্তার বলল, 'মনে হয় না ওরা কেউ যাবে। তবে আমি তো এখন সমিতির প্রেসিডেন্ট, বলে দেখতে পারি।'

সমিতি? ডাক্তাররা মিলে অ্যাসোসিয়েশন করেছিস বুঝি?

না, ওটা গলসি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

ব্যবসায়ী সমিতির মধ্যে ডাক্তাররাও? যশ তখন হে-হে-হে হাসেন। হাসিতে তেমন জোর নেই। চোখ নিচু, মুখ নিচু। পালধি ডাক্তার একটু ঘাড় চুলকে নেন। রসরাজ বললেন, তবে গ্যারান্টি দিতে পারব না ভাই। ওরা এটা ওটা বলে ঠিক কাটিয়ে দেবে। কে যাবে বল ঘরের খেয়ে বনের...

পালধি ডাক্তার বললেন— তা হলে কি আমার ওই স্বপ্নটা ইয়ে হয়ে যাবে? ভেবেছিলাম বাবার নামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয়... বাবা আমাকে কত খরচাপাতি করে ডাক্তারিটা পড়িয়েছিলেন...। যশ বললেন, এক কাজ কর। উদ্বোধনটা করে দে। ওটাই আসল। উদ্বোধনের পর তো কত কিছুই বন্ধ হয়ে যায়...।

পালধি চিন্তায় পড়েন। বলতে চাইলেন— বরং রসরাজ, তুই না হয় সপ্তাহে দু'দিন করে বোস। কিন্তু বলতে পারছেন না।

রসরাজ আর শিবতোষ একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত ক্লাস এইট অব্দি। তারপর রসরাজ পিছিয়ে পড়ে। রসরাজের বাবার বাষট্টি বিঘে, শিবতোষের বাবার বাহান্ন বিঘে জমি। দু'জনায় খুব ভাব ছিল। এক বাটিতে মুড়ি ছোলা খেত। বামুন শিবতোষ পালধি, আগুরি রসরাজের বোনের প্রেমে মজেছিল। কাশবনে দু'জনকে চুমুরত অবস্থায় রসরাজ দেখেও ফেলেছিল, কিন্তু রসরাজ পাঁচ কান করেনি। আলাদা করে আড়ালে বলেছিল ওকে, পারবি বিয়ে করতে? তখনকার দিনে এরকম বিয়ে কঠিন ছিল। শিবতোষ নাক খুঁটছিল, যদিও তখন ওর ডাক্তারির সেকেন্ড ইয়ার। রসরাজ বলেছিল, আর এরকম করিস না। বদনাম হলে ওকে বিয়ে দিতে পারব না। ক'দিন পরে শিবতোষ ওর বোনের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল রসরাজের বোন যূথিকার হাতে গরম তেল পড়ে ফোসকা পড়েছে। শিবতোষ কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে ওটা খুন্তির ছ্যাঁকা কি না? পরে কিন্তু শিবতোষই রসরাজকে ডাকযোগে অ্যালোপ্যাথি শিক্ষা, সচিত্র মানবদেহ পরিচয় ইত্যাদি আনিয়ে দিয়েছিল। চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জির ফিজিওলজি বইয়ের ছবি বুঝিয়ে দিয়েছিল। ওর ব্যাচমেট সতীশ কোঙার বর্ধমানে প্র্যাকটিস শুরু করলে ওকে কম্পাউন্ডার বানিয়ে দিয়েছিল। তারপর রসরাজ ভাগলপুর থেকে ছ' হাজার টাকা খরচ করে রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার সার্টিফিকেট আনিয়ে নিয়েছিল, তা সত্ত্বেও ডা. পালধি এম বি বি এস, একজন আর এম পি-কে বলতে পারছেন না— তুই বরং বোস না ভাই সপ্তাহে দুই দিন। সেই অপরাধ বোধ? আচ্ছা, রসরাজ তো নিজে থেকেই বলতে পারত যে তোর চিন্তা নেই, আমিই বসব।

ডা. পালধি শেষ অব্দি বলেই ফেলল— তা হলে তুই একটা উপায় বাতলে দে রসরাজ।

রসরাজ বলল, দেখি, বুদবুদের সি এইচ এস ও-কে বলে দেখি, মাসে কিছু দিলে যদি আসে। সি এইচ এস ও মানে হচ্ছে তিন বছরের কোর্সের ডাক্তার। প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্তের আইডিয়াতে তিন বছরের ডাক্তারি কোর্স চালু হয়েছিল। ওদের এখন অবস্থা খারাপ। মেডিকেল কাউন্সিল স্বীকৃতি দেয়নি, ওরাই গ্রামে পড়ে থাকে। কোনও প্রমোশনও নেই।

পালধি চুপচাপ। অপারেশন টেবিলে রসরাজও। রসরাজ বলল, আমার পেসেন্টরা সব বসে

আছে অনেকক্ষণ...। পালধির অভিমান হল খুব। বাজারের বাইরে বের হলেন। রিকশা নিলেন একটা। রিকশাওলাকে বললেন, 'কেশরকুনি যাব।' রিকশাওয়ালা বলল, বহু দূর, বারো টাকা লাগবে। ঘাড়টা তেড়া, যেন উঠলে উঠুন— না উঠলে দরকার নেই। রিকশাওয়ালারা এ রকম ছিল না।

রাস্তার দু'পাশে সবুজের ব্যস্ততা। মাঠের বিশ্রাম নেই, এটা উঠলে তো ওটা রুয়ে দাও। রিকশাওয়ালাটির পিঠে চোখ পড়ল ডা. পালধির। ফোসকার মতো বেশ কয়েকটা। রিকশাটা থামাতে বললেন। ডা. পালধি পিঠটা দেখতে থাকেন। জি টি রোড দিয়ে ট্রাক ভরতি, মিৎসুবিসি— ওনিডা—কেলভিনেটার চলে যায়। রিকশাওয়ালাটির গায়ে এইট্রি স্পিডের হাওয়া লাগে। পালধি জিজ্ঞাসা করেন— খুব জ্বালা করে? ছেলেটি বলল, করে।

খুব?

মোটামুটি।

মোটামুটি মানে?

গরম তেলের ফোস্কা লাগলে যেমন...

ক'দিন হয়েছে?

গত মঙ্গলবারের দিন।

এ তো হারপিস জস্টার। পালধির মনে ছোট্ট হিসেব হয়ে গেল— চল্লিশ টাকা।

চিকিৎসা করাসনি?

না?

কেন?

চিকেচ্ছা করিয়ে কী হবে। এটা একটা পাপ বেরিয়েছে। পাপ।

পাপ?

আজ্ঞা।

কী পাপ?

সে আছে।

এইসব কুসংস্কার নিয়েই গ্রামের মানুষরা সব বেঁচে আছে। অজ্ঞানতা, অশিক্ষা...। কিচ্ছু করার নেই। সাইকেল রিকশা গ্রাম্যশোভা ভেদ করে যায়। বটগাছ লাল বটফলে ভরে আছে। কাঠবিড়ালীর আনাগোনা। বটগাছের তলায় একটা লোককে ঘিরে তিন-চার জন বসে আছে। টুকরো কাগজে কী লিখে দিল লোকটা? সাট্টার নম্বর? সবুজ ধানে অবুঝ ঢেউ। পল্লিবধূ কলসি কাঁখে জল আনিতে যায়...। কলসি কোথায়? পলিথিনের জারিকেন। জারিকেনে কী? দিশি? আহা! কী বিশাল আকাশ। বেলঘরিয়াতে আকাশই দেখা হয় না। কী সুন্দর পাখি দোল খাইতেছে তরুশাখে। তরুশাখা নয়, ইলেকট্রিকের তার। তার থেকে হুক করছে কারেন্ট ওই চায়ের দোকানে। ডোবাতে বালক-বালিকা খেলা করিতেছে। খেলা না, গেঁড়ি-গুগলি খুঁজছে। ওই সেই হেলে যাওয়া মন্দির। মন্দিরের পাশে শহিদ বেদি। জোতদারের গুণ্ডাদের দ্বারা...। ওখানে এখন কী যেন হচ্ছে। সবুজ রঙের আবির উড়ছে। এখন আবিরের রং-এ কত কিছু বোঝা যায়। কী গ্রাম কী হয়ে গেল...।

কত ছিল ভাই ভাব
কতই শান্তি ছিল, যদিও অভাব
ম্যান্যজনে মান পেত, গরিব পেত দয়া,
বললে লোকে কথা শুনত, করিত না তর্ক।

মিলল না। না মিলুক বহুদিন পরে অন্তরে কেমন কাব্য জেগেছে। বেলঘরিয়ায় প্র্যাকটিসের ব্যস্ততায় এইসব সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রজাপতি শুঁয়োপোকা হয়েই থাকে।

সেগুনের একটা হলুদ পাতা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে পালধি ডাক্তারের ঠিক কোলে এসে পড়ল। দু' পাশের রাস্তায় আকাশমণি গাছ। সামাজিক বন। সেগুন পাতা এল কোত্থেকে? বাবার কথা মনে পড়ল ফের। ডা. পালধি ওর বাবার একটা ডায়েরি পেয়েছিলেন, তাতে নানারকম মনের কথা লেখা ছিল পদ্যে। যেমন—

সেগুনের বহু গুণ
দাম বাড়ে বহু গুণ
গোটা দশ সেগুন পুঁতে
সন্তানে রাখ দুধে ভাতে।

সেগুন-পাতাটা হাতে ধরে থাকেন ডাক্তার পালধি। মনে পড়ে বাবার লেখা—

সাতবর্ষ ধরি
বহু ব্যয় করি
পুত্ররে করিনু ডাক্তার।
তার হবে গাড়ি
তারই হবে বাড়ি
শতলোকে জানিবে নাম তার।
(আমি) রাখিব এ দেহ
জানিবে না কেহ
কী বা মোর ছিল অবদান।
আমি ভাবি মনে
ডাক্তারি পিছনে
রয়েছে ক' হাজার বস্তা ধান।
(যদি) ডাক্তারি না পড়িত
(মোর) জমি বেড়ে যেত
কিম্বা করিতাম চাল কল।
গীতা কাছে আনি
মনে স্মরি বাণী
কর্ম কর, চাহিও না ফল।

বাবার মৃত্যুর পর নীল ডায়েরিটা হাতে পড়েছিল পালধির। কবিতাটা পড়েছিলেন। তখনই সংকল্প করেছিলেন বাবার নামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করবেন। পিতৃঋণ তো শোধ হয় না, তবু যদি কিছুটা...।

যেদিন উদ্বোধন হবে, সেদিন যে বক্তৃতাটা দেবেন সেটাও কাব্যে দেবেন ভেবেছিলেন পালধি। পুরোটা না হলেও কিছুটা। বাবার থেকে কিছুটা কাব্যের জিন পালধির ক্রোমোজমেও এসেছে। বাবার একটু সাহিত্যবাতিক ছিল। বাবার কাঁঠাল কাঠের আলমারিতে কপালকুণ্ডলা, শ্রীকান্ত, অল পারপাস ইজি লেটার রাইটিং, দলিল লিখন, গৃহস্থের বন্ধু, রাই উন্মাদিনী, পাষাণের কান্না, প্রেমের আলেয়া, যাবার বেলায় পিছু ডেকো না, এ রকম কত বই রয়েছে। গতবার যখন এসেছিলেন, মুনিষ ডাকিয়ে আম-বকুলের পোকা মারার মেটাসিড স্প্রে করিয়েছিলেন আলমারিতে।

ডা. পালধি রিকশায় বসে ডি ভি সি বিধৌত ধান খেতের ওপারে দেখলেন অস্তগামী সূর্যের রিবোফ্লাবিন ট্যাবলেটের মতো রং। বকেরা ফিরছে। মাঠ দাপানো ডিজেল গন্ধ মাখা বাতাসে হাওয়াই শার্টের কলার কাঁপছে। পালধির মনে মনে ভাব এল।

পিতঃ, বহু ঋণে বেঁধেছ আমারে
সাধ্য নাই পিতৃ ঋণ শোধ করিবারে
তুমি ছিলে মহাপ্রাণ পুত্র বৎসল...

তারপর এই গোধূলি আলোয় অনন্ত চরাচরে সত্যি কথাটা বুকের ভিতরে এল—

লইয়াছি কত টাকা করি কত ছল।

কিন্তু এ সব কি প্রকাশ্যে বলা যায়? এই একাকী অবস্থায় পালধির পুরনো কথা মনে হয়। কত টাকা কতভাবে উড়িয়েছে। অমিত, পিনাকী, বনশ্রী, আলপনাদের কথা মনে এল।

তুমি যবে শয্যা নিয়া ডাকিতেছ মোরে আমি মূঢ় মোহগ্রস্ত প্র্যাকটিসের ঘোরে—

এটা অনুতাপ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এটা বলবেন পালধি। এম বি বি এস পাস করার পর প্রথম চাকরি আগরপাড়া জুট মিলে। বেলঘরিয়ায় ঘর ভাড়া করে থাকা। তারপর ওখানেই প্র্যাকটিস। বাড়ি কেনা, একদম রাস্তার উপর। নীচে চেম্বার। তারপর রোজগার আর ইনকাম। ইনকাম আর রোজগার। রোজগারের কত রকমের রাস্তা, কত রকম টেকনিক।

অন্ধকার নামছে। রিকশাওয়ালাটার পিঠের ওই হারপিস ঘা-কে অন্ধকার ঢেকে দিয়েছে। বাঁদিকে মোরামের রাস্তা। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র! ডা. পালধি হঠাৎই বললেন, বাঁদিকে ঘোরাও তো একটু, বাঁদিকে ঘোরাও। হাসপাতালে যাব। হঠাৎই ওই লেডি ডাক্তারটির কথা মনে হল পালধির। রসরাজের কাছে শুনেছিলেন এই হাসপাতালের ডাক্তারটি কোয়ার্টারেই থাকেন। ওকেই যদি একটু রিকোয়েস্ট করা যায়...!

রিকশাওয়ালাটি জিজ্ঞাসা করল, কার কাছে যাবেন?

লেডি ডাক্তার।

আপনার কী রোগ?

কঠিন প্রশ্ন। রিকশার টায়ারের সঙ্গে এখন পথের মোরামের কথা হচ্ছে খর খর— খর খর। আমার একটু হাইপার টেনশন। বি পি ওয়ান ফিপটি বাই হানড্রেড টেন। একটু ইউসনফিল বেশি। একটু কুশিং সিনড্রোম, একটু ডারমাটো মাইওয়াসাইটিস। চোখের নীচটা ফোলা ফোলা, লোকে ভাবে খুব মাল খাই। আর একটা রোগ আছে। শান্তি পাই না। কিছুতেই শান্তি নাইরে ভাই...।

তিন

বারান্দার সামনে জুঁই লতিয়েছে। একটা কম পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। ওখানে একটা বেতের চেয়ারে বসে চশমা চোখে, পাঞ্জাবি পরা একটা মেয়ে সিগারেট টানছে। কানে হেড ফোন। ক্যাসেট চলছে। রিকশাটা ওখানে থামতেই মেয়েটা কান থেকে হেড ফোন সরাল। শচীনদেবের গান। মেয়েটা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল— 'কী ডাক্তার, কী খবর?'

এ কেমন মেয়েছেলে? ডা. পালধি ভীষণ অবাক। পালধিকে চেনে তা হলে। প্রথম দর্শনে এ কেমন সম্বোধন? মাল-ফাল খেয়ে আছে নাকি? বিচিত্র নয়। সিগারেট ফুঁকছে যখন...

রিকশাওয়ালা বলল, ভাল আছি দিদি। আপনি?

ভাল। তোমার ওই অর্জুনপুরের পেসেন্টের খবর কী?

ইক্কেবারে আরাম হঁয়ে গেছে। চাষের কাজে লেব্যে গেছে।

ফাস ক্লাস।

ডা. পালধি ব্যাপারটা ঠাহর করতে পারেন না। কোনও ইয়ারকি নাকি? পালধি ওদের দেখতে থাকেন।

মেয়েটা এবার পালধির দিকে তাকায়। সিগারেটটা ফেলে দেয়। বলে, বলুন, কী ব্যাপার।

ডাক্তার পালধি কীভাবে কথা শুরু করবেন বুঝে পান না। বলেন, আপনিই বুঝি এই পি এইচ সি-র...

হ্যাঁ, আমিই ইনচার্জ।

আপনি নাকি সবসময় এই হাসপাতালেই থাকেন...

হ্যাঁ, থাকি তো, দেখতেই পাচ্ছেন।

আমি ডাক্তার শিবতোষ পালধি। এখান থেকে দু' কিলোমিটার দূরে কেশরকুনি গ্রামে আমার বাড়ি। কিন্তু কলকাতায় থাকি, ওখানেই প্র্যাকটিস করি। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

লেডি ডাক্তার জোড়হাত করেন। বলেন, আসুন, ভিতরে আসুন।

পালধি বললেন— না-না, এখানেই হয়ে যাবে। অল্প দুটো কথা।

লেডি ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা খুললেন। দরজার গায়ে কাঠের ব্লকে লেখা ডা. রত্না সরকার, এম বি বি এস, ডি সি এইচ।

ঘরে বেতের চেয়ার ডবল খাট। খাটে একজন বৃদ্ধা বসে টিভি দেখছেন। লেডি ডাক্তার বললেন, আমার ঠাকুরমা। আমি আর ঠাকুরমা থাকি। ডা. পালধি মেয়েটির মাথার দিকে তাকিয়ে সিঁদুরের চিহ্ন খুঁজতে থাকলেন। আজকালকার মেয়েরা অনেকে বয়কাট চুলেও এক কুচি সিঁদুর লাগিয়ে রাখে।

বলুন কী ব্যাপার। লেডি ডাক্তার বলেন। পালধি তার মনোবাসনার কথা জানান। তারপর দু'বার আঙুল মটকিয়ে বলেন, বলছিলাম কী, আপনি যদি কাইন্ডলি সপ্তাহে দু'দিন করে আসেন...। আমি কিছু অনারিয়ামের ব্যবস্থা রেখেছি...

লেডি ডাক্তারটি বললেন— আচ্ছা, আমি ধরুন গেলাম, রুগি দেখলাম, প্রেসক্রিপশন করলাম, কিন্তু ওষুধপত্র?

তাও কিছু কিছু কিনে দেব। যেমন ধরুন কারমিনেটিভ মিক্সচার, এলকালি মিক্সচার, কিছু মেট্রোজিল, সারফাগুয়ানিডিন, ক্লোরোকুইন আর মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে...

এসব লাল ওষুধ— সাদা ওষুধ তো আমার হাসপাতালেই আছে। আপনি মেবিনডাজোল দিতে পারবেন— যা কৃমির উৎপাত! ডক্সিসাইক্লিন দিতে পারবেন? এরিথ্রোমাইসিন? পেপটিক আলসারের জন্য র‍্যানিটিডিন? ওমিপ্রাজোল দিতে পারবেন?

বড্ড কস্টলি এসব...

তবে আর বাবার স্মৃতি করে কী লাভ?

ডাক্তার পালধি কিছুক্ষণ চুপচাপ। এ সময় মাথা চুলকোনো আনস্মার্টনেস। সোজাসুজি বললেন— তা হলে যাবেন না, এই তো? লেডি ডাক্তার বললেন— যাব না বলিনি। আমার তো যেতেই হয় ওধারে। সাঁওতায় আমাদের সাবসিডারি হেল্‌থ সেন্টার আছে। আপনার গ্রামেও যাই। ওখানে আমাদের হেল্‌থ ওয়ার্কার আছেন— মালতী গড়াই। আমি যাব। এই কারণেই যাব— আপনি আজ ছোট করে শুরু করলে কাল ওটা বড় হতে পারে। আমি আজ ওখানে বসতে শুরু করলে কাল অন্য কেউ বসবে। কাজটা শুরু হোক না। আমি যাব। পালধির হাসি ফুটল মুখে। জুঁই ফুলের গন্ধ নিয়ে বাতাস ঢুকল ঘরে। লেডি ডাক্তারের বুড়ি ঠাকুরমা ইশারায় ডাক্তার নাতনিকে চা করার কথা বলেন। পালধি বলে, তা হলে কার্ড ছাপাই? আপনার নাম লিখি ম্যাডাম? লেডি ডাক্তার হাসলেন, ছোট্ট করে মাথা নাড়লেন। আর বললেন, এক মিনিট। ভিতরে গেলেন। চা-চামচের টুং টাং। ডা. পালধির গান মনে এল মধুর মধুর ধ্বনি বাজে। ওর মেয়ে গায়।

চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকলেন ডা. রত্না সরকার। তিনটে চা।

ডাক্তার— চা নিয়ে যাও...।

রিকশাওয়ালাটি ঘরে এসে চা নিল। পালধি বললেন, আচ্ছা, একটা কথা। আপনি যে বড় ওকে ডাক্তার ডাকেন, ও আবার রেসপন্ডও করে, ব্যাপারটা কী?

রত্না খিলখিল করে হাসলেন। অনেকটা হাসি। হাসতে হাসতেই বললেন, 'ও তো ডাক্তারই। তবে বলি, শুনুন। আমার কাছে ও প্রথম যেদিন এল একটা মেয়েকে এনেছিল। পোস্ট ডেলিভারি পেইন উইথ পিউএরপেরাল ফিভার। বলছে— আমার চিকিচ্ছেয় কাজ হল না, তাই আপনার কাছে আনলাম।

কী চিকিচ্ছে করে ও? ঝাড়ফুঁক?

ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না।

রিকশাওয়ালাটা মেঝেতে বসে চা খাচ্ছিল। ও খুব বিনয়ের সঙ্গেই বলল— নাঃ আইজ্ঞে, সে রকম কিছু লয়, আমি তিনটা রোগের ওষুধ জানি। আমার বাপ আমায় বইলে গেছিলেন। আর কিছু না।

কী কী রোগ?

ওই তো, কানপাকা, হেঁতাল ব্যথা, আর অর্শ রোগ।

কী চিকিচ্ছে?

লতাপাতা

কান পাকায় কী দাও?

কানশিরে পাতার বোঁটা ভেঙে রস।

হেঁতাল ব্যথাটা কী—

রত্না তখন বলেছিল, 'পোস্ট ডেলিভারি পেইন।'

কী ওষুধ?

বাপ চিনিয়ে দেছিল, গাছের নাম জানি না।

পালধি উঠলেন। বললেন, আপনি আমায় বাঁচালেন ম্যাডাম। আবার এসে কথা বলে যাব আসি।

রিকশাওয়ালাও বলল, আসি দিদি।

রত্না ওই রিকশাওয়ালাটির পিঠে হাত রাখলেন। রিকশাওয়ালা কঁকিয়ে উঠল।

কী রে, তোর পিঠে কী হয়েছে?

ও কিছু না।

রিকশায় উঠে বেশ একবার একটা শান্তি শান্তি ভাব। আকাশে বরিক পাউডার মাখানো চাঁদ, ইউক্যালিপটাসের সামাজিক বনে চাঁদের আলোর অ্যানাসথেসিয়া।

সিগারেটখোর মেয়েটার জন্যই ওর কাজটা হতে চলেছে। বাবার আত্মা শান্তি পেতে চলেছে। পিতৃঋণের অন্তত একটা ইনস্টলমেন্ট শোধ হতে চলেছে। অবশ্য সিগারেট তো আজকাল অনেক মেয়েই খায়। টিভিতে তো হরদম দেখা যায়। আজকালেই বা কেন? ডাক্তারি ক্লাসের আইভি বলে মেয়েটা, সে-ও তো খেত। খাগ গে সিগ্রেট, যদিও রিগ্রেট, তবে যাই বলো, মেয়েটার ব্যাভার কিন্তু মন্দ নয়। তা, বে' থা করেনি কেন? ওর কি বাপ-মা নেই? আবার ঠাকমাকে নিয়েই বা আছে কেন? ঝামেলা ভাল লাগে? কাকা-জ্যাঠা-পিসি কেউ নেই তো আর হতে পারে না, এই রিকশাওয়ালাটার সঙ্গে ওর এত ভাব হল কী করে, কে জানে। ডা. পালধি রিকশাওয়ালাকে বললেন, হ্যাঁরে, ডাক্তার দিদিমণির সঙ্গে তোর এত ভাব হল কী করে র‍্যা?

আমিও চিকিচ্ছে করি, উনিও করেন, তা বাদে আমুও রুগি দেখে ট্যাকা লি না, উনিও ল্যান না।

ওব্বাবা!

আমুও আমার সুখদুখের কথা উকে বলি, উ-ও সুখদুখ কথা আমাকে বল্যেন।

বাবা! তোদের খুব মিল দেকচি।

মিল, কিন্তু গরমিলও আচে।

নাটকীয়ভাবে এইটুকু বলেই রিকশাওয়ালাটা ডানদিকে রিকশা ঘোরাল। কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে কেশরকুনি কিলোমিটারটাক। বিশাল বটগাছটার তলা দিয়ে যাবার সময় ডান হাতটা হ্যান্ডেল ছেড়ে কপালে ছোঁয়াল।

মিল তো শুনলাম। এবার গরমিল কিছু কিছু শুনি? পায়ের উপর পা তুলে বেশ আরাম করে রিকশার সিটে বসে আছেন পালধি ডাক্তার।

গরমিল তো অনেকই আছে। তার মধ্যে পরধান হচ্ছে— দিদিমণির কমমো তার বাপের দায় আর আমার ধমমো আমার বাপ যা চায়। ঝিঁঝির আওয়াজ, আকাশে ছায়াপথ, দূরে ট্রাক যায়। হেঁয়ালি হেঁয়ালি।

বাপের দায় মানে?

মানে? মানে হলগে— ওই দিদিমণির বাবা হচ্ছেন গে ডাক্তার। কলকাতার মধ্যে মানিকতলা আছে, হোতায় বসে।

ও, আচ্ছা।

রুগি ছুঁলেই পঞ্চাশ ট্যাকা লেয়।

বেশ তো

রুগি এলেই বেলাড টেস পেসাব টেস। বর্ধমানের হোটেলে খদ্দের ধরে আনলে রিকশাওয়ালা যেমন কমিশন নেয়, ওই দিদিমণির বাপও তেমন কমিশন লেয়।

ঠিক আছে।

কমিশনের লোভে মিছামিছি টেস করায়।

ও।

কমিশনের লোভে শুধুমুদু বুকের কাঠির ফটোক তোলায়।

নাকি?

তা বাদে সরকারি বাবুদের মিছা চিকিচ্ছার হিসাব দিয়ে কমিশন লেয়।

পালধি নিশ্চুপ।

দিদিমণির এসব মোটে পছন্দ লয়। এজন্য পটে না। ওই জন্যে ঘরে থাকে না। ওই জন্য ঠাকমা লিয়্যে চলে আঁস্যেছে। বাপের কাজ নিজে করে ধম্মে থাকছে থির।

হাওয়াটা কি বন্ধ হয়ে গেল? গা-টা একটু জ্বলছে। ইউসেনফিল বাড়ল নাকি? চাঁদটা কি মেঘে ঢাকল? অন্ধকার। পালধি কোনও কথা বলছেন না।

আর আমার কথা বলি। শুনছেন বাবু? আকাশে ছায়াপথ। নক্ষত্রের হিরে কুঁচি। পালধি বললেন— বলো।

আমার বাপ আমাকে ক'টা গাছ চিন্যে দে বলেছিল, এই গাছ এইভাবে ব্যাভার করবি, আর রুগি এলে ফির্যা দিবি না, আর এ কাজে ট্যাকা পয়সা লিবি না। বুঝলেন বাবু? পালধি জোনাকি দেখেন।

আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন রোজা। তেনারও ছিল এমন ভাব। বিদ্যে বেচে পয়সা লিত না। বুঝলেন বাবু।

জোনাকি! জোনাকি!

আমি বুইজলেন, একটা পাপ করে ফেল্যাছি। দিদিমণিকে ওটা বলব ভেবেছিলাম, লজ্জায় বলা হয়নি। রিকশাটা একটু থামায় ও। বলল, বড্ড অন্ধকার, লম্পটা ধরাব।

ও দেশলাই জ্বালে। চরাচর ভর অন্ধকারের মধ্য রিকশাওয়ালাটির মুখ। ও লম্প ধরায়।

পাপের কথাটা বল্যেই ফেলি আইজ্ঞা। একটা রুগি বাড়ি গিয়েছিলাম শনিবার। মেয়াঁছেলে। পরথম পোয়াতি। খুব সোন্দর। হেতাল ব্যথা। ওষুধ দিলাম। সোমবার দেখতে গেলাম।

ও চুপ করল। আর কিছু না বললেও পালধি ডাক্তার বুঝতে পারছেন কী পাপ। সুন্দর রোগিণীর সামনে নিজেকে কন্ট্রোলে রাখাটা...

গিয়ে দেখি ব্যথা নেই। আরাম হঁয়ে গেছে। মেয়াঁটার বাবা টাকা দিতে চাইল। উরা বড়নোক। আমার সামনে ধরা একটা পঞ্চাশ ট্যাকার নোট বাতাসে কাঁপছে। ট্যাকাটা লিয়ে নিলাম গো বাবু, গলসি বাজার থেকে একটা হরলিস কিনলাম আমার ছেল্যেটার জন্য, আর মঙ্গলবারে আমার পিঠ ফুঁড়ে বেরুল পাপ। পাপের চিন্ন।

কী একটা পাখি ডেকে গেল।

দু' পাশের অন্ধকারকে সাপটে ধরতে চাইলেন পালধি। হাওয়া নেই। গায়ে বড্ড জ্বালা। পাপ? আকাশটা বড্ড ঝুঁকে পড়েছে গায়ের ওপর। আকাশ, ক্ষমা করো। নিজের মাটি, দেশের মাটি, ক্ষমা চাইছি, বটবৃক্ষ, একটু ক্ষমা দাও। চোখে জল আসে কেন? ধুস।

চারিপাশের অন্ধকারে রিকশাটার কেরোসিন আলোয় রিকশাওয়ালাটার মুখ জ্বলছে। পালধি বললেন, বাকি রাস্তাটুকু হেঁটেই চলে যাব রে। বুঝলি।

শারদীয় বর্তমান, ১৯৯৮

যৌবন বারিধি

যা রটে, তার কিছু পার্সেন্ট তো সত্যি বটে। কুণাল ঠিক করেছে রেড হ্যান্ড ধরবে। কুণালের বউয়ের নাম ভাস্বতী। কুণালের মনে হচ্ছে ততটা আর সতী নেই ভাস্বতী।

ভাস্বতীকে নিয়ে কুণাল কিছু কথা শুনেছে হেথা হোথা। যে ছেলেটি ক্যুরিয়ারের চিঠি দেয়, সে একদিন বলল— দুপুরবেলা আপনাদের বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে বেল বাজাতে হয়। বউদি দরজা খোলেন না।

কুণাল বলেছিল, ঘুমোয় বোধহয়...

ছেলেটি বলেছিল, না, না ঘুমোন না। বেল বাজালে বউদির গলায় খুলছি খুলছি শুনি, কিন্তু খুলছি বলার পরও অন্তত দশ মিনিটের আগে দরজা খোলেন না। কুণাল একদিন ওর অফিসের পিয়োনকে পাঠিয়েছিল একটা চিরকুট দিয়ে— ওর হাতে হংকং ব্যাংকের পাশবুকটা দিয়ো। পিয়োনটিও এসে বলেছিল অনেকক্ষণ বাজাতে হল।

দুপুরবেলা বাড়িতে ফোন করলে প্রায়ই শোনে এনগেজের টোন। কারুর সঙ্গে কথা বলে, নাকি ঘরের ভিতরে এমন কিছু করে যে ডিসটার্ব হতে চায় না বলে ফোনটা উঠিয়ে রাখে?

কুণাল ব্যস্ত লোক। অফিসে বেদম খাটুনি। তাই ছুটির দিনে বেরোতে চায় না। অথচ ভাস্বতী নাটক দেখতে খুব ভালবাসে। তথাগতের সঙ্গে দেখে মাঝে মাঝে। তথাগত কুণালেরই বন্ধু। কুণালই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তথাগতের সঙ্গে। তথাগত গ্রিটিং কার্ড পাঠায় ভাস্বতীকে। জন্মদিনে, নতুন বছরে...।

ভ্যালন্টাইন ডে-তে পাঠায় কি না কে জানে। সেদিন বিছানার উপর একটা বই দেখেছে কুণাল— 'ভাস্বতীর পদ্মহাতে সদ্যছাপা গদ্য বই'— তথাগত। তথাগত লেখেটেখে।

কুণাল আজ দুপুরবেলা অফিস থেকে বেরিয়েছে। কাজ কম ছিল বলেই বেরোতে পেরেছে এমন নয়। আসলে আজ মরিয়া হয়েই বেরিয়েছে। ধরেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। আজ ধরবেই।

সামনের রাস্তাটা জানলা দিয়ে দেখা যায়। তাই পিছনের রাস্তা দিয়ে স্কুটারটা নিয়ে এসেছে। স্কুটারটা একটু দূরে রেখে হেঁটে হেঁটে ফ্ল্যাটের কাছে গেল কুণাল। স্কুটারের শব্দটাকে পৌঁছুতে দিতে চাইছে না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল কুণাল। বেলটা টেপার আগে দরজায় কান পাতল কুণাল। টিভি চলছে। এবারে বেল টিপল। বার তিনেক টেপার পর ভাস্বতীর বিরক্তি মেশানো গলায় শুনল— কে?

কুণাল কিছু বলল না। ওর গলা শোনাতে চায় না এখন। আইহোলের সামনে থেকে সরেও দাঁড়াল কুণাল। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার বেল বাজাল। কিন্তু কোনও সাড়া নেই। আরও দু'বার বাজাবার পর আবার একইরকম 'কে?' কুণাল বলল, আমি, আমি। খোলো। এতক্ষণ কী করছ? ভাস্বতীর গলায় শুনল— খুলছি। ঠিকই বলেছিল ক্যুরিয়ারের ছেলেটি। পাক্কা দশ মিনিট পর দরজা খুলল ভাস্বতী। খুলেই বলল— এখন? অসময়ে? কুণাল বলল, একটা জিনিস দরকার। একটা বই। কুণাল প্রথমেই জুতোর র‍্যাকে চোখ রাখল। নতুন কোনও জুতো দেখতে পেল না। তারপর ওর বেডরুমে গেল। এরপর পেনটা ফেলে দিয়ে, পেন তুলবার অছিলায় খাটের তলাটা দেখল। তারপর পাশের ঘরটায় গেল। ওই ঘরে আগে বাপটু থাকত। ওদের ছেলে। বাপটু এখন নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে ভরতি হয়ে হোস্টেলে থাকে। পাশের ঘরের র‍্যাক থেকে কী একটি ইংরেজি বই

নিয়ে ওর ব্রিফকেসে ঢোকাল। তারপরেই 'একটু ল্যাট্রিন করে নি' বলে টয়লেটেও গেল। টয়লেট শুকনো এবং ফাঁকা। ফ্লাস ট্যাংকটার ঢাকনা খোলার কোনও মানে হয় না। খুব অবাক হয়ে গেল কুণাল। চিড়িয়া ভেগেছে। কিন্তু চিড়িয়া হয়ে তো ভাগতে পারে না। তা হলে?

কুণাল সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল ভাস্বতীকে, দরজা খুলতে এত দেরি হল কেন?

ভাস্বতী বলল— হতেই পারে। নানারকম কারণ থাকে মেয়েদের। পার্সোনাল।

॥ ২ ॥

দেরি তো হবেই। ভাস্বতী ট্যাঁড়শের হড়হড়ে রসের সঙ্গে পোস্তবাটা আর মুলতানি মাটি মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করে মুখে মেখেছিল দুপুরে। একটা মেয়েদের পত্রিকায় এই ফর্মুলাটা পেয়েছে। কুণালের গলা পেয়েই ভাস্বতী মাস্কটা ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা চালাচ্ছিল, কিন্তু ট্যাঁড়শের রস মুলতানি মাটির সঙ্গে এমন গেঁড়ে বসেছিল যে খুলছিল না। এক্কেবারে 'যেতে নাহি দিব' তা ছাড়া শুকিয়ে যাওয়া ট্যাঁড়শ জুস জল পেয়েই আবার হড়হড়ে।

প্রতিদিনই দুপুরটা এভাবে কাটে ভাস্বতীর। এটা ওটা মেখে রাখে মুখে। তখন কেউ এসে পড়লে বড্ড ঝামেলা হয়। অনেক কিছুই মেখেছে। তবে ট্যাঁড়শের রস আজই প্রথম। ওই মহিলা পত্রিকায় বলা ছিল— এই মাস্ক শুষ্ক কিংবা তৈলযুক্ত দু'রকম ত্বকেই চলবে।

ভাস্বতীর এই সমস্যা আজও মিটল না। ওর ত্বক শুষ্ক, নাকি তৈলাক্ত?

আচ্ছা, যে পর্দাটা হাড় মাস ঢেকে রাখে সেটা চামড়া, নাকি ত্বক? ছোটবেলা ইস্তক ও দেখেছে ত্বক চকচক করে কিন্তু চামড়া ফাটে। ত্বক প্রসাধিত করতে হয় কিন্তু চামড়ায় ঝামা ঘষতে হয়। চামড়ায় ফুসকুড়ি ওঠে কিন্তু ত্বকে ওঠে ব্রণ। ত্বকে লাগাতে হয় ময়শ্চারাইজার কিন্তু চামড়ায় সরষের তেল।

সে যাই হোক। ওর সমস্যা হল ও বুঝতে পারে না ওর চামড়াটা শুষ্ক নাকি তৈলাক্ত ত্বক? শুষ্ক ত্বক হলে ডিমের কুসুম, আর তৈলাক্ত ত্বক হলে সাদা অংশ। বাপের বাড়ি গেলে ওর মা বলেন, তোর মুখটা বড় শুকনো লাগছে রে ভাসু। আবার ওই কবি, মানে 'হাবির'-র বন্ধু তথাগত আলাপের প্রথমদিকে একদিন আচমকা বলেছিল— তোমার গালে আমি আমার মুখের ছায়া দেখতে পাই। ভাস্বতী বলেছিল, কেন, কেন, কেন? তথাগত বলেছিল, আসলে তোমার গালটা খুব তেলতেল কিনা, চকচক করে তাই...। বলেই ঢোক গিলেছিল তথাগত। হতে পারে, ওই কেন কেন-র ঠেলায় নার্ভাস হয়ে গিয়েই ও কথাটা বলেছিল। ভাস্বতী জানে পুরুষরা খুবই নার্ভাস প্রোন। আসলে আচমকা ওইসব আলোছায়া আঁতেল কথায় ঝটকা খেয়ে এক দমকায় কেন কেন কেন বলে ফেলেছিল ভাস্বতী। স্বর যন্ত্রে ব্যালান্স ছিল না। ওই 'কেন' গুচ্ছধমকের মতো শোনাতেই পারে এবং ধমক খেয়ে মিথ্যে বলতেই পারে কোনও লোক। সুতরাং ওই তেলতেলে শব্দটাকে এলেবেলে ভেবে ওর স্বামীকেই একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল— হ্যাঁগো, আমার চামড়াটা, সরি সরি ত্বকটা শুষ্ক না তৈলাক্ত?

তখন কুণাল দাড়ি কাটছিল, অফিস যাবে, সকালবেলা, রেডিয়োতে সাতটা চল্লিশের রবীন্দ্রসংগীত, কড়াইতে বেগুন। ভাস্বতী রান্নাঘর থেকে হঠাৎই বেরিয়ে এসেছিল ওই গূঢ় প্রশ্ন নিয়ে। ওর হাতের খুন্তিতে তখনও মৃদু ধোঁয়া। কুণাল আচারিয়া গো বেচারিয়ার মতো তাকাল ভাস্বতীর দিকে। ভাস্বতী আবার ওই প্রশ্নটা করলে কুণাল ভ্যাবাচারিয়া হয়ে যায়। ভাবে কোনটা বলা ভাল? শুকনো না তেলতেলে? কোনটা বেশি প্রেস্টিজিয়াস? কুণাল অফিসে শ্রুড নামে খ্যাত। ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিয়ন দু'পক্ষকেই খুশি রাখে। ও বলল, ওগো, তুমি কখনও তৈলাক্ত আবার কখনও শুকনো। তুমি টু ইন ওয়ান। দুটি হলে তো চলবে না। যে কোনও একটা বেছে নিতেই হয়। আজই বেছে নিতে হবে... ভাস্বতীর জেদ চেপে গিয়েছিল।

ডিমের সাদা আর কুসুম নিয়েই হল ডিম। ডিম থেকে সাদা অংশ আলাদা করতে গিয়ে কী ঝকমারি। কুসুমটা ফেটে গেলে সাদার মধ্যে মাখামাখি হয়ে যায়। পাঁচটা ডিম এভাবে ওমলেটের জন্য রেডি হল। তারপর ছ' নম্বর ডিমটা থেকে সাদা অংশটা আলাদা করতে পেরেছিল।

কিন্তু সাদা মাখবে, নাকি হলুদ মাখবে? শুকনো নাকি তৈলাক্ত?

ভাস্বতী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখে। শুকনো নাকি তেলতেলে। গান হচ্ছে। রবীন্দ্রসংগীত। আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না। কবিগুরু কত কী বুঝতেন। বেগুন পুড়ে যাচ্ছে।

এ বেলা বেগুন ভাজা, মাছভাজা, ডাল, ওমলেট আর স্যালাড। রোজ স্যালাড খাওয়া ভাল। চামড়া মসৃণ থাকে। উঁহু ত্বক। রূপচর্চার বইতে এসব পড়েছে ভাস্বতী, তাই টমেটো, গাজর, শশা, ক্যাপসিকামের 'সালাদ'। লেটুস পাওয়া যায় না এ বাজারে। দুপুরে ভাস্বতী যখন খাবে, তখন আরও স্যালাড কেটে নেবে।

কাঁচা শাকসবজি আর তরকারি-খোসা
খাইলে জানিও বাহ্য হইবে খোলসা।
খোলসা বাহ্য হইলে শুন হে রমণী
চামড়া উজ্জ্বল হবে, ফুসকুড়ি হবেনি।

বিনা মেডিসিনে রূপচর্চা নামে পাঁচ টাকা দামের চটি বইতে এসব আছে। সোদপুরে ওর দিদির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল ভাস্বতী, ফেরার সময় হকারের কাছ থেকে কিনেছিল এই চটি বইটি, ট্রেনে। এরকম অনেক দরকারি বইটই পাওয়া যায় ট্রেনে। যেমন লতাপাতার গুণ, কলকাতা-হাওড়া বাসরুট, সহজ গ্রামার শিক্ষা, সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা...। এটা বেশ অন্যরকম বই। সিন্দুর দিবার উপকারিতা কী?— না ইহা 'অ্যান্টিসেপটিক' ইহা ব্যবহারে মাথায় খুশকি হয় না। বিবাহিতা নারীর লোহা শাখা পরিবার দরকার কী— ইহা শরীরে রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে। ত্রয়োদশীতে বেগুন ভক্ষণ নিষেধ কেন? না 'ওইদিন বেগুনের মধ্যে একটি ক্যামিকাল বৃদ্ধি পায়, তখন উহা খাইলে অ্যালার্জি হয়'। হকারটি বলেছিল, মাননীয়গণ, আমাদের ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিগণ রিসার্চ করে যে-সমস্ত নীতি প্রচলন করেছিলেন আজ আমরা দু' পাতা ইংরিজি পড়ে সেগুলিকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাইছি; মাননীয়গণ, এই বইটি পড়লে আপনারা শিক্ষিত সমাজ জানতে পারবেন ওই সংস্কারগুলির সাইন্টিফিক রিজিন...। ওই হকারটি ওই বইটির সঙ্গে বিক্রি করছিল বিনা মেডিসিনে রূপচর্চা। ভাস্বতী কিনেছিল। সোদপুর স্টেশন থেকে ওর দিদির বাড়ি নিবেদিতা পল্লি পর্যন্ত যেতে কমপক্ষে পাঁচটা বিউটি পার্লার চোখে পড়েছিল ভাস্বতীর। রূপচর্চা নিয়ে মেয়েরা আজকাল খুব ভাবছে। এই তো সেদিন মিনিবাসে শোনা দুই সখীর সংলাপ—

প্রথমা: মুলতানি মাটি সঙ্গে সর, বেসন অর হিং মিশিয়ে মুখে মেখে দু' ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকবি। দেখবি বলিরেখা পড়বে না।

দ্বিতীয়া: হিং? ভীষণ গন্ধ হবে যে।

প্রথমা: হোক না। তোর ও তো রাত আটটার আগে বাড়ি ফেরে না। সন্ধেবেলায় সাবান মেখে নিবি।

দ্বিতীয়া: ও না হয় রাত আটটায় এল। কিন্তু সে যদি দুপুরবেলা এসে যায়?

অন্য একদিন ছেলের হোস্টেলে অপেক্ষারতা দুই অভিভাবিকা—

প্রথমা: জানো দিদি, আমার একদম সময় কাটতে চায় না।

দ্বিতীয়া: কেন, তোমার চাকরিটা নেই?

প্রথমা: ছাড়তে হয়েছে। ওর একদম মত নেই। খালি বলত যা আর্ন করি, এনাফ, তোমার চাকরি করার দরকার নেই। আমি বলি টাইম পাস হতে চায় না গো দুপুর বেলাটায়। ও তখন বলল তা হলে রূপচর্চা করো।

দ্বিতীয়া: করছ?

প্রথমা: হ্যাঁগো, করছি, প্রথম দিকে সময় কেটে যেত। কুমড়োর বিচির মাস্ক মাখতাম কিনা। কুমড়োর থেকে বিচি একটা একটা করে খুলে তারপর বিচির একটা একটা করে চামড়া খুলে বেটে নিতে হত। বেশ টাইম কনজিউমিং। মাস্ক মেখে চোখ বুজে শুয়েছিলাম, এমন সময় ইঁদুরে গাল চেটে গেল। কুমড়োর বিচি যে ইঁদুরের এত ভালবাসার খাদ্য সেটা জানতাম না। সেই থেকে আর কুমড়োর বিচি মাখি না।

তো, ভাস্বতী রূপচর্চা করে। ওর চোখের তলায় একটু কুঁচকেছে। নাকের দু'পাশে দুটো রেখা। এটাই কি বলিরেখা? কে জানে? ভাস্বতী চায় না ওর গালে এসব পড়ুক। ওকে কলেজের ছেলেরা চামকি বলত। ও চামচিকে নয়, চামকিই থাকতে চায়। ও রূপচর্চায় খরচা করে। ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট খায়, ভিটামিন খায়, ভিটামিন ই মেশানো সাবান মাখে। ভিটামিন এ থেকে জেড পর্যন্ত যা যা ভিটামিন আছে, তাই দিয়ে তৈরি ক্যাপসুল খায়। কোষ্ঠ সাফ রাখতে ইসবগুল খায়, মাঝে মাঝে চিরতার জলও খায়। টক দইও, কুণালকে না দিয়ে।

প্রতিদিন অল্প করে খেলে টক দই।

যৌবন অটুট থাকে চুপিচুপি কই।

বিনা মেডিসিনে রূপচর্চায় এটাও ছিল। দুধ বাঁচিয়ে সামান্যই দই পাততে পারে ভাস্বতী। কুণালও টক দই খেতে ভালবাসে। পেঁপে কিংবা হাফ বাঁধাকপির গার্ড দিয়ে ফ্রিজে রাখে দই। কুণালকে দেয় না। ভালবাসা দেখিয়ে লাভ নেই। 'রূপে তোমায় ভোলাব না ভালবাসায় ভোলাব' ফর্মুলায় আর বিশ্বাস নেই ভাস্বতীর। ভালবাসার চেয়ে ব্যাটাছেলেরা রূপেই বেশি ভোলে। হালে ভালবাসায় বিরূপ হয়ে রূপেই মন দিয়েছে ভাস্বতী।

এই রূপে রূপচর্চা চলে ভাস্বতীর— সকাল ছ'টা— শয্যা ত্যাগ। এক গ্লাস জল (খুব জল খাবেন। বেশি জল খেলে ত্বক নির্মল থাকে) এরপর দাঁত মাজা। মাঝে মধ্যে নুন তেল দিয়ে আঙুলে। (মাঝে মাঝে আঙুলে দাঁত মাজবেন। ব্রাশ সব জায়গায় পৌঁছতে পারে না। আঙুলে মাড়িরও কিছুটা ব্যায়াম হয়) কোন টুথপেস্ট ব্যবহার করবে তা নিয়ে বড় সমস্যা ভাস্বতীর। টিভির বিজ্ঞাপনে দেখে নতুন ফর্মুলার আরও শক্তিশালী, আরও আরও শক্তিশালী টুথপেস্ট। সবার হাসিই মুক্তোহাসি। মাধুরী দীক্ষিত এটায় মাজে শাহরুখ খান অন্যটায়। টুথপেস্টে ফ্লোরাইড থাকলে ভাল নাকি লবঙ্গ তেল থাকলে ভাল নাকি নিম তেল থাকলে ভাল বুঝতে পারে না। কনফিউস্‌ড। চিন্তা করে ভাল ঘুম হয় না। এরপরে গরমজলে লেবু ও মধুর রস। (লেবুসহ মধু খাও ঈষদুষ্ণ জলে/দেখিবে কেমনে নারী যৌবনে জ্বলে) একটু মধু মুখেও মেখে নেয় ভাস্বতী (মধু ত্বক উজ্জ্বল করে) এবার একটু ত্রিফলার জল (বাহ্য খোলস হলে...।) তারপর মুখে এক ঝাপটা ভিনিগার-ওয়াটারের ঝাপটা। ঝাপটা না, স্প্ল্যাশ। ভিনিগার লাগাবার আগে মধুটাকে উঠিয়ে নিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপারটা মনে থাকে না। মধুর উপর ভিনিগার চাপালে বড় কুটকুট করে। এরপর চা। কুণাল চা চা করে চ্যাঁচায়। চা চায়।

কুণাল ঘুম থেকে ওঠার আগেই ভাস্বতীর বেশ কিছুটা রূপচর্চা হয়ে যায়। এসব মধু ভিনিগার ত্রিফলা টিফলা কুণাল জানে না। ইতিমধ্যে পাঁচুর মা এসে যায়। পাঁচুর মা তরকারি কুটতে থাকে। তরকারিগুলিকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন চোখে দেখে। পাঁচুর মার চোখে কড়াইশুঁটি গাজর শশা পালং— হেবি ভিটামিন গো। কুণালের কাছে লো ক্যালারি। আর ভাস্বতীর কাছে মুখে মেখে ফেলার জিনিস। 'গাজরের রস সামান্য দইয়ের সঙ্গে মেখে নিন, গায়ের রং উজ্জ্বল হবে।' 'লাউ ত্বকের পক্ষে অসাধারণ'। 'উচ্ছের রস মুখে মাখলে ব্রণ ফুসকুড়ি হয় না'। 'পাকা কুমড়োয় ভিটামিন এ থাকে। শরীরের জন্য খুব দরকার। মুখেও মাখা যেতে পারে'। 'যখনই ফল খাবেন, পাকা পেঁপে, কলা, আপেল যাই হোক না কেন, একটু মুখে মেখে নিন, উপকার পাবেন।' আজকাল খবরের কাগজের সাপ্লিমেন্টারিতে কমপালসারি রূপচর্চা থাকেই। সব যোগটোগ করে ভাস্বতী দেখেছে

মোটামুটি কচু আর চালতা ছাড়া সব ফল-তরকারিই চামড়ার পক্ষে ভাল। কিন্তু কোনটা মাখবে। এসব চিন্তায় রাতে ঘুমের গণ্ডগোল হলে, কোনও কোনওদিন একটু দেরিতে উঠলে বড় কনফিউশনে পড়ে যায় ভাস্বতী। মধু না ত্রিফলা না চা!

কুণাল অফিসে গেলে আবার রূপচর্চা। খরচা হয় হোক। কী করা যাবে। সর মাখবার জন্য মাঝে মাঝে কাউমিল্ক কিনে আনে। সর বানিয়ে ফ্রিজে রাখে। কী করবে? রূপ বিশেষজ্ঞরা লেখেন সরওয়ালা দুধ খাবেন না কখনও। ফ্যাট থাকে। ডবল টোনড্ দুধই ভাল। সেটাই কেনে। কিন্তু ডবল টোনড্ দুধে সর পড়ে না। তাই কাউমিল্ক। সর না হলে সর-বেসন, সর-হলুদ, সর-মধু হবে কী করে? দুপুরবেলাটায় শশা দিয়ে মুখে এইসব লাগিয়ে শুয়ে থাকে ভাস্বতী। মাছি বসে। মুখ কুঁচকানো যায় না, তা হলে মাস্ক ভেঙে যাবে। দাঁত ব্যথাটাথা হলে গালে হাত বোলানো যায় না। কথাও বলা যায় না, তাই ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখতে হয়।

আজ মেখেছিল ট্যাঁড়শের রসের সঙ্গে মুলতানি মাটি। অন্য এক্সপেরিমেন্ট। আজই এসে গেল দুপুরে।

কুণাল যখন এলই, একটা কাজ করলে হয়। স্কুটারে ওর সঙ্গে বেরিয়ে গেলে হয়। ওকে বললেই কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে নামিয়ে দেবে। বাগমারি থেকে ওর অফিস জোঁড়াসাঁকো যেতে হলে কলেজ স্ট্রিট হয়েও যাওয়া যায়। ওর কিছুটা জটামংশী দরকার। ওটা কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে পাওয়া যেতে পারে।

ক'দিন আগেই ভাস্বতী কাগজের ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞাপনে দেখেছিল যৌবনের জৌলুষ জ্বালিয়ে রাখার জন্য জলপড়া। জলদি যোগাযোগ। ফোন নম্বর...। ফোন করেছিল ভাস্বতী। ফোন ধরেছিল তান্ত্রিক-কবিরাজ জটিলেশ্বর শাস্ত্রী। শাস্ত্রীমশাই বলেছিলেন,আমার হল ডবল অ্যাকশন ফর্মুলা। আরও, আরও বেশি শক্তিশালী। গাছগাছড়ার সঙ্গে তন্ত্রমন্ত্র পাইল করি। তো আপনার কী অসুবিধা ম্যাডাম?

ঘুম হয় না। বড় চিন্তা। কোনও টুথ পেস্টে দাঁত মাজব? কোন তরকারি ছেড়ে কোন তরকারি মুখে মাখব? এমনিতেই বুড়িয়ে যাচ্ছি, তা ছাড়া ওসব চিন্তা করতে করতে আরও...।— বুঝিচি, আর বলতি হবে না। ঘুমটা দরকার, সেইসঙ্গে যৌবনরক্ষা। তিন তোলা জটামাংসী নিয়ে চলে আসুন, জলে ভিজোয়ি মন্তর পড়ে দেব। জটামাংসী কখনও শোনেনি ভাস্বতী। জিজ্ঞাসা করল, কীসের মাংস ওটা? শাস্ত্রীমশাই বললেন, জটামাংসী, জটামাংসী। শোনেননি নামটা? ওটা বাংলার গাছ। কথা বলে।

ভাস্বতী খুঁজেছিল নার্সারিতে। ভেবেছিল কিনা, পায়নি। ইতিমধ্যে ইটিভির মধ্যে শ্রীমতী অনুষ্ঠানে 'রূপচর্চায় আয়ুর্বেদ' দেখানো হল। সেখানে হলুদ, চন্দন, তুলসী এসবের সঙ্গে জটামাংসীর কথাও বলা হল। জটামাংসীর ছবিও দেখাল। একগোছা চুলের মতো দেখতে। ওরাও বলেছিল, জটামাংসী ভেজানো জলে ঘুম হয়, অ্যাংজাইটি কমে যায়, মন প্রফুল্ল থাকে। আর মুখের মধ্যে প্রফুল্লতার ছায়া পড়ে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় বলেনি।

ভাস্বতী মুদি দোকানে খোঁজ নিল। মুদির দোকানে বলল দশকর্মা ভাণ্ডারে খোঁজ নিতে। দশকর্মা বলল, এসব কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে পাওয়া যায়।

ওইজন্যেই কলেজ স্ট্রিট যাওয়া।

কুণালকে ভাস্বতী বলল— অফিস যখন যাচ্ছই আমাকে একটু কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে নামিয়ে দিয়ো। কুণাল বলল— কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে কী করতে যাবে? ভাস্বতী বলেই ফেলল— একটু জটামাংসী দরকার। জটামাংসী শুনেই কুণালের মুখের রং পালটে গেল। হঠাৎ কেমন যেন নার্ভাস নার্ভাস হয়ে গেল। তারপর বলল— কেন, কেন জটামাংসী কী হবে? বলার সময় কুণাল তোতলাচ্ছিল।

ভাস্বতী বলল, দরকার। দরকার।

কুণাল চুপ হয়ে গেল। একটু পরে বলল, যাচ্ছি। চলে গেল। কুণাল কেন যে মাঝে মাঝে এরকম ব্যবহার করে ভাস্বতী বোঝে না।

গত কয়েকদিন ধরে রাত বারোটার আগে শুতে যাচ্ছে না কুণাল। বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বিছানা থেকে উঠে যায়। ভাস্বতীরও তো সাউন্ড স্লিপ হয় না, ও টের পেয়ে যায়। কুণাল বিছানা ছাড়ছে, কিন্তু বাথরুমে জলের শব্দ নেই। গত পরশুদিন কুণাল যখন বিছানা ছাড়ল, ঘড়ির রেডিয়াম কাঁটায় তখন তিনটে বাজতে দশ। কুণাল খুব আস্তে আস্তে বিছানা ছাড়ল। পর্দা সরাল। ভাস্বতী আরও আস্তে আস্তে বিছানা ছাড়ল। কুণাল পা টিপে টিপে পাশের ঘরে গিয়ে দরজাটা আস্তে করে খুলল। ঘরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করল। কী সাসপেন্স। কী করছে ও? দরজায় কান দিল। বুক ঢিপঢিপ করছে ভাস্বতীর। চেয়ার টানার শব্দ শুনল। কী সর্বনাশ দড়িটড়ি নেয়নি তো? ভাস্বতী দরজায় ধাক্কা দিল। একটু পরেই কুণাল বেরিয়ে এলে ব্যাকুল স্বরে কুণালের কাঁধে হাত দিয়ে বলেছিল, ওগো বলো না গো, কেন এই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিলে? কুণাল বলেছিল, ঘুম হচ্ছে না। তাই বই পড়তে ইচ্ছে করছিল। ভাস্বতী বলেছিল, কেন হঠাৎ বই পড়তে ইচ্ছে করল তোমার? তোমার কী শরীর খারাপ? কুণাল বলেছিল— হ্যাঁ।

ভাস্বতী তখন ভেবেছিল হতেই পারে। শরীর খারাপ না হলে ভাস্বতীও বই পড়ে না। ভাস্বতীর পদ্মহাতে সদ্যলেখা তথাগতর গদ্যর বই আজও পড়া হয়নি। তথাগত কয়েকদিন জিজ্ঞাসা করেছিল বইটা পড়লে? ভাস্বতী বলেছিল, না গো পড়া হয়নি। অসুখও হচ্ছে না। আসলে অসুস্থ হলেই বইটা পড়া হয়। যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় জন্ডিস হয়েছিল, বেডরেস্টে ছিল, তখন পড়া হয়েছিল দেবদাস আর চরিত্রহীন। যখন বাপটু হল তখন মেমসাহেব আর চৌরঙ্গী। অসুস্থ হলেই তো পড়া হয়। কুণাল এখন অসুস্থ। ঘুম হচ্ছে না, সুতরাং বই পড়তেই পারে। আর কোনও ব্যাপার নেই, ঠিক আছে।

কিন্তু এখন আর ঠিক আছে মনে হল না। জটামাংসী শুনেই এরকম করল কেন কুণাল?

কুণাল অফিসে চলে গেলে ভাস্বতী একাই বেরুল। প্রথমে জটামাংসী কিনবে, তারপর যাবে জটিলেশ্বর শাস্ত্রীর কাছে। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে গিয়ে একটা শাড়ির দোকানে ভাস্বতী জিজ্ঞাসা করল, জটামাংসী কোথায় পাওয়া যায়? দোকানদার বলল— আরামবাগ হ্যাচারির দোকান এখন খোলা আছে, খাসি বিকেলে পাবেন। যাইহোক খুঁজতে খুঁজতে, যেখানে শিমুল মূল, অর্জুন ছাল, শতমূলী, এইসব কবিরাজি মাল বিক্রি হয়, সেখানে জটামাংসী পেল। জটামাংসী কিনে নিয়ে ঠিকানা খুঁজে জটিলেশ্বর শাস্ত্রীর কাছে গেল শোভাবাজারে।

আমি এনেছি।

জটিলেশ্বরের কপালকুঞ্চন তখন বেশ জটিল।

এখন এলেন? এই নিদাঘ সময়ে। আমার চেম্বার বিকেল পাঁচটার পরে।

তবে কি ফিরে যাব? পরে আসব?

না। ইচ্ছুক রমণীরে আমি ফেরাই না। বোতল আছে?

বোতল কোথায় পাবে ভাস্বতী? একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল কিনে নিতেই পারত— আগে জানলে।

ভাস্বতী বলল, আপনার বোতল নেই?

তান্ত্রিক কবিরাজ জটিলেশ্বর বললেন, তা হলে তো খালি করতে হবে।

খালি করার সময় বললেন, হায়, রাম।

রামের বোতলটা খালি করলেন কিনা। অর্ধেক ভরতি ছিল। সোজাসুজি গলায় ঢেলেই বললেন, খা—লি। ভাস্বতী শুনল খা-লিয়া।

এবার বোতলটা ধুয়ে জটামাংসী গুঁড়ো ভরলেন, তারপর জল।

জটিলেশ্বর বললেন, আপনার মুখ জ্বলবে।

ভাস্বতী ভয় পেয়ে বলল, জ্বলবে?

হ্যাঁগো লাস্যে।

লাস্য, তা হোকগে। কিন্তু আপনি কি কনফার্ম করতে পারেন আমার ত্বক শুষ্ক না তৈলাক্ত?

তা দিয়ে কী হবে?

শুষ্ক ত্বকে ডিমের কুসুম, তৈলাক্ত ত্বকে সাদা...

ওসব সাদা কালো কিছুই লাগবে না। ওই জটামাংসী ভিজানো জলে এইসা ডাবল অ্যাকশন মন্তর পড়ে দেবোনে, দ্যাখবে যৌবন কারে বলে। শুধু কি জেল্লা? চোখের তলায় ওই কালিঝুলি চলি যাবনে। যৌবনের বান ডাকবে গালে, ওষ্ঠে, চিবুকে, ঘাড়ে, গলায়...

থাক থাক।

থাকল।

তবে মন্তর পড়ি?

পড়ুন।

আমারে কিঞ্চিত স্পর্শ করি থাকো।

স্পর্শ?

হুঁ। ডাক্তার কবিরাজের কাছে লজ্জা করলি চলে না।

জটামাংসী জলে ফুঁ দিলেন জটিলেশ্বর। বললেন, নাও। মন্ত্রপূত জটামাংসী। তিন দিন খাবা। কবিরাজি ওষুধের সঙ্গে মন্তর। ডবল অ্যাকশন। বোঝলা না? এই ওষুধ রাতে খাতি হয়। তান্ত্রিক ফর্মুলার মন্তর কিনা। রাত বারোটায় এক ডোজ, তিনটার সময় সেকেন্ড, ভোর ছ'টায় আবার। এইভাবে তিন দিন। এক মাস পরে বুস্টার ডোজ। ব্যাস।

ওল্ড মঙ্কের গায়ে লেবেল লাগল— যৌবন বারিধি। কবিরাজ আবার বললেন, তিন মাস পরে নিজিরি চিনতে পারবা না।

কেই বা নিজেকে চিনতে পারে? কবিগুরু নিজেই বলে গেছেন— আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।

আমার ফি ওয়ান ফিফটি। আর ওই যে বোতলটা, খালি করতে হল, হাফ মতন জিনিস ছিল তাতে। ওটুকর দাম ফট্টিই ধরো। তা হলে ওয়ান নাইনটি।

বাড়ি ফিরল ভাস্বতী, তখনও সন্ধে হয়নি। রাত বারোটায় হাফ ডোজ। কিন্তু বোতলটা রাখবে কোথায়? কুণালের সঙ্গে এসব নিয়ে কোনও কথা নয়। তন্ত্রমতে রূপ ফেরালে ওর নিজের ক্রেডিট কী? বোতলটা গোপনে রাখতে হবে। চৌকির তলায় একটু রিস্কি হয়ে যায়। ওখানে গোপন কথাটি রবে না গোপনে। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে এই বোতল ঢুকবে না। পাশের ঘরে যায়। দেওয়ালজোড়া ক্যাবিনেট। বুদ্ধমূর্তি, টেরাকোটা, ডোকরা, বইটই। শরৎ রচনাবলীর পিছনে রাখলে কেমন হয়? শরৎবাবু, তুমি মেয়েদের জন্য কত কী ভেবেছিলে। শরৎ রচনাবলীটা একটু উপরের দিকে রাখা আছে। চেয়ারের উপর দাঁড়ায় ভাস্বতী। বইয়ের পিছনে রাখা যেতে পারে ভেবে বইটা টেনে নেয়। টেনে বার করতেই দেখে ওখানে ঠিক একই রকমের একটা বোতল।

যৌবন বারিধি। কিছুটা রয়েছে, এক দিনের মতো।

কুণাল তুমিও?

তথ্যকেন্দ্র, বইমেলা সংখ্যা, ২০০০

একটি সামাজিক পালার নামকরণের সমস্যা

দশ টাকায় ব্যাগ ভরতি। ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, পালং শাক, বিট-গাজর। আহা শীতঋতু তুমি যেয়ো না, যেয়ো না, তিষ্ঠ কিছু কাল। শেয়ালদা থেকে বাজার করে সন্ধ্যা ছ'টা ছাপ্পান্নর বনগাঁ লোকালে উঠলেন গদাধর। আগের ট্রেনটা লেট করে এইমাত্র ছেড়েছে বলে ভিড় নেই বেশি। সবজি তরকারির ব্যাগটা বাংকে উঠিয়ে রাখলেন। বেশ ভারী। আহা শীত ঋতু তুমি যেয়ো না যেয়ো না। সিটে বেশ করে জাঁকিয়ে বসলেন। চাদরটাকে বেশ করে পেঁচিয়ে নিলেন। ভিতরে ফুলহাতা সোয়েটার আছে, তার ওপরে খদ্দরের পাঞ্জাবি, তার ওপর চাদর। মনে হচ্ছে আরও একটু কিছু হলে আরাম হত। চাদরটা মাথায় ঘোমটার মতো উঠিয়ে নিলেন। এবার আর কানে ঠান্ডা লাগবে না। একটা বিড়ি ধরিয়ে চোখ বুজল গদাধর।

ফুলকপি আনিয়াছি প্রিয়ে, পুরুষ্টু, নধর। কই মৎস্য সঙ্গে দিলে অমৃত সমান। কিন্তু প্রিয়া মোর, কই মাছ দুর্মূল্য ভীষণ, তাই পারি নাই আনিতে। সঙ্গে দিয়ো তাই— সবুজ কড়াইশুঁটি। হাঃ হাঃ হাঃ।

আ-মরণ মিনসের কতা শোনো। বলে ফুলকপি খাবে। শখ কত, জানো, ফুলকপি কেমন তেল টানে, তেল তো আনবে না। আনতে বললেই মেজাজ, মুখখিস্তি। অমন ফুলকপি খাবার শখের মুখে ঝ্যাঁটা মারি।

এই ডায়লগটা বেশ জুতসই মনে হল গদাধরের। 'গরিব ঘরের শ্যামলা মেয়ে' নামে যে সামাজিক পালাটা লিখছে গদাধর, তাতে এই ডায়লগটা ফিট করিয়ে দেবে। আর দিন পনেরোর মধ্যে পালাটা লিখে ফেলতে হবে। এরপর রিহার্সাল আছে। সরস্বতী পুজোর দিন পালাটা নামবে। মছলন্দপুর রামকৃষ্ণ যাত্রা সমাজ। গতবার ভৈরব গাঙ্গুলির লেখা পালা করেছিল, এবার নিজেই লিখছে। এর আগেও তিনটে পালা লিখেছে গদাধর। 'প্রহ্লাদ', 'দশরথের কান্না', আর 'অহল্যার স্বপ্ন'। সবাই বলল, এবার সামাজিক পালা লেখো গদাধর। সমাজে যা হচ্ছে তা প্র্যাকটিকাল করে লেখো। সব মুখোশ খুলে দাও। গদাধর লিখছে। সব রিয়েল ঘটনা লিখছে। অফিসের মজুমদার সাহেবের মুখোশ খুলে দেবে গদাধর। শালা, সাপ্লায়ারের কাছ থেকে টাকা পেয়ে আজেবাজে জিনিস কেনে। গণেশ ড্রাইভার, জিপ গাড়িটার পার্টস খারাপ করে দেয়, তারপর সারাতে দেয়, কমিশন পায়। তেল চুরি তো আছেই। ভজনবাবু, কেরানি, গড়িয়ায় দোতলা বাড়ি করেছে, একতলায় গুজরাতি ভাড়াটে বসিয়েছে। কী করে করেছে গদাধর ঠিকই জানে। গদাধর পিয়োন হতে পারে, ক্লাস ফোর স্টাফ হতে পারে, কিন্তু সবই জানে, বোঝে। 'গরিব ঘরের শ্যামলা মেয়ে'-তে সব ফাঁস করে দেবে। নৃপেন সামন্ত তিনটে বিয়ে করেছে। পরান হালদার ওর বিধবা বোনটাকে স্থান দেয়নি বাড়িতে, তাড়িয়ে দিয়েছে। ওর বোন এখন বেশ্যা। বিমল দাস, শালা মোদো মাতাল, ওর বউয়ের গয়না বেচে মাল খায়, ওকেও দেখে নেবে গদাধর। পালাটার নামটা চেঞ্জ করতে পারলে হত। এখনও পোস্টার পড়েনি। 'গরিব ঘরের শ্যামলা মেয়ে' নাম শুনে মনে হয় যে একটা কালো মেয়ের কাহিনি। যার বিয়ে হচ্ছে না, পণ হাঁকছে সবাই, তার দুঃখ-জ্বালা-অন্তরের কষ্ট নিয়েই শুধু এই পালা। তা তো নয়, সবার মুখোশ খুলে ফেলে দেবে গদাধর। প্রথমে অবশ্য অভিশপ্ত নারী জাতির হৃদয় বেদনার কথা। ক্লাবের সেক্রেটারি এইরকমই বলেছিল। ক্লাবের সেক্রেটারি পূর্ণবাবু। প্রাইমারি মাস্টার। বলেছিল এবার আর পৌরাণিক পালা নয় গদাধর।

সামাজিক পালা লেখো। আমাদের মা-বোনদের কথা লেখো। পণপ্রথার অভিশাপের কথা লেখো। আঠেরো পাতা লিখেছে গদাধর। পণপ্রথার অভিশাপের বলি তেইশ বছরের কন্যা মালিনীর কথা বলতে গিয়ে ভজনবাবুর কথা এসে যাচ্ছে, গণেশ ড্রাইভারের কথা এসে যাচ্ছে, বিমল দাস, পরান হালদার, সবাই চলে আসছে ক্রমশ। কাউকে আটাতে পারছে না গদাধর। এবার একটু হাল ধরতে হবে, নইলে সামলানো যাবে না। একবার চোখ খুলল গদাধর। বাংকটা দেখে নিল। একবার চোট খেয়েছে। বাংকের ওপর ইলিশ মাছ রেখেছিল। একটু চোখ বুজেছিল, চোখ খুলতেই দেখেছিল ইলিশ মাছটা নেই। এখন দেখল ব্যাগের বাইরের কপি-ডাঁটার সবুজ রং। গদাধর দেখল বাংকের ঠিক কপি-ডাঁটার তলার সিটে একটা ছেলে খালি গায়ে বসে আছে। সম্পূর্ণ খালি গায়ে। ছেলেটার বয়স এগারো-বারো বছর হবে। দু' হাত দিয়ে ওর নিজের বুকটা জড়িয়ে জবুথবু হয়ে বসে আছে। ছেলেটার ডান পাশে একটা লোক সাদা শাল গায়ে বসে বসে সান্ধ্য পত্রিকা পড়ছে, ছেলেটার বাঁ দিকে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলে এইয়া মোটা জ্যাকেট চাপিয়ে সিগারেট ফুঁকছে। ছেলেটার গা একেবারে খালি। প্যান্ট আছে পরনে, হাফ প্যান্ট, পায়ে হাওয়াই চটি। এই শীতের মধ্যে ছেলেটার গায়ে জামা নেই। গদাধর ওর সবজির ব্যাগটা বাংকে ঠিকমতো আছে জেনেও চোখ বুজতে পারল না। ছেলেটার খালি গায়ের দিকে চোখ আটকে গেল। ছেলেটা শাল গায়ে লোকটার দিকে ঘেঁষে বসে আছে। ইতিমধ্যে দুটো স্টেশন পার হয়ে এসেছে ট্রেনটা। ছেলেটা কোত্থেকে উঠেছে? গদাধর ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল— তোর শীত করছে না?

খুব।

জামা দিসনি কেন গায়ে? জামা নেই?

আছে।

তবে?

জামা খুলে রাকিচে।

কে?

মালিক।

কোন মালিক?

মোর মালিক।

কেন?

কাজ করিনি দেকে।

কাজ করিসনি কেন?

করিচি তো।

তবে?

সনঝে অব্দি করিচি। মালিক বলল আরও কর। করিনি। তাই জামা খুলে রাকিচে।

কোথায় কাজ করিস?

উল্টোডাঙ্গায়।

কীসের কাজ?

উলের। উল সুতো আছে না? ঝা দিয়ি ছোয়েটার হয়...।

তোর নাম কী?

ইউসুফ।

তোর মালিকের নাম কী?

ইয়াকুব মিঞা।

উলের কী কাজ হয়?

পেটিতে উল সুতো আসে। তা দিয়ি বল বানাই, বল বানিয়ি পেলাস্টিকির প্যাকেটি ভরতি করি।

কতক্ষণ কাজ করতে হয়?

সকাল আটটা সে সনঝে ছ'টা।

কত আসে।

ডেলি বারো টাকা।

আজ বেশি কাজ করতে বলল কেন?

হেভি ডিমান।

এমনি এমনি করবি?

উভার টাইম। ঘণ্টায় এক টাকা দেয়।

তা হলে করলি না কেন? টাকা পেতিস।

আজ যি আমার দিদির আসার কতা? দিদির শাদি হয়েছে মুশশিদেবাদ। ছ' মাস পরে আজ আসতিছে। মন হাকুপাকু হতিচে।

তোর জামাইবাবু কী করে?

বিড়ি-কারিকর।

তোর দিদির বিয়ের সময় পণ-টন দিয়েছিলি?

পণ কী ছার?

যৌতুক।

না না, ওসব নয়। খালি টেপরেকট আর ছাইকেলের টাকা। আব্বা দেনা করিলো, আর আমি উল কারখানায় ঢুকিলাম।

গদাধর চোখ বোজে। ট্রেন চলে। উল কারখানা দেখতে পায়।

দশ বছরের, এগারো বছরের, বারো বছরের ছেলেরা সব কাজ করছে।

ইয়াকুব ॥ শোন সবাই শোন। আজ কেউ ছ' টার সময় বাড়ি যাবি না। যেতে পারবি না কাজ আছে। ওভারটাইম করবি। পয়সা পাবি।

ইউসুফ ॥ আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি আজ পারব না। কিছুতেই পারব না।

ইয়াকুব ॥ পারবি না? অসম্ভব। আমার মুখের ওপর কথা? পারতেই হবে।

ইউসুফ ॥ আমার বাড়িতে আজ মেহমান আসবে। দিদি আর জামাইবাবু (জামাইবাবুকে ওরা কী বলে?) আল্লার কিরে।

ইয়াকুব ॥ নিমকহারাম। খোল তবে জামাখানি তোর। এই জামা দিয়েছিনু আমি। খুলে ফ্যাল। কাল হতে আসবি না আর। বরখাস্ত করিলাম তোরে। মিউজিক—ঝনন...

এবার বিবেকের প্রবেশ।

বিবেক। এই বাচ্চা, এই, আমার চাদরটা তুই নে।

গদাধর চোখ খুলে ছেলেটাকে বলল ওই চাদরটা নেবার কথা। আশেপাশের লোকগুলো গদাধরকে দেখছে। গদাধর বলল, কোথায় থাকিস? ছেলেটা বলল, মছলন্দপুর। গদাধর বলল, আমি বিড়ায় নেমে যাব। ততক্ষণ চাদরটা জড়িয়ে থাক। আমি নামবার সময় নিয়ে নেব। ছেলেটা বলল, না থাক। আমার শীত লাগতিছে না। গদাধর বলল, নে বলছি, পেঁচিয়ে রাখ, আমার তো সোয়েটার আছে। গদাধর ছেলেটার গায়ে ওর চাদরটা জড়িয়ে দেয়। চোখ বোজে। আমি তোর পিতৃসম। ওরে বাছা মোর। মোর উত্তরীয়খানি করিলাম দান। দান নয়। দান নয়। বিড়া পর্যন্ত। তখন খুলে নেব। চোখ খোলে গদাধর। বেশ মানিয়েছে ছেলেটাকে। ওর মাথা নিচু। কেমন লজ্জা লজ্জা ভাবখানা। শোন বলি বালক। এ পৃথিবীতে ইয়াকুব রয়েছে যেমন, অন্যদিকে আছে গদাধর। পঞ্চাশ গ্রাম চিনেবাদাম কিনল গদাধর। আর দু' পুরিয়া ঝাল-নুন চেয়ে নিল। একটা পুরিয়া ছেলেটাকে দিয়ে বলল, বাদাম খা।

গদাধর জিজ্ঞাসা করল— শোন, ওই শালা ইয়াকুব কী করল তোকে?

কখুন?

ওই যখন তুই বললি যে উভারটাইম করবি না?

বলল, বানচোৎ ছেলে।

তারপর?

তারপর বলিলো যে রাত ন'টা পর্যন্ত থাক।

তারপর।

আমি বলিলাম, বাড়ি যাব। তখন মালিক বলিলো, এই ভজা, ওর জামা-প্যান্ট খুলে নে। ভজার গায়ে হেভি জোর। ও জামা প্যান্ট খুলে নিল। মালিক বলল, এবার যা। আমি কান্নাকাটি করতে প্যান্টটা দিল।

এ তো মহা ফ্যাসাদ। এত কিছু সামলাবে কী করে গদাধর। এবার যদি ইয়াকুব ক্যারেকটারটাও ঢুকে যায়? আড়াই ঘণ্টার সামাজিক পালায় এত ক্যারেকটার এসে ভিড় করছে। কাউকেই বাদ দিতে পারছে না গদাধর। ইয়াকুবের মেকাপটা মনে মনে চিন্তা করে নেয় গদাধর। উপেন পরামানিককে এই পার্টটা দেওয়া যায়।

এই ইউসুফ। তোর দিদির নাম কীরে?

কোন দিদি।

ওই তো যে দিদির জন্য তুই ওভারটাইম করলি না সেই দিদির শাদিতে সাইকেল আর টেপরেকর্ড দিতে গিয়ে তোর বাপ দেনা করল।

আমিনা।

আমিনার বিয়ে হয়েছে কিন্তু মালিনীর বিয়ে হয়নি। মালিনীর বিয়ে হওয়া নিয়েই সমস্যা। মালিনীর বাবা পণের টাকা জোগাড় করতে পারছে না। শেষকালে মালিনীর বাবা চুরি করেছে এটা জানতে পেরে মালিনী আত্মহত্যা করে। এইভাবে কাহিনিটা ঠিক করেছিল গদাধর। খাতায় প্রথম পাতায় এইভাবে চরিত্রলিপি ঠিক করেছিল।

মালিনী ॥ অবিবাহিতা কন্যা।

হরিহর ॥ ঐ পিতা।

বসন্ত ॥ ঘটক।

জীবন ॥ জনৈক পাত্র।

উপেন্দ্র ॥ পিতা।

বলহরি ॥ ঐ পিতা।

দারোগা, প্রতিবেশীগণ।

ক্রমশ ক্রমশ চরিত্র বেড়ে যাচ্ছে। স্ত্রী চরিত্র পাওয়া যাবে না ভেবে মালিনীর মা অর্থাৎ হরিহরের বউকে পর্যন্ত নেপথ্যে রাখতে হয়েছে। এর মধ্যে আবার আমিনা-টামিনা এসে ঝামেলা করে তবে তো মহা মুশকিল।

পালার নাম 'গরিব ঘরের শ্যামলা মেয়ে'। যদি বাংলা মায়ের শ্যামলা মেয়ে রাখত তবে শুনতে একটু ভাল হত। দু-একজন বলেছিল। কিন্তু গদাধর রাজি হয়নি। বাংলা মায়ের শ্যামলা মেয়ের যে সমস্যা, উড়িষ্যা-মায়ের কিংবা বিহার-মায়েরও সেই একই সমস্যা। ওই জন্যই গরিব ঘরের শ্যামলা মেয়ে করেছে।

ও ইউসুফ।

ছার।

তোমার দিদি দেখতে কেমন বলো তো?

সোন্দর।

রং।

ফরসা।

আবার চিন্তায় পড়ল গদাধর। আমিনা ফরসা তবু সমস্যা। তবে গরিব ঘরের শ্যামলা মেয়ের 'শ্যামলা' কথাটা থাকে কেন? 'গরিব ঘরের মেয়ে' রাখলেই হয়। শ্যামলা না হলেও তো সমস্যা।

চোখ বোজে গদাধর।

আচ্ছা এই সমস্যাটা কীসের?

পণপ্রথা। যৌতুক।

তবে আমার এই পালার মধ্যে ওরা ঢুকছে কেন?

ঘুষখোর মজুমদার সাহেব, ভজনবাবু, দুশ্চরিত্র নৃপেন, মদোমাতাল বিমল দাস এরা? পণপ্রথার সঙ্গে কী সম্পর্ক?

লোভ।

ইয়াকুব মিয়াঁ আসে কেন তবে?

ওই যে লোভ।

লোকের ক'ছে সব হ্যা-হ্যা করে বিকিয়ে দিয়েছে।

কেন?

জোর যার মুলুক তার। লোভের এখন বড্ড জোর।

তা হলে গদাধরের সামাজিক পালায় পণপ্রথার অভিশাপের কথা বলতে গিয়ে আরও অনেক কথা বলতে হচ্ছে। একটার সঙ্গে অন্যটা শিকলির মতো আঁটা। এই সামাজিক পালাটার নাম গরিব ঘরের শ্যামলা মেয়ে না হয়ে শুধু গরিব ঘরের মেয়ে হতে পারে, কিংবা মেয়ে শব্দটা বাদ দিয়ে গরিব ঘর হলেও ক্ষতি নেই। কিংবা শুধু 'ঘর'? হতেই পারে। কত কী নাম হতে পারে। নাম যা হোক পরে ভাবা যাবে, কিন্তু যে চরিত্ররা আসতে চায়, তাদের আসতে দেবে গদাধর। কাউকে বাদ দেবে না। পরে দেখা যাবে। চোখ খোলে গদাধর। ছেলেটা ঝিমুচ্ছে। চাদরের গরমে ওর আরাম লাগছে। বামনগাছি পার হল। সামনেই বিড়া। ছেলেটার কাছ থেকে চাদরটা কেড়ে নিতে হবে এবার। এরপর আরও কয়েকটা স্টেশন যেতে হবে ছেলেটাকে। ছেলেটার গায়ে হাত দিল গদাধর। 'চাদর নিয়ো না কেড়ে'। একটা নতুন পালার নাম হতে পারে। গদাধর ছেলেটার চাদরে হাত দেয়। টানে। ছেলেটা ছটপটিয়ে চাদরটা খুলে দিতে চায়। গদাধর বলে, আমার সঙ্গে চল।

ক'নে?

আমার ঘরে এই চাদরটা গায়ে দিয়েই চল। আমি তোকে একটা জামা দেব। জামাটা গায়ে দিয়ে পরে আপ ট্রেনে বাড়ি যাস। ছেলেটা ততক্ষণে চাদরটা ওর গা থেকে খুলে ফেলেছে। গদাধর ধমক মেরে ওঠে। কাণ্ডজ্ঞানখানা কীরকম তোর, অ্যাঁ, গায়ে দে ওটা।

যাত্রীদের একজন বলল, লোকটা টুপি খেয়ে গেল মাইরি। আর কে যেন বলল, ছেলেটা ভালই ঢপ দিয়েছে। গদাধর ভাবল লোকে যে যা বলে বলুক ওদের কথায় কী আসে যায়। ছেলেটার হাত ধরে গদাধর। রাত্রি অন্ধকার। তীব্র শীতে শিহরিছে আকাশের চাঁদ। চল বালক দীন কুটিরে মোর। মলিন সে গৃহ। কিন্তু সে গৃহমধ্যে বিরাজে নারায়ণ। নরনারায়ণ। বিড়া স্টেশন এসে গেল।

ভীষণ শীত। জোনাকিও নেই। চাদর ছাড়া বেশ শীত শীত করছে গদাধরের। গদাধরের বাঁ হাতে একটি পলিথিনের ব্যাগে একটা চাণক্যশ্লোকের বই, বিড়ি, টিফিন ডিব্বা এবং ডান হাতে সবজির ব্যাগ। কাছাকাছি এসে ছেলেটার কাছ থেকে চাদরটা চেয়ে নেয়। গায়ে মুড়ি দিয়ে নেয়। ছেলেটাকে বলে তুই এইখানে দাঁড়া। আমি এখুনি আসছি। বাড়িতে ঢোকে। টিনের চালার বাড়ি, ভিতরে হ্যারিকেনের আলো। বিবিধ ভারতী বাজছিল। গদাধর ঘরে ঢুকতেই বিবিধ ভারতী থেমে গেল। ভারতী আর আরতির গলা শোনা যেতে লাগল। জুলিয়াস সিজার। জুলিয়াস সিজার। তিনি জন্মিয়াছিলেন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে। অল্প বয়স থেকে তিনি ক্ষমতার স্বপ্ন দেখিতেন। দরিদ্র

রোমবাসীদের তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল দরিদ্র জনসাধারণকে ব্যবহার করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। এই কারণে তিনি দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের দাবি জানান। সিজার কনসুল পদে নির্বাচিত হন এবং ৫৮ খ্রি. পূর্বাব্দে ৫৮ খ্রি. পূর্বাব্দ ৫৮ খ্রি.... পূর্বাব্দ...

ভারতী উচ্চ মাধ্যমিকে দু'বার ফেল করতে আরতির সঙ্গে পরীক্ষা দেবে। জুলিয়াস সিজার বোধহয় এবার ইমপর্ট্যান্ট। গদাধরেরও মুখস্থ হয়ে গেছে। গদাধর ওর সামাজিক পালার নায়িকা মালিনীর মুখে যেসব ডায়লগ দিয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু ভারতীর ডায়লগের মিল আছে। গদাধর ঘরে ঢুকল। বারান্দার পাশের হারুর তক্তাপোশ। ওর ছেলে সবচেয়ে বড়। রাত দশটার আগে আড্ডা থেকে ফেরে না, দড়িতে ঝুলছে ওর জামা প্যান্ট। একটা টেনে নেবে নাকি? নাকি নিজের পাঞ্জাবিটা দিয়ে দেবে। সেটা অবশ্য অনেক বড় হয়ে যাবে। পায়ের গোড়ালি ছাড়িয়ে যাবে ওর। তবু হ্যারিকেন উঁচু করে দড়িতে ঝোলা জামাগুলো দেখে। জামার গায়ে লেখা—ওলিম্পিক, ডগ লাভার, ব্লাডপ্রেসার। কোনটা বাতিল আর কোনটা না পেলে কুরুক্ষেত্র— কে জানে। গদাধর ভারতীকে বলে, হ্যাঁরে স্টিলের বাসনপত্তর কেনার জন্য জামাকাপড়ের পুঁটলিটা মা কোথায় রেখেছে রে? ভারতী বলে, কেন বাবা? গদাধর বলে, এমনি, একটু দেখতাম। আরতি বলে কাউকে দেবে বুঝি? গদাধর সত্যি কথাটাই বলে। আরতি বলে, মা জানলে আবার রাগ করবে। বাসন নেবে বলে জমিয়েছে কিনা। গদাধর বলে, সে আমি বুঝব। তুই বার কর। খাটের তলা থেকে একটা পুঁটলি বার করে আরতি। গদাধরের বউ রান্নাঘরে রুটি করছে। গদাধর একটা বুক খোলা সোয়েটার বার করে। ওটা গদাধরেরই। কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, পোকাতেও কেটেছে। ঠিক আছে। কারওর কিছু বলার রইল না। নিজের জিনিস। সোয়েটারটা নিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে ছেলেটার গায়ে পরিয়ে দিল গদাধর। একটু ঢোলা, তবু গরম তো বটে। যা, বাড়ি যা... তাড়াতাড়ি যা। এখুনি ট্রেন। পালা...

পরের দিন সকাল সকাল বেরোতে হয়েছিল গদাধরকে। নীলরতনে অর্শ দেখায়। ট্রেনে উঠে দেখে খালি গায়ে হাত দুটো বুকে জড়িয়ে সেই এক কায়দায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে ইউসুফ। গা খালি। ওর ডান পাশে খাকি কোট পরা পুলিশের লোক বিড়ি ফুঁকছে। ডান দিকে শাল জড়ানো ভদ্রলোক খবর কাগজ পড়ছে। ওর উলটো দিকের একটা লোক ওর সঙ্গে কথা বলছে।

খালি গা কেন?

এমনি।

জামা নেই?

আছে।

পরিসনি কেন?

মালিক খুলি রাকিচে।

গদাধর দেখল আর এক গদাধর এই ছেলেটার সামনে। সেই গদাধর চুকচুক শব্দ করল জিভ দিয়ে।

একজন না একজন গদাধর ঠিকই থেকে যায় বলে পৃথিবীটা চলছে... গদাধর ভাবল। কিন্তু এই ছেলেটা ঢপ দিচ্ছে না তো? টুপি পরাচ্ছে না তো? সহানুভূতি আদায় করে কামাবার ধান্ধা। এই পৃথিবীটা বড়ই বিচিত্র। গদাধর এগিয়ে যায়। কী রে ইউসুফ।

ইউসুফ হাসল।

কাজে যাচ্ছিস?

জে।

সোয়েটারটা কই?

ঘরে।

কাউকে দিয়েছিস বুঝি?

না।

তবে পরিসনি কেন?

ইউসুফ চুপ করে রইল।

বল ইউসুফ, তোকে বলতেই হবে, এই শীতের মধ্যে খালি গায়ে চলেছিস কেন, যখন তোর গরমজামা আছে।

ইউসুফ চুপ।

বল, ঢোলা হয়েছে বলে পরিসনি?

না।

তবে?

জামা পরি গেলে মালিক রাগ করবে।

রাগ করবে? কেন রাগ করবে...?

মালিক তো আমায় জব্দ করতি চেয়েছিল। ঝদি বোঝে আমি জব্দ হইনি, তবে তিনি বেজার হবেন। আর ঝদি বোঝে আমি খুব জব্দ হয়েছি তবে তিনি খুশি হবেন।

হারমোনিয়াম আর সারেঙ্গিতে একটা অদ্ভুত বাজনা বেজে উঠল এই ডায়লগের পেছনে। ইউসুফ চুপ করার পরও বাজনাটা চলতে থাকল। এবারই বিবেকের গান এবং পালাটা শেষ হয়ে যাবার কথা।

কিন্তু গদাধর কিছুতেই এই সামাজিক পালার নাম দিতে পারছে না। 'গরিব ঘরের শ্যামলা মেয়ে', নাকি 'গরিব ঘরের মেয়ে', নাকি 'গরিবের ঘর', নাকি 'দেশ', নাকি 'ভারতবর্ষ'?

শারদীয় বসুমতী, ১৯৯০

নারী হওয়া

এক

দরজা ধাক্কানোর শব্দে কালিদাসী বলল, এখন খোলা যাবে না।

বাইরে থেকে কথা এল— আমরা এসেছি ভ্যান রিকশা নিয়ে। ভোট দিতে যাবেনি?

কালিদাসী বলল— যাওয়া হবেনি।

কেন হবেনি। দু-দুটো ভোট নষ্ট হবে?

কালিদাসী বলল— তোরা কেউ দিয়ে দিস গে যা। আমরা পারব না। প্রসব করাচ্ছি। পুঁটুর বাচ্চা হবে এখন।

নতুন বেলেড, ষাঁড় গোবরের ছাই, রসুন তেল, উদাল লতার পাতা, বেগুইল পাতা ছ্যাঁচা রস, সব নিয়েই কালিদাসী রেডি। পুঁটুর জল ভেঙেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু খালাস হচ্ছে না। কালিদাসী বলে— অ পুঁটু, ঠ্যাংদুটা আরটু ছড়ায়ে দে দিকিলো, আর এট্টু এট্টু করে কোঁত মার।

তাই করল পুঁটু। কিন্তু হচ্ছে না। ব্যথা গতকাল থেকেই। কালিদাসী গতকালও জন খাটতে যায়নি। একদিন কামাই মানে ষাটটা টাকা লস। কিন্তু কী করবে কালিদাসী, এটাও তো ডিউটি, নাকি?

পুঁটুর যোনিদ্বারে হাত রাখে কালিদাসী। বাচ্চার মাথাটার কোনও আভাস পায় না। দু'হাতে দুটো করে আঙুল যোনিপথে চালান করে বাচ্চার মাথা ঠাহর করতে চেষ্টা করে, তাতেও পায় না— দেখ দিনি একুনো ভিতরে ঠেসে বসে আছে। বেরোচ্চে না। আরে আয় বাপধন, সোনা আমার, কইলজে আমার, মিঠু আমার, শাহরুক আমার, আরে আয়নারে...।

আসলে চিন্তায় পড়েছে কালিদাসী। দু' ঘণ্টা হয়ে গেল জল ভেঙেছে। দেরি হলে বাচ্চা বাঁচবে না।

কেৎরে উঠল পুঁটু। একটু আগেও কেৎরে ছিল। বাচ্চা বেরুনোর সময় হলে মোচকানো ব্যথা ঘন ঘন হয়। এবারই হবে মনে হচ্ছে।

আড় বাঁধ সার বাঁধ
চোদ্দো গেরো একুশনাড়ি
মা ষষ্ঠীর দয়ায় জিন্দা ছাওল আয়
শূলের শূল গোলাম
পুঁটুর গভ্‌ভে শূল চালান
মদনীরের আজ্ঞায় ষষ্ঠীর বর
পুঁটুর ছাওল উল্টিয়া ভূমে পড়
কার আজ্ঞায়?
মদনপীরের আজ্ঞায়।

কালিদাসী হাতজোড় করে বসে থাকে।

দুই

কালিদাসী প্রকৃত অর্থে দাই নয়। দাইগিরি করে ওর পেট চলে না। ও জন খাটে। এ অঞ্চলে কালিদাসীর মতো অনেকেই জন খাটে। এই গাঁয়ের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে বাংলাদেশ বর্ডার। গ্রামটির নাম ডুমডুমা। ছেলেপিলের বয়স বছর বারো হলেই দু-এক বোঝা মোট বয়ে দেয়। কালিদাসীর এ রকম অনেক ছেলেপুলে আছে। এই পুঁটুও একজন জন। কালিদাসীর সঙ্গে থাকে। কালিদাসী পুঁটুরানির মাসি হয়। পাতানো মাসি হলেও আসল মাসির চেয়ে বেশিই করেছে। পুঁটুর মা যখন পুঁটুর বাপকে ছেড়ে শান্তিপুরে চলে গেল, বলে গিয়েছিল মেয়েকে দেখিস। পুঁটুর তখন ছ' বছর বয়েস। পুঁটুর বাপের নাম দুলাল। কাজ করে মুখুজ্যে বাড়িতে। বাঁধি কিষেন। ঢেঁকিঘরে বাপ মেয়েতে থাকে। বাঁধি মুনিষদের জন্য আই আর এট এর মোটা চাল, পাঁচ মিশেলি তরকারি। ফাল্গুনের শেষে বাঁধাকপি যখন আট আনা কেজি, তখন মুখুজ্যে বাড়ির জন-মুনিষগুলোর জন্য বাঁধাকপির তরকারি, মাঘ মাসে যখন বাজারে মুলো বিকোয় না, তখন মাঠের পড়ে থাকা মুলো দিয়ে জন-মুনিষদের জন্য তরকারি। মুখুজ্যে বাড়িতে পুঁটুও জন্মদাসী। মুখুজ্যেকত্তার বড়খোকার মেয়ে হৈমবতী পুঁটুরই বয়সি। পুঁটু যখন হাঁটতে শিখেছে, হৈমর হাত থেকে পড়ে যাওয়া ঝুমঝুমি কুড়িয়ে পুঁটুকে দিয়েছে, হৈম যখন এক্কা দোক্কা খেলেছে, পুঁটু ওর সেফটিপিন খুঁজে দিয়েছে। হৈম যখন ওর পুতুলের বিয়ে দিয়েছে, পুঁটু তখন ভোজবাড়ির জন্য শালুক পাপড়ির লুচি ভেজেছে, তেঁতুল বিচির মাংস রেঁধেছে। পুঁটু পাঁচ বছর হতেই ঝাড়ু দেয়, পলাং সাফ করে, পুঁটু যখন গুনতে শিখেছে, তখনই হাঁসগুলিকে আয় আয় চই চই ডেকে গণ্ডা হিসেব করে হাঁসের ঘরে নিয়ে গেছে, পুকুরে কেটো গর্তে চোরা ডিম রয়েছে কি না খুঁজে এনে গিন্নিমাকে ফেরত দিয়েছে। পুঁটু যখন আরও বড় হয়েছে, কর্তাবাবুর পা টিপে দিয়েছে, হৈমর বাবার পাকাচুল বেছে দিয়েছে। কর্তাবাবু, গিন্নিমারা পুকুরে নাইতে গেলে যেন না পড়ে যায়, এজন্য ঝামা দিয়ে শ্যাওলা উঠিয়েছে। এমনি করতে করতে পুঁটু বড় হয়েছে।

পুঁটুর মা তরঙ্গিনী কালিদাসীকে বলে গেছিল মেয়েকে দেখিস, তাই তরঙ্গিনী মাঝে মাঝে মুখুজ্যে বাড়ি গিয়ে পুঁটুর খোঁজ নিয়েছে। যখন পুঁটুর পেট ডিং ডিং, কালিদাসী কালমেঘের বড়ি খাইয়ে কৃমি বার করিয়ে দিয়েছে, যেদিন পুঁটুর প্রথম মাসিক হল, তেনা বাঁধা শিখিয়ে দিয়েছে, আর সেইদিনই পুঁটুর বাপ দুলাল মরল।

দুলালের পিঠে একটু কুঁজ। বেঁটে বামন। হাত বাড়িয়ে হাইব্রিড পেঁপে গাছের পেঁপেও নাগাল পেত না, পুঁটুর মার কাঁধের কাছে পুঁটুর বাপের মাথা। পুঁটুর বাপ যখন হাঁটত, ওর পিঠের কুঁজ কাঁপত। দুলাল গোরুর খড় কাটত, জাবনা দিত। গোরুর গা চুলকে দেওয়া, স্নান করানো, এসব করত, বাগানের জংলা পরিষ্কার, মাঝে মাঝে ইউরিয়ার থলে নিয়ে ধানখেতে জয় লক্ষ্মী জয় লক্ষ্মী বলে ইউরিয়া ছড়ানো, এইসব করত। আর একটা কাজে খুব পটু ছিল দুলাল। নারকেলগাছে উঠে নারকেল পাড়ত আর পুঁটুর মায়ের কাজ ছিল এককাঁড়ি বাসন মাজা, মস্ত উঠোনটা গোবর নেতা করা, মাছ কুটে দেয়া, এইসব। তা ছাড়া মাঝে মধ্যে বানেশ্বরের সঙ্গে শুতে হত। বানেশ্বর, মুখুজ্যেদের কীরকম যেন জ্ঞাতি ভাই। ল্যাংড়া। বে থা করেনি। সব জন-মুনিষ খাটাত বানেশ্বর। মুখুজ্যেকত্তার বড়খোকার বনগাঁ বাজারে পাটের আড়ত। মেজখোকা ইস্কুল মাস্টার, ছোটখোকা বারাসতে চাকরি করে, ওদের জমি জিরেত দেখার সময় কোথায়, সবই বানেশ্বরের হাতে। গলায় মোটা পইতে, হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে লেংচে লেংচে জমির আলে আলে চলে বেড়ায়, দেখে কে ফাঁকি দিচ্ছে কে কাজ কচ্ছে— হেঁকে ওঠে— আবার বিড়ি ধরালি দুলাল। একটা বিড়ির টাইমে বিশটা ধান রোয়া হয়ে যায়। বানেশ্বর আবার বারোয়ারি দুর্গাপুজোও করে, লোক মরলে শ্রাদ্ধশান্তিও করে দেয়। ওই বানেশ্বরের ঘরে তরঙ্গিনীকে মাসে দু-একবার যেতে হত। পুজো করে পাওয়া লালপেড়ে শাড়ি বছরে দুটো করে পেত তরঙ্গিনী বানেশ্বরের কাছে। কালিদাসীই বলেছিল

তরঙ্গিনীকে, দুটো শাড়ি দিয়ে এ রকমভাবে সারা বছর রাখা যায় না। ঠকাচ্ছে। তরঙ্গিনী ভাবল পরপুরুষের সঙ্গে যখন শুতেই হচ্ছে তা হলে বরং গতর বেচাই ভাল। ওর কে যেন জানাচেনা ছিল শান্তিপুরে। ওখানে চলে গেল তরঙ্গিনী।

কালিদাসীকে বলে গেছিল মেয়েকে দেখিস। কালিদাসী দেখছে। দুলাল যখন মরল, কালিদাসী তারপরই পুঁটুকে নিজের কাছেই রেখেছে।

তিন

দুলাল যখন গাছ থেকে পড়ল, ওর তখনও চোখে ছিল নীল চশমা।

ওই চশমা হাট থেকে কিনেছিল দুলাল। একটা লোক সারা গায়ে চশমা সেঁটে হাঁকছিল গগলস্ গগলস্। দুলাল একটু নেড়ে চেড়ে দেখছিল, একবার চোখেও দিল। ভয়ে ভয়ে, আর অমনি আকাশের সাদা মেঘ নীল বর্ণ হয়ে গেল। হাঁসের ছা গুলিও নীল, আমিনুদ্দিনর সাদা দাড়ি নীল। কালো চশমা খুলে ফেলল তাড়াতাড়ি। দামও জিজ্ঞাসা করল একবার। লোকটা বলল, পঞ্চাশ টাকা। দুলাল ফেরত দিল। লোকটা বলল, তুমি কত দেবে। কত আর দেবে দুলাল। ও সামনে বাড়ল। লোকটা এসে খপ করে দুলালের জামা— ওটা ছোটবাবুর পুরনোটা, ধরে বলল, পালাচ্ছ যে বড়, জিনিস দেখলে দাম শুধোলে... বলো কত দেবে।

দুলাল বলেছিল, পনেরো টাকা। ভেবেই বলেছিল। পঞ্চাশের মাল কখনও পনেরো হতে পারে না, এটা ভেবে। কী আশ্চর্য লোকটা বলল, কুড়ি টাকা দাও। দুলাল বলেছিল, কুড়ি নেই। লোকটা ঝাঁঝিয়ে বলেছিল দেখি কত আছে? ষোলো টাকা ছিল দুলালের কাছে। পুঁটুর খুব পাউডার মাখার শখ হয়েছে। ক' মাস ধরে বলছিল পাউডার এনে দাও। দুলাল ভেবেছিল হাটের কোনায় যেখানে কম দামের সোনো পাউডার বিক্রি হয়, ওখান থেকে কিনে দেবে একটা। কিন্তু হল না। চশমাওলা বলেছিল, ষোলোই দাও এখন, সামনের হাটে বাকি চার টাকা দিয়ে দিয়ো।

ঘরে ফিরল। ঘর মানে ঢেঁকিঘর। ওই ঘরে আগে ঢেঁকি ছিল, এখন আর ঢেঁকি নেই। এখন এই ঘরে থাকে মেটাসিড, ফলিডল, ইউরিয়ার বস্তা এইসব। ঘরের ভিতর ওষুধ ওষুধ গন্ধ। দুলাল ভেবেছিল মেয়ের সঙ্গে একটু রগড় করবে। চশমাটা পরে ঘরে ঢুকেছিল। নীল চশমায় দুলাল দেখেছিল ওর মেয়ের টেপ জামায় কালো দাগ। উরুতে কালো ফোঁটা। ওমনি চশমা খুলল। দেখল লাল। ওমা! রক্ত!

চার

পুঁটুর তখন পুকুরে স্নান সেরে ফিরে আসার সময় গামছার দরকার, গায়ে জড়াতে হয়। পুঁটুর আলাদা গামছা ছিল না। দুলালের গামছায় বিড়ির গন্ধ।

পুঁটুর বাবার ওই গামছাটা পুঁটু ছোঁয়নি। একটা চটের টুকরো দুই পায়ের মাঝখানে রেখে চেপে শুয়েছিল। আলাদা। ইউরিয়ার খালি বস্তা পেতে বাবার থেকে দূরে শুয়েছিল। পুঁটুর ভীষণ লজ্জা করছিল। মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। ও যে মেয়েছেলে হয়ে গেছে। ইউরিয়ার বস্তা ঠিকরে চাঁদের আলোর মহামারি। ঘুম আসছিল না। হৈমবতী বড় দাদাবাবুর মেয়ে। ক' মাস আগে ওরও এ-রকম হয়েছিল। হৈম তখন উঠোনে এক্কা দোক্কা খেলছিল। রক্ত দেখতে পেয়েই কেঁদে উঠেছিল হৈমবতী। গিন্নিমা তখনই বেরিয়ে এসেছিল, হৈমবতীর হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরে। খাটে শুইয়ে দিল। গরম দুধ খাওয়াল, আর দুলালকে ডেকে দশটা টাকা দিয়ে বলেছিল— ক'টা আপেল নিয়ে এসো। বাক্সয় ভরে আপেল যায় বাংলাদেশে। যারা পাচার করে, ওদের দশটা টাকা দিলে দু-তিনটে আপেল হাতিয়ে বার করে দেয়।

পুঁটু সকাল সকাল উঠে গেল। ওর তেনা দরকার। একটু তেনা। চাইবে? লজ্জা করে। পুঁটু হাঁসের ঘরে যায়। মদ্দা হাঁস দুটোর পায়ে চিহ্ন দিতে হবে। হাঁস দুটো অন্য পুকুরে যায়। কেন যায় পুঁটু জানে। হাঁসগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে জলে ছেড়ে দিয়ে গোবর পরিষ্কার করতে যাবে, তখনই বড় বউদির সঙ্গে দেখা। বড় বউদি গুড়াকু দিয়ে দাঁত মাজছিল। বড় বউদি পুঁটুর দিকে চাইল, বলে উঠল সে কী লো পুঁটু, বাঁধিয়েছিস। এইখানে দাঁড়া। দুধের গোরুকে ছুঁসনি তো!

পুঁটুর খুব লজ্জা হয়। মাথা নিচু করে থাকে।

শোন, দুধের গোরু ছুঁবি না।

পটল খেতে যাবি না

পান বরজে ঢুকবি না

তুলসীগাছ ছুঁবি না।

হেঁসেলে ঢুকবি না।

পুঁটু মাথা নিচু করে থাকে।

তেনা বাঁধা জানিস?

পুঁটুর মাথা নিচু।

গুণীর মা এলে পাঠিয়ে দেব। ঘরে গিয়ে চুপ মেরে বোস থাকগে যা।

চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল পুঁটু।

পাঁচ

ফ্রক জামা পরে কালিমাসির কাছে গেল পুঁটু। কালিমাসি বলেছিল, যেদিন মেয়েছেলে হওয়া হয়ে যাবে, আমায় বলবি। আমি শিখিয়ে দেব। কালিমাসিই বলে দিয়েছিল মেয়েছেলে হয়ে গেলে কী কী হয়। মাঝে দু-একবার খোঁজ নিয়ে গেছে, কীরে, হল? কালিমাসি বলেছিল— তোরে ওই মুকুজ্যে বাড়ির থে বার করি আনব। আমার লাইনে কাজ করবি, থাকবি ভাল, খাবি ভাল। ও বাড়ি থাকলি সারাজীবন দাসীবিত্তি।

পুঁটু বলেছিল, মাসি, আমার হয়েছে।

কালিমাসি জড়িয়ে ধরল পুঁটুকে। আদর করল। বলল, এবার তোর মায়ের কাছে নিয়ে যাব একদিন। আমার কর্তব্য। তোর মা যদি মায়ের লাইনে রাখতে চায় তো রাখুক, নইলে আমার লাইনে।

পুঁটু বলে, না মাসি মায়ের নাইন ভাল নয়।

পুঁটু জানত ওর মা বেবুশ্যে হয়ে গেছে। বেবুশ্যে মানে বোঝে পুঁটু। বড়খোকাবাবুর মেজখোকাবাবু সুবল, কলেজে পড়ে। একদিন পেয়ারা খেতে গিয়ে হঠাৎ বুকে হাত দিয়েছিল, ছোট্ট বুকটায়। তারপর ওকে দেখলেই লজ্জা। ওই খোকাবাবুদের গেঞ্জি জাঙিয়া পুঁটুকেই সাবান কাচা করতে হয়। একদিন সুবলের ছাপছাপ জাঙিয়া কাচছিল পুকুরে, এমন সময় সুবল এসেছিল, অমনি জাঙিয়াটা বালতিতে সেঁধিয়ে দিল। লজ্জা। একদিন স্বপ্ন দেখেছিল পুঁটু, সুবল দাদাবাবু ওর ঘরে ঢুকেছে। পুঁটু বলছে, কেন এয়েচ? দাদাবাবু তখন পাঁচটা টাকা দিচ্ছে। পুঁটু বলছে, টাকা দিচ্ছ কেন, আমি কি বেবুশ্যে? দাদাবাবু বলছে, তোর মা তো তাই। দাদাবাবু ওকে টানছে, তখন চিৎকার করে ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরেছিল পুঁটু। দুলাল বলেছিল, কী হল। চিল্লাস কেন!

কালিদাসী পুঁটুকে ঘরে নিয়ে গেল। পান্তাভাত আর কলমির শাক ভাজা খেতে দিল। তেনা বাঁধা শেখাল, তেনা দিল কিছুটা। কীভাবে ধুতে হবে, কোথায় লুকিয়ে শুকোতে দিতে হবে। সব বলে দিল কালিদাসী। তারপর কালিদাসী বলেছে— এখন বাড়ি যা। তোর বাপ-মায়ের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব।

পুঁটু আবার বলে, না গো মাসি মায়ের নাইন ভাল নয়।

কালিদাসী বলেছিল— আমারও তাই মত। রোজ রোজ কি পুরুষ বসানো পোষায়? যখন ইচ্ছে হবে তখন বসানো ভাল।

পুঁটুর কান গরম হয়ে যায়। এ রকম কথা আগে কখনও কালিমাসী বলেনি। কালিমাসী পুঁটুকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, দুপুরে খেয়ে গেলে পারতিস। পেঁয়াজ দে পাঁকাল মাছের কটকটে ঝোল রাঁধব ভাবচি।

পুঁটু বলেছিল, বলে আসিনি।

বাড়ি ফেরার পথে পুঁটু দেখেছিল বিশ্বাসবাড়ির উঠানে ভিড়। নারকোল গাছতলায় শুয়ে আছে পুঁটুর বাপ। ঠোঁটের কোনায় রক্ত, নাকের তলায় রক্ত। মাছি।

বাপ গো, বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল পুঁটু। বড়গিন্নি হাত টেনে ধরল। কাছে টেনে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ছুঁসনি ছুঁড়ি, আত্মার অমঙ্গল হবে। তুই আশুচি না! আত্মা শুনে কঁকিয়ে উঠেছিল পুঁটু। আত্মা? মানে মরে গেছে? নুন লাগা মাগুর মাছের মতো ছটফটায় পুঁটু। বড়গিন্নি হাত ধরে রেখেছে। বামুনবাড়িতে থেকে অনাচার চলবে না।

বিশ্বাসদের বাড়ি মুখুজ্যেদের কাছেই। দুটো টাকা দেবে বলে অনন্ত বিশ্বাস দুলালকে নারকেলগাছে উঠিয়েছিল ডাব পাড়ার জন্য। দুলাল নাকি নীল চশমা চোখে দিয়ে গাছে উঠেছিল। গাছে উঠে বলেছিল সব নীল। নীলবন্নের মেঘ। নীল কাশফুল, সব দেখা যাচ্ছে। বিশ্বাস কত্তা, আপনার ধুতিটাও নীল, কিন্তু ওই পঞ্চায়েত বাড়ি লাল ফেলাগের রংটা কালো।

হাত ফস্কে পড়ে গিয়েছিল দুলাল। অনন্ত বিশ্বাস শুনেছিল জ্ঞান হারাবার আগে দুলাল বলেছিল, আপেল, পুঁটুর জন্যি আপেল।

ছয়.

শ্মশানে গিয়েছিল কালিদাসী। পুঁটু ছাড়া কান্নার আর কেউ নেই। শ্মশানের ধারে কাশফুল ফুটেছিল। বাঁশের মাচাটা কাশবনে নামানো। কাশের গোছা হাওয়া হেলে পড়ছে দুলালের মুখে। দুলালের চোখে সেই কালো চশমাটা। পুঁটু দিয়ে রেখেছিল। ও দেখেছে, অনন্ত বিশ্বাসের বাবা মারা যাবার পর ওর চোখে চশমাটা লাগানো ছিল।

বামুন এসেছিল। ঘাটের বামুন। বানেশ্বরের খোঁজ করেছিল। বানেশ্বরকে পাওয়া যায়নি। বামুন জিজ্ঞাসা করেছিল, মুখে আগুন দেবে কে? মেজখোকাবাবু বামুনের কানে কানে কী যেন বলল। বামুন পুঁটুর দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল। বামুন বলল, কেউ একজন মুখে আগুন দিয়ে দিয়ো। পঞ্চানন এগিয়ে এল। বিশ্বাসবাড়ির কিষেন। কালিদাসী পুঁটুকে বলল, চশমাটা নিয়ে নে। কী হবে পুড়ে গিয়ে। চশমাটা পুঁটুর হাতে। চিতা নিভে গেলে কালিদাসী বলেছিল, পুঁটুকে নিয়ে যেতে চায়। সবাই রাজি। পুঁটু সোমত্ত হয়ে গেছে। সোমত্ত মেয়েকে ঘরে রাখা কম ঝামেলা!

সাত

অপমৃত্যুর কাজ চার দিনে।

চার দিনের দিন ডালা সাজিয়ে ভুজ্যি দিয়েছে ঘাটের বামুনকে। একপো চাল, কুমড়ো এক ফালি, দুটো আলু, পান সুপুরি। গোরুকে কাঁঠাল পাতা খাইয়েছে, আর আঁজলা করে বাঁওড়ের জল নিয়ে বলেছে, বাবাগো, যেখানে থাকো ভাল থেকো।

কালিদাসী নতুন ফ্রক কিনে দিয়েছিল পুঁটুকে। বনগাঁ থেকে ট্রেনে চেপে রানাঘাট, রানাঘাট থেকে শান্তিপুর। স্টেশনে চা খেয়ে রিকশা চেপে অনেক দূর। কালিদাসী ওই চশমাটা পরেছে।

দুলালের চশমাটা। একটু সরু গলির সামনে রিকশা দাঁড় করাল কালিদাসী। গলিতে মেয়েরা সব ঘরের সামনে বসে গল্প করছে, পান খাচ্ছে, গাল দিচ্ছে। পুঁটুর ভয় করছিল, আবার আনন্দও। কতদিন পরে মাকে দেখবে।

একটা ঘরে কড়া নাড়া দিল কালিদাসী। ভেতর থেকে আওয়াজ এল লোক রয়েছে। কালিদাসী পুঁটুকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিল। গলির মোড়ে। কালিদাসী পান খেল। পানওলা বলল, নতুন? কালিদাসী বলল— মরণ। আধঘণ্টা এদিক ওদিক কাটিয়ে কালিদাসী ঘরে গিয়েছিল। দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল পুঁটুর মা। পুঁটু ঠিক চিনতে পারল কিন্তু অনেক পালটে গেছে। গালে কালচে ছোপ, চোখ ফুলোফুলো। স্বপ্নে ও এ রকম দেখেনি। পুঁটুর মা দু'হাতে জড়িয়ে পুঁটুকে চুমু খেল। মায়ের গায়ের গন্ধটা পুঁটুর ভাল লাগল না। ওরা ঘরে গিয়েছিল। ঘরে একটা তক্তাপোষ, ঘরের কোনায় জনতা স্টোভ, একটা ফাঁকা বোতল, দুটো গেলাস, দু-চারটে চানাচুরের ডাল মেঝেয় পড়ে আছে।

কীরে কালি, খবর বল। পুঁটুর মায়ের প্রশ্ন। পুঁটুর মাথায় মায়ের হাত। কালী খবর বলল। পুঁটুর বাপের খবর বলল। পুঁটুর মা চোখের জল মুছল। তারপর পুঁটুর খবর শুনল, শুনেই বলল, কী সব্বোনাশ। বলেই পুঁটুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, তুই মেয়েমানুষ হয়ে গেলি রে পুঁটু...।

তারপর অনেক কথা হল দু'জনে। পুঁটু ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরাচ্ছিল। মা কালীর ছবি, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, ইলেকট্রিক লোশন, বহরের ননি— যে-কোনও রকম জ্বালা যন্ত্রণায়...।

চা হল। পুঁটুর মা পুঁটুর হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিল। বলল, মিষ্টি খাস। বলল, সোনা মেয়ে আমার, তুই কালির কাছেই থাক। আমার লাইন খুব খারাপ রে সোনা। এখন যা, সন্ধে হয়ে গেলেই বিপদ।

ওরা বাইরে। বিকেল।

কালিদাসী বলেছিল— তোর মায়ের পারমিশেন হয়ে গেল। তুই এখন আমার।

কালি ওর ব্যাগটা খুলল। কালো ব্যাগে ওই কালো চশমা। ও নিজে পরল না। পুঁটুকে পরাল।

আর ওই চশমাটা বিকেলকে অন্ধকার করে সন্ধে করে দিল।

আট

কালিদাসী বলেছিল, এবার তুই বুঝবি। পুরুষজাতির কার কোন দিকে নজর। কোন পুলিশ একটু ঢলানিতেই সন্তুষ্ট, কোন পুলিশের কাছে একটু গা ঘেঁষি দাঁড়াতি হবে। কোন পুলিশেরে বাবা-জ্যাঠা ডাকতি হবে। কোন পুলিশের পায়ে পড়তি হবে। কোন মস্তানেরে দাদা ডাকতি হবে, রাখির দিনে রাখি পরায়ে দিতি হবে এবার নিজিই বুঝতি পারবি। আমার শিখাতি হবে না।

কাজটা মাল পাচারের। বনগাঁ থেকে এখানে আসে শাড়ি, মশলা, চিনি, তেল, আপেল, আঙুর এইসব। গ্রামের ভিতরের রাস্তা চওড়া নয়। মেটাডোর কোনও মতে ঢুকতে পারে, নইলে ভ্যান রিকশা! ভ্যান রিকশায় বর্ডার পর্যন্ত। একই মাঠ, মাঠে একই ফসল, একই কাক-শালিখ, একই হাওয়া বাতাস। মাঠ বরাবর কাঁটাতার। দূর দূরে বি এস এফ চৌকি। কাঁচা রাস্তাও তৈরি হয়েছে, কিছু জায়গায় কাঁটাতার কাটা আছে। ওই ফাঁক দিয়ে মানুষ মোট বয়ে নিয়ে যায়। ওরাই জন। এ অঞ্চলের বালকরা এভাবেই 'জন' হয়ে যায়। জন খাটে। এই জনরা সিনিয়ার হয়ে গেলে জন খাটায়। কালিদাসী জন খাটায়।

ওপাশ থেকে পোস্ত আসে, আর আসে পুরনো পোশাকের বস্তা। কালিদাসী বলে, মরা সাহেব মেমের জামা। ওইসব পুরনো কাপড়-জামা মোট বয়ে সাইকেল ভ্যানে তুলে দিতে হয়। এইসব কাপড় জামা হাবড়া, রানাঘাট, শান্তিপুর, মহলন্দপুরে যায়। ওখানে ধোলাই হয়, লাইনিং হয়, মেডিন থাইল্যান্ড, মেডিন তাইওয়ান শিলিপ লাগানো হয়, তারপর মার্কেটে আসে। ধর্মতলার ফুটপাতে,

কৃষ্ণনগর-হাবড়া-নৈহাটির বাজারে চলে আসে। ওইসব মাল বর্ডার থেকে পৌঁছে দিতে হয় হাবড়া-মছলন্দপুর-রানাঘাট-শান্তিপুরে। কালিদাসী, মানে পুঁটুর কালিমাসী বলেছিল, ঝামেলির কিছু নেই রে পুঁটু, ট্রেনে বাবুদের ব্যাগের সঙ্গে ব্যাগ রেখে দিবি, স্টেশন এলি নামায়ে নিবি, ব্যাস। তোর মতো মেয়েরাও আছে, ছেলেরাও আছে। তোকে সবাই সাহায্য করবে, ভালবাসবে। একদিন বিয়েও হয়ে যাবে তোর। দু'জনে মিলে কাজ করবি। আমার মুক্তি।

নয়

এই আট-দশটা গ্রামে বেকারি নেই। সবাই জন খাটে। মাঠের কাজের জন্য লোক পাওয়া ভার। সরকারি রেট যা, তার চেয়ে বেশি দিতে হয়। ভিখিরি নেই। একজন জনখাটা ছেলে পণ ছাড়া বিয়ে করে না। মেয়ে বিয়ে দিতে মেয়ের বাপের খরচ এরকম—

পণ	৫০০০্
সাইকেল	১৫০০্
ঘড়ি	৫০০্
গয়না	৯০০০্ (দু' ভরি)
খাটবিছানা	৩০০০্
লোক খাওয়ানো	৫০০০্
অন্যান্য	১০০০্
মোট	২৫০০০্
(কমপক্ষে)	

এই টাকা হয়েও যায়। প্রেম করে বিয়ে হলেও মেয়ের বাপকে হাজার বিশেক টাকা খসাতেই হয়। এটাই দস্তুর।

গ্রামের মুদি দোকানে হরলিক্স, কমপ্ল্যান পাওয়া যায়। বিদেশি সাবান, বড় বোতলে কোকাকোলা পেপসি, আর ছবিওলা বিদেশি কনডোমও। গোটা তিনেক দেশি মদের ঠেক হয়েছে। বি এস এফ-র লোকজন মাঝে মাঝে ওই ঠেকে আসে, মাতব্বরদের কাছ থেকে মাসিক দক্ষিণা নিয়ে যায়। এ রকমই এক কমবয়েসি মাতব্বরের নাম সুখেন। চওড়া ছাতি, কোঁকড়া চুল, মাদ্রাজি বি এস এফ-এর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে। পুঁটুর সঙ্গে অন্য যেসব মেয়েরা কাজ করে, ওরা সুখেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। সুখেন যদি কাউকে ঝালমুড়ি খাওয়ায়, সে মেয়ে যেন বর্তে যায়। এই সুখেন একদিন গোবরডাঙ্গার 'স্মৃতি' হলে পুঁটুকে নিয়ে সিনেমায় গেল। হাতে হাত রাখল।

দশ

পুঁটু যখন সুখেনকে বিয়ে করল, তখন পুঁটুর বয়েস সতেরো। কালিদাসী নিষেধ করেছিল। বলেছিল সবকিছু কর, কিন্তু বিয়েটা এখন করিসনি। বিয়ে মানেই ফের দাসীবিত্তি। ঘর-সংসার ছেলেপুলে চাস তো পরে করলেও পাত্তিস। কিছুদিন মৌজ করে থাক। টাকাপয়সা জমা, নিজের একটা কালার টিভি হোক। হাজার দশেক টাকার নিজস্ব ব্যাংকের কাগজ হোক, তবে না! পুঁটু বায়না ধরল, না মাসি, অমন কোরো না...। কালিদাসীর কিন্তু সুখেনকে মন্দ লাগত না। দাপুটে ছেলে। কিন্তু খেলুড়ে নয়। যতটা দেখেছে সুখেনকে, মনে হয়নি আলুর দোষ আছে। এ লাইনের অনেক ছেলেদের মধ্যে এই দোষ আছে। তা ছাড়া সুখেন কালিদাসীকে মান্যিগন্যি করে। সুখেন দেখতেও ভাল। লোমভরতি চওড়া বুক। চৌকো মুখ। খোকাপানা ভাব। ওকে সাইকেল দিতে হবে না, কারণ ওর মোটর সাইকেল আছে। ওকে পণের জন্য নগদ টাকা না দিলেও চলবে। ও থাকে চাঁদপাড়ার কাছে।

এধারে কাজে আসে। মেটাডোর ভরতি মাল নিয়ে আসে আবার মেটাডোর ভরতি মাল নিয়ে চলে যায়। খোঁজখবর নিয়ে দেখেছে কালিদাসী। ওর রেকট ভাল। আগেও বিয়ে করেনি, কাউকে পেট করেছে, এমন কথাও কেউ বলেনি। চাঁদপাড়ায় নিজেদের একতলা পাকা বাড়ি, দশ বিঘে ধানী জমি, কালিদাসী আপত্তি করেনি। দশ হাজার টাকার ব্যাংকের কাগজ করতে এখনও অনেকদিন লেগে যাবে, সুখেন কি অ্যাদ্দিন বসে থাকবে? তার চে মনে যখন ধরেছে, বিয়েটা দিয়ে দেওয়াই ভাল। তরঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করতে তরঙ্গিনী বলেছিল, তুই যা ভাল বুঝিস তাই কর।

বিয়েতে তরঙ্গিনী আসেনি। কালিদাসীই বিয়ে দিয়েছিল। একশো লোক খেল। এর মধ্যে অনেকেই বি এস এফ, তাতে কী আছে, কালির টাকা কী হবে। ছেলেপুলে নেই, স্বামী ছেড়ে গেছে, ব্যাংকের কাগজ যা আছে, মাস গেলে এক হাজার টাকা সুদ, এক পেট চালাতে ক' টাকা লাগে।

সুখেনের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কালিদাসীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল পুঁটু। বলেছিল— ছোটবেলায় মা পাইনি, বড়বেলায় পেয়েছিলাম। কালিদাসী বলেছিল, মা হওয়া কি সহজ কথা?

এগারো

পুঁটু একদিন এসে কেঁদে পড়ল। ছ' মাসও পেরোয়নি বিয়ে হয়েছে। বলল, মাসিগো, আমাকে বি এছ এফের সঙ্গে শুতে হয় গো মাসি, দু'বার এমন হয়েছে।

শখ করে না জোর করে? কালিদাসী জিজ্ঞাসা করে।

ছিঃ, শক কেন হবে, জোর করে। একদিন ওদের ক্যাম্পে রেখে দিল। আগে কিছু বলেনি। পরদিন নিয়ে গেল। আমার শাউড়ি জানে আমি তোমার কাছে ছিলাম।

সুখেনকে বললি না কিছু পরে?

বললাম, এমন কেন করলে, ও বলল— আমার ভালর জন্য একদিন না হয় একটু কষ্ট করলে, এটা তোমার আমার ব্যাপার।

তারপর সাত দিনের মাথায় আবার একদিন বনগাঁ নিয়ে গেল শাড়ি কিনবার নাম করে, তারপর শাড়ি কিনে একটা হোটেলে ঢোকাল। ওখানে ছিল একজন বিয়েছেপ। ও ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। বিয়েছেপ ব্যাটা বলল— আগেরদিন বড় ভাল লেগিছিল, তাই সুখেনকে বললাম আর একবার যদি হয়...। তা সুখেন বড় ভাল ছেলে। ও উন্নতি করবে।

তারপর?

দু' ঘণ্টা পর সুখেন নিতে এল। ওর সঙ্গে বাড়ি গেলাম। বাড়ি গিয়ে চ্যান করলাম। শাশুড়িকে কিচ্ছু বলিনি। আজ পালিয়ে এলাম মাসি। সুখেন নিতে এলে যাব না।

বারো

সুখেন নিতে এল না।

কালিদাসীর সঙ্গে সুখেনের দেখা হয়, সুখেন কথা বলে না। কালিদাসী একদিন সুখেনকে ডেকে বলল— সুখেন, কথা আছে, একদিন এসো। সুখেন বলল— কোনও কথা নেই। ওকে নেব না। ও বি এস এফ-এর সঙ্গে নষ্ট। কালিদাসী বলল, তুমি তো ওকে জোর করে...।

সুখেন বলেছে— ও তাই বলেছে বুঝি! মিছে কথা। আমি হাতে নাতে ধরেচি।

কালিদাসী পুঁটুকে বলল— সুখেন ভোল পালটেচে। সব পুরুষ যা করে। বলি হ্যারে, পেট বাঁধাসনি তো, পুঁটুর মাথা নিচু। বলে দু' মাস মাসিক বন্ধ।

কালিদাসী বলেছিল— আগে বলিসনি কেন? তাড়াতড়ি খালাস করে নে।

পুঁটু বলেছিল, না মাসি, ওরকম বোলো না, ও থাক।

কালী বলেছিল, কিন্তু ওটা কার?

সুখেনের না বি এস এফ-এর?

পুঁটু বলেছিল, জানি না।

অনেক বলেছে কালিদাসী, অনেক বুঝিয়েছে, পুঁটু বলেছে, ও থাক মাসি, আমাকে মা ডাকবে।

এখন সুখেনও নেই। ও পাতাগুঁড়োর কাজ শুরু করেছিল। হেরোইন। এক সুটকেস মাল নিয়ে বম্বে গিয়েছিল, এই খবরটা কালিদাসী জানে। কিন্তু বম্বে থেকে আর ফেরেনি। পুঁটু কিন্তু মাথায় সিঁদুর দিয়ে যাচ্ছে।

তেরো

পুঁটুর পেটে একটু জল মালিশ করে কালিদাসী। অল্প চাপ দেয়। পুঁটু ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে। পুঁটু, কোঁৎ দে, পা দুটো আর একটু ফাঁক কর, আর একটু ছেতরে দে। ষষ্ঠীঠাকুরকে ডাক। দুর্গা নাম কর।

পুঁটু বলে, বড্ড কষ্ট মাসি।

কালিদাসী বলে, তুই যে মা হতে চেয়েছিস পুঁটু, মা হওয়া কি সহজ কথা।

কালিদাসী দেখে এখনও একটু করে জল চুঁয়ে পড়ছে। কালিদাসী জানে জল চোঁয়ানো বন্ধ হয়ে গেলে পেটের বাচ্চা মরে যায়। ওর হাতে গত পঁচিশ বছরে শ' দুই বাচ্চার জন্ম হয়েছে। নিজের বাচ্চা নেই— বাচ্চা বিয়ানোর কষ্ট ও জানে না, আনন্দও জানে না কালিদাসী। অন্য মেয়েছেলের আনন্দ দেখতে ভাল লাগে।

পুঁটু এবার চিৎকার করে, যন্ত্রণায় বেঁকে যায়, কালিদাসী দু' হাতে পুঁটুর ভাঁজ করা দুই হাঁটু ধরে থাকে। আসছে! আসছে! কালিদাসী মনে মনে উলু দিয়ে ওঠে।

একটা হাত বেরিয়ে আসছে। হাত। হাত নয়, মাথা চাই। মাথাটা বেরিয়ে এলে দু' হাতে আস্তে করে মাথা ধরে টেনে নিতে হয়। কিন্তু প্রথমে হাত বেরুলে মহা বিপদ। হাত ধরে টানতে গেলে ঘাড় আটকে যাবে। ক্রমশ হাতটা বেরিয়ে আসছে।

ও হাত, বেরুসনি, বেরুসনি, ও হাত, তোকে ভয় লাগে। কালিদাসীর দাই জীবনে এমনটা হয়নি আগে। শুনেছে কখনও কখনও এরকম হয়। এরকম হলে খুব খারাপ। রুইতন বিবি খুব ভাল দাই। রুইতনের কাছে ছুটে যাবে? বরং হাসপাতালই ভাল।

হাসপাতাল বলতে বনগাঁ। বনগাঁ এখান থেকে সাত কিলোমিটার। ভ্যান রিকশা ছাড়া কিচ্ছু নেই।

পুঁটু জল খা। পুঁটুর জিভে জল দিয়ে, চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে বলল, একটু সবুর কর। কালিদাসী ঘরের বাইরে যায়। হাঁক মারে, ভজা, গিরিধারী, রুইতনরে...।

রাস্তায় কোনও ভ্যান রিকশা নেই। সব ভ্যান রিকশা ভোট খাটতে গেছে। সমস্ত জন খাটিয়েরা আজ জনগণ। ভোটার জনগণ। একটা ভ্যান রিকশা কাস্তে হাতুড়ি চিহ্ন লাগিয়ে ভ্যানভরতি জনগণ নিয়ে ভোটের বুথের দিকে যাচ্ছে। আর একটা ভ্যান রিকশাও পাটাতন ভরতি জনগণ নিয়ে হাত চিহ্ন লাগিয়ে ভোটের বুথের দিকে চলে গেল।

ঘরের ভিতরে একটা রক্তমাখা হাত পুঁটুর পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপছে।

কালিদাসী ছুটে বেরিয়ে যায় আবার। বাইরে ভোটের সকাল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। একটা ভ্যান রিকশা দেখতে পেল রাস্তায়। ভরতি। ভোটের দিকে যাচ্ছে। আজ কোনও খালি ভ্যান রিকশা পাবে না, সব ভোটের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওই ভ্যান রিকশাটার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কালিদাসী। বলে, হাসপাতালে চলো গো, আমার মেয়ের বাচ্চা হবে, হাসপাতালে চলো। বুকে ব্যাজ আঁটা একটা লোক বলল, এখন কী করে হাসপাতালে যাবে, এতগুলো লোক ভোট দিতে যাচ্ছে...।

কালিদাসী বলল, ভোট বড় না জীবন বড়, তোমরাই বলো।

লোকটা বলল— ভোট বড়।

একটা বুড়ি কাঁপা গলায় বলল, জেবন বড় জেবন বড়...।

কালিদাসী ভ্যানওয়ালাকে বলল— চলো ভাই, হাসপাতালে, নইলে মেয়ে বাঁচবে না। ভ্যানওলা বলল— সকাল থেকে একদম ভোট পর্যন্ত আমি এদের কাছে বাঁধা। আমি কী করে যাব।

ব্যাচওলা লোকটা বলল, চল-চল-চল। কালিদাসী ছুটে গিয়ে ভ্যান রিকশার সামনে শুয়ে পড়ল।

বুড়িটা বলল, আমরা ভোট দিতি যাব না। ভাল লাগে না মোটে, বছর বছর ভোট হয় আর জোর করি নিয়ি যায়।

দু'জন-একজন করে ভ্যান রিকশা থেকে নেমে যায়। রিকশাওলা ব্যাজপরা লোকটাকে বলে, কী করব বাবু?

বুড়ি বলে কী আবার করবে, পোয়াতি নিয়ে হাসপাতালে যাবে।

ব্যাজওলা বলে, কতগুলো ভোট নষ্ট হল বলদিনি...।

বুড়িটাও নামতে যাচ্ছিল। ভ্যানওলা বলল, তুমি বোস থাকো, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দোব বুড়িমা।

বুড়ির সঙ্গে ছিল বুড়ির দুই নাতিনাতনি। বুড়ি বলল, আমার নাতিনাতনি দুটোও আমার সঙ্গে বসুক খানে। আগে তোমার মেয়েকে চাপাও, বনগাঁ হাসপাতালে যাবার পথেই আমার বাড়ি। নামিয়ে দিওখনে।

ব্যাজওলা লোকটা বলল— তোমার নাতি-নাতনিকে ছাড়ছি না। ওদের অন্য গাড়িতে নিয়ে যাব। তুমি যাও।

শেষ অব্দি বুড়িটা একাই রয়ে যায়। ভ্যানটা ঘরের সামনে নিয়ে কালিদাসী পুঁটুকে নিয়ে আসে। হেঁটেই আসে পুঁটু। কালিদাসী রিকশাওলাকে বলে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো। কালিদাসী পুঁটুর শায়া গুটিয়ে ধরে থাকে তলপেটের উপরে। একটা হাত ঝুলছে।

মাথায় একটা বালিশ দিয়ে পুঁটুকে শুইয়ে দেয় কালিদাসী। শায়াটা একটু নামিয়ে বেরিয়ে আসা হাতটা ঢাকা দেয়। বলে তাড়াতাড়ি চলো। বুড়ির মুখ গম্ভীর। বলে, কেরিমন দাই মরে গেছে, নইলে ও পারত হাতটা ঢুকিয়ে দিতে। বুড়িটা পুঁটুর মাথায় হাত বুলোচ্ছে।

কালিদাসীকে জিজ্ঞাসা করল, হিঁদু?

কালিদাসী মাথা নাড়ল।

বুড়ি বলল, দুগ্‌গা নাম করো। পুঁটুর কানের কাছে, মুখ নিয়ে বুড়ি কী যেন বলল বিড়বিড় করে, তারপর ওর মাথায় ফুঁ দিল।

আমিনপুরের মুসলমান পাড়ায় নেমে গেল বুড়ি। বলল, আল্লা করুন সব ঠিকভাবে হয়ে যায়। ভ্যানওলাকে বলল, সাবধানে যেয়ো। কালিদাসীকে বলল, দুগ্‌গা নাম জপতে জপতে যাও। বুড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, মা ফতেমা, মা ফতেমা, মা ফতেমা...।

হাসপাতালে ডাক্তার, ডেলিভারির নার্স, কেউ ছিল না, সব ভোট দিতে গেছে।

কালিদাসী শায়া উঠিয়ে দেখল রক্তমাখা হাতটা নিস্তেজ ন্যাতন্যাত করছে। কালিদাসী বুঝল আর নেই সে।

পুঁটুর হিক্কা শুরু হয়ে গেছে। সারা শরীর বেঁকে যাচ্ছে পুঁটুর। খিঁচুনি হচ্ছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

কালিদাসী, হে বিশ্বনাথ হে বিশ্বনাথ করতে লাগল, হে কালী, হে দুর্গা, হে কাস্তে হাতুড়ি, হে পদ্মফুল, হে হাত করতে লাগল। হে ডাক্তার হে ডাক্তার করতে লাগল। তারপর চেঁচামিচি শুরু করল। এতদূর মেয়েকে নিয়ে এলাম কী কত্তে তবে? মেয়ে মরে যাচ্ছে কিছু একটা করুন...।

অন্য ডিপার্টমেন্টের নার্স এসে পুঁটুর নাকে অক্সিজেন দিল। শায়াটা তুলেই বলল— ওমা, এ যে দেখি প্রতীক চিহ্ন।

ডাক্তার এল সিগারেট টানতে টানতে। এসে পুঁটুকে ভিতরে নিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়ে দিল পুঁটুকে। সঙ্গে ডেথ সার্টিফিকেট। একজন ভবিষ্যতের ভোটার কমল।

ভ্যান রিকশাতেই পুঁটুকে নিয়ে ফিরছিল কালিদাসী। রিকশাওলা কোনও কথা বলছিল না। দমকা হাওয়া দিচ্ছিল। যে হাতটা পৃথিবী আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, সেই হাতটা রক্তমাখা কাপড়ে ঢাকা। দমকা হাওয়া কাপড়টাকে কাঁপায়। নড়ায়। ইলেকট্রিকের খুঁটি থেকে খুঁটিতে ভোটের প্রতীক চিহ্নের শিকলি, সাজানো, তার তলা দিয়ে পুঁটুর ডেড বডি যায়।

একটু পরেই দেখে পুঁটুর বুকের কাছটা ভিজে গেছে। কালিদাসী মরা পুঁটুর বুকে হাত দেয়। ঠান্ডা, কিন্তু ভেজা। কালিদাসী বোঝে দুধ। শিশুটির জন্য নিজের শরীরে দুধের আয়োজন করে রেখেছিল পুঁটু।

সেই দুধ। কালিদাসী স্পর্শ করে। ছুঁলে পুণ্যি হয়।

রিকশা এগোয়। আমিনপুরের মুখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে লাঠি ভর দিয়ে ওই বুড়ি।

বুড়ি বলে, সেই থেকে দাইড়ে আছি। পোয়াতির খবর কী?

এই বুড়ি পুঁটুর কেউ না, কালিদাসীর কেউ না, শুধু একজন পুরনো মেয়েমানুষ কোনও নবীন মেয়েমানুষের খোঁজ নিচ্ছে।

এতক্ষণ কালিদাসী কাঁদেনি। এবার কাঁদল।

পুরশ্রী, ২০০২

মেয়েমানুষ অথবা কলাগাছ

১৮ই জুলাই। রাত ১১টা। ৫ নম্বর ট্যাংক।
বিদিশা ও চিনু।

জলে জাহাজ প্যাটার্ন বাড়ির ছায়া। আধখানা হওয়া চাঁদের ছায়া। জল ছুঁয়ে আসা হালকা হাওয়ায় মাধবী ফুল আর ডিজেলের গন্ধ। ঘাটের কাছটাতে নড়ছে মাখনের শূন্য প্যাকেট। লোড শেডিং। জাহাজবাড়ি থেকে ভেসে আসা স্টিরিয়োর পপ-এ মিশে আছে জেনারেটারের ঘট ঘট।

চিনু—একটু সাঁতার দিমু বউদি?

বিদিশা—না।

চিনু—অল্প একটু?

বিদিশা—আচ্ছা। ঠিক এক মিনিট।

চিনু—আমাদের হৃদয়পুরের মামার বাড়ির পিছনে একটা পুকুর আছিল।

কত শাপলা, লাল শাপলা, আর চোককুনি মাছ! ঘাটের কাছে চোককুনি মাছেরা ঘুরঘুর করত, কী সুড়সুড়ি লাগত।

বিদিশা—পুকুরের পাড়েটাড়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে নাকি রে?

চিনু—না, কেউ নাই।

বিদিশা—তবে আমার পিঠে সাবানটা একটু ঘষে দিবি?

তখন মাখন প্যাকেটের পাশে ভাসে মহীশুর স্যান্ডাল সোপের খালি প্যাকেট। চিনু ক্ষীর রং সাবানটা মুঠোয় নিয়ে গন্ধ নেয়। বিদিশা ব্লাউজ খোলে। সাদা পিঠে ভাঙা চাঁদের আবছা আলো। পিঠময় ঘুরে যায় ওই সাবান। চিনুর সাবানটা চিনু আনেনি। ওর সাবান হল সোমা। রেশনের। চিনু ইচ্ছে করেই আনেনি, আজ এই সাবানটাই মাখবে। ওর পিঠে মাখা হবে না, কে মাখিয়ে দেবে? বউদিকে কি বলা যায় পিঠে মাখিয়ে দাও...। বিদিশার পিঠে জলের ছিটে দেয় চিনু। ম্যাকসিমাম টেম্পারেচার থার্টি নাইন, রেইন ফল নিল। আবার জলের ছিটে, বৃষ্টির মতো।

বিদিশা—আঃ।

চিনু—ঠান্ডা লাগে বউদি?

বিদিশা—কী আরাম! বাড়ির ট্যাংকের জল কী গরম, না?

চিনু—আমি তো কতদিন কইছি চলেন বউদি, পুকুরে যাই!

বিদিশা—আমরা পারি না রে, লোকে কী ভাববে!

চিনু—আমি? আমারেও তো পুকুরে আসতে দেন না!

বিদিশা—তুই আমাদের বাড়িতেই তো আছিস...

আলোগুলো জ্বলে উঠল। চার কোনায় চারটে টিউব আলো। আলো জ্বলে উঠতেই বিদিশা ঝপাং করে জলে নেমে যায়। আলোর দৌরাত্ম্যে চিনুর আর সাঁতার কাটা হল না। ওরা দু'জন কোনওরকমে ডুব দিল। বিদিশা টার্কিশ তোয়ালে এবং চিনু গামছা পেঁচিয়ে কালো রাস্তায় জলের ফোঁটার চিহ্ন ফেলে বাড়ি ফেরে। মাধবীলতা ছাওয়া গেট। শ্বেতপাথরে লেখা শিবশম্ভু ধাম।

শিবশম্ভু ধাম।
১৮ই জুলাই, রাত ১২টা।
নীলাঞ্জন ও বিদিশা।

টেবিলে ঢাকা দেওয়া প্লেট, সন্দেশ আছে। নারায়ণকে তুলসী দেওয়া হয়েছিল সকালে, সেই প্রসাদ। বাড়িতে নারায়ণ আছে, বীরেশ্বরবাবু নিজেই পুজো করেন। বীরেশ্বর ভট্টাচার্য। নীলাঞ্জনের বাবা। টেবিলে সানন্দা। তন্দুরী চিকেনের ছবি। বিদিশা ছবিটা দেখছে। চন্দনের গন্ধ। বিদিশার গায়ের। গায়ের পাউডারের। একটা ট্যাক্সি থামল। নীলাঞ্জন এল।

নীলাঞ্জন—আজ একটু রাত হয়ে গেল।

বিদিশা—রোজই তো হয়।

নীলাঞ্জন—হিতেশ তরফদার ফোন করেছিল?

বিদিশা—করেছিল।

নীলাঞ্জন—ভাল করে কথা বলেছিলে তো?

বিদিশা—ভাল করে মানে?

নীলাঞ্জন—মানে না বোঝার কথা না।

বিদিশা—লোকটা বদ।

নীলাঞ্জন—কিন্তু আমার বস।

বিদিশা—তাতে আমার কী!

নীলাঞ্জন—এই তুমি আমায় ভালবাস?

বিদিশা—তোমার মুখ থেকে ভীষণ মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

নীলাঞ্জন—লায়নস ক্লাবের লোকাল সেক্রেটারি হলাম এ বছর।

বিদিশা—কনগ্রাচুলেশন। তরফদার যেন তুমি না থাকলে ফোন না করে।

নীলাঞ্জন—লায়নসের সেক্রেটারির অনেক দায়িত্ব।

বিদিশা—হাত মুখ ধুয়ে নাও। প্রসাদ রেখে গেছেন বাবা, খাবে তো খেয়ে নাও।

নীলাঞ্জন—বাবাকে চ্যবনপ্রাশ দিয়েছিলে ঠিক মতো?

বিদিশা—হ্যাঁ।

নীলাঞ্জন—হলিকস?

বিদিশা—কী, ব্যাপারটা কী?

নীলাঞ্জন—না, এমনি, ইয়ে, চিনু কী বলছে? চলে যাবে-টাবে বলছে না তো আর?

বিদিশা—ওকে বোঝানো হয়েছে।

নীলাঞ্জন—প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে?

বিদিশা—জানি না।

নীলাঞ্জন—ও এখন রিসকি হয়ে গেছে। অথচ বাবার এমন প্রেজুডিস যে বামুন ছাড়া চলবে না।... এই, জানো, আমার কমপিটিটার কে ছিল জানো? সুশান্ত সান্যাল। ইন্ডিয়ান ফয়েলের। পাত্তাই পায়নি। তরফদার গেইভ মি হেভি সাপোর্ট। তরফদারকে আর একটু ফিট করতে পারলে প্রমোশনটা হয়ে যায়। ম্যানেজারিয়াল পোস্ট। গাড়ি পাব, তোমার ইচ্ছে করে না?

(মাই...ডট্-ডট্... অফিস থেকে ফিরে এসে ফ্রিজ খুলে কার্স্টার্ড আর আনারস নিয়ো... এই কথাটা লিখবার সময় প্রথমবার একটু হাত কেঁপেছিল বিদিশার। এখন কী অবলীলায় ব্যবহার করে ফ্রিজ, পুডিং, ভি সি আর। ওকে বাইরে যেতে হয় টুকটাক। হাসমী স্মরণ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, বস্তিবাসীদের সান্ধ্য স্কুল, মহিলা সমিতির মিটিং। কলেজে পড়ার সময় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের কর্মী ছিল বিদিশা। বিদিশা কি একদিন এরকমই অবলীলায় লিখবে ডার্লিং তিনটের সময়

গাড়িটা একবার পাঠিয়ো। মার্কেটিং আছে।)

বিদিশা—নাঃ, আমার এসব লাকসারি ইচ্ছে করে না।

নীলাঞ্জন—বাজে কথা বোলো না। পেলে তো ছাড়বে না। তোমাদের নেত্রী অনিতাদিকে দেখলাম মিছিলের পর গাড়িতে বাড়ি ফিরছেন। তুমিও নিয়ো। সর্বহারা নেত্রী।

বিদিশা—তুমি আমাকে সর্বহারা নেত্রী বলে ব্যঙ্গ করার চেষ্টা করলেও আমি বেশ জানি তুমি এটাই চাও। একটু একটু এসব করলে তোমারও স্ট্যাটাস বাড়ে। তুমি বেশ চাও পার্টিটা ক্রমশ মধ্যবিত্ত হয়ে উঠুক, বাবু হয়ে উঠুক।

নীলাঞ্জন—খচে যেয়ো না তো, কাছে এসো।... একটা গাড়ি খুব দরকার, বুঝলে না, এটা লাকসারি নয়। রিকোয়ারমেন্ট। ভি সি আরটা কিনবার সময় বাগড়া দিয়েছিলে। এখন সখীদের নিয়ে চার্লি চ্যাপলিন দেখছ না? দিন বদলায়, বুঝেছ? গাড়িও হবে। এই কাছে এসো...

বিদিশা—তুমি তো জানোই, অ্যালকোহলের গন্ধ আমার অসহ্য।

নীলাঞ্জনা—আজ সেলিব্রেট করব। জলের জারটা এখানে থাক।

বিদিশা—খাবে না কিছু?

নীলাঞ্জন—শুধু কিস।

বিদিশা—ইমপসিবল।

নীলাঞ্জন—খোলো।

বিদিশা—মদের গন্ধ ভাল লাগে না আমার।

নীলাঞ্জন—খুলে ফ্যালো।

বিদিশা—তোমার প্রমোশনের জন্য হ্যাংলামো ভাল লাগে না আমার।

নীলাঞ্জন—না হলে ছিঁড়ে ফেলব।

বিদিশা—তোমাকে ভাল লাগে না আমার, ভাল লাগে না, ভাল লাগে না...

নীলাঞ্জন—এদিকে ফেরো।

বিদিশা—প্লিজ...

১৯শে জুলাই। সকাল প্রায় সাতটা। রাস্তার ধারের বারান্দা।
নীলাঞ্জন, বিদিশা এবং পাড়া প্রতিবেশীগণ।

মুখার্জি—গুড মর্নিং নীলাঞ্জনবাবু, কাগজ পড়েছেন? ধর্ষণের কেসটা নিয়েছে?

নীলাঞ্জন—ধর্ষণ?

মুখার্জী—হ্যাঁ। শুনলুম গতকাল রাত্রে একটা বিচ্ছিরি রেপ হয়ে গেছে এখানে... দেখি তো একটু কাগজটা... অ্যাই, একটুখানি দিয়েছে। মধ্যরাতে গণধর্ষণ। রেপ বড্ড বেড়ে গেছে, বলুন। বাজারে ইলিশ উঠেছে খুব। ভাগে কিনলাম। বাজার যাবেন না? চলি।

ঘোষ—দেখেছেন নীলাঞ্জনবাবু, খবর কাগজে আমাদের পাড়ার নাম উঠেছে। কাল রাতে খালধারের ঝুপড়িগুলোতে না, ছ্যাঃ মন্টুর নাম শোনা যাচ্ছে, ওই যে, জমির দালাল। শুনলুম রনচাও ছিল। রনচাই না আপনার গ্রিল-ট্রিল রং করল? আপনাদের বারান্দায় সেদিনও বসে থাকতে দেখেছি?

বিদিশা—ঘোষবাবু এত উত্তেজিত কেন?

নীলাঞ্জন—কাগজ দ্যাখো, এইখানে।

বিদিশা—এই রে, তাই ভাবি বাসন্তী কেন এত দেরি করছে। চিনু এই চিনু—বাসনগুলো মেজে ফেল না, বাসন্তী বোধ হয় আসবে না।

রায়গিন্নি—এই বিদিশা, শোনো, তোমাদের কাজের লোক এসেছে? আমাদের রেবা এখনও আসেনি।

বিদিশা—না দিদি, বোধ হয় ও এবেলা আসতে পারবে না। ওদের একটা বিপদ হয়ে গেছে।

রায়গিন্নি—সে রকম তো শুনছি। আচ্ছা, কার কার হয়েছে বলো তো, শুনলুম তো চার-পাঁচ জনের হয়েছে। আমাদের রেবার হয়নি? ও তো দেখতে বেশ ইয়ে। কাগজে নাম দেয়নি? তুমি শুনেছ কার কার হয়েছে?

বিদিশা—কাগজে কি সব নাম দেয়? কাগজ কি জানে কাল রাতে কোথায় কোথায় আর কত কী হয়েছে।

রায়গিন্নি—কী কেলেঙ্কারি বলো তো, যদি হয় ওকে আর রাখা যায়?

অলোক—নীলাঞ্জনদা, শুনেছ তো খালধারে ঝুপড়িতে কাল রাতে অ্যান্টি সোস্যালরা একটা গ্যাং রেপ করেছে। আজ সন্ধ্যাবেলা থানার সামনে একটা প্রোটেস্ট আছে। বিদিশাদি, আপনি থাকবেন। মহিলা সমিতির পক্ষ থেকেই ব্যাপারটা অরগানাইজ করা হচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি পোস্টারিং করা যাচ্ছে না। অনিতাদিরা স্পটে আছেন। যদি পারেন একবার গেলে ভাল হয়।

বিদিশা—আচ্ছা, ও অফিসে যাক, তারপর যদি...

নীলাঞ্জন—ব্যাপারটা কী হয়েছিল, ইন এ নাটশেল...

আলোক—ব্যাপারটার মূলে আছে জমির দালালদের ইন্টারেস্ট। কেষ্ট আর মন্টু। কেষ্ট আর মন্টু আগে একটাই গ্রুপ ছিল। ওরা বেশ কিছুদিন ধরে ইট সাপ্লাই, মাটিফেলা, জমির দালালি এইসব করছিল। ওরা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে দেখলেই জোর-জবরদস্তি করত। ওদের মধ্যে রিসেন্টলি বখরা নিয়ে গণ্ডগোল বাধে। কেষ্টকে ক'দিন ধরে খুঁজছিল মন্টু। কেষ্ট নাকি ঝুপড়িতে একটা মেয়ের ঘরে রাত্রে মাঝে মাঝে যেত। কাল রাত্রে মন্টু ড্রিঙ্ক ফ্রিঙ্ক করে, রনচা, গিল্টি, ক'জন সাকরেদ নিয়ে ওই ঘরে যায়। কেষ্টকে তো পায় না, না পেয়ে মন্টু নাকি ওই মেয়েটাকেই...আর অন্য সাকরেদগুলো আশেপাশের ঘরে হানা দিয়ে যাকে পেয়েছে তাকেই... কেউ অ্যারেস্ট হয়নি এখনও...।

রায়গিন্নি—মেয়েগুলোর নাম জানো ভাই?

অলোক— সে তো তিন-চার জন... নামটাম কী যেন সব, ওদের যেমন নাম হয় আর কী...

বিদিশা—বাসন্তী নামের কেউ?

অলোক—হ্যাঁ, হ্যাঁ বাসন্তী। ওর ঘরেই তো মন্টু প্রথমে গিয়ে...

রায়গিন্নি—রেবা? রেবা নামের কেউ?

অলোক—রেবা? হতে পারে কী রেবু না রেবা কী যেন বলছিল ওরা...

রান্নাঘর। ২১ শে জুলাই। সন্ধ্যাকাল।

চিনু, বাসন্তী, পুলিশ সাব ইনস্পেকটর, নীলাঞ্জন, বিদিশা, রিপোর্টার, মহিলা সমিতির লোকজন ও মি. তরফদার।

সামনের নর্দমায় ভেজা চা পাতা, কাপ। কাপে উচ্ছিষ্ট চায়ের তলানি, ভাসছে পোড়া সিগারেট। অনেক জুতো বারান্দায়, মিটিং। মিটিং-এ অনেক কথা। কথার মধ্যে হাসির শব্দ। রান্নাঘরে গালে হাত দেয়া চিনু ও বাসন্তী। গ্যাস উনুনে প্রেসার কুকার। বিদিশা ওঘর থেকে ডাকল। চিনুকে ডাকল। চিনুর কান্না পেল। কতবার বলতে হয়েছে এসব। চিনু বাসন্তীর দিকে তাকায়। বাসন্তীর ঠোঁটে চাপা দাঁত।

বিদিশা—চিনু এসেছিস? থানা থেকে এসেছে, তোর সঙ্গে কথা বলবে।

পুলিশ সাব-ইনস্পেকটর—আপনাদের বাড়িটা বুঝলেন মি. ভট্চার্য, দারুণ জায়গায়। সামনেই ট্যাংক। ক'বিঘে হবে?

নীলাঞ্জন— তা বলতে পারব না।

পুলিশ—বিঘে আষ্টেক তো হবেই। জলের বাতাস পান। ওটা বুঝি বাঁকুড়া থেকে আনা ঘোড়া?
নীলাঞ্জন—ঠিকই ধরেছেন।
পুলিশ—পুলিশের চাকরি করতে হচ্ছে বটে, আমি খুব কালচার মাইন্ডেড।
বিদিশা—মেয়েটাকে ছেড়ে দিন।
পুলিশ—তোর নাম...ইয়ে, তোমার নাম চিনু?
চিনু—হ।
পুলিশ—পুরো নাম?
চিনু—চিন্ময়ী চক্রবর্তী।
পুলিশ—রনচাকে ক' বছর চেনো?
চিনু—এখানে আইত, রং করত।
পুলিশ—ক' বছর ধরে চেনো।
চিনু—গত পূজার আগের পূজায়...
পুলিশ—ঘুরতে?
চিনু—দুই দিন।
পুলিশ—সিনেমা?
চিনু—দুইটা।
পুলিশ—বিয়ে করতে চেয়েছিল?
চিনুর মাথা নিচু, মাটি যেন ফাঁক হয়ে যায়।
পুলিশ—একটু থানায় যেতে হবে।
বিদিশা—থানায় কেন?
পুলিশ—আমরা একটু জিজ্ঞাসাবাদ করব। রনচাকে অ্যারেস্ট করেছি।
মাটি যেন ফাঁক হয়ে যায়, এক্ষুনি।
বিদিশা—তা জিজ্ঞাসাবাদ এখানে হয় না?
অনিতাদি—পুলিশকে কাজ করতে দাও...
নীলাঞ্জন—একটু পরেই আমাদের কয়েকজন বিশেষ গেস্ট আসবেন, বাড়িতে কাজটাজ আছে। কাল সকালেই থানায় যাব আমরা।
বিদিশা—কাল সকালেই যাবে। অনিতাদি, আমি বলছি, নিজে পৌঁছে দেব।

চিনু

ভাসাইলা। ভাসতে ভাসতে বেউলা সুন্দরী গেল কই? গেল সগ্‌গে। মাছে খাইল তার সিচরণ। আমারে ভাসাইলা মা, ভাসাইলা। কইলা—কইলকাতা চল। কইলকাতা গেলে কি কারবালা পার হওন লাগে? কইলকাতা কি কাফিরের দ্যাশ? জহর মিলে পানি মিলে না। কইলা কইলকাতা মামার বাড়ি যা তুই। সোমত্ত হইচস। মাইয়া-রক্তে বিধবা মায়ের বড় ভয়, বড় ডর। কেবলই কও, সোমত্ত হইচস মাইয়া, বড় হইচস। তখন চাইদ্দিকে একুইশারি ফেবরুয়ারি ভুলব না ভুলব না। চাইদ্দিকে আওয়াজ উঠে জয় বাংলা, তখন চাইদ্দিকে খান সেনা, চাইদ্দিকে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেবরুয়ারি...রক্তে বড় ভয়, বড় ভয়। পাকিস্তানে বড় ভয়। কইলকাতা চললা। কইলকাতা অর্থাৎ হৃদয়পুর। কইলকাতা বিশমাইল। হৃদয়পুরে মামার বাসা। মামার বাসায় হৃদয় নাই। বাসন মাজি, জল তুলি। আর তুমি কাঁথার মধ্যে সুঁচের ফোঁড়ে ফুল তুল, রান্নাঘরে কচুর শাক রান্ধ, লতিপাতুড়ি রান্ধ। চাঁদমার্কা হারিকেন চিমনি নাই, এখানে গণেশ মার্কা হারিকেন চিমনি, মুছি। জবর আলির সিনেমা নাই, সুখেন দাসের বই, ইঁচার নাম

চিংড়ি, আকরির নাম কাঁকরোল, জলহাজা হইলে মুস্তাক আলির ইলেকট্রিক লোসন নাই, বোরোলীন।

মায়ের হঠাৎ ভীষণ অসুখ। ঘাড় শক্ত, হাত-পা শক্ত, ধুম জ্বর। মা মরল তিন দিনে। কাঁদলাম, চোক্ষের জল চোক্ষে শুকাইল। মামাবাড়ির রেশন আনি, বাজার যাই, মা-র কাজগুলি করি। মাইয়ার কাজগুলি করি। কলেজপড়া মামাতো ভাই আমারে একা একা চায়, মুদিদোকানের অনিল ঘোষ আমারে একা একা চায়। মাইজা মামাতো ভাইডারে একদিন অনিলের ভাই কয়—কও তো দেখি আমের ছাল? আমের ছাল। তোর পিসতুতো বোন আমাদের গেরামের মাল। মামা কয় চিনুরে, এই বাড়িতে আর থাকিস না। তোর দিকে চ্যাংড়াগো কুনজর। তোরে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি দি। খাবিদাবি, থাকবি ভাল। বিয়ার সম্বন্ধ দেখি, কিছু হইলে খবর দিমু।

আইলাম ভটচাইজ বাড়ি। শিবশম্ভু ধাম। বড়ুদাদু ব্রাহ্মণের হাতে ছাড়া খায় না। আগের বামনী চইলা গেছে, বউদির নিজের রানতে লাগে, বউদির কষ্ট। আমারে পাইয়া য্যান চান্দ পাইল হাতে। ভাল ভাল দুইখান শাড়ি দিল, ফুলতোলা ব্লাউজ দিল, সাবান দিল, পাউডার দিল, কইল পুরী গিয়েছিস কোনও দিন? পুরী? ভালভাবে থাক, পুরী নিয়ে যাব একদিন। মামার আর দ্যাখা নাই, খোঁজও লয় না। কত মাইয়ার বিয়ার বাজন বাজে, আমি শুধুই ইচা কুটি, কুচা কুটি, ঘর মুছি, গ্রিল মুছি। রনচা আইল। গ্রিল রং-এর মিস্তরি।

গ্রিলের কাম শেষ হইলে দাদাবাবু কইল দরজা জানলা রং কর। আমারও খুশি লাগল মনে। রং লাগল। আরও ক'দিন তবে রনচা আছে। রং-এর পোচে দরজার কাঠ চকচকায়, জানলার কাঠ চকচকায়। আমি ওর রং করা দেখি। রং-এর দিন শেষ হইল। রনচা কইল, ক'টা দিন ভালই কাটল চিনু। আজ শেষ। রনচারে চায়ের লগে বিস্কুট দিলাম। রনচা কয়, তুমি বড় ভাল চিনু, মনের মতো। রনচা রোজদিন তাকাইতে তাকাইতে যায়, আমিও বারিন্দায় থাকি। চোখে চোখে কথা হয়। দাদা বউদি না থাকলে কই, বস, চা খাও। একদিন সিনেমায় গেলাম। সুচিত্রা সেন যখন উত্তমকুমারের বুকের উপর আছাড়ি পাছারি খায়, আমি রনচার হাত ধইরা কানে কানে কইলাম, আমারে বিয়া করবা তুমি? রনচা কয়, তুমি রাজি তো আমিও রাজি।

বউদি কইল, মাথা খারাপ? ও তোকে খাওয়াতে পারবে? কত আয় করে ও। ফ্যানের হাওয়া ছাড়া ঘুম হয় না তোর, টিভি দেখিস রোজ, বাড়ির মেয়ের মতো আছিস। আমরাই দেখে শুনে বিয়ে দেব।

রনচার বাড়ি গেলাম একদিন। ছিঁড়া মাদুরে অর বুড়া বাবা। ছোটভাই রিশকা চালায়, টালিরচালে নীল প্লাসটিক। কাঠের জালে লইট্যা মাছ রান্ধে রনচার মা। রনচা হাসতে হাসতে কয়, আমার ঘর। ডিশে কইরা লইট্যা মাছের টুকরা দিয়া কয়, খাও। আমি ঝালে হু-হা করি, রনচা হাসে।

রাস্তায় দেখা, কয়—কবে কালীঘাট যাবে? আমি কই—করুম না। রনচা কয়, পালটি খেয়ে গেলে? আমি কিছু কই না। রনচা কয়, ব্যাপারটা কী? আমি কইলাম, সারা জীবন কষ্ট কইর‍্যাও বিয়ার পরে কষ্টে থাকুম? রনচা মুখ হাঁড়ি কইরা চইলা গেল। কতদিন দেখা নাই। একদিন হঠাৎ আইল। কইল, চিনু, একটা বছর মাইরি কোথাও যেয়ো না। রোজগার বাড়াচ্ছি। টেপ কিনব, টিভি কিনব, সব কিনব। জমির লাইনে ঢুকেছি। মন্টুদার কাজ করছি। ই এস সি কারখানার সাইরেন বাজলে বারান্দায় দাঁড়িয়ো চিনু একবার করে দেখব।

পাঁচ কাপ চা কর চিনু, একটা চিনি ছাড়া। বাসন্তী আছে তো। এখানে, ওকে আসতে বল তো একবার...

বাসন্তী কপাল কুঁচকায়। এ নিয়ে যে কতবার হল! কতবার ওর লজ্জার কথা বলতে হয়েছে কত জনের কাছে। পুলিশের কাছে, ডাক্তারের কাছে, পার্টির লোকেদের কাছে, কত পার্টি, কত মাতব্বর, কত খবর কাগজের লোক, 'উঃ' শুনেছে, 'আঃ' শুনেছে, আর পারে না। ডাক্তারের কাছে ওর

দেখাতে হয়েছে সব। কত জায়গায় কাপড় সরাতে হয়েছে, কান্না পেয়েছে কতবার। মিছিলে যেতে হয়েছে বাসন্তীকে, মিছিলের কথা উচ্চারণ করতে পারে না বাসন্তী তবু কাল গেছে বন্দেমাতরম। আজ গেছে ইনকিলাব। কালও নাকি যেতে হবে, দিদিমণি বলেছে। ধর্ষিতা নামে একটা শব্দ শুনছে দু'দিন ধরে, মাইকে মিছিলে কতরকম করে কতবার। কত লোক ওর দিকে কতরকম করে তাকিয়ে থাকে। কে বাসন্তী, কই বাসন্তী, দেখি দেখি... বাসন্তী মাথা নিচু করে থাকে। মিছিলের ভাষা ঠিক ঠিক বলতে পারে না ও। এখন আরও ভয় লাগে ঝুপড়িতে। ভালমানুষদের জন্য ভয়! খালধারের ঝুপড়ি ছেড়ে এবাড়ি এসে বলেছিল, দু'দিন থাকতে দেবেন? আর পারি না! বিদিশাদিদি থাকতে দিয়েছিল!

বিদিশা— এ আর একজন ভিকটিম। বাসন্তী।

রিপোর্টার— ও, এ বাসন্তী। বাঃ! একটু কথা বলব।

বিদিশা— খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন। ও খুব টায়ার্ড। এই সব বদারেশন অ্যাভয়েড করানোর জন্যই ওকে শেলটার দিয়েছি আমি।

বিজয়া— কাল পরশুও ওকে আটকে রেখে দাও। সনাতনবাবুদের র‍্যালিতে যেন না যেতে পারে।

অনিতা— বিজয়া, তুমি বড্ড বাজে কথা বলো।

রিপোর্টার— আপনার বয়স কত?

বাসন্তী— ক'তি পারব না।

রিপোর্টার—বিবাহিত?

বাসন্তী— হ্যাঁ।

রিপোর্টার— বাচ্চা?

বাসন্তী— একটাই কচি। খকা।

রিপোর্টার— আপনার স্বামী কী করছিল যখন ওরা আপনাকে...

বাসন্তী— মোর সোয়ামি ফেলি থুয়ি চলি গেছে ঔ খকা হবার আগে আগে।

রিপোর্টার—আপনি একা থাকতেন?

বাসন্তী—আমি আর আমার কচি।

রিপোর্টার—কেউ আপনার ঘরে যেত?

বিদিশা—এসব আমি পরে ব্রিফ করে দেব।

রিপোর্টার—মন্টু আপনার ঘরে ঢুকে কী বলেছিল?

বাসন্তী—বলল কিষ্টদা কোথায়? আমি ক'লাম আমি ক'তি পারবনি। সে হাত ধরি ঝাঁকি দিয়ি বলল—তবে তুই যাবি ক'নে।

রিপোর্টার— বাইরে নিয়ে গেল, না কি ভিতরেই...

বাসন্তী—খালধারে।

রিপোর্টার— একটা ছবি নিচ্ছি।

অনিতা—না। কেন? এদের ছবি দেখিয়ে আপনার কাগজ বিজনেস করবে?

রিপোর্টার— তবে যেখানে যেখানে ইনজুরি হয়েছে সেই ছবি তুলতে পারি তো?

অনিতা— ছবি তোলার কী হল? এমনি রিপোর্টিং করুন না।

রিপোর্টার—না, একটা ডকুমেন্ট। প্রুফ।

অনিতা—বাসন্তী, এখানে এসো তো, আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াও...

সরানো আঁচল মুখে চাপা দিয়ে বাসন্তী হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে।

ভাসায়ি দিলে। আট মাসের গভবো তখুন। বাজার যাচ্ছি বলি সেই যে গেলে গো পুরুষ, আর আলে না। আমি ভাবি নোকটা গেল কনে। বাস নরী যা সাঁই সাঁই চলে, হোল কী মানুষডার। দু'দিন ঘুম নাই, খাওয়া নাই। ও হরি! শুনি তিনি বে করিচেন। কাঁচা মেয়া, রসের মেয়া বে করিচেন। আমারে ভাসালে।

খকা এল পিরথিমীতে। খকা। ফুলির মতো। পিরথিমী কঠিন ঠাঁই। কচি খকা। ফেলি থুয়ি যাব কনে? কিষ্টবাবুর দয়া হয়। কিষ্টবাবু খাতি দেয়। কোথা পাব উড়কি ধানের মুড়কি। কিষ্টবাবু পাউরুটি দেয়। কোথা পাব খকার তরে আম কাঁঠালের ছায়া, ইষ্টিকুটুম পাখি? খালধারের বাজে পোড়া গাছটার মরা ডালে শকুন। খাট নাই, পালং নাই, নীল পেলাস্টিকে কাঁদে আমার খকা। নোকের বাড়ি কাজে যাই, খকা আমার হাঁটি হাঁটি পা পা করে। কিষ্টবাবু লজেন দেয়, বিস্কুট দেয়। কিষ্টবাবু তো পুরুষ, পুরুষ ঘরে আসে। আমার ভাঙা ঘরে আসে। সেদিন ঘরে আসে মন্টু। সেই রাতে। বলে কিষ্ট কই? কিষ্ট?

নাই।

কেষ্ট নাই তুই রাধা। কিষ্টর নাং। চিত হ।

ডাক্তার বলে, দেখি তোর চিত হবার দাগ। মাতব্বর বলে, দেখি তোর চিত হবার চিহ্ন। খবরের কাগজের বাবুরা চিত হবার আকিবুকি আর শুকনা রক্তের দাগ কেবলই ছবি করে রাখে।

আর পারি না, সোনা যাদু আমার, সোনামণি আমার। তুই কবে বড় হবি।

মি. তরফদার—সরি নীলাঞ্জন, একটু দেরি হয়ে গেল।

নীলাঞ্জন— না না, ঠিক আছে। এতক্ষণ মহিলা সমিতির মিটিং চলছিল। বিদিশা ওয়াজ রিয়েলি বিজি উইথ দেম। এইমাত্র ওরা গেল।

বিদিশা— হ্যালো তরফদারদা, ভাল?

তরফদার—এই যে বিদিশা। বাঃ দারুণ দেখাচ্ছে। টায়ার্ডনেসেরও একটা বিউটি থাকে।

নীলাঞ্জন—ঠিকই ধরেছেন তরফদারদা, ওর বেশ ধকল যাচ্ছে।

তরফদার—আরে প্রেস কী শুরু করেছে দেখেছ। বড় বড় করে লিখেছে ধর্ষণ, বলাৎকার,—বলাৎকারের খণ্ডতটা বড় অশ্লীল, একটা বাজে ইমেজ তৈরি করে, বুঝলে না? নারীনিগ্রহ লিখলেই তো হয়। অ্যাম আই রাইট?

নীলাঞ্জন—ঠিক ধরেছেন। বিজনেস বিজনেস।

তরফদার—তা বিদিশা, তোমরা তো অনেক কিছুই করছ। প্রোটেস্ট, মিছিল, বিবৃতি, শাস্তিদাবি, এই সব ভিকটিমদের কথা কিছু ভেবেছ? এনি সর্ট অফ কমপেনশেসন?

বিদিশা— আমরা এভাবে ভাবি না। তা ছাড়া এর আবার কমপেনশেসন হয় নাকি?

তরফদার—না, ধরো, লায়নস ক্লাব যদি হেলপ করে ওদের, ধরো এনি ফর্ম অফ মানিটারি হেলপ? কিংবা শুনেছি বাসন্তী না কে যেন প্রসটিটিউশন করত, ওকে যদি লায়নস ক্লাব একটা সেলাই মেশিন দেয় কেমন হয় ব্যাপারটা? এই আর কেউ আসছে না কেন? মাথুর তো অনেক আগেই আসবে বলেছিল...

বিদিশা—আপনারা সবাই আসবেন ভেবে কতগুলি মাংস চাপিয়েছি...

তরফদার—মাংস? বাঃ। থ্যাংকিউ। লক্ষ্মী মেয়ে।

বিদিশা—থ্যাংক ইউ এমনি বললেও তো পারেন। গায়ে হাত কিন্তু আমি পছন্দ করি না।

তরফদার—রেগে গেলেও তোমাকে দারুণ দেখায়। উওম্যান লায়ন।

নীলাঞ্জন—বড্ড আনসোস্যাল হয়ে যায় ও মাঝে মাঝে। আসলে সারাদিন যা টেনশন গেছে না...অ্যাই বিদিশা, হুইস্কিটা নিয়ে এসো।

তখনই ফস করে প্রেশার কুকার। মাংস গন্ধ। আর তখনই বিদিশার কান্না আসে। স্টিরিও অন করে। বোতলটার গলা টিপে ধরে। তখন ঠাকুর ঘরে ঘণ্টার শব্দ। বাবা ঠাকুর শয্যা দিলেন।

বিদিশা

আমাকে ভাসাল। না বুঝে। না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে না বুঝে।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলের হাতে বড় সুখে সম্প্রদান করেছিলে বাবা। মৃত্যুশয্যায় জিজ্ঞাসা করেছিলে ইঞ্জিনিয়ারটা আসে না কেন? আমি বলেছিলাম, ও বড় ব্যস্ত। মিথ্যে বলেছিলাম। বলেছিলে সুখী তো? বলেছিলাম সুখী। মিথ্যে বলেছিলাম। কত শাড়ি আমার, গার্ডেন, সাউথ ইনডিয়ান, নাইলন জর্জেট, কত ছবি আমার অ্যালবামে— পিছনে তাজমহল, পিছনে জলপ্রপাত, পিছনে গাছের ফুল। নিজস্ব বাড়ি আমার, প্লিনথ এরিয়া বারোশো স্কোয়ার ফুট। কত লোক কত কষ্টে থাকে। ঘেঁষাঘেষি। ঝুপড়িতে মুরগির খাঁচার মতো। তবু ভয় করে। খাঁচার ভিতরে মুরগিরও ভয় করে মাংসের দোকানে? মুরগি কি ভয় বোঝে? খাঁচার ভিতরে বসে মুরগি অন্য মুরগিটার মাংস হয়ে পলিথিন প্যাক হয়ে যাওয়া নিশ্চুপ দেখে।

আমি তো চেঁচিয়েছিলাম। নারী নিগ্রহের প্রতিকার চাই। দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি চাই। বাসন্তীদের কথা মিছিলে বলেছি। কতদিন পরে।

কতদিন পরে মিছিলে অলোককে দেখেছিলাম সেদিন। একসঙ্গে এস এফ আই-এর অলোক। অলোক কী ভাল ছেলে ছিল। ব্রিলিয়ান্ট। কী দারুণ বক্তৃতা দিত, কী দারুণ কথা বলত, সুকান্ত, সুভাষ মুখার্জি...ওর ঠিকানা আমার কাছে একটা টুকরো কাগজে বহুদিন ছিল।

ইঞ্জিনিয়ারের বউ এই বিদিশা ট্যাক্সি থেকে দেখেছিল ওকে। ট্যাক্সি থেমেছিল জ্যামে। ও থমকানো গাড়ির ফাঁকে এঁকেবেঁকে রাস্তা পার হচ্ছিল। ঘামে ভেজা পাঞ্জাবি। ডাকিনি। কী হবে ডেকে?

২৩ শে জুলাই।
মধ্যরাত

নীলাঞ্জন

ঘুম আসে না। ফুলস্পিড ফ্যানেও ঘামছি। কোথা যেতে পারে বিদিশা? আজ ফিরে আসবে ভেবেছিলাম। আসেনি। পুলিশে খবর দিইনি। প্রেস্টিজের ব্যাপার। বাবাকে মিথ্যে বলেছি। বলেছি ওর দাদার কাছে গেছে। ওর দুই দাদার বাড়ি গেছিলাম। আশা করেছিলাম ওখানেই আছে। ওদের কিছু বলিনি। কাল কোথায় খোঁজ করব? চিনুটা পালিয়েছে। সেদিন থানায় ওর যাবার কথা ছিল, সকালে উঠে দেখি ও নেই। কীসের ভয় ছিল ওর? পুলিশের? নাকি রনচার সামনে দাঁড়ানোর ভয়? একটু পরেই পালাল বাসন্তী। চিনুর হৃদয়পুরে মামার বাড়ি। ওখানে গেছে নাকি? ঠিকানা জানি না। বাসন্তী কোথায় যাবে? আর বিদিশা? বিদিশা কি ওদের খুঁজতে গেল? কী আশ্চর্য। কাল অফিস থেকে ফিরে দেখি বিদিশা নেই। বুড়ো বাবা বারান্দায়। বলছে বৌমা নেই! কিছু লিখেও যায়নি ও। সব খুঁজলাম। কিছু নেই! এখন রাত ক'টা? দুটো? রাস্তায় কেউ নেই। পুকুরপাড়ে তবু হাওয়া। জল খেয়েও জলতেষ্টা যায় না। পুকুরের ধারে যাই। পুকুরের জল কাঁপে।

জলে কী? কী ওটা পুকুরের মাঝখানে? কী ওটা লম্বা মতো? কী ভাসছে মানুষ? মেয়েমানুষ? উপুড় হওয়া মেয়েমানুষ? রাস্তার টিউব আলো পুকুরের মাঝখান পর্যন্ত যায় না। আকাশে ভাঙা চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে আবছা আভা দেয়। মাঝজলে স্থির কী ওটা! মানুষ জলে ডুবে গেলে আবার

ভেসে ওঠে। ভেসে উঠতে ক'দিন লাগে? কী ওটা? মানুষ? মানুষ কি এত সরু? এত লম্বা? দু'হাত সামনে মেলা। ওটা কি হাত? হাত কি এতবড় হয়? তবে কী ওটা? কলাগাছ? কলাগাছ জলে ভাসে। ওপারের দত্তদের বাড়ি কলাগাছ আছে! কলাগাছ এমনই। কলা খাওয়া হয়ে গেলে মানুষ গাছ কেটে ফেলে দেয়। তবে কী ওটা? কলাগাছ? কিছু বোঝা যায় না। অস্পষ্ট! কী ওটা? মানুষ? বাসন্তী? বিদিশা? চিনু? নাকি কলাগাছ?

অমৃতলোক, ১৯৯০

যে মেয়েটি মোহময়ী হতে চেয়েছিল

দুটি মানবদরদী রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক বোমাবাজির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল কাশীনাথের বাবার প্রাচীন হারকিউলিস সাইকেলটি। ব্রেক কষার মুহূর্তে একটা বোমা ফেটেছিল তাঁর গায়ে। হাসপাতালে যখন নেয়া হল, তখন তিনি মৃত। ময়নাতদন্তের জন্য পুরো বডি দরকার, তাই খোঁজাখুঁজি করে নয়ানজুলিতে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর বাঁ হাত ও বাঁ পায়ের অংশ। পায়েতে তখনও স্যান্ডাকের জুতোটা আটকে ছিল।

এরপর দুটি মানবদরদী দলই দাবি করল হত্যাকারীর শাস্তি চাই। কিন্তু হত্যাকারীকে পাওয়া গেল না, ওরা বলল পরিবারকে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। ওরা বলল পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে। রাস্তা অবরোধ হল, যা হয় আর কী, মন্ত্রী এসে জানালেন চাকরি দেয়া হবে। কিন্তু চার বছর হয়ে গেল, কিছুই হয়নি, যদি জানতে চান।

অনাথ কাশীনাথের দিকে মদতের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল উত্তম চোংদার। উত্তম তখন হাটখোলায় নতুন মার্কেট-কমপ্লেক্স এ ওষুধের দোকান দিয়েছে। ওই দোকানের কর্মচারী করে নিল কাশীনাথকে। কাশীনাথ তখন সবে বি কম পরীক্ষা দিয়েছে। ওর বাবা ছিল পালিশ মিস্ত্রি। হাবড়ার একটা ফার্নিচারের দোকানে কাজ করত। কাশীনাথ ওর বাবার কাজ শেখেনি। ওর ইচ্ছে ছিল চাকরি করা ভদ্রলোক হবে।

ও ওষুধের দোকানে চাকরি পেল। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে দশটা। দুপুরে একটা থেকে চারটে বন্ধ। তখন বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া। এর মধ্যেই অন্য কাজও কিছু করতে হয়, যেমন বিকেল পাঁচটায় খাটাল থেকে গোরুর দুধ কিনে চোংদার বাড়ি পৌঁছে দেয়া, চোংদারের চার বছরের মেয়ের বেলা এগারোটার সময় কিন্ডারগার্টেন ইস্কুল ছুটি হলে বাড়ি পৌঁছে দেয়া এইসব।

কাশীনাথের ইচ্ছে ছিল পি এস সি, এস এস সি, স্কুল সার্ভিস কমিশন ইত্যাদি পরীক্ষা দেবে। কমপিটিশন সাকসেস-টাকসেস কিনেছিল, খোলার সময় পায়নি।

কাশীনাথের একটা ভাই আছে। ফিটের ব্যারাম। মানে মৃগী রোগ। আগে টোটকা চলছিল, কাশীনাথ এখন ডাক্তার দেখিয়েছে। উত্তম চোংদার বিনে পয়সায় গার্ডিনাল সাপ্লাই করে যায়। কাশীনাথের বোনের বয়েস বারো। খুব মাথা ঘোরে। উত্তম চোংদার মাঝে মাঝে টনিকের শিশি দেয়, পয়সা লাগে না। পুজোর সময় নতুন জামা দেয় উত্তম, ওষুধের দোকানের মধ্যে একটা ডাক্তারের চেম্বার আছে, এম বি বি এস ডাক্তার বসিয়েছে, ওখানে একটা টিভি সেটও রাখা আছে। রবিবার দোকান বন্ধ। মাঝে মধ্যে কোনও রবিবারে ভি সি পি ভাড়া করে 'ব্লু' দেখা হয়, উত্তমের বন্ধুবান্ধব থাকে। কাশীনাথকেও থাকতে দেয়। কাশীকে মোটর সাইকেল চালানো শিখিয়ে দিয়েছে। এমনি ভাবেই কাশীনাথের বিস্বাদ জীবনে নিমক যুক্ত করছে উত্তম। কাশীনাথ কখনও নিমকহারামি করতে পারবে না।

সোনালি গড়াই কুড়ি বছরের যুবতী মেয়ে। কিন্তু ছেলেরা ওকে নিমাই নাম দিয়েছে, সোনালি সেটা জানে। কোথাও যৌবন শব্দ চোখে পড়লে সোনালি চোখ সরিয়ে নেয়। টিভিতে যখন মেয়েরা বুক কাঁপিয়ে নাচে, কিংবা নানা ছলে বুক দেখায়, সোনালির গা জ্বলে যায়। কলেজে পড়ে ও। শালোয়ার-কামিজ পরে না আর। ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে দুটো ছেলে ম্যানচেস্টার সমাসের ব্যাসবাক্য ভেঙে ছিল—যে উওম্যানের চেস্ট ম্যানের ন্যায়। সোনালির নিজের মা নেই। একটা সৎ মা আছে।

ওর বাবা সকাল আটটা বারোর ট্রেনে কলকাতা যায়, রাত ন'টায় ফেরে। ওর বাবা কি জানে ও কেন শালোয়ার-কামিজ পরে না? সোনালির নিজের মা অনেক দিন আগে মরে গেছে। সৎমাটা কেমন যেন। শোবার আগে পায়ে আলতা দেয়, কপালে দলা করে সিঁদুর মাখে, সোনালিকে কোনওদিন লিপস্টিক কিনে দেয় না, কোনওদিন ময়েশ্চারাইজার কিনে দেয় না। কোনওদিন ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যায়নি। পাশের বাড়ির মাসিমা হোমিওপ্যাথির ওষুধ দেয়। একটা মোটা বই থাকে টেবিলের উপরে, চশমা পরে, মাঝে মাঝে বই দ্যাখে, আর ওষুধ দেয়। পাঁচ টাকা করে নেয়। একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে ওই মাসিমার কাছে গিয়েছিল সোনালি। বলেছিল মাসিমা, আমার স্বাস্থ্যটা ভাল করে দিন না। মাসিমা বলেছিলেন—এমনিতে তো স্বাস্থ্য তোমার ভালই, হাত পা তো বেশ মোটাসোটা....

সোনালি বলেছিল—না, সেটা বলচি না, বলে মাথা নিচু করে ছিল।

মাসিমা বলেছিল, বুঝেছি, বুঝেছি। তারপর চোখে চশমা লাগিয়ে বইটা খুলে ছিল।

মেন্‌স ঠিক মতো হয়?

হয়।

শুরু হয়েছিল কবে?

সেবেন থেকে।

মাসিমা কয়েকটা পুরিয়া বানিয়ে একটা খামে ভরে সোনালির মাথায় হাত রেখে বলেছিল, চিন্তা কোরো না, যখন বিয়ে হবে, ঠিক হয়ে যাবে।

ওই ওষুধ খেয়েছিল সোনালি, কিচ্ছু হয়নি। যখন বিয়ে হবে ঠিক হয়ে যাবে বলে দিলেই হল? বিয়েটা হবে কী করে? কে করবে? কলেজের দু-একটি মেয়ে মেয়েদের পত্রিকা রাখে। ওগুলোতে মাঝে মাঝে মোহময়ী হয়ে ওঠার কথা পড়েছে সোনালি। 'পুরুষের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠুন' পড়েছে। পুরুষের চোখে নারীদেহ নামে একটা লেখায় যতসব মান্যগণ্য বিখ্যাত মানুষেরা তাদের মনের কথা বলে দিয়েছে। কিছুদিন পরে আর একটা সংখ্যা বেরোয়, স্তন সংখ্যা। সোনালি কিনে নেয়।

সোনালি টিউশনি করে। ক্লাস ফোরের দুটো মেয়ে। ওদের অঙ্ক করতে দিয়ে বইটা খোলে। লুকিয়ে লুকিয়ে একটু একটু পড়ে। কান লাল হয়, তেষ্টা পায়। চোখে পড়ে খাজুরাহোর পাথরমূর্তির ছবির তলায় লেখা স্তনই নারীর সম্পদ। তারপর একটা বিজ্ঞাপন। স্তন সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গ্লান্ডিনার।

উত্তম চোংদারের ওষুধের দোকানের নাম নবজীবন ফার্মেসি। দোকানটার সামনে একবার দাঁড়াল সোনালি। দোকানে তখন কয়েকজন খদ্দের ছিল। সোনালি সরে গেল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখল দোকান ফাঁকা হয়েছে। তবু যেতে পারছে না। বাজারের মধ্যে যে-ওষুধের দোকানটা, ওখানে একটা বুড়ো লোক থাকে। বরং ওখান থেকে কেনাই ভাল। কিন্তু ওখানে বড্ড ভিড় থাকে। তা ছাড়া মুখও চেনা। ওদের পাড়াতেই থাকতেন। ওর বড্ড লজ্জা করে।

সোনালি রেডি হয়। একটু স্মার্ট হবার জন্য নিশ্বাস নেয়। রেডি সেডি গো। শোঁ করে যেন উড়ে নবজীবনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। গ্লান্ডিনার কত দাম?

সামনের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ছিল কাশীনাথ। ভিতরে একটা টেবিলে বসেছিল উত্তম। ওখানেই ক্যাশ। কাশীনাথ আলমারি খুলে ভাইলটা বার করে। ভাইলের গায়ের দাম দেখে বলল, সত্তর টাকা।

সোনালি টিউশনির পনেরো দিনের মুজুরি। সোনালি ব্যাগ থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে বলল, দিন।

ভিতর থেকে উত্তম চোংদার সোনালিকে দেখল। দেখে বলল, মালিশ করতে হবে কিন্তু। ভাল করে মালিশ করতে হয় জানেন তো। সোনালির কান লাল হয়ে গেল।

উত্তম কাউন্টারের দিকে এগিয়ে এল। বলল, হাবড়া চৈতন্য কলেজে পড়েন না?

সোনালি কোনও জবাব দিল না।

উত্তম প্যাকেটটা একটা কাগজে মুড়ে দিয়ে বলল, বছর খানেক ধরে ইউজ করলে উপকার হয়। গাছ-গাছড়া আজও কথা বলে।

সোনালিদের বাড়িটা গোবরডাঙা স্টেশন থেকে একটু ভিতরের দিকেই। মরা যমুনা নদীটা সামনেই। এখনও জোয়ার ভাঁটা খেলে। ওখানে ছোটবেলায় স্নান করেছে সোনালি। এখনও মাঝে মাঝে করতে ইচ্ছে হয়। অনেক মেয়ে-বউরা স্নান করে যমুনার জলে, স্নান করে ভেজা কাপড়ের উপর গামছা ঢাকা দিয়ে বাড়ি ফেরে। সোনালির বোনটা, মানে সৎবোনটা, সিক্স এ পড়ে। ও নদী নেয়ে এলে ফ্রকের উপর গামছা ঢাকা দেয়। সোনালিদের বাড়িতে একটা টিউবওয়েল আছে। ওখানেই স্নান করে। ওর গামছা ঢাকা দিয়ে ঘরে না গেলেও চলে। ওর একদিন ইচ্ছে করল নদীতে নাইবে। নদীতে স্নান করে ঘরে ফিরছিল, পাকা রাস্তা দিয়ে একটুখানি হাঁটতে হয়, তোয়ালে ঢাকা দিয়েছিল বুকের উপরে। ওই রাস্তা দিয়েই বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল উত্তম চোংদার। সোনালিকে দেখে ব্রেক কষল। বলল, ওঃ লুকিং সো বিউটিফুল। আসবেন, আর একটা দিয়ে দেব। সোনালিদের বাড়ির চারিদিকে আকাশ। আর কাছেই একটা নদী। ওদের ঘরটা গাছের ছায়ায় ঢাকা, ঘর তো নয়, কুটির। সৎমায়ের ঝি, সোনালি যেন রূপকথার মেয়ে হয়ে গেল। মায়া-সরোবরে নেয়ে এসেছে যেন। বাইকের টিক টিক এখনও শোনা যাচ্ছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া। দর্পণে মুখ দেখতে চাইল সোনালি। ড্রেসিংটেবিলটা মায়ের ঘরে।

সোনালিদের একটা ঘর পাকা, আর একটা ঘরে এখনও টালির চাল। টালির ঘরে সোনালি থাকে, একটা টেবিলে ওর ভারতীয় দর্শন, ইউরোপের ইতিহাস, জুলিয়াস সিজার, আর কী করে মোহময়ী হয়ে উঠবেন। ওর সঙ্গে শোয় ওর সৎ বোন, সৎ ভাই। বাবা-মা অন্য ঘরে। ওর ভাইবোনরা শুয়ে পড়লে, সোনালি পড়ার টেবিলে বসে থাকে, তারপর রাত নিশুতি হলে, ও অন্ধকারে একা একা নিজের বুকে আয়ুর্বেদ মালিশ করে।

সোনালি একদিন নবজীবন ফার্মেসিতে গেল। তখন বিকেল। কাশীনাথ গিয়েছিল খাটালে। দুধ আনতে। উত্তম চোংদার একা দোকানে, এবং ডাক্তারের চেম্বারটাও ফাঁকা। সোনালির পদক্ষেপ সেদিন কী স্মার্ট, সোজা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উত্তম উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, আইব্বাস, এসে গেছেন। কথা আছে, এ ঘরে চলুন। ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েই বলেছিল, এই তেল মেসেজ করার একটা নিয়ম আছে।

গর্ভপাত করার কয়েকটা নিয়ম আছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ভ্রূণহত্যার কৌশলও পালটাচ্ছে। শুধু ভ্রূণহত্যাই বলি কেন, সভ্যতা যত এগিয়েছে হত্যা ব্যাপারটাও তত সহজ ও সাবলীল হয়েছে। আগে ঘাতককে কাছে আসতে হত। তিরধনুকের পর দূর থেকেও হত্যা সম্ভব হল। বন্দুকে আরও দূর থেকে মেরে ফেলা যায়, কামানে আরও দূর থেকে, এখন ঘরে বসে, স্যান্ডুইচ খেতে খেতে, কমিকস দেখতে দেখতে, হাসতে হাসতে একটা বোতাম টিপে দিলেই হল। গর্ভপাতের জন্য আগে জরায়ুতে শেকড় বা কোনও সরু ডাল প্রবিষ্ট করে দেয়া হত। জরায়ু বাইরের কোনও পদার্থ সহ্য করতে পারে না, সে নিজের মাংসপেশি সংকোচন করে বাইরের জিনিসটাকে ঠেলে বার করে দিতে চায়। যত্নে রাখা ভ্রূণটিও বেরিয়ে যায় তখন। প্রচণ্ড কষ্ট হয় এতে গর্ভধারিণীর। রক্তপাতও হয়। জরায়ুতে নুনজলও ঢুকিয়ে মারা হয় ভ্রূণটিকে, যে ভাবে শিঙি মাছ মাগুর মাছকে নুন মাখিয়ে মারা হয়। নারকোল কোরাবার মতো করে ছোট ভ্রূণটিকে জরায়ুর আধার থেকে চেঁচে কুচি কুচি করে ফেলার মতো যন্ত্রপাতিও এই সভ্যতা দিয়েছে—ডায়লেটেশন অ্যান্ড কিউরেটিং মেশিন। ওই কুচিকুচি ভ্রূণশরীরটিকে জরায়ুর আধার থেকে বাইরে বের করে আনবার জন্য রয়েছে সাকস্যান মেশিন।

নবজীবনের ডাক্তারের ফাঁকা চেম্বারে এই রবিবার একটা সুন্দর ছিমছাম কিউট বাক্স এসেছে। ওই বাক্সে পুরো প্যাকেজটাই আছে। ডায়লেটেশন অ্যান্ড কিউরেটিং মেশিন উইথ সাকসান। নবজীবন ফার্মেসি রবিবার বন্ধ থাকে। আজ রবিবার। বাইরে তালা ঝুলছে। ভিতরে রয়েছে হেলাবটতলার মাতৃমঙ্গল ক্লিনিকের ডাক্তার গণপতি মণ্ডল। হাবড়া অশোকনগর গোবরডাঙা অঞ্চলের রেলস্টেশনে, বাসটার্মিনাসে, বাজারের পেচ্ছাপখানায় এই ডা. মণ্ডলের টাইপরা গোঁপওলা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। আর আছে সোনালি।

উত্তম চোংদার আর কাশীনাথ নবজীবনের ভিতরে বসে আছে। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ, নবজীবনের ভিতরে টিউব লাইটের আলো। এখন বেলা এগারোটা। ঘরের ভিতর প্রচুর ধোঁয়া, কাশীনাথ ও উত্তম সিগারেট খেয়ে চলেছে। ইলেকট্রনিক দেয়াল ঘড়িটার কাঁটা নড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, পাশের চেম্বার থেকে গণপতি মণ্ডলের গলা শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে—কোনও ভয় নেই, পনেরো মিনিটের ব্যাপার। মেয়েটার ভয়-পাওয়া কাতর কণ্ঠ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। গণপতি মণ্ডল একবার বাইরে এলেন। বললেন, ও কাশীনাথবাবুকে একটু ডাকছে।

কাশীনাথ ঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিতেই তুলোর বান্ডিল থেকে এক মুঠো তুলো খামচে নিয়ে সোনালি ওর দুই উরুর মাঝখানে ফেলে দিল। আড়াল করতে চাইছে ও, একটু আড়াল। কাশীনাথের চোখের দিকে চাইল। কাশীনাথ ওর চোখের ভাষা পড়তে পারল। কাশীনাথ ঘাড় নাড়ল। এবং মনে মনে বলল, কথা দিচ্ছি দু' বছর পরে। সোনালি মৃদু হাসল। আবার কী যেন বলছে চোখ। কাশীনাথ বলল, কোনও ভয় নেই, আমি পাশের ঘরেই আছি। সোনালি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। গণপতি মণ্ডল বলল, আবার কান্না? সাউন্ড বাইরে যাচ্ছে, বলেই এক দলা তুলো সোনালির মুখের মধ্যে পুরে দিল, ঠেসে দিল। কাশীনাথকে বলল, বাইরে যান।

গণপতি মণ্ডল টিউবে লুব্রিকেটিং জেলি মাখাতে মাখাতে সোনালিকে জিজ্ঞাসা করল, একচুয়ালি ফাঁসিয়েছে কে? কাশীনাথ?

সোনালি মাথা ঝাঁকাল।

উত্তমবাবু?

সোনালি চুপ।

নাকি দু'জনেই কাজ করেছে?

সোনালির চোখে জল। মুখের আওয়াজ শুষে নিচ্ছে তুলোর দলা।

গণপতি মণ্ডল টিউবের মাথায় কিউরেটিং-এর যন্ত্রটা বসিয়ে দিল। ওটাই ধারালো দাঁতে ভ্রূণটা চাঁচবে। বাইরে থেকে ওই দাঁতের শক্তি বাড়ানো কমানো যায়, সরানো যায়, নড়ানো যায়। গণপতি মণ্ডল যন্ত্র বসানো টিউবটাকে ঠেলে দিলেন। দুর্গা দুর্গা।

পাশের বন্ধ ঘরে চুপচাপ বসে থাকা উত্তম দুটো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে মাকালীর ছবির ফ্রেমে গুঁজে দিল। কাশীনাথ এসে টুলে বসল। উত্তম কাশীনাথকে বলল, তোকে এত করে বললাম, ওকে বিয়েটা করে নে, মাইনে বাড়িয়ে দিতাম, শুনলি না।

লোকে বলে আমি উত্তমদার চামচে। আমিও তাই মনে করি। উত্তমদা তখন আমাকে ডেকে চাকরিটা না দিলে না খেয়ে মরে যেতাম। উত্তমদা বলেছে একটা প্যাথলজিকাল ক্লিনিক করে দেবে। উত্তমদা এখন পার্টি করে। টাকা দেয়, পার্টির লোক আসে, আড্ডা মারে, থানাতেও খুব খাতির, ওসির সঙ্গে মাল খায়।

উত্তমদাই আমাকে প্রথম মাল খাইয়েছে, প্রথম ব্লু দেখিয়েছে, সোনালিকে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকিয়ে আমাকে যেতে বলেছিল একদিন। বলেছিল, যা, একসপেরিয়েনস করে আয়। আমি যাইনি। আমার খুব ভয়।

উত্তমদা আমাকে দিয়ে বোতলটোতল আনায়, আমি এনে দি। গেলাসেও ঢেলে দি, আমাকে খেতে বলে। প্রথম প্রথম খেতাম না, এখন মাঝে মধ্যে একটু খাই। না খেলে আমার ভয় করে। উত্তমদা আমার সঙ্গে হার্গিস মালিকের মতো ব্যবহার করেনি, বন্ধুর মতো। ওর মেয়ের জন্মদিনের সব বাজার-টাজারের দায়িত্ব ছিল আমার উপর। উত্তমদা বউ আর শালি নিয়ে দিঘা গেল। পুরো দোকানটা আমিই দেখলাম। আমাকে এতটা বিশ্বাস করে। তাই আমি উত্তমদার কোনও কথা ফেলতে পারি না, কিছু করতে বললে না করতে পারি না। একবারই না করেছিলাম—যখন ফেঁসে যাবার পর উত্তমদা আমাকে বলেছিল, ওকে বিয়ে কর, মাইনে বাড়িয়ে দেব।

কেন করব আমি, ওর পেটে উত্তমদার বাচ্চা, আর আমাকে বলছে বিয়ে করো। আমি বলেছিলাম, তা হয় না উত্তমদা। বিয়ে করার ছ-সাত মাসের মধ্যে বাচ্চা হয়ে গেলে সবাই ভাববে বিয়ের আগেই আমি...।

বেশ করেছিস বিয়ের আগে করেছিস। ভাবলে তোর কী যায় আসে!

আমি তো করিনি উত্তমদা।

করিসনি তো করিসনি। তা এখন বিয়েটা করে নে।

কিন্তু বাচ্চাটা তো আমাকে বাবা ডাকবে। সারাটা জীবন।

ডাকুক।

না। ক্ষমা করে দিও উত্তমদা।

তা হলে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই বলে অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল উত্তমদা। তারপর বলল, আমি এখন পুরো অফ হয়ে যেতে পারি, কিন্তু কী সব জিনেটিক টেস্ট-ফেস্ট হচ্ছে আজকাল। ওটাকে অফ করে দিতে হবে। তুই আমাকে মদত করবি তো?

আমি বলেছিলাম, করব।

করছি তো, আমি তো মদত করছি। মদত না করে কী করব? ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেলে আমার যে ভাত বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি শালা উত্তম চোংদার, বুদ্ধু বনে গেলাম। কেন যে ফাঁসলাম। ঘরেতে শালা পারফেক্ট ফ্যামিলি প্ল্যানিং করছি, একটা মেয়ে, চার বছর বয়েস হল—এখনও ফারদার বউয়ের পেট বাধাইনি, এখানেই গড়বড় হয়ে গেল।

ওকে জাস্ট বিনে পয়সায় ভাইলগুলো দিচ্ছিলাম। ওর খুব শখ হয়েছিল যৌবনবতী হবে। ভিটামিন ক্যাপসুলও দিচ্ছিলাম, পয়সা তেমন নিতাম না। ওকে বললাম, নিজে নিজে মালিশ করে লাভ হয় না। অন্যহাতে করাতে হয়, যত করাবে তত ভাল হবে। তাতেই টোপ গিলে ফেলল মেয়েটা, তো আমি কী করব?

পরপর ক'মাস ধরে রোববারের খবর কাগজে দেখছিলাম সব বিখ্যাত বিখ্যাত লোকদের কেচ্ছা বেরুচ্ছে। সবারই কত সেক্স লাইফ। আমিও কম কীসে? আমারও তো ইচ্ছে হতে পারে। আমিই বা এক বউকে নিয়ে পড়ে থাকব কেন? অনেককে ভোগ করো—এটাই তো পৌরুষ। মরদের লক্ষণ। রোববারের কাগজেই তো বক্স করে লিখেছে বহুগামিতা পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

কাশীনাথটাকে বললাম, বিয়েটা কর, খরচা আমার, শালা সেয়ানা আছে। সিধে ডিনাই করল। কেসটা মিটে যাক, ওকে হাটিয়ে দেব। একের নম্বরের নিমকহারাম।

উত্তম চোংদার কাশীনাথকে বলল, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, যা-না, একবার ওঘরে, কী হচ্ছে দেখে আয়, তুই তো কখনও পুরো মেয়ে দেখিসনি।

কাশীনাথ বলল, ধুস!

উত্তম বলল, ফালতু ফালতু কত খরচা হয়ে গেল। গণপতি মণ্ডল একগাদা টাকা চেয়ে বসেছে।

গণপতি মণ্ডল হন্তদন্ত হয়ে পাশের ঘরে এল। এসেই বলল, স্যালাইন আছে, স্যালাইন, একটা বোতল বার করুন এক্ষুনি।

উত্তম বলল, কেন, স্যালাইন কী হবে?

দরকার, দরকার। স্যালাইনের সঙ্গে টিউব-নিডলও বার করুন।

উত্তমের চোখের দিকে তাকাল কাশীনাথ। চোখে সম্মতি পেল। সঙ্গে সঙ্গেই কাশীনাথ শোকেশ থেকে একটা স্যালাইন বার করল। গণপতি মণ্ডল ওটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পাশের ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে গেল। উত্তমও পিছন পিছন গেল। উত্তম ও ঘরে গেল বলে কাশীনাথও। গণপতি মণ্ডল মেয়েটার মুখের ভিতর থেকে তুলোর দলাটা বার করে নিল। মেয়েটা এখন যতটা জোরে কাতরাতে পারছে, সেই আওয়াজ বেশি দূরগামী হবে না। মেয়েটার দুই উরুতে রক্ত। যোনিমুখে রক্ত, রবার ক্লথে রস রক্ত ফেনা।

মাছি এসে গেছে।

গণপতি মণ্ডল ঘামছে। বলল, ফিটাসটা এমন আঁকড়ে ধরেছিল ইউটেরাসটাকে, যেন মায়ের কোল। স্ক্রাপ করতে গিয়ে ইউটেরাসটা ফুটো হয়ে গেছে।

তা হলে কী হবে!

ভিতরে ব্লিডিং হচ্ছে। কেস খারাপ।

গণপতি মণ্ডল মেয়েটির নাড়িতে আঙুল রাখে। চোখ বোজে। মেয়েটার জড়ানো কথা শোনা যায়, আমাকে বাঁচান, আর কখনও চাইব না। একটা মাছি গরিব স্তনবৃন্তের উপরে চুপচাপ বসে যায়, গণপতি মণ্ডল বলে—এখন এই অবস্থায় হাসপাতালেও যাওয়া যায় না। সবার হাতকড়া পড়বে। ডাইসিনিন ইনজেকশন আছে, ডাইসিনিন?

কাশীনাথ জানে ওটা নেই। ইশ, কেন নেই? ডাইসিনিনটা থাকলে কি মেয়েটা ঠিক হয়ে যেত! তা হলে ক্রোমোস্ট্যাট? গণপতি জিজ্ঞেস করে।

আছে। আছে। কাশীনাথ শোকেশ খুলে ছোঁ মেরে নিয়ে আসে। গণপতি ইনজেকশনটা দ্রুত পুশ করে। মেয়েটার কষ্টের শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, কিন্তু চোখ খোলা। চোখ কথা বলছে, বাঁচাও, প্লিজ বাঁচাও।

উত্তম বলে, আপনার উপর বিশ্বাস ছিল গণপতিবাবু।

গণপতি বলে, শালার ফিটাসটা এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল ইউটেরাসটাকে। আমি কী করব, একটু জোর পড়ে গিয়েছিল চাঁচতে গিয়ে।

কী হবে যদি... উত্তম আর কিছু বলতে পারে না।

ডেকাড্রনও দেওয়া হল। মেয়েটা চোখ বুজল।

সারাটা ঘরে নিস্তব্ধতা। একটা ছোট ফ্যান ঘুরে যাচ্ছে। গণপতির একটা হাত মেয়েটার হাতের কবজি ধরে আছে। একটু পরেই গণপতি দু'হাতে মেয়েটার বুকে চাপ দিতে থাকল, তারপর নাড়ি দেখল, চোখের পাতা তুলে চোখ দেখল, তারপর বলল, সরি।

উত্তম চিৎকার করে উঠল, শুয়োরের বাচ্চা কোথাকার।

গণপতি আর একবার মিনমিন করে বলল, এমনভাবে খামছে ধরেছিল ফিটাসটা...। গণপতি বেসিনে লাল সাবানে হাত ধুয়ে পকেট থেকে কয়েকশো টাকা বার করে টেবিলে রাখল। বলল, যে টাকাটা অ্যাডভানস নিয়েছিলাম সেটা ফেরত দিচ্ছি।

উত্তম বলল, এসব নখরামি ছেড়ে বলুন এখন কী করব?

গণপতি বলল, আমাকে ফাঁসাবেন না। আমি ডিনাই করব। আবার সাবান ঘষতে লাগল হাতে। আমি ফেঁসে গেলে আপনাকেও ফাঁসাব আমি।

কাশীনাথ বলল, উত্তমদা, আমি তো কিছু করিনি, আমিও কি ফেঁসে যাব?

গণপতি বলল, যাতে কাউকে না ফাঁসতে হয়, সেই ব্যবস্থা করলেই তো হয়। কোনও চিহ্ন রেখো না।

কাশীনাথ তখন চিহ্ন লোপাট করছে। তুলো দিয়ে মুছে নিল উরুতে লেগে থাকা রক্ত। যোনি মুখে জমাট বাঁধা কালচে রক্ত, এই প্রথম কোনও যোনি স্পর্শ করল কাশীনাথ, মৃতমানুষের। উত্তমদা কিছু বলছে না, তাকিয়ে আছে শুধু, ওতেই বুঝতে পারছে কাশীনাথ, উত্তমদা বলছে, আমি তোর প্রভু, কাশীনাথ তুলো দিয়ে রবার ক্লথের রসরক্ত কাঁচিয়ে পরিষ্কার করে। উত্তম দু'হাতে মুখ ঢাকে। কাশীনাথ সমস্ত রক্তমাখা তুলো একসঙ্গে জমা করে কয়েক ফোঁটা স্পিরিট ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন নিভে গেলে কালো ছাইগুলোকে একটা নিরীহ ঠোঙায় ভরে ফেলে।

উত্তম চোংদার ওষুধের একটা খালি পেটি বার করে আনে। বলে এটায় ঢোকাতে হবে। কাশীনাথ ওটাকে দেখে। বলে ওটায় তো কোম্পানির নাম লেখা, কনসাইনমেন্ট নম্বর লেখা, ফেঁসে যাবে তো। নাকে অক্সিজেন ফিট করে দেবার পর বড়লোক রোগী যেভাবে নার্সিংহোমের নার্সকে থ্যাংককিউ বলে, সেরকম ভাবেই বলল, থ্যাংকিউ। কাশীনাথ একটা মিনারেল ওয়াটারের খালি পেটি নিয়ে এল। যাবতীয় নম্বরটম্বর ছিঁড়ে ফেলল, বলল—এটায়।

উত্তম বলল, ঢুকবে না। একটা করাত ছিল না ঘরে, করাত,— পারবি?

কাশী ওর প্রভুর দিকে তাকিয়ে বলল, পারব।

কাশীনাথ, ভিতু কাশীনাথ, নিজে হাতে কোনওদিন মুরগিও কাটেনি। হাতে করাত তুলে নিল। মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল না, ভুল করে উচ্চাভিলাষী হতে যাওয়া বুকের দিকেও নয়, শুধু গলাটার দিকে তাকিয়ে ওখানে করাতটা চালাতে লাগল। হচ্ছে, আলগা হচ্ছে, এই প্রভু, পারলাম। চেয়ারে বসে থাকা উত্তমের দিকে তাকাল কাশীনাথ। কাশীনাথ দেখল উত্তমদার মাথাটা ঝুলে গেছে, চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছে উত্তমদা। কাশীনাথ দৌড়ে গিয়ে উত্তমকে ধরে ফেলল। উত্তম অজ্ঞান হয়ে গেছে। কাশীনাথ উত্তমকে শুইয়ে দেয় মেঝেতে। জলের ঝাপটা দেয় চোখে মুখে। উত্তম একটু পরে চোখ খোলে। বলে—হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল কাশী। তা হলে একটু মানুষ আমি এখনও আছি বল?

কাশী কি তা হলে একটুও মানুষ নেই এখন?

কাশী আবার কাজে লেগে গেল। নিপুণ ভাবে করাত দিয়ে হাঁটুর তলা থেকে পা দুটো কেটে ফেলল। পাঁচ টুকরা সোনালি নামের মেয়েকে আলাদা আলাদা পলিথিনে ঢুকিয়ে পলিথিনের মুখ বেঁধে বাক্সটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। দুটো ইটও রাখল বাক্সটার ভিতরে। অয়েল ক্লথটাও বাক্সটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ফিনাইল জল দিয়ে ভাল করে মুছে নিল মেঝে। সব পরিষ্কার। পেশেন্ট দেখার বিছানা এখন শুধু বিছানা হয়েই পড়ে আছে। এবার একটা দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল, তারপর দড়িটার শেষ প্রান্তদুটোকে ফাঁস লাগিয়ে একটা ফুল তৈরি করল, কোনও প্রেজেনটেসনের প্যাকেট যে ভাবে বেঁধে দেয়। তারপর দু'হাত ঝেড়ে উত্তমকে বলল, নিন। যেন উপহার।

উত্তম বাক্সটার দিকে তাকাল। কাশীনাথের দিকে, তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এত বেলা হয়ে গেছে। এবার বাড়ি চল।

কাশীনাথ শেষ · রের মতো দেখে নিল কোনও চিহ্ন পড়ে আছে কি না।

উত্তম বলল, রাত দশটায় এখানে আসিস। আমিও আসব। বাক্সটা যমুনার জলে ফেলে দেব।

কাশী ঘরে গেল। ওর মা বলল, এত দেরি হল কেন?

কাশী বলল, দরকারি কাজ ছিল একটা।

ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভিতে সানন্দা ক্যুইজ দেখল, খেতে বসল, কিন্তু একটু পরেই ভাতের থালার মধ্যেই বমি করে ফেলল কাশীনাথ।

রাত্রি দশটাতেই নবজীবন ফার্মেসির সামনে পৌঁছে গেল কাশীনাথ। উত্তমও এসেছে মোটর বাইকে। ওরা তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। আলো জ্বালাল। দেখল বাক্সটা পড়ে আছে। আর দেখল একটা লাল পিঁপড়ের লাইন বাক্সটার ভিতরে যাচ্ছে।

উত্তম বলল, কাশী, তুই আমাকে মদত করলি, জিন্দেগীতে ভুলব না। লাস্ট স্টেজেও তুই আমাকে বাঁচিয়ে দে। একটা মোটর সাইকেলে এত বড় বাক্স আর দু'জন ধরবে না। আমায় সবাই চেনে। বরং তুই যা। মোটর বাইকটার পিছনে বাক্সটা বেঁধে দেব। তুই অর্জুনপুরে যমুনার কাঠের ব্রিজটাতে চলে যাবি, ফেলে দিবি, দশ মিনিটের ব্যাপার। পারবি না?

কাশীনাথ মোটর বাইকের গিয়ার পালটায়। ঘটঘট ঘটঘট। হাতের একসেলারেটারে স্পিড বাড়ায়। পৃথিবী টলছে। ও এখন স্বাধীন। ওর সামনে এখন ওর প্রভু নেই। ঘটঘট ঘটঘট। এই দেহ নিয়ে এখন যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। ও স্বাধীন। ও কাশীনাথ। কাশীনাথ শিবের আর এক নাম। ওর পিছনে বাক্সবন্দি সতী। ও এখন দক্ষযজ্ঞ বাঁধাতে পারে, ও এখন প্রলয় নাচন নাচতে পারে। আই লাভ ইউ সোনালি, তোমাকে ভাল বেসেছিলাম। কাউকে বলতে পারিনি, নিজেকেও নয়। সোনালি তুমি কেন মোহময়ী হতে চেয়েছিলে? ঘটঘট ঘটঘট। তীব্র হেডলাইট। আমি বাক্স খুলে একটা একটা করে অঙ্গ ছুড়ে দেব। পা-দুটো ছুড়ে দিলাম নবজীবন ফার্মেসীতে। মোহময়ী হতে চাওয়া করুণ বুকজোড়াকে ছুড়ে দিলাম গ্রান্ডিনার কোম্পানিতে। মুণ্ডুটা ছুড়ে দিলাম থানায়। সব তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠো, পীঠস্থান।

কাশীনাথ অর্জুনপুরের দিকে যাচ্ছে না। একদম অন্যদিকে। অন্য রাস্তায়। কাশীনাথ থানার সামনে এসে থামল। গাছে জোনাকি। কাশীনাথ থানার ভিতরে গেল। পুলিশের জামা পরে একজন তখন আধুনিক রমণীদের রমণীয় পত্রিকার একটা পুরনো সংখ্যা পড়ছে। স্তন সংখ্যা। কাশীনাথ ওখানে দাঁড়াল।

কী চাই?

উত্তর নেই।

কী চাই এখানে?

কাশীনাথ চুপ।

বলবেন তো কী চাই?

কাশীনাথ কিচ্ছু না বলে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। চোখ ফেটে জল বেরুল। কাশীনাথ দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল, আর তখন নিজেকে মানুষ মনে হতে লাগল, স্বাভাবিক মনে হতে লাগল।

পরদিন খবর কাগজে বেরুল অস্বাভাবিক যৌন মানসিকতার শিকার হল একটি তরুণী। মানবদরদী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলি বলল অপরাধীর শাস্তি চাই। আর রমণীয় পত্রিকাটি বিজ্ঞাপনে জানাল পরবর্তী সংখ্যার কভার স্টোরি—'অস্বাভাবিক যৌন মনস্তত্ত্ব।'

পরিকথা, ডিসেম্বর ১৯৯৯

ডিপ ফ্রিজ

আমার বড়মামার বডি ডিপ ফ্রিজে রাখা আছে। আমি বাইরের টানা সিঁড়িতে ফুঁ দিয়ে বসেছি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। মামিমার দিকের একজন আত্মীয় মামিমাকে শুনিয়ে বলল 'আকাশ বাতাস এখন কাঁদছে।' আমাদের আত্মীয়স্বজনরা সব ভিতরে। ওখানে চেয়ার-টেয়ার রাখা আছে। আমিও বরং ভিতরে যাই, বৃষ্টি লাগছে। হারু এলে সামনে চলে যাব। হারু কি আমাকে জড়িয়ে ধরবে? জড়িয়ে ধরলে আমি ওর গায়ের সাহেবি পারফিউমের গন্ধ পাব। ও কি কাঁদবে? সাহেবরা কি কাঁদে? হারু যদি কান্নাকাটি করে, আমি বলব, কাঁদিস না হারু...। সবার বাবা কি চিরদিন থাকে? দেখ না, আমার বাবাও তো নেই। যদি চোখের জল মোছাতে হয়? এমা, আমার রুমালটা বোধ হয় নোংরা।

হারুর মেম বউ আর বাচ্চা দুটোও আসছে। আমার ছেলেটাকেও নিয়ে এসেছি । আজ, ওর ইস্কুল কামাই হল। ছেলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, ক্লাস নাইন। পুলিশ-সার্জেন্টের সঙ্গে সেদিন ইংরিজিতে দারুণ ঝগড়া করেছে।

এয়ারপোর্টে ফোন করেছিলাম, দেড়ঘণ্টা লেট। এয়ারপোর্টে আমারই যাবার ইচ্ছে ছিল ছেলেকে নিয়ে, ভল্টুর ভাই, আর অর্চনার হ্যাসবান্ড গ্যাঁড়া চলে গেল। অর্চনা বলল, তুই থাক দাদা, এদিকে তোকে দরকার হতে পারে। খিদে পেয়েছে। কচুরি প্যাঁদাব? হাতের ইশারায় ছেলেকে কাছে ডাকি। ওরও তাই ইচ্ছে। কিন্তু ইন দি মিন টাইম যদি ও এসে যায়? বরং পাশের দোকান থেকে বিস্কুট কিনে আনি। ছেলেকে একবার জিজ্ঞাসা করি, কী রে, আমেরিকা যাবি নাকি? ছেলে বলে, হোয়াইন্নট?

বিস্কুট আনতে গিয়ে দেখি মেইন গেটে ভল্টু আর ভল্টুর বউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। সব বুঝি। ওদের গাড়ি এলে প্রথমে দরজা খুলে দেবে। আমি নিজেকে নাদান শো করে বলি, কী গো, তোমরা ভিজছ কেন? ভল্টুর বউ বলল, যা গরম পড়েছিল ক'দিন, ঘামাচি মরবে। ভল্টু বলল, এবারে তো চলে আসা উচিত..।

এই 'পিস হাভেন'টা আমিই ফিট করি। কেউ জানতই না এরকম ডেড বডি রাখার ফ্রিজও আছে। ভল্টুরা তো তাল-তাল বরফ এনে তার মধ্যে শুইয়ে রেখেছিল, মামিমাকে ওখান থেকে সরানোই যাচ্ছিল না, ঠান্ডা লেগে কাশি শুরু হয়ে গিয়েছিল। এদিকে হারুর সঙ্গে কনট্যাক্টও করা যাচ্ছিল না, ফোন বেজে যাচ্ছিল, উইক এন্ডে বাইরে ছিল বোধ হয়। বডি খারাপ হতে শুরু করেছিল। ম্যাকসিমাম আর একটা দিন রাখা যেত, তখনই এই ডিপ ফ্রিজটার খবর পাই। আমিই ফিট করি এটা।

ডিপ ফ্রিজ ডিপ ফ্রিজ করছি কেন? অন্য কিছু নাম নিশ্চয়ই আছে, জানি না । বেশ বিরাট আলমারির মতন, প্রতিটি আলমারিতে পাঁচটা করে ড্রয়ার আছে, ড্রয়ারের ভিতরের শীতল শূন্যতায় নীল হয়ে থাকা শুয়ে থাকা বডি। বডি রাখতে হেভি চার্জ। ওই জন্য সানসা পার্টিরাই এখানে আসে। আমরা এসবের খোঁজখবর রাখতে যাব কেন? নেহাত একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার খোঁজটা দিয়েছিল। ওর ট্যাক্সিতে বরফ আনছিলাম। ও জিজ্ঞাসা করেছিল কেন এত বরফ। বলেছিলাম, ডেড বডি...। ও বলেছিল, লাশ রাখনেকে লিয়ে বহুত আচ্ছা বন্দোবস্ত হায়...। ওর কাছ থেকেই খোঁজটা পেয়েছিলাম। আমিই তখন উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থাটা করি।

ওদিকে, দু'দিন পরে হারুর সঙ্গে যখন যোগাযোগ করা গেল, ভল্টুই ফোনটা করেছিল, বলল,

এধারের ব্যবস্থা করেছি আমরা, তোর জন্য রেখে দিচ্ছি বডি, তুই এসেই মুখে আগুন দিবি, আমরা খুব ভাল জায়গাতেই বডিটা রেখে দিয়েছি।

'আমরা', তাই না? আমড়াগাছি হচ্ছে। আমিই সব ব্যবস্থা করলাম। এখানকার ম্যানেজার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ওর সঙ্গে ইংলিশে কথা বললাম। মামিমাকে রাজি করালাম। ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছ থেকে শুধু এলাকাটার খোঁজ পেয়েছিলাম, ঠিকানা নয়। কম ঘুরেছি? কম পেট্রোল পুড়েছে আমার গাড়ির? ভগবানের আশীর্বাদে আমাকে ক'লিটার পেট্রোলের জন্য চিন্তা করতে হয় না আর। আমার গাড়িটাই তো এয়ারপোর্টে গেছে ওদের আনতে।

বাইরে মাটাডর রেডি । ফুলও আনা হয়েছে। হারু এলেই বডি বার করব, সিধে বার্নিংঘাট। মামার নাকি ইচ্ছে ছিল রতনবাবুর ঘাট। ওই এলাকাতেই কাটিয়েছেন বহুদিন। তবে হারু যদি নিমতলা নিতে চায়, তাই হবে।

হারুর কি এখন এসব নিমতলা-কেওড়াতলা মনে আছে? পঁচিশ বছর হল দেশ ছেড়েছে। আমি যখন বি কম-এ ধ্যাড়াচ্ছি, ও তখন আমেরিকা চলে গেল স্কলারশিপ নিয়ে। হারুটা যাকে বলে গোবরে পদ্মফুল। আমাদের গুষ্টিতে লেখাপড়ার চল নেই তেমন। আমার দাদামশাই, মানে মামার বাবা ডায়মন্ডহারবার লাইনের গোচারণে থাকতেন শুনেছি। ওখানে কিছু একটা কেলো করে বরানগরের দিকে এসে আস্তানা করেছিলেন। মামাবাড়ির জ্ঞাতিগুষ্টিরা সব গোচারণেই রয়ে গেছে। বরানগরের জেলেপাড়ায় তখনও কয়েকঘর জেলে থাকত। যেমন আমরা। আমার ঠাকুরদাদা নাকি ইলিশ ধরতেন। নিজের নৌকো ছিল। আমার বাবারও খেপলা জাল ছিল। গঙ্গায় জাল মেরে মাঝে মাঝে তপশে-বেলে-চ্যাং-চিংড়ি ধরে আনতেন, তবে সেটা শখে। আমার বাবার ছিল বরানগরে মাছের দোকান। ভোর ভোর বেরিয়ে যেতেন। ফিরতে ফিরতে বেলা একটা। আমার বাবা চুলে মাখতেন জবাকুসুম তেল। বিকেলে মাঝে মাঝেই পাজামা আর গিলে করা পাঞ্জাবি পরে রোয়াকে বসতেন, তাস খেলতেন, জর্দাপান খেতেন, আর গাইতেন সায়গল-রবীন মজুমদারের গান। কে বলবে মাছের কারবার?

একবার কলকাতায় নাকি খুব পাউরুটির ক্রাইসিস। ময়দা ব্ল্যাক হচ্ছে। আমার মামা নাকি ময়দা ব্ল্যাক করতেন। মামার কোন বন্ধু নাকি চুগলি করে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। আমার বাবার তখন মাছের দোকান। থানার ও সি বাবার থেকেই মাছ নেয়। বাবা মাঝে-মধ্যেই ও সি-র ব্যাগে গলদাটা পারশেটা ঢুকিয়ে দিত। ও সি বলত, কী হচ্ছে মদন, এখন তো টাকাপয়সা নেই। বাবা বলত, তাতে কী হয়েছে, পরে দেবেনখনে। ও সি পেমেন্ট দিতে ভুলে যেত, বাবাও চাইতে ভুলে যেত। ফলে বাবার সঙ্গে ও সি-র একটা ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। বাবাই মামাকে ছাড়িয়ে আনে। উনি তখনও আমার মামা হননি। মামা হবার আগে উনি পিসেমশাই হয়েছিলেন। ব্যাপারটা হল বাবা যখন থানা থেকে ছাড়িয়ে আনে ওই মামা আমার বাবার কাছে একেবারে বিলবাট্টা হয়ে যায়। আমার বাবার বড়বোন, মানে আমার বড়পিসিমার ছিল বাঁ পায়ের তিনটে আঙুল জোড়া । তখন মেয়ে দেখতে গেলে প্রথমেই পা দেখার রেওয়াজ ছিল। ফলে বিয়ে হচ্ছিল না । বাবা এই মামাকেই মুরগি করলেন। মানে বাবার ওই বোনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। উনি পিসেমশাই হলেন। কিন্তু বাচ্চা হতে গিয়ে ওই পিসিমা মারা যান। বাচ্চাও। এগুলো সবই শোনা কথা। তবে আমি কখনও পিসেমশাই অবস্থায় দেখিনি। মামাই দেখেছি। গিলে পাঞ্জাবি পরা রবীন মজুমদার সায়গল গুনগুনানো আতরমাখা বাবাকে আমার মা নিজেই পছন্দ করেছিল। কালীঘাটে মালাবদল হয়েছিল। পুরনো পিসেমশাই মামা হয়ে গেল। মামা এর পর বিয়ে করেছিলেন ফের। আলমবাজারের মেয়ে, মামিমা। হারুর মা । মনে আছে মামাবাড়ির কলতলার লাইনে আমার মা কিংবা জবার মা ডাকছে, ওলো-ও হারুর মা তোর বালতি ভরতি হয়ে গেল... হারুর মা এখন ভিতরের সোফায় বসে আছে, ওঁর মাথায় যে বিলি কেটে দিচ্ছে, সেই মেয়েটাকে আমি চিনি না। এই মামারবাড়ি আমার জীবনে অনেকটাই। জেলেপাড়া বস্তির পিছনের দিকে লাইনে একটা মাত্র ঘরে বড়মামারা থাকতেন। মামার

ঘরেই আমি জীবনে প্রথম দেখেছিলাম চুম্বক। সড়াত করে টেনে নিচ্ছে আধুলি, টেনে নিচ্ছে সিকি। দেখেছিলাম স্পঞ্জ। টিপে দিলাম আর অমনি ফুলে গেল। আমার মামার এইসব দরকার হত। ময়দা ব্ল্যাকের কেস থেকে ছাড়া পাবার পর আমার মামা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছে একটা দোকান করে। কালী মায়ের ছবি, শাঁখা-সিঁদুর-লোহা এসব থাকত। আর স্পঞ্জের কুশনে বসতেন। কুশন ছিঁড়ে গেলে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। আমাকে একটা স্পঞ্জের টুকরো দিয়েছিলেন মামিমা। কতদিন শ্লেট মুছেছি ওটা দিয়ে...। আর চুম্বকটা দরকার হত দোকানদারিতে। তখন খুব নকল সিকি আধুলি বেরোত বাজারে। ওগুলো চুম্বকে টানত না। আজকাল আর নকল সিকি আধুলি দেখা যায় না তেমন। পড়তায় পোষায় না। বাল্যকালের আশ্চর্য হবার স্মৃতিতে বারবার সেই চুম্বক এসে যায়। আজ যখন এখানে আসি, সকালবেলা, আমার বাড়ির অ্যান্টেনার ছাতে দেখেছিলাম, আটকে আছে একটা পেটকাট্টি ঘুড়ি। লালের মধ্যে সাদা। আমার তখন চুম্বক মনে পড়েছিল, সেই জেলেপাড়ার বস্তি, কলতলার শ্যাওলা, জবার মা আমার মায়ের হাঁক, টিনের সিনেমা। আবার পরবর্তী কালে মামার বাড়িতেই জীবনে প্রথম দেখেছি, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, হারু পাঠিয়েছিল, পকেট টেলিভিশন দেখলাম মামাবাড়িতেই জীবনে প্রথম। খোসাসমেত পেস্তা-বাদাম মামাবাড়িতেই, টোবাস্কো সস্, রোল করা দারুচিনি...।

হারুর কী রকম জ্ঞাতি ভাই, পাজামা আর চকচকে একটা প্রিন্টেড শার্ট পরা, আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা দাদা, মড়া বেরোতে আর কতক্ষণ লাগবে? ছেলেটা গোলাপি পলিথিন থেকে মুড়ি খাচ্ছিল, সঙ্গে কাঁচালংকা। গোচারণ থেকে সপরিবারে এসেছে পরশু দিন, ভাগচাষি। আর একজন এসেছে সকালবেলা। আজ বৈকাল তিনটা থেকে জমিতে জল পড়বে, ডিপ টিউকলের জল...। ও বলল। ও চলে যেতে চায়।

আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা সব এমনিধারাই। হারুটাই কী করে দৈত্যকুলে পেল্লাদ। ও তো আমারই বয়সি ছিল। আমার চেয়ে ছ' মাসের ছোটই। রামেশ্বর ইস্কুলে আমরা দু'জনে ভরতি হয়েছিলাম একই ক্লাসে। আমরা দু'জনেই রঞ্জন নামে একটি ছেলের খিদমতগিরি করতাম। রঞ্জন বলত ওর মামার প্লেন আছে । টিফিনবেলায় রঞ্জনের বাড়ি থেকে চাকর এসে ওদের দুধ খাইয়ে যেত, আর বাক্সে দিত টিফিন। ও হাতের চেটোর উলটো দিক দিয়ে মুখ মুছে টিফিন বাক্স নিয়ে আসত। রঞ্জন মাখন মাখানো পাউরুটির হাফ আমাকে, হাফ হারুকে দিত। রঞ্জনের মাখন-রুটি খেতে ভাল লাগত না। ও গৌরের ঘুগনি খেত। হারুর ভাল নাম ছিল হারাধন। হারাধন খামারু। ক্লাস সেভেনে যখন সমাস পড়ানো হচ্ছিল, কতগুলো ছেলে বলত, হারাধন—যে ধন হারাইয়া গিয়াছে—বহুব্রীহি সমাস। আসলে মামিমার আগে একটা ছেলে হয়েছিল। রক্ত আমাশা হয়ে এক বছরের মাথায় মারা যায়। তারপর যখন হারু এল, মামিমার বিশ্বাস হয়েছিল ওই ছেলেটাই ফিরে এসেছে। ক্লাসে হারু সেকেন্ড হত। কে জানে কী করে হত।

আমার বাবার মাছের দোকান। আমার জন্য অনিলবাবু স্যার ফিট করা ছিল ক্লাস ফাইভ থেকে। হারুর বাবার মাকালীর ফটোর দোকান। ওর কোনও মাস্টার ছিল না। আমি ক্লাস এইটে গাড্ডু মারলাম। হারু ফার্স্ট হল। আমার বাবা আমায় খুব প্যাঁদাল। বলত—যা হারুর গু খেয়ে আয়। হারুর সঙ্গে সেই থেকেই বেশি কথা বলতাম না আমি। এমনি এমনি পাশ করলে চলত না? একেবারে ফার্স্ট হতে হবে?

হারু ফার্স্ট হবার পর হারুর বাবা ওকে একটা খুব ভাল সিনেমা কিনে দিয়েছিল। একটা লম্বা মতো টিনের চোং, একদিকে চোখ রেখে অন্যদিকে ফিলিম ঢুকিয়ে দাও, একদম সিনেমা। হারু সিনেমাটা দেখাবার জন্য আমাদের ঘরে এসেছিল। আমি ততদিনে বৈজয়ন্তীমালা চিনে ফেলেছি। দিলীপকুমার, রাজকাপুর, দেবানন্দ চিনেছি। সাধনা-আশা পারেখ-নন্দা-সায়রাবানু চিনে গেছি। ক্লাস কেটে আমি আর রঞ্জন দেখে ফেলেছি সঙ্গম। টেরিলিনের জামা পরে বৈজয়ন্তীমালার টুলের উপরে কী নাচ। বৈজয়ন্তীমালারও ভিতরটা দেখেছিলাম। তারপর কয়েকদিন হারুদের বাড়ির স্পঞ্জ আমার

কাজে লেগেছিল। এমন সময় বাড়িতে সিনেমা। কাচের ভিতরে চোখ দিয়ে সাধনা-আশা পারেখ-বৈজয়ন্তীমালা দেখেছি। আর বোল রাধা বোল কিংবা ঝুমকা গিরারে করছি। ওই চোং-সিনেমাটার উপর আমার খুব লোভ হয়েছিল। বাবাকে বলে কোনও লাভ নেই, বাবা আবার প্যাঁদাবে। বাবার কাছ থেকে পয়সা চুরি খুব সোজা নয়। বাবা তো খুব ভোরবেলা বেরিয়ে যেত। তখন ঘুমিয়ে। যখন ফিরত, তখন স্কুলে। রবিবারে দুপুরটায় চৌকির উপর ঝুন ঝুন শব্দ পেতাম। ওই শব্দটা আমার খুব ভাল লাগত। ওটা পয়সা ভাগা দেবার শব্দ। দোকানের বিক্রির টাকা ভাগা দিচ্ছে বাবা আর মা। পাঁচ নয়ার স্তম্ভ, দশ নয়া—বিশ নয়ার। গোনা হয়ে গেলে একটা কাঠের আলমারির মধ্যে চাবি দিয়ে সেই চাবি আঁচলে ঝুলিয়ে রাখত মা। রাত্রে বাবা ফিরত বেশ রাত করে। বাবার পকেট কখনওই পেতাম না।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দুপুরে বাবা ঘুমুচ্ছে। আজ বিকেলে দোকান খুলবে বাবা, কোন বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ। মাসে এরকম দু-একবার সন্ধেবেলা বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে যেতেন বাবা। আমি বাবার পকেটে হাত দিয়ে যা আছে নিয়ে আসি। কিছু খুচরো পয়সা, বেশি না। তিন-চারটে টাকা, আধুলি হলেই কাজ মিটে যেত। খালি দশ নয়া-পাঁচ নয়া। একটা গোল মতো জিনিস পেলাম, সোনালি রাংতায় মোড়া। একে আমরা টাকা লজেন্স বলতাম। ঠিক একটা রুপোর টাকার সাইজ। সোনালি রাংতায় মোড়া। রাংতাটা খুললে ভিতরে একটা টাকা সাইজের চকলেট। এটা নিশ্চয়ই হারুর জন্য এনেছে বাবা। বাবা হারুকে এর আগেও চকলেট দিয়েছে। আমি ওই গোল জিনিসটা পকেটে পুরি। খুচরো চল্লিশ নয়া নি। আর একটা কাগজ ছিল ভাঁজ করা। কে জানে কেন খুললাম। দেখি আমার চেয়েও অনেক বাজে হাতের লেখায় লেখা একটা লাইন 'আজ সন্ধ্যায় আসিও'। আমি কাগজটা আবার ভাঁজ করে রেখে দি।

বাবা সন্ধের সময় চলে গেলে আমি চকলেটের চাকতিটা খুলি। হালকা কেন? খুলি। দেখি বেলুন। গোলাপি রঙের অনেক বড় বেলুন। ওটা ফোলাই। বস্তির অন্যরা হাসাহাসি করে। একজন জিজ্ঞেস করল, কোথায় পেলি রে? বললাম, বাবা দিয়েছে। ওরা আরও হাসল।

সেদিন রাত্রে বাবা-মার ঝগড়ায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মায়ের কান্নাকাটির শব্দ শুনেছিলাম। পরদিন দোকানে যাবার সময় বাবা বলেছিল কোনও দিন পকেটে হাত ঢুকিয়েছ কি থাপ্পড় মেরে দাঁত ভেঙে দেব।

তারপর একদিন মামার বাড়ি থেকে হারুর টিনের সিনেমাটা চুরি করেছিলাম। হারু খুব দুঃখ পেয়েছিল। আমাকেই সন্দেহ করেছিল। কারণ আমি খুব বেশি ঘুরঘুর করছিলাম সেদিন। হারু ওটা কোথায় রাখত আমি জানতাম। হারুর সেদিন জ্বর। খুব জ্বর। জ্বরে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি ওই সিনেমাটা ঝেড়ে দিয়েছিলাম। হারু জ্বর থেকে উঠে আমায় স্কুলে ডেকে বলেছিল আমার সিনেমাটা দিয়ে দে। আমি বলেছিলাম, মুখ সামলে কথা বলবি। আমি চোর? কী যা-তা বলছিস। আমাদের ব্যাকরণ বই থেকে অনেক প্রবাদ মুখস্থ করতে হয়েছিল। তার মধ্যে একটা ছিল চোরের মায়ের বড় গলা। সেই কথাটার মানেটা খুব ভাল করে বুঝেছিলাম সেদিন।

এর পর থেকেই হারু আমার সঙ্গে কথা বলত না, এড়িয়ে থাকত। আমিও বলতাম না। হারুকে স্যারেরা ভালবাসত। হারু হায়ার সেকেন্ডারিতে স্কলারশিপ পেল, প্রেসিডেন্সিতে ভরতি হল। তারপর আমেরিকা চলে গেল। ও যেদিন আমেরিকা যায়, আমি এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, আমি গোপনে সেই জল মুছে নিয়েছিলাম হাতের চেটোয়। আমি বলেছিলাম, চিঠি দিস। ও দেয়নি। এর পর তিন বছর পর ও যখন এসেছিল, ওর গায়ে অন্যরকম গন্ধ, অন্যরকম রং। ওর কথা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল। ও নায়েগ্রার ছবি দেখিয়েছিল, শিকাগোর রাস্তা, ওয়াশিংটনের মূর্তি। যখন ফিরব বলে উঠলাম, একটা ডট পেন আর এক মুঠো চকলেট দিয়েছিল। আমি নিইনি, রেখে এসেছিলাম। তখন হারুরা জেলেপাড়া বস্তিতেই থাকে। বস্তির সবার জন্যই নিয়ে এসেছিল একটা করে ডটপেন আর একপাতা চকলেট। আমার জন্যও

এই। ও ভুলে গেছে আমার বাবা ওর বাবাকে পুলিশের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল। আমি দেখতাম, বস্তিতে, বস্তির বাইরে, বড়মামাকে দেখিয়ে লোকে বলত—ওই যে, ওর ছেলে আমেরিকা থাকে।

কিছুদিন পর হারুরা কাঁকুড়গাছিতে ফ্ল্যাট কেনে। চলে যায়। হারু বড়মামাকে চিঠিতে লিখত, ওই দোকানে আর বোসো না । মামা তবুও দোকানে যেতেন। তারপর ছোট্ট একটা হার্ট অ্যাটাক হবার পর দোকান যাওয়া বন্ধ করে দিলেন মামা। মামা একদিন আমাকে বলেছিলেন, হারু বলছে একটা গাড়ি কিনতে। গাড়ি কিনে কী করব বল? ওই দোকানটায় অবশ্য আবার যাওয়া যায়। আমি বলেছিলাম, এটা কি ভাল দেখাবে? গাড়ি করে ওই ছোট্ট দোকানে যাওয়া? শেষ অব্দি বড়মামা দোকানটা বিক্রি করে দিলেন। আমার বন্ধুই কিনেছে। গোপাল। গোপাল ওটাকে স্টেশনারি দোকান করল। ছোটর মধ্যে সাজিয়েছিল ভালই। কাচের জারে ভরতি থাকত বাদাম, কাজুবাদাম, চানাচুর, লজেন্স, কেক। এখন গোপালের দোকানে শূন্য জার । গোপালের জামার বোতাম ছেঁড়া। কাঁচাপাকা বুকের লোমে হাহুতাশের হাওয়া। মন্দিরে বেড়াতে আসা কিশোরীদের ফাউ দিয়ে ফাউ দিয়ে সমস্ত জার শেষ।

কাঁকুড়গাছি যাবার পর মামাবাড়িতে কমই গেছি। মামাবাড়িকে আর মামাবাড়ি মনে হচ্ছিল না। ফ্রিজে বোতল ভরা অরেঞ্জ-পাইনাপেল। পাপোশ থেকে বাথরুম পর্যন্ত কোথাও জেলেপাড়া নেই। মামা-মামিকে হারু আমেরিকা নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে মাস তিনেক ছিল। মামিমা ওখান থেকে নিয়ে এসেছিল কাঁড়ি কাঁড়ি সুখের গল্প। এতটা পুত্র-গর্ব আমার মায়ের মনেও ঈর্ষা জাগিয়েছিল, আর আমার মায়ের ঈর্ষা বুঝতে পেরে মামিমা আরও সুখী হয়েছিল। মামিমা খাবার সময় সাবানে হাত ধুয়ে খাওয়া অভ্যেস করেছিল বলে মা হাসাহাসি করত। কথায় কথায় 'নো প্রবলেম' রপ্ত করছিল মামিমা। আমার মাকে একটা বিদেশের শাড়ি দিয়েছিল মামিমা। বলেছিল এটা জাপানি সিমপেথিক্ শাড়ি। সিনথেটিক বোঝাতে চেয়েছিল মামিমা। আর আমার মামা কোনও কিছু জানি না বোঝাতে দু' পাশের কাঁধ উঁচু করে দিতেন।

হারু ওখানে চাকরি পালটেছে, আরও বড় চাকরি পেয়েছে খবর পেয়েছি, মেম বিয়ে করেছে সে খবরও পেয়েছি। মেম বউ নিয়ে হারু কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাটে এসেছে সে খবরও পেয়েছি, মেম বউ নিয়ে মামা-মামি গোচারণে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে এসেছে সে খবরও শুনেছি, কিন্তু আমি হারুর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। কেন যাব? ওইসব কথা শুনতে! মামিমা একদিন বলেছিলেন, আগে তো গোচারণের কেউ আসত না, এখন আসে। হারু পার্সেল পাঠায় তো...। এটা 'গোচারণ' বললেও আমার গায়েও লাগে।

আচ্ছা, এটাই কি কারণ ছিল মামাবাড়ি না যাবার? আজ এইখানে মেঘলা দিনে কেমন যেন ভাবতে ইচ্ছে করল। আজ আমার গাড়ি গেছে হারুকে আনতে এয়ারপোর্টে। আমার বাড়ির ছাতের অ্যান্টেনায় আটকায় পেটকাট্টি ঘুড়ি। কেন যেতাম না? আসলে নিজেকে খুব ছোট লাগত, ছোট।

হারুর একটা বোন হয়েছিল। অর্চনা। হারুর চেয়ে দু' বছরের ছোট। অর্চনার যখন ষোলো বছর, শেতলা মন্দিরের পিছনে লেদ মিস্ত্রি গ্যাঁড়ার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। গ্যাঁড়ার সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। হারু তখন প্রেসিডেন্সিতে। ওর তখন খুব মন খারাপ। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা নেই, সেই সিনেমাবাক্স চুরির পর থেকে। হারু খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, আমি একদিন ওর পিঠে হাত দিয়ে বলি—হারু, যার ভাগ্যে যা আছে...। হারু আমার কাছ থেকে ছিটকে সরে গিয়েছিল। সেই গ্যাঁড়া এখন একটা লেদের কারখানা করেছে নিজের। মিঠুন-জয়াপ্রদা নাইট হলে দুশো টাকা দিয়ে টিকিট, কিংবা দেড়শো টাকা কেজির চিতল মাছের পেটি কেনার গল্প করে।

কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাটে গ্যাঁড়া আর অর্চনা প্রায়ই যেত। বিজয়ার পর আমি একদিন গেছি, অর্চনা বলল, একটা জিনিস খাবি, কোনও দিন খাসনি। দাদা পাঠিয়েছে, দাঁড়াও করে দিচ্ছি। একটা টিন

থেকে নরম, সাদা সাদা একটা জিনিস বার করল। আমি বললাম, কে বলল কখনও খাইনি? এটা তো চিজ।

ততদিনে আমিও মানুষ হয়েছি। আমিও শিখে গেছি স্কুটারের ক্র্যাচ আর গিয়ারের কায়দা। ততদিনে আমি বিমল রায়ের সিমেন্টে গঙ্গামাটি মেশানোর কারবারে ভিড়ে গেছি।

বউ-বাচ্চাকে নিয়ে গেলাম একবার। তখনও অর্চনা। ওর ফোপড়দালালিটা একেবার সহ্য হয় না আমার। অর্চনা বলল—বউদি এসপেডি খাও। দাদা এনেছিল। মা এটাকে দুধ দিয়ে ফুটিয়ে পিঠে করে। ঝাল ঝালও খাওয়া যায়—টোব্যাস্কো সস্ দিয়ে খাবে? এই বলে একটা প্যাকেট দেখাল। দেখি লেখা স্পিগেডি। আর সস্টা 'টোব্যাস্কো'। মেড ইন ইটালি। দাঁড়াও, এর সঙ্গে টুনি মাছও দিচ্ছি। এই বলে একটা টিন দেখাল। টুনাফিশ্। ওই সব খাওয়াল। ভালই খেতে, তবু অনেকটা ফেলে দিলাম। বললাম, ভাল লাগছে না। অর্চনা বলল, টুনি মাছে গন্ধ লাগছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। অর্চনা বলল, অভ্যেস হয়ে গেলে আর গন্ধ লাগে না, বরং ভাল লাগে। তারপর অর্চনা আমার বউয়ের হাতে একটা শিশি গুঁজে দিয়ে বলল, খুব ভাল সেন্ট বউদি, মেড ইন ফ্রান্স।

ততদিনে আমি মামলেটকে ওমলেট আর সেন্টকে পারফিউম বলতে শিখে গেছি। জালখাবারকে কখন স্ন্যাকস বলতে হয়, তাও।

এরপর বহুদিন মামাবাড়ি যাইনি। তবে যোগাযোগটা ছেড়ে দিইনি। আমার বাড়িতে ফোন আসার পর মাঝে-মাঝেই ফোনে খবর নিতাম। তারপর যখন সিমেন্টের লাইন ছেড়ে হাত ধুয়ে ফেলে প্রোমোটারিতে এলাম, গাড়ি কিনলাম, তখন মামিমাই ফোন করতে লাগল আমায়। কেমন আছিস, কী খবর, বহুদিন আসিস না, আয়...। হারুর সঙ্গে কিন্তু দেখা হয়নি আমার আর। সেই যে এয়ারপোর্টে, সেই শেষ!

ভল্টু আমার পাশে এসে বসল। একটা সিগারেট ধরাল। বলল, বহুদিন পর সব আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখাটেখা হচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ।

তুই তো সল্টলেকে বাড়ি করেছিস, তাই না?

সল্টলেক নয়, কেষ্টপুরে—

ওই কাছাকাছিই হল। ভেরি গুড। কদ্দিন হল?

বছর দুই।

জেলেপাড়া ছেড়েছিস তো অনেক দিন...

বাবা মারা যাবার পর। বছর পাঁচ...

তোর বাবার শ্রাদ্ধে তোর সঙ্গে লাস্ট দেখা ...

হুঁ

খুব খরচ করেছিলি । কিন্তু ক্যাটারার ভাল ছিল না।

হুঁ

গাড়িটা তো জেলেপাড়ায় থাকতেই...

হুঁ। বাবা দেখে গেছেন।

মেসোমশাইয়ের শরীর খারাপের খবর তো তুই আগেই পেয়েছিলি।

হ্যাঁ। মামিমা বাড়িতে ফোন করেছিল...

তুই গিয়ে বেঁচে থাকা অবস্থায়...

দেখেছি। আমিই আমার গাড়িতে নার্সিংহোম নিয়ে যাই।

আমায় কেউ খবর দিল না। আমারও তো ফোন ছিল।

জানি না তো...

নম্বরটা লিখে নে। আচ্ছা, কার্ড দিচ্ছি।

কার্ড পেলাম। চ্যাম্পিয়ান ক্যাটারার। 12/A/2D বেনিয়াপাড়া লেন। ফোন নম্বর...

আমি বললাম এটা তোর কোম্পানি।

হ্যাঁ।

কার্ডে তোর নাম দিসনি কেন?

আমার ভাল নাম জানিস না? ভোলানাথ মণ্ডল।

তো?

লোকে ডাকবে? মণ্ডল দেখলেই এখনও...একচুয়ালি এটা তো ছিল বামুনদেরই কাজ...।

ওই লোকটা এসে গেছে। আমি আজ নিয়ে তিন দিন এখানে এসেছি। তিন দিনই এই লোকটাকে দেখলাম। এরকম দুপুরের দিকটাতেই আসেন। ম্যানেজারের ঘরে দু' মিনিট বসেন। একটা সিগারেট খান চুপচাপ, তারপর ওই অন্ধকার অন্ধকার ঘরটায় চলে যান, ওই ঠান্ডা মেশিনটার কাছে দাঁড়ান। 'জন' নামের যুবকটি এসে যায়, গালে চাপদাড়ি। জন চাকা ঘোরায়, ড্রয়ারের ঢাকনি খুলে যায়, ড্রয়ারটা এগিয়ে আসে। ঠান্ডায় নীল হওয়া একটি হিম নারী। লোকটি তাকে স্পর্শ করে থাকেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর সেই ঠান্ডা হাতের দিকে ঝুঁকে পড়েন, ঠোঁট ছোঁয়ান। চুম্বন করেন। তারপর ড্রয়ার সরে গেলে, দরজা বন্ধ হয়ে গেলে লোকটির চোখে কাতরতা থেমে থাকে। লোকটির বয়স ষাট ছাড়িয়েছে মনে হয়। জন বলে—প্লিজ রিমুভ ম্যান, শি ইজ ডিকেয়িং। লোকটা বলে, ওয়ান ডে, জাস্ট ওয়ান ডে মোর। প্লিজ।

ছাড়তে চায় না, ছাড়তে চায় না কিছুতেই।

ভল্টুর বউ দুটো সন্দেশ নিয়ে এসেছে। মামিমাকে খাওয়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। মামিমা কিছুতেই খাবে না। অর্চনা একটা সোফায় চোখ বুজে আছে, অর্চনার কিশোরী পরিচারিকা অর্চনার মাথা টিপে দিচ্ছে। অর্চনা চোখ খুলল। মেয়েটাকে বলল—আমার ব্যাগটা দে তো জবা, দেখি ওডিকোলন আছে কি না, ওটা হলে মাথা ধরাটা কমত...।

দেখ অর্চনা, আমাকে স্পেগেডির সঙ্গে যে মাছ খাইয়েছিলি, ওটা টুনি নয়, টুনা। অনেক পরে জেনেছি, শোন, দেখে রাখ, এখন আমার বাড়িতে ছাতে টিভির অ্যান্টেনায় ঘুড়ি আটকে যায়।

মামিমা আমাকে ডেকে পাঠালেন ভল্টুর বউমাকে দিয়ে। বললেন, এয়ারপোর্টে আর একবার ফোন করতে। আর বললেন ফুল এনেছি কি না, আর জিজ্ঞেস করলেন কাগজে দিয়েছে কি না!

ফুল তো প্রচুর আনা হয়েছে। মাটাডর ভরতি ফুল। কিন্তু খবরের কাগজে কিছু দেওয়া হয়নি।

মামিমা এখন আমাকেই দায়িত্ব দেন। বলা যায় আমিই এখন গার্জিয়ান। আমি জানি আমার এই ক্ষমতার উৎস আমার টাকা। টাকার গায়ে এক নম্বর দু'নম্বর লেখা থাকে না। মা গঙ্গা আমাকে অনেক টাকা দিয়েছিলেন। সিমেন্টে গঙ্গামাটি পাইল করে অনেক কামিয়েছি। এখন হাত ধুয়ে নিয়েছি আমি। নন্দনকানন এন্টারপ্রাইজ। আমার প্রোমোটারি বিজনেস।

পাঁচ বছর আগে বাবার শোক সংবাদ ছাপার মতো টাকা আমার ছিল। ছাপাইনি। আসলে এসব ব্যাপার মনেই আসেনি।

তো কী লিখি? সমাজসেবীর মৃত্যু। শ্রীপশুপতি খামারু ছিলেন জনদরদী...। জনদরদীই তো। মাঝে মাঝেই কাঁকুড়গাছির ওই সাজানো ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতেন বরানগরের জেলেপাড়ায়। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে, তাদের সঙ্গে গল্প করতেন, মুড়ি বেগুনি খেতেন। এক কথায় এটাকে কী বলা যায়? দু'জন যক্ষা রোগীকে দুধ খাবার টাকা দিতেন। এটাকে কী বলা যায়? এসব কি আমি পারি? ছেলের দ্বারাও হবে না। ও আবার ইংলিশ মিডিয়াম। বাংলায় উইক। ভাবছি কী করব। দালাল পাওয়া যায় না? লোক পাওয়া যায় না কাগজের অফিসে? পোস্ট অফিসে তো পাওয়া যায়, লিখে দেয়। কোর্টে পাওয়া যায়। কাগজের অফিসে থাকে না?

ভল্টু এল। বলল—সব আত্মীয়স্বজনকে শ্রাদ্ধে বলতে হবে। হারু তো কিছুই জানে না, আমি ঠিকানা জানি কি না...।

একটা পয়েন্ট। শোক সংবাদে যদি বলে দি—অমুক তারিখ অমুক স্থানে শ্রাদ্ধবাসর...

মনে মনে কাটাকুটি অথবা সংশোধন চলছে, এমন সময় ছেলে এল। বলে, বাবা, একটা কোক খাব। খুব তেষ্টা পেয়েছে। দেখ, দেখ হারু, আমার ছেলেও তেষ্টা পেলে কোক খায়। আমি তখন কাগজে ড্রাফট করছি। বললাম, প্লিজ ওয়েট। দিচ্ছি। ও অমনি আমার পকেটে হাত ঢোকাল। খুব রেগে গেলাম। বললাম, বলেছি না আমার জামার পকেটে কক্ষনো হাত দেবে না, নেভার। যা লাগবে আমাকে বলবে।

একবার হয়েছিল কী, আমার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ও একবার সাট্টার স্লিপ পেয়ে গিয়েছিল। পুরনো অভ্যেস, ছাড়তে পারিনি। ও অবশ্য বোঝেনি। ইংলিশ মিডিয়াম!

আমি ওকে টাকা দিলাম। ভল্টু বলল, সত্যি তোকে দেখে শেখার আছে। এইসব হ্যাবিট কত ভাল। আমাদের ছেলেদের এইসব জানা দরকার। তোর ছেলেকে তুই খুব ভাল ট্রেনিং দিচ্ছিস...।

ভল্টু কি আমাকে তেল দিচ্ছে?

এখানকার টেলিফোনটা কাজ করছে না। ফোন করতে বাইরে যাই। ফোনে জানলাম প্লেন নেমে গেছে। তা হলে আসছে। পঁচিশ বছর পরে দেখব হারুকে। হারুর মেম বউকে দেখব, হারুর সন্তানদেরও। ওর বাচ্চারা আমাকে আংকেল ডাকবে। ওদের কথা কি বুঝব আমি? ছেলেকে সঙ্গে সঙ্গে রাখব। ছেলেকে বলব, হারুর বাচ্চাদের সঙ্গে ফ্লুয়েন্ট ইংলিশে কথা বলবি, মোটে ভয় করবি না, আর হারু, সে তো তোর কাকু। ভাব করে ফেলবি। আমেরিকা গিয়ে পড়াশুনো করতে ইচ্ছে হয় তোর বাপ্পা?

ফুটপাথে খেলনা বিক্রি হচ্ছে। হরেক খেলনা। আমি দাঁড়িয়ে যাই। পেটটেপা পুতুল, ডুগডুগি হাঁস। হি ম্যানও আছে। প্লাস্টিকের কর্ডলেস ফোন, পেজার, ক্যামেরা! আচ্ছা ওটা কী? সিনেমা? সেই সিনেমা? চোখে লাগিয়ে দেখার সেই সিনেমা? হারুরে...! আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ি, কাচে চোখ লাগিয়ে দেখি অমিতাভ বচ্চন ঝাঁপ দিচ্ছে।

বাক্সটা টিনের নয়, প্লাস্টিকের। সেই চোখে লাগালে সিনেমা।

কী কী ফিলিম আছে? বলি আমি—ও একটা প্লাস্টিকের বাক্স খুলে সেলুলয়েড সম্ভার দেখায়। আমি রাস্তায় বসে যাই। ভিজে রাস্তার ট্রাক কাদা ছেটায়। আলপনা। আমি সাদা শূন্যতায় ফিলিম গুঁজে দি । মিঠুন। দেখি অমিতাভ, দেখি রেখা, শ্রীদেবী, সঞ্জয়, ডিম্পল...এখনকার সবাইকে চিনি না । খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাই রাজ কাপুর। ওই তো মেরে মন মে গঙ্গা। ওই তো ডম ডম ডিগা ডিগা। ওই তো জেলেপাড়ার বস্তি , ওই তো বুড়ো হজমিওলা। গৌরের ঘুগনি । হারু ইস্কুলে যাচ্ছে, টিলে প্যান্ট, বগলে অঙ্ক খাতা । সব অঙ্ক রাইট। এক পলকে একটু দ্যাখা, আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কী। এটা কে? ছবি বিশ্বাস? এটা জহর রায়! ট্রামের হলুদ টিকিট। উত্তরা পূরবী উজ্জ্বলা। লিলি বিস্কুট। জনিওয়াকার না! টুনটুন? শাম্মি কাপুর? চাহে মুঝে কোই জংলি কহে...চেঁচিয়ে উঠলাম ইয়া...হু...।

দাও দাও। ওই ফিলিমগুলো সব দাও। ও আমাকে একটা গোলাপি পলিথিনে ভরে দেয়।

আমি পিস হাভেনে ফিরে গিয়ে আমার ছোট্ট এটাচিতে ভরে রাখি ফিলিম সম্ভার। মামিমাকে বলি, ওরা আসছে। অমনি শোরগোল পড়ে যায়। ভল্টুর বউ চুল ঠিক করে। অর্চনা ওর ছেলেকে ডাকে। বলে, বাচ্চাগুলোর সঙ্গে কথা বলবি, ভয় পাবি না। আমি সিঁড়িতে বসি, সিঁড়িতে ফুঁ দিলাম না।

ভল্টু এল। আমার পাশে বসল। বলল—বৃষ্টি হল, তবু দ্যাখ গরম কমল না। একটা সিগারেট দিল আমায়, তারপর ও নিজে ধরাল। রিং ছাড়ল। তারপর বাঁ হাতে নিজের তৈরি রিং ছত্রাখান করে বলল, শোন তোকে একটা কথা বলি। ভল্টু আমার আরও কাছে সরে আসে। বলে দ্যাখ—শ্রাদ্ধটাদ্ধর ব্যবস্থা তো আমাদেরই করতে হবে। বলছিলাম কী, শ্রাদ্ধের ক্যাটারিং-এর কাজটা আমিই ভালকরে করে দেব । অন্য কাউকে বলার দরকার নেই। আমার বলাটা তো ভাল দেখায় না , তুই যদি...

এতক্ষণ একটা মতলব ডিপ ফ্রিজে শুইয়ে রেখেছিল ভল্টু, এবার বার করল।

আমি মৃদু ঘাড় নাড়ি।

ভল্টু আবার বাইরে দাঁড়াল গেটের সামনে।

আমিও বসে আছি। আমার কোলে অ্যাটাচি। ভিতরে গোলাপি পলিথিন, তার মধ্যে আনন্দ। হারুর নিশ্চয়ই ভি ডি ও ক্যামেরা আছে, ভি সি পি , ভি সি আর, প্রজেকটার সবই আছে । কিন্তু ছোটবেলার সিনেমার বাক্সটা হারানোর দুঃখটাও কি নেই? ও কি যত্ন করে রাখেনি সেই দুঃখ?

কাজটাজ চুকে গেলে ওটা দেব। আমার বাড়ির ছাতে আটকে থাকা পেটকাট্টি ঘুড়িটা খুলে নেব, দু'হাতের উপর বসাব ওই ঘুড়ি, তার উপরে এই সিনেমা বাক্স। বলব, গ্রহণ কর।

তোর চোখে লাগিয়ে দিচ্ছি এই কাচ। তোর গায়ের থেকে মেড ইন ফ্রান্স পারফিউম নয়, ডাংগুলি খেলাফেরত ঘামের গন্ধ পাচ্ছি আমি। আমরা হাফ প্যান্ট পরা দু'ভাই রঞ্জনের মাখম রুটির ভাগ পাই। দ্যাখ দ্যাখ হারু, শাম্মী কাপুর, দ্যাখ দ্যাখ হারু উত্তরা পূরবী উজ্জ্বলা, দ্যাখ দ্যাখ কাঁচি পাগলা, ভূপে দা, পটলার চপের দোকান,জেলেপাড়া দ্যাখ, দ্যাখ, তুই ফার্স্ট হয়েছিস বলে বন্ধুদের বোঁদে খাওয়াচ্ছে বড়মামা। হারু, একবার চিল্লিয়ে বল, বল মাইরি ইয়া-হু।

ওরা এল।

শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৯৯৬

ধর্ম

রুপুর মা ম্যাজেনাইন ফ্লোরে থাকেন। ঘরের হাইট কম, তাই দরজার ফ্রেমও ছোট। তাই 'মা ভাল আছ?' বলতে গিয়ে মাথা ঝোঁকাতে হয়। আজও দরজার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে কথাটা ছেড়ে দিয়েই উপরে চলে যাচ্ছিল। রোজই তাই করে রুপু। 'কিছুই খেতে ইচ্ছে নেই, ঘুম নেই, গা জ্বালা, আর পারি না' এইসব এক কথা রোজ শুনতে ইচ্ছে করে না। রুপু চলে যায়, রুপুর মায়ের কথা চলতেই থাকে। আজ যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই মায়ের জন্য রাখা আয়াটি বলল মাসিমার আজ শরীর খুব খারাপ। বমির সঙ্গে রক্ত গেছে।

বেশ হয়েছে। রুপু মনে মনে ঝাঁঝিয়ে ওঠে। জুতোর শব্দ খটখট উপরের দিকে চলে যায়।

আজ দু'বছর ধরে এইসব চলছে। গ্যাস অম্বলের ধাত বহুদিনই। ছোটবেলা থেকেই লম্বা লম্বা ঢেঁকুর তুলতে দেখেছে রুপু। গাদাগাদা জেলুসিল, অম্লজিন, আমলকীর বড়ি, ভাস্কর লবণ ইত্যাদি নানারকম জিনিস চানু সাপ্লাই করে গেছে। বাবা মারা গেছেন বছর পাঁচেক হল। তারপরই রুপুর মা একটু বেশি শুচিবাইগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কোনও বউ কিছু খাবার নিয়ে এলে আগে জেনে নিতেন 'শোয়া কাপড়ে' আছে কি না। সকালে উঠে স্নান, দুপুরে স্নান, বিকেলে স্নান। ঘরে ওঁর বিছানায় বাইরের কেউ বসতে পারবে না। একদিন এরকমও হয়েছে, মা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, রুপুর বউ গায়ে হাত বুলোতে গেল, রুপুর মা বললেন কী শাড়ি? রুপুর বউ বলল, ধোয়া শাড়ি মা। মা বললেন, আমাকে ছুঁয়ো না , আমি অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছি । এর পরেও কি কোনও বউ সেবা করবে? রুপুর মা বলতেন, আমার কিছু দরকার নেই। সারাটা জীবন সংসারের জন্য করেছি, কোনও প্রতিদান আশা করি না। নিজের রান্নাটা নিজেই করতেন। গত দু'বছর ধরেই আর পারছেন না। বছর খানেক আগেই ধরা পড়ল গলব্লাডারে স্টোন হয়েছে, অপারেশন হল ছ'মাস আগে। এবং স্টোন অপারেশন করতে গিয়ে ধরা পড়ল ক্যানসারও রয়েছে। তারপর কেমোথেরাপি ইত্যাদি। খুবই ব্যতিব্যস্ত রুপু। বহুদিন কোথাও বেড়াতে যেতে পারেনি, বহুদিন বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব ডেকে হই হই করতে পারেনি। মেয়েটার জন্মদিনও নমো নমো করে সারতে হয়েছে, এসব কারণে রুপুর মনটা একটু খিঁচোনোই থাকে। তা ছাড়া অফিসেও ঝামেলা চলছে। লোক কমে গেছে বলে খাটুনি বেড়েছে খুব, তা ছাড়া রুপুর আন্ডারে কাজ করত একটি মেয়ে, সে এস সি কোটায় প্রোমোশন পেয়ে রুপুর বস হয়ে গেছে। আজ একটু হুইস্কি চড়িয়ে এসেছিল রুপু। জুতোটা খুলতে খুলতে শুনছিল সাগা মাগা মাগারে নিসা। শুক্লা রেওয়াজ করছে। ভীমপলশ্রী। ভীমপলশ্রীর মধ্যেই রুপু বলল, মায়ের রক্তবমি হয়েছিল? মাপা গামা পানি সা নি ধাপা। হ্যাঁ। হাসিদি বলছিল। সাগা মাপা মাগারে নিসা। বেসিনে মুখে জলের ঝাপটা দিল রুপু। মুখটা ভাল করে কুলকুচি করল। তারপর মায়ের ঘরে গেল রুপু। রাত ন'টা। নীল আলো জ্বলছে। মায়ের কপালে হাত রাখল রুপু। কপালে একটা হাত বুলিয়ে দিল। আসলে ওর হাত বলার চেষ্টা করছিল সবসময় মেজাজটা ঠিক রাখতে পারি না মাগো। রুপু শুনল ওর মা বলছে জল খাব।

হাসি নামের আয়াটি, বছর পঞ্চাশ বয়েস হবে, বাটিতে জল নিয়ে ঝিনুক দিয়ে রুপুর মায়ের মুখে জল দিল। মা বলল, অণু, তুই এতদিন পরে এলি? ভাল আছিস মা?

হাসিদি বলল, মাসিমা এখন আবার আমাকে অণু অণু ডাকছে। ওপর থেকে ভেসে আসা ভীমপলশ্রী মাখানো নীল আলোয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল হাসি।

অণু হল রুপুর দিদি, রুপুর চেয়ে বছর তিনেকের বড়। রুপুর মা প্রীতিলতার তিন সন্তান ছিল। রুপু, চানু আর অণু। রূপক, চম্পক আর অণিমা। অণুই সবচেয়ে বড়। বিয়ে হয়েছিল দিল্লিতে, ছেলেমেয়েরা ওখানেই পড়ে। হঠাৎ মেনিনজাইটিসে মারা গেল প্রীতিলতার অপারেশনের দু'সপ্তাহের মধ্যেই। প্রীতিলতাকে জানানো হয়নি। ক'দিন আগে অণুর স্বামী এসেছিল। প্রীতিলতা শক পাবে বলে কিছু বলেনি। ছেলেমেয়ের পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত বলে অণু আসতে পারছে না এরকম কথাই বলেছে অণুর স্বামী। প্রীতিলতার মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিল। কতদিন বলেছে, অণুটা একটিবারের জন্যও দেখতে এল না, আমি বুঝি ছেলেমেয়ে মানুষ করিনি! গলব্লাডার অপারেশন করে যখন ফিরে এসেছিল, তখন রুপু একটা মিছিমিছি চিঠি সামনে নিয়ে বলেছিল, দিদির চিঠি। পড়ে শুনিয়েছিল, মাগো, তোমার অপারেশনের খবরে বড় চিন্তিত আছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। আমি বড় ঝামেলায় আছি। সময় পেলেই আমি আসব। এর পর আর পড়তে পারেনি রুপু। কান্না চাপতে বড় কষ্ট হচ্ছিল।

কিছু দিন পর চিঠিটা আবার দেখতে চেয়েছিল প্রীতিলতা। কিন্তু রুপু তখন চিঠিটা খুঁজে পায়নি। তবে মাঝে মাঝে বলেছে, দিদি ফোন করে খোঁজ নিয়েছিল। ভাগ্যিস ফোনটা উপরে, ম্যাজেনাইনে নয়।

ম্যাজেনাইন ঘরকে ওরা বলে দেড়তলার ঘর। দেড়তলার ঘর থেকে উঠে ফোন ধরা প্রীতিলতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেড়তলার ঘরে ফোনের শব্দঝঙ্কার শোনা যায়। মাঝে মাঝেই প্রীতিলতা বলতেন—ওই, বোধহয় অণুর ফোন এল।

অপারেশনের পর থেকেই আয়া রাখা হচ্ছে। দু'বেলার দু'জন। কাছেই একটা এজেন্সি আছে, রেডক্রশ লাগানো, 'নিবেদিতা নার্স সেন্টার', ওরাই আয়া সাপ্লাই করে। আগে দু'বেলায় দু'জন আসত। ওদের মধ্যে একজনের নাম হাসি, ওই হাসিকেই প্রীতিলতার বেশি পছন্দ। ঘোরের মধ্যে থাকলে প্রীতিলতা ওকে অণু বলে ভুল করে। ঘোর কেটে গেলে ভুল ভেঙে যায়, ওকে যে অণু ভেবেছিল, অণু ডেকেছিল, সেটাও ভুলে যায়।

প্রীতিলতার এখন কেমোথেরাপি চলছে। ফলে মাঝে মাঝেই জ্ঞান-অজ্ঞানের সীমার মধ্যে থাকছেন। আলো-আঁধারে। প্রীতিলতার প্রায় সব চুল উঠে গেছে। গায়ের চামড়ায় কালচে ছাপ। কেমোথেরাপি নিতে পারছেন না। যে-ডাক্তার কেমোথেরাপি করছেন, তিনি বেশ নাম করা ডাক্তার। বলেছেন কেমো যদি স্যুট করে তবে বছরখানেক ভাল থাকবেন। কিন্তু যা সব হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে কেমোথেরাপি স্যুট করছে না। ডাক্তার এসেছিলেন বাড়িতে। পাঁচশো টাকা ভরা খামটা খুব নির্লিপ্তভাবে বুকপকেটে ঢুকিয়ে বলেছিলেন, কেসটা আর তত হোপফুল নেই।

রুপু জানে ডাক্তাররা এর বেশি বলেন না। গত ছ'টা মাস ভীষণ চাপ চলছে রুপুদের। রুপু বড়ছেলে হওয়াতে ওরই দায়িত্ব বেশি। এরই মধ্যে দিল্লি যেতে হয়েছিল। মা-মরা ভাগ্নে-ভাগ্নিদের একটু দেখে তো আসতে হয়। চানুটা দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘোরে। ও খালি অফিস দেখায়। ট্যুর কি রুপুর নেই? রুপু তো মায়ের অসুখের কথা বলে ট্যুর-এ যায় না। প্রতি মাসেই একবার-দু'বার বাইরে যায় চানু। আর প্রতিবার না হলেও, প্রায়ই চানুর অবর্তমানে চানুর বউ বাপের বাড়ি চলে যায়। এখন যেমন চানুরা কেউ বাড়ি নেই। রুপু মনে মনে বলে—মা যখন মারা যাবে তখন যেন চানু বাড়ি না থাকে, চানু যেন দেখতে না পায়। মনে মনে এই যে প্রার্থনা, এই প্রার্থনা-বাক্যটির প্রথমেই হে ভগবান শব্দটি গুপ্তভাবে থেকে যায়, যদিও রুপু ভগবান-টগবানে বিশ্বাস করে না। কিন্তু যখন বায়পসি করতে দিল, রিপোর্ট পাবার অপেক্ষায়, তখন কালীমন্দিরের পাশ দিয়ে যাবার সময়েই কেন মনে আসত বায়পসি রিপোর্টটা যেন ভাল হয়। কিন্তু কালীমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কপালে আঙুল ছোঁয়ায়নি কখনও রুপু।

এখন বড্ড ঝামেলা মনে হচ্ছে। প্রতিদিন টেনশন। বাড়ি ফেরার পর প্রতিদিন নতুন নতুন মন খারাপ। জ্বর হয়েছে, কিংবা খুব ব্যথা, কিংবা গা কাঁপছে, কিংবা চানু চলে গেছে কিম্বা শুক্লা কাঁদছে।

শুক্লা আর পেরে উঠছে না । কতদিন আর ভাল লাগে! আয়া আছে যদিও, কিন্তু শুক্লা তো কোথাও যেতে পারছে না। বিয়ের আগে গ্রুপ থিয়েটারে ছিল, বিয়ের পরেও কিছুদিন অভিনয় করেছে। এখন করে না যদিও, কিন্তু নাটক দেখতে ভালবাসে। কতদিন নাটক দেখেনি শুক্লা। কত দিন নন্দন চত্বরে যায়নি। বাড়ির ঝক্কি আর টেনশন, দিনের পর দিন। তেমন কিছু হলে পাড়ার ডাক্তারকে খবর দেওয়া, ওষুধ বিষুধ আয়াকে বুঝিয়ে দেওয়া...।

আজ একটা প্যাকেট এনেছে রুপু। মাঝে মাঝে রান্না করা খাবার নিয়ে আসে, এতে শুক্লার কিছুটা খাটুনি কমে। একটা মাইক্রো-ওভেন থাকলে ভাল হত। মায়ের জন্য যদি এত টাকা খরচ না হত হয়ে যেত...। রুপুর খাবার ব্যাপারে কোনও প্রেজুডিস নেই সব খায়। শুক্লাও। ওরা ওদের প্রেম পর্বে কতদিন নিজাম-টিজামে গিয়ে বিফরোল খেয়েছে। বাড়িতেও এনেছে কয়েকবার। রুপু এ নিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন গর্বও রয়েছে। ওর প্রগতিশীল বন্ধুদের বলেছে, পারবি তোরা আমার মতো বামুনের বাড়িতে বিফ ঢোকাতে? ওদের ছেলে পুকু। পুকুকেও খাইয়েছে। যদিও বলেনি কিছু। পুকু জানে মিট। মিট খেতে ভালবাসে পুকু। পুকুকে এখন বলা যায় না। স্কুলে গিয়ে যদি বলে বাড়িতে বিফ খাই, স্কুলের বন্ধুরা, টিচাররা এটাকে ঠিকভাবে নেবে না। রুপু ওর কলিগদেরও বলে না। তবে প্রীতিলতার খাবারের সঙ্গে মেশায় না শুক্লা। প্রীতিলতার জন্য আলাদা রান্না। উনি মাছ খেতেন না। অসুখের আগে প্রীতিলতা একটা ছোট্ট গ্যাস বার্নারে নিজের নিরামিষ রান্না নিজেই করে নিতেন। এর পর শুক্লাই করে। এখন যেসব পথ্য খান প্রীতিলতা, শুক্লাই করে। ডালের জল, গলা ভাত, মাছের পাতলা ঝোল...। এখন তো ক'দিন ধরে ভাত-টাত খেতেই পারছেন না। হাসি নামে যে আয়াটি, ও দু'বেলাই থাকছে । রাত্রে প্রীতিলতার ঘরেই শুয়ে থাকে। রুপুরা যা খায়, হাসিও তাই খায়। বাইরের খাবার আনলেও ভাগ পায়। চিলিচিকেন—চাউমিন কিংবা বিরিয়ানি খেতে পায় হাসি। একবার পরোটা আর বিফ চাঁপ এনেছিল রুপু। হাসি দেখেছিল পলিথিন মোড়া প্যাকেট। প্যাকেট দেখলে হাসি হাসিখুশি হয়ে যায়। জিজ্ঞাসাই করে ফেলে, আজ কী আনিচেন?

চাউমিন খুব একটা পছন্দ করে না । বলে কেমন কেঁচোপনা দেকতি। বিরিয়ানি খুব পছন্দ। একদিন বলেছিল ওর মা নাকি ভাল বিরিয়ানি করতে পারত। কাঠকয়লার আঁচে বিরিয়ানি করার গল্প বলেছে হাসি। সেদিন যখন জিজ্ঞাসা করল, আজ কী আনিচেন? রুপু বলেছিল, এটা তুমি পাবে না হাসিদি।

হাসির একটা আলাদা প্লেট আছে । যখন প্লেটে খাবার দিচ্ছিল, শুক্লা আস্তে আস্তে হাসিকে বলেছিল—বাইরের খাবারটা তোমাকে আর দিলাম না হাসিদি । গলা নামিয়ে বলল, এটা কিন্তু গোরুর মাংস। কাউকে বলো না আবার।

হাসি বলেছিল, গরিবের আবার গোরু আবার ছাগল। আমাদের সবই অব্যেস আছে।

ক'দিন পরে একটু পোর্ক এনেছিল রুপু। শুক্লা খুব ভালবাসে এটা। চাংওয়াতে চিলিপোর্ক খেত ওরা মাঝে মাঝে। সেদিন হল কী, যখন হাসির খাবার বেড়ে দিচ্ছিল শুক্লা, হাসিকে বলল, আজও কিন্তু খারাপ মাংস। শুয়োর খাবে তো? হাসি কেমন যেন আঁতকে উঠল। হাসি বলল, তোবা, তোবা। তখন রুপুও ছিল সামনে। রুপু প্রথমে ভেবেছিল হাসি একটা ইয়ারকি করছে । কিন্তু যখন হাসি ওটা খেলই না, এমনকী রুটি তরকারিও খেল না, তখন একটু ধন্ধে পড়ল ওরা । শুক্লা জিজ্ঞাসা করল, রুটি খেলে না কেন? হাসি বলল, এমনি, খাতি ইচ্ছা নাই। বড় অ্যাসিড অম্বল হয়েছে। শুক্লাদের মনে হল ওই মাংসের ছোঁয়া লেগেছে বলেই হাসি রুটিও খায়নি।

হাসি মুড়ি খেল শুধু, একটা কালচে হয়ে যাওয়া কলা দিয়ে।

রুপুর সন্দেহ হল হাসি কি তবে মুসলমান? রুপু খবর কাগজের একটা ফিচারে পড়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে ট্রেনে চেপে অনেক মহিলারাই আসে ওদের নামটা ওদের নিজের গ্রামে জমা রেখে । ইউনিফর্মের মতো একটা নতুন নাম পরে নেয় ওরা । ফতেমারা প্রতিমা হয়ে যায়, মমতাজরা মুনমুন, জুবিলারা জবা। হাসি কি তবে অন্য কিছু?

রুপু হাসিনাকে দেখতে থাকে। রোগা শ্যামল মুখ, ঠিক ওর কোনও আত্মীয়রই মতো। একটা সবুজপাড়ের শাড়ি। এখানকার বিধবারা যেমন পরে। ওর মা-ও এরকমই শাড়ি পরে। হাতে কোনও চুড়ি নেই, শাঁখা নেই, পলা নেই। ওর মায়েরও নেই। বাটির ভিতরে একটা হাত শুকনো সাদা সাদা মুড়ি উঠিয়ে নিচ্ছে মুখে। মুখ নড়ছে, হাসিদির মাথাটা নিচু। চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে । কোথাও মুসলমান লেখা নেই।

হাসি চলে গেল, রুপু আর শুক্লার মধ্যে এরকম কথাবার্তা হয়।

রুপু—কিছু বুঝলে?

শুক্লা—কেমন যেন মনে হল।

রুপু—ও কি নাম ভাঁড়িয়েছে?

শুক্লা—এখন থাক।

পুকুর দিকে তাকাল শুক্লা।

শুক্লা আর রুপু নীচে নামল। ওরা দেখল মায়ের মশারি খাটিয়ে ফেলেছে হাসি। হাসি বসে আছে মশারির ভিতরে, মায়ের পাশে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে হাসি। কিন্তু হাসির মুখে হাসি নেই। গম্ভীর।

মা বলছেন, ক'দিন থাকবি অণু?

হাসি বলছে—তুমি ভাল হলে যাব।

কবে ভাল হব?

আর ক'দিন পরেই।

ভাত খেয়েছিস মা?

খেয়েচি।

কী দিয়ে খেলি?

ডাল, তরকারি, ভাজা...

মাছ ছিল না!

মাছও ছিল।

পেট ভরেছে?

হ্যাঁ গো মা।

তোকে আমি বাড়ির অংশ দেব।

হুঁ।

ফুলগাছ লাগাবি।

হুঁ।

ঠাকুরকে ফুল দিবি।

হুঁ।

ঠাকুরকে জল দিয়েছিস?

কোনও কথা বলে না হাসি।

রুপু দেখল ঠাকুরের তাকে জল ঢাকা।

ঠাকুর এখানেই থাকে। যখন প্রীতিলতা আর পারতেন না, তখন শুক্লাই এই কাজ করত। এর পর যখন আয়া রাখা হল, আয়াই করে।

ওরা উপরে চলে আসে।

রুপু শুক্লাকে বলল, ব্যাপারটা অন্যরকম লাগছে।

শুক্লা বলল, ওকে কাল জিজ্ঞাসা করব।

রুপু—কাল কেন? আজই

শুক্লা—এত ব্যস্ত হবার কী হল?

ঘুম হবে না নইলে।

কীসের টেনশন?

নাম ভাঁড়াবে?

আর ইউ শিওর?

অলমোস্ট! তুমি কী ভাবছ?

হতে পারে। কিন্তু তুমি কীভাবে শিওর হলে?

ওর তওবা তওবা শুনে।

কী নাম হতে পারে!

জানি না। তবে ও মুসলিম।

না হয় হল। কী হল তাতে? তুমি কি এসব মানো?

মানি না। একদম মানি না। তাই বলে মিথ্যে কথা বলবে?

অনেক মিথ্যে সত্যির চেয়ে বেশি সত্যি। ওর অণু হয়ে যাওয়াটা তো মিথ্যে। কিন্তু ওই মিথ্যেটা মার কাছে সত্যি না?

দ্যাটস ডিফারেন্ট?

কেন ডিফারেন্ট?

সেটা অন্য কথা। কিন্তু আমাকে ধোঁকা দেবে? তার মানে ও রিলায়েবল নয়। শি ইজ নট ট্রানসপারেন্ট। ও আমাদের রান্নাঘরে ঢুকছে, এর জন্য কিছু নয়, ওসব প্রেজুডিস আমার নেই। কিন্তু আমরা মাকে কী করছি? প্রতারণা করছি না? কিন্তু মা তো এসব মানেন। মায়ের সঙ্গে প্রতারণা করছি না?

শুক্লা কিছু বলে না।

রুপু বলে, ওকে একবার ডেকে নিয়ে এসো। ওর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলব।

হাসি আসে।

শুক্লা বলে, হাসিদি, সত্যি করে বলো তো তুমি কে?

আমি কে আবার? অ্যাটেনডেন।

অ্যাঁ!

অ্যাটেনডেন। আয়া।

রুপু বলে, তোমার ঠিক নামটা বলো। সত্যি কথা বলবে। মিথ্যে কথা বললে খুব খারাপ হবে।

খুব চেপে কথা বলে রুপু। কারণ তখন রাত হয়েছে বেশ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নেমেছে বাইরে।

আমার নাম হাসি।

সত্যি কথা বলো। ধমকে উঠল রুপু। কিন্তু জোরে না। তাই সত্যি কথা বলো শব্দ তিনটি কীরকম যেন হয়ে গেল।

আমি তো সত্যিই বলছি। আমার নাম হাসি।

তুমি হিন্দু না মুসলমান?

মোছলমান। মাথা নিচু করে বলে হাসি।

তা হলে বলছ যে তোমার নাম হাসি?

মোছলমান হলি হাসি হতে নেই? বাবা নাম রাখিছিল হাসিনা। কিন্তু হাসিই ডাকত কিনা। ইস্কুলেও হাসি নাম লেখা ছিল।

শুক্লা জিজ্ঞাসা করল, ইস্কুলেও পড়েছিলে বুঝি? কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলে!

কেলাশ ফাইব।

তা তুমি তো মুসলমান বলোনি তো কখনও?

কখনও নিকেশ করেননি কিনা। নিকেশ নিলেন , বল্লাম।

তুমি যে ঠাকুরের জল দিচ্ছ? অসুবিধা হচ্ছে না?

আমার কিসির অসুবিদে! আমার তো অসুবিদে নেই, ঠাকুরের অসুবিদে হলি অন্য কথা।

রুপু কোনও কথা বলে না। শুক্লাও চুপ। রুপু বলল, যাও, শুতে চলে যাও।

এবার? রুপু জিজ্ঞাসা করল শুক্লাকে।

শুক্লা বলে তুমি কী ভাবছ?

মেয়েটার কাজটা কিন্তু খারাপ না কী বলো!

শুক্লা বলল, চলুক না যেমন চলছে।

পরদিন রবিবার। চা খেয়ে থলে নিয়ে বাজার গেল রুপু। কিন্তু কোনও পরিকল্পনা ছিল না, তবুও নিবেদিতা নার্সিং সেন্টারে ঢুকল রুপু।

যে মোটা মতো মহিলাটি বসেছিল, ওর কাছেই পেমেন্ট করতে হয়। কমিশন কেটে রেখে বাকি টাকা নার্স বা আয়াকে দেয়। রুপুর সঙ্গে ভালই চেনা হয়ে গেছে ওই মোটা মহিলার। উনিই মালিক। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন কাজ করছে মেয়েটা?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রুপুই জিজ্ঞাসা করে—যাকে পাঠিয়েছেন ওর নামটা কী বলুন তো?

কেন, হাসি!

হাসি কী?

হাসি মণ্ডল।

ঠিকানা?

খাতা খুলে দেখতে হবে। কেন? পালিয়েছে! কিছু নিয়েটিয়ে গেছে?

না, ওসব কিছু না। ঠিকানাটা বলুন।

নবাবহাটি। হিঙ্গলগঞ্জ।

আগে কোথায় কাজ করত!

কেন কাজ কি ভাল করছে না? ও তো ভালই কাজ করে। ওর নামে তো ব্যাড রিপোর্ট নেই। আগে তো জুপিটার নার্সিংহোমে কাজ করত।

রুপু বলে, জেনে রাখুন ওর নাম হাসি নয়, হাসিনা।

ওই একই হল।

কী করে একই হল?

একটু শর্ট করে বললে হাসিনা তো হাসিই হয়। ডাক নাম।

জানতেন ওর নাম হাসিনা?

না। খাতায় তো হাসিই আছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কী হয়েছে?

ও তো মুসলমান। আমার মা তো বিধবা, নিয়ম মানেন। ঘরে ঠাকুর আছে ...

মোটা মহিলাটি মাথা চুলকোলেন। তারপর বললেন—সরি সরি। সেটা তো জানতাম না। লোক পালটে দেব। ভাল লোক দিয়ে দেব।

সকালবেলা উঠে হাসির স্নান সেরে নিতে হয়। ম্যাজেনাইন ফ্লোরে একটা বাথরুম বানানো হয়েছে প্রীতিলতার অসুস্থতার সময়। ওখানেই আয়ারা ওদের বাথরুম সারে। স্নান করার পর কাচা কাপড় পরে হাসির প্রথম কাজ হল ছাদ থেকে ফুল তুলে আনা। কয়েকটা জবা গাছ আছে টবে। সারা বছর ফুল ফোটে। আর আছে নয়নতারা। তারপর থালায় সাজিয়ে দেয়। প্রীতিলতা যদি ভাল থাকেন, তো নিজে উঠে ঠাকুরকে ফুল দেন। ঠাকুর বলতে কয়েকটা দেবদেবীর ছবি, আর পেতলের ছোট্ট একটা নাড়ুগোপাল । যদি ওঠার মতো অবস্থায় না থাকেন তা হলে যে আয়া থাকে, সেই দিয়ে দেয়।

আজও স্নান সারল হাসি। ফুলও তুলে আনল। তারপর কাপড়ও পালটে নিল। এবার শুক্লার কাছে গেল হাসি। বলল, দিদি, মাসিমা তো উঠতে পারবে না, ফুল দিতি হবে, কী করব!

শুক্লা বলল, দিয়ে দাও।

হাসিনা তাই করল। বাসি জল ফেলে দিল। বাসি ফুল তুলে নিয়ে প্রীতিলতার কপালে ছোঁয়াল, তারপর জড়ো করে রেখে দিল। ওই ফুল জঞ্জালের সঙ্গে যাবে না, ছাদের টবের মাটিতে মিশে যাবে। নতুন তুলে আনা ফুল দিল; প্রীতিলতা হাত জোড় করল, সেইসঙ্গে হাসিনাও। শুক্লা নীচে এসে এ-দৃশ্য দেখল । ঘরে ধূপের গন্ধ তখন। এবার মাকে বেড প্যান দেবে হাসিনা। হাসিনা এ সময় শুক্লাকে দেখতে পায়। বলে, সকাল ন'টায় ডিউটি শেষ। আর কী রাখবেন?

ন'টা থেকেই শিফট শুরু হয়।

শুক্লা বলল, তুমিই থাকবে।

রুপু ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরেই একটি নতুন মেয়ে এল। হাতে একটা কাগজ। বলল, ম্যাডাম-দিদি আমাকে পাঠালেন, এটা কি রূপক ব্যানার্জির বাড়ি? মেয়েটা বলল, হাসিদিকে ফিরে যেতে বলেছে ম্যাডাম দিদি। শুক্লা রুপুর দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকালে, রুপু বলল, আমি সেন্টারে গিয়ে বলে এসেছি।

শুক্লা একটু কপাল কুঁচকে রুপুর দিকে তাকায়।

রুপু ওদিকে না তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। নতুন আসা মেয়েটি হাতে কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাগজটা চেয়ে নিল রুপু। লেখা নতুন লোক পাঠালাম। হাসি মণ্ডলের কার্ডে সই করে পাঠিয়ে দেবেন।

রুপু মেয়েটিকে দেখতে থাকে।

সিনথেটিক ছাপা শাড়ি, হাতে কাচের চুড়ি, কপালে হলুদ টিপ, নাকে ছোট্ট একটা নথ, গোলগাল চেহারা, বছর তিরিশেক বয়স হবে।

রুপু জিজ্ঞাসা করল, কী নাম আপনার?

জরি।

পুরো নাম বলুন।

জরিনা।

জরিনা? জরিনা খাতুন?

না, বিশ্বাস।

মুসলমান?

হিন্দু।

হিন্দুর নাম জরিনা?

তা কী করব? বাংলাদ্যাশে ছিলাম কিনা! সেইখানে এইরকম নাম রাখে। হিন্দুরাও রাখে। সুবিধা আছে।

কী সুবিধা?

বুঝা যায় না।

বাংলাদেশে থাকতেন?

জি।

কবে এসেছেন?

তিন বচ্ছর।

বিয়ে হয়েছে?

জি।

আপনার ঘটনাটা বলুন। কেন এলেন, স্বামী কী করে, বাড়ি কোথায়।

মাদারিহাটে থাকতাম। স্যাখ মুজিবের পাশের গ্রাম। দাদার সংসার। একজন ছাতা সারাইতে কলকাতা আসত। তারেই বিয়া করলাম, সে বলল, চল, ইন্ডিয়াতেই থাকব।

ছাতা সারায় তো মুসলমানরা।

অখন হিন্দুরা সেই কাম শিখছে।

তারপর?

ছোড একখানি দোকান আছে অর, হাবড়া বাজারে। আর এই কাজ করি।

শুক্লা বলল, মায়ের কাছে চলো। মা যাকে চাইবেন, সেই থাকবে।

রুপু বলল—মাকে তো নিশ্চয়ই বলা হবে না হাসি আসলে হাসিনা।

শুক্লা বলল—তা হলে আর চেঞ্জ করছ কেন?

রুপু বলল—না, মানে। আমি যে জেনে গেছি, জেনে শুনে...মানে মায়ের ঠাকুর-টাকুর...।

প্রীতিলতার ঘরে গেল ওরা। হাসিও রয়েছে ওখানে। তখনও ধূপের গন্ধ।

রুপু হাসি কিংবা হাসিনাকে দেখিয়ে বলল, মা, ওর নাম কী বলো তো?

প্রীতিলতা বলল, কেন, ওর নাম তো হাসি।

রুপু ভাবল যাক, বাঁচা গেল। অণু বলেনি।

রুপু, শুক্লার কানে ফিসফিস করে বলল স্বাভাবিক অবস্থায় মা ওকে কখনওই অণু ভাবে না। ঘোরের মধ্যে ভাবে। ঘোরের মধ্যে এই নতুন মেয়েটাকেও অণু ভাববে মা। সুতরাং ওই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা নেই।

রুপু বলল, মা, একটি নতুন মেয়ে এসেছে। বেশ ভাল। তোমার কাজকর্ম করবে। ভাবছি এবার ওকেই রেখে দেব। তুমি কী বলো।

হাসিনা তখন শুক্লার শরীরের নিকটবর্তী হয়। শুক্লার হাত ধরে আস্তে আস্তে বলে, আমার চলে যেতে কিছু অসুবিধে নেই দিদি, কিন্তু এ বাড়িতে মাঝে মাঝে মেয়ে হয়ে যেতে পারতাম কিনা...। মা মরিছিল ছোটকালে, মেয়ের ধম্মো তো করতি পারিনি কখুনো...।

ঘরে তখনও ধূপগন্ধের অবশেষ ছিল।

দুর্বাসা, ২০০২

দীন-ইলাহি

জীবন পাত্র রেডিয়োতে চাকরি করেন। গতকাল মেমো খেয়েছেন। এখন সিগারেট খাচ্ছেন। টেনশনে খান। কমিউনাল হারমনির উপর একটা প্রোগ্রাম এক মাসে তিনবার বেজেছে। প্রোগ্রামটা জীবনবাবুরই করার কথা । কারণ পাকেচক্রে প্রোগ্রাম অফিসার হয়ে গেছেন উনি। দিব্যি ছিলেন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে, যুদ্ধ থামলে একসেস, তখন রেডিয়োতে চালান দিল। তারপর রিটায়ার করার আগে প্রমোশন। এবার বানাও প্রোগ্রাম, পোষায়? আগে দেখতেন সংস্কৃত প্রোগ্রাম। নর শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনটাই 'নরম' বলে আজও মনে আছে, আর শক্তগুলো সবই ভুলে মারা হয়ে গেছে। একজন সংস্কৃত প্রফেসারের হেলপে চলে যাচ্ছিল কোনওরকমে, গতমাসে ঘাড়ে চেপেছে ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন আর কমিউনাল হারমনি।

ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন নিয়ে নো প্রবলেম। কত পি ভি এস মানে পেট্রিয়টিক ভোকাল সং আছে, আর এই সাবজেক্টের রিসোর্স পার্সন তো বাম-ডান-মধ্যপন্থী নির্বিশেষে পাড়ায় পাড়ায়, খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না, কমিউনাল হারমনির আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান— রবীন্দ্রনাথের, সরি, সরি, নজরুলের ওই কবিতাটা পার্থ ঘোষকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ওটারই গায়ে গায়ে ছোন্নত করলে হয় মুসলমান নারীলোকের কী হয় প্রমাণ বাজিয়ে দিলে তিনে চারে সাত মিনিট খেয়ে গেল, বাকি আট মিনিট হাজী গোলাম আহমেদ আর ব্যোমকেশ ভট্টাচার্যের টক (Talk) দু'জনেই এম এল এ-চার চার মিনিট করে বাজিয়ে দিলেই, ব্যস হয়ে গেল। এটাই বাজিয়ে ছিলেন তিনবার। শালা রিপোর্ট হয়ে গেছে।

জীবনবাবু নতুন একটা প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করছিলেন। অনেক সিগারেট পুড়ছিল। স্কুল ফাইনালে আকবরের চরিত্র সংক্ষেপে লিখে ঝাড়া মুখস্থ করেছিলেন। সম্রাট আকবর হিন্দুধর্ম, ইসলাম, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি সকল ধর্মের সার লইয়া এক অপূর্ব নতুন ধর্মের চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন দীন-ইলাহি। দীন-ইলাহি নিয়ে কিছু করা যায় কি না, এ নিয়ে পাশের টেবিলের কিংশুক ভদ্রের সঙ্গে, কিংশুক নতুন এসেছে, ডাইরেক্ট ইউ পি এস সি—একটু আলোচনা করছিলেন, ছেলেটি তখন ওর ব্যাগ থেকে একটা পত্রিকা বার করে দিল, তা হলে এটা নিন জীবনদা, একটা গল্প আছে , পড়ে নিন, অনেকগুলো কমিউনাল হারমনি বানাতে পারবেন।

[ওটা অফিসে পড়েননি জীবনবাবু। আজ ছুটির দিন, বাড়িতে পড়ছেন। বউকে ডাকলেন উনি— মাধুরী—এক কাপ চা। ওদের স্বামী-স্ত্রীর নামের মধ্যে যে এত ভাব লুকিয়ে আছে রেডিয়ো না হলে উনি জানতেই পারতেন না। দিনরাত গান হয়, 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান'। গল্পটা শুরু করে জীবন পাত্র। গল্পের নাম 'দীন-ইলাহি'।]

নুরুল বলল যাদবপুর। দশ টাকার একটা নোট দিল। কন্ডাক্টার কুড়ি পয়সা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, টাকা পরে দিচ্ছি। নুরুল বলল, টাকা পরে দিচ্ছি মানে? তা হলে তো টিকিটটাও পরে করলেই হত। কন্ডাক্টার বলল, কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না? নুরুল বলল—না, হচ্ছে না। কন্ডাক্টার বলল, মিনিবাসে নতুন উঠছেন নাকি? নুরুল বলল, এক থাবড়া মেরে মুখ ভেঙে দেব।

[সব শালার মাথা গরম। হবে না? কেমিকাল সার। এখন বর্ষায় টমেটো-কড়াইশুঁটি, শীতে পটল-ঝিঙে, সারা বছর ধনেপাতা হচ্ছে কী করে? সব সারে। কেমিকাল সারে। ওই সারের

জিনিস, মাদার ডেয়ারি মানে তো কেমিকাল দুধ, খাচ্ছে সব, মাথাটা গরম হবে না?]

আসলে নুরুলের মেজাজ খুব খারাপ। একটা ঘর খুব জরুরি। দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স চাইল, ভাবা যায়? পকেট থেকে একটা হ্যান্ডবিল বার করল নুরুল। ঘর ভাড়া । গড়িয়া হইতে সোনারপুরের মধ্যে উত্তম উত্তম ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলায় দুই কামরার ফ্ল্যাট ৭০০, দক্ষিণ খোলা, একতলায় ৬০০, ইহা ছাড়া উপরে অ্যাসবেসটাস ছাদ, রান্নাঘর, টিউবকল, সেঃ পায়খানা যুক্ত ৫০০, সত্বর যোগাযোগ করুন—চিত্তর পানের দোকান, রামগড়ের মোড়। দালালের পাল্লায় পড়তে চায় না, বড় হুজ্জোত হয়। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির গেটের সামনেই স্বাতী দাঁড়িয়ে ছিল। নুরুলকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল, বৈষ্ণবঘাটা দেখে এলে? নুরুল বলল—ভোগাস। দশ হাজার। চলো চা পেঁদিয়ে আসি।

[হিন্দু মেয়েটাকে নিয়ে মুসলমান ছেলেটা থাকবে নাকি? ঘর চায় কেন? বিয়েও করেছে নাকি?—বাঙালি ঘরের মেয়েগুলো যা হচ্ছে না আজকাল!]

নুরুল বলল, আজ শুধু চা খেয়েই ফুটব। গ্যাঁজানোর সময় নেই, ডিউটি আছে।

নুরুল কলকাতা টেলিফোনে কাজ করে।

[ওঃ, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সারভেন্ট? তবে কোয়ার্টারের চেষ্টা করছ না কেন? সাঁতরাগাছিতে একগাদা কোয়ার্টার হয়েছে, এস্টেট ম্যানেজারকে লিখতে পারো। বে-জাতে প্রেম করছ, এসব খবর রাখো না?]

নুরুল অফিসে ঢুকতেই একজন মাঝবয়সি দাদা বলল, এই যে 'কাটা' এসে গেছ? তখন একজন মহিলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে হাসল। উনিই অবিনাশদা। নুরুলকে খুব ভালবাসেন। নুরুলকে কাজ শিখিয়েছেন। ক্যান্টিনে রাতের খাবার বলতে গেল নুরুল। রাতে বিষ্টুবাবু থাকেন। কী তরকারি হচ্ছে? না আলুপটলের। এক তরকারি এক মাস ধরে হচ্ছে, যেন মেশিনে তৈরি। সেম স্বাদ, সেম্ ভিসকোসিটি, সেম স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, সেম ফ্লুয়িডিটি। ছ' মাস আগে, নুরুল যখন এক্কেবারে নতুন, রাতের খাবার অর্ডার দিতে গিয়ে ছিল, বিষ্টুবাবু নাম জিজ্ঞাসা করেছিল, ও বলেছিল লিখুন টেকনিকাল অ্যাসিসট্যান্ট। বিষ্টুবাবু বলেছিলেন, টি এ তো , এখানে অনেকেই আছে নাম বলুন। ও গলাটা একটু নামিয়ে বলেছিল, নুরুল আলম। গলাটা নামাল কেন নুরুল? নাম বলতে কীসের লজ্জা? কীসের অপরাধ বোধ? এটা সেকুলার স্টেট না? বিষ্টুবাবুর অ্যাঁ? শব্দের সঙ্গে কপাল রেখার কুঞ্চনে নুরুল যে-অর্থ পায়, তার প্রতিক্রিয়ায় ও দ্বিতীয়বারে তীব্র উচ্চারণে জানায়, নুরুল, নুরুল আলম। বিষ্টুবাবু বলেন, ও। নতুন ভরতি হলেন বুঝি, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন রাত্রের ডিউটি হলেই নুরুল যে-প্লেটটা পায় তার মাঝখানে গোলাপ ফুলের ছবি, তার মানে এই নয় যে ক্যান্টিনের সব প্লেটেই গোলাপের ছবি মারা।...ঠিক আছে। এসব ছোটখাটো ব্যাপারে মন খারাপ করলে চলে না।

ট্রানসফরমারের একটা ফিউজ উড়ে গেছে, দুটো ট্রানজিস্টার পালটাতে হবে । আর-একটা রেজিসট্যান্স পালটানো দরকার ছিল, রেজিসট্যান্স বোর্ডে একটা ছোট কমপ্ল্যানের কৌটো মারা আছে। অবিনাশদা, অবিনাশ মজুমদারের ব্রেন। 'বেল' থেকে রেজিসট্যান্স কবে আসবে ঠিক নেই । কৌটোটার 'ওমস' এখানে ট্যালি করে গেছে। ওটা লুজ হয়ে গিয়েছিল বলে সোলডারিং করছিল নুরুল, তখন বিজনদা বলল, কী, বাড়ি পেয়েছ?

ধুর! কোথায় বাড়ি? পাচ্ছি না।

বউ কোথায়?

বাপের বাড়িতে।

মিট করছ? চোখ টিপল বিজনদা।

খুব অসুবিধে। ওদের বাড়িতে থাকা যায় না। স্বাতীদের জয়েন্ট ফ্যামিলি, বাড়িতে নারায়ণ আছে, স্বাতীর দাদু রোজ পুজো করেন।

সিগারেট আছে?

পাউচ আছে। বানিয়ে দিচ্ছি।

বানাও একটা, ছেড়েই দিয়েছি, এই বৃষ্টির জন্য একটা ইচ্ছে করছে , থুথু লাগিয়ো না, আমিই জুড়ে নিচ্ছি।

তা তো নিশ্চয়ই, আপনিই জুড়বেন।

বাড়ি আছে একটা, কেষ্টপুরে, আমার জামাইবাবুর দাদার। খুব মাই ডিয়ার লোক। ওরা গভর্নমেন্ট সার্ভিসের লোক চাইছে, ট্রান্সফারেবল প্রেফারড।

আমাদের দেবে তো? না, মানে আমি তো ইয়ে, মানে...

ধুস। ওদের ওসব প্রেজুডিস নেই , একবার আমার সঙ্গে বিফ পর্যন্ত খেল।

[বিফ বাদ। ১৫ মিনিট প্রোগ্রামের পক্ষে এই পর্যন্তই এনাফ। ওরা ঘর পেয়ে যাবে, বিজনের জামাইবাবুর দাদা বলবে, ওয়েলকাম ওয়েলকাম, অমনি সেতারে ধুন বাজিয়ে দেব, সুপার ইমপোজে দিলীপ ঘোষের ভয়েস যাবে, এইভাবেই দূর করতে হবে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ভেদাভেদ। আস্তে আস্তে ফেড ইন হবে—'এস হে আর্য এস অনার্য হিন্দু- মুসলমান। শক হুন দল...' হুন কি চিনের লোক? তবে থাক। 'খোল খোল দ্বার রাখিও না আর—' সে দ্যাখা যাবে। বাকিটা পড়েই ফেলি।]

বিজনের জামাইবাবুর দাদার বাড়িটা বাসরাস্তা থেকে পাঁচ মিনিট হেঁটে। একটা খালের ধারে। স্বাতীও সঙ্গে ছিল। ও বলল, কত গাছপালা! ও বলল, খালের জল কোথায় যায়? নুরুল বলল, সাগরে। যাতায়াত করতে পারবে তো স্বাতী, যাদবপুর? স্বাতী বলল, একবার তো পালটাতে হবে খালি। বাড়িটার নাম স্বপ্নপুরী। প্লাস্টার হয়নি। ভদ্রলোক ছিলেন না , ইউনিয়নের মিটিং চলছে পুরীতে। ভদ্রমহিলা এলেন, চুলে লক। নুরুল বলল—বিজনদা পাঠিয়েছেন, ঘরভাড়া দেবেন শুনলাম।

আমরা তো গর্ভনমেন্ট সার্ভেন্ট ছাড়া...

আমার গর্ভনমেন্ট চাকরি, বিজনদার সঙ্গেই...

অ, এসো, বসো , তুমি করেই বলছি ভাই, মেয়েটি বউ তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই।

বিয়ে হয়ে গেছে না হবে?

না, না, হয়ে গেছে।

বেশ ভাল, বেশ লাকি বউ হয়েছে ভাই, তবে সামান্য হলেও একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে রেখো। কিছু মনে কোরো না যেন, এটা বাঙালির কালচার? কী নাম গো?

স্বাতী । স্বাতী মজুমদার।

কদ্দিন বিয়ে হল?

পাঁচ মাস।

তুমিও চাকরিবাকরি করো নাকি?

রিসার্চ করি, কিছু টাকা স্কলারশিপ পাই।

ডক্টরেট হবে?

হতেও পারি, যদি...

সব সেপারেট, জল, কল, পায়খানা...

দেখব?

দেখতে পারো, তবে আমি ভাই হই-চইটা খুব পছন্দ করি, ওই যে সেপারেট সিস্টেমে একেবারে মুখ গুঁজে সেপারেট হয়ে রইলে, আমাদের সেটা একেবারে ভাল লাগে না।

নুরুল দেখল লেবেল খসানো ওল্ডমংকের খালি বোতলে মানিপ্ল্যান্ট, বিয়ারের বোতলে জল, বোতলের গায়ে জলবিন্দু।

নুরুল বলল—সে তো ভাল কথা, আমরাও হই-চই করব।

ঘরটর দেখল ওরা। ভাড়া? মার্কেটের চেয়ে ৫০্ কম ছাড়া বেশি নয়—তা উনি আসুন, ফাইনাল বলে দেবে। অ্যাডভান্স? মাত্র তিন মাসের, তবে, দু' বছর পর ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু। স্বাতীর মুখে হাসি ফুটল। সামনের সপ্তাহে এসে একদিন ফাইনাল করে যাওয়া যাবে।

নামটা তো জানা হল না ভাই, নুরুলকে জিজ্ঞাসা করে ভদ্রমহিলা।

নুরুল আলম।

সে-কী? মো-মো-মো—

হুঁ।

অদ্ভুত, বিজনটা অদ্ভুত। হাওয়ায় ফোঁড়ানো চাপা স্বগতোক্তি। তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। এ সময় স্বাতীই বলল—তা হলে বোধ হয় ঘরটা আর...ভদ্রমহিলা স্বাতীকে বলল—শোনো, একটু এদিকে এসো। ভিতরের দিকে নিয়ে গেলেন উনি, তারপর বললেন, দ্যাখো, একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না, শিক্ষিত হতে পারো কিন্তু রুচিটা খুবই খারাপ। মুসলমান বিয়ে করলে? জানো না ওরা আমাদের কীরকম মেরেছিল। কী না অত্যাচার করেছে...তাড়িয়ে দিয়েছে...

স্বাতী কথা বাড়ায়নি, চলে এসেছিল।

স্বাতীরা দেশ ভাগ দেখেনি, দাঙ্গা দেখেনি, যুদ্ধও দেখেনি ঠিকমতো। পঁয়ষট্টির যুদ্ধের সাইরেনের শব্দ আর ঠুলি পরানো রাস্তার আলো খুব আবছাভাবে মনে পড়ে। আচ্ছা ওই বাড়িওলি ভদ্রমহিলাও কি দেশ ভাগ দেখেছে? ওঁর বয়স দেশ ভাগ দেখার মতো নয়।

স্বাতী যখন এসব বলছিল নুরুলকে, নুরুল বলেছিল, মানুষ সহজে ভোলে না। সেই কবে পৃথিবীতে হিম যুগ এসেছিল, প্লাবন হয়েছিল, সেই স্মৃতি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষ তাঁদের মিথলজিতে, তাদের উপকথায়! স্বাতী তখন বলেছিল, আমরা তো দাঙ্গা করিনি তবুও আমাদের ভুগতে হবে বুঝি?

[একেই বলে মেয়েছেলে। আবার ডক্টরেট হচ্ছে। বাঘ আর ভেড়ার গল্পটাই জানে না। সেই যে ভেড়ার কোন পূর্বপুরুষ ঝরনার জল ঘোলা করে দিয়েছিল বলে...]

ময়দানে বসেছিল ওরা, স্বাতী ওর গত রাতের মজার স্বপ্নটার কথা বলছিল। ঠাম্মাকে আনতে গেছি ব্যোমকালীতলীয়—তখন খ্যাপা বাবা বলছে—ওরে মেয়ে, তোর মনের কষ্ট আমি বুঝতে পেরেছি। ঘর চাস তো? ওই নে। দেখি ব্যোমকালী মন্দিরের উলটো দিকে একটা হলুদ দোতলা বাড়ি। খ্যাপাবাবা আঙুল উঁচিয়ে দেখাচ্ছে—দোতলায়। দোতলায় কী হাওয়া পর্দা নড়ছে, একটা ঘরের দেওয়াল জুড়ে বুক শেলফ। কী মজা যে লাগছিল...।

[জীবনবাবুরও অনেকক্ষণ ধরেই চোখ লেগে আসছিল। উনিও ইতিমধ্যে একটা ছোট্ট করে স্বপ্ন দেখে ফেললেন। ভক্তিতে নুরুল খ্যাপাবাবার দীক্ষা নিল, নুরুলের গলায় খ্যাপাবাবার ছবিঅলা লকেট। ও সকাল-সন্ধ্যা মন্দিরে বসে থাকে, আর খ্যাপাবাবা অন্যদের বলছে, দ্যাখ-দ্যাখ। একজন যবন কীভাবে আমাতে বিশ্বাস রেখেছে।

চটকা ভাঙলে জীবনবাবু এই স্বপ্নটার সঙ্গে গতকাল বাড়ি আসার পথে শেয়ালদা স্টেশনের ইউরিনালে সাঁটা লিফলেটটার মধ্যে একটা লিঙ্ক পেয়ে যান।

'জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য বাবা কালাচাঁদ। বিশ্বাস হারাইয়াছেন? জীবনে শান্তি হারাইয়াছেন? বাবা কালাচাঁদের আশ্রমে আসুন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভক্তসংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে।']

সেই দিনই তোল্লাই হল। মিহি ধুতি আর হাফশার্ট পরা একজন পকেট থেকে একটা কার্ড বের করেই বলল—চলো থানামে। বদমাসি হচ্ছে।

আমরা তো জাস্ট বসে ছিলাম। স্বাতী বলেছিল।

চুপচাপ বসে থাকলে কিছু বলি না, যখনই হাত লাগিয়েছে তখনই ধরেছি।

আমরা হাসব্যান্ড-ওয়াইফ।

সে পুরুফ থানামে দিবেন।

পকেট হাতড়ে ২২ টাকা ৫০ পয়সা পাওয়া গেল। এত কমে রাজি নয়। কমসে কম পঁচাশ দিন। কিন্তু নেই যে...।

স্বাতী লাইব্রেরি কার্ড বের করেছিল, নুরুল আইডেনটিটি কার্ড। নুরুলের কার্ডটা দেখে ওসি বলল— নুরুল আলম? গভমেন্ট সার্ভিস? ছিঃ একটা হিন্দু মেয়ের সর্বনাশ করছেন? সাসপেন্ড হয়ে যাবেন।

নুরুল বলল, আমরা ম্যারেড।

বললেই হল?

আমাদের সার্টিফিকেট আছে , রেজিস্ট্রির।

কোথায়, দেখি?

সঙ্গে সঙ্গে কেউ রাখে? ঘরে আছে।

কাল দেখিয়ে যাবেন, এখন যা আছে রেখে যান।

যাবার ভাড়ার জন্য দুটো টাকা রাখি, অ্যাঁ?

[তোমরা তো আচ্ছা বুদ্ধু, যাও না, কড়েয়া রাজাবাজারে, পার্কসার্কাস, খিদিরপুরের দিকে। ওদিকে তো তোমার জাতভায়েরা থাকে। মিডল ইস্টের টাকায় মসজিদ উঠছে সব—]

সেদিন অফিসে চুপচাপ কাজ করছিল নুরুল। বনানীদি শাড়ি খসখস করে খেজুর করছে। নতুন শাড়ি পরে এলেই পাবলিক রিলেশন বেড়ে যায় ওঁর। কেউ বলল, খুব ভাল দেখাচ্ছে, কেউ বলল, বয়সটা তোর দশ বছর কমে গেছে রে। মাধুরীদি একটু ঠোঁট কাটা। বলল, ইস কী ক্যাটকেটে, মুসলমান মুসলমান রং, তখনই এই রে বলেই জিভ কাটল। নুরুলের দিকে একবার তাকাল। একটু পরেই মাধুরীদি বলল, কী ভাই, বাড়িটাড়ি পেলে?

ওঁর কী দোষ? স্বাতীও তো বলে। নুরুল একবার বলেছিল, এইসব জায়গায় আমরা ঘর ভাড়া পাব না, চলো আমরা পার্কসার্কাস, কড়েয়া, খিদিরপুরের দিকে চেষ্টা করি। স্বাতী বলেছিল, ওইসব জায়গায় কীরকম মুসলমান-মুসলমান গন্ধ। নুরুল একবার স্বাতীকে নিয়ে গিয়েছিল ওর এক দাদার বাড়ি। ওর বাবার জেঠিমা হন তিনি। নিজেদের বাড়ি। বুড়ি তো স্বাতীকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করল। নুরুলকে বলল, অ্যাদ্দিনে দাদিকে মনে পড়ল, শুনেছি বিয়ে করেছিস, ইজাব-কবুল করেছিলি তো বাবা? নুরুল বলল, দেশে গিয়ে করে নেব দাদি। বুড়ি বলল, সেটা তো জায়েজ হবে না বাবা, ইজাব, কবুল, ওলী, খোৎবা ছাড়া মুসলমানের বিয়ে হয় না ধন। তোর জ্যাঠা খুব দুঃখু করছিল, তুই রোজা রাখিস না , নামাজও পড়িস না, আখেরে খারাপ হবে ধন। এখন তোমরা মিশছ—মেশো, কথাবার্তা কও, কিন্তু খোৎবা না পড়ে স্বামী-স্তিরির ওই কাজটা কোরনি বাপ, ওটা হারাম...

তখন ওই বাড়ির তিন ভাড়াটের রান্নার ফোড়ন । পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ তো পৃথিবীময় একরকম, বৌদ্ধদেরও খেতে দেখেছে দার্জিলিং-এ। বিফও। তবে মুসলমানি গন্ধটা, যেটা স্বাতী বলেছিল, সেটা ঠিক কী তা স্বাতীও বলতে পারেনি, তবে নুরুলের নিজেরও এইসব এলাকা ভাল লাগে না। অনেক কারণ। যেমন, হয়তো হঠাৎ দরকার পড়ল গীতবিতান দ্বিতীয় খণ্ডটা, পাশের বাড়ি খোঁজ করে পাওয়া যাবে খিদিরপুরে? রাজাবাজারের মুসলিম পাড়ায়? তা ছাড়া ওইসব অঞ্চলেই কি আর ফাঁকা ঘর আছে? ঘরের ভিতর ঘর হচ্ছে, বারান্দায় পার্টিশন, সংসার বাড়ছে, যাবে কোথায়? তার উপরে আবার বাইরের লোক? দাদিমাকে বললে হয়তো টেম্পোরারি থাকতে দিত, দোতলায় তিনটে ঘর। তার আগে খোৎবা পড়তে হবে, ইজাব-কবুল, দোয়া দরুদ, এটা ফরজ , ওটা ছোন্নত, ...ভাবা যায়?

মেসে ফিরে এসে চুপচাপ শুয়ে থাকে নুরুল। ইসমাইল বোর্ডিং। স্টুডেন্ট লাইফে হোস্টেলে

ছিল। এখন এখানে সত্যি ভাল লাগে না। মাথার কাছে দুলদুলের ছবিওলা ক্যালেন্ডার। রুমমেট রহমতউল্লা বসিরহাটের ছেলে। ঠিকঠাক নামাজ-ফামাজ পড়ে। ব্যাটা এম এ-র স্টুডেন্ট, বাংলার। এখনই মৌলভি মৌলভি ভাব। নুরুলকে তো নাফেস-ফাসেক বলে খিস্তিই দেয়। গতকাল ঘাড় নাড়িয়ে নুরুলকে উপদেশ দিচ্ছিল—পেট্রোলের সঙ্গে আগুনের যে সম্পর্ক, একজন যুবতীর সঙ্গে পুরুষের সেই সম্পর্ক। টক খাদ্য দেখলে জিহ্বায় পানি আসবেই। সেই জন্যই নবী পর্দার বিধান দিয়েছেন। ক্যাঁঠাল দেখলিই মাছিরা ভোঁ ভোঁ করে ধেয়ে আসে। ক্যাঁঠালের যদি ফোঁকড় থাকে, সেখান থিকে মাছিরা ক্যাঁঠালের মধু খায়, আর যদি খোসাটা ঠিকমতো থাকে, মাছিরা কিছু করতি পারে না। নুরুল তখন ওকে বলেছিল, যাও ভাই, বাথরুমে গিয়ে হাত মেরে এসো। ও খুব খচে আছে।

ওর টেবিলে একটা বই। মলাটে একজন সেন্ট্রাল মিনিস্টারের ছবি। ঈদের নমাজে টুপি পরে সেজদা করছে। এই মন্ত্রীই দু'দিন পরে হনুমান মন্দির উদ্বোধন করবেন, কম্পিউটারে সিঁদুর মাখানো কলা লাগিয়ে মেশিন পবিত্র করবেন, বড়দিনে মাল খাবেন, শিবরাত্রে বেল খাবেন। বইটা হল আনন্দমঠের নোটবুক। শাবাশ। ভাল মলাট দিয়েছে। খুলে দেখল নুরুল। এখানে ওখানে দাগ মারা। ইমপ, ভি ভি ইমপ।

ওখানে শান্তি নামে একটা ক্যারেকটার আছে না, ব্যাটাছেলে সেজে থাকত।

আচ্ছা, একটা মেয়েছেলে যদি নির্বিঘ্নে ব্যাটাছেলে সেজে থাকতে পারে—একেবারে সেই অর্জুনের আমল থেকে, তা হলে ওটাও পারবে। নুরুল অমিতাভর কাছে যায়।

অমিতাভ নুরুলের সঙ্গেই ফিজিক্স পড়ত। এখন স্বাতীদের সঙ্গেই রিসার্চে রয়েছে। অমিতাভ বলেছিল একটা অ্যাকোমডেশন আছে নাকতলার দিকে। ওই টেকনিকাল অসুবিধেটা ম্যানেজ করতে পারলে ঘর হয়ে যেতে পারে। টেকনিকাল অসুবিধেটা হচ্ছে নামটা।

হোয়াট ইজ ইন এ নেইম, একটা ভেগ কথা। নামে আসে যায়। ওর তো আসলে কোনও ধর্ম নেই। ও নিজেকে মুসলমান মনে করে না। হিন্দু তো নয়ই। বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান কিচ্ছু নয়। শুধু নাম। নুরুল। নুর মানে তো জ্যোতি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নাম আরবিতে নুরুলই বোধহয় হবে।

অমিতাভ বলল, ওদের বাড়িতে আগে পড়াতাম। এখন আর টাইম দিতে পারি না। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। চিঠিতে স্বাতীর কথাই লিখছি। পত্রবাহিকা আমার সহপাঠিনী ও রিসার্চফেলো স্বাতী মজুমদার...। স্বাতীকেই ফেস করতে বলবি। ওরা রাজি হবে, কারণ ওদের ছেলেটা নাইনে উঠেছে।

কাবায় বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন মারা গেছে, সাহাবুদ্দিন হাঁক দিল মুসলিমদের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালাতে হবে। আর এস এস চ্যাঁচাচ্ছে রাম জন্মভূমি আদায় করবই, আর নুরুল ঠিক করল ও নারায়ণ হবে। নারায়ণ মজুমদার।

অমিতাভর চিঠি নিয়ে নাকতলায় গেল ওরা। দু'জন 'সাইন্স' পেয়ে বাড়িওলা তো মহাখুশি। বলছে, ছেলেটাকে দেখিয়ে দিতে হবে আপনাদের। মাধ্যমিকে সাইন্স গ্রুপে যেন স্টার থাকে।

নুরুল বলল, ঠিক আছে, এই জন্য ভাবতে হবে না। আমার পক্ষে তো ভালই হল, চর্চাটা থাকবে।

[বাব্বাঃ অ্যাদ্দিনে ঘর পাওয়া গেল তা হলে। ঘরই যখন পাওয়া গেল ক'দিন আগে পেতে দোষ কী ছিল? অনেক আগেই কমিউনাল হারমনি হয়ে যেতে পারত,—খালি ভ্যাজাং ভ্যাজাং!]

সেদিন সরস্বতী পুজো। বাড়িওলি স্বাতীকে বলেছে সকাল সকাল স্নান সেরে নিয়ো। ঠাকুরমশাই প্রথমেই আমাদের পুজোটা সেরে দেবে। বাড়িওলার ছেলেটা, যে নুরুলদের ছাত্র, স্বাতীর গ্ল্যাডস্টোনের বইটা নিয়ে গেল কারণ ওইটাই সবচেয়ে মোটা। স্বাতী এলোচুলে। নুরুলের মনে পড়ে কলেজ লাইফে, যখন হোস্টেলের কালচারাল সেক্রেটারি ছিল। হোস্টেলের সরস্বতী পুজো। সারারাত জেগে রঙিন কাগজের শিকল বানানো, খিচুড়ি আর বাঁধাকপি। ঠাকুরমশাই পুজো করার সময় জিজ্ঞাসা করলেন কার নামে সংকল্প বাক্য পড়া হবে? অমিতাভ বললে—কেন, আমাদের সেক্রেটারির নামে।

সেক্রেটারির নাম কী?
নুরুল আলম।
ঠাকুরমশাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলে—কী বললে?
অমিতাভ বলে—বলছি তো নুরুল আলম।
গোত্র?
নুরুল বলেছিল, মনুষ্য গোত্র...
নারায়ণবাবু, আসুন, অঞ্জলি দিয়ে যান। বাড়িওলা ডাকছে।
সক্কালবেলায় অফিসে পালিয়ে যাওয়ার কথা মনে হয়েছিল, সেটাই বোধ হয় ভাল হত।
বলো—ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত...
নুরুলের দুই হাতের তালুতে নিষ্পাপ ফুল পাপড়িগুলি দলিত, মথিত হতে থাকে..."
[আর পড়া যায় না।—দেখি, লাস্টে কী আছে?]

একটু দূরে আর একপাটি চটি খুঁজে পেল স্বাতী। নুরুল তখন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নুরুল তখনও বুঝতে পারছিল কে মুছিয়ে দিল ঠোঁটের কোণের রক্ত, কার হাত পিঠের উপর ঘুরছে।

'আর ভয় নেই। আমরা এবার যাই দিদি। আর কিছু হলে আমাদের জানাবেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমরা রক্ষা করবই'—পার্টির ছেলেরা বলে গেল।

কার হাত পিঠের উপর ঘুরছে নুরুল জানে।

তবু কেন দরজা-জানালা চৌকাঠের গলায় ফিসফাস শুনতে পায় নুরুল—মিথ্যেবাদীটা নারায়ণ নামে এসেছিল, আসলে নুরুল।

নুরুল বিড়বিড় করে—আমি তো একই, আমি তো সেই, সেই একই, শুধু নামটা...

[নামের সঙ্গে কিংশুক ভদ্রের কোনও মিলই নেই। ও অভদ্র। আমাকে প্যাঁচে ফেলতে চাইছিল। প্রফেশনাল জেলাসি।]

শারদ প্রতিক্ষণ, ১৯৯০

তাল্লাক

এই ৺শ্রীশ্রী বাটিতে কেহ পাদুকা পায়ে দিয়া জাইবেন নাই, যে জাইবেন তাহাকে তাল্লাক ॥ সন মুরারি মুরলী ছিদ্র কুমারবদন রত্নাকর সুধাকর এরূপ গনন।

রমাপদ মিত্র পি. জি. হাসপাতালের ইজিচেয়ারে শুয়ে শোলক ভাঙাচ্ছেন। বাঁ হাতের শিরার উপর সেঁটে থাকা তুলোর পুঁটুলিটা ওষুধ ওষুধ গন্ধমাখা বিকেল বাতাসে এই মাত্র পড়ে গেল। এই অবসন্তেও একটা একা কোকিল ডাকছে। উডল্যান্ড ওয়ার্ডের সাদা বারান্দা বেয়ে সাদা নার্সটি হেঁটে গেল। হাঁটার শব্দে হাসপাতাল বাজে। আকাশে মেঘ। বৃষ্টি আসবে?

রমাপদ মিত্রর বুকের উপর উলটে রয়েছে একটা নীল রঙের বাঁধানো খাতা। ওই খাতাটা খুললেই কেমন যেন ঘুঙুরের শব্দ পান। একদিন অমরায় গিয়ে বেহুলাও নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়। বাংলার মাঠ ঘাট ভাট ফুল ঘুঙুরের মতো বেজেছিল বেহুলার দু' পায়।

এই যে খাতাটা, এতে আছে কত লোকশিল্পীদের নাম, গ্রাম কথা, লোকাচার। মন্দির বিবরণ, মেলা বর্ণনা...। গ্রাম বাংলা ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করা এরকম হাজারো তথ্যে ভরা রয়েছে এই জীবনখাতার প্রতি পাতা।

হাসপাতালে যখন ভরতি হতে হল, এরকম কয়েকটা খাতা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন রমাপদ। একটা নতুন কাজ করার পরিকল্পনা মাথায় এসেছে কিছুদিন হল। মন্দিরের গায়ে যেসব লিপি আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে কিছু সমাজ-ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়েছে। মন্দির-লিপিগুলিকে আলাদা করেছেন, বর্গীকরণও করতে হবে। কিছু কিছু মন্দিরে আবার যাওয়া দরকার। লিপিগুলিকে বুঝতে হলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আর স্থানীয় ইতিহাসটাও মাথায় রাখা দরকার। যেতে হবে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই যেতে হবে বহু জায়গায়। প্রথমেই যেতে হবে আলমণিপুর।

আলমণিপুর হল হুগলি জেলার বলাগড়ের কাছে একটি গ্রাম। ওই গ্রামের একটি বিগ্রহহীন পরিত্যক্ত মন্দিরের বাইরের দেয়ালে পাথরে খোদাই করা ছিল এই সাবধান বাণী। "কেহ পাদুকা পায়ে দিয়া জাইবেন নাই। যে জাইবেন তাহাকে তাল্লাক।"

তাল্লাক শব্দটি কেন উৎকীর্ণ হল হিন্দু মন্দিরে? কীসের কারণে?

তাল্লাক শব্দটির পরে বেশ মজার দুটি লাইন। এটা হল প্রতিষ্ঠা লিপি। এখানে ছদ্মবেশে প্রতিষ্ঠার দিনটি রয়েছে। কেন যে এই ছদ্মবেশ ধারণ। মুরারি মুরলী ছিদ্র কুমারবদন। মুরারি মুরলী মানে কৃষ্ণের বাঁশি। তাঁর সাতটি ফুটো। তা হলে মুরারি মুরলীছিদ্র মানে সাত। কুমারবদন মানে কার্তিক মানে ছয়। রত্নাকর সুধাকর এরূপ গনন। রত্নাকর মানে তো সোজা, রত্নাকর ইজিকাল্টু সমুদ্র ইজিকাল্টু সাত। সাত সমুদ্র। আর সুধাকর মানে এক। একশ্চন্দ্র তমোহন্তি। অঙ্কস্য বামাগতি। ৭, ৬, ৭, ১ কে বাম দিক থেকে সাজালে ১৭৬৭। সন বলতে শকাব্দই ব্যবহৃত হত মন্দিরের গায়ে। তা হলে ১৭৬৭ শকাব্দ। দেড়শো বছরেরও বেশি পুরোনো। পুরনো না বলে প্রাচীন বলাই ভাল। 'প্রাচীন' শব্দটার গায়ে কীরকম যেন ভাঙা-মন্দিরের চারা বটগাছ আটকে থাকে।

কিন্তু ওটা যে প্রতিষ্ঠা লিপিই, সেটা কে বলল? এটা তো সাবধান লিপি। জুতো পায়ে ঢোকার ব্যাপারে নিষেধ রয়েছে। ওই সাবধান বাণীটি লেখার অনেক আগেই হয়তো মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল, সাবধান বাণী পরে যুক্ত হয়েছে হয়তো। কিন্তু সাবধান বাণী কেন? বিশেষত ওই গ্রাম্য মন্দিরে? শহর এলাকার কোনও কোনও আধুনিক মন্দিরে আজকাল লেখা থাকে 'জুতা পায়ে প্রবেশ নিষেধ।' কিন্তু কোনও গ্রামের মন্দিরে জুতা পায়ে মন্দিরে প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার নোটিস দেবার দরকার হয় না,কারণ সবাই জানে জুতো পায়ে মন্দিরে ঢুকতে নেই। তা হলে? আর কেনই বা তাল্লাক শব্দটি?

ভাঙা মন্দিরটা ভেসে ওঠে চোখে। যখন এটা নোট করেছিলেন তখন এত কিছু মনে হয়নি। তাল্লাক শব্দটায় একটু খটকা লাগলেও লিখে রেখেছিলেন। আসলে রমাপদবাবু সেবার বলাগড় গিয়েছিলেন অন্য কাজে। ওখানে আজও নৌকো তৈরি হয়। এককালে জাহাজও তৈরি হত। খোদ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানকার পালতোলা জাহাজ কিনত। আবার 'বলাগড়' নাম হয়েছিল বলরাম ঠাকুরের গড় থেকে। ওই গড়ের সন্ধানেই ওধারে গিয়েছিলেন রমাপদ মিত্র। বলাগড় থেকে ৪/৫ কিলোমিটার দূরে বট-অশ্বত্থ-ডুমুর কবলিত মন্দিরটির সন্ধান পান। রেখদেউল রীতির মন্দির। কুড়ি ফিটের মতো উচ্চতা হবে। শিখর-কলসটি ভেঙে পড়েছে। ভেঙে যাওয়া ইটগুলিকে আগলে রেখেছে বট-অশ্বত্থের শিকড় সমাবেশ। মন্দিরে কোনও পোড়ামাটির অলংকরণ আছে কি না দেখতে গিয়েই মন্দিরে প্রবেশ পথের বাঁ দিকে ওই পাথরলেখাটি দেখতে পেয়েছিলেন। সবুজ ক্লোরাইট পাথর। এই পাথর এখানে পাওয়া যায় না। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ছবিও তুলেছিলেন ক্লিক থ্রি ক্যামেরায়। তখন ওই ক্যামেরাটাই ছিল। ফ্ল্যাশ ছিল না। বছর তিরিশ আগেকার কথা। মন্দিরের ছবিটা উঠেছিল অন্ধকারমাখা, প্রস্তর লিপিটা ওঠেনি। ওটা শুধুই কালো। ভাগ্যিস খাতায় টুকে নিয়েছিলেন লেখাটা।

আজ বিকেল থেকে মাঝে মাঝেই দমকা বাতাস দিচ্ছে। বাতাস একা আসে না। কিছু বয়ে নিয়ে আসে। গন্ধ, শব্দ, কিংবা স্মৃতি। স্মৃতি মানে তো ইতিহাস কথা। ওই তো, সামনের বাড়িটায় লেখা রোনাল্ড রস এর নাম। এই পি জি হাসপাতালেই ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কার করেছিলেন রস সাহেব। কিন্তু দিগম্বর মিত্র? উত্তরপাড়ার দিগম্বর মিত্রের নাম কে জানে আজ আর? ম্যালেরিয়া অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বদ্ধ জলের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন। দিগম্বর মিত্রের রিপোর্টটা না পেলে রস সাহেব কি মশার কথা ভাবতে পারতেন? এ নিয়ে একটা লিখলে হয় না? এ লেখার অধিকারী হয়তো তিনি নন, তবু একটু অনুসন্ধান করার লোভ সামলানো যায় না। এসব পরে হবে।...পরে? হবে? হবে তো? উঃ জীবন এত ছোট কেনে?

সামনের বড় বকুল গাছের পাতায় পড়া রোদ্দুরে ভিজিটিং আওয়ার্সের রং লেগেছে। এবারই একজন একজন করে আপন জন আসবে। সুদেষ্ণাটা আসছে না ক'দিন। ওর ছেলেটা নাকি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরেনি। কী মুশকিল বল দিনি! গৌরের কাছ থেকে ওই খবরটা পেয়েছেন রমাপদবাবু। গৌর দমদম এলাকা নিয়ে কাজ করছে। ক্লাইভ হাউসটা যেখানে সেখানেই নাকি মুর্শিদাবাদের নবাবদের হান্টিং হাউস ছিল। গৌরের তাই মত। রমাপদরও এরকমই মনে হচ্ছে। দমদমে একটা ঝিল আছে, ওর নাম মতিঝিল। মুর্শিদাবাদেও মতিঝিল আছে। সুদেষ্ণা কাজ করছে পিঠে-পুলি-মিষ্টান্ন শিল্প নিয়ে। প্রদীপ মেতে আছে নীলকুঠি নিয়ে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নীলকুঠিগুলির একটা তালিকা তৈরি করছে ও। বেশির ভাগ নীলকুঠিই আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, তবু বেঁচে আছে নীলদর্পণ। তপন পুতুল নিয়ে, ইন্দ্রজিৎ, দেবাশিস ওরা সমাধি সৌধ, মনুমেন্ট নিয়ে কাজ করছে। রোজই এদের কেউ না কেউ আসে। ওদের সঙ্গে কথা হয়। ওরা এলে ঘর ভরে ওঠে। ঘরই তো। এই হাসপাতালটা তো ঘরবাড়িই হয়ে গেছে। এর আগে দু'বার এসে এক মাস এক মাস করে থেকে গেছেন। এ যাত্রাতেও অলরেডি দশ দিন হয়েই গেল। অনেকে বলেন-টলেন ও রমাপদবাবু, এতদিন ধরে মাঠেঘাটে ঘুরে ঘুরে এই সব যে করে বেড়ালেন, কী পেলেন জীবনে? না পেলেন বই বিক্রির তেমন রয়্যালটি, না পেলেন তেমন কোনও পুরস্কার-টুরস্কার। রমাপদ মিত্র বলেন, কে বললে পুরস্কার পাইনি? কতগুলো শাবক পেলুম যে। ওদের বেশ লাগে। তা ছাড়া

ম্যাটিরিয়াল গেইনের কথা যদি বলো, তা হলে বলি এই যে পি জি হসপিটালের উডবার্ন ওয়ার্ডের মতো জায়গায় চিকিচ্ছে করাতে পারছি, গভরমেন্ট সুবিধে করে দিয়েছে, ডাক্তাররা যত্ন নিচ্ছেন, এই বা ক'জন পায় বলো? কাজ করে মনের আরাম তো কম পাইনিকো, ওসব করলে আরাম ফ্রি।

এমন সময় ওই মেয়েটা এল। রেডিয়ো অফিসের। গতকালই বলে গিয়েছিল আসবে। একটা ইন্টারভিউ নেবে। মেয়েটির সঙ্গে বৃষ্টিও এল। তুমি এলে, অনেক দিনের পরে যেন বৃষ্টি এল। মনে এল। ছিঃ।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বীণাপাণি এল ঘর থেকে। বীণাপাণি হল আয়া। আজকাল আবার হাসপাতাল থেকে আয়া সিসটেম উঠে গেছে, তবু নিজেদের আত্মীয় বলে লোক রাখা যায়। ওই গৌর-তপন-প্রদীপরা জোর করে আয়ার ব্যবস্থা করে গেছে। কোনও দরকার নেই, তবুও। ভালবাসার অত্যাচার আর কী।

বীণাপাণি এতক্ষণ ঘরের ভিতরের নিচু চেয়ারটাতে বসে ঝিমুচ্ছিল। বলল, কী গো দাদা, এতক্ষণ বাইরে বসে আছেন, জলের ছাট আসছে যে, ভিতরে চলুন।

ভিতরে নিয়ে যায় বীণাপাণি। রেডিয়োর মেয়েটিও ভিতরে যায়। বেশ মিষ্টি দেখতে মেয়েটি।

'রেডিয়ো আপিসে দু-তিন বার গেসলুম, বুঝলে, কবিতা সিংহ ডেকেছিলেন। তা অনেক দিন হয়ে গেল। তো এখন কী করতে হবে আমায় বলো।'

ব্যাগ থেকে একটা টেপ রেকর্ডার বের করল মেয়েটি। মাইকে ফুঁ দিল। তারপর মাইকের সামনে মুখ রেখে বলতে লাগল—আমরা জানি আপনি একজন লোক সংস্কৃতি এবং পুরাতত্ত্বের অক্লান্ত গবেষক। এ বিষয়ে আপনার দশ-বারোটি গ্রন্থ আছে। খুব জানতে ইচ্ছে করছে আপনি এ কাজে উৎসাহী হলেন কী ভাবে।

রমাপদবাবু মাথা চুলকোলেন।

তা হলে তো অনেক পুরনো কথা বলতে হয়। তখন আমার বয়েস কত হবে, সাতাশ-আঠাশ, কম্যুনিস্ট পার্টি করি, হোল টাইমার। একবার পার্টি থেকে আমায় খুব বকাবকি করল। রূপনারান নদীর জেলেদের একটা সংগঠন নিয়ে ঝামেলা, আমার বিচার-বিবেচনায় আমি কোনও অন্যায় করিনি, অথচ পার্টি আমাকে যা-তা বলল। সে অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু তাইতে আমার মন খুব খারাপ। আমি আমাদের গ্রামের আড়াইশো বছরের প্রাচীন রাধামাধব মন্দিরের চাতালে গালে হাত দিয়ে বসে আছি, হঠাৎই মন্দিরের টেরাকোটা ফলকের দিকে চোখ পড়ল। দেখি, একটা মেয়েছেলে, সরি, মহিলা, একটা ব্যাটাছেলের চুল ধরে টানছে। ব্যাটাছেলেটার পরনে কোঁচাওলা ধুতি, মুখে বেশ কায়দা করা গোঁপ, চুলটাও বেশ বাবড়ি, যেন কার্তিক। মহিলাটির বেশ দশাসই চেহারা। খুব অবাক হয়ে গেলাম। এরকমটা তো হবার কথা নয়, ব্যাটাছেলেরই তো মেয়েদের চুল ধরে টানার কথা। আমার এটা তাজ্জব লাগল। আমি আরও সব কারুকার্যগুলি দেখতে লাগলাম। আমার চেনা মন্দিরের গায়ের দিকে তাকাইনি এর আগে। দেখি, পালকি চেপে যাচ্ছে নববধূ, পালকি বাহকদের হাঁটুর উপর কাপড়। সঙ্গে চলেছে একটি কুকুর। সেই নববধূটির বাপের বাড়ির পোষা কুকুরটি বোধহয়, সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, আহা। দেখি তিনজন সাধু বসে বসে কী সব ভাবছে। আমার যেন মনে হল শিল্পী সাধুদের দিয়ে ভাবাচ্ছেন—পরকালের চিন্তা করে ইহলোকটা তো গেল। মনে হল কী আশ্চর্য কথা আমি এ গাঁয়ের ছেলে, আমাদের গাঁয়ের মন্দিরে যে আমাদের জীবনের কথাও লেখা থাকতে পারে, বুঝতেই পারিনি এতদিন? আমি অবাক হয়ে দেখতে থাকি হরিণের পাল, পেখম তোলা ময়ূর, পালতোলা জাহাজ, হুঁকো হাতে সাহেব, প্রসাধনরতা নারী, কত কী। দেখি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পায়ের গোড়ালিতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটি রমণী মূর্তি। সেই যে কৌতূহল হল, সেটাই রয়ে গেল। এখনও দেখি। এখনও নতুন নতুন ব্যাখ্যা পাই। ওই যে নারী মূর্তিটির কথা বললাম, গোড়ালি ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক পরে বুঝেছিলাম ওটা অভিসারিকা মূর্তি। কী করে বুঝলাম জানো? মান্না দের একটা গান শুনে। 'পথের কাঁটায় পায়ে রক্ত না ঝরালে কী করে এখানে

তুমি আসবে।' মেয়েটি কাঁটা তুলছে পায়ের গোড়ালি থেকে। অভিসারে যেতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফোটার বর্ণনা আছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। কণ্টক গাড়ি কমলসম মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি... তারপর কী সব যেন আছে। দ্যাখো, একটা আইডিয়া কী ভাবে বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমে ট্রানসফারড হয়। তা, যা বলছিলাম, আমাদের গ্রামের মন্দিরটাকে ভালভাবে দেখে, পাশের গাঁয়ের মন্দিরটাকে দেখি। মিল আর অমিল খোঁজার চেষ্টা করি। সেই সময় বিনয় ঘোষের কালপেঁচার নকশা বইটা পড়েছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল বইটা। আমি বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা করি। উনি বললেন, মন্দিরের গঠন, অলংকরণ, বিগ্রহ, পূজা পদ্ধতি এই সব কিছুর মধ্যেই সমাজ-ইতিহাসের উপাদান পাবে। ওটাও তো দেশ সেবা। তুমি মন্দির করো। লেগে গেলাম।

কিন্তু রুজি রোজগার? মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।

সেটাই ছিল আসল সমস্যা। অভিমান করে পার্টির হোলটাইমারগিরি ছেড়ে দিলুম। পার্টি থেকে একটা ভাতা পেতুম, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। তার উপর আবার ভাব-ভালবাসা করে একটা বিয়েও করে ফেলেছিলুম, তার উপর আবার বিড়ি। বিড়ি খাওয়া অভ্যেস করে ফেলেছিলুম। জেলে-চাষিবাসিদের সঙ্গে মিশতে হত কিনা। পয়সা পাই কোথায়? বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম। দু-একটা টিউশনিও ধরলুম। কিন্তু টিউশনি টিকবে কেন। যাওয়া আসার ঠিক নেই কো। এদিকে তো নেশা ধরে গেছে। মন্দিরের নেশা। আমি, জানলে, কোনও ধর্ম মানি না। নাস্তিক লোক, কিন্তু ধর্মচর্চা করতে থাকলাম। আমার একটা নিজস্ব থিয়োরি আছে। সেটা হল নাস্তিকরাই সব চেয়ে ভালভাবে ধর্মচর্চা করতে পারে। কত কিছু শিখলাম। সুফি, সহজিয়া, বজ্রযান...। এসব কিছু জানতাম না আগে। দেখি কী বিচিত্র উপায়ে মানুষ সৃষ্টি রহস্য খুঁজে চলেছে। হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস, বৌদ্ধর আচার, মুসলমানের প্রার্থনা একাকার হয়ে গেছে। এক মুসলমান ফকিরের গান শুনলাম ও রামচন্দ্রকে বলছে নবী, আর রাবণকে ইবলিশ শয়তান বলে গান বেঁধেছে। কংসকে বলছে মালাউল, কৃষ্ণকে বলছে মোমেন। চিত্রকর সম্প্রদায়ের লোকরা নমাজও পড়ছে আবার হিন্দু দেব দেবীদের নিয়ে গানও গাইছে। জগতটা কীরকম খুলে যেতে লাগল, জানলে। এদিকে আবার ডেভিডের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন। ফুল প্যান্টালুনের উপর পাঞ্জাবি ফেলে দিয়ে, পায়ে একটা চটি গলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকে আমি আমাদের গাঁয়ের রাধামাধব মন্দিরের টেরাকোটার কথা বলি, বিশেষ করে ওই ব্লকটির কথা। নারী কর্তৃক নর নির্যাতন। ও একদিন দেখতে এল। দেখে টেখে ডেভিড বলল, এ তো খুব চেনা চেনা লাগছে। এরকম কিছু পেইনটিংস, কিছুদিন আগেই দেখেছি। ইয়েস। কালীঘাটের পট। কালীঘাটের পটে এরকম ব্যঙ্গাত্মক ছবি আঁকা হত। এটা বোধহয় কলিকাল সিরিজ। কলি এলে সব উলটে যাবে, ব্যাং সাপকে ধরে খাবে, নারকোলগাছে আম হবে, স্ত্রী স্বামীকে মারবে। এরকম সব ছবি। এই টেরাকোটাটা বোধহয় কালীঘাটের পটের কলিকাল সিরিজের ইনফ্লুয়েন্স।

কী অবাক কাণ্ড! সাহেব বলে কী। কোথায় কালীঘাটের পট কোথায় নবাসনের মন্দির। কালীঘাটের পটের প্রভাব মন্দিরের গায়ে? ডেভিড বলল, হতেই পারে। কলকাতার কালী মন্দিরে তীর্থযাত্রীরা গেলে, ফেরার সময় পট কিনে নিয়ে যেত। আমি বললুম, ডেভিড, তা কী করে হবে? আমাদের এই মন্দির তো কালীঘাটের পটের যুগের চেয়েও পুরনো। সবাই বলে। মন্দিরের গায়ে একটা প্রতিষ্ঠালিপি আছে ওটা হিসেব করলে দাঁড়ায় ইংরেজি ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তখন তো কালীঘাটের পটের যুগই শুরু হয়নি। তুমি উলটে কেন ভাবছ না ডেভিড, আমাদের এই মন্দিরই কালীঘাটের পটকে প্রভাবিত করেছিল?

হো হো করে হেসে উঠল ডেভিড। বলল, সরি মিট্র, ওই দ্যাখো টেরাকোটাটা কী বলছে। ডেভিডের হাতের আঙুলটা হুঁকো খাওয়া সাহেবকে ছুঁয়েছে। ইতিহাস বইতে ক্লাইভ-টাইভের যেমন পোশাক থাকে, টেরাকোটায় ওই রকমই পোশাক করা হয়েছে। ডেভিড বলল, দ্যাখো মিট্র, বাবুদের সঙ্গে মিশে হুঁকো খাওয়া শিখতে সাহেবদের বেশ কিছু সময় লেগেছে। ১৭৭০/৮০ সালের

আগে শিল্পীর ভাবনায় হুঁকো খাওয়া সাহেব আসতে পারে না। সুতরাং, ওই টেরাকোটা ব্লকটা মন্দির প্রতিষ্ঠার বেশ কিছু পরেই লাগানো হয়েছে। প্রথমে ওই মন্দিরটা ন্যাড়া মন্দিরই ছিল। গ্রামটা যখন নতুন করে তৈরি হল তখনই বোধহয় মন্দিরে অলংকরণ হয়েছিল। গ্রামের নাম তো নবাসন, তাই না? মিনস নিউ কলোনি! খোঁজ করে দ্যাখো তো গ্রামটাকে নতুন করে বিল্ড আপ করতে হয়েছিল কেন?

একটা মন্দিরের অলংকরণের পিছনে এত কিছু থাকে? এত গল্প কথা? ইতিহাস-ভূগোল-নৃতত্ত্ব! তখন মনে হল অনেক পড়াশুনো করতে হবে। অনেক।

আমাদের গ্রামে লাইব্রেরি কোথায়? বাগনানে একটা আছে বটে, তাতে চলবে না। কলকাতা যেতে হবে। কলকাতা যাওয়া আসার খরচ কম? ইনকাম নেই মোটে। তখন এক বুদ্ধি করলাম। আমাদের গাঁয়ে একটা মুদি দোকান ছিল। ওর মালিক ছিলেন ষষ্ঠী গাঁতাইত। উনি করতেন কী ছেলেকে দু'দিন অন্তর দোকানে বসিয়ে কলকাতা যেতেন মাল কিনতে। ওর ছেলে তখন দোকানে বসে মুনি মুনী মুনয়ঃ। মুনিম মুনী মুনিন করত। আমি ষষ্ঠীদাকে বললুম, দাদা, আপনার বড় অসুবিধে দেখতে পাচ্ছি, আমায় বরং আপনি একটা মাস্থলি করে দিন, আমি কলকাতা গিয়ে আপনার মালপত্র নিয়ে আসব খনে।

ষষ্ঠীদা দাঁতে জিভ কেটে বললে, ও কী কথা? কায়েতের ঘরের বড় মানুষকে দিয়ে মাল বয়াব? আমি বললুম, মাল বইলে মান যায় না। বিদ্যাসাগরের গল্প জানেন তো, সে আমার কোনও অসুবিধে হবে না, কম্যুনিস্ট পার্টি করা লোক কিনা...

শেষ অব্দি রাজি করালুম। একটা মাস্থলি করিয়ে দিলে, আর রোজ দু' আনা করে পয়সা। সকালবেলা বেরতুম, হাওড়া ইস্টিশনে নেবে একটা ফিরপোর রুটি কিনতুম, এরপর হেঁটে কখনও ন্যাশনাল লাইব্রেরি কখনও বিডন স্ট্রিটের চৈতন্য লাইব্রেরি, সারা দিন পড়াশুনো করে এটা ওটা নোট নিয়ে বিকেলবেলা পোস্তাবাজারের পাইকিরি দোকান থেকে মাল কিনে দু' হাতে দু' ব্যাগ নিয়ে ট্রেনে উঠতুম...।

গলা ধরে উঠেছিল আগেই, এবার চোখ ফেটে জল বেরুল রমাপদর। দু' হাতে মুখ ঢাকলেন।

বীণাপাণি ওই মেয়েটিকে বললেন, থাক, ওনাকে এখন আর বকাবেন না। মেয়েটি টেপ রেকর্ডার অফ করল। বলল, থাক। আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না এখন। কিন্তু কাঁদছেন কেন?

রমাপদ মিত্র কিছু বললেন না। চোখ মুছলেন হাতের চেটোয়। শুয়ে পড়লেন। আবহাওয়াটা কী রকম গম্ভীর হয়ে গেল।

মেয়েটি আবার বলল, আপনি বোধহয় ভাবছিলেন এত কষ্ট করলেন জীবনে অথচ কী-ই বা তেমন পেলেন।

রমাপদ বললেন, না গো, ছিঃ, ওসব নয়। কী মনে হয়েছিল জানো, এত কষ্ট করে কাজ শুরু করেছিলুম তো, শেষ কাজটা করে যেতে পারব না, চার হাজার ইনসক্রিপশন কালেক্ট করেছিলুম, ওগুলোকে ক্লাসিফাই করে অ্যানলিসিস করব ভেবেছিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে মরণ আমাকে অলরেডি দুই তালাক দিয়ে দিয়েছে। থার্ড তালাকটির অপেক্ষায় আছি। আমার শেষ না হওয়া কাজগুলোর কথা ভেবে হঠাৎ দমক মেরে কান্না এসে গিয়েছিল। ও কিছু নয়। সরি। আর কী জিজ্ঞাসা করবে বলো। মেয়েটি একটু অবাক চোখে তাকায়, তারপর চলে যায়, যাবার আগে একটু মিষ্টি হাসে।

এবার সুদেষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে গৌর আর পরিমল। সুদেষ্ণার মুখে হাসি। বোধ হয় খবর ভাল।

রমাপদ জিজ্ঞাসা করেন, কীরে, ছেলের খবর কী?

সুদেষ্ণা বলল, আর বলবেন না দাদা। গুজরাত যাচ্ছিল ছেলে, দাঙ্গা থামাবে বলে।

বলিস কী?

উঠে বসলেন রমাপদবাবু।

কী আর বলব। ট্রেনে উঠে বসেছিল। শুভ আর ওর এক বন্ধু। ওদের একটা কমন পেন ফ্রেন্ড থাকে আমেদাবাদে। ছেলেটা মুসলিম। দাঙ্গায় কেমন আছে জানতে ফোন করেছিল ওকে। ও জানিয়েছিল ওর এক বোন মারা গেছে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে। ওরা তখনই নাকি ঠিক করে ফেলে দাঙ্গা থামাতে গুজরাত যাবে। কোত্থেকে টিকিটের টাকা জোগাড় করেছে কে জানে, আমেদাবাদ এক্সপ্রেসে চেপে বসল। বিলাসপুরে উঠেছিল এক বাঙালি পরিবার, ওরা নাকি রায়পুর যাচ্ছিল। ছেলে দুটোর সঙ্গে কথা বলে ওদের গণ্ডগোল মনে হল। ওরা রায়পুরে নামিয়ে নিয়ে কলকাতায় ফোন করেছিল। ভাগ্যিস। তারপর আমরা রায়পুর গিয়ে ওদের নিয়ে আসি।

কোন ক্লাস যেন তোর ছেলের?

ইলেভেন।

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ স্পর্দ্ধায় নেয় মাথা তুলবার ঝুঁকি।

দুঃসহ নয়, দুঃসাহস। গুজরাত গিয়ে পড়লে কী বিপদটাই না হতে পারত ভাবুন রমাদা। ভাগ্যিস লোকগুলো খবর দিয়েছিল। ভাল লোক এখনও আছে, বলুন...

তাই তো। আছেই তো। ভাল লোক হয়। তোর ছেলেটা যেমন হবে। সবাই বলছে এ প্রজন্ম গোল্লায় গেছে। অথচ তোর ছেলে, ছেলের বন্ধু ওরাও তো এ প্রজন্মেরই ছেলে।

গৌর তখন বলল, আমাদের বাড়ির এক গল্প বলি শুনুন, ওই যে, বাসনউলিগুলো আসে, পুরনো শাড়ি কাপড় নিয়ে স্টিলের বাসন দেয়, ওরকম একটা বাসনউলি এসে বাসন নেবার জন্য বসেছিল। মা বলছিলেন এখন বাসন দরকার নেই। তবু খুব জোরাজোরি করছিল। শেষকালে বলল ওর এক বচপনের সহেলি বাচ্চাদের নিয়ে ওর ডেরায় এসে উঠেছে কারণ ওদের ঘর নেই, আগুনে শেষ, জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঘর কোথায়? কী একটা জায়গার নাম বলল, গুজরাতের। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কী? বলল অন্নপূর্ণা। আর সহেলির নাম? বলল, রেহেনা। উসকি তাল্লাক হুয়ী।

একটু নিস্তব্ধতা। গৌর বলল, ঠিক যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা বানানো গল্প। তাই না?

সুদেষ্ণা কিছু বলতে পারছিল না। আসলে ওর বুকের মধ্যে তখন মন্দির কারুকার্য তৈরি হচ্ছিল।

রমাপদ বললেন, আচ্ছা, তোমরা কেউ তাল্লাক কথাটার প্রচলিত অর্থ ছাড়া অন্য কোনও মানে জানো?

প্রচলিত অর্থ বলতে?

ওই তো, মুসলমানি মতে যেটা ত্যাগ করা। বউকে তালাক দেয় না, সেই। ওই রেহেনার যা হয়েছিল।

না, অন্য কোনও মানে?

না। জানি না তো। আছে নাকি? হঠাৎ তাল্লাক নিয়ে পড়লেন কেন?

রমাপদ তখন বললেন সেই মন্দির গাত্রের শিলালিপির কথা। যেখানে তাল্লাক শব্দটি রয়েছে।

এটা কোন মন্দিরে দেখেছেন?

আলমণিপুর। হুগলি জেলা। অদ্ভুত নাম তো, সুদেষ্ণা বলে। জানেন তো, অ্যালুমনিয়ামের বাসনকে গ্রামেগঞ্জে আলমনি বলে।

অ্যালুমনিয়াম থেকে নিশ্চয়ই আলমণিপুর হয়নি। গৌর বলল।

আশেপাশে মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম আছে বোধহয়, সুদেষ্ণা বলল।

না গো, চারিপাশে হিন্দু গ্রামই তো দেখেছিলুম মনে হচ্ছে। সন্ধেবেলায় আজানের শব্দও শুনিনি।

বীণাপাণি দেখল কী যে ব্যাপার, তালাক কথাটাকে নিয়ে সবাই গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছে।

একটু পরেই ঘণ্টা বাজল। আলোগুলো সব বরিক পাউডার মাখা হয়ে গেল। ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ। বিছানাটা আবার হয়ে গেল বেড। সবাই ধীরে ধীরে চলে গেল। আবার প্রতীক্ষা। আগামীকালের জন্য। বাতাসে ওষুধ গন্ধ ফিরে এল ফের। সাদা নার্সটি এসে নীরবে ইনজেকশন

দিয়ে চলে গেল। গলায় রবারের নলে জিজ্ঞাসা জড়িয়ে ডাক্তারবাবু এলেন। কী ব্যাপার? পা-টা ফুলেছে দেখছি। কাল আবার একটু ডায়ালিসিস, জানেন তো?

হ্যাঁ। জানি। কালকের ডায়ালিসিস হয়ে গেলে ছেড়ে দেবেন তো? একটু কাজ ছিল।

ছেড়ে দেব কী বলছেন? সাত দিন বাদেই—আবার একটা ডায়ালিসিস করতে হবে যে।

রমাপদ বুঝতে পারেন ওর আর মুক্তি নেই। আর কয়েকবার হয়তো ডায়ালিসিস করা যাবে, তারপর আর তাতেও কাজ হবে না।

নার্সটি এল। হাতে একটা টুকরো কাগজ। বলল, একটা ফোন এসেছিল। গৌর মৌলিক নামে একজন ভবানীপুরের একটা বইয়ের দোকান থেকে জানালেন সুবল মিত্রের অভিধানে আছে তালাক মানে হল—

এবার কাগজের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে বলল, দিব্যি দেয়া, শপথ, প্রতিজ্ঞা।

ও। আচ্ছা, আচ্ছা।

নীল খাতাটা খুললেন, রমাপদ। 'নিষেধ' বোঝাতে গিয়ে 'শপথ' শব্দটার ব্যবহার কোথায় যেন দেখেছেন উনি। ৯৩ নম্বর টালিগঞ্জ রোডে হরিহর ধাম মন্দিরের প্রবেশ পথে পাথুরে লেখা : সকলের চরণে আমার এই নিবেদন

দেবালয়ে যাইবে না করিয়া আরোহন
নিষেধ বিধি কহি কিছু সবার অগ্রভাগে
গাড়ি পালকি ঘোড়া গজাদি নিষেধ আগে
পাদুকা পাদেতে আর শিরে ছত্রধরে
না যাইবে গঙ্গাস্নানে দেবের মন্দিরে
মুনিবাক্য হেলন করে যাইতে হাজার মন
শপথ আছয়ে প্রবেশ করিতে অঙ্গন।

ডাক্তার তরফদার ওয়ান টিস্পুন ফুল মতো হেসে বললেন, কাল সকালে আবার দেখা হচ্ছে, ভাল থাকবেন!

ভাল থাকবেন শুনলেই রাগ ধরে রমাপদর। ভাল থাকাটা যেন নিজের ইচ্ছেতে হয়। তবে আজ কিন্তু ভাল থাকা যেতেই পারে। কী শুভ দুটো ঘটনা শোনা গেল। শুভ আর বাসনউলি।

বীণাপাণির কাজ নেই তেমন। বেডটা ঝেড়ে দিল। গ্লাসে জল ভরে দিল। একটু পরেই খাবার আসবে। রাত আটটায় ওর ছুটি। রমাপদ একদিন মাথা ঘুরে পড়ে যায়। এর পরই সুদেষ্ণা গৌর তপনরা মিলে বীণাপাণিকে রাখার ব্যবস্থা করেছে। রমাপদর দুই ছেলে। মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। ওরা কমই আসে। ব্যস্ত। বীণাপাণি বলে বউদিকে অনেক দিন দেখছি না। ভাল আছেন তো উনি?

আসতে কত কষ্ট বলো, বাত ব্যাধিতে ধরেছে কিনা...। তা ছাড়া নতুন নাতনিটাকে নিয়ে কত ব্যস্ত থাকতে হয়, বলো...

বীণাপাণি খুঁচিয়েও স্ত্রী-পুত্র সম্পর্কে কোনও কটু বাক্য বার করাতে পারে না। পরচর্চা কে না ভালবাসে।

নার্সটি আবার এল। হাতে টুকরো কাগজ। কপালে ডবল দাঁড়ির মতো দুটো রেখা। বিরক্তির। বলল, আবার ফোন সুদেষ্ণা নাগ। ফোনে যা বলেছেন, আমি লিখে নিয়েছি। এই যে। টুকরো কাগজটায় লেখা—চৈতন্য চরিতামৃতে আছে 'বীর বলে তো, তোকে তালাক ভেড়ের ভেড়ে স্ত্রী।'

তবে কি তালাক শব্দটি হিন্দুদের বাংলাতেও প্রচলিত ছিল!

নার্সটি যাবার সময় বলে গেল, 'আরও ফোন আসবে নাকি!'

রমাপদ বীণাপাণির দিকে তাকালেন।

বলো তো বীণাপাণি, তোমাদের দেশের হিন্দুরা তালাক শব্দটা নিজেদের কথায় ব্যবহার করে?

বীণাপাণি বলে, কে জানে, শুনিনি তো।

তোমার গাঁয়ের নাম কী?

আলমণিপুর।

বলো কী? রমাপদ নড়েচড়ে বসলেন। ওর দেশ হুগলি জেলায়। এটা জানতেন কিন্তু গাঁয়ের নামই জিজ্ঞাসা করেননি আগে? ছিঃ। এমন তো হবার কথা ছিল না।

তোমাদের গাঁয়ে একটা পুরনো মন্দির আছে, বীণাপাণি?

আছে। উচেষ্ট শিবের মন্দির। কেউ যায় না, ঠাকুর নেই, তবু শিবরাত্তিরে মেলা হয়।

কেউ যায় না কেন?

কেন যাবে? ঠাকুর নেই তো।

বিগ্রহ কোথায়!

শুনিচি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে।

কেন?

ছোটবেলা থেকেই দেখেছি মন্দিরের ভিতরে কোনও ঠাকুর নেই। বাইরে একটা বটগাছ আছে, ওখানে এখনও লোকে মানসিকের ঢেলা বাঁধে, আর গাছতলায় শীতলা মনসা রেখে যায়। তবে শুনেচি অনেক আগে ওখানে শিবপুজো হত, আর ওই শিব নাকি খুব জাগ্রত ছিল। তারপর নাকি একজন মোসলমান ওই শিবকে পুজো করতে লাগল। সে অনেক দিনের কথা। সেই মোসলমান নাকি একজন পির ছিল। একদিন শিব মন্দিরের ভিতরে ওই পিরের ডেড বডি পাওয়া যায়। তারপর থেকেই ওই মন্দিরে কেউ যায় না। ছোটবেলায় একটা গান শুনতাম, কালো কাপড়পরা এক মোসলমান গান গাইত। আমানুল্লার কিসসা। তাতে ওই মন্দিরের কথা কিছু ছিল। এখন আর মনে নেই।

মনে করার একটু চেষ্টা করো না, প্লিজ...বীণাপাণি সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করে। কিছু বিড়বিড় করে। রমাপদ ব্যাকুল তাকিয়ে থাকে বীণাপাণি মুখের দিকে।

> ...ওরে। আমানুল্লা বলে আল্লাতালা সর্বত্র রয়েছে।
> পানিতে আসমানে গাছে পাথরেও আছে
> আল্লার হুকুমে পির মন্দির রচিল
> আল্লা শিব বলি পির সেজদা করিল...

তারপরে?

মনে পড়ে না

প্লিজ বীণাপাণি, চেষ্টা করো...

নাঃ।

উঃ।

রমাপদ মাথায় হাত দেন। বলেন, মুছে গেল?

একটুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, বীণাপাণি, ও বোধ হয় আল্লাশিব বলেনি। জানো, ওটা বোধহয়-- আল-হাসিব। মানে হিসেব নেবেন যিনি, মানে ঈশ্বর। মানুষের মুখে ওই আল হাসিব-ই আল্লাশিব হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ মেলায়। মেলায় মেলায়।

একটা জায়গা মনে পড়ছে একটু। বীণাপাণি বলে। আমার নাম ছিল বলে।

> বিনা হাওয়া বিনা পানি হল ইন্তেকাল
> আখিরাতে কেয়ামতে...

কী যেন ছিল, মনে পড়ে না আর।...

বীণাপাণি, ওটা বোধ হয় আখের রাত হবে। শেষ বিচারের রাত। আমানুল্লার শেষের কথাটা। জল ছাড়া, বাতাস ছাড়া আমানুল্লাকে মরতে হয়েছিল।

আটটা বাজে। দুধ পাউরুটি খেয়ে নেন। আমার ডিউটি শেষ। খাওয়া শেষ করে আপনি ভাবুন আবার।

বীণাপাণি, দরজা খুলে যাচ্ছে। দ্যাখো, মন্দিরটার নাম বলেছিলে উচেষ্ট শিবের মন্দির। আসলে ওটা উচ্ছিষ্ট শিব। ওই শিব উচ্ছিষ্ট হয়ে গেল বলেই গঙ্গায় বিসর্জন দেয়া হল, তাই না?

তাই হবে। দুধরুটি খেয়ে নেন।

গ্রামটার নাম আলমণিপুর। ওটা আল মোমিন থেকে আসেনি তো? আরবিতে আলমোমিন মানে নিরাপত্তা দাতা। বুঝলে সুদেষ্ণা।

আমি বীণাপাণি।

ও, সরি। ঠিক আছে। মোমিনপুর আছে না, কলকাতায়, থাকগে। কিন্তু ওটা আল মোমিন থেকেই আলমণি।

রমাপদ চোখ বোজেন। দেখতে পান হুগলি নদীতে পর্তুগিজ আর ডাচ বণিকদের জাহাজের পাল সপ্তদশ শতাব্দীর লবঙ্গ গন্ধমাখা হাওয়ায় দুলছে। মুর্শিদাবাদের তখত এ বসে আছেন আলিবর্দি। বাংলার ফৌজদার তখন কে? সুজা খাঁ? মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়েছে। মারাঠারা হুগলি ছেড়ে চলে গেল, আর প্রচুর মুসলিম সেনা বসে গেল হুগলি জেলায়। গঙ্গার কাছাকাছি। ধর্মান্তকরণও হল। ওই যে গ্রামটা, যে গ্রামে একটা প্রাচীন শিব মন্দির ছিল, আর ওই গ্রামটারও অন্য কিছু নাম ছিল হয়তো। সেই নামটা বদলে গেল। নতুন নাম হল আলমোমিনপুর। হাজি-মৌলভিরা যেমন এসেছিল ফকির দরবেশ সুফিরাও এসেছিল। শ্বেত শুভ্র দাড়ি শোভিত আমানুল্লাকে যেন দেখতে পান রমাপদ। দেখেন তাঁর নিষেধের হাত। মন্দির ভাঙতে দেয়নি আমানুল্লা। সে নিজে রক্ষা করেছিল। হয়তো সেই অঞ্চলে ওর প্রতিপত্তি ছিল, সে আগলে রেখেছিল ওই মন্দির, অপবিত্র হতে দেয়নি। সে পাথরে লিখিয়ে রেখেছিল, "শ্রীশ্রী বাটিতে কেহ পাদুকা পায় দিয়া জাইবেন নাই যে জাইবেন তাহাকে তাল্লাক।" এ জন্য ওকে হয়তো লড়তে হয়েছিল, কষ্ট পেতে হয়েছিল। সে সময়ের মৌলবাদীরা ওকে তাল্লাক দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কি মৌলবাদীদের হাতে খুন হতে হয়েছিল ওকে, মন্দিরের ভিতরে? "বিনা হাওয়া বিনা পানি হল ইন্তেকাল।"

তারপর হয়তো ইতিহাসের চাকা ঘুরেছিল, পালাবদল, আবার নতুন জনবিন্যাস, নবাসন। হিন্দুরা ফিরল আবার। কিন্তু ওই মন্দিরটি কি গ্রহণ করেনি আর, ম্লেচ্ছ স্পর্শে অপবিত্র শিবলিঙ্গটি, উচ্ছিষ্ট, শিবলিঙ্গটি গঙ্গায় বিসর্জিত হল। কিন্তু মন্দিরটি বেঁচে রইল উচেষ্ট শিবমন্দির হয়ে। বেঁচে আছে শিবরাত্রির মেলা, প্রাচীন বটবৃক্ষটিও বেঁচে আছে। যার শাখায় শাখায় ঝুলন্ত পাথরে আছে কামনা বাসনা, আল্লা শিব। নাকি আল-হাসিব!

নিজে নিজে কত কথা বলছেন। খেয়ে নেন। আটটা বেজে গেল, এবার পালাব।

চলো বীণাপাণি। পালাই।

ভুল বকছেন। দেখি, আবার জ্বর এলো কি না। কপালে হাত দিল বীণাপাণি।

জ্বর তো হয়নি, তবে?

তুমি তবে চলে যাও বীণাপাণি।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবেন। রাত করবেন না। কাল আবার ডাইলিসিস আছে।

হ্যাঁ। ডায়ালিসিস। আর ক'টাই বা? আর দু-চারটে, ব্যাস।

চোখ বুজে থাকেন রমাপদ মিত্র। বীণাপাণি কপালটি ছোঁয়। চুলেও একটু হাত বুলিয়ে দিল যেন। মায়া হাত। বলল, যাই।

রমাপদ চোখ বুজে শুয়ে থাকেন। কত কাজ ছড়ানো-ছিটোনো। কত কাজ বাকি। কত কাজ করতে ইচ্ছে করে, ওরা তো রইল। ওরা করুক, গড়ুক।

আমানুল্লাকে দেখতে পান রমাপদ। তারপর সেই আমানুল্লা টেরাকোটার ফলকে বসে যায়। টেরাকোটা ফলকে বসে যায় সুদেষ্ণার আঠারো বছরের ছেলেটা, বাসনউলি বউ। নিজেরই গায়ে। রমাপদ তখন নিজেই মন্দির হয়ে উঠছেন ক্রমশ, সারা গায়ে টেরাকোটা।

এই শ্রীশ্রী বাটিতে হে মরণ তুমি আসিবে নাই। যদি আসিবে তবে তাল্লাক, তাল্লাক, তাল্লাক।

শারদীয় বর্তমান, ২০০২

দর্পচূর্ণ পালা

আজ অষ্টম রজনীর পালা। শূর্পণখার দর্পচূর্ণ। এর আগে হয়ে গেছে রামের মায়ের পোয়াতি হওয়া, রাম-লক্ষ্মণের জন্ম, তাড়কা বধ, হরধনু ভঙ্গ, রামের বিয়ে, মন্থরার বজ্জাতি আর রাম-সীতার বনবাস। আজ অষ্টম রজনীতে শূর্পণখার দর্পচূর্ণ। বিশ্বামিত্র মুনি মাইক হাতে নিয়ে সেই থেকে নানারকম 'বিশেষ ঘোষণা' করে চলেছেন। তবে পালা নিলামের কথাই বেশি করে বলা হচ্ছে। 'আজ অষ্টম রজনীতে অষ্টমঙ্গলার মালার এসপেশাল নিলাম হইবে। যে ভাগ্যবানের ঘরে এই মালা যায় তাঁর সর্বকাজ শুভ হয়, কুনজর কেটে যায়, বদহাওয়া ঘুরে যায়, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয় না, বউ-শাউড়ির মিল হয়। আইবুড়ির বিয়ে হয়, বেকার ছেলের চাকরি হয়...।' মাইক বাজছে ব্যাটারিতে। এইসব বিশেষ ঘোষণার মাঝে মাঝে ক্যাসেটে গান বাজছে। দুটি মাত্র ক্যাসেটই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। গোষ্টগোপালের পল্লিগীতির রিমেক, আর বাবুল সুপ্রিয়। খালবাঁধের ওপর চারকোনায় চারটি বাঁশ পুঁতে নীল পলিথিন বেঁধে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। খালের ওপারে মেদিনীপুর জেলা। এপারে হুগলি। ওপারের গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে, এপারেরটা সি পি এম-এর। মাঝে বাঁশের সাঁকো।

মাঠ দাপানো হেমন্তের হাওয়ায় পলিথিন ক্রমাগত শব্দ করে যাচ্ছে। মাঠের ধান রোদ্দুরের রং খেয়ে হলুদবরণ। খালবাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে ধানখেত দেখছে কেউ কেউ। কতবার দেখেছে এই ধানখেত, তবু পুরনো হয় না। কমবয়েসিরা সব আগেভাগেই ভিড় করেছে পলিথিন তলায়। ওখানে সাজগোজ হচ্ছে। টিনের বাক্সর মধ্যে রয়েছে মাথার মুকুট, চুলের খোঁপা। সন্ন্যাসীর দাড়ি...। যে লোকটা তৃতীয় রজনীতে তাড়কা রাক্ষসী, ষষ্ঠ রজনীতে মন্থরা, সেই আজকে শূর্পণখা সাজছে। খুব মজার লোক। লোকটা একটু মোটাসোটা, ভুঁড়িওলা। রাম, লক্ষ্মণ, সীতাও মেকআপ নিচ্ছে কিন্তু শূর্পণখাকে ঘিরেই ভিড় বেশি। একটা বেশ বড়সড় ব্রেসিয়ারের ভেতরে প্রচুর ছেঁড়া মশারির টুকরো গুঁজে শূর্পণখা লক্ষ্মণকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। লক্ষ্মণ জানে ওকে এখন কী করতে হবে। মুখের বিড়িতে দুটো সুখটান দিয়ে শূর্পণখার ব্রেসিয়ারের হুক বেঁধে দিল। লাল স্কার্টপরা ইস্কুলের মেয়েগুলো লজ্জা পেয়ে সরে গেল। ছেলেগুলো হাসাহাসি করতে লাগল। তাতেই প্রশ্রয় পেয়ে লক্ষ্মণ শূর্পণখার সামনে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করে বলল, হয়নি, আরও ন্যাকড়া গোঁজ। এরপর নিজেই কিছুটা ন্যাকড়া ঠেসে দিল। পরমাণিকদের ঘরের ছেলেটা বাসস্টপের কাছে দর্মার বেড়া দিয়ে ডবল আয়না ফিট করে নতুন সেলুন দিয়েছে। ছেলেটা শূর্পণখাকে জিজ্ঞাসা করে—বলি তাড়কা রাক্ষসীর পালায় অত বড় বড় কী দিয়ে বানিয়ে ছিল গো? শূর্পণখা হাত নাড়িয়ে বলল, ভেতরে দুটো লাউয়ের বোঁটায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম যে, পরের দিন আবার ডালে দিয়ে খেয়ে ফেললাম। এবার হাসির রোল উঠল।

এইসবই তো মজা। এক মাস ধরে চলবে। গ্রামে বিদ্যুতের খুঁটি বসেছে বেশ কিছুদিন হল। তার চড়েনি এখনও, তবে দড়ি চড়েছে। দড়িতে ভোটের প্রতীক চিহ্ন ঝোলানো কাগজগুলিকে জলবাতাস এতদিনে নিয়ে নিয়েছে বলে দড়িগুলোই রয়ে গেছে শুধু। ভোটের চিহ্নমাখা দড়িতে দোয়েল দোল খায়। শুধু এইসব মজায় তো মানুষ মজে না আর, রামযাত্রার দিকে তাই বছরভর অপেক্ষা থেকেই যায়। বিদ্যুত না এলেও টিভি চলে কয়েকটা ঘরে। ব্যাটারিতে। দু'মাইল দূরের ফুড়সুনচণ্ডিতে ভিডিও হল আছে, ওখানেও ভিড় হয়। তবে এইসব রামযাত্রার মজাই আলাদা। এটা

তো উৎসব। মানুষ পুরনোকে ছাড়ে না সহজে। এত যে পরিবর্তন, এত কিছু, তবু গ্রামে গেলে দেখা যায় কুম্ভকাররাই এখনও মাটির পাত্র বানায়। কর্মকাররাই হাটের কোণে হাপর ঠেলে; এ তো গেল গ্রামের কথা। কিন্তু ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, কমপিউটার, মাইক্রো-আভেন, মিক্সি গ্রাইন্ডার সমন্বিত উচ্চবিত্ত কিচেনেও আমরা এখনও ধরে রাখি প্রাচীন প্রস্তর যুগ। শিল নোড়াটাকেও রেখে দিই।

এই রামযাত্রার দলটা গত ৭/৮ বছর যাবৎ এখানে আসে আশ্বিন-কার্তিকে। এ বছর পার্টির নতুন মাতব্বরদের কেউ কেউ বলছিল রামযাত্রা বন্ধ করে দাও কারণ রামকে নিয়ে এখন খুব মৌলবাদ হচ্ছে। কিন্তু মৌলবি নিজামুদ্দিন, মানে কমরেড নিজামুদ্দিন রামযাত্রা বন্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। মৌলবি সাহেব হচ্ছেন এই খিজিরপুর গ্রামের প্রধান।

খিজিরপুরে হিন্দু-মুসলমান প্রায় আধাআধি। এতদিন কোনও ঝুট-ঝামেলা হয়নি। কারবালা মাঠও আছে, শীতলার থানও আছে। ঝাড়ফুঁক, শেকড়বাকড়, দোয়াদরুদ, সবই একসঙ্গে চলে। তবে হালে একটু আধটু কেমন যেন হচ্ছে। গোঁসাইদের একটা রাধামাধব মন্দিরের পাশে একটা টিনের চালা করে হনুমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মসজিদে দুটো মিনার উঠেছে, ব্যাটারি লাগানো মাইকে আজান দেওয়া হয়। মুসলমানদের মধ্যে কয়েক জনের পা-জামার ঝুলটা যেন হঠাৎ করে কমে গেছে মনে হয়। তবে এই রামযাত্রার আসরে অনেক মুসলমানই রামযাত্রা দেখতে আসেন। মাথায় টুপি পরা কয়েকজনও পিছনের দিকে বসেছেন। মুসলমান মহিলাদের মধ্যে আসরে এলে কয়েকজন এখনও বোরখা পরেই আসেন। সীতার দুঃখে বোরখার ভিতরে থাকা চোখের পানি ওরা কালো বোরখায় মুছে ফেলে। রামযাত্রাটির অধিকারীর নাম শশধর পাত্র। মেদিনীপুরের কালিয়াচকে ওর ঘর। ও বশিষ্ঠ মুনির রোল করেছে, সীতার বাবা জনক রাজাতে ও নেমেছিল, কিন্তু ওর ফাটাফাটি রোল হচ্ছে কুম্ভকর্ণ। রাম এ বছরে নতুন। আসল রাম গত বছর হলদিয়া টাউনে লেবারের কাজ করতে গিয়েছিল বর্ষায়, আর ফেরেনি। কারেন্ট খেয়ে মরেছিল। শশধরের কাছে একথা শুনে সবাই খুব দুঃখ পেয়েছিল।

রামযাত্রা শেষ হয়ে গেলেও রাম-লক্ষ্মণ থেকে যায়। শুকনো পাতায়, বাতিল মৌচাকে, জমাজলের শ্যাওলায় সীতার দুঃখ রয়ে যায়। শুকনো মাঠের হাওয়ায় একা কেউ সীতাহারা রাম হয়ে গিয়ে গান গায়—

যা রে লক্ষ্মণ দেশে যা রে
দেশে গিয়ে বলবি মা কে
হয়ে আমি সীতা হারা
রয়েছি যে পাগল পারা
খাওয়া নাওয়া ভুলে আমি
রয়েছি দারুণ শোকে
দেশে গিয়ে বলবি মা কে
যারে লক্ষ্মণ দেশে যা রে...।

এবছর যে ছেলেটি রাম করছে, ও এবছরই প্রথম রাম করছে। আগে নাকি ঢোল বাজাত। ও দেখতে বেশ ভাল। চোখা নাক, বড় বড় চোখ, লম্বা চেহারা। আগের রামের চেয়েও গলায় বেশি সুর। বনবাসে যাবার সময় কৌশল্যার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় রাম গান দিয়েছে—কেঁদো না কেঁদো না মাগো অঞ্চলেতে মুছ আঁখি, পদরেণু দাও গো মাতা সর্বদা এই মাথায় রাখি। সবার চোখেই জল এসেছে। এই গানটা এবারের নতুন।

প্রাইমারি ইস্কুলের ঘরে রামযাত্রার দলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। বেলা এগারোটা পর্যন্ত স্কুল, তাই সকাল হলেই বেরিয়ে যেতে হয়। স্কুল ছুটি হলে ওরা ঘরে ঢোকে। স্কুলের বাইরে তেঁতুলতলায় চালডাল ফুটিয়ে নেয়। খাওয়া-দাওয়ার পরে স্কুলের বারান্দায় ওরা একটু গড়িয়েও

নেয়। স্কুলের কাচ্চাবাচ্চারা অনেক সময় দুপুরবেলায় ঘুমন্ত নাটুয়াদের দেখতে আসে। 'উই দ্যাখ উটা তাড়কা রাক্ষসী, মুখে মাছি বইসেছে। উটা দশরথ রাজা। লুঙ্গিটা ছিঁড়া। উটা নারদ মুনি।'

ছোলাবাদামওলা এসে গেছে। কাঠের পাটার উপরে ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ-লঙ্কা কুঁচোনো চলছে। রেল বিভাজন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, শেয়ারবাজার, ত্বকের যত্ন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খবর কাগজের টুকরোয় পেঁয়াজকুঁচি, লঙ্কা, লেবুর রস মিশিয়ে ছোলাবাদাম তৈরি করছে ওরা।

সূর্য ডুবল সেই বুগির বিলের হিজিবিজি গাছগাছালির পেছনে। কাকেরা ফিরছে, বকেরা ফিরছে। তিন ইটের উনুনে খড়কুটো জ্বালিয়ে চা করে দিল সীতা। ঢোলে চাঁটি পড়ল। মঞ্চের চারিপাশে রাখা হল চারটে ধামা। হ্যাজাকে পাম্প করতে উবু হয়ে বসল রাবণ রাজা। প্রথম রজনীতে ক্লাবের ছেলেরা ডিজেলের জেনারেটর এনেছিল। বড্ড শব্দ হয়, ডায়লগ শোনা যায় না। বাঁশের দুই খুঁটিতে দুটো 'হ্যাচাক' বাঁধা হল দড়ি দিয়ে। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে 'যাত্রা-যাত্রা-যাত্রা রামযাত্রা। আজকের পালা শূর্পণখার দর্পচূর্ণ। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ। আমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ। রামযাত্রা দেখতে এলে কিছু কিছু চাল, ডাল, আলু, পয়সা সঙ্গে আনিবেন। মঞ্চের সামনে রাখা ধামায় মাগন রেখে দিয়ে যে যার আসনে বসে পড়বেন। সঙ্গে যে যার আসন নিয়ে আসবেন।'

বাঁধের ওপর লম্বা রাস্তার দুইদিকে মানুষজন বসেছে। যে যার বাড়ি থেকে যেমন পেরেছে আসন, পিঁড়ি, চাটাই নিয়ে এসেছে। মঞ্চের সামনে গোটাকত মোড়াও রাখা আছে গণ্যমান্যদের জন্য। গ্রামের ছেলে ভূদেব ভাল আড়বাঁশি বাজায়। ও বাজনদারদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। বলেছে সীতাহরণের পর রামের বিলাপে ও বাঁশি ফাটাবে।

মূলযাত্রা শুরু হবার আগে একজন লোক পাটের দাড়ি-গোঁপ লাগিয়ে গেঞ্জির ভিতরে কাপড়-চোপড় ঢুকিয়ে ভুঁড়ি বানিয়ে নাচতে নাচতে 'ফার্স দিতে' শুরু করলেন। মিনিট পাঁচেক ফার্স চলার পর রাম এলেন। রাম এসেই ডায়লগ দিলেন—আঃ, কী মনোহর এই পঞ্চবটী বন। পাখির কূজন, মৃদুমন্দ সমীরণ, পরির ড্যান্স। এইমাত্র গোদাবরীর শীতল বারিতে অবগাহন করে এসেছি, আঃ, গা জুড়িয়ে গেল গো। এবার ভাত খাব। বউ গেঁড়ি-গুগলি দিয়ে লাউশাক রান্না করেছে। ঠেসে ভাত খাব। খুব খিদে পেইছে। যাই তাড়াতাড়ি ঘরকে যাই। সীতা, বলি ও সীতা...।

এমন সময় শূর্পণখা ঢোকে। মিউজিক ঝনঝন। শূর্পণখা রামের দিকে লোভীর দৃষ্টিতে তাকায়। বলে—আহা মরে যাই। কী রূপ গো। একেবারে যেন সত্যিকারের মরদ। যেমন চোখ, তেমন নাক, তেমন চওড়া কাঁধ। যেন শারুক খাঁ। ওগো, নাম কী তোমার?

আমার নাম রাম। তোমার নাম কী?

আমি কামরূপিনী রাক্ষসী শূর্পণখা। একটু আলিঙ্গন দাও।

ছি ছি একথা বলে না। আমি বিয়ে হওয়া লোক! অন্য মেয়েছেলে আমি স্পর্শ করি না।

বিয়ে হওয়া লোক? হাঃ হাঃ হাঃ। ওই যে কুটিরে থাকো, একটা রোগা মতো মেয়েছেলের সঙ্গে, সে কি তোমার পত্নী? তবে আর একজন ব্যাটাছেলেকে দেখি যে? তুমি মিথ্যে কথা বলছ রাম। তোমরা দুই বন্ধু মিলে একটা মেয়েছেলেকে ধরে এনে ফুর্তি করতে এসেছ, সে কি আমি বুঝি না ভেবেছ?

ছি ছি ছি নারী, এমন কথা বলে না। একথা শুনলেও পাপ হয়। আর একজন ব্যাটাছেল্যা হল আমার প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণ। আমরা পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে এসেছি। সীতা আমার সহধর্মিণী সতী।

সতী? হাঃ হাঃ হাঃ ওই রোগা মেয়াঁছেলেটার মধ্যে কী আছে? গায়ে যদি একটু মাংস থাকত। ওকে আমি খেয়ে ফেলব। আমার একবেলার টিপিন হয়ে যাবে। তারপর তোমার সঙ্গে সুখে ঘর করব। এই দ্যাখ আমার কেমন রূপ, কেমন যৌবন...

শূর্পণখা ওর ন্যাকড়া ঠাসা বুক রামের সামনে নাচাতে থাকে আর গাইতে থাকে

এই মৌ মৌ মৌ
মৌ বনে
কত মধু
জমে থাকে...

ঠিক এমন সময় হাজির হলেন গ্রামপ্রধান নিজামুদ্দিন সাহেব। সঙ্গে খালের ওপাড়ের কানাপুখুরি গ্রামের প্রধান পরেশ সানা। ওরা দু'জনে পরস্পর বিরোধী দলের হলেও আজ একসঙ্গে রামযাত্রা দেখতে এসেছেন। ওদের দেখে দু-চার জন দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্লাবের ছোঁড়ারা মোড়া খালি করে দিল। শূর্পণখা গান থামিয়ে দিল। ক্লাব সেক্রেটারি মন্টু মিশ্র বলল, একটু লেট করে ফেললেন আপনারা। এই মাত্র শুরু হয়েছিল। মাথায় শিং সাঁটা শশধর পাত্র যে খর রাক্ষস হবে, সে এসে বলল, আরে তাতে কী, তাতে কী, ওরা নয় আবার ফের থেকে শুরু করবে।

আবার ফের থেকে শুরু হল। অবশ্য, নতুন করে আর ফার্স দেওয়া হল না। রামের ডায়লগ শুরু হল ফের।

আঃ কী মনোহর এই পঞ্চবটী বন। মৃদুমন্দ সমীরণ, পাখির কূজন, সম্মুখে সজ্জন, ঋষিজন...বলেই পরেশ সাহা মৌলবির দিকে হাত দেখাল।

মৌলবি সাহেব দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে মিটি মিটি হাসতে লাগলেন।

যাত্রা চলতে থাকল। শূর্পণখার প্রেম নিবেদন, রামের প্রত্যাখান হল। রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়ে বলল, আমার ভাই এখনও বিয়ে করেনি, তুমি ওকে বলো। শূর্পণখা লক্ষ্মণকে নাচ দেখাল। মিনিট পাঁচেক খেমটা নাচার পর লক্ষ্মণকে প্রেম নিবেদন করল।

লক্ষ্মণ বলল, হে শূর্পণখা, শুন। আমি নিজেই হলাম গিয়ে চাকর। রামের চাকর। আমাকে বিয়ে করে চাকরানি হতে যাবে কেন তুমি? বরং এক কাজ করো। রামকেই ভাল করে পটাও। ভাল করে পটাতে পারলেই রাম গলে যাবে। সীতাকে ত্যাগ করে তোমাকেই বিবাহ করবে। শূর্পণখা কী করে বুঝবে যে দুই ভাই মিলে ওকে মুরগি করছে। শূর্পণখা তখন বলল, অত পটানোর মধ্যে আমি নেই। অতসব পারব না বাপু। সীতাকে খেয়ে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যায়। এই বলে সীতার দিকে তেড়ে গেল। আর লক্ষ্মণ তখন নানা পোজ করে খড়্গটা নাচাতে লাগল। শেষ কালে শূর্পণখার নাকে গিয়ে যেই না লাগল, নানারকম মিউজিক বেজে উঠল। শূর্পণখা লুকোনো আলতার শিশিটা নাকে ঢেলে দিল, দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠল।

যাত্রাটা এখানেই শেষ নয়। এর পরে আর একটু আছে। শূর্পণখা কাঁদতে কাঁদতে ওর এক ভাই খর-এর কাছে গিয়ে নাকিসুরে নালিশ করল। খর তাঁর সেনাপতি দূষণকে বলল, যাও রাম-লক্ষ্মণকে এক্ষুনি বধ করে এসো। দূষণ যুদ্ধ করতে গেল। রাম বলল, তবে রে সন্ত্রাসবাদী, নে, মর—এই বলে তির ছুড়ল, দূষণ মরে গেল।

সীতা তখন একটা মালা নিয়ে রামকে বলল—তোমার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আমি এই মালাখানি তোমার গলায় পরাতে চাই। রাম সীতার হাত থেকে মালাটি নিয়ে বলল, শুন প্রিয়তমে, তোমার দেওয়া এই মালাখানি আমি গ্রহণ করলাম। তবে এটা আমি লক্ষ্মণের গলাতেই পরাতে চাই কারণ লক্ষ্মণই হল প্রকৃত বীর যে শূর্পণখার দর্পচূর্ণ করেছে। এসো লক্ষ্মণ, ভাই আমার, এই পুষ্পমাল্যখানি তোমার গলাতেই পরাতে চাই।

লক্ষ্মণ রামের পায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলে, রাম লক্ষ্মণের গলায় জবা, স্থলপদ্ম, করবী, নতুন ফোটা গ্যাঁদার সমন্বয়ে তৈরি মালাটি পরিয়ে দিল। ঢোল, কাঁসি, বাঁশি, হারমোনিয়াম বেজে উঠল। তালিও পড়ল।

শশধর পাত্র বলল, আপনারাও এবার রাম, লক্ষ্মণ, সীতাকে মালা দিন। সঙ্গে ওদের মুড়ি, চিঁড়ে, ফল, ফুল, মিষ্টি যে যা পারেন দিন। ওরা বনবাস করতেছেন। অথচ বন কোথায়, সব সাফ হয়ে

গেছেগা। ফলমূল নাই। আপনারা দিলেই রাম খেতে পাবে। আর মালা যদি দেন তবে ফুলের মালা না দিয়ে টাকার মালা দেন, আপেলের মালা দেন, কমলা লেবুর মালা দেন।

এই ব্যাপারটা এখানে নতুন নয়। একজন একটা কমা বিস্কুটের মালা বানিয়ে নিয়ে এসেছিল। কমা বিস্কুট হচ্ছে নকল বিস্কুট। ব্রিটানিয়া থিনের মতোই দেখতে কিন্তু নকল। আটার তৈরি। কমা লাকস, কমা সানলাইট, কমা পন্ডস এরকম অনেক কিছুই 'কমা মাল' বিক্রি হয় হাটে। যে দান করলেন তাঁর নাম নরেন খুঁটি। সীতা-রাম-লক্ষ্মণ কোরাসে গান ধরল—নরেন খুঁটি দানি ভাল দান করেছে রামায়ণের এই আসরে মান রেখেছে। শূর্পণখা এই সময় প্লাস্টিকের লাল প্লেট হাতে আসরে নেমে গেল। একটা বউ একটা টাকা দিল। শূর্পণখা গেয়ে উঠল—বউদিমণি ছেল্যা কোলে একশো পয়সা দান করেছে।

এইসময় দু-একজন উঠে যাবার উদ্যোগ করতেই শূর্পণখা লতা মঙ্গেশকারের 'না যেয়ো না রজনীর এখনো বাকি' সুরে গান ধরল—

না, যেঁয়ো না, মালা যে রয়েছে বাকি
রাম নামে দিয়ো না ফাঁকি
এখনও যে পালা বাকি
না, যেয়ো না...

তবু দু-চারজন উঠে গেল। শূর্পণখা রঙ্গ করল—যে যা পারছে চাটা বগলে তুলে ঘর যাচ্ছে। যা আছে কপালে ছেঁড়া কাঁথা বগলে। এসো হে লক্ষ্মণ, বিপদ বিলক্ষণ, সব হয়ে যাচ্ছে ফাঁকা, শুরু কর মালা ডাকা।

কমরেড মৌলবি এবং সাদা পাঞ্জাবি পরা তৃণমূল একই সঙ্গে হাসতে থাকে, তাইতে তেনাদের আশেপাশের লোকেরাও হেসে ওঠে। শূর্পণখা বলে যে পালিয়ে যাবে তাকে ছারপোকা কামড়াবে।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের গলা থেকে মালাটা তুলে নিয়ে দু-হাতে ধরে দর্শকদের দেখায় বলে, মালা ডাক দিচ্ছি। দয়া করে আপনারা ডাকবেন।

শূর্পণখা বলে, হে মা জগধারী মা গো...।

রামচন্দ্র—জগধারী নয়, জগদ্ধাত্রী।

শূর্পণখা—ভুল হয়ে গেছে। হে মা জগধ্যারিণী মাগো, যারা পালিয়ে যাচ্ছে তাদের ঘরে এমন ছারপোকা দিয়ো যেন সারারাত কুটুউস কুটুস, কুটুউ-উস্, কুটুস।

রামচন্দ্র—এই মালা ডেকে নিন। আজকের আসরে মান্যগণ্য ব্যক্তিরা আছে, আজ মনে হয় ভাল ডাক পাব। রাত্রে মণ্ডা খাব। আপনারা না খাওয়ালে রাম বেচারা খেতে পারে না।

একজন বলল, পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা।

অন্য একজন সাত টাকা হাঁকল।

কানাপুখুরির সাদা পাঞ্জাবি পরা নেতা পরেশ সাহা হাত উঁচু করে ডেকে উঠল, দশ টাকা।

তখন শূর্পণখা—

আরে নেতা দাদা কী দিল
হাটে যেন মুলোর কিলো
আরে, রামের মালার বহুত মূল্য
এর দাম হাঁকুন সোনার তুল্য।

দর্শকের একজন বলল—এত রাম রাম করোনি। রাম নিয়েই যত ঝ্যামেলা হচ্ছে চাদ্দিকে।

শূর্পণখা তখন কোমর নাচিয়ে বলল,

রামেই বাবরি, রামেই রাবড়ি
আবার হুইস্কির ভাই রাম
রামেই ঘোঁট, রামেই ভোট
রামেই অর্থ মোক্ষ কাম।

অর্থ মানে তো জানেন মহাশয়রা, রামের নামে যে যা পারছে টাকাপয়সা লুটছে, আমরা আর ক'পয়সা? মোক্ষ মানে হল গে গদি। রামের চাল চেলে কত নেতা গদি পাচ্ছে। আর কাম মানে সে কাম নয় গো, যা আপনারা ভাবছেন। কাম মানে হল কামনা-বাসনা। ইচ্ছা। রামায়ণে যখন রাম রাক্ষসদিগকে মারে, তখন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। আমারা তো মস্তানদের হাতে মার খাই, কিন্তুক চুপ মেরে থাকি। উদের উলটায়া মারতে পারি না। তাই যখন রাম রাক্ষস মারে, সুন্দরী মেয়াঁ বিয়া করে, বন্ধু পাতায়, ভাল কথা বলে, ভাল কাজ করে, তখন আমাদের কামনা মিটে। ওইটাই হল কাম।

ঠিক কিনা?—মৌলবি-কমরেডের দিকে চোখ রেখে শূর্পণখা জিজ্ঞাসা করে। শূর্পণখা এরপর আবার দু'হাতে মালাটা তুলে ধরে। হাত উঁচু করলে ওর ন্যাকড়া ঠাসা স্তন প্রকটতর হয়। ঠোঁটের উপরে আলতার রং লেগে আছে। বলে, হাঁকেন, হাঁকেন দেখি কে কত হাঁকতেছেন।

রামের মালা।

পরেশ সাহা বললেন, পঁচিশ টাকা দিচ্ছি। খুশি তো? বলে হাসলেন। মৌলবি নিজামুদ্দিন এক লাফে হাঁকলেন পঞ্চাশ টাকা। নেতা পঞ্চাশ বলায় দু-চার জন কচি কমরেড হাততালি দিয়ে উঠল।

পরেশ সাহা একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে উঠল সিক্সটি।

ইস্কুল মাস্টার তরুণ মাইতি তাত্ত্বিক নেতা। ওর পকেটে দু-তিনটে কলম, বগলে খবরের কাগজ আর পকেটে ফিল্টার উইলস থাকে। উনি এসে নিজামুদ্দিন সাহেবের কানের কাছে মুখ রেখে কী যেন বলে গেলেন। এরপর সভা কিছুক্ষণ চুপচাপ। মৌলবি সাহেব মাথা চুলকোচ্ছেন একা। শূর্পণখা বলল—কী হল গো? সব চুপ যে? আর উঠবেনি? আর একটু উঠুক? ন'গ্রামে অষ্টমঙ্গলার মালা একশো টাকা উঠেছিল।

রাম এসে বলল, তা হলে কি তৃণমূলই জিতে গেল?

কিছু ছেলেপিলে হই হই করে উঠল। বোঝা গেল ওরা তৃণমূল। পরেশবাবু মালাটা পেলে ওরা পরেশদা জিন্দাবাদ করবে।

নিজামুদ্দিন আবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, পঁচাত্তর।চারদিকে চাইলেন। বেশ একটা হই হই ভাব ফিরে এল ফের। লক্ষ্মণ বুঝল আসর জমেছে। হ্যাজাকটা নামিয়ে উবু হয়ে বসে দম দিতে লাগল।

পরেশ সাহা দু'হাত তুলে বললেন, একশো। নতুন দম পাওয়া হ্যাজাকের আলোয় ওর জামাটা তখন আরও সাদা।

নিজামুদ্দিন মৌলবি উশখুশ করছেন। তাত্ত্বিক তরুণের দিকে এক ঝলক তাকালেন। তাত্ত্বিক নেতার চোখের নিষেধ পড়ে নিলেন নিজামুদ্দিন।

শূর্পণখা আবার বলতে লাগল—আর কোনও ভাল মানুষের পো আছেন এখানে, অষ্টমঙ্গলার মালা যিনি একশোর বেশি দিয়ে ডেকে নেবেন?

দেড়শো দিচ্ছি, দেড়শো...। নিজামুদ্দিন দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে অতীব শান্ত স্বরে বললেন।

আমি তবে দুশো। পরেশ সাহা রীতিমতো উত্তেজিত। সভাময় হই হই রই রই।

নিজামুদ্দিন আবার দাড়িতে হাত দিতেই তাত্ত্বিক নেতা ছুটে এলেন। বললেন, বলছি না রাম নিয়ে অত বাড়াবাড়িতে যাবেন না...।

নিজামুদ্দিন কোনও কথা কইলেন না। কলরব শুনতে থাকলেন। পরেশদা জিন্দাবাদ ধ্বনি শুনলেন। পাশে তাত্ত্বিক নেতা দাঁড়িয়ে আছেন। নিজামুদ্দিন দাড়িতে হাত রাখলেন। শুনলেন—

দুশো টাকা... এক

দুশো টাকা.... দুই

আমিও খোদার বান্দা। আমি হারব না ইনসাল্লা। আড়াই শো...।

এইভাবে পাঁচশো টাকা দাম উঠে গেল। পরেশ সাহার তিনটে পাম্প সেট আছে ভাড়া খাটে। জমিজমা ছাড়াও একটা সারের দোকান আছে। তা সত্ত্বেও নিজামুদ্দিনের পাঁচশো ডাকের উপর উনি আর চড়ালেন না। পাঁচশোর পর চুপ করে গেলেন।

রামচন্দ্র গেয়ে উঠল—

নিজামুদ্দিন দানি ভাল পাঁচশো টাকায় মালা নিলেন
রামায়ণের এই আসরে নিজামুদ্দিন মান রাখিলেন
খিজিরপুর গ্রামের মান রাখিলেন
রামায়ণের মান রাখিলেন
নিজামুদ্দিন মুমিন ভাল রামের প্রতি ঈমান দিলেন...।

খুব কাঁসি, খঞ্জনী, ঢোলের শব্দ হতে লাগল। এত টাকা কখনও নীলামে ওঠেনি।

নিজামুদ্দিনের হাতে মালা, ডাক ঘিরে লোকজন। কেউ বলছে শাবাশ। কেউ বলছে মৌলবি সাহেবই আমাদের গাঁয়ের মান রাখলেন। একজন বলল, আপনিই আমাদের পার্টিকে জেতাবেন, নইলে ওই তৃণমূল পার্টি ফাট লিয়ে লিত।

নিজামুদ্দিন একটু গলা খাঁকারি দিলেন। বললেন, ওসব কিছু নয়, শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যই মালাটা ডেকে নিতে হল। রামের মালা একজন মোসলমান নিয়ে একটা দৃষ্টান্ত তৈয়ার করল। এর আগেও রামায়ণ পালা হয়েছে, কিন্তু কোনও দিন কোনও মোসলমান মালা ডাকেনি। আজকে যখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চক্রান্ত চলছে সেখানে আজ আমি একটা সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে খুব গর্বিত হয়েছি।

মৌলবি সাহেবের বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যেস আছে বোঝাই যায়।

এমন সময় রাম মৌলবি সাহেবের কাছে আসে। বলে, আপনি জনাব খুব হক কথা বলেছেন। কিন্তু বলি, আমার নাম জব্বার। জব্বার আলি।

জব্বার আলি? মোসলমান?

আজ্ঞে।

ঈমানদার?

আজ্ঞে।

নমাজ পড়ো?

পড়ি আজ্ঞে। তবে পালা থাকলে এশার নামাজটা আদায় হয় না। ওই যে পালা করি, তখন উটাই নামাজ মনে হয়। বেয়াদপি মাপ করবেন জনাব।

শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, ২০০৩

কার্তিক

টি আই ও এন এবং এস আই ও এন-এ আমার বড্ড গণ্ডগোল হয়ে যায়। এডুকেশনে এস আই ও এন লিখেছিলাম, বড়সাহেব আমার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকালেন, বললেন গ্র্যাজুয়েট? আমি বললুম 'হুঁ'। আবার অনার্সও আছে নাকি? বললুম 'উঁহু'। বললেন—আপনি এই ফাইল ডিল করছেন কেন? বড়বাবুকে পাঠিয়ে দিন। বড়বাবু মানে হেড ক্লার্ক। সুখরঞ্জন পোদ্দার। আমার বিষয়েই কিছু বলবেন হয়তো। নতুন চাকরি আমার, বড্ড টেনশন হয়। টেনশনে কি টি আই ও এন? বড়বাবু ফিরে এলেন। বললেন, একবার পড়ুন তো কী লিখেছেন? আমি পড়ি—এনক্লোসড হিয়ার উইথ অ্যাটাচড সারকুলার ফ্রম দি মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন রিকোয়েস্টিং ইউজ অফ বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ ইন দি গভর্নমেন্ট অফিসেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল। বড়বাবু বললেন, চার লাইনে চারটে ভুল। আর সাহেব যখন আপনাকে ভুলটা পয়েন্টাউট করে দিলেন, তখন আপনি নাকি হাসছিলেন? আমি বলি—না স্যার, হাসিনি, আমার সামনের দাঁত দুটো উঁচু উঁচু তো, এইজন্য স্যার, সব সময় মুখটা হাসি হাসি থাকে।

এইজন্যই তো তোমার নাম ক্যালানে। অধিকারীবাবু পাশ থেকে বলে উঠলেন। আমার কল্যাণ নামটাকে অধিকারীবাবু এরকম করে দিয়েছে, এখন প্রায় সবাই আমাকে নতুন নামে ডাকে।

বড়বাবু অধিকারীবাবুকে বললেন, কী করি বলুন তো, সাহেবের তো হুকুম একে ডেসপ্যাচে দাও, এদিকে ডেসপ্যাচের মালটা যা চিজ, আরও কাজ করবে না। বড়বাবু চলে গেলে অধিকারী আমায় বললেন, আর একটা জিনিস শিখ্যা লও। হেড ক্লার্ক ইজ নট স্যার। হি ইজ অলসো গ্রুপ সি। ডোনট সে স্যার টু হেড ক্লার্ক। ও-কে?

অধিকারীবাবুর কাছেই সব কাজ শিখেছি। উনিই আমার কর্মগুরু। ফাইল নাম্বার বসানো, নোট শিট লাগানো, সাহেব যখন সই করবে তখন ফাইলের পৃষ্ঠাগুলো উলটে দেয়া, সই করার পর তারিখ ভুলে যাওয়া সাহেবদের নিয়ম, তখন ক্লার্কদের নিয়ম তারিখ বলে দেয়া, অফিসের পিছনের সিঁড়িটা, যেটা দিয়ে নেমে গেলেই খাবারের রাজ্য! দোসা শিখেছি, ইডলি শিখেছি, শিখেছি ধারে পান খাওয়া।

জয়েন করার ছ-সাত দিনের মাথায় বড়বাবু বললেন ১৮ নম্বর বাড়িতে আমাদের যে অফিস আছে, ওখান থেকে বারোটা চেয়ার নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে। আমার তো মহা বিপদ, ১৮ নম্বর বাড়িটাই চিনি না, যাও বা খুঁজে বার করব, মাথায় করে নিয়ে আসতে হবে? পারব না এমন নয়, দেশের বাড়িতে ধানের বোঝা কি আনিনি? কিন্তু সিঁড়িটা যা সরু, এক বারে যদি দুটো করে আনা যায় মোট ছ' বার? অধিকারীবাবু সেদিনই প্রথম আমাকে ক্যালানে ডাকলেন। বললেন, বাবা ক্যালানে মণ্ডল, গভরমেন্টের সোনার চাঁদ ছেলে, কোটার জোরে তোমাদের মতো ছেলেরাও চাকরি পাইতাছ, এইটুকু কমন ছেনস নাই যে ইউ আর নট গ্রুপ ডি স্টাফ। ইউ আর নট সাপোসড টু মাথায় কইরা চেয়ার ক্যারি করবা।

উনি তখন দুলালকে ডাকেন। দুলালকে আমার সঙ্গে দিয়ে দেন। অফিসের নোট আমার হাতে। আমি গ্রুপ সি। আর দুলাল বয়ে আনবে চেয়ার। ও গ্রুপ ডি। ১৮ নম্বর বাড়ি খুব দূরে নয়, তিন-চার মিনিট লাগে হেঁটে গেলে। দুলাল তখন জানাল ও একদিন পারমেন হবেই কারণ সব স্যাররাই ওকে

ভালবাসেন। আর দুলাল আমাকেও যখন স্যার ডাকল, তখন মাইরি ভীষণ লজ্জা করছিল। তখনই জানলাম দুলাল ক্যাজুয়াল। ক্যাজুয়ালই শুধু নয়, ডেইলি লেবার।

মানে মাসে ছ'দিন করে বুকিং হয় ওর। দিনে বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা হিসেবে ও মাসে পায় ১৩৫ টাকা। কিন্তু ও রোজই আসে, রোজ কাজ করে। দুলাল চেয়ারগুলি বয়ে আনল। অধিকারীবাবু আমাকে বললেন, তোমার আর একটু কাম বাকি। একটা লেবার রিক্রুটের ক্লেইম করো। ল্যাখো— অমুক মেমো নম্বরের রেফারেন্সে ১৮ নম্বর বাড়ি থিকা বারোখান চেয়ার আনার জন্য একজন কুলি রিক্রুট করা হল সেই বাবদে বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা... ও বুঝেছি। টাকাটা দুলালকে দেয়া হবে।

ক্যালানে, তুমি একের নম্বরের ডট ডট ডট ডট। আমাদের অফিসটা হল ছ্যাঁচড়া অফিস। কোনও একসট্রা ফেকসট্রা নাই। এইভাবে আমাগোর টিফিন খরচটা উঠাইতে হয়।

অধিকারীবাবু এইভাবে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন আমাকে। একদিন কয়েকটা ভাউচারের তলায় ডান হাতে বাঁ হাতে কতকগুলো টিপসই করালেন, নিজেও করলেন। বললেন, এগুলোকে বলে পেটি ভাউচার। কেন জানি না, আমাকে বড় ভালবাসেন উনি। গ্রাম থেকে এসেছি বলে আমি নাকি খুব সরল। আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন পাটখেতের ভিতরে আমার কোনও কেস আছে কি না।

ডেসপ্যাচে যে কাজ করে তাকে সবাই কবিরাজ বলে ডাকে ভাবতাম উনি ওষুধপত্র জানেন। অধিকারীবাবু আমাকে ওর কাছে নিয়ে যেতেই কবিরাজ বললেন, শুনবেন নাকি অধিকারীবাবু, কলিকালের রং তামাশা। নতুন। 'আইল কি জামানা।'

আইল কি জামানা হাতে দেয় না মেয়েলোকে চুড়ি
নতুন স্টাইলে পরে দেখ হাতে লেডিজ ঘড়ি
ধরল নতুন ফেশন
নতুন ফেশন বলব এখন মেয়েলোকের কথা
বুকের কাপড় ঠিক থাকে না লজ্জায় পুড়ে মাথা
কাপড় পিঠ ঘুরে না...

কবিরাজ নামকরণের সার্থকতা এখন বুঝতে পারলাম। অধিকারীবাবু ওকে বললেন, তোমায় অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে গেলাম কবিরাজ। এবার মনের আনন্দে কবিগান লেখো। টেবিলের কাচের তলায় ওই ভদ্রলোকের একটা দাঁড়ানো ছবি। তার তলায় লেখা শ্রীজনার্দন হালদার। কবিশেখর।

জনার্দনবাবু কবিশেখর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

নাম?

শ্রীকল্যাণকুমার মণ্ডল।

শুনো কল্যাণ মণ্ডল গণ্ডগোলের অফিসেতে বাস
জয়েন করিয়াছ তুমি হয়নি তো একমাস, হল পানিশমেন্ট...

বর্তমান থাকা হয় কোথায়?

শেয়ালদার একটা হোটেলে ছিলুম ক'দিন। বড্ড খরচ! দিন তিন-চার হল দাদার ভায়রার বাড়ি আছি; বেলগাছিয়া। ওখানে লজ্জা করে। একটাই ঘর কিনা।

দেশ কোথায়?

বর্ধমান নেমে কালনার দিকের বাসে ১০ মাইল।

বাপ কী করে?

চাষ।

ক' বিঘে জমি?

ন' বিঘে

তা চাষির ছেলে অফিসের বাবু হতে এলে কেন?

বি এ পাশ করলুম যে...

তোমার মতো হাজার হাজার বি এ, এম এ বসে বসে ছিঁড়ছে। একসঙ্গে বহু এস সি, এস টি নিল বলে চাকরিটা পেয়ে গেলে। তোমার বরাত ভাল। কী রাশি?

বিছে।

কর্কট? ভাল রাশি। সামনের মাস থেকে খুব ভাল সময়।

ঘর পাব?

ঘর চাইছ? কালই দিতে পারি। আমাদের পাড়ায় যাবে?

কোথায়?

বারাসাত। শেয়ালদা থেকে ট্রেনে চল্লিশ মিনিট।

গেলেই ঘর পাব?

আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার ভায়রার বাড়ি। বাইরের দিকে একটা ঘর আছে। রান্নাঘর নেই বলে ফ্যামিলিম্যান ভাড়া হবে না। ব্যাচেলার ট্যাচেলার হলে ভাল, যারা হোটেলে ফোটেলে খাবে। আর গভরমেন্টের চাকরি শুনলে তো দেবেই। সে আমি বলে দেব। ইচ্ছে করলে স্টোভ জ্বালিয়ে রাঁধতেও পারো। রান্নাটা শিখে রাখা ভাল। আজকালকার বউরা রাঁধে না।

বলে রাঁধতে নারি কলির নারী। সিনেমাতে যায়
গালে মাখে পাউডার ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায়
চলে ভিড় কাটিয়া
চলে ভিড় কাটিয়া ধাক্কা দিয়া পরপুরুষের গায়
আই এ্যম সরি বলে নারী মুচকি হেসে যায়।

ঘর হয়ে গেল। মাথায় অ্যাসবেস্টাস। দেশে টিনের ঘর আমাদের, উপরে চাষের খড় ছেয়ে দিতাম, ঠান্ডা থাকত। আর ছিল দুটো আম গাছ দু' পাশে। টুপটাপ আম পড়ত বোশেখ মাসের ঝড়ে। এই ঘরে কিন্তু বড্ড গরম। তার উপর সন্ধে থেকেই পাশের ঘরে গাঁক গাঁক করে টিভি চলে। বাড়িটার চারপাশে সব বিহারিটিহারি থাকে। পিছনে ধাঙরপট্টি। ঘরের সামনে এসে শুয়োর ভোঁক ভোঁক করে। সামনেই মুচিদের ঘর। ঠুকঠাক লেগেই আছে। সন্ধেবেলায় বাড়ি আসতে ইচ্ছে করে না। ক্যারাম পেটাই অফিসে, কিংবা বেলগাছিয়া যাই। ট্রেনে পুরনো ম্যাগাজিন বিক্রি হয়, দু' টাকা করে পিস, কত কী থাকে, বউদি কর্তৃক দেবর ধর্ষণ, তান্ত্রিকের ব্যাভিচার, নার্সের অন্তরঙ্গ কথা, এইসব। দু-একটা বই কিনেছিলাম, বাড়িওলার ভাই একদিন নিয়ে গেল, আর দিল না। চুপচাপ বসে থাকি ঘরের সামনে। একটা মুচি ছেলেপিলে পড়ায়। এর নাম বদ্রীনাথ।

মাইনে পাবার পর শনি রবি আর দু'দিন সি এল নিয়ে বাড়ি গেলাম। আমাদের গাঁয়ে মণ্ডলদের মধ্যে আমিই ফার্স্ট বি এ এবং গভরমেন্টের চাকরি করছি।

বাবা হরিনাম বসালেন, বাড়িতে হরিলুট করালেন। আমাদের গাঁয়ের বোসবাড়ি, মুখুজ্জেবাড়িতে অফিসার-টফিসার আছে। সেই সঙ্গে আমাদের বাড়িও যুক্ত হল বলে বাবা আনন্দে হাউ হাউ করে কাঁদলেন। রায়পুরের হাটেও খবর হয়ে গেছে, লোক তাকাচ্ছে, যেন বলছে—ওই দাখো, তিনু মণ্ডলের ছেলে, গভরমেন্টের চাকরি পেয়েছে। দু'দিন বেশি থাকলাম। গ্রামে কী প্রেস্টিজ!

ক্যালানে মণ্ডল এসে গেছেন? মাইনে পেয়ে কেটে পড়লেন, খাওয়ালেন না। চঞ্চল বলে একটি ছেলে বলল। এখন অনেকেই আমাকে এই নামে ডাকে।

আমি তখন সত্যি সত্যি দাঁত ক্যালাই। পে কমিশনের এরিয়ার পেয়েছে সবাই, শনিবার ফিস্ট, আমাকে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিতে হবে। আমি এর মধ্যে এরিয়ার-টেরিয়ার সব বুঝে গেছি। বললুম,

আমি তো এরিয়ার পাইনি, চঞ্চল বলল, এরিয়ারের বাপ পেয়েছেন। আজকালকার দিনে একটা চাকরি...

শনিবার দুটোর পরই গেট বন্ধ। দুলালের কত কাজ। ডেকোরেটারদের থেকে গেলাস, প্লেট ভাড়া করে আনা, ওসব ধোয়াধুয়ি। কাগজের কাপ আনতে ভুলে গেল দুলাল, ও কাগজের কাপ বুঝতে পারছে না। অধিকারীবাবু আমাকে বলল, তুমি সঙ্গে যাও তো কল্যাণ। চঞ্চল বলল, ও কী বুঝবে? আমি যে কাগজের কাপ ব্যাপারটা বুঝি সেটা ওদের বুঝিয়ে দেবার জন্য দুলালের সঙ্গে গেলুম। হেভি মেনু। বিরিয়ানি, ফিসফ্রাই, চিংড়ির মালাইকারি, রসমালাই। দুলালের ফ্রি।

আমি বললাম, আজ তোমার খুব মজা। না? দুলাল বলল, কার্তিক দেখেছেন স্যার? কার্তিক? বাবরি চুল, ছাঁটা গোঁফ কোঁচা দুলিয়ে বসে থাকে। লোকে ভাবে খুব সুখে আছে। বুঝলেন না?

বুঝলাম না।

বুঝলেন না স্যার? কার্তিক তো সুখে আছে, আর এদিকে যে একটা গরান কাঠ কার্তিকের পাছার ভিতর দিয়ে উঠে মাথায় গিয়ে ঠেকেছে, সেটা কার্তিক আর কুমোর ছাড়া আর কেউ জানে না। আপনাদের মাইনে বেড়েছে, মনে ফুর্তি আর... এবার জিনিসের দাম বাড়বে।

দুলালের গলায় স্বর পালটায়। বলে, স্যার, আপনাদের ডি এ বাড়ে। আমাদের ডি এ নেই স্যার। জিনিসের দাম বাড়ে। আমাদের ওই একশো পঁইতিরিশ। তেল স্যার আবার বাড়ল। আবার বাসভাড়া বাড়ল। আপনারা মাইনে বাড়াবেন! আমার একশো পঁইতিরিশ। মাঝখান থেকে আমার কাজটাও নষ্ট।

কাজ নষ্ট মানে!

আমি স্যার অফিস ছুটির পর দুশো সতেরো চাপি। নারায়ণপুরে রিফিলের কারখানায় যাই, রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ। আট-দশ টাকার কাজ করি। নইলে এই একশো পঁয়তিরিশে কিছু হয়? তারপর বাড়ি যাই। এক মাইল পথ। হাঁটি।

চাঁদের আলো হলে গান গাইতে গাইতে চলে যাই। অন্ধকার হলে অসুবিধে হয়। ব্যাটারির যা দাম। ইশ...আমার যদি একটা সাইকেল থাকত—আমি বললুম, তুমি মাসে ছ' দিনের পয়সা পাও, রোজ আস কেন?

না এসে উপায় নেই যে।

কেন?

অধিকারীবাবু স্যার বলেছেন, রোজ না এলে পারমেন হবি না।

কবে রেগুলার হবে তুমি?

অধিকারীবাবু স্যার লিখালিখি করছেন, বড়বাবু স্যার লিখালিখি করছেন। পারমেন চাকরি কি মুখের কথা?

সবাই জনার্দন হালদারকে নিয়ে পড়েছে। কবিরাজ, শুরু করো। কবিরাজ শুরু করো। হালদারবাবুর পায়ে ঘুঙুর পরানো হয়েছে। হালদারবাবু শুরু করে— শোনো লোডশেডিং-এর কবিগান। চঞ্চল-টঞ্চল হইচই করে ওঠে। বলে ওসব জমবে না। এতগুলো যে ধর্ষণ হল, নতুন কিছু পয়দা হয়নি? হালদারবাবু মাথা নাড়ায়। তবে ওটা করো, ওই যে, বুড়োর সঙ্গে যুবতীর প্রেম।

ঢেঁকুরে ভেটকির গন্ধ। বেশ রাতে বাড়ি ফিরলাম। দুলালের গতকাল বাড়ি ফেরা হয়নি। চঞ্চল, নিখিল, ওদের জন্য বরফ জোগাড় করতে গিয়ে লাস্ট বাস পায়নি দুলাল। ওকে সবাই ছিঁড়ে খাচ্ছে। ও ইউনিয়কে জানাচ্ছে না কেন? কেন যে জানায় না? ওদের কি ইউনিয়ন নেই? বোধ হয় নেই।

পরদিন রবিবার। খেয়েদেয়ে ঘুমোলাম। বিকেলে কিছুই করার নেই। মুচিদের ওখানে একটু আড্ডা মারছিলাম। শিবনাথ আর বদ্রীনাথের পাশাপাশি ঘর। শিবনাথের ছাপা লুঙ্গি; রঙিন গেঞ্জি। ঘড় ঘড় করে রেডিয়ো বাজছে। ও চটিটটি বানায়। রকমারি চামড়া। আমি হাতে ধরে গোরুর

চামড়া, মোষের চামড়া আর ফোমের তফাত বুঝলাম। বদ্রীনাথের সব মোটা কাজ। ফ্যাশনের কিছু বানায় না, টায়ারের সোলের মোটাসোটা ধ্যাবড়া মতো ঢেঁকি ডিজাইন চটি বানায় আর পুরনো জুতো সারায়। দু-একটা কথা হবার পরই আমায় বলল, দেশ কা ক্যা হাল হো গিয়া সাহাব, মিট্টি তেল বিলকুল না মিলি। ব্ল্যাক মে বহুত দাম মাংতা কেরোসিন। সমস্যাটা আমারও। আমারও ব্ল্যাকে কিনতে হয়। কিন্তু ওদের কিছু বলি না। বদ্রীনাথের চোখে প্লাস্টিকের চশমা। একটা ডাঁটি নেই, সেখানে সুতো। পরনে নোংরা ধুতি, হাঁটুতে ঠেকেছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই বদ্রীনাথ সেলাই-এর সরঞ্জাম বাক্সে পুরে ফেলে। হাত-পা ধুয়ে নেয়। একটা কালো রঙের লিকলিকে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেয়। একটা প্যাকিং বাক্স উলটো করে নিয়ে বসে, আর অমনি ওর চেহারাটা কেমন যেন হয়ে যায়। কী রকম যেন ব্যক্তিত্ব। গাম্ভীর্য এসে যায়।

এখন লোডশেডিং। কী আর করব ঘরে গিয়ে। অফিসে থাকলে এখন ক্যারাম পেটানো যেত। বাবা এ সময় রেডিয়োর কৃষিকথার আসর শুনছে। আমি ক'দিন আগেও এ সময় ঘরে বসে মুখস্থ করেছি। পি এল ও মানে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন, ডব্লু এইচ ও মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন। অফিসে এসব কোনও কাজে লাগে না।

এবার একে একে আসতে শুরু করে ছেলেপুলেরা। কেউ একটু আগে লাস্ট টান মেরে ফেলে দিয়েছে বিড়ি। হজমিওলা মালিশওলার ছেলেরা। ধাঙরপট্টির ছেলেরা। যেসব ছেলেরা সারাটা দিন পথে গড়িয়ে গাঁজার ঠেক চুল্লুর ঠেক দেখে শ্রীদেবী ডিম্পল রেখার লাস্য ছবির আগে পাশে থেকে সময় পার করেছে আর একটু বড় হবার জন্য বাপকে মদত দেবে বলে, ওরা এসে যায়। রাস্তাই ওদের শ্লেট। ওদের হাতে হাতে চকখড়ি দেয় বদ্রীনাথ। আমার দিকে তাকিয়ে বদ্রীনাথ বলে, আভি মেরা অক্ষরদান হোগা।

আমার অদ্ভুত লাগছে। একে একে ছেলেরা আসছে, কেউ খালি গা, কেউ চকমকে গেঞ্জি, বলছে পরনাম মাস্টারজি, তখন মুচি বদ্রীনাথ ওলটানো প্যাকিং বাক্সের বেদিতে বসে রাজার মতো হাসে। এমন সময় আলো এসে যায়। বদ্রীনাথ বলে জয়রামজিকি। ছাত্ররা সব হইহই করে ওঠে।

এমন সময় আমার পিঠে থাপড়া পড়ল। হালদারদা। হালদারদা কাছাকাছির মধ্যেই থাকে। হাঁটাপথে পনেরো মিনিট। এর আগেও দু-একবার এসেছে। আমি হালদারদাকে নিয়ে ঘরমুখো হচ্ছিলাম, বদ্রীনাথ বলল, হামার সবসে মাথা সাফ ইস্টুডেন্টকে তানি দেখকে যান সাহেব। ইউসুফ আভি আসবে। হালদারদা আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

হালদারদা বলে, রবিবারের বাজার, তার উপর কিছু মালকড়িও পেলাম, একটা ছোট পাঁইট এনেছি। বাড়িতে ছেলেমেয়ে বড় বড় হয়ে গেছে, বুঝলে না, বউ ঝামেলা করে। তুমি হচ্ছ ব্যাচেলার। রাজা মানুষ। গ্লাস দাও। চানাচুরও এনেছি।

তালের তাড়ি খাই ফি চৈত্র-বৈশাখ মাসে। বিলিতি খেয়েছিলাম 'মা তুমি কেঁদ না' পালা দেখে ফেরার সময় বছর দুই আগে বাঁশবাগানে বসে। সেই প্রথম সেই শেষ। আজ হালদার এনেছে যখন, ঠিক আছে, একটু মেরে দি। দু-ঢোঁক খেয়ে হালদারদা বলল— বুঝলে কল্যাণ, দেশটার আর কিচ্ছু হবে না। সব শালা গান্ডু হয়ে গেছে। হালদারদা বলে যায়। বাইরে তখন বদ্রীনাথ পড়ুয়াদের নামতা শেখাচ্ছে।

একটু পরেই দরজায় টোকা। বদ্রীনাথের গলা। সাহাব, তানি খোলিয়ে। আমি সাততাড়াতাড়ি গেলাস সরাই। মুচি বদ্রীনাথকে আমার ভয়। আমি বলি, থোড়া দাঁড়ান মাস্টারমশাই। বদ্রীনাথ বলে, আরে ছি-ছি-ছি। হামি চামার-উমার মোচি। আপনি মাস্টারজি না বলবেন, বদ্রীনাথ বলবেন। দরজা খুলে দেখি একটি ছেলের মাথায় পরম স্নেহে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বদ্রীনাথ। হামার সবসে মাথা সাফ ইস্টুডেন্ট। ইউসুফ কাগজ-উগজ কুড়ায়। ইউসুফ আমাকে আর হালরদারকে প্রণাম করল। ওরা চলে যেতে হালদারদাকে বললাম, পা-টা কী রকম শিরশির করে উঠল জানো। হালদারদা এক চুমুকে অনেকটা রাম খেয়ে বলল, আমারও রে। পৃথিবীতে মানুষ আছে। আমরাই গান্ডু। বাকি মালটুকু খেয়ে হালদারদা বলল, শুনুন মশায় :

শুনুন মহাশয় গোটিকয় মানুষ আজ আছে,
এদেরই দয়ায় আজ মানুষ সমাজ বাঁচে, দেখে জল আসে...

চেয়ার ক্যারি করার যে বিলটা করেছিলাম, সোমবার দিন টাকাটা পেলাম। টাকাটা নিতেই বদ্রীনাথের কথা মনে হল আমার। টাকাটা দুলালকে দিয়ে দিলাম। বললাম, দুলাল, কাউকে বোলো না। অধিকারীবাবুকেও না।

আমার চটিটা ছিঁড়ে গেলে বদ্রীনাথের কাছে সারাতে যেতে লজ্জা করল। শিবনাথ বলল, চটি সারাই হবে না। অর্ডারি কাজ আছে। অগত্যা বদ্রীনাথের কাছে যাই। বদ্রীনাথ চটিটা সারিয়ে একটা কুপনের বই ধরিয়ে দিল আমার হাতে। পাতায় পাতায় ২৫ পয়সার ছবি, জানলাম ওর পড়ুয়ারা সরস্বতী পুজো করবে। আমি ২০টা কাটলাম। ৫ টাকা। বদ্রীনাথ খুব খুশি হল। যেখানে বিশ-পঁচিশ হাজারের কমে পুজোর ফুর্তি হয় না, সেখানে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পুজোটা দেখলাম বদ্রীনাথের বিনিমাগনার ইস্কুলে। ইটে চুনের প্রলেপ লাগিয়ে মঞ্চ করেছে। তার উপর পুতুলের মতো সরস্বতীর পিছনে শিবনাথের কাছ থেকে নেয়া সাদারঙের এক চকচকে চামড়া। ইউসুফ ভলান্টিয়ার। কাচ্চাবাচ্চা সামলাচ্ছে। বদ্রীনাথ বলল, সরস্বতী পুজোটা করলাম কেন কী, ইসব হামার ইস্টুডেন্টরা ভি বুঝবে সিরফ কিতাব উতাব আর পড়া লিখা দিয়ে ভি ধূম হতে পারে, সব এক সাথ মিলা যায়।

অফিসে সেদিন একটা ঘটনা ঘটল। খামে স্ট্যাম্প মারতে গিয়ে দেখি একটা চিঠি বেরিয়ে পড়েছে। চিঠিফিটি আমি পড়ি না। কী দরকার খামকা ইংরেজি পড়ে। তবু কেন যেন চিঠিটা পড়ি, হয়তো হাতে কাজ ছিল না বলে। চিঠিটা পড়ে আমার সারা গা শিরশির করে উঠল। ডেইলি রেটে লেবার বুকিং নিয়ে একটা স্টেটমেন্ট যাচ্ছে ডাইরেক্টরেটে। বলা হচ্ছে, মাসে ছ'দিন হিসেবে পাঁচজনকে বুকিং দেয়া হচ্ছে। ওই পাঁচজনের নামও দেয়া হয়েছে। দুলালচন্দ্র বিশ্বাস, গুরুপদ গুছাইত, দয়ারাম রায়, রামরতন সিং আর শ্রীপতি দাস। তলায় সাহেবের সই। বাঃ, দুলাল ছাড়া সবাই ফলস। মানে ওদের টাকা ফলস সই করে তুলে নেওয়া হচ্ছে। চিঠিটা হালদারদাকে দেখাই। হালদারদা বলল, এ আর নতুন কী, তুমি নতুন তাই আশ্চর্য হচ্ছ। জানো কতরকম চুরি আছে। পেটি ভাউচারই হয় মাসে চার হাজার টাকার। অর্ধেক ফলস। আমায় পাগল বানিয়ে সরিয়ে রেখেছে। ভাবে কিছু বুঝি না। এ নিয়ে একটা কবিগান আছে আমার। শুনবে?

আর কবিগান শুনতে চাই না হালদারদা।

আমি ভাবি আমার কী। যা হচ্ছে হোক। গাঁয়ের ছেলে আমি, চাকরি করতে বিদেশে এসেছি, কী দরকার আমার। আমি সেদিন একটা ব্যানলনের গেঞ্জি কিনি। দোকানদার বলল, স্মার্ট দেখাবে আপনাকে!

সন্ধ্যাবেলা বদ্রীনাথ আমাকে ডাকল। একটু মদত করুন স্যার। হামারা ইউসুফ দস্তখত শিখতে চায়। আপনি একটু লিকে দিন, ও ঠিক ধরে লিবে, দিমাক বহুত সাফ। আমি সেদিন ওদের ইস্কুলে যাই, বদ্রীনাথের উপুড়করা প্যাকিং বাক্সের উপর বসি, আর ওমনি নর্দমা থেকে ছুটে আসা বাতাসে জয়ধ্বনি! রাস্তার শালপাতা নাচে। আমি একটা সাদা কাগজে লিখি ইউসুফ আলি। আর নোংরা গেঞ্জি হলুদ দাঁত নয়-দশ বছরের ছেলেটা আমার হাতের লেখার উপর মকস করতে গেলে বদ্রীনাথ বলে, জয় রামজিকি।

বদ্রীনাথের কাছে জানতে পাই, ও যখন আসানসোল ছিল, অ্যাডাল্ট এডুকেশন স্কিমে ও রাতের বেলায় কিছুদিন পড়াশুনো করেছিল! সেই পড়াশুনো ও বৃথা যেতে দেয় না। ও অক্ষর দান করে। আমি বদ্রীনাথকে বলি, আমিও তোমার সঙ্গে আছি বদ্রীনাথ, আমি অঙ্ক শেখাব। ইংরেজিও।

সন্ধ্যার পরই টান অনুভব করি কীরকম। অফিসে ক্যারাম পেটাই না। সোজা ট্রেনে চেপে বসি। ট্রেন লেট করলে বিরক্ত হই। আমি যেন হাঁস। বদ্রীনাথের ইস্কুল যেন দূর থেকে ডাকে, আয় আয় আয়, চই চই। আমি এখন মাস্টারজি। আমায় দেখলে ওরা উঠে দাঁড়ায়, ওরা পরনাম করে। আমি জানি ওরা কেউ

বেশিদিন আমাদের ইস্কুলে নেই, কচি দু'হাত উপযুক্ত হলেই ফুচকাওলা হয়ে যাবে কিংবা পকেটমার। উপুড়করা প্যাকিং বাক্সের উপর বসে আমি ওদের অঙ্ক করতে দি, সামনের ধানখেতে চারাগাছ বড় হচ্ছে, ধানে দুধ আসছে। আমি আনন্দে দাঁত বার করে থাকি। দাঁত কেলাই। আমার লজ্জা করে না।

অফিসে চুপচাপ থাকি। তবে দুলালকে দেখলে আজকাল কেমন একটা অস্বস্তি হয়। মনে হয় আমার কী যেন করার ছিল। দুলালকে দেখলে বুকের মধ্যে কাঠঠোকরা পাখি গর্ত খোঁড়ে। আর কাঠঠোকরা পাখির চোখে ডাঁটভাঙা চশমা। বদ্রীনাথের সঙ্গে যদি দেখা না হত তা হলে বোধ হয় এই অস্বস্তিগুলো হত না। দুলালকে এড়িয়ে যাই। দুলালই ডেকে কথা বলে। যেমন বলল, এই গেঞ্জিটায় আপনাকে খুব ইয়ে, এসমারট দেখায় স্যার। গেঞ্জিটা কত নিল? আমি মনে মনে বলি বাইরেটাই দেখছ দুলাল, ভিতরের ব্যাপারটা জানো না তো, তোমার সেই কার্তিক।

পাছা ফুঁড়ে মাথা পর্যন্ত গরান কাঠ।

পাছার ভিতর দিয়ে মাথা পর্যন্ত যেটা গেছে সেটা মেরুদণ্ড না? এটার জন্যই তো মানুষ সোজা থাকে। আমি একটা ডিকশনারি কিনি!

অনেক রাত পর্যন্ত বানান ঠিক করে করে অনেক কষ্টে ও টেনশনে আমি একটা চিঠি লিখি। মিনিস্টারকে। জানাই এই অফিসে দুর্নীতি চলছে। ফলস নামে লেবার পেমেন্ট হচ্ছে। এটা টাইপ করে দেব। নাম দেব না। ঘুমুই।

হেড-ক্লার্ক-এর ঘরে ডাক পড়ে। জেরক্স করা আমার পাঠানো ওই চিঠিটা। আমার পাশে অধিকারীবাবু ঝুঁকে পড়েছেন। নস্যির গন্ধ পাচ্ছি।

চিঠিটা আপনি লিখেছেন?

আমার শরীর ফুঁড়ে মাথা পর্যন্ত যেটা আছে সেটা কী? মেরুদণ্ড না গরান কাঠ?

আমি বলি, না তো!

এই যে দেখুন। টেনশন বানান টি আই ও এন।

আমি বলি, পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কারুর বানান ভুল হয় না?

দেখুন তো ভাউচারগুলো, কার টিপ সই?

দেখি কলসি, চাদর, খসখস কেনার কাঁচা রসিদ। তলায় টিপ সই। অধিকারীবাবু আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিল প্রথম দিকটায়।

এটা কার টিপ সই?

আমার হতে পারে।

কোথায় খসখস?

কোথায় কলসি?

কোথায় চাদর?

ঘুম ভেঙে যায় আমার। আলো জ্বালাই। জল খাই। পাখাটা আর একটু বাড়াই। বগলে চন্দন পাউডার দি আর একটু। নীল মশারিতে ঢেউ। বাবার চিঠি এসেছে—সুখে থাকো। আমি মিনিস্টারকে লেখা চিঠিটা দলামোচড়া করি। কাঠঠোকরা পাখি উড়ে আসে। চোখে ডাঁটাভাঙা প্লাস্টিকের চশমা। বুকে বসে। যারে পাখি ঘরে যা। আমি নীল মশারিতে ঢুকে চিত হই। আমার দাঁত বেরিয়ে থাকে। সুখে ঘুমাই।

তোমরা ভাব কার্তিক সুখে আছে।

এদিকে যে...

অতএব, ১৯৮৭

জার্সি গোরুর উলটো বাচ্চা

রূপনারায়ণ পার হল গাড়িটা। অরুণাংশু বলে উঠল, রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়...। তোচন সারখেল বলল, রূপনারানে ইলিশ কেমন আসে? ইলিশ? হরিসেবকবাবু বলল, আসুক না আসুক, বর্ষায় আসুন খাওয়াব। তোচন সারখেল কে চেনেন তো? বিখ্যাত কৌতুকশিল্পী। আজাদহিন্দ ফৌজের ওই গানটা— কদম কদম বাঢ়ায়ে যা, বিভিন্ন সুরে গেয়ে খুব নাম করেছেন, কাওয়ালি সুরে, খ্যামটায়, বিভিন্ন রাগে, পল্লিগীতির ঢং-এ, এমনকী কীর্তনের সুরেও গেয়েছেন। অনেক ক্যাসেট আছে ওঁর। 'সারে যাঁহাসে আচ্ছা' গানটারও প্যারোডি আছে। 'সারে যাঁহাসে আচ্ছা'র পরের লাইনটা হাম সব শূয়ার কী বাচ্ছা, আর অমনি কী হাততালি। তোচন সারখেল (চলচ্চিত্র, ক্যাসেট) আছেন, উর্বশী অধিকারী আছে (লতাকণ্ঠী), মিস পাপিয়া আছেন (আশাকণ্ঠী), রন্‌চা ঘোষ আছেন (কিশোরকণ্ঠ), মিস সংঘমিত্রা আছেন (ছোটবৌ খ্যাত), আর ঘোষণায় আছেন অরুণাংশু বোস (বেতার, টিভি, সিনেমা)। অরুণাংশু বোস বসে আছেন জানলার ধারে, হাতে সিগারেট, মুখে স্মিত হাসি। ওর হাসিটাই আসল। মেয়েরা পাগল। অরুণাংশু বোস শুধু টিভির অ্যানাউন্সারই নয়, সুখেন মোদকের সুপারহিট ছবি 'ভাসুরপো'-তে নায়কের বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ওখানে বাপ্পী লাহিড়ীর গানে লিপ দিয়েছেন, কাগজ খুললেই দেখবেন, 'চ্যবনপ্রাস সব বয়সেই খাওয়া চলে' লেখাটার তলায় অরুণাংশুর হাসি হাসি মুখের ছবি। অরুণাংশুর ঠিক পাশেই বসে আছে লতাকণ্ঠি উর্বশী অধিকারী। অরুণাংশু রূপনারানের কূলে জেগে উঠে উর্বশীর কাঁধে হালকা হাত রেখেছিলেন। এ সময়, ঈশ্বর না করুন গাড়িটার যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায়, বঙ্গসংস্কৃতির যে কতবড় ক্ষতি হয়ে যাবে ভাবা যায় না। আর্টিস্ট বোঝাই এই গাড়িটা যাচ্ছে নন্দকুমার গ্রামে। নন্দকুমার হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে নক্ষত্র সমাবেশ। সারারাত্রব্যাপী রেডিয়ো-দূরদর্শন-মঞ্চ-চলচ্চিত্র ও ক্যাসেট-শিল্পী সমন্বয়ে বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান। পরিবেশনায় হরিসেবক মাইতি। হরিসেবকও এই গাড়িতেই আছেন। নামটা শুনেই ভাববেন না হরিসেবক চিমসেপানা কেউ। না। একদম ইয়াং। ওই দেখুন গায়ে পলিয়েস্টার গেঞ্জি, পকেটে লেখা নাইটক্লাব। চোখে গগল্‌স। গাড়ি কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ পেরিয়ে আবার ঘুরল।

শস্যভারে নুয়ে পড়েছে ধানগাছগুলি। কতবার যে ধান হয় আজকাল, মাটির বিশ্রাম নেই। দু'পাশে সবুজ, আর সবজে হলুদ। মাঝে মাঝে দু-একটা গ্রাম, ঘর গৃহস্থালি, আমগাছগুলিতে ভরে আছে ফুলকচি সবুজ সবুজ গুটি। কিশোরকণ্ঠী রন্‌চা ঘোষ গেয়ে উঠল, আ গয়া আ গয়া— হালুয়া আলা আ গয়া। শস্যভারে নুয়ে আছে ধানগাছ। গৃহস্থের দেওয়ালে আলপনা, গাছভরা ফুলকচি আম... গাড়ি ছুটছে ত্রস্ত গোশাবক ছুটে সরে যায়। হরিসেবক বলে, চলুন, চা খাই।

সামনে একটা বাজার মতো, ওখানে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গাড়ি থামল। হরিসেবক দৃপ্ত হুকুম করল, কাপ প্লেটগুলো সব গরম জলে ফাসক্লাস করে ধোও। তারপর চা দিতে বলা হল। আর গজা। উর্বশী আধিকারী প্রথম কামড় মেরেই থু থু করে ফেলে দিল। ইস রেপসিডের গন্ধ। তাইতে আর কেউ গজা খেল না। হরিসেবক একবার মিনমিন করে বলেছিল, রেপসিডে হার্টের দোষ হয় না...। গাড়িটা ছাড়বার সময় হরিসেবকবাবু গাড়িটার ডান দিকে না উঠে বাঁ দিকে উঠলেন। ফলে মিস পাপিয়ার পাশের সিটটাই ওর হল। এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটা বোধহয় অরুণাংশু লক্ষ করে

থাকবে। নইলে গাড়িটা ছাড়তেই উর্বশীর কানে কানে অরুণাংশু কিছু বলতেই উর্বশী পিছনের দিকে তাকিয়ে হেসে নিল কেন!

সূর্য ডুবছে, ছাগলছানা ঘরে ফিরছে। পিচরাস্তার উপর ধান শুকোতে দিয়েছিল যেসব চাষিবউ, ওরা ধান তুলে নিচ্ছে। হরিসেবক বলল, ওই যে দেখুন আমার নাম। আলকাতরায় লেখা পোস্টার। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতিতে হরিসেবক মাইতিকে ভোট দিন।

ভোট হয়ে গেছে না? অরুণাংশু জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, হয়ে গেছে, চিহ্ন রয়ে গেছে।

আপনি পঞ্চায়েতের মেম্বার?

হতে পারতাম, নিজেদের দোষে হলামনি।

নিজেদের দোষে, মানে?

সি পি এম ক্যান্টিডেট দিল, আর এস পি-ও দিল, মাঝখান থেকে সুড়ুৎ করে কংগ্রেস বেরিয়ে গেল আর কী।

আপনার কী পার্টি?

বুঝে নেন।

হরিসেবকবাবুর নাইটক্লাব লেখা পলিয়েস্টার গেঞ্জির ওপর মিস পাপিয়ার কাঁধছাটা চুল খলবল করছিল। বলল, এম এল এ মিনিস্টাররা আমাকে চিঠিপত্র লেখেন। একবার আমাদের পার্টির মিনিস্টার নিজে হাতে চিঠি লিখে রিকোয়েস্ট করলেন লোকজন নিয়ে মেদিনীপুরের রবীন্দ্রমঞ্চে গিয়ে উষা উত্থুপকে আটকাও। উষা উত্থুপ খুব অপসংস্কৃতি করছে। দুশো লোক নিয়ে গেলাম, পুলিশ লাঠি চালাল, খেলাম ক'ঘা। পার্টির জন্য কম করিনি স্যাকরিফাইশ।

অরুণাংশু বলে, আপনি তো উষা উত্থুপের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। এদিকে এসব ফাংশন করছেন, পার্টি বলবে না কিছু?

হরিসেবক হাসল। বলল, গরমেন্টের মিনিস্টাররা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে আপনাদের সল্টলেক স্টেডিয়ামে কিমি কাতকারকে নাচাচ্ছে, মিঠুনকে নাচাচ্ছে, সংস্কৃতির নাম খগেন করে দিল, আমি কোন হরিদাস, হরিসেবক উত্তেজিত।

এই ড্রাইভার! একটু থামাও। এখানে থামাও। অরুণাংশু হঠাৎ চিৎকার করে। গাড়ি থামলে অরুণাংশু মুখ বাড়িয়ে ডাকে, শিবপদদা...। একজন রোগামতো লোক, পাজামা পাঞ্জাবি পরা, হাওয়াই চটি, এগিয়ে আসে। অরুণাংশু গাড়ি খুলে নেমে যায়, লোকটা অরুণাংশুকে জড়িয়ে ধরে। অরুণাংশু বলে— শিবপদদা, এখানে কীভাবে?

আমি তো এখানেই থাকি। ওই তো নন্দকুমার গ্রামে, গেছিলাম কাজে, ফিরছি।

তবে ওঠো গাড়িতে। আমরা তো নন্দকুমারেই যাচ্ছি। অরুণাংশু আরও একটু সরে জায়গা করে দিল।

কতদিন পর দেখা— শিবপদ বলল। ফাংশানে যাচ্ছিস তো? পোস্টারে তোর নাম দেখেছি, 'ভাসুরপো'-খ্যাত প্রখ্যাত দূরদর্শন নক্ষত্র অরুণাংশু বসু। ভেবে রেখেছিলাম স্টেজে গিয়ে দেখা করব। এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি। দুটো বাস ছেড়ে দিয়েছি, উঠতে পারিনি। সবাই ফাংশানে যাচ্ছে। ভিড়। ভাগ্যিস হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম।

কোত্থেকে ফিরছিলে শিবপদদা?

রুগি দেখে। একেবারে ফুলো পেট!

তুমি ডাক্তার শিবপদদা?

ডাক্তার কী করে হব রে বোকা? জানিস না আমি বি এস সি ফেল? আমি সামান্য একজন স্বাস্থ্যকর্মী। হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল গতকাল ডাক্তারবাবু ছিলেন না। উনি সপ্তাহে দু'দিনের বেশি থাকেন না। কম্পাউন্ডারবাবু ওষুধ দিলেন। আমার মনটা আঁকুপাঁকু করছিল, ভাবলাম— যাই দেখে আসি...

কতদিন পর দেখলাম। কী ভাল যে লাগছে, সেই যে পাড়া ছেড়ে চলে গেলে...

চলে গেলাম কোথায়, চলে যেতে বাধ্য হলাম বল। হ্যাঁরে সেই ব্যোমকেশ বক্সির খবর কী রে, যে আমাদের ওঠাল?

জানো না, ও তো কাউন্সিলার হয়েছে।

বেশ।

এখনও লেখো শিবপদদা?

হ্যাঁ, লিখি তো...

এখন আর লিটল ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন পড়াও হয় না। কলেজ স্ট্রিটের দিকে যাওয়াই হয়ে ওঠে না আমার। আর কলেজ স্ট্রিটের বাইরে লিটল ম্যাগাজিন তো পাওয়াই যায় না। কাল ভোরবেলা তোমার ঘরে যাব শিবপদদা, কবিতা শুনব। কোথায় তোমার ঘর?

ওই তো নন্দকুমার স্কুলের পিছনেই। ১৮০ টাকা ভাড়ায় থাকি।

ক'দিন হল শিবপদদা?

মালদায় ছ' বছর ছিলাম। এখানে ছ' মাস।

কলকাতার আশেপাশে ট্রান্সফার চাও? আমার সঙ্গে হেল্‌থ-এর ডেপুটি সেক্রেটারির আজকাল খুব...

না রে, চাই না। খুব ভাল আছি। আমাকে এরা ছোট ডাক্তারবাবু বলে। আমি তো ওদের জন্য কিছুই করতে পারি না, ওরাল রিহাইড্রেশনের নিয়ম শেখাই, টিপল অ্যান্টিজেন দি, স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মকানুনের কথা বলি। অনেক সাধ আছে, কিন্তু ক্ষমতা নেই রে। বড় অন্ধকারে পড়ে আছি আমরা।

নন্দকুমার গ্রামে এখন কত আলো। কত লোক, গাড়ি থামতেই ভিড়। ভলান্টিয়াররা ভিড় রুখতে রুখতে আর্টিস্টমণ্ডলিকে নিয়ে গেল নন্দকুমার হাইস্কুলে। মহারাজ নন্দকুমার, যাঁকে ব্রিটিশরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল তার নামে এই গ্রাম, এই স্কুল। সারা স্কুলে আজ আলোর মালা। ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট দীনবন্ধু সাউ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন স্কুলের ঠিক দরজাটায়, যেখানে তমসো মা জ্যোতির্গময় লেখা আছে। তারই তলায় লাল শালুতে ঝুলছে গণেশ পূজা উপলক্ষে ব্যবসায়ী সমিতি দ্বারা পরিচালিত বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান। অভ্যর্থনা কেন্দ্র। আর্টিস্টমণ্ডলী ঢুকছে। ক্যামেরার ফ্লাস জ্বলে জ্বলে ওঠে। হরিসেবক পরিচয় করিয়ে দেয়— এঁকে তো চেনেন নিশ্চয়ই, অরুণাংশুদা। দীনবন্ধু বলে, আপনাকে টিভিতে কত দেখি, হেঁ হেঁ। এই যে উর্বশী, এই যে পাপিয়া। শিবপদ পাশে সরে গিয়েছিল। অরুণাংশু শিবপদের হাত ধরে টেনে নিল। বলল, এঁনাকে চেনেন তো? শিবপদ মজুমদার। আমার শিক্ষক, ওঁর কাছেই আবৃত্তি শিখেছি। ভাগ্যক্রমে আজ দেখা। এখানেই থাকেন।

দীনবন্ধু সাউ সবার ক্ষেত্রেই হেঁ হেঁ করছিলেন, শুধু শিবপদর বেলায় বললেন— 'ও' অরুণাংশু তখন বলল, তা ছাড়া ইনি একজন সাহিত্যিক। খুব ভাল লেখেন।

গদাধর পই বাংলা টিচার! ফাংশান কমিটিতে আছেন। যদিও ফাংশানটা করছে ব্যবসায়িরা, এর মধ্যে মাস্টারমশাই কেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হাটতলার মোড়ে গদাধরবাবুর একটা কোচিং আছে বলে কি? তা, দু'বেলায় ডেলি একশো ছেলেমেয়ে পড়ে। উনি শিবপদর কাছে এসে বলেন— আমিও একটু সাহিত্যসেবা করি। আপনিও সাহিত্য করেন শুনলাম, 'দেশ'-এ লেখেন?—উঁহু। তা হলে কোথায় লেখেন? শিবপদ পরিচয়, অনুষ্টুপ, শিলীন্ধ্র, প্রমা কী সব পত্রিকার নাম বলল, তা শুনে নিয়ে গদাধরবাবু মিস পাপিয়ার কাছে চলে গেল। অরুণাংশু গলা উঁচু করে বলল, ও খুব উঁচু দরের লেখক, কত গ্রুপ থিয়েটার ওর গল্প নিয়ে নাটক করেছে, এমনকী শমীক ব্যানার্জির মতো লোক...। পাপিয়া আর সংঘমিত্রা হেসে উঠল। গদাধর পই কিছু একটা রসের কথা বলেছে বোধহয়। এইমাত্র পোস্টমাস্টার মশাই তাঁর কলেজ স্টুডেন্ট মেয়েকে নিয়ে এলেন। মেয়েটি শিবপদ ছাড়া সবার

থেকে অটোগ্রাফ নিল। অজিত সামন্ত আলাদা ফটোগ্রাফার নিয়ে এলেন। দীনবন্ধু সাউ প্রেসিডেন্ট হতে পারেন কিন্তু তিন হাজার এক টাকা চাঁদা দিয়েছে কে?— অজিত সামন্ত। উনি মহাকালী কোল্ড স্টোরেজের মালিক। উনি একপাশে সংঘমিত্রা অন্যপাশে পাপিয়াকে নিয়ে ছবি তুললেন। টুং টাং শব্দ, গ্লাস এল বোতল এল, আর হইহই করে এসে ঢুকল পাঁশকুড়া ফাইভস্টার অর্কেস্ট্রার শিল্পীরা। শিবপদ বলল, যাই রে অরুণাংশু।— ফাংশান দেখবে না?— তা তো দেখতেই হবে। ঘরেও কি ঘুমুতে পারব? যা মাইক।— তুমি কিন্তু সামনের চেয়ারে বসবে, তুমি আমার গেস্ট। অজিত সামন্ত বললেন, নিশ্চই। নিশ্চই।

মাঠ জুড়ে ধান গাছের গোড়া এখনও কিছুটা সবুজ। পরিপূর্ণ হলুদ হবার আগেই কেটে নিতে হয়েছে বোধহয়। গাঁয়ের ফাংশান। শিবপদর পায়ে খোঁচা খোঁচা লাগে। হাজার হাজার লোক। সবাই বসতে পারেনি। কত লোক দাঁড়ানো। বউ ঝি-রা আসছে, আলতা রাঙা পায়ে দাঁড়িয়ে আছে কাটা ধান গাছের গোড়ায়। মুখে পান, কোলে সন্তান। পা-টা এ রকম কেন? পোলিওর টিকে-টা নিয়েছিল? কত লোক। কত অ্যানিমিয়া, ম্যালনিউট্রিশন, ভিটামিনের অভাব, স্কার্ভি, হেপাটাইটিস দাঁড়িয়ে আছে। জল ফুটিয়ে খেয়ো বুঝলে? কীসে ফুটাব ডাক্তারবাবু। মঞ্চে এলেন অরুণাংশু, সবাই হো হো করে উঠল। অরুণাংশু বলছে আকাশ নীল, সমুদ্রও নীল। নীলে নীলে নীলাকার। সমুদ্রের আছে ঢেউ, সুরেরও আছে ঢেউ। সুরের ঢেউ তুলতে আজ আপনাদের কাছে আসছেন আপনাদের চির আকাঙ্ক্ষিত, আপনাদের চির...

কেটে নেওয়া ধান গাছগুলো তখনও কিছুটা সবুজ। সেখানে দাঁড়িয়েছে আলতা রাঙা পা, বেজে ওঠে অ্যাকর্ডিয়ান, গিটার, মাউথ অর্গান। মাঠ দাপিয়ে ছুটে যাচ্ছে ঝিন চাগ ঝিন। শিবপদ ওর ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে।

বলাকা সংঘের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অরুণাংশু ফার্স্ট হয়েছিল। শিবপদ ছিল জাজ। ও অরুণাংশুর পিঠ চাপড়ে বলেছিল, পরে দেখা কোরো। শিবপদ যুব উৎসবে ফার্স্ট হয়েছিল। পাড়ায় ওর খুব নামডাক। পাড়ার এক দাদা বলেছিল, একবার রেডিয়োতে যাও শিবপদ, ওখানে চেষ্টা করো। এক অফিসারের চেয়ারের উলটো দিকে দেড়ঘণ্টা বসেছিল শিবপদ। তারপর অফিসারটি বলেছিলেন— কিছু মনে কোরো না ভাই, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসবে? সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। এরপর আর ও মুখো হয়নি শিবপদ।

অরুণাংশুর গলা ভাল। তা ছাড়া ও পেরেছে। ওর উন্নতি হয়েছে, নাম করেছে। ভালই লাগছে শিবপদর। দু' বছর ওর কাছেই তো তালিম পেয়েছিল অরুণাংশু। অরুণাংশু তো এ কথা অস্বীকার করে না...

শিবপদ ফিরে আসতেই খপ করে হরিসেবক ওকে ধরল।— সেই থেকে খুঁজছি, কোথায় গিসলেন অ্যাঁ? অরুণাংশুদা বলেছে আপনাকে একটু খাতির যত্ন করতে, চলুন একটু জলটল খাবেন। শিবপদ কিছুতেই খাবে না। হরিসেবকও এঁটুলি। না আপনাকে খেতেই হবে। অনলি ফর মাই পেস্টিজ। শিবপদকে নিয়ে গেল নন্দকুমার হাইস্কুলের ওই ঘরটায়, ক্লাস নাইন বি। বোর্ডে লেখা ভাব সম্প্রসারণ করো:—

ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাটফুল ঘুঙুরের মতো তাঁর কেঁদেছিল পায়।

হরিসেবক গ্লাসে ঢালল হুইস্কি। শিবপদ বলল, করছেন কী?

অল্প, অ্যাঁ? অনলি ফর মাই পেস্টিজ।

শিবপদ বলল— আমি উঠছি।

হরিসেবক বলল, তা হলে আপনি কাজু খান, চিপ্‌স আছে। মিষ্টিও বোধহয় আছে। আমি একটু জল খাই, অ্যাঁ? আমাকে সব্বাই চেনেন। পিন্টুদা আমাকে চিঠি লেখেন। আরতিদি, হৈমন্তীদি,

শিবাজীদা সবাই আমাকে ভালবাসেন। শিবাজীদা আগে বিরাটিতে থাকতেন, এখন অরুন্ধতীদিকে বিয়ে করে সল্টলেক চলে গেছেন, একটা যা অ্যালসেশিয়ান আছে না। শিবপদ বলে, ঠিক আছে, বিশ্বাস করছি।

হরিসেবক বলে— তিরিশটার মতো ফাংশান করেছি এই মেদিনীপুর জেলায়। আগে আগে দু-এক জন বলত আমি অপসংস্কৃতি করছি, এখন আর কেউ বলে না, বলার মুখ নেই, বললেই হোপ, লাইট দেখিয়ে দেব, বুঝলেন না?

শিবপদ বলে, স্থানীয় শিল্পীদের চান্স দেন না কেন, এখানে কত ভাল শিল্পী আছে।

কেন, দিলাম তো, ওই যে পাঁশকুড়া ফাইভস্টার অর্কেস্ট্রা?

আমি বলছি পল্লিগীতি, ঝুমুর, রং, তরজা।

ধুস।

ওখানে খুব হইচই। অরুণাংশুর গলা শোনা যাচ্ছে— আপনারা শান্ত হোন... ব্যাপারটা কী? জানা গেল, বনলতা সেন কলকাতা থেকে এসে গেছেন। গুজব ছিল উনি আসবেন না।

অবশেষে এলেন। তাই আনন্দ। অরুণাংশু চিল্লাচ্ছে, আপনারা দয়া করে সংযত হোন। নইলে মিস বনলতা স্টেজেই উঠবেন না। হরিসেবক আর শিবপদ স্কুলের মাঠের সামনেটায় বসেছিল।

হরিসেবকের এইসব নাচটাচ দেখার ততটা উৎসাহ নেই। জীবনে অনেক দেখেছে হরিসেবক। মিস শেফালি, মিস জে, কিছু বাকি নেই। এখানে ফুরফুরে হাওয়া।

এমন সময় এক বুড়ি এল। হরিসেবককে দেখেই এক্কেবারে গলে গেল। বলে, খোদ আপনার দেখাই পালাম যদি, আমার উপ্‌কার করেন। আমার লাতি দুটারে এট্টু খপর করে দ্যান, আমার ঘরে বড় বিপদ আজ্ঞা, জার্সি গোরু উলটো ছানা বিয়োচ্ছে।

হরিসেবক নাতি দুটোর নাম লিখে নেয়। বলে, লাতিগুলা ইখানে তো, লাতিগুলার বাপ কুথা!

বুড়ি বলে, বাপ মানে আমার ছেল্যা, সে তো নাই। ঘরে বউ একা কী করবে, বিকলো গোরুর পঁদে ঝল দেখ্যে বললাম, খকারা যাসনি, এখন ঠ্যাং বেরোয়ে এটকে রইছে।

শিবপদ ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝে। বাচ্চা হবার সময় আগে মাথা বেরোয়। বুড়ির গোরুর বাচ্চাটা পেটের মধ্যে উলটে গিয়ে আগে ঠ্যাং বেরুচ্ছে। ঠিকমতো বার করতে না পারলে বাচ্চাটা তো মরবেই, গোরুটাও মরে যেতে পারে।

হরিসেবক নাম লেখা কাগজটা পকেটে পুরে স্টেজের দিকে যায়। শিবপদকে বলে, সোশ্যাল সার্ভিস করি বলেই না গাঁয়ের লোক আমার কাছে আসে।

স্টেজে বনলতা সেন এসে গেছেন। এতদিন কোথায় ছিলেন? শিবপদ মনে মনে বলে। আমি শো করছিলাম। স্টারে, জানেন তো, প্রেমতৃষ্ণা নাটকের আমিই হিরোইন। আপনাদের ডাকে শো শেষ করেই সোজা গাড়ি নিয়ে চলে এসেছি। গ্রহণ করুন আমার উষ্ণ অভিনন্দন।

দর্শক আত্মহারা। হাজার হাজার অ্যামিবায়োসিস-হেপাটাইটিস-অ্যানিমিয়া-একজিমা দু'হাত তুলে নাচতে লাগল। অরুণাংশু বলল, নাচের ময়ূরী এবার খুলে দিচ্ছেন তার পাখনা। বেজে উঠল ট্রালালা। হরিসেবক ছুটে গিয়ে একটা স্লিপ দিল অরুণাংশুর হাতে। অরুণাংশু একবার পড়ে কপাল কুঁচকাল। হরিসেবক অরুণাংশুর কানে কানে কী যেন বলল। তারপর অরুণাংশু বলল— একটি বিশেষ ঘোষণা। হারু সেনাপতি আর নাড়ু সেনাপতি আপনারা যেখানেই থাকুন, এক্ষুনি বাড়ি চলে যান। আপনাদের জার্সি গোরুর উলটো বাচ্চা হচ্ছে।

নৃত্য করেন বনলতা। চ্যাংড়া ছেলেপিলেরা দাঁড়িয়ে যায়। নাচে। ওদের পায়ের তলায় খোঁচা মারে বাংলার মাঠের ধান গাছের অবশেষ। 'নাচো রে রঙ্গিলা, রক্তে এক কর স্বর্গ ও হার্লেম।'

উদ্দাম নাচ আধঘণ্টা হল। গাড়ি রেডি ছিল, বনলতা উঠে বসলেন। অজিত সামন্ত শেষ মুহূর্তে বনলতার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ফটোগ্রাফার ছবি তুলল, হরিসেবকও ধেয়ে এল। ততক্ষণে বনলতা গাড়িতে ঢুকে গেছেন। ওর আর ছবি তোলা হল না।

হাস্যকৌতুক শুরু হবার আগে মাইকে অরুণাংশু ঘোষণা করল, শিবপদ মজুমদারকে মঞ্চে আহ্বান করা হচ্ছে।

ব্যাপারটা কী! শিবপদ খুব আশ্চর্য।

শিবপদ মঞ্চের পিছনে যায়। দীনবন্ধু সাউ ওকে সমাদর করে নিয়ে যায়। বলে, আপনি এই গাঁয়েই আছেন, আপনি একজন রত্ন, অরুণাংশুবাবু বলছিলেন, অথচ আমরাই জানিনে, স্টেজে চলুন। হরিসেবকও এসে গেছে। বলে, একটা সারপ্রাইজ। নিজেই মাইক তুলে নেয় হরিসেবক। বলে, বন্ধুগণ! আমাদের ভাগ্যক্রমে আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীশিবপদ মজুমদার। তিনি বর্তমানে এই গ্রামেই থাকেন। নন্দকুমারের জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দিতে পেরে আমরা ধন্য।

শিবপদ কী করে ফিরে হতচকিত সম্মোহিতের মতো স্টেজের কোনায় চলে এসেছিল।

দীনবন্ধু সাউ কাগজ মোড়া কী একটা তুলে দিল শিবপদর হাতে। অরুণাংশু বলল, তালি বাজান, অমনি, সারা মাঠ জুড়ে তালি বেজে উঠল। সারা মাঠ যেন পোষমানা। শিবপদ কী ঘটে গেল ঠিক বুঝতেই পারল না, মৃত সন্তান কোলে করা দুঃখী মায়ের হাসপাতালের সিঁড়ি পেরোনোর মতো ওই প্যাকেটটা নিয়ে কোনওরকমে মঞ্চ থেকে নেমে আসে শিবপদ। পোস্টমাস্টারের মেয়েটা খাতা খুলে এগিয়ে আসে, একটা অটোগ্রাফ। স্টেজে হাস্যকৌতুক শুরু হয়ে গেল। শিবপদ কাগজ খুলে দেখে কাচ বাঁধানো লেখা—

শিবপদ তোমার লেখায় পল্লি মায়ের কথা
তোমার গায়ে লেগেই আছে পল্লি মায়ের ব্যথা
তোমায় পেয়ে ধন্য মোরা আজিকার এই রাতে
ক্ষুদ্র স্মৃতি চিহ্নখানি তুলে দিলাম হাতে

—ইতি নন্দকুমারের অধিবাসীবৃন্দ

॥ লেখাই ও বাঁধাই চিন্তামণি আর্ট স্টুডিয়ো ॥

শিবপদ ওই প্যাকেটটা নিয়ে মাঠে, একেবারে পিছন দিকে চলে যায় যেখানে অন্ধকার। ধানগাছের কাছে, মাঠের সিক্ততার কাছে চুপচাপ বসে থাকে। ওকে যেন কেউ ধর্ষণ করে গেছে। কীর্তনাঙ্গে কদম কদম বাড়ায়ে যা হচ্ছে। ধর্ষিত হচ্ছে সমস্ত মাঠ, মাঠ কি বোঝে না? ওইসব শেষ হলে মৃগী রুগির মতো কেঁপে উটল মাঠ। হাততালি। এবার অরুণাংশুর ভারী কণ্ঠস্বরে শুনতে পায় শিবপদ—

হারু সেনাপতি, নাড়ু সেনাপতি, এক্ষুনি বাড়ি চলে যান। আপনাদের জার্সি গোরুর উলটো বাচ্চা হচ্ছে।

কাচ বাঁধানো ওই জিনিসটা মাঠের অন্ধকারে ফেলে আসে শিবপদ। আঙুলে উঠে আসা ফ্রেমের বার্নিশের রং মাথার চুলে মুছে ফেলে। আর্জেন্ট অর্ডার দিয়ে ওটা করানো হয়েছিল নিশ্চয়ই।

স্কুল মাঠের পিছন দিয়ে ঘরে ফেরে শিবপদ। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। এখানেও অরুণাংশুর গলা। পাঁশকুড়া ফাইভস্টার অর্কেস্ট্রা। জিলে লে জিলে লে। হাইড্রোসেফালাসের একটা শিশুর মা শিবপদর পা জড়িয়ে ধরেছিল। বাঁচান ডাক্তারবাবু। শিবপদ ডাক্তার না। ও কিচ্ছু জানে না। হাসপাতালে ডাক্তার থাকে না। শিবপদ দেখেছিল বাচ্চাটার মাথাটা বিরাট, চোখ বেরিয়ে এসেছে, স্কাল নরম। এর চিকিৎসা এখানে হবে না, শিবপদ এটুকু শুধু জানে। কলকাতায় নিয়ে যাওয়া, একবার পারে, বারবার পারে না। ছেলেটা মরবেই। শিবপদ কিচ্ছু করতে পারবে না। ওর কিচ্ছু ক্ষমতা নেই। জিলে লে জিলে লে... ভোর হয়ে আসছে। অরুণাংশুর গলা শুনতে পায় শিবপদ—

সুরের এই উৎসব, গানের এই উৎসব শেষ হতে চলল। পুব আকাশ লাল হয়ে এল। এটাই শেষ আইটেম। গজল গাইবেন...

এবার হরিসেবকের গলা শুনতে পেল শিবপদ। হরিসেবক উত্তেজিত। একটি জরুরি ঘোষণা: হারু সেনাপতি, নাড়ু সেনাপতি এক্ষুনি বাড়ি চলে যান। আরে যা না রে উল্লুক। তোদের ঠাকমা এইমাত্র বলে গেল তোদের জার্সি গোরুটা বাছুরসহ মরে গেছে।

শিবপদ এবার ওঠে। অরুণাংশু এখানে আসবে বলেছিল, বিশ্রাম নেবে বলেছিল। স্টেজের পিছনে যায় শিবপদ। অরুণাংশু বলে, সেই থেকে তোমায় খুঁজছিলাম। অরুণাংশু সমাপ্তি ঘোষণা করে বলে— সামনের বছর দেখা হবে আবার! বিদায়!

অরুণাংশুকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য রিকশা রেডি ছিল। কথা ছিল হরিসেবক পৌঁছে দেবে স্টেশনে। অরুণাংশু বলল স্টেশনে যাবে না, শিবপদর সঙ্গে ওর ঘরে যাবে। হরিসেবক মনঃক্ষুণ্ণ হল। হাজার হাজার মানুষ দেখতে পেল না হরিসেবক অরুণাংশুর পাশে বসে রিকশায় চলেছে। হরিসেবক লম্বা করে হ্যান্ডসেক করল। রিকশার চারদিকে ভিড়।

হরিসেবক শিবপদর দিকেও বাড়াল হাত। দীনবন্ধু সাউ, অজিত সামন্ত, সবাই এসেছে। অরুণাংশুর দিকে হাত বাড়ানো। ভিড়। শিবপদকেও দেখছে অনেকে। একজন শিবপদকে বলল, আপনি রাধেশ্যামবাবুর বাড়ি ভাড়া থাকেন না? শিবপদ বলে— হ্যাঁতো।— আপনি অরুণাংশুবাবুর বন্ধু? বাব্বা! রিকশা ছাড়ল। ভিড় ঠেলে এগুচ্ছে, এমন সময় একজন ছুটতে ছুটতে আসে। হাতে কাচ বাঁধানো ওই মানপত্রটা। বলে, মাঠে ভুলক্রমে ফেলে গেইছিলেন আজ্ঞা। অরুণাংশু ওটা নেয়।

শিবপদ বলে, ব্যাপারটা কী অরুণাংশু, এইসব মানপত্র...টত্র...

অরুণাংশু বলে— তোমাকে দেওয়া হল।

কেন?

তোমার পাওয়া উচিত।

কে বলল।

আমি বললাম ওদের, বললাম, আপনারা জানেন না, উনি কে?

আমায় পাইয়ে দিলি?

না, মানে আমি বললাম ওদের...

ছিঃ!

কিছু অন্যায় করেছি শিবপদদা?

তুই বুঝতে পারছিস না অরুণাংশু। তুই এতটাই ব্লান্ট হয়ে গেছিস। তুই তালি দিতে বললে ওরা তালি দেয়, তুই নাচতে বললে ওরা নাচে। তাই বলে তুই আমাকে মানপত্র পাইয়ে দিবি? করুণা করবি?

শিবপদদা, তুমি তো তোমার লেখায়...

ওদের কাছে আমার লেখা পৌঁছতে পারে না। ওদের জন্য আমরা আঁতেল কাগজে আঁতেল কায়দায় কাঁদি আর ওই কান্নার ক্যাসেট আঁতেলরাই বাজিয়ে শুনে সুখ পায়। ওদের কাছে আমি কিচ্ছু না। তুই ওদের দেবতা।

বাড়ির সামনে ভিড়। অনেকে আগেভাগেই খবর পেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়িওলার স্ত্রী কড়কড়ে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে রিকশাটা ঢুকতে দেখেই বলে, শিবপদবাবু, উনি আপনার বন্ধু? আগে কখনও বলেননি তো...

শিবপদ রিকশাওলাকে বলে— ঘোরাও। স্টেশনে চলো।

অরুণাংশু অবাক হয়। শিবপদ বলে— তুই দেবতা। আমি প্রসাদ হতে চাই না।

চৌমাথার মোড়ে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। শিবপদ রিকশা থামিয়েই মানপত্রটা পেট্রোল ট্যাঙ্কারের উপর আস্তে করে রেখে আসে। রাস্তার পাশে বসে প্রাতঃকৃত্য করছিল ড্রাইভার, পরিষ্কার না করেই হইহই করে ছুটে আসে!

শিবপদ ওটা বার করে বোঝায়—বিপজ্জনক কিছু নয়। বোঝায়— কলকাতা নিয়ে যেতে অসুবিধা হচ্ছে, তাই এখানে রেখে যাচ্ছে! ভাল করে পরীক্ষা করে ড্রাইভার। তারপর পিছন দিকটা খুবলে ফেলে। বলে, হনুমানজির ছবিটা এখানে সেট হয়ে যাবে! আচ্ছাই হুয়া।

ম্লান বসে থাকে অরুণাংশু! শিবপদও কথা বলে না কিছু। রাত্রির গর্ভ থেকে উঠে আসছে গো-শাবকের মতো একটা ম্লান গ্রাম। রিকশা চলে।

শিবপদ বলে—

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক ॥

আপাতত ওই মানপত্রে ঢুকে থাকে হনুমানজি।

একান্তর, ১৯৮৮

নৈশপর্ব

এখন যেখানে মুক্তবায়ু সেবন হচ্ছে, সেখানে ভাগাড় ছিল। ওই অঞ্চলটা ছিল কচুরিপানা অধ্যুষিত নিচু জমি। লোকেরা জানত শীলেদের ডোবা। এখন শীলভদ্র আবাসন। শীলভদ্রের ভদ্রলোকেরা পূর্বতন ভাগাড়, অধুনা বিহারিকায় প্রাতঃবিহার করছেন, অনেকেরই পায়ে কেড্‌স, কেউ আবার ট্রাক স্যুট পরেছেন যদিও, স্যুটের ভিতর থেকে ভুঁড়িটা ফুটে বেরুচ্ছে, হাফ প্যান্টও আছেন। মহিলাদের মধ্যে শাড়ি আছেন, উচ্চাঙ্গে তোয়ালে চাপানো ম্যাক্সি আছেন, শালোয়ার কামিজও আছেন।

মহিলারা যতই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজ-সামঞ্জস্যের জন্য, বা আরও কতকিছুর জন্য চেঁচান না কেন, নিজেরাই মূলস্রোতে মিশতে চান না। কোনও সভাসমিতিতে গেলে দেখা যায় কিছু মহিলা এক জায়গায় একজোট হয়ে আছেন। মিছিলেও তাই, এমনকী পিকনিকেও। এই মাঠেও মহিলারা একটি নির্দিষ্ট কোনায় সমবেত। মহিলারা স্কিপিং করেন না, বুকডন দেন না, বিহারিকায় কিছুক্ষণের জন্য বিহার করেন, যাদের ঘাড়ে স্পন্ডেলোসিস হয়েছে, ঘাড় ঘোরানোর ব্যায়ামে তারা তপন মিত্র-শ্যামল দত্তদের একটু-আধটু দেখেন ও একটু-আধটু মন্তব্য করেন— যতই লাফাক, ওর ভুঁড়ি কমবে না, কিংবা শোনো, উনি না পার্লারে যান, ফেসিয়াল করতে দেখেছি, কিংবা কী মেসোমশাই কেমন আছেন... এইসব কথাবার্তা বলে ব্যায়াম সাঙ্গ করেন।

এই মেসোমশাইরা, মানে বয়োবৃদ্ধদেরও এরকম একটা মাইনরিটি ফিলিং হোক বা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স হোক, কিছু একটা আছে। ওঁরাও মাঠের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হন। নিজেদের সুগারলেভেল, কোলেস্টেরল, ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদির সংখ্যাতত্ত্ব বিনিময় করেন, দাঁত তোলার পর দাঁত বাঁধানো উচিত নাকি উন্মুক্ত মাড়িই ভাল। প্রস্টেটের জন্য ট্যাড়শ উপকারী নাকি ক্ষতিকর— ইত্যাদি ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ডিবেট। আজকালকার গৃহবধূদের আর তেমন গৃহকর্ম করতেই হয় না— এ ব্যাপারে মতৈক্য শেষে যে যার বাড়ি ফেরেন।

এই যে বিহারিকা, মুক্তবায়ু সেবনের মাঠ, এখানে নারী-পুরুষ বৃদ্ধ নিয়ে জনা ত্রিশেক লোক সমাগম হয়, তারমধ্যে সাত-আট জন বৃদ্ধ। চকচক করলেই যেমন সোনা হয় না, তেমন চুল পাকলেই, কিংবা দাঁত পড়লেই বৃদ্ধ হয় না,— এমনকী পেনশন নিলেও বৃদ্ধ হয় না। পরিমল সেন অন্তত তাই মনে করেন। বৃদ্ধত্বের কি কোনও সংজ্ঞা আছে? রেল কোম্পানি ৬৫ বছর বয়েস হলে কনসেশন দেয়। আবার অফিস-টফিসগুলোতে কোথাও ৫৮, কোথাও ৬০ হলে অবসর নিতে হয়। কিন্তু তমোনাশবাবু তো ৬৭ বছর বয়েস। এখনও জিন্‌স পরেন, চকরাবকরা জামা, নাতনিসমা বান্ধবী, উনি কি বৃদ্ধ?

পরিমল সেন শীলভদ্র আবাসনের পুরনো পাপী। বয়স ৭২। শীলেদের ডোবায় যখন প্রথম লটের ফ্ল্যাটগুলো হল, তখনই রিটায়ার করে পাওয়া টাকায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছিলেন পরিমলবাবু। 'শীলের ডোবা' নামটা পাল্‌টে শীলভদ্র আবাসনের প্রস্তাব পরিমলবাবুরই। শীলভদ্র আবাসন রেসিড্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন, সংক্ষেপে SARA তাঁর হাতে তৈরি। দু' বছর সেক্রেটারিও ছিলেন। একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবার পর ওঁকে সবকিছু থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিমলবাবুর ভাগ্নে আর ওঁকে বাজার করতে দেন না, রেশন আনতেও দেন না। অ্যাসোসিয়েশনের নতুন বাড়িতে উনি নেই বহুদিন। বাহাত্তর বছর বয়েস বলে কি সংসারে ফেলনা নাকি?

ভোরবেলায় পরিমলবাবু বিহারিকায় এসে হাত-পা একটু বেশি বেশিই ছোড়েন। বুকে

পেসমেকার বসানো বলরামবাবু ফেরার সময় বলেন, অত যে লাফালাফি করেন পরিমলবাবু, আবার হার্ট অ্যাটাক হবে যে। পরিমলবাবু হরধনু ওঠানোর মতো হাতের লাঠিটা আকাশের দিকে তুলে বলেন, কিচ্ছু হইব না। আমি এখন উইদাউট টেকিং এনি রেস্ট দোতলায় উঠতে পারি। জানেন?

এই পরিমলবাবু মুক্তবায়ু সেবন মেম্বারদের ভিতরে একটা উপদল গঠন করেছেন— APA মানে, এজেড পারসন্‌স অ্যাসোসিয়েশন। ওরা চাইছেন বয়স্কদের সামাজিক গুরুত্ব। বাজার করার অধিকার, রেশন তোলার অধিকার, শীলভদ্র আবাসিক অ্যাসোসিয়েশনের কাজের অধিকার। বর্তমান সেক্রেটারি তপন মিত্রকে বলেছেন, অ্যাসোসিয়েশনের কামে আমাগরে লাগান না ক্যান? আমরা কি নেহাতই সরবিট্রেট আর ডায়াবিনিজ খোর বুড়ো হাবরা? এবারের আবাসনের স্পোর্টস-এ মাঝবয়সিদের জন্য হাঁটার রেস ছিল, হাঁড়িভাঙা রেস ছিল, এক্সক্লুসিভলি বৃদ্ধদের জন্য কোনও রেস ছিল না কেন? আমরা অবহেলিত। তপন মিত্র বলেছিল, তা হলে সামনের বার দাঁতপরা রেস নামে একটা ইভেন্ট দিয়ে দেব। বাঁশি বাজলেই মুখ থেকে বাঁধানো দাঁতটা খুলে একটা বাটিতে রাখতে হবে, তারপর আবার মুখে লাগিয়ে নিয়ে একটা বিস্কুট চিবিয়ে খেতে হবে। যিনি আগে পারবেন...। পরিমল বলেছিলেন— যাঁদের বাঁধানো দাঁত নাই, শুধু মাড়ি?

পরিমলবাবুর সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে। আগে রিফিউজি সংগঠন করতেন। একটু-আধটু বামপন্থী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও আছে। অবহেলিত, নিপীড়িত, চক্রান্ত, এইসব শব্দগুলি ওঁর ভোকাবুলারিতে রয়েই গেছে। আর রয়ে গেছে একটু বাঙাল-বাঙাল টান। পরিমলবাবু ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেল্‌থ স্কিম বা সি জি এইচ এস-এর ডিসপেনসারিটা কাছেই। ওখানে মাঝে মধ্যে যান। বয়স্ক মানুষেরা ওখানে আসেন, অন্যরা বড় একটা আসেন না। কী করে আসবেন? ওই ডিসপেনসারিটা খোলা থাকে সকালবেলা। তখন তো অফিস। ওখানে অবসরপ্রাপ্ত বয়স্করা সব হজমের ওষুধ, ডায়বেটিজ, প্রেসার ইত্যাদির ওষুধপত্র নিয়ে থাকেন, আর সুখ-দুঃখের কথা বলে থাকেন। ওখানেই পরিমলবাবু বৃদ্ধদের নিজস্ব সংগঠনের উপযোগিতা নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা রেখেছিলেন। উপস্থিত সবাই ওই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, এবং সেইদিনই একটা সংগঠন তৈরি হয়েছিল। সংগঠন মাত্রই মুখপত্র মুখাপেক্ষী। সুতরাং একটি মুখপত্র প্রকাশ করার কথা ওঠে। অবসরপ্রাপ্ত সি বি আই কর্মী নারায়ণ মুখার্জি সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। তাঁর ভিতরে সুপ্ত ছিল সাহিত্যপ্রতিভা। পুলিশের চাকরিতে সেই প্রতিভার স্ফুরণ হয়নি। এবারে সুযোগ পেয়ে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পত্রিকাটি ছিল হাতে লেখা পত্রিকা। নারায়ণবাবু প্রথম সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন কবিতায়।

কত অপরাধী নিজে ধরিয়াছি
এখন আমাকে ধরিতে হয়
অপরাধ মোর বুড়া হইয়াছি
কত গঞ্জনা সহিতে হয়... ইত্যাদি

ওই সংখ্যায় পরিমল সেন লিখেছিলেন একটি ওজস্বিনী কবিতা। সুকান্ত ভট্টাচার্যের মানব না বাধা মানব না ক্ষতি চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতির অনুকরণে লিখেছিলেন মানি না সর্দি মানছি না কাশি/শত গঞ্জনা মুখে তবু হাসি... শেষ লাইনে ছিল আরও খাব আলু আরও খাব ডিম।

পত্রিকাটি ডাক্তার-ইনচার্জের বিশেষ অনুমতিতে ডিসপেনসারির একটি দেয়ালে লাগানো হত, যেখানে রুগিরা ডাক্তারের জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকেন। পত্রিকাটি সম্প্রতি বন্ধ হয়েছে— সম্পাদকের ছানি হল কিনা।

পরিমলবাবু ওই শীলভদ্র আবাসনেও একটা বয়স্কদের পত্রিকার প্রকাশ চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনও ভলান্টিয়ার সম্পাদক পাওয়া যায়নি। আর পরিমলবাবু নিজস্ব হাতের লেখাকে তিনি

নিজেই বলেন কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং তাই পত্রিকাটি হয়নি। তবে ওল্ড পিপলস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেছিলেন, কিন্তু ওই তরুণ, তপনরা ওটাকে ওল্ড মংকস, বলতে থাকায় নামটা ঈষৎ পালটে, এজেড পারসনস অ্যাসোসিয়েশন বা এ পি এ করেছেন। আপাতত ছ'জন মেম্বার আছেন। পরিমলবাবু নিজেই স্বঘোষিত সেক্রেটারি। অনেকটা একনায়কত্বই চালান। ষাটোর্দ্ধদের মধ্যে যারা অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত ইত্যাদি, তাঁরাই মেম্বার হতে পারেন।

নিপীড়ন নানারকমের। যেমন অবিনাশবাবু নিজেকে নিপীড়িত ভাবেন, কারণ ওর স্ত্রী গুরুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। গুরুর ছবিতে নিয়মিত মালা পরান। গুরু জীবিত। ছবির সঙ্গে কথা বলেন, সন্দেশ খাওয়ান, গুরুবাক্য পাঠ করেন, গুরুর অবয়ব ধ্যান করেন। বুড়ো বলে কি অবিনাশ পুরুষ নন। হারাধনবাবু আবার অন্যভাবে নিপীড়িত। ওঁর পুত্রবধূ দিনরাত টিভি খুলে বসে থাকে। হই-হট্টগোল একেবারেই ভাল লাগে না হারাধনবাবুর। একটু শুয়ে শুয়ে জীবনে কী পেলাম— কী পেলাম না ভাবছেন, এমন সময় বোলো তারারারা... উকলি কি নীচে দানা। পরিমলবাবু আবার অন্যভাবে নিপীড়ত। উনি ব্যাচেলার মানুষ। ভাগ্নেকে মানুষ করেছেন। ভাগ্নের সংসারেই থাকেন। ভাগ্নে-বউ এখন আর বাজার করতে দেয় না। একটা ছোটখাটো হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে বলে কি একেবারেই অকেজো? সংসারের কোনও কাজেই কি লাগতে পারেন না? একটু ডাল-ভাত-আলুসেদ্ধ খাবার ইচ্ছে। পান না। আলু খাওয়া কি পাপ? রোজ স্যুপ। হার্ট অ্যাটাক যেন কারুর হয় না। সরষে-লঙ্কার ঝাল বাদ। মাছপাতুড়ি কী ভালই না লাগে। কিন্তু বাদ। ডিম বাদ। সবই বরবাদ। মামার দুঃখ বোঝে না। এই ভাগ্নেকেই মানুষ করেছেন। রিটায়ার করা টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন। টলস্টয়ের আনাক্যারেনিনার প্রথম লাইনটা একটু পালটে পরিমল সেন বলেন, অল হ্যাপি পার্সন রিসেম্বল ওয়ান অ্যানাদার; এভরি নিপীড়িত পার্সন ইজ নিপীড়িত ইন ইট্‌স ওন ওয়ে।

তো, আজকের এই শীলভদ্র আবাসনের পিছনের বিহারিকায় এ পি এ সদস্যদের মধ্যে একটা অন্য আলোচনা। সম্প্রতি পাড়ায় কয়েকটা চুরি হয়ে যাওয়ায় আবাসিক অ্যাসোসিয়েশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাইটগার্ড দিতে হবে। নাইটগার্ডের একটা রোস্টারও করা হল, তাতে বুড়োদের রাখা হয়নি। কেন? বুড়ো বলে কি পাহারা দিতে পারা যাবে না? মতিবাবু পরিমল সেনকে বললেন, দেখুন, এটা কিন্তু আমাদের অপমান। পরিমলবাবু বললেন, দেখছি। তারপরই অ্যাটেনশন, ডাইনে মুড়, এবং ফরোয়ার্ড মার্চ। তখন তপন মিত্র হাত ছোঁয়াচ্ছে পায়ের পাতায়। ভুঁড়ি কমাবার ব্যায়াম। পরিমলবাবু বললেন— শোনো তপন, কথা আছে।

সব শুনে তপন মিত্র বলল— আপনারা নাইটগার্ড দিলে আপনাদের আবার কে গার্ড দেবে?

কেন পারি না? জানো, রাতে আমার ঘুম হয় না?

আপনাদের সবার বাড়ি থেকে যদি পারমিশন পাই তা হলে ভাবা যেতে পারে।

পারমিশন?

পরিমলবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। কার পারমিশন? বাড়ির? জানো না আমিই হেড অফ দি ফ্যামিলি? রেশন কার্ড দেখে এসো গে। ভোটার লিস্ট দেখে এসো গে। আমিই পারমিশন দিয়ে থাকি সব ব্যাপারে, আর বলছ আমাকেই পারমিশন নিয়ে আসতে? আমরাও নাইটগার্ড দেব।

ইতিমধ্যে মতিবাবু, হারাধনবাবু ইত্যাদিরা চলে এসেছেন, এবং হাতের মুঠি উপরের দিকে তুলে ফেলেছেন। পরিমলবাবু বললেন, রাত্রির অধিকার...

বাকিরা— দিতে হবে। দিতে হবে।

পরিমলবাবু সংশোধন করলেন, দিতে হবে না,— ছিনিয়ে নেব।

তপন বলল, প্লিজ চেঁচামেচি করবেন না, আমি একজিকিউটিভ বডির মিটিং ডেকে ব্যাপারটা ফয়সালা করছি।

একজিকিউটিভ কমিটিতে বোধহয় এ পি এ লবিটবি করেছিল। ওরা নিমরাজি হল। ঠিক হল মাসে একদিন করে এ পি এ-কে নাইটগার্ড দেবার জন্য আহ্বান জানানো হবে। এ পি এ উইথ প্রটেস্ট

রাজি হয়ে গেল। শীলভদ্র আবাসনের অ্যাসোসিয়েশন রুমের দেয়ালে সাঁটানো রস্টারে এ পি এ-র ডেট দেওয়া থাকবে। কে কে আসবে, ক'জন থাকবে সেটা নির্ভর করছে এ পি এ মানে পরিমল সেনের উপর।

পরিমলবাবু তাঁর দলের মিটিংয়ে বললেন, লড়াই করে যখন অধিকার অর্জন করা গেছে, আমরা প্রত্যেকেই গার্ড টিমে থাকব। ওর দলে এখন আটজন বায়ুসেবী মেম্বার।

তারিখটি এসে গেল। কথা ছিল আটজনই থাকবে নাইটগার্ড টিমে। শেষদিকে চারজনই পিছিয়ে গেল। অ্যাডভেঞ্চার উত্তেজনায় একজনার প্রেসারটা বেড়ে গেল তো নার্ভাসনেসে আর একজনার প্রেসারটা ফল করে গেল। অন্য একজনের বাড়িতে এই ইস্যুতেই নিপীড়ন বেড়ে গেল। অবশেষে শ্বেত সন্ত্রাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে টিম থেকে নাম কাটিয়ে নিল। অন্য একজন প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের যন্ত্রণায় বেশ কষ্ট পাচ্ছেন। বাকি রইলেন চারজন। রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত গার্ড দিতে হয়। এগারোটার আগেই যে যার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মতিবাবু এলেন গলায় মাফলার গায়ে চাদর। মার্চ মাস। শীত চলে গেছে। হারাধনবাবুর আবার বাঁদুরে টুপি, কাঁধে ওয়াটার বটল। অবিনাশবাবু কয়েকটি পান নিয়ে এসেছেন, পরিমলবাবুর ফ্লাস্কে চিনিছাড়া চা। সঙ্গে প্রত্যেকেরই বাড়ির লোক। কারুর ছেলে, কারুর ভাইপো, পরিমলবাবুর পিছন পিছন এসেছে ওঁর ভাগ্নে, পরিমলবাবু ভাগ্নেকে ভাগিয়ে দিলেন। অন্যদেরও। বললেন, এগারোটা বেজে গেছে, সব চলে যাও। আমাদের ডিউটি করতে দাও। পরিমলবাবু বাঁশি বাজালে পি-পিপ। ডিউটি শুরু হল।

বসন্ত যাই যাই করছে, নাকি চলেই গেছে। দুপুরবেলায় দু-একটা কোকিল এখন কেঁকুর কেঁকুর করে। হলুদ হ্যালোজেনের আলোয় শিমুলগাছটা ফ্যাকাশে মেরে গেছে। রেডিয়োর এফ এম চ্যানেলে ভুলু সাহার গলা শোনা যাচ্ছে। একটা বাড়ির ফাঁকা বারান্দায় শতরঞ্জি পেতে চারজনে বসলেন। ওই বাড়িতে এখনও লোক আসেনি। প্রথমেই হারাধনবাবু খুলে ফেলেন মাংকি ক্যাপ। মতিবাবু মাফলার। বোঝাই যাচ্ছে সব জোর করে পরিয়ে দিয়েছিল 'বাড়ির লোক'। পরিমলবাবু প্লাস্টিকের গ্লাসে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন। ওঁর সিগারেট নিষেধ। ঝোলার ভিতর থেকে বার করলেন নিষিদ্ধ সিগারেট। সবাই সিগারেট ধরালেন। অ্যাডভেঞ্চার। ধোঁয়া ছাড়ার মধ্যে, আঃ।

পরিমলবাবু বললেন, একটু পরেই আমরা বারইয়া পড়ুম। মুক্তচিত্তে মাতৃভাষায় প্রত্যেককে কাজ বোঝালেন পরিমলবাবু। কে কোনদিকে যাবে ঠিক করে দিলেন। তিনিই কমান্ডার-ইন-চিফ। প্রত্যেকেরই বাঁশি আছে। যে চোর দেখবে সেই বাঁশি বাজাবে। বাঁশি শুনেই বাকিরা সেইদিকে যাবে। হাতের লাঠি দিয়ে দরকার হলে চোরের মাথায় আঘাত করা যেতে পারে। চোর যদি ছুটে পালাতে চায়, তা হলে লাঠির বাঁকা হাতল চোরের পায়ে লাগিয়ে চোরকে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। চোর যদি পুকুরে ঝাঁপ দেয়, তা হলে চারজনে সমবেতভাবে বাঁশি বাজাবে, তখন ফ্ল্যাটের অন্য লোকেরা ধেয়ে এসে পুকুর ঘিরে ধরে চোর পাকড়াও করবে। পরিমলবাবু সবাইকে একটা করে টর্চ বিলি করলেন।

প্ল্যান-প্রোগ্রাম হল। এবার চারজনে বেশ আয়েশ করে বসলেন। বহুদিন এত রাতে এভাবে আড্ডা জমেনি। মতিবাবু গান ধরলেন, সখী যাই যাই বোলো না। হারাধনবাবু বললেন, তবে আমি একটা নিধুবাবু ধরি? সবাই বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরো। হারাধনবাবু চারিদিকে তাকালেন। বহু ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। হারাধন বললেন, এখন থাক। পরে হবে। পরিমল সেন বললেন, এরকম পাহারা দিতাম চল্লিশ বছর আগে। রিফিউজি কলোনিতে যেন গুন্ডারা আগুন দিতে না পারে। নাইট আফটার নাইট পাহারা দিয়েছি। মতিবাবু বললেন, আমিও। আমাদের কারখানা মেশিনপত্র পাচার করে লকআউট করে দেবার চক্রান্ত চলছিল। তখন রাতের পর রাত পাহারা দিয়েছি। অবিনাশবাবু বললেন আমার দেশের বাড়িতে ছিল খেজুরগাছ। শীতে হাঁড়ি ঝোলাতাম। চুরি হবার ভয় ছিল। পাহারা দিতাম। এমন সময় টর্চ হাতে তপন মিত্র এল। এসেই বলল— সব ঠিক আছে তো? কোনও অসুবিধে নেই তো?

পরিমলবাবু একটু রুক্ষভাবেই বললেন— না, কোনও অসুবিধা নাই। এভরিথিং ইজ ওকে। তপন চলে যাবার পর পরিমলবাবু স্বগতোক্তি করলেন— 'ভেরি ইনসালটিং'।

এ গল্প সেই গল্প করতে করতে আরও রাত হল। ফ্লাস্কের চা শেষ হল। ফ্ল্যাটের আলোগুলো নিভে গেল আস্তে আস্তে। কিন্তু চারটে ঘরে আলো নিভল না। ওদের চারজনের ঘর। পরিমলবাবু আলো জ্বলা ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভেরি ইনসালটিং। পরিমলবাবু ওর নিজের ফ্ল্যাটের দিকে হেঁটে গেলেন। হাঁকলেন— বিদিশা, অ্যাই বিদিশা, শিগগির দরজা বন্ধ কইরা বাত্তি নিভাইয়া শুইয়া পড়। ওঁর হাঁকডাকে আরও দু-চারটে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। পরিমলবাবু বললেন— ইগনোর, ইগনোর দেম।

চারজনে চারদিকে ঘুরে পুনরায় ওই ফাঁকা বারান্দায় এসে মিললেন। চারজনেরই মুখে চার রকমের গান। হারাধানবাবুর মুখে নিধুবাবু। উনি গুনগুন করছেন। পরিমলবাবু বললেন— হোক হোক। হারাধনবাবু ধরলেন— এমন চুরি চন্দ্রাননী শিখিলে কোথায়/হাসিয়ে নয়ন বান হরিয়ে লইলে প্রাণ/কথায় কথায়।

গানটা শেষ হলে পরিমল সেন বললেন— আহা! আহা! এবার বিজয়া সম্মেলনে আপনাকে গাইতে হবে আর একটা ধরুন। হারাধনবাবু গাইলেন, মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না। কুকুর চ্যাঁচাল। ওটাকে ইগনোর করে সবাই বলল, আহা আহা। সবাই বলল, আহা আহা সবাই পুলকিত। মতিবাবু বললেন, আচ্ছা পরিমলবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি তো ব্যাচেলার। আপনার জীবনে কি একেবারেই কোনও ইয়ে আসেনি? পরিমলবাবু বললেন— কে বললে আসেনি। তবে বলছি শুনুন।

সবাই ঘন হয়ে বসলেন।

কম বয়সে বাবা বিবাহ দিয়া দিছিলেন। আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট দেন। ঘরে পনেরো বছরের বালিকা বধূ। আমি বিশ বর্ষীয় যুবক। কলকাতার হোস্টেলে থেকে রিপন কলেজে পড়ি। বি এ পরীক্ষার পর দ্যাশে আসলাম। বাড়ির সামনে খাল। বসন্তকাল। আকাশে একটা বিগ সাইজের চাঁদ। আমার বালিকা বধূ রোমান্টিক হইয়া গেল গিয়া। সে বলল— চলো, বেড়াইতে যাই।

সব যখন ঘুমাইয়া পড়ছে, নিশুতি রাইত, দুইজনে নৌকায় উঠলাম। ছোট্ট একখানা বৈঠা। ভাটার টান। আমি বৈঠা ছাইড়া দিছি। বইঠার পরিবর্তে কি ধইরা আছি বুঝতেই পারতাছেন।

সবাই হাসলেন। গো অন গো অন। নৌকা ইজ গোইং অন ইটস ওন ওয়ে। খাল ছাইড়া নদীতে পড়ল গিয়া নৌকা। ভাটিতে ভাইস্যা যায় আমার কি আর হুঁস আছে? মৃদুমন্দ হাওয়া। আহা এমন সময় নৌকাটা কীসের গায়ে ধাক্কা খাইল। দেখি, নৌকাটা নদীতে পাতা জালের সঙ্গে জড়াইয়া গেছে। বাঁশের খটখট শব্দ। আর পর মুহূর্তেই আকাশ ফাটানো চিৎকার ও কাশেম ভাই... কোন হালার পো হালায় বুঝি ভেসালের বেবাক মাছ উডাইয়া নেলে। চোর ধরার লাইগ্যা বেবাক আস...।

সর্বনাশ। আমি আবার বালিকা বধূরে জড়াইয়া ধইরা ঝাঁপ দিলাম। সে ভাল সাঁতার জানত। সাঁতরাইয়া পাড়ে আইস্যা লুকাইয়া রইলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে আমার গ্রামে ফিরলাম।

লণ্ঠন হাতে গ্রামের চৌকিদার বলাই মণ্ডল আমগরে দেইখ্যা ফালাইল, কিন্তু আন্ধারে চিনতে পারল না। চিনলে কী সর্বনাশ, কী ভাবব সে? গ্রামে রাষ্ট্র করব। আমি আমার বালিকা বধূরে লইয়া ঝোপে গা ঢাকা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বলাই মণ্ডল চিৎকার পাড়ল। চোর-চোর-চোর... তারপর সেই বালিকা বধূ কী করল শোনবেন? হঠাৎ, অল অন এ সাডেন আমার মুখে নখের আঁচড় বসাইয়া দিল। আমি তো হতভম্ব। বালিকা বধূ কইল— চোরে মারছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর তারস্বরে চিৎকার— চোর চোর চোর। আমারেও কইল তুমিও চোর চোর চিৎকার দাও। আমিও চোর চোর চোর...

লোকজন দেখল চোরে আমার গালে কীরকম আঁচড় দিছে। তারপর গালের যন্ত্রণা সেই সারাইল। যে ব্যাথ্যা দিতে পারে, সারাইতেও জানে। কী কইরা সারাইল—কমুনা। হারাধনবাবু বললেন, ব্রাভো! ব্রাভো! কিন্তু আপনার স্ত্রী...

পরিমলবাবু বললেন— অল্প বয়সেই স্বর্গে গেছেন। এ ঘটনার অল্পদিন পরেই। কলেরা।

মতিবাবু বললেন, কিন্তু ঠিক এরকম একটা গল্প যে পড়েছিলাম মনে হচ্ছে... নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা—নৈশপর্ব...

অ! পড়েছেন নাকি! এক ঘটনা কি দু'জনের জীবনে হয় না। গল্প কি সত্যি হয় না, নাকি জীবনে গল্প হয় না। পরিমলবাবুর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল!

এমন সময় একটা আওয়াজ। কথা থেমে গেল। রিভলভারের ট্রিগার টিপলেন পরিমল সেন। ঠিক রিভলভার নয়, টর্চ লাইট। মেশিনগান চালানোর বিক্রমে টর্চ ঘোরালেন। টর্চের আলোয় দেখা গেল একটা লোক রাস্তায় পড়ে আছে।

কুইক মার্চ। ওরা পা চালিয়ে গেলেন ওইদিকে। লেফ্‌ট রাই লেফ্‌ট। লোকটার মাথা ফেটে গেছে। পাশে একটা ফুলের টব, ভাঙা। একটা বনসাই। মতিবাবু বললেন, আমার পুত্রবধূর রচনা। টবটা আমাদের ব্যালকনিতে ছিল।

মতিবাবু লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি কি চোর? লোকটা বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরিমলবাবু বললেন, নাও ইট ইজ প্রুভ্‌ড দ্যাট উই ক্যান। আমরাও... সরি, আমরাই চোর ধরতে পারি। বাঁশি বাজাও। কিন্তু কারুর কাছে বাঁশি নেই। সবাই ওখানেই ফেলে এসেছে।

তবে চেঁচাই? হারাধনবাবু জিজ্ঞাসা করেন। চোরটা উঠে বসে। জোড়হাত করে বলে, দোহাই, চেঁচাবেন না।

কেন?

চেঁচালে আপনাদের প্রেসার বেড়ে যাবে। প্যান্টের পকেট থেকে রুমালটা বের করে মাথার রক্ত মুছল চোর।

ক'দিন আগে যে একটা সাইকেল চুরি হল তুমি করেছ?

আজ্ঞে না।

এর আগে কী কী চুরি করেছ তুমি এ পাড়া থেকে!

কিচ্ছু না। পনেরো বছর পরে আজই কাজে নেমেছিলাম।

তা এই সামান্য টব চুরি করতে গেলে কেন?

দেখছিলাম এখনও পারি কি না।

কী পারো কি না?

কাজ। রিটায়ার করেছি তো, সবাই বলে অকম্যে। তা আজ একটু ট্রাই করতে গিয়েছিলাম।

পরিমলবাবু বলেন— এদিকে এসো। আমাদের ওয়াটার বোটলে জল আছে। ব্যাকটেরিয়া ফ্রি। মাথাটা আগে ধুয়ে নাও।

ওরা ওই বারান্দায় যায় শতরঞ্জিতে বসে। চোরটিও। রাত আড়াইটে। একটা প্যাঁচা ডাকল।

পরিমল জিজ্ঞাসা করে— বয়স কত হল!

চোরটি বলে, হবে ষাট-সত্তর। রায়েটের সময় ছোট ছিলাম।

কোথায় থাকা হয়?

গাধিধোলা। কাছেই।

আগে কী করতে?

চুরি।

ছেড়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ। পনেরো বছর পর আজ ট্রাই করলাম।

ট্রাই করে কী মনে হল?

পারি।

কই পারলে? পাইপ থেকে পড়ে গেলে তো।

উঠেছিলাম তো ঠিকই। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি খেলাম। তারপর আপনাদের গল্প শুরু হল। ওই বালিকা বধূর গল্প। এক হাতে টব নিয়ে পাইপ বেয়ে নীচে নামছিলাম। তারপর আপনাদের কে একজন সিনেমার সুখেন দাসের সব ডায়লগ বললেন— গল্প কি জীবনে সত্যি হয় না? তখন ঘাড়টা ওদিকে ঘোরালাম। আর পড়ে গেলাম। তবে রক্ষে, বেশি উঁচু থেকে পড়িনি।

গত পনেরো বছর যে তুমি আর চুরিটুরি করছ না তো তোমার কী করে চলে?

কেন, ছেলে চুরি করে।

কোথায়?

সরকারি অফিসে। আমার চুরির ইনকাম দিয়ে আমার ছেলেটাকে পড়ালেখা শিখিয়েছি। ও এখন সরকারি চাকরি করে। ওর চুরি করতে তো সিঁদকাঠি লাগে না। পাইপ বেয়ে উঠতে হয় না। ওদের কাজ খুব সোজা। সব খাতায়-কলমে হয়।

তো আজই কেন হঠাৎ ট্রাই করতে এলে?

ছেলের বউ যে গতকাল বললে, আপনি কোনও কম্মের না। কোনও কাজই পারেন না। খালি বসে বসে খান...।

তো এখন যদি তোমায় ছেড়ে দি, কী করবে?

বাড়ি চলে যাব। গিয়ে ঘুমব। আমি তো জেনে গেছি— পারি। ঘুমটা ভাল হবে। কী, মশায়রা কী বলেন, পারি না?

পরিমলবাবু সায় দিলেন। অন্যরাও।

এবার মতিবাবু বললেন, তো এবার ওকে নিয়ে কী করা যায়?

পরিমলবাবু বললেন—দ্যান, ছাইড়া দ্যান।

মতিবাবু বললেন, ছেড়ে দেবেন? ছেড়ে দিলে কিন্তু প্রুভ্‌ড হয়ে যাবে আমরা চোর ধরতে পারিনি। সকাল হলেই আমার পুত্রবধূ চেঁচামিচি করবে।

পরিমলবাবু বললেন, তা হলে বরং এক কাজ করি। চোরকে বলি, আবার পাইপ বেয়ে বনসাইটা যথাস্থানে রেখে আসুক।

মতিবাবু বললেন— তো টবটা, টব তো আর গাছ থেকে নিজে নিজে বেরিয়ে এসে বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিতে পারে না...

দ্যাট ইজ কারেক্ট, দ্যাট ইজ কারেক্ট।

দেন?

দেন উই ক্যান ডু ওয়ান থিং...। পরিমলবাবু বললেন। একটা টব জোগাড় করতে হবে। তারপর বনসাইটা টবে প্লেস করতে হবে। হোয়ার ইজ দা চোর?

চোর বলে, ইয়েস স্যার...

পরিমলবাবু বলেন— ওই যে একতলা বাড়িটা দেখতাছ, ওইটা আমার ভাইগনার শ্যালকের বাড়ি। ওই বাড়ির ছাদে অনেকগুলি ফুলের টব আছে। ওর খুব ফুলের শখ। ফাঁকা টবও নিশ্চয়ই আছে। একতলার ছাদে উঠতে পারবা না?

চোর বলল, নিশ্চয়ই পারব।

চোরটা পারল। আর হারাধনবাবু হাততালি দিয়ে উঠলেন, পেরেছে পেরেছে...।

পরিমলবাবু বললেন, ডোন্ট বি একসাইটেড, লোকজন জাইগ্যা যাইব গিয়া। চোরটা একটা লম্বা দড়ি জোগাড় করে নিল ছাদ থেকে। টবটাকে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। পরিমলবাবু ঝুলন্ত টবটা ঝাঁপিয়ে ক্যাচ লোপার কায়দায় ধরলেন, যেন জন্টি রোডস। চোর নেমে এল। একটু হাঁপাচ্ছে। পরিমলবাবু চোরকে বললেন, টেক রেস্ট।

মতিবাবু এবার নিজের বাড়ির সামনে গেলেন। টবের ভাঙা টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলে এসে নিজের বাড়ির পাইপটা চোরকে দেখিয়ে বললেন— যেমন পাইপ বেয়ে উঠেছিলে,

তেমন ওঠো। টবটা সঙ্গে নিয়ে উঠতে হবে না। রিস্ক নিতে হবে না। ব্যালকনিতে উঠে গেলে দড়ি ধরে টবটা টেনে নিয়ো, তারপর গাছটা বেঁধে দেব, দড়িতে টেনে নিয়ো। গাছটা ঠিকমতো প্লেস করে দিয়ো টবে। পারবে না?

মতিবাবুর দোতলার ব্যালকনিতে চোর উঠছে পাইপ বেয়ে। হাতে দড়ি। পরিমলবাবু টর্চের আলো ফেলছেন পাইপটির গায়ে। চোর দোতলায় উঠছে। ষাটোর্ধ্ব চোর। আহা পারছে। ওরা হাততালি দিতে পারছে না, উচ্চ শব্দ করে বলতে পারছে না, শাবাশ। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেন অন্ধকারে। মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন।

শারদীয় বর্তমান, ২০০১

উদ্বাসন কাব্য

১৯৭৯ সালের বসন্তকালে অবশেষে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলল কমল মুখার্জির বাড়িতে। রান্নাঘরেও একটা বাল্‌ব। কনকলতা ভেবেছিলেন রান্নাঘরে বোধহয় ডুম দেবে না। কারণ, ওটা 'রান্নাঘর' তো। খাওয়া ছাড়া পুরুষদের ওই ঘর লাগে না। রান্নাঘরেও ডুম আসাতে খুব খুশি কনকলতা। ঘরের বাঁশের খুঁটিতে কাঠের বোর্ড বসিয়ে এখানে কালো রং-এর গোল গোল সুইচ। টুনি আর আওয়া সুইচটা বারবার জ্বালাচ্ছিল আর নেভাচ্ছিল। দেবু ছোট ও জানে পুরুষ সন্তান, সুতরাং বুঝে নিয়েছে সংসারে কর্তৃত্ব করতে হবে ওকে। বলে, দিদি আলটাবিনা, আলটাবিনা, লাইট খারাপ হলে কিন্তু আমি জানি না। টুনি ওর পাকা পাকা কথা শুনে হাসে। আরও বেশি করে সুইচ অফ-অন করে। আজ খুশির দিন। পাশের দুই বাড়িতেই সেই কবে থেকে ইলেকট্রিক এসেছে, মুখার্জি বাড়িতেই আসেনি। আজ মুখার্জি বাড়ির পাশে রাস্তাটার ওপারের বিশ্বাসবাড়িতেও এসেছে। বড় ঘরটার দু'পাশে দুটো ডুম। দুটো সুইচ। আর একটা কালো জিনিস, তাতে তিনটে ছোট গর্ত। হাবুলদা বলে গেছে ওই গর্তের মধ্যে যেন কক্ষনো কিছু না ঢোকানো হয়। ওটা কী কাজে লাগবে কনক ঠিক জানে না। যদি শিবু থাকত, শিবু সব বুঝত।

বেলা বারোটা নাগাদ হাবুল চলে গেছে। এখন একটা বেজে গেছে। কমলবাবু কাজে চলে গেছেন। কনকলতা রান্নাঘরে। হাতে খুন্তি, কড়াইতে কচুর শাক নাড়ছেন। আসলে চিঠি লিখছেন। কালো কচুর শাকের গায়ে খুন্তির নাড়াচাড়ায় শিবুকে চিঠি। শিবু, আলো আইছেরে ঘরে, ইলেকট্রিকের। তুই হ্যারিকেনের আলোয় কত কষ্ট কইরা পড়ছস। তুই অখন আছস কেমন? কে তোরে রাইন্ধ্যা দেয়? অখন আমি কচুর শাক পাক করতাছি। তুই কত কচুর শাক ভালবাসিস। তুই যাইবার পরে কচুর শাক পাক করি নাই। আইজ উপায় নাই, তরিতরকারি কিছুই নাই, তাই ক'টা কচু গাছ উঠাইয়া পাক করলাম। কচুর শাকের গায়ে খুন্তি টেনে শেষ লাইনটা কেটে দেয় কনকপ্রভা। ঘরের অভাবের কথা বলে ছেলেকে বিব্রত করা উচিত হবে না।

আজ বৃহস্পতিবার। কচুর শাকটা জাল দিয়ে দুটো দিন রেখে দেবে কনকপ্রভা। শনিবার শিবু আসতে পারে। গত শনিবার আসেনি, তার আগের শনিবার এসছিল। লণ্ঠনের আলো ডিম করে রেখে অনেক রাত অব্দি গল্প করেছে।

হেমকান্ত উপরের কাঁড় থেকে টিনের সুটকেসটা নামিয়ে দিতে বললেন দেবুকে। দেবু নামিয়ে দিল। ওটাকে সুটকেস বলেন কেন কে জানে, ওটা তো একটা টিনের বাক্স। হেমকান্ত যে তক্তাপোষটার উপর শোন, তার পাশেই বাঁশের খুঁটিতে একটা বাল্‌ব লাগানো হয়েছে। হেমকান্ত পড়াশুনো করতে ভালবাসেন। একটা আতস কাচ রয়েছে তাঁর, ওই আতস কাচ চোখের কাছে রেখে পড়েন-টড়েন। কিছুদিন আগে একটা পুরনো শারদ সংখ্যা পেয়েছিলেন, সম্ভবত শিবুই এনেছিল। মলাট ছিল না। আতস কাচ চোখের সামনে রেখে সমরেশ বসুর 'বিবর' পড়ছিলেন আর গাল দিচ্ছিলেন এইডা সাহিত্য? হুঃ। অশ্লীল। অশ্লীল। তবু পড়ছিলেন। হেমকান্তর ধারণায় রবীন্দ্রনাথও 'অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট'। স্তন, চুম্বন, ইত্যাদি হেডিং দিয়া কবিতা ল্যাখে! ছিঃ। কবি হইলেন গিয়া নবীন সেন। পোহাইল বিভাবরী পলাশি প্রাঙ্গণে, পোহাইল যবনের সুখের রজনী।' আহা! আহা!

হেমকান্ত বাক্সটার ধুলো ঝাড়লেন। একটা কৌটো খুললেন, কৌটোর ভিতরে চাবি। চাবিটা

দিয়ে বাক্সটা খুললেন। ভিতরে হলুদ হলুদ কাগজপত্র। বইটই। বাক্সটার ডালা বন্ধ করলেন হেমকান্ত। তক্তাপোষের তলায় আর একটা বাক্স আছে হেমকান্তর। ওখানে থাকে টাকাপয়সা। কমল সংসার খরচা ওর বাবার কাছেই দিয়ে দেয়। এ ছাড়া হেমকান্ত পেনশনও পেয়ে থাকেন। ছত্রিশ টাকা। এ ছাড়া ওই বাক্সে একটা কৌটোয় থাকে তালমিছরির টুকরো। হেমকান্ত মাঝে মাঝে কৌটোটি খুলে তালমিছরি মুখে দিয়ে চোষেন। দেবু যখন আরও ছোট ছিল, মাঝে মাঝে দু-এক টুকরো পেত। শিবুর একদিন খুব টাকার দরকার হয়েছিল। দুটো টাকা ঝুমুর চেয়েছিল। বাক্সটা খুলেছিল দুপুরবেলায় চুপিচুপি। মাত্র চারটি এক টাকার নোট ছিল। মাসের সেদিন তেইশ বা চব্বিশ হবে। কিছু নেওয়া যায় না এখান থেকে। বাক্স ঘাঁটলে একটা রুমালে বাঁধা কয়েকটি রুপোর টাকা। এটা থাক! এটা থাক! আরও গভীরে কী লুকোনো কিছু নেই! খুঁজতে গিয়ে একটা বই পেয়ে গিয়েছিল শিবু। 'নরনারীর যৌন প্রভেদ'। প্রচ্ছদে ভেনাস। এখন সে কথা থাক।

হেমকান্ত দেবুর পেড়ে দেওয়া সুটকেসটির উপর একটা কিল মারলেন। ঠং শব্দ। হেমকান্তর উচ্ছ্বাস। বললেন, তা হইলে শ্যাষম্যাষ রিফিউজি ঘরেও বিজলি বাতি আইল? আমাদের দ্যাশের বাড়িতে ছিল না। পাকিস্তানে থাকলে কিন্তু বিজলি বাতি ভোগ করতে পারতাম না। বাঁশের খুঁটিটির দিকে তাকালেন হেমকান্ত। তখন আলোটা জ্বলে রয়েছে। হেমকান্ত বললেন, 'যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি। আশু গৃহে তার দেখিবে না আর নিশীথে প্রদীপ ভাতি।' এখন দিনেরবেলায় বাত্তি নিভাও। টুনি বলল— এটা মোমের বাতি নয় দাদু, ডুম বাতি, ডুম হেমকান্ত বললেন, মিটারটা বসানো হয়েছে একটা শালের খুঁটিতে। যে আতস কাচটা দিয়ে বিবর পড়েন, হিসেব লেখেন, সেই কাচটা দিয়ে মিটারে চাকার ঘূর্ণন দেখেছেন হেমকান্ত। টুনি লাইটটা নিভিয়ে দেয়। হেমকান্ত বলেন, আসলে এই ঘরটা কিঞ্চিৎ অন্ধকার। জানালাগুলি ছোট। পর্য্যাপ্ত আলো আসতে পারে না। ইলেকট্রিকের আলোর কল্যাণে এই সত্যটা বুঝতে পারলাম। আরও একবার জ্বালো দেখি মা, একটু পরেই নিভাইয়া দিও।

হেমকান্তও ওর নাতি-নাতনিদের সঙ্গে আলো জ্বালার খেলা খেলতে থাকেন। কনকলতা ব্যাপারটা দেখবার জন্য ঘরে এসে দেখল— হেমকান্তর চোখে গামছা বাঁধা। হেমকান্ত চোখ বাঁধা অবস্থায় নিজের তক্তাপোষ থেকে উঠে সুইচ অন করে ডুম জ্বালাতে চলেছেন। শ্বশুরের ব্যাপার-স্যাপার দেখে ঘোমটা দিল কনকলতা, শ্বশুরের চোখ বাঁধা। তবুও, কনকলতা গলা খাটো করে বলল— একখান মুছিব্বত বাধাইবি তোরা, বুড়া পইর‍্যা গেলে কী হইব? মুছিব্বত কথাটা উর্দু। পাকিস্তান থেকে ক্যারি করে এনেছে। কথাটা হেমকান্ত শোনেননি। কানে কম শোনেন তিনি। রান্নাঘরে গিয়ে কনকলতা কচুর শাকের গায়ে আবার লেখে— আজ বাড়িতে বড় আনন্দ।

খাওয়ার সময় হেমকান্ত বলল, রাত্রে আর আমার জন্য খাওয়ন লইয়া ঘরে যাইতে হইব না। আমি রান্নাঘরে আইস্যাই খামু অনে। দুই ঘরের দুই আলোয় উঠানটাও ফক ফইক্যা হইয়া যাইব। টুনি বলে, কখন সন্ধ্যা হবে মা? আজকের সময় কাটে না।

সন্ধে হল। অবশেষে সন্ধের আগেই আলো জ্বালাতে হল। হ্যারিকেনটার দিকে তাকিয়ে হেমকান্ত বললেন, ওই যে ওইটা আমি। বলেই একা একা হাসলেন। বললেন, আর দরকার নাই। কনকলতা বলে উঠল— কে কইল দরকার নাই, যা লোডশেডিং। কনকলতা ধূনো জ্বালাল, ঘরের দরজায় জল ছিটাল, শাঁখ বাজাল, আর হেমকান্ত তাঁর ওই সুটকেস থেকে বের করলেন রিফিউজি সার্টিফিকেট, এনট্রি পাস। বাস্তুহারা পরিষদের ইশ্‌তেহার একটা প্রাচীন নোটবুক, আর একটা বাহাদুর খাতা। বাহাদুর খাতাটা দিন কয়েক আগেই দেবুকে দিয়ে আনিয়েছিলেন হেমকান্ত। মলাটের উপর লিখলেন— ॥ উদ্বাসন ॥

ব্যাকেটে লিখলেন মহাকাব্য। প্রথম পৃষ্ঠায় লিখলেন— অমর কাব্য তোমরাও লিখিও বন্ধু যাহারা আছ সুখে। পরের পৃষ্ঠায় লিখলেন— ॥ প্রথম সর্গ ॥ সন ১৯৪৬ ॥

আসিল ক্রিপ্‌স সাহেব ভারত মাটিতে
সুভাষের যুদ্ধ তাঁর রয়েছে স্মৃতিতে
কিছুদিন আগে হল নাবিক বিদ্রোহ
তলোয়ার জাহাজের বীর নাবিকেরা
উপেক্ষা করিয়া সব ব্রিটিশ শাসন
বাজাইল রণ ডংকা। শুরু হ'ল রণ।
লেবার পার্টির মন্ত্রী— অ্যাটনি সাহেব
ভাবিল এইবার, আর দেরি নয়
ভারতেরে দেহ স্বাধীনতা। সেই হেতু ক্রিপ্‌স
আসিল ভারতে।
প্রাদশিক নির্বাচন কিছুকাল আগে হল শেষ
বাংলায় জিতিয়াছে মুসলিম লিগ।
১৬ই অগস্ট হ'ল কলঙ্কের দিন
পাকিস্তান মাগিল জিন্না। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।
তার পরে পাল্টে গেল আমাদের গ্রাম।

বিজলি বাতিতে লিখছেন হেমকান্ত। কনকলতা উলটো দিকের তক্তাপোষে। সবাই বিজলি বাতির রোশনাই উপভোগ করছে।

হেমকান্ত হঠাৎ কনকলতার দিকে তাকালেন। বললেন, বৌমা, সেইদিনের ঘটনাখান একবার কও দেখি। সেই দ্যাশের ঘটনাটা, তুমি আমাদের খিড়কির পুকুরে স্নানে গেছিলা শীতকালে। কমল বোধহয় তখন বরিশালে। তুমি পুকুরে, কয়েকটা ছ্যামরা চিল্লাইয়া উঠল— পাক-পাক-পাক পাকিস্তান...।

কনকলতা ঘোমটা দিলেন। বললেন— সেই কথা অখন ক্যান? অনেক পুরানো কথা। অন্ধকার কথা। হেমকান্ত বলেন— এই আলোয় আমার অন্ধকার কথা দরকার। কও, কও, লাজ কী, য্যান কইছিল হেই ছ্যামড়া গুলাইন? সব লিখ্যা যামু।

কনকলতা মাথা নিচু করে থাকেন।

কও না, কও, আমি জানতাম, ভুইল্যা গেছি গিয়া। তখন সব গ্রামেই এইরকম কথা শুনা যাইত। কনকলতা চুপ।

কিছুক্ষণ বিড়বিড় করেন হেমকান্ত। তারপর বলেন পাক-পাক-পাক পাকিস্তান হিন্দুর ভাতার মোছলমান। পাইছি। পাইছি।

কনকলতার মনে সেই শীত-সন্ধ্যার কথা। ঋতুস্নান সেরে পুকুর থেকে উঠবে, এমন সময় ওই রব। পাক-পাক-পাক পাকিস্তান...। কনক তখন ভয়ে চুপ। ওই মানুষগুলো কুয়াশায় আর অন্ধকারে অচেনা। আবার পাক-পাক-পাক পাকিস্তান...। অন্য স্বরে হিন্দুর ভাতার মোছলমান। একজন পুকুর পাড় দিয়ে জলে নেবে আসে। বলে, বিবিযান দেরি হইয়া যাইতেছে। পানিতে আর কতক্ষণ থাকবা? শীত লাগে না বুঝি? হাত ধরো। তখনই কনকলতা চিৎকার করে উঠেছিল ভীষণ জোরে। হেমকান্ত সেই আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছিল। ওরা পালিয়ে গিয়েছিল তখন।

রাত আটটা বেজে গেল, কমল এল না। রাগ ধরে না বুঝি? আজকের দিনে কোথায় একটু আগে আগে আসবে। রাগ ধরে কনকলতার। কনকলতা ঘরের ভিতর থেকে উঠানের দিকে চেয়ে দেখে কাঁঠাল গাছটার গায়ে আলো পড়েছে। আলো পড়েছে পায়খানাতলা যাবার পথেও। মুগ্ধ হয়ে আলো দেখে কনকলতা, আলো দেখে টুনি, আওয়া, দেবু। আর আলোর তলায়, তক্তাপোষের

উপর জলচৌকি, তাতে কাগজপত্র খুলে রেখেছে হেমকান্ত, যেন রাত্রিবেলা পড়াশুনো না-করলেই নয়।

হেমকান্ত বলেন— কলোনিতে দুই বছর আগে যদি কানেকশনটা দিত, শশাঙ্ক ঘোষের পোলাটা মরত না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। হ্যারিকেন থাকলে শিখাটা কেঁপে উঠত।

শশাঙ্ক ঘোষের ছেলেটা ছিল শিবুর সমবয়সি। ঘর থেকে রান্নাঘরে যাবার সময় সাপ কামড়েছিল। অন্ধকার ছিল উঠোন।

তখন টুনি অন্য কথা ভাবছিল। অন্য অন্ধকার। সেই অন্ধকার পুরুষ মানুষটির অন্ধকার মুখ। রাস্তায় তখন কোনও আলো ছিল না। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল পাম্প করছিল। বালতি ছিল কলে। আর অন্ধকার ছিল। হঠাৎই পিছন থেকে কেউ। দুই বুকে দুটো হাত। টিউবওয়েলের শব্দ বন্ধ। ও চিৎকার করার চেষ্টা করতেই ওই হাতের একটা থাবা হয়ে বসে গিয়েছিল টুনির মুখে, আর একটা হাতের আঙুলগুলো সব পোকা হয়ে গিয়েছিল, ঠ্যাং হয়ে গিয়েছিল, শিং হয়ে গিয়েছিল, ছুরি, করাত, বাটালি। টুনির দুটো হাত, রোগা হাত কিছুতেই এ হাতটাকে সরাতে পারছিল না। টুনি পিছনে তাকিয়ে মুখটাও দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু একটা সাপের মতো হাত, আর সাপের ফণার মতো হাতের পাঞ্জা। দূরের একটি সাইকেল ও তার আলোর পরে ওই হাতটা সরে গিয়েছিল।

এক আকাশ অন্ধকার নিয়ে ঘরে গিয়েছিল টুনি। কাউকে বলেনি, কেউ জানে না, শুধু বালতিটা, আর কলটা।

সেই থেকে খুব আলোর শখ টুনির, আলোর ইচ্ছে। প্রায়ই বলত কলোনিতে কবে লাইট আইব গ মা। কনকলতা শুধু ঠোঁটটা উলটে দিত।

টুনিরা দেখেছে— সোদপুরের কত জায়গায় ইলেকট্রিক এসে গেছে। স্টেশন রাস্তাটা তো কবে থেকেই ঝলমল। রবীন্দ্রপথ, প্রফেসর পল্লি, অঞ্জনগড় সব জায়গায় ইলেকট্রিক শুধু কলোনিগুলিতে নেই।

আসলে কলোনিগুলোতে বিদ্যুৎ দিতে অনেক অসুবিধে ছিল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের। কলোনিগুলো তো বৈধই নয়। এই মহাজাতি নগর কলোনি যেমন। খাতায়-কলমে এই জমি চৌধুরিদের। এখানে যদি ট্রান্সফর্মার বসাতে হয়, পোস্ট বসাতে হয়, খাতায়কলমে চৌধুরিদেরই তো জানাতে হবে। উন্নয়ন কমিটি অনেকদিন চেষ্টা করেও বিদ্যুৎ নিয়ে আসতে পারেনি কলোনিতে। অবশেষে এল বছর দুয়েক আগে। এই মুখার্জি বাড়িতেই একটু দেরি হয়ে গেল আর কী।

বাইরের উঠোনে পাতা মাড়ানোর শব্দ পেয়ে কনকলতা বলে, এতক্ষণে এলে, কেউ সাড়া দেয় না। উঠোনে গড়ানো আলোয় দেখে কুকুর।

কমল আজ ইচ্ছে করেই একটু রাত করছিল। কমল কাজ করে হাটখোলার দত্তদের বাড়িতে। সেরেস্তার কাজ। মূল কাজ বাড়িভাড়া আদায়। দত্তদের অনেক বাড়ি আছে কলকাতায়। কমল ঘুরে ঘুরে বাড়িভাড়া আদায় করে। ভাড়া আদায় করতে বাড়ি বাড়ি যাওয়াকে বলে তাগাদায় যাওয়া। তাগাদায় যাওয়া ছাড়াও আরও কাজ আছে কমলের। বাড়িভাড়ার হিসেব করে তার অংশ আলাদা আলাদা শরিকদের ভাগে জমা করা, ভাড়াটেদের সঙ্গে যে-ক'টা মোকদ্দমা চলছে, তার তত্ত্বতালাশ করা, তা ছাড়া বাবুদের ইলেকট্রিক বিলগুলো জমা দেওয়া, যে-বাবুদের টেলিফোন আছে, তাদের বিলগুলো জমা দেওয়া, দরকার মতো রেলের টিকিট কেটে দেওয়া, বাবুদের সিনেমার টিকিটও। বউদিরাও চাকরদের দিয়ে চিরকুট পাঠায় মাঝে মধ্যে। এই পরশু দিনই মেজ বাড়ির চাকর একটা চিঠি নিয়ে এল— মুখার্জিবাবু, ঝটুর হাতে দশ টাকা পাঠালাম। ছোটিসি মুলাকাতের চারটি টিকিট কাটিয়ে রাখবেন, কাল তিনটে-ছটা। দুপুরবেলা গিয়ে ঝটু টিকিট নিয়ে নেবে। কারুকে বলবেন না। কাল আড়াইটের সময় দুটো রিকশা আনিয়ে রাখবেন।

চিঠিটা পড়ে কমল ঝটুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। ঝটু বাবুদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা

বলে না। কিন্তু কমলের চোখের দিকে তাকিয়েই ছোট করে চোখ মারল। বলল, উত্তম-বৈজয়ন্তীমালা। এইসব সম্মান-টম্মান নিয়ে কমল মাথা ঘামায় না। ওর মায়ের কাছে একটা প্রবাদ শুনত— শালগ্রাম চিবাইয়া খাইলাম চালতায় ডর করে না। কত রকমের কত অপমান সয়েছে কমল। এসব তো কিছু না। কমলকে টিকিট কাটতে বলা হয়েছে কিন্তু কোন হল-এ বলা হয়নি, খবরের কাগজ দেখে হল জেনে নেয়, তারপর লাইন দিয়ে টিকিট কাটে।

দত্তবাড়ির সেরেস্তায় চাকরি করার আগে কমল কাজ করত পণ্ডিত রমেশচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণের কাছে। তারও আগে, মানে দেশের বাড়িতে চাকরি করত চৌধুরিদের সেরেস্তায়। দত্তপাড়ার চৌধুরিরা ছিল জমিদার। জমিদারদের ছেলেরা সবাই হেমকান্তর ছাত্র। হেমকান্ত জিলাস্কুলের হেড পণ্ডিত। হেমকান্তর অনুরোধেই সেরেস্তায় একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়েছিল কমলের। বামুনবাড়ির ছেলে বিষয়-আশয় ভাল বোঝে না, কিন্তু ওদের নায়েব ন কড়ি মিত্র কাজ শিখিয়েছিলেন কমলকে। চৌধুরিদের সেরেস্তাতেই দলিল, পরচা, খতিয়ানে হাতেখড়ি। কারা রায়ত, কারা কোর্ফা, কোনটা শিকস্তি জমি, কোনটা পয়স্তি, কোনটা লায়েক পতিত, কোনটা গড়লায়েক পতিত বুঝতে শিখেছিল কমল। মোকররি পত্তনী পাট্টা কাওলা কবুলিয়ত এইসব শব্দগুলির অন্তর্নিহিত অর্থগুলি বুঝেছিল।

দেশ ভাগের পর এদিকে চলে এল কমলরা। চৌধুরিদের জমিদারি এখন শত্রু-সম্পত্তি। নকড়ি নায়েব মারা গিয়েছিলেন রানাঘাট ক্যাম্পে। আর চৌধুরিদের সেজ হিস্যার ছোটছেলের সঙ্গে কয়েক বছর আগে কমলের দেখা হয়েছিল শেয়ালদা স্টেশনে। বলেছিল, একটা সিনেমা হল খুলেছে চাকদায়। নাম দিয়েছে হাসি টকিজ। বলেছিল— এটা সেই ছোট নদীটার নামে। নদীটার নাম হাস্যমুখী। হাস্যমুখী নদীটি এঁকেবেঁকে ফেনিতে পড়েছে। হাস্যমুখী নাকি সিনেমা হলের নাম হয় না। তাই হাসি টকিজ। কমল তখন রমেশ জ্যোতির্ভূষণের কাছে কোনওরকম একটা কম বেতনের চাকরি করে। ছেলেটা বলেছিল, চাকদায় ওই সিনেমা হলে টর্চ লাইট দিয়ে সিট দেখানোর চাকরি দিতে পারে— যদিও একথা বলতে লজ্জা করছে।

কর্মহীন দশায় রমেশ জ্যোতির্ভূষণ দয়া পরবশ হয়েই— তাঁর কাছে রেখেছিলেন। হ্যান্ডবিল ছাপা, হ্যান্ডবিল বিলি করা, আর ওঁর চেম্বারে নাম ডাকা এই ছিল কাজ। রমেশ জ্যোতির্ভূষণ দেশ ভাগের আগেই কলকাতা এসেছিলেন। তাঁর দেশ ছিল নোয়াখালি। হেমকান্তর বিশেষ বান্ধব। তাঁর বাড়িতেও চার-পাঁচটি বাস্তুহারা পরিবার দীর্ঘদিন ছিল। কমলও সারাদিন কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় হ্যান্ডবিল মেরে জ্যোতিষসম্রাটের চেম্বারেই রাত কাটিয়েছে। আসলে কলকাতাটাকে চিনেছে হ্যান্ডবিল মেরেই। আসার সময়ে হ্যান্ডবিলটাই পড়েছে। এখনও মুখস্থ।

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ। মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের কোষ্ঠী প্রস্তুতকারক, দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক নিযুক্ত রাজ-জ্যোতিষীদের অগ্রগণ্য, জ্যোতিষপ্রভাকর, নিখিল ভারত জ্যোতিষ মহামণ্ডলের প্রেসিডেন্ট, বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলাফলের নির্ভুল ভবিষ্যত বক্তা। সম্রাট ৮ম এডোয়ার্ডের বিবাহ ও সিংহাসন ত্যাগের ভবিষ্যত বক্তা, জওহরলাল নেহরু ও আয়ুব খাঁয়ের কোষ্ঠী প্রস্তুতকারক, দমদম সেন্ট্রাল জেলের ধর্মোপদেশক জ্যোতিষ সম্রাট রমেশচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ সামুদ্রিক রত্ন এম আর এস (লন্ডন) মানব কল্যাণার্থে এখন প্রতিদিন চেম্বার করিতেছেন...।

এখানেই, এই চেম্বারেই গিলে পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি পরা নারায়ণ দত্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। নারায়ণবাবু ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কমলের হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিল আমার নামটা আগে ডেকে দিয়ো ভাই। বড্ড তাড়া আছে। কমল টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল এইভাবে হয় না। আমি ঠিকই ডেকে দিব। তখন, ১৯৬০ সালে এক টাকায় দেড় সের দুধ কিংবা দু' কিলো মোটা চাল পাওয়া যেত। কমল নারায়ণ দত্তকে একটু আগেই ডেকে দিয়েছিল। চেম্বারে ঢোকার সময় নারায়ণ দত্ত কমলকে একটা ঠাংকু ছুড়ে দিয়েছিল। দত্তবাবুর মুখে পান ছিল। চেম্বারে ভিতরে পিকদানি থাকে। জ্যোতির্ভূষণ মশাইও খুব পান খেতেন। চেম্বারের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে

থাকলে অনেক কথাবার্তা শোনা যায়। নারায়ণ দত্ত ওঁর সমস্যার কথা বলছিলেন। একেবারে শান্তি নেইকো ঠাকুরমশাই, জেরবার হয়ে গেলুম। যে ভাইপোদের কোলেপিঠে করে মানুষ করলুম ওরাই বাঁশ দিচ্ছে। একটা বাগানবাড়ি, বুঝলেন বহু সালের কেনা...

বাগানবাড়ি শুনেই বুকটা ধক করে ওঠে কমলের। রিফিউজিরা দখল করেনি তো? করলে বড্ড লজ্জা করবে কমলের।

না, রিফিউজিরা নয়। এই বাগানবাড়িটা বাঁশবেড়িয়াতে। ওদিকে রিফিউজিরা ধাওয়া করেনি। দখল করে রেখেছে নারায়ণবাবুর এক ভাইপো। এখন তাঁর প্রশ্ন কবে দিনক্ষণ ভাল, মামলা ফাইল করবে। আর কোষ্ঠী দেখে বলে দিতে হবে এখন সময়টা কেমন। মামলা করলে জিতবে কি না। জ্যোতির্ভূষণ গণনা করে বললেন— এখন সময় ভাল নয়। আপোষে মিটিয়ে নেওয়াই ভাল। পরের কথাবার্তা একটু নিচু গলায়। আরেকটা ব্যাপার ঠাকুরমশাই, একটা মেয়েছেলের কাছে যাই মাঝে মাঝে, ওকে রাখতে চাইছিলুম, ওর ভাইটাই আছে। যদি একটা বাড়িতে নিয়ে রাখি, ও কি সম্পত্তিটা ক্লেইম করবে? জ্যোতিভূষণ বললেন— ওই মহিলার কোষ্ঠী না দেইখ্যা কিছু বলা সম্ভব নয়।

নারায়ণ দত্ত বললেন— আমার ছক দেখে হবে না? জ্যোতির্ভূষণ বললেন ওই জাতিকার জন্মতারিখ নিয়া আর একদিন আসেন। নারায়ণ দত্ত বললেন— ওদের কি আর জন্মতারিখ জানা যাবে? জ্যোতির্ভূষণ বললেন— তা হলে ওকেই নিয়া আসেন হস্তরেখা দেখা দরকার। আমি ওই জাতিকার স্বভাব-চরিত্র সবই বলে দেব।

কমলের খুব বলতে ইচ্ছে করল— এইসব পরামর্শ দেয় উকিল। জ্যোতিষী নয়। কিন্তু বলা উচিত মনে হল না। বেরোবার সময় ওই নারায়ণ দত্ত কমলের দিকে একবার তাকাল। ওই দৃষ্টির মধ্যে বেশ একটা কৃতজ্ঞতা ছিল। লোকটা কমলের দিকে চেয়ে একটু হাসল। যেন বন্ধু। একটা টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে বলে এতটা? কমলও ওর দৃষ্টিতে একটা উত্তর দিল। কলকাতার বনেদি বড়লোকের সঙ্গে এক রিফিউজির অসম দৃষ্টি বিনিময়। কমল হঠাৎ বলেই ফেলল— একটা কবুলিয়ৎ করায়ে ন্যান, তা হলে আর কোনও ক্লেম থাকব না। নারায়ণ দত্ত একজন জ্যোতিষীর রুম-বেয়ারার কাছ থেকে এরকম কথা আশা করেনি। বড়জোর একটা বিপত্তারিনী-কবচ ধারণ করুন গোছের কিছু বলতে পারত, কিন্তু এ যে আইনি উপদেশ। নারায়ণ দত্ত ওকে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়। বলে, এসব কবুলিয়ৎ-টবুলিয়ৎ সম্পর্কে কী করে জানো? কমল বলে, আমি স্যারেস্তায় কাজ করতাম।...

তারপর নারায়ণ দত্তের সঙ্গে আরও দু-তিন বার দেখা হয়েছে। দৃষ্টি ও হাস্য বিনিময় হয়েছে। একদিন নারায়ণবাবুই কমলকে বললেন— আমার সেরেস্তায় একজন বিশ্বাসী লোক দরকার। কাজ করবে?

অবাক হবার আগেই কমল প্রথম কথাটা বলেছিল— ব্যাতন?

নারায়ণবাবু বলেছিলেন, এখানে যত পাও তার চে বেশিই দেব। দ্যাখো সম্পত্তির ব্যাপার। টাকাপয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া। এক টাকা ঘুষ তুমি নাওনি, ফিরিয়ে দিয়েছিলে কিন্তু বেশি টাকা ঘুষ ফিরিয়ে দিতে পারবে তো!

কমল বলেছিল, ঈশ্বর যদি দুর্মতি না দেয়...।

রমেশ জ্যোতির্ভূষণ বলেছিলেন, নিশ্চই, নিশ্চই। নিজে উপযাজক হইয়া যখন কাজ প্রদান করতাছে, নিশ্চই গ্রহণ করো। আমি তোমারে ছাইড়া দিলাম।

অসময়ে রমেশ জ্যোতির্ভূষণ কমলদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল। রমেশ বেতন ছাড়াও মাঝে মধ্যে চার আনা আট আনা দিতেন। বাড়ি থেকে ফল নিয়ে আসতেন রমেশ। কমল সেই ফল ছুরি দিয়া কেটে রিকাবে সাজিয়ে দিত। আপেলের টুকরো, দু-একটা আঙুর, কিংবা একটা মর্তমান কলা কমলও পেত। তখন শিবু খুবই ছোট। সন্তানকে না

দিয়ে এই মূল্যবান ফল খেতে খুবই খারাপ লাগত কমলের। দু-একদিন কাটা আপেল পকেটে করে নিয়ে গিয়ে বাড়ি গেছে। বাড়ি গিয়ে দেখেছে সেই কাটা আপেল কালো হয়ে গেছে।

রমেশ জ্যোতির্ভূষণ অনেক নিজের কথাও বলতেন। অনেক কিছুই জেনেছিল রমেশের কাছে। যেমন ১৫ অগস্টের স্বাধীনতা দিবসের দিন ঘোষণা।

মাউন্টব্যাটেন সাহেব ১৫ অগস্ট দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ভেবেছিলেন, কারণ ঠিক তার দু' বছর আগেই, ১৯৪৫ সালের ১৫ অগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল মিত্র শক্তির কাছে। তখন উনি নেতাদের চিঠি লিখে জানান ১৫ অগস্ট অশুভ দিন। চন্দ্র অশুদ্ধ। বিষযোগাদি দোষ। তবে ১৪ তারিখ শুভ। কিন্তু ১৪ তারিখ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। নেহরুর পরামর্শে তখনই ঠিক হয় তা হলে ১৪ অগস্ট মধ্যরাতে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। বিলিতি মতে সময়টাকে ১৫ অগস্টই বলতে হবে, কিন্তু দেশি মতে ওটা ১৪ তারিখ। সূর্য উঠলে তবে না চন্দ্র অশুদ্ধ হবে। মধ্যরাতে বিষযোগাদিদোষ নেই।

স্বাধীন ভারত তার যাত্রা শুরু করেছিল এভাবে কুসংস্কারের সঙ্গে সমঝোতা করে।

১৪ অগস্ট মাঝরাতে দিল্লির পরিষদ ভবনে স্বাধীনতার উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। ভাবগম্ভীর বক্তৃতা দিলেন। কবিতার শব্দ ভরা ছিল তাতে।

বহুকাল আগে নিয়তির কাছে আমার একটি প্রতিশ্রুতি রেখেছিলাম; সম্পূর্ণভাবে না পারলেও সেই প্রতিশ্রুতি আজ বহুলাংশে পূরণ করার সময় এসেছে। মধ্যরাতের ঘণ্টা যখন বাজছে, বিশ্ব সুপ্তিমগ্ন, ভারত তখন জেগে উঠছে জীবন আর স্বাধীনতার কেতন নিয়ে।

এরপর সুচেতা কৃপালনির গলায় বন্দেমাতরম। বরিশালের সেনগুপ্ত বাড়ির মেয়ে সুচেতা। বরিশালের গ্রামের মানুষরা, ওর জ্ঞাতি-আত্মীয়রা শুনতে পেল না। ওর গ্রামের মেয়ের গলার সুমধুর বন্দেমাতরম। এরা তখন পেয়ে গেছে অশনি সংকেত। ধানসিঁড়ি নদীটিকে বিদায় জানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

সেদিন, স্বাধীনতার দিন, দিন তো নয়, রাত, সেই মধ্যরাতে আকাশ কালো। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বৃষ্টিও। হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে আছেন পরিষদ ভবনের সামনে। সেখানে শিখও আছেন অনেক। লাহোরের শিখ মহল্লায় আগুন লেগেছে তখন এরা জানে না। রাত বারোটার ঘণ্টা বাজার পর বাড়িতে বাড়িতে বেজে উঠল শাঁখ, বিউগল, ড্রাম। যাদের এসব নেই, টিন বাজাল। নোয়াখালি জেলার দত্তপাড়া গ্রামের হেমকান্ত জানেন ওই রাতে ভারত স্বাধীন হচ্ছে, আগেরদিন আল্লা হো আকবর আর কায়েদে আজমের জয়ধ্বনিতে জেনেছিলেন ওর জন্মভূমি পাকিস্তান হয়ে গেল। ওই রাতে হেমকান্ত বিনিদ্র শুয়েছিলেন। প্যাঁচার শব্দ শুনেছিলেন। বম্বে-মাদ্রাজ-কলকাতার বন্দরে বন্দরে নোঙর ফেলা জাহাজগুলি বাঁশি বাজিয়ে স্বাধীনতার মুহূর্ত ঘোষণা করল।

দিল্লির পরিষদ ভবনে স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলেন। লেডি মাউন্টব্যাটেন খুব সেজেছিলেন সেদিন। হিরের লকেট, ঘন লিপস্টিক, রাষ্ট্রপতি মাউন্টব্যাটেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। মাউন্টব্যাটেন সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় দিল্লির দরবার হলে। মাউন্টব্যাটেন এবং নেহরু পানীয় বিনিময় করলেন, মাউন্টব্যাটেন শুভকামনা জানাচ্ছেন ভারতের প্রতি, আর নেহরু ইংরেজ-রাজ ষষ্ঠ জর্জের প্রতি। লুধিয়ানায় বস্তি জ্বলছে। লালকেল্লায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করলেন নেহরু।

সেই সকালে দিল্লির রাজপথে জনসমুদ্র। দূর দূর থেকেও মানুষ আসছে বাসে, লরিতে, ট্রেনে, গোরুর গাড়িতেও। ভিড়ের চাপে মাউন্টব্যাটেনের গাড়ি এগোতে পারছে না। ব্যাটন হাতে পুলিশ যা আছে, সংখ্যায় কম। স্বাধীনতার দিনেই লাঠিচার্জ ভাল দেখায় না। নেহরু নিজেই চিৎকার করে জনতাকে বলতে লাগলেন— সরো, অতিথিকে রাস্তা করে দাও।

এরপর স্বাধীন ভারতের সামরিক বাহিনী ফাঁকা বন্দুক ছুড়ল। জনতা ভয় পেল। আসলে ওই

বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ মাউন্টব্যাটেনকে সম্মান দেখানোর জন। একুশবার ফাঁকা আওয়াজ করা হয়েছিল। সুকুমার রায় অবশ্য এর অনেক আগেই একুশে আইন লিখেছিলেন।

ব্যান্ড বেজে উঠল। ব্যান্ডে গড সেইভ দি কিং ব্রিটিশ জাতীয় সংগীত। বাইরে সেই অগস্টে দুপুরে চড়া রোদ উঠল। ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের তাপ নিয়ে মানুষেরা নতুন রাজাকে দেখতে চাইছে। কিন্তু তখন ভিতরে, ঠান্ডায়, পুরনো রাজা আর নতুন রাজা পাত্র-মিত্র-অমাত্য নিয়ে মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত।

বিকেলবেলা পতাকা উত্তোলন প্রিনসেস পার্কে। স্বাধীন দেশের মানুষেরা ভিড় করেছে। মাউন্টব্যাটেন সাহেব পতাকা তুলবেন। যেতেই পারছেন না ভিড়ের চাপে। জওহরলাল নেহরু চিৎকার করছেন, উত্তেজিত পাগলের মতো দু'দিকে হাত চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যে অনেক কষ্টে লর্ড-লেডি মাউন্টব্যাটেন মঞ্চে উঠেছেন। তাদের মেয়ে পামেলা পারেনি। পামেলা মেম-যুবতি। এত ভিড়ে কী করে যাবেন? কালো কালো লোকের ঘাম লেগে যাবে না বুঝি? নেহরু বললেন— মানুষেরা সব বসে যাও। মানুষেরা নিচু হলে ওদের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে পামেলা-যুবতি মঞ্চে এলেন। পতাকা উড়ল। ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা নয়, গভর্নর জেনারেলের নিজস্ব পতাকা। ঘন নীলের মাঝখানে সোনালি বৃত্ত। ইউনিয়ন জ্যাক নামানো হয়নি। মাউন্টব্যাটেনের অনুরোধ ছিল ব্রিটিশ-রাজের ইউনিয়ন জ্যাক যেন না নামানো হয়, ওটা এক্ষুনি নামিয়ে ফেললে ইংরেজদের অসম্মান হবে।

মানুষ জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। মাউন্টব্যাটেন কী জয়। রানিজি কী জয়। পণ্ডিত নেহরু কী জয়। কেউ কেউ বলে ফেলছিল পণ্ডিত মাউন্টব্যাটেন কী জয়। আর বোম্বাইতে খাজা আহমেদ আব্বাস একটি টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন তখন পানিপথ থেকে, লিখছেন তার বোন। আর পারছি না। মরে যাব। এক্ষুনি বম্বে নিয়ে চলো। আর হেমকান্ত শুনলেন তাঁর বাড়ির উঠানে একটি চিৎকৃত কণ্ঠস্বর হিন্দুস্থান হই গেছে গই। আমাগোর পাকিস্তানে হিন্দুরা য্যান না থাকে কই দিলাম। মোছলমানের মাতাত লবণ থুই হিদুগো বরে খাওনের দিন শ্যাষ। কই দিলাম (মুসলমানের মাথায় নুন রেখে হিন্দুদের কুল খাবার দিন শেষ বলে দিলাম) শুইনছেন কি কত্তা...

হেমকান্ত জানালা খুলে মুখ দেখাতে ভয় পাচ্ছিলেন।

এইসব পুরনো কথা লিখে যাবার ইচ্ছে হয়। এটাকে তিনি মহাকাব্য করতে চান। কত ঘটনা। কত স্মৃতি। ক'টা দিনই-বা আর বাঁচবেন। এরই মধ্যে তাঁর কাজটা শেষ করতে হবে। এই যে এত বড় একটা উথাল-পাথাল, দেশত্যাগ, কলোনি জীবন, নতুন বসতি, বোমাযুদ্ধ, আবার হালের এই বোমাযুদ্ধ, সবই তো তার জীবনে ঘটে যাওয়া স্মৃতি। তিনি কি পারবেন সব লিখে যেতে? ক'দিন আগে লাল ঝান্ডার দল একটা মিছিল করে গেল। মাঝে মাঝে মিটিং হচ্ছে। নাগরিক কমিটি তৈরি হয়েছে। শশাঙ্ক ঘোষ হেমকান্তকে বলেছে, আপনিই নাগরিক কমিটির সভাপতি হন। হেমকান্ত নিষেধ করেছেন। কমুনিস্টদের সংস্রব পছন্দ করেন না তিনি। মুসলিম লিগের পতাকার সঙ্গে মাখামাখি করা লাল পতাকা তিনি প্রথম দেখেছিলেন ফিরোজপুরে। ১৯৪৬ সালে পটুয়াখালি থেকে নির্বাচনে দাঁড়ালেন কংগ্রেসের সতীন সেন। তপশিলি জাতি ফেডারেশনের পক্ষে যোগেন মণ্ডলও দাঁড়ালেন। হীরালাল সেনগুপ্ত তখন কমুনিস্ট। কমুনিস্টরা নেতাজিকে গালমন্দ দিয়ে যতটা না ক্ষতি করেছিল তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল মুসলিম লিগ আর তার দোসর যোগেন মণ্ডলকে সমর্থন করে। পাকিস্তান হবার পর যোগেন মণ্ডলকে মন্ত্রী করেছিল লিগ। একদিন যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে হেমকান্তর দেখা— গৌরীপুরের হাটে। হেমকান্ত সস্তার বাজার করতে রবিবার রবিবার গৌরীপুর হাটে যেতেন। যোগেন মণ্ডলের তখন ছেঁড়া পাঞ্জাবি। মুখে দাড়ি। উনি পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছেন। উনি চেষ্টা করছেন পলিটিকাল সাফারারের ভাতাটা জোগাড় করা যায় কি না। আজ কলোনির উদ্বিগ্ন নেতা শশাঙ্ক ঘোষের মধ্যে হীরালাল সেনগুপ্তের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন হেমকান্ত।

হেমকান্তকে যখন শশাঙ্ক ঘোষ নাগরিক সমিতির সভাপতি হবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, হেমকান্ত বলেছিলেন— সাধু-সাবধান। ফাঁন্দে পড়িয়া বসা কান্দেরে গানটা জানো তো? মনে রাইখ্যো।

শশাঙ্ক ঘোষ বলেছিলেন— পুরানো কথা আর মনে রাইখো না কাকা। ভুইল্যা যান। অখনকার বাস্তব পরিস্থিতিটা দ্যাখেন। বিজয় মজুমদার তো কমুনিস্টই। অনিল সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী সবই তো ওগো লগেই আছে। জ্যোতিবাবুও অনেক করছেন, রাধিকাবাবুও।

হেমকান্ত বলেছিলেন— যা কইরো, ভাইব্যা কইরো। উন্নয়ন কমিটি ভাইসা দিয়ো না। নাগরিক কমিটি য্যান আমাদের নিজের সংগঠনটা গ্রাস না করে দেইখ্যো।

হেমকান্ত এখন উদ্বাসন কাব্যের এই জায়গাটা একবার পড়ে নেন। দেশ ভাগ ফর্মুলা বিষাক্ত রুটিরই সমান বুঝিয়া গান্ধীজি কহে— হে জিন্না ভ্রাতঃ তুমি করো মন্ত্রিসভা। তুমি হও মন্ত্রিপ্রধান— কংগ্রেস হল না রাজি। গান্ধীজির অরণ্যেরোদন বৃথা গেল:—

এইটুকু লিখে আর এগোতে পারেননি হেমকান্ত। ওর কেবলই ধাঁধা লাগে গান্ধীজি কি পারতেন না দেশ ভাগটা আটকাতে? গান্ধীজি কতবার অনশন করেছেন জীবনে। গান্ধীজি যদি আর একবার অনশন করে কংগ্রেস নেতাদের দেশভাগ মেনে নেবার প্রস্তাবটা প্রত্যাহারে বাধ্য করতেন, কিংবা? থাকুক কংগ্রেস, তোমার দরকার নেই বলে অখণ্ড ভারতের জন্য আর একটা আন্দোলন শুরু করতেন? নতুন আন্দোলন করার ক্ষমতা একমাত্র গান্ধীজিরই ছিল।

কিন্তু তখন আন্দোলনের ডাক দিলে কে আসত! মুসলমানরা সব তখন জিন্নার পিছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অনুগামী অল্প কয়েকজন। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসি নেতারা অপেক্ষা করছেন, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় নেতারা অপেক্ষা করছেন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় কবে ঢুকবেন। কারুর সবুর সয় না।

১৯৪৬-এর শীতকালে হেমকান্তর ভিটের খেজুরগাছ থেকে রসের হাঁড়ি পেড়ে আমিনুদ্দি বলেছিল, কী কত্তা, আইয়ে বচ্ছর এই গাছগুলি আঞি পাইয়ুমনি? আঞার কী নসিবে আছে নি? কে পাইব?

অবাক হেমকান্ত জিজ্ঞাস করেছিল— এইরকম কও ক্যা?

আমিনুদ্দি বলেছিল, শুনতাছি মোছলমানের রাজ আইতাছে, নোয়া বাদশা হইব কায়েদে আজম। নবাব হইব নাজিমুদ্দিন। ইস্কুলে ক্যাবল মোছলমান মাস্টর, কাছারিতে মোছলমান হাকিম, মোছলমান দারোগা, মোছলমান জমিদার...। খেজুরগাছের হকও কি... অমিনুদ্দি খুব সরল। ভাল মানুষ। তাই ওইভাবে বলেছিল। কিন্তু অবস্থা ঠিক ওইরকম। চাচা-মিঞা ডাকা ধনী মুসলমান লোক তুই-তোকারি করা গরিব মুসলমান প্রত্যেকের মনেই নতুন উন্মাদনা। নতুন স্বপ্ন। একটা মুসলমানের দেশ হচ্ছে। এই অবস্থায় কি কিছু করা যেত? পারতেন না গান্ধীজি। হয়তো পারতেন জিন্না। জিন্নাই বোঝাতে পারতেন সাড়ে ছয় কোটি মুসলমানকে। জিন্নাকে প্রধানমন্ত্রিত্ব দেওয়া হলে জিন্না রাজি হতেন। কিন্তু আসন্ন প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়তে রাজি হননি জওহরলাল।

সেইসব ভুলতে চেষ্টা করা দিনগুলিকে আঁকশি দিয়ে টেনে আনতে কষ্ট হচ্ছে হেমকান্তর, তবুও এটা করছেন এখন। পুরনো দিনগুলির সঙ্গে কথা বলছেন যেন।

কৃষক প্রজাপার্টির ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন চেয়েছিলেন। কংগ্রেস রাজি হল না। তাই মুসলিম লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন করলেন হকসাহেব। কিছুদিন পর হেমকান্তর স্কুলে একটা সরকারি সার্কুলার এল। সেই সার্কুলার অনুযায়ী ক্লাসে নাম ডাকার পর লিখতে হত এম

M—.....

N. M—.....

.....

Total.....

মানে উপস্থিত ছাত্রসংখ্যার মধ্যে মুসলিম এত, নন-মুসলিম এত। মোট এত। মানুষের দুই ভাগ।

মুসলমান এবং অমুসলমান হেমকান্তর মনে পড়ে ছেচল্লিশের শীতকালে বোর্ডে লিখেছেন এম ১২ এন এম ৩৬, সাতচল্লিশের শীতকালে এম ১২, এন এম ৬, সব ফাঁকা, সব ফাঁকা। হেমকান্ত দেশ ভাগের পরেও দেশ ছাড়েননি। মনে পড়ে বাংলা বইয়ের রামধনু পাকিস্তানে কীভাবে রংধনু হয়ে গেল। হালিমকে মনে পড়ে, গ্রামের হালিম, স্বভাব কবি। গানের গলা ছিল ভাল। সরমা নাটকে রামের অভিনয় করে মাতিয়ে দিত। ছেচল্লিশের দুর্গাপূজায় চৌধুরিদের মণ্ডপে হরধনু ভঙ্গ অভিনয়। হালিম রাজি হল না। বলল, নিষেধ আছে। অথচ এই হালিমই গান বেঁধেছিল—

পচা দড়ি যাবে ছিঁড়ে টানাটানি কইর না
ভাই টানাটানি কইর না।
কলিকাতার শুন ঘটনা।
কলিকাতার হিন্দুগণ আর কত মুসলমান
তারা করে খুনাখুনি কার কথা কেহ শুনেনা
কলকাতার শুন ঘটনা।

গান্ধীজি যখন নোয়াখালি এসেছিলেন, হালিমের লোকেরা গান্ধীজির এই গানটা শ্রীরামপুর রাজবাড়িতে গাওয়া হয়েছিল। হেমকান্তও ছিলেন সেই কোরাসে।

মনে পড়ে গানটার আরও কথা—

প্রভু নিরাকার কী কারবার ভবের মাঝে হইল
তোমার সৃষ্টি কত লোক প্রাণে মারা গেল
হায়রে খোদাতালা
হায়রে খোদাতালা কী করিলা আমাদের কপালে
কত অপরূপ কাণ্ড ঘটে কলিকালে
যত হিন্দুগণ
যত হিন্দুগণ মুসলমান এক জাগাতে বাস
কী কারণে বাংলা দেশে হাজার হাজার লাশ
তাহা কেবা জানে
তাহা কেবা জানে নিরঞ্জনে যদি রক্ষা করে
রাজত্ব করিতে আছে ইংরাজ বাহাদুরে
তাদের বিচার ভাল
তাদের বিচার ভাল চিরকাল সবে দেখতে পাই—
স্বাধীন স্বাধীন করি কেন প্রাণে মারা যাই

গান্ধীজি বাংলা বলতে না পারলেও বুঝতেন। শেষ দু' লাইন শোনবার সময় কপালটা একটু কুঁচকেছিলেন তিনি। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে কী যেন বলেছিলেন। ওরা জানতে চেয়েছিলেন এই গানের লেখক কে! হালিম ছিল না সেখানে। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলেছিলেন— এই গানটার শেষটা পালটে দিয়ো।

গান্ধীজিকে খুব কাছে পেয়েছিলেন হেমকান্ত মিনিট দশেকের জন্য, কিন্তু কোনও কথা হয়নি। কাছ থেকে দেখেছিলেন। কনকও ছিল। কনক পাখার বাতাস করেছিল। গান্ধীজির মুখ থেকে হেমকান্ত শুনেছিলেন— মাই হার্ট ব্লিড্‌স। আই কান্ট ডু এনিথিং বাট ক্রাইং।

হাতের কলমটা অনেকক্ষণ হাতেই আছে। হ্যান্ডেল পেন। ক্রাউন নিব। দোয়াতে পি এম বাগচির কালি। পুরনো অভ্যেস। ফাউন্টেন পেন একটা আছে হেমকান্তর। রাইটার। দেড় টাকা দাম। সামান্য লিক করে। নাতি-নাতনিরা কেউ হ্যান্ডেল কলম ব্যবহার করে না। ওরা ফাউন্টেন

পেনই ব্যবহার করে। কিছুদিন আগে শিবু দেখাল ডট পেন। সরু কাঠির মধ্যে কালি ভরা। ডট পেনে লিক করার সম্ভাবনা নেই। হেমকান্তর হ্যান্ডেলই ভাল। দোয়াতে কলম ডোবান অনেকক্ষণ পর। দিনের আলো মলিন হয়ে যাচ্ছে। তিনি গান্ধীজির অরণ্যেরোদন বৃথা গেলর পর লিখলেন—

এ সময়ে উদ্ধারিতে পারিত সুভাষ।
পরবাস হতে যদি আসিয়া তখনি
বজ্র নির্ঘোষে যদি বলিতেন তিনি
বন্ধ কর বেয়াদপি বাইচলামি যত
শত শত কণ্ঠে তাহা হইয়া ধ্বনিত—
ছড়াত ভারত মাঝে। আমাদের মনে
এই আর্তি আসে শুধু শয়ন স্বপনে।

এই আর্তি এখানে আসে। স্বাধীনতা, কিংবা দেশ ভাগের ২৫ বছর পরেও। আকাশে উড়োজাহাজ উড়ে গেলে হেমকান্তর মনে হয় কোনও একটা উড়োজাহাজ থেকে প্যারাসুটে নেমে আসবেন সুভাষ বোস।

অন্ধকার হয়ে আসছে। কনক এসে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। একরাশ আলো হেমকান্তর খাতার উপর এসে পড়ল। খাতার সাদা পৃষ্ঠাটার বাকি অংশের শূন্যতা জুড়ে আলোময় হয়ে রইলেন সুভাষ বোস।

শারদ রাজপথ, ২০০০

ভগীরথ

তখন মাঠ গিলছিল রোদ্দুরের রং। পিচকুরির ঢালের বাতাস ছুটছে অজয় নদীর চরের দিকে। কড়াই দানা পুরুষ্ট হচ্ছে ডাঙা মাঠে। সদ্য প্রসবকরা মাঠে ধানকাটার অবশেষ পড়ে আছে। কোথাও মাঠের মাঝে পড়ে আছে স্তূপাকার ধান, গোরুর গাড়িতে ধান যাচ্ছে। উঠানে ধান্য গন্ধ। ধান ভানার টিপিক টিপিক শব্দ কোথাও। চিতের বেড়ায় এল লাল লাল ফুল, বাখরগুলি দিয়ে নতুন চালের পচাই তৈরি হচ্ছে বাগদি পাড়ায় বাউড়ি পাড়ায়, কানাই মুদি পলিথিনের প্যাকেটে আনিয়ে রেখেছে বোলপুরের ঝাল চানাচুর। চায়ের দোকানে সকাল সন্ধ্যা জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

ধান পাকলে হইহই ঢ্যাঁড়া। মানুষ জনের মুখে শালুক ফুলের টাটকা হাসি। ঢোল বাজে, মাদল বাজে, 'লবান' হয়। নতুন ধানের উৎসব।

তখন ফাঁকা মাঠের গোপন আনাচ-কানাচ, ইঁদুরের গর্ত, আলের ফাটল থেকে পায়রা ঘুঘু আর চড়াইয়ের সাথে খুঁটে খুঁটে ধান খুঁজছে কোড়া পাড়ার ছিলা-পিলারা। মাঠবাবু এইসব দেখছিল। মাঝে মধ্যে তত্ত্বতালাশ নিচ্ছিল— হেই গদ্‌কা, পোয়াটাক পেলির‍্যা? হেই যমুনা, তুয়ার কত ক'টা হল? মাঠবাবু দাঁড়িয়ে আছে বঙ্গলক্ষ্মী রাইস মিলের পাঁচিলটার পাশে। পাঁচিলের ওপাশেই মাঠ। মাঠের মধ্যে কুচো ধান কুড়োবার উৎসব। কাঠ চাঁপা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাঠবাবু এইসব দেখছিল। পাঁচিলের এই ধারে বিরাট শানের চাতাল। ধু-ধু করছে। বয়লারে বসে আছে কাক। চিমনিটা একাকী দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে মুখ করে। গুদামের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে শালিক আর ঘুঘু। একটাও ধান পাচ্ছে না ওরা।

অথচ এই সময়টা ধানের গন্ধ কুঁড়োর গন্ধে ম ম করত এই রাইস মিল। বয়লারের শব্দ, চিমনির ধোঁয়া, মাঝি, মেঝেন, হাঁকডাক।

এখন শুনশান। মাঠবাবুর সময় কাটে না। মাঠবাবু হলেন ধান শুকোদের সুপারভাইজার। 'বিড়ায়ে দে' বললেই গা চকচক সাঁওতালি মেঝেনরা বেলচা দিয়ে ধানগুলি শুকোবার জন্য বিছিয়ে দিত। 'ছড়ায়ে দে' বললে ছড়িয়ে দিত, 'গড়ায়ে দে' বললে উলটে দিত। এখন চাতাল জুড়ে ঘুরে বেড়ায় ভুখা বাতাস। শুখা পাতা ওড়ে।

এমন সময় রোগা, চিমসেমতো একজন গদিঘরের সামনে এসে হাত জোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'নমস্কার।'

মাঠবাবু দেখলেন। মাঠবাবুকে কম লোকই নমস্কার করে। ওই চিমসে লোকটার পিছনে একজন বেঁটেমতো লোক, খাংলা খাংলা চুল, গায়ে সাত তাপ্পির জামা, দাঁত ভাঙা। সে-ও বলল, নমস্কার। চিমসে লোকটা বলল, আমি ম্যাজিক করি স্যার। মাঠবাবু 'স্যার' শুনে বড় লজ্জা পেল। পদ্ম মেঝেনকে মাঠবাবু প্রথম যেদিন বলেছিল, পদ্ম, তুই বড় সুন্দর। পদ্ম বুক ঢেকেছিল আঁচলে। মাঠবাবু এখন দাঁতে ঠোঁট কামড়াল।

লোকটা বলল, আমি ম্যাজিক করি স্যার। আবার স্যার! লোকটা কি দেখতে পাচ্ছে না মাঠবাবুর খালি গা, ধুতি হাঁটুর কাছাকাছি উঠে আছে, পায়ের ফাঁকে ধুলো, গোড়ালি ফাটা?

আমার নাম ম্যাজিশিয়ান ডি রতন। রতন দত্ত, কেম ফ্রম রেসপেকটেবল কায়েত ফ্যামিলি, জানতে পারলাম আপনাদের গোডাউন ঘর ফাঁকা পড়ে আছে, যদি পারমিশন করেন তো ক'দিন ম্যাজিক শো করি। আপনাদের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

মাঠবাবু ভাবল তবে তো ভালই। ক'দিন লোকজনে ভরে থাকবে এই ধানকলের চাতাল। মাঠবাবু চলল বাবুবাড়ি খবর দিতে।

মিলের বাবুবাড়ি দশ মিনিট হেঁটে যেতে। দোতলা বাড়ি, বাড়ির মাথায় অ্যান্টেনা। রং করা টিভি চলে। বাবুবাড়ির সামনে মোটা দরজা। দরজার উপর সিমেন্টের গণেশ। দরজার পাশে লেখা বাবু কমলাপতি রায়। কমলাপতিবাবু এখন কফে কাশে জব্দ। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। যা করে ছেলেরা। বড়ছেলে ডাক্তার। বর্ধমান টাউনে নার্সিং হোম। মেজোটার পানাগড়ে কোল্ডইস্টোর। ছোটটাকে বলেছে কমলাপতিবাবু, ওই বন্ধ রাইস মিলটা তোকেই দিলুম। চালাতে হয় চালা, অন্য কিছু করলে অন্য কিছু কর। আর যদি মনে করিস ওটা বিককির করে দিয়ে বাস কিনবি, তাও করতে পারিস, কিছুই আপিত্যি নাই।

মাঠবাবুকে কমলাপতি বললেন, আমি কী জানি, সন্টুকে বল। সন্টু হল ছোটছেলে।

সন্টুবাবু গুদোম ঘরটা কিছুদিন আগে সারিয়েছিল। ফুটো হওয়া চাল পালটে ছিল। দেয়ালে সাদা রঙের উপর লাল বর্ডার মারিয়ে ছিল। টিনের পাতে লেখানো হয়েছিল প্রস্রাব ঘর (পুং) আর (স্ত্রী)। ইচ্ছে ছিল গুদোম ঘরটাকে আপাতত ভিডিও হল বানাবে।

সন্টুবাবুর জুলফি কামানো। গায়ে গেঞ্জি। নীল প্যান্ট। হাঁটুর কাছটায় রং ওঠা ওঠা। সন্টুবাবু বঙ্গলক্ষ্মী মিলে এল।

ম্যাজিশিয়ান উঠে দাঁড়াল।

নমস্কার স্যার।

সন্টুবাবু বলল, কী ব্যাপার।

স্যার ক'দিন ম্যাজিক খেলা দেখাব। আমি ম্যাজিশিয়ান ডি রতন। কেম ফ্রম রেসপেকটেবল কায়েত ফ্যামিলি। শোয়িং ম্যাজিক সিনস টুয়েন্টি ইয়ারস। আই উইল পে রেন্ট, ডেলি টেন রুপিস। সন্টুবাবু বলল, দ্যাখো, আমি ভাবছিলাম সামনের হপ্তা থেকেই ভিডিও চালু করব। তোমায় এক হপ্তার জন্যে দিতে পারি। লোকজন জানুক এটা আর ধানকলের গুদাম নয়। ডেলি কুড়ি টাকা দিয়ো।

চালু হল ম্যাজিক। সাত সকালে হাতে ডুগডুগি, পায়ে ঝুমুর, মুখে চোং লাগিয়ে খ্যাংলা চুলের ফোকলা দাঁতের লোকটা পাবলিসিটিতে বের হয়। গিলি গিলি গিলি হোকাস ফোকাস। আসুন, দেখুন, প্রফেছার ডি রতনের ম্যাজিক খেলা। শরবতকে জল করা, দেশলাইকে সিগারেট করা, হাওয়া থেকে সন্দেশ করা, ফুঁ থেকে ভাত রান্না করা, ট্যাকা নাচবে...।

লোকটার চুনকালি মাখা গাল, গায়ে শত তালি মারা জামা। ঘরের বউ-ঝিরা কাণ্ড দেখে এ ঢলে পড়ে ওর গায়ে।

আসুন দিদিরা, আসুন বউদিদিরা, ফুঁ মেরে ভাত রান্না হবে, হাওয়া থেকে সন্দেশ হবে, ট্যাকা নাচবে হাতের তালুতে। গিলি গিলি গিলি হোকাস ফোকাস।

মিলের মাঠে পায়ের চিহ্ন। মিলের গেটে পাঁপর ভাজা, জিলিপি। খেলা আরম্ভ হবার আগে ফোকলা দাঁতের ছেলেটাই টিকিট চেকার। মাঠবাবু তত্ত্বতালাশ নিচ্ছে। ছেলেপেলেদের বলে, হাঁ করে দাইড়ে দাইড়ে দেখছিস কী, অ্যা!— ঢুকে যা, ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে যা।

প্রথম রজনীর শো। স্টেশন মাস্টার, সন্টুবাবু, প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার, এদের জন্য ভাঁজ করা ওঠা কাঠের চেয়ার। ভি আই পি সিট।

যেখানে ম্যাজিক হবে, সেখানে একটা শাড়ি ঝুলছে। খ্যাংলা চুলের ফোকলা লোকটা একটা ডুগডুগি বাজিয়ে শাড়িটা খুলে দিল। মানে পর্দা উঠাল, ওই শাড়িটা দু'ভাঁজ করে টেবিলে পরিয়ে দিল, মানে টেবিলের ঢাকনি হল।

লোকটা হাত জোড় করে বলল লেডিস অ্যান্ড জেন্টিলম্যান, আই অ্যাম ভগীরথ। যে ভগীরথ গঙ্গা লিয়ে আসা করিছিল মা ধরিত্রীর বুকে, আমি তেমনি ম্যাজিশিয়ান ডি রতনের দি ওয়ান্ডার

ম্যাজিককে লিশ্চয় লিয়ে আসা করি। হিন্দু ভাইদের নমস্কার, মুসলমান ভাইদের সেলাম আলিকুম। নাও স্টার্ট ম্যাজিক। ঝিং ঝিংচাক। মুখ দিয়েই আওয়াজ করল ভগীরথ।

টাইট পাজামা আর লাল ব্লাউজ পরা রোগা মেয়েটা হল ম্যাজিশিয়ানের বউ। সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট খ্যাংলা চুলের লোকটা এবার হল জোকার। ম্যাজিশিয়ানের গোলাপি আলখাল্লার রং উঠে গেছে। মিস্টার ভগীরথ, কাম হিয়ার বললেই— ভগীরথ ধপ ধপ পায়ে ম্যাজিশিয়ানের দিকে এগিয়ে যায়। ভগীরথের পিছন থেকে বার করা হয় ডিম, পেট থেকে জল। সদ্য অঘ্রাণের মানুষেরা হাওয়া দোলানো ধান গাছের মতোই আহ্লাদে লুটিয়ে হাসে।

ভগীরথের কত কাজ। সকালবেলা চোং নিয়ে পাবলিসিটিতে যাওয়া, দুপুরবেলা ম্যাজিকের জিনিস রেডি করা, টিকিট বেচা। সন্ধে হলে গালে লাগায় চুন, লাগায় কালি। ম্যাজিশিয়ানের বউটাও সন্ধে হলে লিপস্টিক ঘষে ঠোঁটে, দুপুরবেলা রান্না করে, বাচ্চা হাগায়, আর শানচাতালে মেলে দেয়া শাড়ির দিকে চেয়ে থাকে, কখন শুকোবে। আর ম্যাজিশিয়ান ডি রতন বসে বসে চুকচুক করে মাল খায়।

মাঠবাবু দুপুর থেকে উশখুশ করে। লোক সমাগম বড় ভাল লাগে ওর। শানচাতালে বহুদিন পর হাজার পায়ের চিহ্ন। ভগীরথের সঙ্গে গপ্পো করে মাঠবাবু।

বুঝলি ভগীরথ, এই ক্যাটালিচাঁপার গাছটা দেখছিস, সাজগোজ করে দাঁড়িয়ে আছে, ফুলে ভরতি, তখন কিন্তু গাছে একটা ফুলও থাকতনি, যখন মিলটা চালু ছিল। সব মেঝেন টেঝেন মেয়াছেলেগুলির এক একটা জ্যান্ত ফুল গাছ হয়ে থাকত। এই যে পুকুরটা দেখছিস ভগীরথ, ঝিম মেরে পড়ে রইচে, এমন ছিল না রে ভগীরথ, ধানের খুদ কুঁড়ো মেখ্যে মেয়াছেলেগুলির পুকুরে লেব্যে কী যে লুটোপুটি ঝুটোপুটি লাগাইত, হাজারে গুজর নাই,— কী বলব, যখন মিলটা চালু ছিল...। ওই যে বয়লারটা দেখতে পাচ্ছিস, ওটা থেকে ভুস ভুস করে ধোঁয়া উগলত। ধানের মধ্যে গরম ইস্টিম ঢোকাত ইস্টিমবাবু। তখন কী সুগন্ধা রে বাপ। তারপর ধান শুকোত ওই চাতালে। তারপর বুঝলি ভগীরথ, সন্ধের ভোঁ বাজত, মেয়েছেলে গুলিন লুটোপুটি করত পুকুরের জলে, জলের মধ্যে বুটবুটি ফেনা। আর ওরা চলে গেলে, জলের মধ্যে ভেসে থাকত খোঁপা থেকে খসে পড়া ক্যাটালিচাঁপার ফুল। বুঝলি যখন মিলটা জ্যান্ত ছিল...

ভগীরথও বলে ওর ম্যাজিকের দলের কথা। জানেন মাঠবাবু, ভেলভেটের ইসক্রিন ছিল। দড়ি দিয়ে টানলে ফিস করে খুলে যেত। আলোর ফোচাং বাতি ছিল। ভেলভেটের উপর যখন আলো পড়ত তখন কী দৃশ্য যে কী বলব। ভেলভেটের ইসক্রিন কী নরম। হাতে ঘসলে হাতের তেলোয় সুড়সুড়ি লাগত। তিন সেট জামা পাজামা ছিল আমার। জরি লাগানো বেল্ট ছিল। চারটে পাগড়ি ছিল ম্যাজিশিয়ানের, তিনসেট পোশাক ছিল। চারসেট টাইট জামা প্যান্ট ছিল বউদির। বুলু প্যান্ট আর লাল বেলাউজে যা লাগত না।... এখন কিছু নাই।

কেন! নাই কেন! মাঠবাবু জিজ্ঞাসা করল। অনেকটা বাতাস ফুসফুসে টেনে নিল ভগীরথ। তারপর বাতাসে মিশিয়ে দিল ফের। বলল, মাঠবাবু গো, সব কিছু ফুটোয় আর মদে ঢেলে দিল। একটু চুপ থেকে ভগীরথ বলল, তোমার কী হল মাঠবাবু? তোমার ধানকল ফাঁকা হয়ে গেল কেন? মাঠবাবু বলল, ছোটছেলে ইখানে সিনেমা হল বানাবে। সামনের বছরই সিনেমা হল হবে। লাভ বেশি, হাঙ্গামা কম।

পাড়ার ছেলেদের মুখে এক রা। গিলিগিলি গে হোকাস পোকাস। এ ওর পাছায় চাপড় মেরে বলে ডিম পাড়। এক-একজন দু'বার-তিনবার করে দেখছে। দু'দিন ধরে গুদাম হাউস ফুল। নদেরশোল, ভালুককাঠি, পিচকুড়ির চাল, নোয়াদার ঢাল এমনকী আউশগ্রাম থেকেও ম্যাজিক দেখতে আসছে।

সন্টুবাবু সকালবেলায় লোকজন নিয়ে ফিতে দিয়ে চাতালটা মাপজোখ করাচ্ছিল। ডি রতন এল।

— স্যার। আর সেভেন ডে ম্যাজিক শো চালাতে চাই।

— খুব ভিড় হচ্ছে, না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। নতুন ধান ওঠা পয়সা। উড়ছে।

— সব পয়সা তুমিই মেরে দেবে নাকি! সাত দিনের আর একটা দিনও বেশি নয়। হলেই ছেড়ে দেবে। সন্টুবাবু সেইদিনই কাঠালিচাঁপার গাছে ঝুলিয়ে দিল বঙ্গলক্ষ্মী ভিডিও হল। গুদোমটা আর বঙ্গলক্ষ্মী রাইস মিলের গুদাম নয়। ভিডিও হল।

দুপুরে ম্যাজিকওলার ঘরে খুব হুটোপুটি। ঝগড়া, চিৎকার, রোজই একটু হয়, আজ অন্যদিনের চেয়ে বেশি। ম্যাজিশিয়ানের বউ কাঁদছে। বউ প্যাঁদাচ্ছে ম্যাজিশিয়ান। গদিঘর থেকে মাঠবাবু শুনতে পায় ম্যাজিশিয়ানের গলা। অ্যাঁ, একটু মাল খাব বলে আলু ভাজা চেয়েছিলাম, তাতেই এত বড় কথা। বাউড়ির বাচ্চা, বল তোকে পুষছি কেন? এক মাসের মধ্যে যদি অন্য একটা আলুভাজার মাগী না আনতে পারি, তবে আমি কায়েতের বাচ্চাই নই। শালা স্টেজের পোশাক পরে বিবি সেজে বসে থাকা?

এবার ভগীরথের গলা শোনা যায়। আর একবার বউদির গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখ শুয়োরের বাচ্চা, বহুত খারাপ হয়ে যাবে।

— দ্যাখ ভগীরথ, দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং আগেও বলেছি, আমার ওয়াইফের জন্য দরদ দেখাতে গেলে তোকে লাথি মেরে ফেলে দেব।

— বেশ করব। আরও বলব। মাল খেয়ে মজা মারাচ্ছ, আলু ভাজা চাই, এদিকে বউদির সাজ নেই, গোটা শাড়িটাই ইস্টেজের পর্দা হচ্ছে, ছেঁড়াটা ভিজে। সে জন্য ইস্টেজের পোশাক পরেছে। সেটা বোঝ না?

— বা। ফাস্ট ক্লাস। আমার বউয়ের ক'টা শাড়ি, ক'টা ব্লাউজ, ক'টা ইড়িং পিড়িং সবই তো দেখি এ জানে। এক লাথি মারব তলপেটে...

— তোমার ম্যাজিকের পুঁটকি মারি... এই বলে হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ভগীরথ। ধানকলের মরে যাওয়া বয়লারটার তলায় বসে বিড়ি খেল, তারপর চোং নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। আসুন, তালুতে ট্যাকা লাচায়, ফুঁ মেরে ভাত রান্না হবে, পেট থেকে জল বেরুবে... অদ্য শেষ রজনী...

দুপুরবেলা গদিঘরে একা একা শুয়েছিল মাঠবাবু। কুলুঙ্গিতে গণেশ। বিবর্ণ হাজিরা খাতা। ভগীরথ এল। টলছে। হাতে মদের বোতল। বলল, মালিককে শোরের বাচ্চা বলে এসেছিল মাঠবাবু। সেজন্য আজ এট্টু মাল খেলাম। মাল না খেয়ে মালিককে কী করে শোরের বাচ্চা বলি বলো দিকি? মাঠবাবু বলল, আমাকে এট্টু দিবি?

— লাও, লাও না।... ভগীরথ খুশি হয়। মাঠবাবু দু' চুমুক খায়।

ভগীরথ বলল, মাঠবাবু গো, আমার বড় দুখ।

— কেনে?

— বউটারে তাড়াবে।

— কে?

— ম্যাজিশিয়ান।

— কেনে।

— ওর এই রোগ। নতুন জাগায় ম্যাজিক দেখাতে যায়, লতুন মেয়েমানুষ তুলে নেয়, আগেরটারে তাড়ায়।

— এখানে কাউকে তুলেছে নিকি?

— এখানে তুলেনি, তবে ও মন করলেই তুলে নেয়।

— তাতে তোর কী?

— এই বউদিদিটা বড় ভাল। ও ম্যাজিক বড় ভালবাসে। ম্যাজিক-অন্ত-পেরান। আর কুন বউদিদি এমন ছিল না। অনেক বউদিদি দেখলাম।

— ক'টা!

— এই এগারো বছরে চারটে।

— এগারো বছর তুই ওর সাথে আছিস?

— হ।

— এর আগে?

— চোর ছিলাম।

— চোর।

— হ। গরিব ছিলাম। জন্মের পর বাপ দেখিনি চোখে। শুধু মা।

— তারপর!

— খুঁজে খাই, চেয়ে খাই। চুরি করে খাই।

— তারপর!

— একটু বড় হয়েছি। আসানসোলে ম্যাজিক হচ্ছিল, আমি জুতো চুরি করব বলে ঢুকেছিলাম। ম্যাজিক দেখতে দেখতে জুতোর কথা, রোজগারের কথা ভুলে গেলাম। সে কী ম্যাজিক গো মাঠবাবু, হাওয়া থেকে ট্যাকা ধরা, বলের নাচ, এট্টুকুন একটা বাক্স থেকে পায়রা বেরুনো... খেলা শেষ হলে ওর কাছে যেয়ে বললাম, আমারে ভর্তি নাও। ম্যাজিশিয়ান বলল, কী কাজ পারবি তুই! আমি বললাম, সব। তুমাদের যাদুকাঠি গুইছে রাখব, ভেলভেট ইসকিরিন ভাজ করব, হুইসিল বাজার, বাঁধব, ছাদব...। ম্যাজিশিয়ান বলল, পা টিপতে পারবি? বললাম, হ আজ্ঞে আজ্ঞে। মাথা ম্যাসাজ! বললাম, হ আজ্ঞে। বলল, কর দেখি তো।

— তোর তখন বয়েস?

— ষোলো।

— সেই থেকেই ওর সঙ্গেই আছিস।

— হ। সেই থেকেই। সব ছিল গো সংসারে, সব কিছু। ভেলভেট ইসকিরিন, পিতলের জাদুকাঠি, চুমকি বসানো পাগড়ি...

— আহা! এখানেও ছিলরে ভগীরথ, মিলের ভোঁ ছিল, বাতাসের সঙ্গে ধানকুঁড়োর ওড়াওড়ি, কী হাঁকডাক...

— সব ছিল গো মাঠবাবু, ঘোরানো চেয়ার, পিতলের কলসিতে ওয়াটার অফ ইন্ডিয়ার খেলা। আমি ছড়া কাটতাম। সব ক'টা দাঁত ছিল তকুন আমার। শুনবে একটা ছড়া!

ইচিং বিচিং চিচিং ফাঁক
শাকের রাজা পালং শাক
মাছের রাজা রুই
ম্যাজিশিয়ানদের রাজা হলাম
ভগীরথ দাস মুই।

'ভগীরথ দাস মুই' বলেই বুকে চাপড় মারতাম ঠাস করে, তারপর ব্যথায় কেতরে মাটিতে পড়তাম, পাবলিক হেস্যে গড়াত। তারপর আমি নিজে ম্যাজিকের খেলা দেখাতে গিয়ে সবকিছু গড়বড় করে দিতাম। ...সে এক দিন ছিল গো...।

— তা তুই এমন দাঁতফোকলা হলি কী করে?

— প্যাঁদানি খেয়ে।

— কে মারলে, ওই ম্যাজিকশিয়ান?

— পাবলিক।

— কেনে?

— মেয়েছেলে কেস। ঘোষপাড়ার মেলায় ও একটু আলুবাজি করতে গেল। সবাই ম্যাজিকশিয়ানকে মারতে আসে তেড়ে। আমি বলি, মেরোনি গো, ও খেলাটা দেখায় ভাল, ওর কিছু হলে খেলাটা ভোম্বাট হয়ে যাবে। উলটে পাবলিক আমায় মারলে। ... সে এক দিন ছিল গো...।

সন্টুবাবু হঠাৎই এল গদিঘরে। মাঠবাবু বোতল লুকোল। সন্টুবাবু বললে, ভগীরথ, এখানে তোমায় পেয়ে ভালই হয়েছে, তোমাকেই খুঁজছিলাম। তুমি আমার কাছে চাকরি করবে? ভগীরথ ভ্যাবাচাকা খেয়ে সন্টুবাবুর মুখের দিকে চায়। সন্টুবাবু বলল, এখন কত পাও তুমি? কত টাকা? ভগীরথ বলল, তা কিছু ঠিকানা নাই। যখন য্যামন, তখন ত্যামন।

— তাইলে আর কেন ওর কাছে আসিছ? আমি মাসে মাসে মাইনে দেব, থাকার জায়গা দেব।

— কী কার্য করতে হবে মোকে?

— পাবলিসিটি। টিকিট চেক। মাঠবাবু টিকিট বেচবে। ভিডিও হল হবে। সিনেমা। তুই সিনেমা দেখতে পাবি বিনিমাগনায়, যত খুশি।

— সে তো মিশিনের কাজ বাবু, যন্তরে সিনেমা হবে। আমরা তো কিছু লয়। আমি তো আর পাবলিককে হাসাতে পারব না।

— বিনি মাগনায় লোক হাসাচ্ছিস। কী লাভ তোর! তার চে আমার কাজে মজা বেশি। পাবলিসিটির মাইক দেব, মাইনে দেব মাসে মাসে। ভগীরথ রা কাড়ে না।

বাইরে হাঁকডাক। ম্যাজিশিয়ানটা চ্যাঁচাচ্ছে— ভগীরথ, এই শালা ভগীরথ...

ভগীরথ ব্যস্ত হয়ে উঠে যায়। তারপর ওধার থেকে তুমুল খিস্তির শব্দ আসে। সন্টুবাবু মাঠবাবুকে বলে, ওকে ম্যানেজ করো। ও ব্যাটা বেশ একস্পার্ট। কাজ দেবে!

রাত দুপুরে গদিঘরে কড়া নড়ে। ভগীরথ এসেছে। বলল, ও শালার কাজ আর করব না। আজকের দিনটা করে দিলাম, ব্যাস। কালকে ও শালা কাটোয়া যাবে। আমি আর যাচ্ছিনি। আমাকে তোমরা টুকুন নুইক্কে রাখো।

ওই রাত দুপুরেই টর্চে টাইগার ব্যাটারি পুরে সন্টুবাবুর বাড়ি যায় মাঠবাবু। ভগীরথ বাড়ির গোয়াল ঘরে বসে মশার কামড় খায়।

সকালবেলা ম্যাজিশিয়ান ডি রতন শানচাতালে পাইচারি করছিল, পাইচারিতে ছটফট ভাব। আঙুলের বিড়ি শেষ হয়ে গেল বড় জলদি। মাঠবাবুকে এসে জিজ্ঞাসা করল, ভগীরথকে দেখেছ? মাঠবাবু মুখে কোনও শব্দ না করে শুধু মাথা নাড়াল। এধার ওধার ঘুরাফিরি করে বেলা বারোটার বাসে বাসের ছাতে মাল উঠিয়ে কাটোয়ায় চলে গেল ডি রতন।

দুপুরে বাবুবাড়ির মুসুরির ডাল, ভাত আর কুমড়োর তরকারি দেয়া হল ভগীরথকে। ভগীরথ খেতেই পারেনি। মাঠবাবু গেল দুটোর সময়। বলল, ওরা বিদেয় হয়েছে। ভগীরথ বলল, মাঠবাবু গো, যাবার সময় বউদিদি কিছু বলে গেছে?

মাঠবাবু বলে, না।

বউদিদির চোখের দিকে টুকুন ভাল করে তাইকে ছিলে?

মাঠবাবু বলে, না।

ঠিক চোখ ছলছল করছিল, দেকলেই বুঝতে!

দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। শুভ উদ্বোধন। ভিডিও হল। সতী সাবিত্রী। পরবর্তী আকর্ষণ প্রেমরোগ।

ভগীরথ চোং লাগিয়ে ব্যাটারি সিস্টেম মাইক লাগিয়ে পাবলিসিটি করল।

আসুন আসুন, সতী সাবিততিরির মহিমা দেখে যান। সাবিততিরের ভুমিকায় রয়েছেন গঙ্গা তেরি মাইলি খ্যাত মন্দাকিনী। ম-অ-ন-দা-কি-নী। আবার বলছি মন্দাকিনী।

প্রথম দিনে হাউস ফুল। চ্যাংড়া চোটার দল সতীসাবিত্রীর স্নান দেখে সিটি দিল। সাবিত্রী যখন

যমের কাছে ভাতার ছিনাতে যাচ্ছে, তখন তুমুল বৃষ্টি। সাবিত্রী ভিজছে, আবার সিটি। শো ভাঙলে দু'জন বিধবা চোখের জল মুছতে মুছতে বেরুল। কয়েকজন কম বয়েসের ছোঁড়া আ যা রে মেরা পেয়ারা সত্যবান তু আ যা আর মৌত কেয়া হায় ইস্কা পাস গান গাইতে গাইতে বেরুল! ভগীরথ ভাবল দুস, আমি কী করলাম। আমার তো কিচ্ছু কাজ নাই, সবই তো যন্তরের খেলা। আমি তো লোক মজাতে লারলাম!

সকালবেলা ভগীরথ নেই। কোথাও নেই। ওর হাওয়াই চটিটা শুধু গদিঘরের বাইরে পড়ে আছে।

এরপরেও বঙ্গলক্ষ্মী ভিডিও হলটা ঠিকঠাকই চলছিল। মাঠবাবু ঠিকঠাকই টিকিট ব্যাচে। ভগীরথ-এর বদলে ধনা বাগদি পাবলিসিটি করে। হল হাউস ফুল হয়।

উত্তরের হাওয়া বয়, চিতে ফুল ফোটে, প্রেমরোগের পর হান্টারওয়ালি, তারপর জয় সন্তোষী মা, কামাগ্নি, রোজা, দি বডি...

ভিডিও ক্যাসেট ভাড়া নিতে মাঠবাবু এসেছিল বর্ধমান। এখন তো মাঠবাবুই আসে। কার্জন গেট-এর সামনে বাসস্ট্যান্ড। বাসে জানলার পাশের সিটে বসল মাঠবাবু। কচুরি ভাজার গন্ধ, মাইকের হল্লা, ভিড়...।

সামনে কীসের ভিড়?— মাঠবাবু জানালা দিয়ে দেখে। লোকজন গোল হয়ে ঘিরে আছে। ভিড়ের মাঝখানে ও কী?— ভগীরথ না? খেলা দেখাচ্ছে। ছেঁড়া জামা, মাথায় গামছার পাগড়ি। পাগড়িতে গোঁজা প্লাস্টিকের ময়ূর পেখম।

লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান এবার দেখুন দি ভগীরথ ম্যাজিক কোম্পানির পরবর্তী খেলা আশ্চর্য রুমাল। বাচ্চারা বাজাও তালি।

ইচিং বিচিং চিচিং ফাঁক
শাকের রাজা পালং শাক
মাছের রাজা রুই
ম্যাজিশিয়ানদের মধ্যে রাজা
ভগিরথ দাস মুই...

কাম অন ডার্লিং, মাই অ্যাসিস্ট্যান্ট, রুমালগুলো দাও। গিভ...

রাস্তার উপরে রাখা একটা কালো বাক্স থেকে একহাতে লাল রুমাল আর অন্য হাতে নীল রুমাল নিয়ে ভগীরথের দিকে নেচে নেচে এগিয়ে আসছে ওই মেয়েটা, রোগা মেয়েটা, প্যাংপ্যাঙে মেয়েটা,— ম্যাজিশিয়ান ডি রতনের বউ... কী যেন নাম?

ওর নাম তবে গঙ্গা...।

বাস ছেড়ে দেয়।

কালিমাটি, ২০০১

পুরোহিত দর্পণ

ভটচায্যিদের বাইরের ঘরটাকে মন্দির বলা হয় কারণ ওখানে একটা কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি আছে। নিত্যি পুজো হয়। বারোটা জবাগাছ আছে বাড়িতে। কয়েকটা তুলসী ঝোপ। দুটো বেলগাছ। একটা আমগাছ; সুতরাং বিল্বপত্র, রক্তপুষ্প, তুলসী এবং আম্রপল্লবের ব্যাপারে ভটচায্যিবাড়ি স্বয়ম্ভর। ভটচায্যিদের গৃহপালিত স-বৎসা গাভীও আছে। সুতরাং আসনশুদ্ধি, বেদিশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি এবং জলশুদ্ধির জন্য গোময়, গোমূত্র সংগ্রহের জন্য ভটচায্যিদের কাউকে খাটালে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। গো-সেবার ভারটা কালাচাঁদের উপর। তবে কালাচাঁদকে নারায়ণপুজো সহ কালীপুজোও করতে হয় যদি গৃহকর্তা শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য যজমানিতে স্থানান্তরে যান। এটা প্রায়ই ঘটে থাকে। ছটি নারকেল গাছও আছে। শুদ্ধবস্ত্রে নারকেল কুরে, আশালতা দেবী নারকেল নাড়ু পাকিয়ে রাখেন যা পুজোয় লাগে। নারকেলের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর হলেও চিনির ব্যাপারে ভটচায্যি বাড়িতে সমস্যা রয়ে গেছে কারণ রেশনে মাত্র ৭৫০ গ্রাম চিনি পান। সাড়ে সাতটি রেশন কার্ড। যথা—

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ৬৬
পিতা ঁকৈলাশ
শ্রীমতী আশালতা দেবী। ৫২
স্বামী শিবপ্রসাদ
শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়। ৩৪
স্বামী ঁবিকাশ
শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ২৯
পিতা শিবপ্রসাদ
শ্রীমতী সুরমা ভট্টাচার্য। ২৪
পিতা শিবপ্রসাদ
শ্রীমতী সুষমা ভট্টাচার্য। ২০
পিতা শিবপ্রসাদ
শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। ৫
পিতা ঁবিকাশ
শ্রীকালাচাঁদ চক্রবর্তী। ৪০
পিতা ঁভোলানাথ

সিন্নিতেই ওই সাড়ে সাতশো চিনি লেগে যায়। প্রতি শনিবার বারের পুজো হয়, ৩০-৪০ জন লোক আসে, সিন্নি প্রসাদ নেয়। সুষমার চেয়ে সুরমা বেশি ফরসা, ওই সিন্নি মাখে। পুজোটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য অনেকে চাপ দিতেন, কারণ ওই দিনে টিভি-তে সিনেমা। বলতেন, সিন্নির দরকার নেই, সন্দেশ দিয়ে দিন। তাঁরা নিজেরাই সন্দেশের বাক্স নিয়ে আসতেন। শিবপ্রসাদ রাজি হননি। সিনেমা অথবা শনি, একটা বেছে নিতে হবে। দোকানের সন্দেশে বিশ্বাসী নন শিবপ্রসাদ। কোনও পুজোতেই দোকানের সন্দেশ ব্যবহার করেন না তিনি। কারণ মিষ্টির দোকানে সিঙাড়া, কচুরি ইত্যাদি তৈরি হয়। শাস্ত্রানুসারে, তণ্ডুল জাতীয় পদার্থে লবণ প্রয়োগে সেই খাদ্য উচ্ছিষ্টতুল্য হয়। এবং সিঙাড়া-কচুরির স্পর্শদোষে সন্দেশাদি মিষ্টান্ন দ্রব্যও উচ্ছিষ্টতুল্য হয়।

শ্রীশিবপ্রসাদ এতটাই শাস্ত্রাচারী যে বাড়িতে স্টিলের বাসন-কোসন ঢুকলেও পুজোয় স্টিল বা চিনামাটির বাসন ব্যবহার করেন না। কারণ এগুলি ম্লেচ্ছপাত্র। শাস্ত্রে সুবর্ণ রৌপ্য শঙ্খ শুক্তি কাংস তাম্র ও প্রস্তর নির্মিত পাত্রই যে শুদ্ধ এ কথা বলা আছে। জগৎপতি সূর্যদেব উদিত হবার পরে যে দন্তধাবন করে, সে পাপিষ্ঠ। শিবপ্রসাদ সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্বে শয্যাত্যাগ করেন। নিমডালে দন্তধাবন করেন, পুকুরে অবগাহন করেন। গামছা পরিধানরত অবস্থায় পুষ্পচয়নে যান। নিজগৃহে জবা এবং টগর ভিন্ন অন্য গাছ না থাকায় প্রতিবেশীর বাড়িতে যেতে হয়। যেহেতু মায়ের পুজোর ফুল, কেউ সরাসরি আপত্তি করেন না, তবে মরূদ্যান নামে যে ঢং-এর বাড়িটা, ও বাড়ির একটি ছোঁড়া, যে নাকি জেসপ কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার, বলেছিল, ঠাকুরমশাই, গামছার তলায় একটা আন্ডার প্যান্ট পরে আসবেন প্লিজ,— তখন বারান্দায় বসা, ম্যাক্সি পরা ওর স্ত্রী হাসছিল। লজ্জাহীনা। ওই বাড়িতে আর যান না শিবপ্রসাদ। তবে ইদানীং একটা প্রবণতা লক্ষ করছেন তিনি, যে প্রতিবেশীগণ গাঁদা, সূর্যমুখী, বেল ইত্যাদির পরিবর্তে হলিহক, পিটুলিয়া-ফিটুলিয়া ইত্যাদি কী সব ফুলগাছ লাগাচ্ছে। এই সকল ফুলের বিবরণ শাস্ত্রে না থাকায় পুজোর কাজে লাগে না। পুষ্পচয়ন সমাপন করে ক্ষেমবস্ত্র পরিধান করেন শিবপ্রসাদ। গৌহাটি থেকে কেনা গরদ। রেলের চাকরি করতেন শিবপ্রসাদবাবু। রেলের পাশ নিয়ে তীর্থস্থানগুলি ছাড়া অন্যত্র যাননি তিনি। কামাখ্যা ভ্রমণের সময় একজোড়া গরদ কিনেছিলেন, এখন ছিন্নপ্রায়। রেলের পাশ ব্যবহার করে জলশুদ্ধি মন্ত্রে যে, সকল নদীর কথা উল্লেখ আছে, সে-সমস্ত নদীর জল সংগ্রহ করেছেন শিবপ্রসাদ।

যথা—

গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু।

সিন্ধু ছাড়া সমস্ত নদীর জল বোতলে ভরে এনে রেখেছিলেন। পরে একটা কলসে সব জল মিশ্রিত করে পুনরায় বোতলে ভরে ছিপি এঁটে বন্ধ করেছেন। পুজোর সময় আসনশুদ্ধির পর যখন জলশুদ্ধি করতে হয় তখন ওই বোতলের কয়েক ফোঁটা জল অঙ্কুশমুদ্রায় করতলে রেখে গঙ্গেচ যমুনেচৈব মন্ত্রপাঠ করে বাকি জলের মধ্যে মিশিয়ে নেন। এইভাবে তিনি মন্ত্রের সঙ্গে সত্যের মিল ঘটান। সিন্ধুর জন্য সামান্য খুঁতখুঁতি থেকে যায়। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তিনি আরব সাগরের জল মিশিয়েছেন। কারণ সিন্ধুনদ আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। পুজোয় ব্যবহৃত যাবতীয় তৈজসপত্রাদির মধ্যে একমাত্র ওই বোতলগুলিই কাচ নির্মিত। পিতলের কলসিতে ঢাকনি দিয়ে রাখলেও বাষ্পীভবন ঠেকানো যেত না। ধর্মশালার দারোয়ানদের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে কেনা ওই বোতলগুলির অধিকাংশই যে বিয়ারের, রামের, সেকথা দেবু ভালই জানে। দেবু মানে দেবপ্রসাদ। শিবপ্রসাদের একমাত্র ছেলে। লিখল— এজ: থার্টি, কোয়ালিফিকেশন: বি কম। দেবু দরখাস্ত করছে মিউনিসিপ্যালিটির চাকরির জন্য। একস্ট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটি কী লিখবে ও? কালীমন্দিরে ঢুকতেই বাঁ দিকের দেয়ালে সুন্দর হাতের লেখায় মহিম ঘোষকে ভোট দিন দেবুরই কীর্তি, আর ডান দিকের দেয়ালের শ্রীশ্রীরক্ষাকালীমাতা। দেবুর হাতের লেখাটা বড় ভাল। স্কুলের পাঁচিলে লম্বা বোফর্স কামানটা ওরই আঁকা। ওকে বিভিন্ন দেয়ালে অনেক লিখতে হয়েছে, অনেক আঁকতে হয়েছে, অনেক অনেক দেয়ালে। নিজের বাড়ির দেয়ালটা সাফ-সুফ রাখাটা এক্ষেত্রে ভাল দেখায় না যেখানে এত পাবলিক আসে, স্পেশালি শনিবার শনিবার।

আট-ন' বছর হয়ে গেল দেবু পার্টি করছে। একদিন দুপুরে মহিলা সমিতির যূথিকাদির ঘরে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীর ব্যাপারে হঠাৎ ঢুকে গিয়েছিল দেবু। যূথিকাদি থতমত খেয়ে চমকে উঠেছিল। দেবু বলেছিল, এরকম চমকে ওঠেন নাকি মাঝে মাঝে? আমার বাবার কাছে যাবেন, কালীর ফুল দিয়ে দেবে। যূথিকাদি বলেছিলেন, কালীতে বিশ্বাস করো নাকি? দেবু বলল, বাড়ির

কালী... যাই বলুন, একটা ইয়ে তো আছে, একটা শক্তি। যূথিকাদি বলেছিলেন, তুমি ব্রাঞ্চ কমিটির মেম্বার না?

হ্যাঁ

যে-কোনও একটা বেছে নেয়া উচিত ছিল। কালী কিংবা মার্কস। 'অন রিলিজিয়ন' পড়েছ?

না তো?

এঙ্গেল্‌স?

উঁহু।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব?

না, মানে...

পড়ে দিয়ে দিয়ো, দাঁড়াও দিচ্ছি, বলে যূথিকাদি বইয়ের তাক খুঁজছিল। সুকান্তসমগ্র, মানিক গ্রন্থাবলি, চুলের যত্ন, কেক ও আইসক্রিম, গোর্কি, টলস্টয়, একব্যাগ শংকরের ফাঁক-ফোঁকরগুলো খুঁজেও যূথিকাদি যা খুঁজছিলেন পেলেন না। বললেন, কে যে নিয়ে গেছে মনেও নেই। দাস ক্যাপিটাল ছিল, ওই যে। সিলেকটেড ওয়ার্কস অফ লেনিন, কিন্তু আগে বেসিক বইগুলো পড়া দরকার।

শিবপ্রসাদও বলেন ক্রিয়াকর্মবারিধি এবং তন্ত্রসুক্তসার বই দুটি পড়তে। কখন পড়বে দেবু? সকাল থেকেই কাজ। নাগরিক সমিতির জীবনবাবু সকাল পৌনে সাতটা নাগাদ, বাজার যাবার পথে কালীমন্দিরে প্রণামটা রেখে যান। দেবুর তখন থেকেই কাজ শুরু হয়। ওর হাতে তখন দাঁত মাজার ব্রাশ। ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়া টুথপেস্টের ফেনা সামলে সামলে সংগঠনের কথা বলে নেয় দেবু, যেমন হাশমি স্মরণ, ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ট্যাপ ওয়াটারের কানেকশন বণ্টন, স্টেশনের চুল্লুর ঠেক ও স্থানীয় থানার সম্পর্ক।

দরখাস্তে বয়সটা লিখেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল দেবুর। তিরিশ ক্রশ করে ফেলেছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরিতে অ্যাপ্লাই করার বয়স আর নেই। স্টেটের কিছু চাকরির এজ লিমিট থার্টিফাইভ। ওসব হবে-টবে না বুঝে গেছে দেবু। জীবনে তিরিশটার উপর ইন্টারভিউ দিয়েছে। ফায়ার ব্রিগেডে খুব চান্স ছিল। ডিসট্রিকট থেকে লিখিয়ে এনেছিল, অধীরদা কথাও দিয়েছিলেন, হল না। এবার লাস্ট চান্স মিউনিসিপ্যালিটিতে। চেয়ারম্যান মোটামুটি কথাও দিয়েছেন। বলেছেন এটা ডিপ টিউবওয়েল, জলের ট্যাংক আর তোমার চাকরি— এই তিনটে কাজ হল আমার আগামী এক বছরের টারগেট।

ইয়োরস সিনসিয়ারলি লিখবার জন্য আবার ডিকশনারি খুলতে হল দেবুর। সিনসিয়ারলি কথাটা জীবনে কতবার লিখেছে, তবু গুলিয়ে যায়। ডিকশনারি খুলতেই বেরিয়ে পড়ে বাবার চিঠি।

হুকুমচাঁদ ধর্মশালা, বারাণসী। দীর্ঘজীবেষু।

হিন্দুসমাজে আজকাল পুরোহিতের ক্রাইসিস দেখা দিয়াছে। যথেষ্ট সমাদর ও অর্থলাভের সম্ভাবনা না থাকায় ব্রাহ্মণ সন্তানগণ এই ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করিতেছে না বলিয়া অনেকে মনে করেন। আমি এই মতে বিশ্বাসী নই। পূর্বে পুরোহিতগণই ছিলেন সমাজের যন্ত্রী। এখনও উত্তম পুরোহিতের কদর আছে বলিয়া মনে করি। গভঃ চাকুরি বর্তমানে মরীচিকা প্রায়। তুমি চাকুরিতে ব্যর্থকাম হইতেছ। বরং কুল-ব্যবসায়ে মনঃসন্নিবেশ করো। আমরা সাধক শ্রীসর্বানন্দের সাক্ষাৎ বংশধর। তুমি নিশ্চয় বুঝিতে পারো যে কেবলমাত্র আমার স্যালারি হইতে এতবড় সংসার প্রতিপালন করা সম্ভব হইত না যদি মন্দিরের আয় এবং যজমানি না থাকিত। তুমি মনস্থির করো। আশা আছে অচিরেই সমাজে পুজো, যাগ-যজ্ঞ, ধর্মাচারণ ইত্যাদির কদর হইবে। বি জে পি উঠিতেছে।

দরখাস্ত শেষ করে ব্রাইট ফিউচার কমার্শিয়াল কলেজ থেকে ওটা টাইপ করিয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসে দেবু। কালচাঁদদা, কাগজটা একবার মায়ের পায়ে টাচ করিয়ে দাও তো।

চেয়ারম্যানের বাড়ি যায় দেবপ্রসাদ। টুং-টাং করতেই চেয়ারম্যানের মেয়ে। কানে ওয়াকম্যান। বলল, উপরে আসুন। খলবল করছে চুল। শিয়োর সুবার্বন বিউটি পার্লারের খদ্দের। উপরে গঙ্গেশদা বসে ছিল। গঙ্গেশদা মিউনিসিপ্যালিটির কন্ট্রাক্টার। সেন্টার টেবিলে পলিথিনের প্যাকে কাজুবাদাম, দারুচিনি, এলাচ। গঙ্গেশদা গোয়া থেকে ফিরেছেন। চেয়ারম্যান দেবুর দরখাস্তটা নিয়েই ব্রিফকেসে ঢোকালেন। বললেন ও-কে। এবং চোখে-মুখে এমন পোজ দিলেন তাতেই দেবু বুঝে নিল— ব্যাপারটা গোপন, এবং মাল ওকে হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে এসে পচাকে কোলে জড়িয়ে ধরল দেবু, পচার মুখের লালা মুছিয়ে দিল, বলল, ভাগনেরে, তোকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব আমি। কাঁধে চাপিয়ে বাঘ দেখাব, হনুমান! চাকরিটা হয়ে যাক। উমা বড় চুপচাপ থাকে, কথা বলে না। বোনটা বিধবা হয়ে এসেছে তিন বছর। ওর স্বামী বিকাশের দোকানে এখন বিকাশের ছোটভাই বসে। বিকাশের এল আই সি-ও ছিল না। একটা টাকাও পায়নি উমা। ফলে ও পুরোটাই বোঝা। তাই ও পুকুর থেকে কলমি তোলে, জামাকাপড় কাচে, উমা পুকুর পাড় থেকে ধেয়ে আসে। সত্যি নাকি রে দেবু? কথার জবাবে শুধু পচার মাথায় বিলি কাটতে থাকে দেবু।

পচার পোলিও হয়েছিল। আচমকা আদরে ওর সরু সরু পা নড়তে থাকে দ্রুত, উৎফুল্ল মুখ থেকে আরও লালা ঝরতে থাকে। প্রশ্রয় পেয়ে বলে, অ মামু, জিল্‌পি খাব...

দেবুর মায়ের সারাদিন কাজ। কতবার যে কাপড় ছাড়তে হয় ঠিক নেই। ঠাকুরের কাজের জন্য আলাদা কাপড়, রান্নার জন্য আলাদা। খাওয়া-দাওয়া সারা হলে সামান্য বিশ্রাম, তখন আলাদা, সবই লালপাড়ের মোটা কাপড়। শিবপ্রসাদের যজমানির সংগ্রহ। দু-চারটে ছাপা শাড়ি যা মেয়েরা পরে, এইভাবে সংগ্রহ করেন শিবপ্রসাদ:

'শোন নিশানাথ, স্ত্রী বিয়োগ বড়ই বেদনার। তোমার এখন কর্তব্য তাঁর আত্মার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য যথাসম্ভব সামর্থ অনুযায়ী শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদন করা। বৃষোৎসর্গ সম্ভব নয়, তিলকাঞ্চন করো, বৈতরণী করো, ষোড়শ করো। ষোড়শে ভূমি, আসন, জল, দীপ, পাদুকা, ফল, বস্ত্রাদি ষোলোটি দান আছে। ভূমি আর কোত্থেকে দেবে, গঙ্গা মৃত্তিকাই দিয়ো। আর বস্ত্র যে-ক'টা দেবে, ছাপা শাড়ি দিয়ো। তোমার ওয়াইফ খুব শৌখিন ছিলেন। ভাল ভাল শাড়ি পরতেন...'

দেবুর মা ডুমুর কুটতে কুটতে শুনছিলেন পচার সঙ্গে দেবুর ওই খুশি খুশি কথাবার্তা। যতক্ষণ বাড়ি থাকে, দেবুর তো সর্বদাই খিচির-মিচির। এটা হল না কেন, ওটা হল না কেন? একই ছেলে, কিছু বলেন না আশালতা। আশালতা জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, তোর চাকরি হল নাকি? দেবু বলল, না মা, তবে হয়ে যাবে। আশালতা তক্ষুনি শাড়ি পালটাতে গেলেন এবং গরদটা পরে কালীর চৌকাঠের সামনে দাঁড়ালেন। আশালতার ওই চোখ বুজে থাকা, চৌকাঠের উপর মাথা ঠোকা, এসব দেখে কালাচাঁদ যেন কিছু বুঝল। জবাফুল দিল, সিঁদুর দিল। জিজ্ঞাসা করল, মানত বুঝি কাকি?

আশালতা বলল, হ্যাঁ?

নাতির জন্য?

না।

তবে?

তোর দরকার কী?

পাঁঠা মানত হলে কালাচাঁদের ভালই লাগে। মাংস খাওয়া যায়। পুজো বা মানতের মাংস ছাড়া এ-বাড়িতে অন্য মাংস ঢোকে না। বাজারের মাংস হল জবাই করা। একটিমাত্র কোপে কাটা ছাগ মাংসই শাস্ত্রীয়। মাংসপাকে পিঁয়াজ রসুন ব্যবহার হয় না। গতবার একটু অন্যায় হয়ে গিয়েছিল।

দেবুর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব কালীপুজোর দিন কিছুটা কারণবারি নিয়ে এসেছিল। ভাঁড়ে মাংস নিয়ে সবাই চলল বসাকদের সদ্য ছাদ হওয়া বাড়িতে। কালাচাঁদকেও নিয়ে চলল। বলল, তুমি না হলে জমবে না। কারণবারিটা বিলিতি ছিল। হলেদেটে। দেবুর বন্ধু ভটা বড় ফাতড়া। বলে, কালাদা, মিনতিকে বিয়ে করবে? মিনতি বামুনের মেয়ে। প্রফেসর বউদির বাড়িতে কাজ করে, চমকানো বডি। কালাচাঁদের ততক্ষণে ব্রহ্মরন্ধ্রে ক্রিং, ললাটে হ্রিং, নাভিমূলে হুং। দেবুরে দেবু, তুই মাইরি তোর বাবা-শালাকে বলে-কয়ে মাইনেটা বাড়িয়ে দে লক্ষ্মী, অন্তত পঞ্চাশটা টাকা বাড়িয়ে দিলে সোমসারি হতুম। এই টাকায় কিছু হয়, বল, তোর বাপ দু' বছর ধরে একটা নয়া মাইনে বাড়াল না মাইরি। দেবু বলে, একজনের খোরাকি কত আজকাল, তা ছাড়া দান দক্ষিণেটা...

সেও তো দেয় না শালা তোর বাপ। শুধু শনিপুজোরটাই পাই হাফ। ভটা বলে, খুব দুক্‌খু না? আর একটু খাও। কালাচাঁদ আরও খায়। বলে, পঞ্চভূতের এই শরীরে জোয়ার ভাঁটার খেলা সবই মায়ের ইচ্ছে। আমার বাপ সন্ন্যেসী, ভাই নেই, বুন নেই, কেবল মা আছেন। কালীমা! এই দেখ ধেনুমুদ্রা। এই দেখ যোনিমুদ্রা। এই যে ভূতিনীমুদ্রা। হৃদয়ে ক্রিং নমঃ, লিঙ্গে ক্রিং নমঃ।

নাও। আর একটু মাংস খাও। ভাঁড় এগিয়ে দিয়েছিল ভটা। কালাচাঁদ মাংস মুখে নিয়েই বোঝে অন্যরকম। পেঁয়াজের গন্ধ কেন? ভটা বলল, দোকানের। দোকানের কেন? ভটা বলল, দেবু শালা যা কিপটে, ওইটুকুতে হয়? দোকান থেকে এনেছিলাম যে। কালাচাঁদ চিৎকার করে উঠল... দেবুরে, তোর পায়ে পড়ি, তোর বাবাকে এই পেঁয়াজের মাংসর কথা বলিস না। আমি প্রায়শ্চিত্ত করে নেব...

বলো না কাকি, কী মানত করলে, জবা, না পাঁঠা?

পাঁঠা বলে মৃদু হাসি ছুড়ে দিয়ে আশালতা চলে গেলেন। জবার কেসই বেশি হয়— একশো এক জবা, হাজার এক জবা। পাড়াপড়শিরা মানত করে যান। লাস্ট পাঁঠা মানত হয়েছে মাস দুই আগে। কলেজের প্রফেসার এক ভদ্রমহিলা, তাঁর স্বামীও অফিসার, তাঁদের ছেলে হবার জন্য মানত করেছিলেন। এর আগে ওদের দুই মেয়ে। ভদ্রমহিলার কাঁধ-ছাঁটা চুল, বাড়িতে ম্যাক্সি পরে থাকেন, উনি কালীর দয়ায় পুত্রসন্তান লাভ করলেন। পাঁঠা মানত হলে কালাচাঁদই বলি দেয়। উঠানে পারমেন হাঁড়কাঠ আছে। প্রফেসার ভদ্রমহিলা সোনার জিভ দিয়েছিলেন। কালীমায়ের সোনার চোখ আছে, আরও গয়না আছে, সব লকারে। কালীপুজোয় সাজানো হয়। সবই ভক্তরা দিয়েছে। এখন শুধু জিভটাই লাগানো রয়েছে, তবে সোনার নয়, রুপোর। এটা দিয়েছে ভোলা। ভোলা ছ'বছর ঝুলছিল একটা মার্ডার কেসে। ও কংগ্রেস করত বলে দেবু সাফ বলে দিয়েছিল আমাদের মন্দিরে আসবি না। এ নিয়ে দেবুর বাবার সঙ্গে দেবুর মতভেদ হয়। দেবুর বাবার মতে, মায়ের কাছে কংগ্রেস কমিউনিস্ট কী? ভোলা শেষ অবদি পুজো দিয়েছে। যে দিন কেস ডিশমিশ হল, সেদিন রুপোর জিভটা দিয়ে গেছে।

আবার কালীপুজো আসছে। নারকেল মজুত হচ্ছে ঘরে। জবার মায়ের কালো পাঁঠাটার, আহা, কালো কুচকুচে রং। ওকে বলা হয়েছিল যেন পাঁঠাটাকে খাসি না করা হয়। পুজোয় চাই নিখুঁত পাঁঠা। এখন ওর আট মাস হল। খুব লাফাচ্ছে। পাঁঠাটা বায়না করা হয়েছে। সুষমা সুরমা দুই বোন সর আর বেসন মাখতে শুরু করেছে মুখে। ওরা প্রফেসার বউদিকে বলে রেখেছে পান্নালাল, অনুপ জলোটা আর রুনা লায়লার ক্যাসেটগুলো কালীপুজোর সময় নেবে। পচা বলতে লাগল, বাজি ফটাস কব্বে তো মামা?

ফটাস বাস্ট করল দেবপ্রসাদ, কালীপুজোর দিনকয়েক আগে। মিউনিসিপ্যালিটির চাকরিটা দেবুর হয়নি। হয়েছে গঙ্গেশ কন্ট্রাকটারের শালার। আশালতা কালীমূর্তির দিকে কটমট করে তাকাল। তারপরেই বলল, অপরাধ নিয়ো না মাগো। নাগরিক সমিতির জীবনবাবু সকালবেলা কালী

নমস্কারে এলে ফ্লোরাইডযুক্ত সাদা ফেনা মুখ থেকে ফক করে ফেলে দেবু প্রথমেই বলল, সব শুয়োরের বাচ্চা। দেবু চেয়ারম্যান টেয়ারম্যান, গঙ্গেশবাবু সবাইকে জড়িয়ে যা-তা বলতে লাগল। জীবনবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চলে যেতে যেতে শুনতে পেল চাইসেস্কি সরকার এমনি এমনি ঝাড় খায়নি, বুঝলেন, সুষমা সুরমা বর্ণালীর ভল্যুম কমিয়ে সব শুনল। বুঝল গার্ডেন শাড়ি হল না। চাকরি হলে হত। কাঁধে হাতের স্পর্শ। পিতৃদেবের। বলল, এ আর আশ্চর্য কী। পায়খানা সেরে একটু আয়। কথা আছে। কী কথা দেবু বোঝে। দেখ, আমরা শ্রীসর্বানন্দের বংশধর...। পায়খানা ঘরে বিড়ি খেতে খেতে মনস্থির করে ফেলে দেবু। বলে, বাবা, রাজি।

গায়ত্রী মন্ত্র মনে আছে তো?

আছে।

রোজ এখানে বসে থাকবি। কাজ দেখবি। আমি হাতে কলমে দেখাব। এখন এটা দেখ! পুরোহিত দর্পণ, তন্ত্রসূক্তসার। এইসব বইগুলির তলা থেকে একটা বাঁধানো খাতা বার করলেন।

১০ই আশ্বিন। শুক্রবার	
প্রণামী বাবদ—	৬.০০
নিরাপদবাবুর ক্যাটস্-আই শোধন	২০.০০
মোট	২৬.০০

১১ই আশ্বিন। শনিবার	
কালী প্রণামী বাবদ—	১৮.০০
শনি দক্ষিণা বাবদ—	৪৮.০০
কালী কবচ—	২০.০০
পরমেশ বসুর নীলা শোধন—	২০.০০
মোট—	১০৬.০০

১২ই আশ্বিন। রবিবার	
সনাতন মুখটির গৃহপ্রবেশ	
দক্ষিণা বাবদ—	২০.০০
প্রাপ্ত দানসামগ্রী বিক্রয়	
দি আইডিয়াল ডেকরেটার্স কর্তৃক প্রাপ্ত—	১৩৬.০০
কালী প্রণামী—	৮.৫০
মোট—	১৬৪.৫০

সিনসিয়ারলি মায়ের কাজ করলে মা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেন। বুঝলি। চাকরি করে আর ক'টাকা পেয়েছি। এতবড় সংসার প্রতিপালন মায়ের দয়াতেই হচ্ছে। বলি কী, চাকরিরও চেষ্টা কর, ক্রিয়াকর্মও শেখ! আমরা শ্রীসর্বানন্দের বংশ...

অঙ্গন্যাস ও করন্যাস শিখতে শিখতেই কালীপুজো চলে এল। অ্যালুমিনিয়াম চুর দিয়ে ৮০টা ইলেকট্রিক তুবড়ি ঠাসল দেবপ্রসাদ। দু'ডজন বুড়িমার চকোলেট বোমা— মুরগিহাটা থেকে। খাঁড়ায় ধার দেয়া হল। চাকরি না হোক, বলি তো হতেই হবে। কাপড় ছোপানো হয়েছে লাল। মায়ের গলায় জবার মালা। পাঁঠার গলায় জবার মালা। বলি হবে। কালাচাঁদ পাঁঠাটাকে স্নান করিয়ে এনেছে। ছোট ছোট শিং দুটোয় সিঁদুরের ফোঁটা। কালাচাঁদ পাঁঠার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ওঁং হৈং হৌং ইমং পশুং স্বর্গং প্রদর্শয় মুক্তিং নিয়োজয় স্বাহা। তারপর খাঁড়াটা তুলে নিল কালাচাঁদ। মাথাটা টেনে ধরেছে দেবুর এক জ্ঞাতিভাই। প্রতিবারের মতোই ঠ্যাং টেনে ধরেছে দেবু। খড়্গ ওঠাল কালাচাঁদ। চারিদিকে জয় মা। কাঁসর ঘণ্টা। ইমং ছাগপশু বহ্নিদৈবতং তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে। খড়্গ নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ— মানুষের আর্তনাদ, কী সর্বনাশ হল রে...

মাথাটা শরীরে রয়েছে। বলি হয়নি। এ কী করলে মা। খড়্গ তোলে কালাচাঁদ। শরীরে সমস্ত শক্তি দিয়ে খড়্গাঘাত করে। আবার আর্তনাদ। আশালতা লুটোপুটি খায় মাটিতে। উমা গড়াচ্ছে। তুই আমায় খা, আমায় খা, আমি অভাগিনী। দেবু পাঁঠাটার পা ছেড়ে দেয়; কালাচাঁদ উন্মাদের মতো নিজের মাথায় কিল মারতে থাকে। শিবপ্রসাদ মাথা ঠান্ডা রাখে। নিজ হাতে খড়্গ তুলে নেয়। বলে স্থির হও। মাতৃনাম জপ করো সব। দেবু, নাও, পা ধরো, চোখ বুজে মন্ত্রোচ্চারণ করো, জয় মা। খড়্গ নেমে আসে। রক্তচ্ছটা। শিরশ্ছিন্ন হয়। জয় মা। ঝটপট করতে থাকে ছাগ কবন্ধ। এবার বিড়ি ধরান শিবপ্রসাদ।

কিন্তু এই ছাগমুণ্ড পুজোয় উৎসর্গীকৃত হবে না। এটা বিঘ্নবলি। এক কোপে শিরশ্ছেদন না হলে বহুদোষ। বলিবিঘ্ন হলে সংসারে অমঙ্গল হয়। নিয়মানুযায়ী সেই ছাগপশু এক হাজার আট টুকরো করে হোম করা হল। যে দেবী যত জাগ্রত সেই দেবী তত হিংস্র। পাবলিক এটাই মনে করে। ওই হোমে কি এই কালী খুশি হবেন? প্রফেসার বউদি একদিন শেষরাতে হঠাৎ শুনলেন ভটচায্যি বাড়িতে কান্নার রোল। কালী নিশ্চয়ই কাউকে নিয়েছেন ভেবে ধড়মড় করে উঠে গেলেন, তারপর বুঝলেন ওটা স্বপ্ন। পাড়ায় আলোচনা হতে লাগল, কালী যদি জাগ্রত হয়, নিশ্চয়ই কাউকে খাবেন।

কালাচাঁদ খুব মনমরা। মাঝে মাঝে একা একা কী সব বকে। দেবুকে বলেছে, ওকে যদি মা নেন, নিক, ওর আর কেই-বা আছে, কীই-বা আছে। দোষ তো আমারই, পিঁয়াজ খেয়েছিলাম।

ভটচায্যিদের বাড়ির উলটোদিকেই থাকে যূথিকা। চৌধুরিদের ভাড়াটে। কালো ব্যাগ নিয়ে বিকেলে বার হয়, ফেরে লাস্ট ট্রেনে। ও নাকি প্রায়ই দেখে রাত বারোটায় বাইরের ঘরে উমা ঢুকছে। বাইরের ঘর মানে মন্দির, আর কে না জানে ওপরে কালাচাঁদ শোয়।

লাল খাতা খুললে আজকাল বড় দুঃখ হয় দেবুর।

৬ই অগ্রহায়ণ। বৃহস্পতিবার	
প্রণামী বাবদ—	৪.৫০
৭ই অগ্রহায়ণ। শুক্রবার	
প্রণামী বাবদ—	৫.০০
কালী কবচ—	৫.০০
৮ই অগ্রহায়ণ। শনিবার	
কালী প্রণামী—	৬.০০
শনি দক্ষিণা—	১২.০০

সংসারে যা হোক একটা অমঙ্গল না এলে ফিউচার বেশ খারাপ, দেবু বুঝতে পারে।

জীবনবাবু আজকাল বাজার যাবার সময় মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে জাস্ট হাতের সঙ্গে কপালটা

টাচ করান। সেদিন দেবুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলে জীবনবাবু বললেন, একদিন আপনার সঙ্গে বসব বুঝলেন, আলোচনা আছে। মায়ের কাজ করেও তো সংগঠনের কাজটাজ করতে পারেন।

কালাচাঁদের হঠাৎ একদিন বুকে ব্যথা! প্রচণ্ড। কথা বলতে পারে না, নিশ্বাস নিতে কষ্ট। একেই বলে ধর্মের মার। হার্ট অ্যাটাক। কালী তবে কালাচাঁদকেই নিলেন। এই মুহূর্তে কালাচাঁদের মরণ অনেক দামি। ওর মৃত্যুর উপর নির্ভর করছে কালীর মাহাত্ম্যকথা, আর একটা গোটা সংসার।

কালাচাঁদ ছটফট করছে। তখন দুপুর। শিবপ্রসাদ ধীরে ধীরে বলল, কী রে দেবু, এখন ডাক্তার-টাক্তার পাবি? ওরা তো বিশ্রাম করছে। দেবু বলল, গিয়ে দেখি। শিবপ্রসাদ বলল, মা যদি নেবেন মনে করেন, ডাক্তার কী করবে। দেপ্রসাদ বলল, তবু বিনা ডাক্তারে তো রাখা যায় না। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে কালাচাঁদের। দেবু ডাক্তার ডাকতে বের হয়। একটা সিগারেট ধরায়। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সাঁটা গণশক্তিটা পড়ে, অনেকদিন পর। কবিতা পড়ে— 'সংহতি শপথ'।

হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহ
রক্ত মানে আমার দেশের মানুষ
আর তাদের চূর্ণ ইচ্ছামালা
হৃৎপিণ্ড থেকে....

হার্ট। হার্ট অ্যাটাক বেশি সময় দেয় না। আহা রে কালাচাঁদ! আস্তে আস্তে মধুসূদন ডাক্তার ব্যস্তসমস্ত হয়ে এলেন। রুগি দেখলেন। কালাচাঁদ কথা বলছে। বলছে বুকে ব্যথা। কোনখানে? না এইখানে, মধ্যিখানে। মধুসূদন ডাক্তার বললেন, চিন্তার কিছু নেই মনে হচ্ছে। চার চামচ ওষুধ খাইয়ে দিলেন। একটু পরেই লম্বা ঢেঁকুর তুলল কালাচাঁদ। ডাক্তার বললেন, গ্যাস।

ছিঃ

এর কিছুদিন পরই মণিপুর রাজ্য লটারির পঞ্চম পুরস্কারে ৫০০০ টাকা কালাচাঁদের নামে ওঠে। স্টেশনের লটারিওলা বড় বড় করে পোস্টার লিখে রাখে দোকানের সামনে। শিবপ্রসাদ কালাচাঁদকে বিদেয় করেন।

কালাচাঁদ বিহনে প্রচুর কাজ বেড়ে গেছে দেবুর। পুজোর গোছগাছ। মৎস্যাদি দশাবতার, গণেশাদি পঞ্চদেবতা, কত ফ্যাঁকড়া। নৈবেদ্য তৈরি, দুর্বা, তুলসী, চন্দন, নানান কাজ। শিবপ্রসাদ থাকলে কালীপুজোটা তিনি স্বহস্তে করেন। নারায়ণ পুজোটা দেবপ্রসাদ করে। কিন্তু যজমানিতে শিবপ্রসাদ বাইরে গেলে কালীপুজো দেবপ্রসাদকেই করতে হয়। বাজার খুব খারাপ। একটা অমঙ্গল এল না। একটা অমঙ্গলের দেবীমাহাত্ম্য সংসারটাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারত।

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ডটা রিনিউ করে এসে দুপুরবেলাটা চুপচাপ মন্দিরে বসেছিল দেবপ্রসাদ। সুষমা সুরমা সিনেমায় গেছে। উমা কোথাও যেতে চায় না। ওকেও নিয়ে গেছে ওরা। চিত্রবাণীতে উত্তম সুচিত্রার বই। আশালতা কাঁথা সেলাই করছে ঘরে। শিবপ্রসাদ যজমানিতে গেছে নৈহাটি। বাইরে রোগা রোগা রোদ্দুর। মেঘ মেঘ আকাশ। উত্তরের মৃদু হাওয়া। ফাঁকা ফাঁকা লাগে। অবলম্বনহীন। একটু অবলম্বন চাই। সামনে মা কালী। করালবদনী। মণ্ডমালিনী। লোলজিহ্বা। দাঁড়িয়ে আছে। রক্তচন্দনের বাটী থেকে কিছুটা লাল চন্দন তুলে নেয়। কপালে টিপ পরে। অমঙ্গল চাই। একটা ভ্রমর ঘরে ঢুকল। পচা, পঞ্চানন, উমার ছেলেটা গুটিগুটি বের হয়েছে ঘর থেকে। হাতে জুতোর বাক্স। ওটা জাহাজ। কাল একবার ও বলেছিল, মামু এতা জাহাজ, জলে ভোঁ। পচা উঠান অতিক্রম করে। হাঁটে। একবার পড়ে যায়, আবার উঠে দাঁড়ায়। সরু সরু পায়ে চলতে থাকে পিছল পুকুরের দিকে। ঘট বিসর্জন হয় এই পুকুরে। হেঁটে যাচ্ছে পঞ্চানন। সরু সরু পা। হাতে জাহাজ। জাহাজ ভাসাবে। দেবপ্রসাদ চোখ বোজে। করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী চতুর্ভুজাম। চোখ বন্ধ করে থাকে। কান সজাগ। জলের শব্দ চাই। অমঙ্গলের শব্দ। অমঙ্গলই এখন অবলম্বন।

চোখ বন্ধ। ভ্রমরের ভোঁ ভোঁ। এবার জলের শব্দ শোনে। জলেরই শব্দ। পতনের শব্দ। স্থির হও দেবপ্রসাদ...

দেবু লাফিয়ে ওঠে। ছুটে যায় পুকুরের দিকে। জলের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে পচা, পুকুরে ভাসছে গাছ থেকে সদ্য খসে পড়া ঝুনো নারকেল। তখন দেবু দু'হাত বাড়ায়। যোজন বিস্তৃত দু'হাত দিগন্তরেখা স্পর্শ করে। দেবু বুকে জড়িয়ে ধরে পচাকে। ওকে বুকে নিয়ে ছুটে আসে কালীমন্দিরে। কালীর সামনে দাঁড়ায়। কোমরে হাত। ডুকরে কেঁদে ওঠে। জলে গাল ভেজে। পচার মুখ দিয়ে লালা গড়ায়। দেবু পচাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওর মাথায় ঘষতে থাকে নিজের মুখ, আর কপাল থেকে মুছে যেতে থাকে রক্তচন্দন তিলক। কেবলই বলতে থাকে, পচা রে, তুই আমাকে বাঁচা। পচা বলে, অ মামু জিলপি খাব।

প্রতিক্ষণ, ১৯৯২

মধুদার বাড়ি যাব

মধুদাকে দেখতে যাব।

রোজই ভাবি মধুদাকে দেখতে যাব, সময় হয় না। খেলা যেদিন থাকে না শুনিটং থাকে, নয়তো পার্টি থাকে, নয়তো মন্দিরা...। আজ ঠিক করেছি যাবই। আজ দুপুরে খেয়ে দেয়ে চিঠির উত্তর দিতে বসলাম। ফ্যান লেটার। রোজই দু-তিনটে করে চিঠি আসে। আমার মাঠের ফুটবল খেলা নিয়ে প্রশংসার চিঠি আসে, তবে খুব বেশি একটা আসে না, সিরিয়ালের ফুটবল খেলা নিয়েই চিঠি আসে বেশি। একজন লিখেছে মাঠে আপনার খেলা দেখেছি। বাইনাকুলার দিয়েও দেখেছি, কিন্তু টিভির পর্দায় আপনাকে আরও ভাল লাগে। চার নম্বর এপিসোডে যখন আপনি খেলার পর বৈশাখী মিত্রর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি করে গোষ্ঠ পালের মূর্তির পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘোড়ার গাড়ির চালকের সিটে বসে গিয়ে ঘোড়াকে চালনা করতে লাগলেন তখন দারুণ লাগছিল। আপনি কি ঘোড়ার গাড়ি চালাতে পারেন? আপনি উত্তর দেবেন কিন্তু। না উত্তর দিলে ভীষণ ভীষণ মন খারাপ করব। আর একটা অনুরোধ। আপনার অটোগ্রাফওলা একটা ছবি পাঠিয়ে দেবেন? আমি স্ট্যাম্প লাগানো খাম ভরে দিলাম...।

আমিও এরকম চিঠি লিখতাম ক্লাস টেনে পড়ার সময়, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়। ঠিকানা জোগাড় করতাম। সৌমিত্র চ্যাটার্জি কোনও উত্তর দেননি। মিঠুন পাঠিয়ে ছিল সই করা ছবি, রাজেশ খান্না, উষা উত্থুপ...। আমি কি জিন্দেগিতে ভেবেছিলাম আমার কাছেও এরকম চিঠিপত্র আসবে? অনেক সময় চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে বানান নিয়ে কনফিউশন হয়। টি আই ও এন আর এস এস আই ও এন এর গণ্ডগোল হত। হয়তো লিখব আমার সাজেশন হল লেখায় আরও ডিভোশন দাও, তখনই গণ্ডগোল। তারপর, 'র' আর 'ড়' নিয়েও সমস্যা। বই পড়ব, কিন্তু জার্সি পরব। একবার জঘন্য লিখতে গিয়ে জঘন্ব লিখেছিলাম। আমার কী দোষ! কণ্ব মুনি যদি নয় বয় হয়, জঘন্য কেন নয় বয় হবে না? এটা যে 'ণ্ব', এ নিয়ে আমার কোনও কনফিউশন ছিল না। কিন্তু অভিনিবেশ বানানটায় তালব্য শ হবে না মূর্ধন্য ষ হবে দেখাতে গিয়ে ভুলটা ধরা পড়ল। মন্দিরাকে দেখাচ্ছিলাম। ওর কাছে আমার কোনও লজ্জা নেই। ও জিভ কেটে বলেছিল এ-মা চানুদা, জঘন্যরকম ভুল।

মধুদাকে দেখতে যাব, রেডি, এমন সময় মন্দিরার ফোন। বদমাশ আছে, গলাটা চেঞ্জ করে বলছে, আমি বৈশাখী বলছি, ঘোড়ার গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে খুব লেগেছে, এসে একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে যাও। আমিও তো অ্যাকচুয়ালি নৈহাটির ছেলে, কম খচ্চর নাকি, বললাম—কেন, কাল যে এত করে হাত বুলোলাম, কমেনি বুঝি। আবার কাল বুলিয়ে দেব। আজ হবে না, কারণ এখন আমাকে মন্দিরার গায়ে হাত বুলোতে যেতে হবে।

মন্দিরা তখন নিজের গলায় বলে, সত্যি? আমি হেসে ফেলি। বলি, মন্দিরা, এখন আমি একটু মধুদার কাছে যাচ্ছি। মধুদা মানে আমার গুরু। যিনি আমাকে হাতে ধরে ছোটবেলায় ফুটবল খেলা শিখিয়েছিলেন। নৈহাটির রেলের মাঠে প্র্যাক্টিসে যেতে হত—মধুদার কাছে। কলকাতায় ফ্ল্যাট নেবার পর মধুদার সঙ্গে দেখা হয়নি।

বেশ তো, আমিও যাই না নৈহাটি, ট্রেনে করে যাব বেশ, ট্রেনে চড়তে খুব ভাল লাগে আমার।

মধুদা তো হাসপাতালে। এন আর এস-এ।

ওমা, কেন কী হয়েছে?

পায়ে কিছু একটা হয়েছে।

ও। এন আর এস-এর গেট-এর সামনে দাঁড়াব? তোমার মধুদাকে দেখতাম।

না। থাক। অসুবিধে হবে। অনেকগুলো গেট। কোথায় দাঁড়াবে?

ওভারব্রিজের মুখটার সামনে যে গেট...

না, দেরি হয়ে যাবে। আমি এক্ষুনি বেরুচ্ছিলাম।

আমিও তো...

না, অন্য একদিন, অ্যাঁ?

নেওয়া যায়? কী বলতাম মধুদাকে? আমার গার্লফ্রেন্ড? লজ্জা করে। কতদিন কান মুলে দিয়েছেন মধুদা। সকালে যখন প্র্যাকটিসে যেতাম, তখনই নিস্তারিণী ইস্কুলের মেয়েরা হলদে-সাদা, জার্সি, সরি, স্কুল ড্রেস পরে ইস্কুল যেত। অ্যাই, ওদিকে কী দেখছিস, এদিকে দ্যাখ। হেড-এ ভুল করে কতদিন চড় থাপ্পড় খেয়েছি। বলের দিকে চোখ রাখতে বলি, মন রাখতে বলি,—চোখ এদিক-ওদিক যায় কেন? মেরে লাড্ডু বানিয়ে দেব। মন্দিরার কেসটা মধুদা হয়তো কিছু কিছু জানে। গতবার সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কারটা নিতে গেলাম, মধুদাকে দেখেছিলাম, এসেছিল, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার ইচ্ছে হচ্ছিল। কাছে যাব কী করে, খেলার সাথী, খেলার কাগজ, ময়দান, স্পোর্টসওয়ার্লড, খেল সমাচার— সব কাগজের রিপোর্টাররা ছেঁকে ধরেছে, ফটোগ্রাফাররা ছবি ওঠাচ্ছে। ওদের কাটিয়ে সামনে গিয়ে আর মধুদাকে পেলাম না। মন্দিরাকে আগেই মধুদা দেখেছে। ফটোগ্রাফাররা যখন ছবি তুলছিল, ও সেঁটে ছিল। খেলার কাগজগুলিতে মন্দিরা আর আমাকে নিয়ে বেশ গল্প ফেঁদেছিল। 'এ বছরের শ্রেষ্ঠ গোলদাতা চঞ্চল সরখেলের সাফল্যের পিছনে'—এই ক্যাপশনে মন্দিরার ছবি। মধুদা কি দেখেনি? আজ মন্দিরাকে ফুটিয়ে ভালই করেছি।

টুলের উপরে কমলালেবুর খোসা একা একা। ফ্যান ঘুরছে, মধুদা চোখ খুলে চুপচাপ। আমি ঢুকতেই মধুদার মুখে হাসির রেখা। টুলটা দেখিয়ে দিলেন। কমলার খোসা সরিয়ে বসলাম। ছোট আলমারিটার উপরে একটা ছোট সন্দেশের বাক্স। উৎসব। অভিজাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। কয়েকটা মাছি বসে আছে। একটা বিস্কুটের প্যাকেট। ট্যাবলেটের রুপোলি পাতা।

তোর বাঁ পায়ের কাজগুলো খুব ইমপ্রুভ করছে রে চানু। একদম কৃশানু দে-র মতন। টিভিতে সেদিন দেখলাম।

আপনার আশীর্বাদ মধুদা।

ধুর। এইসব গ্যালারি মারানো কথা। তুই খাটছস, প্র্যাকটিস করছস, তোর রিফ্লেক্স ভাল, তোর হয়েছে। কিন্তু আরও স্পিড চাই চানু। দশটা হরিণ মইরা একটা স্ট্রাইকার পয়দা হয়। সাদামাঠা ভাবে এগিয়ে গেলে হবে না চানু, একটা চুক্কি-টুক্কি দরকার। স্কুইজ করতে হয়। জোহান ক্রুয়েফ-এর খেলা দেখিসনি? সরি সরি, আমার এই অইভ্যাস আর গেল না। তুই অখন সব বড় বড় কোচের কাছে ট্রেনিং পাস, আমি জ্ঞান দিবার কে? হরিদাস পাল।

খেলার কথা ছাড়ুন মধুদা, কেমন আছেন বলুন।

কী যে কস চানু, খেলা তো ছাইড়াই দিয়ছি, খেলার কথাও ছাইড়া দিলে আমার আর কী থাকল। ক'টা বাজেরে?

আমি আমার কোয়ার্টজ ঘড়িতে তাকিয়ে বলি, চারটে পনেরো।

খুব আর্লি আর্লি আসছস চানু আমার লোকজন সব পাঁচটা নাগাদ আসে। আমারে একটু ধরবি চানু? একটু দেখা কইরা আসি। আজ না গেলে আর হবে না রে। আমারে একটু নেফ্রলজিতে নিয়া যাইতে পারস? একটু আড্ডা দিয়া আসি।

ওখানে কে আছে মধুদা?

আমার পিসাতো ভাই। বাংলাদেশ থিকা এসেছে। বড়পিসার ছেলে।

বাংলাদেশ থেকে এন আর এসে এসেছেন ট্রিটমেন্টের জন্য?

হ্যাঁ। আমার আর এক পিসামশাই, মানে ছোট পিসামশাইয়ের ছেলে অনির্বাণ এই হাসপাতালের ডাক্তার। অর ব্যাকিঙেই আমার এই কেবিন। অনির্বাণের ভরসাতেই বাংলাদেশের ভাই এখানে ভরতি।

নেফ্রলজি ডিপার্টমেন্ট বেশি দূরে নয়। একই ফ্লোরে। মধুদার হাঁটতে একটু কষ্ট হচ্ছে। ঠিক কী হয়েছে আমি জানি না। নানান কথা শুনছি। মধুদাকে, ডাইরেক্ট জিজ্ঞাসা করা যায় না। এগারো নম্বর কেবিনের দরজা ফাঁক করেই মধুদা বলল, হেরি ও ফরাইন্যা ফরাইন্যারে, এক্কারে ভুলছস নি, বেতুরিব্যাত। বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটার মুখে হাসি। মুখটা ফুলে থাকায় সেই হাসি পুরোটা ফুটল না। দু' হাত দু'পাশে বাড়াল লোকটা। মধু নি তুই? হাচা নি? বেদ্দপ। আয়, ইয়ানো আয়।

মধুদা বলল, কাইল আইতাম পাত্তাম না, আঁয়ার একখান পা ফালাইয়া দিব কাইল।

কী কস মধু? বয়, ইয়ানো বয়।

মধু ওই লোকটার বিছানায় বসল। লোকটার পা ফুলে আছে। লোকটা মধুদার গায়ে হাত দিল। বলল, মধু, কী কইলিরে।

ঠিকই কইলাম। কাইল আমার একখানা পা কাইট্যা ফালাইয়া দিব। একপায়ে, এতদূর আইতে পাত্তাম না। আইজই আইলাম।

ক্যান? পা কাটব ক্যান? কী হইছে?

কয়তো ক্যানসার।

কস কী?

কী আর কই। রেফারি ঘুষ খাইছে।

কোন রেফারি?

ভগবান।

কোন পা?

বাম পা।

কী ভাল শট আছিল তার বাম পায়ে।

কাছারির হেই মাঠখান আর আছে নিরে ফরাইন্যা।

হ। হ। এক্কারে সেম সেম আছে।

কত্ত বড় মাঠ, ক'চাই। এক কিনার দি কাছারি, আর এক কিনারে মকবুলের পরটার দোকান, দোকান খান আছেনি রে ফরান ভাই।

ব্যাবাক আছে। মকবুলের পোলা চালায়। মকবুলের ইন্তেকাল হইছে। দোকানে সাইনবোর্ড দিছে খুশির ফোয়ারা।

খেলার পরে পরটা খাইতাম মকবুলের দোকানে।

ব্যাবাক মনে আছে তর মধু।

কিচ্ছু ভুলি নাই। কাছারি মাঠের পুব দিকে জোড়া কদমগাছ। এক কিনার দি কাছারি, অন্য কিনারে বাস রাস্তা মাঝে মাঠ। মাঠের উপর দিয়া পায়ে চলার সরু রাস্তা খান। আছে, অখনো আছে? হালদারবাড়ির ছাত থিক্যা হালদারগর তিন ভইন খেলা দেখত। আছে, হালদারবাড়ি আছে? স্বপ্নে তোগো মাঠে খেলি। কাঁচা রাস্তাটার ধারে বল পাইয়া ড্রিবলিং করতে করতে ছুটি, হালদারবাড়ির মাইয়ারা আমার খেলা দ্যাহে। বামপায়ে শট মাইরা গোল দি, গোলকিপার ইরফান ভোদার মতো দাঁড়াইয়া থাকে। গোলপোস্টের ভিতর দিয়া বল গিয়া কাছারিবাড়ির দেয়ালে লাগে। দেয়ালে ল্যাখা ইয়াহিয়া সাবধান।

ওরা দু'জন কথা বলে, আমি বাংলাদেশ দেখতে পাই। নোয়াখালি শহরের ওই মাঠ, মাঠ চিরে যাওয়া পায়ে চলার পথ, কদমগাছ। মকবুলের দোকানের পরটার গন্ধও পেয়ে যাই। আমি কোনও দিন বাংলাদেশ যাইনি। গতবার আমাদের টিম ঢাকায় গিয়েছিল, আমি যেতে পারিনি। ওই মধুদা

আর পরানদা, মামাতো-পিসতুতো দুই ভাই ওদের যে জীবনে ফিরে গেছে—সেটা আমার এই বয়েস। ওরা ঢাকার উয়াড়ির কথা বলছে, খুলনার মিলনপন্থী সংঘর কথা। আয়ুব খাঁর কথাও বলছে।

মধুদা বলছে, কত দিন পর প্রাণ ভইরা নোয়াখালি কথা কইলাম, ক ফরাইন্যা?

পরানদা বলল, নোয়াখালি কস ক্যান, নোয়াহালি ক।

মধুদা বলল, তগো নারায়ণ ছিল না ঘরে, পূজা করসনি অখনো?

পরানদা বলল, পূজার ব্রাহ্মণ নাই। মন্ত্রপইড়া হয় না আর। সিংহাসন আছে। নারায়ণও আছে। আমাদের পাশের অবনী ভট্টাচার্যের বাড়িখান কিন্যা নিছে জাকির মিঞা। জাকিরের নাতনির নাম শ্রাবণী। আর দেখ আমার মুসাত ভাই অনির্বাণের মাইয়ার নামও শ্রাবণী। ভট্টাচার্যবাড়ির জবাগাছ-টগরগাছ চাঁপাগাছগুলি তো জাকিরের গাছেও একই রকম ফুল দেয়। শ্রাবণী সাঁজি ভইরা রোজ ফুল নিয়া আসে। নারায়ণ মন্ত্র পায় না, ফুল পায়। ইন্ডিয়ায় পাঠাইয়া দিমু ভাবি। মা কয় থাক। নারায়ণ থাক। তর তো ফাউল হইয়া গেছে গা। তর কথা ক। পায়ে এই রোগ বাধাইলি ক্যামনে।

তর কথা ক। কিডনি রোগ বাধাইনি ক্যামনে।

জানি না।

আমিও জানি না।

পা ফুলে নেফ্রাইটিসের রোগী আর পায়ের হাড়ের ক্যানসার হওয়া রোগি দু'জন হাহা করে হেসে ওঠে। পরানদার মুখ ফুলে থাকায় চোখ দুটো এমনিতেই ছোট লাগছে। হাসছে, তাই চোখ দুটো আরও ছোট হয়ে যায়। আমি ঠিক বুঝতে পারি না এই সময় আমারও হেসে ওঠা উচিত কি না। আমি বলি, আপনারা হাসছেন?

মধুদা বলে, হাসুম না কি কাঁদুম নিকি? হঠাৎই যেন মধুদার সম্বিত হয়। বলে, আরে পরান, এই ছ্যামড়াডার লগে পরিচয় কইর‍্যা দি নাই এতক্ষণ। এর নাম চানু। চঞ্চল সরখেল। মোহনবাগানে খেলে।

পরানদা উঠে বসতে গেলেন, ঠিক পারলেন না। আবার বালিশে মাথা দিয়ে দু' হাত সামনে বাড়িয়ে বলেন তুমিই চঞ্চল, আরে আরে। হাইয়েস্ট স্কোর করছ। তোমার খেলা তো টিভিতে দেখছি বাংলাদ্যাশে বইস্যা। বড় ভাল খেল।

আমি পরানদার এগিয়ে আসা হাতটা ধরি।

শীতল হাতের কম্পন টের পাই।

মধুদা বলল, আমার হাতেরই তৈয়ার।

পরানদা বলল, বাম পায়ের কাজ দেইখ্যাই বুঝন যায়।

পরানদা বলল, মনে আছে মধু, তোর সেই বাইসাইকেল ভলি, বাম পায়ে, শাঁখারিটোলা ক্লাব ভার্সেস আমাগোর নোয়াখালি একাদশ। তোর গোলে জিতলাম। 'একুশে' ট্রফি পাইলাম আমরা। একুইশারী ফেব্রুয়ারি ভুলব না, ভুলব না—কী আওয়াজ, সইফুদ্দিন তোর বাম পা মাথায় নিল, কইল দ্যাশ স্বাধীন হইলে তোর পা রুপায় মুড়াইয়া দিবে...

সইফুদ্দিন কেমন আছেরে?

রাজাকারে মাইরা ফালাইছে।

পরানদা আমার হাতটা ধরেই রেখেছে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সাতটার সময় প্রডিউসারের বাড়ি যাবার কথা। নেক্সট এপিসোডের স্ক্রিপ্ট দেবে। রাত ন'টায় সুমিতা হক ফোন করবে। অ্যাড এজেন্সির। সে আবার একটু জ্ঞানদা পিসি। বড্ড বকর বকর করে। শচীন তেন্ডুলকর যে ভাবে অ্যাডে গ্যালারি মারায়, আমি পারি না, আমি কম স্মার্ট, সুমিতা হক বোঝায়। বাঁ পায়ে শট মেরে বল গোলে চালান করার পর খেলোয়াড়রা আমাকে কোলে তুলে

নেবে, তারপর আমি একটা চুনকাম—সরি, চুইংগাম মুখে দেব। পায়ের স্টেপটাই পালটে যাবে, আর, তখনই চুইংগামটার ফেলে দেয়া পাউচটা উড়ে উড়ে পর্দায় নাচবে। আমার নাকি পায়ের স্টেপিংটাই হচ্ছে না। ফুটবল প্লেয়াররা নাকি যথেষ্ট স্মার্ট নয়। গিজোড়।

মধুদাকে যখন ওর নিজের কেবিনে নিয়ে যাচ্ছি মধুদা আমার হাতটা শক্ত করে আছে। নিজের কেবিনের দিকে যেতে যেতে বললেন, চানু, তোকে নিয়া আমার গর্ব। আই ফিল প্রাউড...

আমি বললাম, ক্যানসারটা কবে ধরা পড়ল মধুদা।

মধুদা বলল, মাসখানেক আগে। শোন চানু, ওই সব বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন বাদ দে। খেলার ক্ষতি হয়। কী করবি এত টাকা দিয়া। ন্যাশনালে গোল পাওয়া চাই। আমি হয়তো তখন আউট অব দি ফিল্ড। রেডকার্ড দেখাইয়া দিছে অলরেডি। চানু, আমার কোনও ছাত্রই ন্যাশনালে খেলে নাই। আমি বললাম, পা-টা অপারেশনের পর... আমাকে থামিয়ে দিয়ে মধুদা বলল, অপারেশন নয়, অ্যাম্পুট, অ্যাম্পুট...। পা খান ফালাইয়া দিব কাইল। বড় ইচ্ছা হয় চানু, আইজ শ্যাষবারের মতন বাম পায়ে একটা শট মারি।

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলি, পা-টা কাটার পরই তো ভাল হয়ে যাবেন, অত ভাবছেন কেন, রেডকার্ড-ফেডকার্ড সব আজেবাজে ভাবছেন।

মধুদা আবার হেসে উঠল। বলল, সব জানি। ঠ্যাং কাটার পর আবার আর এক জায়গায় উদয় হবে। ক্যানসার। বেকেনবাওয়ার। নিমেষের মধ্যে পেনাল্টি এরিয়ায়।

মধুদার কেবিনের কাছে চলে এলাম। মধুদা আমার হাতটা ছাড়লেন। বললেন, ঠ্যাংটা কাটার পর ক'দিন কেমোথেরাপি হবে। আবার আসতে হবে। তখন আসিস হাসপাতালে।

আমি বললাম, তখন কেন, নৈহাটি যাব। অপারেশনের পর নৈহাটি ফিরবেন না?

তা ছাড়া কোথায় ফিরব?

তা হলে নৈহাটি যাব।

কথা রাখতে পারবি? আফটার অল ইউ আর এ বিজি পারসন।

আমি মাথা নিচু করি। ওর কেবিনের সামনে চলে এসেছি। অনেকেই বসে আছে। বলি, খুব খরচ হচ্ছে, না মধুদা?

তা তো হচ্ছেই।

যদি আমি কিছু...

তুই কিছু দিলে আমি কি নিষেধ করতে পারি? সত্যি কথা বলি? সবার ডোনেশনেই আমার চিকিৎসা চলতাছে। আমার তো নিজের কিছু নাই। তোরাই আমার সম্পদ।

ঘরে যারা বসে আছে, তাদের অনেকেই আমাকে হিংসে করে, নিন্দে করে, আমি জানি। ওদের সবার দিকে তাকিয়ে দাঁত ক্যালাই। কে একজন বলল, এতদিন পর সময় হল? মধুদা রোজ তোর কথা বলত।

তারপর মধুদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আগামিকাল একটা পা থাকবে না। মধুদা বলল, চানু, দম বাড়াইবার ব্যায়ামটা করস তো যেটা শিখাইয়া দিছিলাম...।

করি।

মধুদা ভাবেন আমার পুরো স্কিল মধুদার দেওয়া। ভেবে আনন্দ পান। চানুদার পর চার জন কোচ পেয়েছি। স্পেন থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসা কোচ অতনুদার কাছে খেলা শিখেছি। দম বাড়ানোর জন্য মধুদা আদ্যিকালের ওই আস্তে আস্তে নিশ্বাস নেওয়া আর আস্তে আস্তে ছাড়ার প্রাণায়াম করতে বলতেন, সেই ধরে রেখেছেন এখনও। দম বাড়ানোর জন্য কত কায়দা বেরিয়েছে আজকাল। পেঙ্গুয়িন স্টেপিং, হগ প্রসেস, কত কী, মধুদা খবরই রাখেন না। কাগজে ছবি বেরলেই মধুদা চিঠি লেখেন। অমুক কাগজে ছবি দেখলাম। খুব খুশি হয়েছি। তোর জন্য গর্ব হয়। মনে হয় এত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। যেন আমার জন্য একস্ট্রা লেবার দিয়েছ তুমি। তিমির সাহার জন্য কম খেটেছ?

ভোর ছ'টার সময় তিমিরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে মাঠে নাওনি? হাফ বয়েল ডিম পকেটে করে নিয়ে আসতে তিমিরের জন্য। কী হল? তিমির তো ফার্স্ট ডিভিশনেও খেলতে পারল না। মধুদা একদিন লিখল, সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলে তুই খেলছিস। তোকে অভিনন্দন। তুই আমার মানসপুত্র। তোকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি চানু। সন্তোষ ট্রফিতে প্রথম গোলটা করে একবার আমার নাম করিস। সেই দিনগুলির কথা মনে করিস, যেদিন নৈহাটির কদমতলার ছোট্ট মাঠে...

হ্যাঁ, কদমতলার ছোট্ট মাঠে ফাইভ টু হাইটের ম্যাচ। আমার হাইট পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চির অনেক কম তখন। ক্লাস এইটে পড়ি। ফাইনালে হ্যাট্রিক করলাম। মধুদা ছিল ওই ম্যাচের অরগাইনাজার। ম্যাচের পর মধুদা আমার নামধাম, বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বলেছিলাম আমার বাবা রেলের গ্যাংম্যান। বলে দিলাম খেলতে দেখলে বাবা প্যাঁদায়। বাবা বলছে বড় হয়ে স্টেশনমাস্টার হতে হবে। বললাম বাবা মদ খায়, মাকে মারে। বললাম দু' বেলা পেট ভরা...।

মধুদা রেলের মাঠে খেলতে আসতেন, বলেছিলেন, রেলের মাঠে আয়। বাবার কাছে গেল মধুদা। সেটা বছর বারো হয়ে গেল।

মধুদা নাকি বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন উনিশশো একাত্তরে। আমার তখন জন্মই হয়নি। একটা টেলারিং-এর দোকান করেছিলেন, টেলার মাস্টারও রেখেছিলেন। পরে ওই টেলার মাস্টারের কাছেই মধুদাদের দোকানটাকে বিক্রি করে দিতে হয়। মধুদা নৈহাটি অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন, এখনও বোধহয় তাই। নিজেই ফুটবল খেলার রেফারি। নিজেই কোচ। আবার ফুটবল টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ করতেন।

আমাদের ইস্কুল, সুব্রত কাপে এন্ট্রি নেয় মধুদার চেষ্টাতেই। আমি স্কুলের হয়ে খেলেছিলাম। আমাদের খেলার স্যার যিনি ছিলেন, তিনি সাবধান/ আ-রাম/ ডাইনে মুড়/ বাঁয়ে মুড় করাতেন। ফুটবল-টুটবল হার্গিস খেলাতেন না। মধুদাই আমাদের ইস্কুলের ফুটবল ট্রেনার হয়েছিলেন। আমাদের ইস্কুল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। আমি হ্যাটট্রিক করেছিলাম। তখন ক্লাস টেনে। সেই সময়-মধুদার কাছে সকাল-বিকেল গিয়েছি। ঋষি বঙ্কিমে পড়ার সময়েই এরিয়ানস ক্লাবে চান্স পাই। ভোর পাঁচটা দশ-এর ট্রেনে কলকাতা যেতাম। মধুদার সঙ্গে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক তখনই শেষ। মাঝে মাঝে দেখা হত, দাঁড়িয়ে দুটো কথা হত, ব্যস, এইটুকুই। তারপর এরিয়ানস থেকে স্পোর্টিং ইউনিয়ন, তারপর এই ক্লাব। সন্তোষ ট্রফির প্লেয়ার। ব্যাংকে চাকরি হয়ে গেল। দমদমে ফ্ল্যাট হয়ে গেল একটা। নৈহাটি থেকে দমদম। গুড মর্নিং গ্ল্যাড টু মিট ইউ—বাআই রপ্ত হয়ে গেল। ভেবেছিলাম, আমি যখন একা একা বল নিয়ে এগিয়ে যেতাম, নিজে নিজে রিলে করতাম—বল নিয়ে এগুচ্ছেন রোমারিও, গুলিটকে কাটালেন, সামনে ফাঁকা গোল...। স্বপ্নেও ভাবিনি আমার খেলাও রিলে হবে... চানু রে, শোন শোন। কাল রিলে শোনলাম। বল নিয়ে এগুচ্ছেন চঞ্চল সরখেল... কী যে ভাল লাগছিল চানু... মধুদা প্রথম প্রথম বলতেন। যখন নৈহাটি থাকতাম। উৎসাহ পেতাম। কিন্তু মধুদা যেটা বলতে চান—উনিই আমাকে তৈরি করেছেন। আমার যা কিছু স্কিল মধুদার দেওয়া—দ্যাট ইজ নট টু।

দুই

কে পয়সা পিটছে না? শচীন পিটছে না? কাম্বলি পিটছে না? মাধুরী ক'দিনে কোটিপতি হল? মিঠুন? আমি চান্স পেয়েছি, পিটব। একটা কোল্ড ড্রিংক্স-এর নাম ছাপ গেঞ্জি পরলেই টাকা পাই। একটা কোম্পানির বুট পরে ছুটলে টাকা পাই। কেন করব না? যার চোখ টাটাচ্ছে টাটাক। মন্দিরা বলছে টিভিতে আমাকে নাকি হেবি সুন্দর লাগে। ফুটবল খেলা বেশি দিন স্টে করে না। খেলা চলে গেলেই পাবলিক ভুলে যায়। এ বছর হাইয়েস্ট গোল দিয়েছি, আগামী বছর যদি সত্য কিংবা সুচুং স্টার হয়ে যায়—গেঞ্জি জাঙিয়ার কোম্পানিগুলো ওদের দিয়েই ছবি তোলাবে সুতরাং খেপ এলে

ওয়েলকাম। পরে আক্ষেপ করার মধ্যে আমি নেই। মন্দিরা তো আমাদের মতো ফ্যামিলির মেয়ে নয়, ছোটবেলা থেকেই ফ্রিজের জল খেয়ে বড়। আমার তো ব্যবস্থা রাখতেই হবে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে পাঁচ-দশ হাজার ডোনেশন করা ভাল। যেমন স্প্যাসটিক সোসাইটি, থ্যালাসেমিয়া সোসাইটি, এরকম। এতে গ্যালারি হয়। আগামী বছর মালয়েশিয়াতে একটা সফর হওয়ার কথা। মালয়েশিয়া এখন ইলেকট্রনিকস-এ বহুত অ্যাডভানস্। কিছু মাল কিনব। একটা সি ডি প্লেয়ার কিনে মন্দিরাকে দেব। ক'দিন আগে মন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে একটা মিক্সি কিনে আনলাম। মা তো কিছুতেই ওটায় মশলা করবে না। মা সেই শিল নোড়াতে মশলা বাটে। মিক্সিটা এমনি এমনি পড়ে আছে। মন্দিরার এখানে পোষাবে না। আর একটা ফ্ল্যাট দেখতে হবে। খরচ কি কম, মধুদাকেও কিছু টাকা দিতে হবে। ওয়াদা করা আছে। দিস ইজ ডিউটি। যাব, একদিন নৈহাটি যাব। ক'দিন আগে মধুদার খবর পেয়েছি। ওর নাকি একটা অদ্ভুত ব্যথা হচ্ছে। যে পা-টা ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেই পায়েরই হাঁটুতে, গোড়ালিতে। হাঁটু নেই, গোড়ালি নেই অথচ ব্যথা আছে। মধুদার একটা পোস্টকার্ড পেয়েছি তিন-চার দিন হল। একটু যেন অভিমান। কষ্ট করে তোকে নৈহাটি আসতে হবে না। একটা দরকারে এই চিঠি। আমার পিসতুতো ভাই পরান কলকাতায় আছে। ওর ঠিকানা দিলাম। ওর কাছে একদিন যাস। ওর তোকে খুব ভাল লেগেছে। প্লিজ যাস।

ঠিকানা দেখলাম শান্তি ঘোষ স্ট্রিট। আমি চিনি। শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের কাছেই। মেট্রোর কাছাকাছি বাড়িটারি থাকলে অসুবিধে নেই। মেট্রোকে বলি ফুটোস্কোপ। ফুটো দিয়ে ঢোকো, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাও। দমদমে আমার ফ্ল্যাট থেকে সাত-আট মিনিট হেঁটে গেলেই মেট্রো রেল। মেট্রো রেলের একটা বিজ্ঞাপনে দেখাচ্ছিল সুনীল গাঙ্গুলি, মৃণাল সেন, পি কে ব্যানার্জি...। না, আমি ওরকম স্বপ্ন দেখি না। তবে আমাকেও তো টিভিতে দেখায়।

শান্তি ঘোষ স্ট্রিটে গেলাম। সিক্স বাই বি। দরজায় লেখা ডা. অনির্বাণ চ্যাটার্জি। ডাক্তারের বাড়িতেই আছেন পরানদা। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হওয়ার কথা নয়। মধুদার বড়পিসির ছেলে হচ্ছেন পরানদা, আর ছোটপিসির ছেলে অনির্বাণ। ওরা দু'জন মাসতুতো ভাই।

পরানদার মুখচোখ আরও ফুলে গেছে। পরানদা বলল, সো কাইন্ড অফ ইউ।

কেমন আছেন পরানদা।

ডেটোরিয়েটিং। কামিং উইকে পিজিতে ভরতি হব। ডায়ালিসিস হবে। আলটিমেটলি হয়তো ভেলোর যেতে হবে। কিডনি পালটাতে হবে। বাট আই মাস্ট ডু ইট। আমার এখনও অনেক কাজ বাকি। আই মাস্ট সারভাইভ।

পরানদার কথায় কোনও রকম টান পর্যন্ত নেই এখন। মধুদার সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন, অর্ধেক কথাই বুঝতে পারছিলাম না। পরানদা বললেন, শোনো চানু, তোমারে একটা প্রোপোজাল দিমু। দুই দিন চিন্তা করবা, তারপর ইয়েস অর নো বলবা।

একটু বাংলাদেশি টান এসেছে এবার। আন্তরিক হয়ে গেলে এরকম হয়। মধুদারও হয়।

আমিও একজন ফুটবল প্রোমোটার, তোমার মধুদার মতো। কিন্তু অর মতন আমি খোদার খিদমতগার না। আমার বিজনেস আছে। বুঝলা?

হুঁ।

আমার একটা নোয়াখালি বেস্‌ড ক্লাব আছে। নাম দুরন্ত দল। গত কয়েক বছর ফার্স্ট ডিভিশনে খেলছে, ঢাকায়। গত বছর লিগে থার্ড পজিশনে। টিমটারে তৈয়ার করতে চাই, বুজলা।

সামনের লিগে আমার ক্লাব লিগ চ্যাম্পিয়ান। দিস ইজ মাই মটো। বুঝলা। আমি আমার ক্লাবের প্লেয়ারদের কিছু ইনসেনটিভের ব্যবস্থা করছি। আগামী মাসেই—অরা কলকাতায় আসতাছে। কয়েকটা খেলার কথাবার্তা চলতাছে। কিছুদিন পরে টিমটারে সিঙ্গাপুর নেবার ইচ্ছা আছে। সবার হাতে কিছু ডলার দিয়া বাজারে ছাইড়া দিমু। দিস ইজ ইনসেনটিভ। আই নিড

ইট। তুমি আমার টিমের স্ট্রাইকার হও। এক বছরের কনট্রাক্ট। বলো কত টাকা চাও। আওয়ার ক্লাব হ্যাজ ইটস ফান্ড।

বাংলাদেশ যেতে হবে?

কী হয়েছে। কতক্ষণের রাস্তা? তোমাদের বাইচুং, বিজয়ন—সব কোথাকার? ওদের ঘর কোথায়?

না মানে বাংলাদেশের অবস্থা...

খুব ভাল। তোমায় মাথায় করে রাখবে। জোরাজোরি কিছু নয়। চিন্তা হয়।

টাকার অঙ্কটা...

তুমি এখন যা পাও তার দেড় গুণ তো হবেই। ওদের লোক আসবে। ইউ গেট ইট।

আমার ব্যাংকের চাকরি।

সেটা কোনও প্রবলেমই নয়। এক বছর উইদাউট পে ছুটি পাওয়া যায়।

কিন্তু মাইনেটা?

সে আমরা পুষিয়ে দেব। সব পোষাইয়া দিমু। গেইন ছাড়া লস নাই।

চিন্তা করে দেখি।

প্লিজ। অনেক কথা বললাম। ফিলিং টায়ার্ড।

মন্দিরা বলল, ভালই তো। খবর হবে, পাবলিসিটি হবে। সবাই জানবে তুমি বিদেশে যাচ্ছ খেলতে। ফিফটি পার্সেন্ট টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে নাও, নিয়ে একটা ফ্ল্যাট বুক করে দাও।

আমি বললাম, এক বছর তোমাকে দেখতে পাব না যে।

মন্দিরা বলল, কেন পাবে না। মাঝে মাঝে আসবে। যাবার আগে রেজিস্ট্রিটা করে নিয়ো। তা হলে তোমার সঙ্গে গিয়েও থাকতে পারব।

এই সব ব্যাপারে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে কোনও লাভ হয় না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি। মধুদাকে জিজ্ঞাসা করব?

যাব। মধুদার বাড়ি যাব। আগামী বৃহস্পতিবার মন্দিরার জন্মদিন। শুক্রবার খেলা। শনিবার প্র্যাকটিসে যেতেই হবে। রবিবার খেলার কাগজের সাংবাদিক আসবে। আমাকে নিয়ে একটা ফটো ফিচার করবে। সোমবার কী যেন...

ইতিমধ্যে একদিন ফোনে অ্যাপয়েন্ট চাইলেন সামশের আনোয়ার খান নামে এক ভদ্রলোক। পরানদার রেফারেন্স দিলেন। একটা ডেট করলাম।

আনোয়ার সাহেব পাজামার সঙ্গে একটা লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি পরেছেন। গায়ের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা আমি চিনি। ওডিকোলন। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। আঙুলে একটা আংটি। পাথরটা হেভি চমকাচ্ছে। হিরে? কে জানে। আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে আর একজন।

বাড়ি চিনতে অসুবিধা হয়নি?

জি না।

বলুন!

আপনি বলুন।

আমার কিছু বলার নেই। আপনিই বলুন... ।

ওরা যা অফার করল তাতে এমন কিছু লাভ হবে বলে মনে হল না। অঙ্কে আমি ভাল ছিলাম না কখনও। পাঁচ অঙ্কের/ছয় অঙ্কের সংখ্যাগুলি নিয়ে ডিল করতে হচ্ছে। সংখ্যাগুলিকে বারো দিয়ে ভাগ করতে হচ্ছে মাসে কত হয় বুঝে নিতে। তার সঙ্গে এখন কী পাচ্ছি সেটা হিসেব করে কম্পেয়ার করা, ভেরি টাফ। ক্যালকুলেটার নিয়েও ভুল হয়। বেশ ভজকট ব্যাপার। এটুকু বুঝলাম—এমন কিছু লাভ হচ্ছে না। আমি বললাম, যাচ্ছি না।

ফাইনাল?

হ্যাঁ।
আমরা আরও বিশ হাজার বাড়াতে পারি।
বড্ড মক্ষীচুষ আপনারা।
জি?
কিচ্ছু না।
কন কিছু।
যাব না।
ফাইনাল?
ইয়েস।
আনোয়ার সাহেব রথম্যান ধরালেন। বললেন, তা হলে অন্য একটা প্রস্তাব।
বলুন।
আনোয়ার সাহেব সঙ্গের ছেলেটিকে বললেন, কাইন্ডালি একটু বাইরে যান।
ছেলেটা বাইরে গেলে আনোয়ার সাহেব বললেন, আমাদের ক্লাবের সঙ্গে আপনাদের ক্লাব একটা ম্যাচ খেলবে। ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা যদি ম্যাচ জিততে পারি তবে আমাদের ক্লাবকে ভাল টাকা ডোনেশন দেবার ওয়াদা করেছেন আমাদের দ্যাশের একটা জাহাজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। আমাদের ছেলেদেরও কিছু কিছু টাকা দেবে। আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী বিভিন্ন রকম ইনসেনটিভের কথা কবুল করেছে। এই ম্যাচ জিততেই হবে আমাদের।
তো?
ইউ প্লিজ হেল্প মি।
হাউ?
আপনি আমাদের গোল দেবেন না। খেলা ছেড়ে দেবেন। পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব।
ইমপসিবল।
আপনি হেল্প করলে আমার ক্লাবটা দাঁড়ায়। জাহাজ কোম্পানির অনেক টাকা পাব আমরা।
সে হয় নাকি?
কেউ জানতে পারবে না। নট ইভেন পরানদা।
না-না। এরকম ভাবে...
টাকার দরকার নেই আপনার?
নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এভাবে
ক্লাবটা বাঁচে। আমাদের ছেলেগুলো বাঁচে...

মধুদার কাছে যাচ্ছি। ক্যাশ দশ হাজার। মধুদার কেমোথেরাপিতে অনেক টাকা লাগছে। এটা কোনও গুরুদক্ষিণা নয়। জাস্ট হেল্প। টাকাটা কী ভাবে রোজগার করেছি সেটা কোনও ভাববার ব্যাপারই নয়। এসব নিয়ে ভাবনা এলে লং কিক করে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দি। একজন রিপোর্টার বলেছিল লিখে যেমন টাকা পাওয়া যায়, না লিখেও টাকা পাওয়া যায়। একজন বড় ক্লাবের এক কর্মকর্তার কিছু কিছু কাজ কারবার ও জানে। ও সেইসব ডকুমেন্ট ফাঁস করে যে টাকা পেয়েছে, লিখে সে তুলনায় কিছুই পেত না। টাকা হল গঙ্গাজল। গঙ্গাজলে পাপ নেই।
মধুদার জন্য ফল কিনেছি। পলিথিন ব্যাগের ভিতরে আপেলের লাল আভাস। আঙুর উঁচিয়ে আছে, মুসাম্বি লেবুগুলো গাঢ় সবুজ। মধুদার বাড়ি গেলাম।
টিনের ঘর, ঠিক তেমনই। তক্তপোশ। একটা ছোট্ট টেবিল। দেয়ালে পেলের পোস্টার। সব একরকম। শুধু দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে একটা ক্রাচ। আগে ছিল না। মধুদার সব চুল উঠে গেছে। অল্প কয়েকটা চুল যা আছে পুরো সাদা। গায়ের চামড়া কেমন যেন কুঁচকে গেছে কালচে।

একটা গেঞ্জি আর পাজামা পরে আছেন। পাজামার বাঁ দিকটা অবলম্বনহীন, শূন্য। নেতিয়ে পড়ে আছে। মধুদা গম্ভীর। হয়তো রোগের কারণেই। পলিথিনের ব্যাগটা রাখলাম। মধুদা ওদিকে তাকালেন না।

কেমন আছেন মধুদা।

ভাল নয়।

কেন?

এক কথায় বলা যায়?

মাঠে যান আর?

যাই। রিকশায়। কিছুক্ষণ থাকি।

মধুদার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বেশ বুঝতে পারি আমি। মধুদার মুখের দিকে তাকাই। হেরে যাওয়া ক্যাপ্টেনের মতো মুখ। যদি আমার অনেক টাকা হয়, নৈহাটিতে মধুদার নামে একটা টুর্নামেন্ট চালু করে দেব।

মধুদাকে নমস্কার করি আমি। এক পায়ে। আর একটা পা যেখানে থাকতে পারত, সেই শূন্যে, মহাশূন্যে একটা একশো টাকার একটা বান্ডিল রাখি।

এটা কী?

আপনার চিকিৎসার জন্য।

মধুদার কাটা পা নড়ে ওঠে। পুরো পাজামাটার শূন্য শরীর নেচে ওঠে। মধুদার বাঁ পাটা বাদ পড়ার আগেই একটা কিক চেয়েছিল। লাথি। মধুদা বলল, গ্যালারি মারাচ্ছিস?

অ্যাঁ?

পরানের ওই দুরন্ত দলের সঙ্গে তোদের ক্লাবের খেলাটা আমি টিভিতে দেখেছি। পেনাল্টি বক্সের ভিতরে যখন অবিনাশ তোকে বলটা পাস করল, তুই বাইসাইকেল ভলি মেরে চিতপটাং হয়ে গেলি। গ্যালারি মারালি। গ্যালারির সব লোক হাততালি মারল। আহা কী অ্যাটেমপ্ট। বলটা বারের উপর দিয়ে চলে গেল। ওই বল তোর বাঁ পায়ে জলভাত। সেকেন্ড হাফে পেনাল্টির ছ' গজের মধ্যে অচিন্ত্য বল দিল তোকে। সেম বল। সিজারিয়ান মারলি। বল বাইরে চলে গেল। আর একবার একটা সিম্পল হেড দরকার ছিল, ব্যাকভলি করলি। খেলা শেষ হবার এক মিনিট আগে তোল্লাই বলটা বাঁ পায়ে ঠেলে দিলেই গোল, তুই হেড মারতে গেলি। বুঝি না কিছু?

আমি চুপ।

তোর ক্লাব এক গোলে হারল।

আমি চুপ।

তোর ক্লাবের সার্পোটার আমি না। কিন্তু আমি দুঃখ পেলাম খুব। চানু, আমি কোনও দিন সন্তোষ ট্রফিতে চান্স পাইনি। ন্যাশনালে খেলার স্বপ্ন দেখিনি। তোর মধ্যেই আমি ছিলাম। এখন আমি আর নাই। কোথাও নাই। আই অ্যাম ডেড।

আমি চুপ।

বুঝি না কিছু?

আমি, মধুদা আমি মানে...

সরা, সরা ওই টাকার বান্ডিল... নিয়া যা, অখনি নিয়া যা।

হাঁটুর উপর থেমে থাকা মধুদার বাঁ পা নড়ে উঠল। পদাঘাত। পদাঘাত। মধুদার পাজামার শূন্যতা জয়ধ্বজার মতো নড়ছে।

একটু জল হবে মধুদা, খাব।

তিন

আমি মধুদার বাড়ি যাচ্ছি। মধুদার শ্রাদ্ধ। ক্যানসার বেকেনবাওয়ার হয়ে পেনাল্টি এ বিষয়ে এসে গিয়েছিল ফের।

মধুদার ছবিতে মালা। মধুদা দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে বল।

পিণ্ডদান হল। মধুদার ভাইপো মন্ত্র পড়ছে। পুরোহিত বলছে, ওঁ মধুবাতা ঋতয়তে মধু ক্ষ্যরন্তি সৈন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণ সন্তোষধিঃ মধুনক্ত মুতোষবা... ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু। পুরোহিত বলল, ওই কথাটার অর্থ বুঝলেন। পৃথিবী মধুময় হোক। মধু ঝরে পড়ুক নদী-বৃক্ষে-সমুদ্রে... এটা জাস্ট মন্ত্র। এই মধু মানে মধুদা নয়।

মধুদার বাঁ পা-টা বাদ পড়ার আগে একটা কিক চেয়েছিল। কিক। লাথি।

আমি পালাই।

শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৯৯৫

শোক গাথা

অটোরিকশার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

উলটো দিকের নতুন ওঠা ফ্ল্যাট থেকে জরি বসানো শাড়ি ঝুলছে। ব্যালকনিতে চার-পাঁচ রকম বয়াম। আচার নিশ্চই। শিয়োর অবাঙালি। মেট্রোরেলটা চালু হবার পর এধারে অসম্ভব বেড়ে গেছে ফ্ল্যাটের দাম। যারা কিনছে, বেশির ভাগই অবাঙালি। মোবাইল সবজিওলাটির চাকাওলা ভ্যানে কুমড়ো-টুমড়োর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে টিভলা পুদিনাপাতা, অসময়ের টমেটো, আর কী অবলীলায় সবজিওলাটি লাউকে বলছে লোউকি।

একটা বাস আসছে। যাব তো দমদম স্টেশন। এখান থেকে তিনটে মাত্র স্টপ। বাসে ছ' মিনিট এক টাকা ভাড়া অটোয় দেড় টাকা। পাশের দাঁড়িয়ে আছে নির্মলেন্দু মিত্র নাকি মৈত্র? ব্লক বি-র, বাসে উঠল না। গা থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে ওডিকোলনের। ক'দিন আগে কাগজের সাপ্লিমেন্টারিতে 'নারীর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠুন'-এ ছিল গায়ে ওডিকোলন দিন। এরপর থেকেই কি ওডিকোলনের প্রকোপ হয়েছে?

আর একজন এল। সাফারি স্যুট পরা। ইশ, এই গরমে সাফারি স্যুট? মুখে পান। অবাঙালি শিয়োর। লোকটা পানের পিকটা ফেলে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার ভেরি স্যাড। অটো এসে গেল। ড্রাইভারের বাঁ পাশে একটা ছোট সিটে সেট হয়ে গেলাম। ন'টা বত্রিশ এর মেট্রো ধরব। ওই সাফারি পরা লোকটা স্যাড বলল কেন? কীসের স্যাড? অংশুর ব্যাপার? পরশু দিন বিকেলে অংশুর মাথায় একটা বল লেগেছিল। অংশুরা তো খেলে না, খেলা দেখে। টিভিতে, ভিসিপি তে। মাঝে মাঝে লাইভ। কাছেই একটা বস্তি মতো আছে, ওদের ছেলেরা সামনের একটা ছোট জায়গায় খেলে। অংশু সেই খেলা দেখে লাইভ। পরশু দিন হলিডে ছিল, আমি বাড়িতেই। বিকেলে ব্যালকনিতে বসে জাস্ট দেখছিল। একবার বলল, বাবা, একটা বাইনোকুলার কিনে দেবে? বললাম, ও কে। বলটা অংশুর কপালে লাগে। আর একটু হলেই চশমায় লাগতে পারত। প্লাস থ্রি, মোটা কাচ, লেগে গেলে চোখটার কিছু হয়ে যেতে পারত। সন্ধের সময় এস বি আর এ-র সেক্রেটারিকে ব্যাপারটা বললাম। এস বি আর এ মানে সুরবিহার রেসিড্যান্স অ্যাসেসিয়েশন।

এই এলাকাটা ছিল ডোবা কচুরিপানা সমন্বিত। সুর ফ্যামিলিরা ছিল এই জমির মালিক। নাম ছিল সুরের মাঠ। এই মাঠ ভরতি হয়ে ফ্ল্যাট উঠতে লাগল একের পর এক। ফ্ল্যাটের মালিকরা অ্যাসোসিয়েশন বানাল। সুরের মাঠের নাম চেঞ্জ করে সুরবিহার করা হল। এই নামটা আমার মাথা থেকেই এসেছিল। অবন্তিকা সোম, ব্যাংক ম্যানেজার, বলেছিলেন, কী সুইট।

একটা সরকারি আন্ডারটেকিং-এর পিআরও-র কাজ করে আমার সাহিত্যচর্চা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আগে লিখতাম-টিখতাম। সেই সুবাদেই হয়তো আমাকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন-এর কালচারাল সেক্রেটারি করে দিয়েছে। সুরবিহার সার্বজনীন দুর্গাপূজার স্যুভেনির-এর এডিটারও আমি। এস বি আর এ-কে বলেছিলাম খেলাটা বন্ধ করে দিতে হবে। কিছুদিন আগে অবন্তিকা ম্যাডামের কাচের শার্সি ভেঙেছে। আজ অংশুর চোখটা একটুর জন্য বেঁচে গেছে। এদের খেলাটা একটা নুইসেন্স। খেলার সময় ওরা শ্ল্যাংও বলে মাঝে মাঝে। কমিশনারকে ব্যাপারটা জানানো উচিত। তো, সেক্রেটারি বলেছিল, একটা পিটিশন ড্রাফট করুন।

সাফারি স্যুট যে স্যাড, ভেরি স্যাড বলল, এটা কি সেই রেফারেনস্-এ? কিন্তু অংশুর তো কিছু

হয়নি তেমন। তা হলে গুজব ছড়িয়েছে। চোখটার কিছু হতে পারত— হয়তো এটারই শাখাপ্রশাখা বেরিয়েছে। এই তো, ক'দিন আগে সুধীর বোস হঠাৎ ঘামতে থাকেন। অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তার কাঞ্জিলাল তখন ঘরেই ছিলেন। ওকে ডেকে আনা হয়েছিল। প্রেশার খুব ফল করেছিল সুধীরবাবুর। ওঁর স্ত্রী ডাক্তার কাঞ্জিলালকে জানিয়েছিলেন ব্যাংকে দশ হাজার টাকা শর্ট হয়েছে গতকাল। সুধীরবাবু হচ্ছে হেড ক্যাশিয়ার।

গত পরশু ব্রয়লার কিনতে গিয়েছিলাম। জিন্‌স পরা বি এস সি পাশ দোকানদার বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? আপনাদের পাড়ার সুধীরবাবু, উনি নাকি সাসপেন্ড হয়ে গেছেন। আমি বললাম, কই, না তো? কে বলল আপনাকে? ছেলেটা বলল শুনছিলাম। অনেকদিন আসছেন না তো, ইট মে বি এ রিউমার, কাঁধটা একটু স্ল্যাগ করল ছেলেটা। ছেলেটা নাকি ক্লাস এইট পর্যন্ত সেন্ট মেরিস ইস্কুলে পড়েছিল।

আজ বিকেলে মেঘ মেঘ। অফিস থেকে ফিরবার পথে একটা হুইস্কির নিপ নিলাম। তিনতলার রজতটা বেশ ফিট, ব্যাচেলর। সন্ধের সময় ও কি থাকবে? ও, হ্যাঁ। আজ তো থাকবে। আজ সন্ধ্যায় স্টার এ মিস ওয়ার্লড কনটেস্ট, লাইভ। জমবে। চিলি চিকেন করলে হয়। এটা আমি ভালই পারি। চিলি চিকেনটা বানিয়ে অঞ্জনাকে বলব, চাউ করো, ততক্ষণে রজতকে একটু চিকেন টেস্ট করিয়ে আসি। আসলে ঘরে এখন আর খাই না। বউ খ্যাচ খ্যাচ করে। বলে অংশু বোঝে সব। আরে, বোঝে তো বোঝে। কিছু অন্যায় করছি নাকি আমি। একটু ব্রয়লার এর দোকানে গেলাম। জিন্‌স পরা দোকানদারটি বললে, স্যাড, ভেরি স্যাড, তাই না?

কী স্যাড বলুন তো...

ওই মৃত্যুটা?

কোন মৃত্যুটা?

জানেন না? গতকাল রাত্রের কেস।

না জানি না তো।

তুহিনদা মারা গেলেন জানেন না? এই বলে আটশো গ্রাম চিকেন প্যাক করে আমার হাতে দিল ছেলেটি।

জাস্ট এক বছর আগে বিয়ে করেছিল তুহিনদা।

বিয়াল্লিশ টাকা দিন।

স্যাড, ভেরি স্যাড। চল্লিশ নাও।

সরি। ফট্টি টুই দেবেন। এমনিতেই আমি কম রাখি। স্ট্রোক হয়েছিল। বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়স, লাইফে কী আছে বলুন।

সুরবিহারে ঢুকতেই একটা কদমগাছ। ওখানে একজন বিহারি ছেলে ইস্ত্রি-টিস্ত্রি করে। অনিলদা আর একজন ওখানে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে কথাবার্তা বলছে। আমার হাতে পলিথিন ঝুলছে। অনিলদা বলল, দেখুন মানুষের জীবন কী রকম কচুপাতায় জল। লাইফের কোনও দাম নেই। এই যে আদিত্য, এই মাত্র তুহিনবাবুর জামাপ্যান্ট ইস্ত্রি করল। কে পরবে বলুন?

আদিত্য বলল, হামারা তো ডিউটি করনেহি হোগা, হ্যায় না? আজ সাম মে লিয়ে যাবে বলেছিল।

অনিলদা বলল, আগামী রোববার আমাদের এস বি আর এ-র পক্ষ থেকে কম্যুনিটি হল-এ একটা কনডোলেন্‌স ডেকেছি। আপনাকে বলতে হবে।

আমি মৃদু মাথা নাড়ি, চলে আসি। কদম ডালে ঝোলানো ক্যারাটে স্কুলের ফেস্টুনের উপর বসে আছে একটা কাক, মুখে কোল্ড ড্রিংক্‌স এর পলিথিনের স্ট্র, বাসা বাঁধবে। শোনা গেল অনিলদাকে লোকটা বলছে, মাল ছেড়ে দিতে হয় এখনই ছাড়ুন, শ'ওয়ালেস আর রিলায়েন্‌স উঠে গেছে। ম্যাগনাম ফ্যাগনাম আর উঠবে না। ও গড। ওরা শেয়ার নিয়ে কথা বলছিল। বাড়ি যাচ্ছি।

ঐক্যনীড়ের দোতলা থেকে পপ আসছে। ডালডার গন্ধ আসছে। ওটাই কি সফারি স্যুটের ফ্ল্যাট? আমাদের ফ্ল্যাটের একতলা থেকে সমবেত আবৃত্তি 'প্রিয়াকে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল দে দোল দোল...'। আবৃত্তিকার কমল বিশ্বাস থাকেন এখানে, রেডিয়োতে খবর পড়েন। দরজায় পেতলের অক্ষরে লেখা কমল বিশ্বাস (আকাশবাণী) কবি বলেই ডাকে সবাই। আজ ওর ক্লাস। সব ঠিকঠাক। আমার ফ্ল্যাটের কলিংবেল এ কোয়েল পাখি। অঞ্জনা মুখে সর-বেসন মেখে রয়েছে। নাথিং অফিসিয়াল অ্যাবাউট ইট। আমি বললাম, তুহিনবাবু কে গো? তুহিনবাবু?

অঞ্জনা ওর ডান হাতের আঙুলগুলো ফাঁক করে হাতটা আমার সামনে ধরল। দেহভাষা থেকে বোঝা গেল বলছি, পরে বলছি। তার মানে সর-বেসনের সঙ্গে আরও কিছু আছে, যা মুখে মাখা হলে কিছুক্ষণ কথাটাও বলা যায় না। আমি হাত মুখ ধুলাম, জামা-প্যান্টের বদলে পাজামা-গেঞ্জি পরলাম, বগলে পাউডার দিলাম, ইতিমধ্যে বোধহয় অঞ্জনার মাস্ক ধোয়ার সময় হল। ও বেসিনে মুখ ধুলো...

জানো খুব স্যাড।

আমি বললাম, হ্যাঁ, স্যাড তো, কিন্তু তুহিনবাবু কে? অঞ্জনা বলল, সামনের সপ্তপর্ণীর দোতলায় না তিন তলায় থাকেন, সরি, থাকতেন।

কেমন দেখতে?

চেনো না? বাঃ, ফ্ল্যাট অ্যাসোসিয়েশন করো, ...

মানে ঠিক বুঝতে পারছি না, কেমন দেখতে বলো তো...

আমি কী করে বলব? আমি কি সবাইকে চিনি?

আমি বললাম, কোন ফ্ল্যাটটা? পুবের জানালার দিকে যাই। পর্দা সরাই, ক্যাকটাসের টবটা একটু সাইড করি। বললাম, অঞ্জনা, কোন ফ্ল্যাটটা গো? অঞ্জনা কাছে এল। গোলাপের গন্ধ। মুখের ওই মাস্কে গোলাপ জলও ছিল। বলল, ওই তো, ওই বাড়িটার পিছন দিকের ফ্ল্যাটটা, দোতলায় না তিনতলায় ঠিক জানি না। ওদের ফ্ল্যাটেরই পাঁচতলায় তোমার ওই অবন্তিকা সোম থাকে। এবার বুঝলে?

যাঃ এমন বলছ যেন আমি অবন্তিকার ফ্ল্যাটে ফ্লার্ট করতে যাই।

যাওয়া না যাওয়ার কথা তো হয়নি, ফার্স্ট ওর রেফারেনস্‌টা দিলাম তুহিনবাবুকে চেনাবার জন্য। কিন্তু ঠাকুরঘরে কে, আমি কলা খাইনি এই হল তোমার অবস্থা।

হাঃ, ফালতু বোকো না। কী হয়েছিল গো?

কার কী হয়েছিল।

তুহিনবাবুর।

জয়ন্তী এসেছিল সকালে। ওর কাছেই শুনলাম কাল সন্ধের সময় তুহিনবাবুর একবার বমি হয়েছিল। বিকেলে নাকি কচুরি আর এঁচোড়ের চপ খেয়েছিলেন, ভাবলেন, তাতেই অম্বল হয়ে গেছে। একটু পর বুক ব্যথা, অ্যান্টাসিড খেলেন, কিছুক্ষণ পর বুক ব্যথা বেড়ে গেল, ডাক্তার ডাকতে গেল। রবিবারের বাজার, ম্যাকসিমাম ডাক্তারের চেম্বার বন্ধ, তারপর যেন কোন ডাক্তারকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল। ডাক্তার এসে বলল শেষ।

তখন ক'টা?

রাত আটটা নাগাদ।

ঝিন্দের বন্দি হচ্ছিল ডি ডি সেভেনে তখন।

চিকেন কাটছ কেন?

চিলি চিকেন করব।

রান্না আছে তো। ডিমের তরকারি।

থাক না, করি একটু।

তারপর রজতকে একটু দিতে যাবে, তাই না?

সবই তো বোঝো, হে হে। ডেড বডি আজ গেল?

হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি দেখেছিলাম এখানে ঢুকছে, তখন অংশুকে স্কুলে দিয়ে ফিরছি।

কাচের বাক্সের ভিতরে কে ছিল দ্যাখোনি?

না, বললাম তো, গাড়িটা ঢুকতে দেখেছি।

লোকটা কে বলো তো?

আশ্চর্য, আমি কী করে বলব। আমাদের বাড়ি থেকে ওদের বাড়ির দূরত্ব একশো ফুটও নয়। ও বাড়িতে ইলিশ মাছ রান্না হলে এ বাড়িতে গন্ধ আসার কথা। লোকটা কী রকম একা একা মরে গেল।

ই সি জি-টা করিয়ো মাঝে মাঝে।

কেন? আমার হার্ট তো ও কে।

না তবু মাঝে মাঝে চেক আপ করা ভাল। ভয় করে, একা থাকি আমরা।

একটু আসছি। তুহিনবাবুকে নিয়ে একটা স্টোরি করতে হবে। খবরের কাগজের ভাষা বলে ফেললাম। ওকে নিয়ে একটা রাইট আপ করতে হবে। একটু রজতকে জিজ্ঞাসা করে আসি ও লোকটাকে চেনে কি না। অ্যাঁ?

ছুতোর দরকার নেই। বেশি দেরি কোরো না। সারাদিন একা থাকি।

রজত দিব্বি আছে। বারমুডা আর গেঞ্জি পরা। দুটো খালি চায়ের কাপ, বিছানায় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এর ক্যাসেট। তার মানে ওই মেয়েটা এসেছিল, রজতের বান্ধবী। ও এসব শুনতে ভালবাসে, ওর জন্যই রজত কয়েকটা কিনে রেখেছে। রজত নচিকেতার ফ্যান। আমি বললাম, ভাল কাটল? রজত বলল, ধুস দাঁত ব্যথা। গালে টাচ করতে দিল না। আমি চিলি চিকিনের বাটিটা আর চ্যাপটা বোতলটা টেবিলে রাখলাম। বললাম, শুধু গালের ওপর নির্ভর করলেই চলবে? রজত বলল না কিছু, একটু হাসল, বোঝাতে চাইল যে এরকম নির্ভরতা ওর নেই।

আমি জানি গ্লাস কোথায় থাকে। দুটো নিলাম। বরফ নিলাম। বললাম, বেশি নয়, ছোট করে। রজত বলল, একেই বলে টেলিপ্যাথি। চিয়ার্স। চিকেনটা তোমারই করা মনে হচ্ছে, কী করে বুঝলাম বলো তো, তুমি গোল গোলমরিচ দাও। পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই চিলি চিকেনে গোলমরিচ ইউজ করো, ভালই লাগে কিন্তু...

আমি বলি স্যাড, ভেরি স্যাড, রজত বলল, কেন, স্যাড কেন? ব্ল্যাক পিপারের সঙ্গে স্যাডনেস এর কী সম্পর্ক?

আমি বললাম, কালকের কেসটা জানো না? উইদাউট এনি নোটিস মারা গেলেন আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের একজন মেম্বার।

কে?

তুহিন। তুহিনবাবু। তুহিন কী? মানে সারনেইমটা জানো রজত?

কোথায় থাকেন?

সপ্তপর্ণীতে।

তুহিনবাবু? কীরকম দেখতে?

সেটাই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

না দেখলে ঠিক চিনতে পারব না।...

আই মিন দেখলে চিনতে পারতাম। আসলে এই সুরের মাঠে দশটা অ্যাপার্টমেন্ট দুশোটা ফ্ল্যাট। সবাইকে চেনা সম্ভব?

দুশোটা ফ্ল্যাট, মানে দুশোটা ফ্যামিলি আমরা গায়ে গায়ে লেগে আছি। বউ যখন বলে একা একা থাকি, তখন এই পয়েন্টটা বলা যায়। ভাল পয়েন্ট। বলা হয়নি কখনও।

—ডেড বডি আছে?

আজ সকালে পোড়ানো হয়ে গেছে। তুমি জানো না কিছু?

না তো, আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম। আসলে আজ সকাল থেকেই বাড়িতে। কাজে বেরোইনি। খুব ঘুমিয়েছি। লক্ষ্মীর মা এসেছিল সকালে, কিছু বলেনি তো, আসলে ঘুমোচ্ছিলাম বলেই বোধহয় কিছু বলেনি। কী হয়েছিল?

হার্ট অ্যাটাক। কাল সন্ধের সময়।

আমি তখন সেলস ম্যানেজারের বাড়িতে। নতুন প্রোডাকটার সেলস টারগেট এক্সিড করেছে বলে পার্টি দিয়েছিল। অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছি। একটুখানি সকালে হ্যাং ছিল বলে শুয়েই ছিলাম।

কোনও লাভ হল না। আমি রজতের ফ্ল্যাট থেকে নেমে যাই। তুহিনবাবু সম্পর্কে আমাকে কিছু লিখতে হবে। প্রথমেই আমাকে জানতে হবে তুহিনবাবুর পুরোনাম। আমি সপ্তপর্ণীতে যাই। গেট এর সামনে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে একটা কুকুরের চেন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে কি জিজ্ঞাসা করব? নাকি সোজা ম্যাডামের কাছে চলে যাব? অবন্তিকা সোম। সারেন্ডার করব। উনি নিশ্চয়ই তুহিনবাবুকে চেনেন। ওর ফ্ল্যাটে বার দুয়েক গিয়েছি। কখনওই একা নয়। অনিলদা ছিল। উনি সবার সঙ্গেই বেশ ইনটিমেটলি কথা বলেন। আমার প্রতি কোনও স্পেশাল ইয়ে আছে, তা না। তবে মাঝে মাঝে নটি লুক দেন। বেশ লাগে। ফট্টি-নট্টি। যাই? ফ্রাংকলি বলি কী প্রবলেমে পড়েছি। যাব? কিন্তু একটু যে মালের গন্ধ আছে মুখে। মাল খেয়ে কোনও মহিলার ফ্ল্যাটে... উনি আবার একা থাকেন। বড্ড ব্যাকডেটেড আছি। কী আর ভাববেন। সপ্তপর্ণীতে ঢুকে যাই। সিঁড়ির তলায় লেটারবক্স সবার নাম আছে। তুহিনবাবুর পদবি এই লেটার বক্স থেকেই পাওয়া যেতে পারে। এটা মনে আসেনি কেন এতক্ষণ? দেখলাম টি করচৌধুরি একজন আছেন, ...থ্রি বি-তে। টি মজুমদার আছেন একজন, ফ্ল্যাট নম্বর টু সি থ্রি বি-তে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না তুহিনবাবু। করচৌধুরি নাকি মজুমদার। তবে এই দুটোর মধ্যে একটা। সিঁড়ি দিয়ে উঠি। দোতলার সি ফ্ল্যাটের দরজায় নেমপ্লেট তপন মজুমদার। বাঃ এই তো পেয়ে গেলাম। তা হলে তুহিনবাবু করচৌধুরি। তিনতলায় তিনটে ফ্ল্যাটেই নেমপ্লেট আছে শুধু বি-তেই নেই। একটা ব্যাপার জানা গেল, শোক সভায় বলা যাবে— তুহিনবাবু খুবই প্রচারবিমুখ ছিলেন, তার ফ্ল্যাটে নামের ফলকটুকুই লাগাননি কখনও। পাঁচতলায় ম্যাডামের ফ্ল্যাটে বেল বাজতেই কুকুর ডেকে ওঠে। দরজা খুলে ম্যাডাম উচ্ছ্বাসে হাসেন। আরে, আপনি, আসুন। পর্দা দুলছে। ম্যাক্সির ঝালর হাতা উড়ছে। আমি বলি, দখিন দুয়ার খোলা। ম্যাডাম বললেন, এসো হে এসো হে। একটু বেশি হয়ে গেল নাকি? আমি বলি, আপনার সাউথটা ওপেন তো, ওই জন্য খুব হাওয়া, আর এই জন্য আপনি বেশ খুশিতে থাকেন। ম্যাডাম বললেন, শুধু সাউথ ওপেন হলেই হয় না, মনটাও ওপেন। বলেই—আলনা থেকে একটা ওড়না নিয়ে নিজের ম্যাক্সির উপর চাপিয়ে দিলেন। যতই ইয়ে হও, মধ্যবিত্ত। বেশ হাওয়া আসছে। ম্যাডামের ওড়নাটা উড়ছে। আমি দখিন দুয়ার খোলা গানটা জানি। শেষের দিকে আছে তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিও। গাইতে ইচ্ছে হল। কী সাহস, অ্যালকোহলের এফেক্ট? ... এখন এসেছি একটা সিরিয়াস ব্যাপারে। আমি গম্ভীর হই। বলি ভেরি স্যাড।

অবন্তিকা বলল, তুহিনবাবুর ব্যাপারটা বলছেন তো?

হুঁ, ওই জন্যই আপনার কাছে আসা। আমি আজই শুনলাম। তুহিনবাবু মানে তুহিন করচৌধুরি তো?

রাইট।

কোথায় কাজ করতেন?

ব্যাংকে।

কোন ব্যাংকে।

সেটা ঠিক... ইউ বি আই না যেন ...

কেমন দেখতে বলুন তো? আমি না ঠিক মনে করতে পারছি না।

কেমন দেখতে কী করে বলি। শ্যামলা রং, সাড়ে পাঁচ ফিট হাইট, পাতলা চুল...

আমিও তো তাই। এভারেজ বাঙালিই তো তাই। শ্যামলা রং, সাড়ে পাঁচ ফিট। কোনও স্পেশালিটি?

গোঁপ নেই।

সে তো আমারও নেই।

চশমা আছে।

সে তো আমারও আছে। কোনও মার্ক অফ আইডেন্টিফিকেশন...

যেমন এ মোল অ্যাট দি রাইট ব্যাক, এ ব্ল্যাক স্পট ইন দি লেফট থাই, এসব তো? আমি কী করে জানব?

না না সেসব বলছি না, মুখে কোনও স্পেশাল ব্যাপার, যেমন থাকে না, মুখে বসন্তের দাগ টাগ...

এ জেনারেশনে কারুর মুখে বসন্তের দাগ নেই। আমাদের বাবাদের জেনারেশনে ছিল। দেশ থেকে স্মল পক্স উঠে গেছে।

এজন্য ম্যাডামকে ভাল লাগে, খুব ইনটেলিজেন্ট কথাবার্তা বলেন।

বলি, চুল টুল কাটার মধ্যে কোনও ইয়ে আছে? মিঠুন ছাঁট, বচ্চন ছাঁট, সঞ্জয় দত্ত...

না না, ওরকম নয়, জাস্ট আপনার মতোই ছাঁট। তবে চুলটা একটু কপালের দিকে এলিয়ে পড়ত।

সে তো আমারও পড়ে। আচ্ছা, থুতনিতে ছোট একটা জড়ুল ছিল কি?

ছিল বোধহয়। বাট নট শিয়োর। খুব কাছ থেকে দেখিনি। অ্যাকাচুয়ালি, আজ সকালেই ডেড বডিটার যত কাছ থেকে দেখেছি, জীবিত অবস্থায়, তত কাছ থেকে তুহিনবাবুকে দেখিনি কোনও দিন। আজ সকালে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে অনিলদা মালা দিয়েছিলেন, আমরাও ছিলাম সঙ্গে। তবে বেশি কাছে যাইনি। ডেড বডি আমি ঠিক সহ্য করতে পারি না। একটা কোয়েশ্চন, হোয়াই জড়ুল?

আমি ওই জড়ুলটার উপর কেনও স্ট্রেস দিচ্ছি কেন জানেন, লোকটাকে বুঝতে সুবিধে হত। ক'দিন আগে অটোর জন্য লাইন দিয়েছি, একটা লোক দেখি বে-লাইনে ঢুকে পড়ছে। আমি চ্যাঁচামিচি করলাম। খুব ঝগড়া হল। উনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার অটোতেই উঠলেন। উঠে বললেন, এত ঝগড়া করছেন কেন? এক পাড়ায় থাকি আমরা, কোথায় একটু ব্যাক করবেন... আমি বললাম, এক পাড়া? সরি, চিনতে পারিনি, কোন বাড়িতে, উনি বলেছিলেন সপ্তপর্ণীতে। ওঁর চুলটা কপালের দিকে এলিয়ে পড়েছিল, থুতনিতে একটা ছোট্ট জড়ুল ছিল।

জড়ুল ছিল কি না কনফার্ম করে দিচ্ছি। ওর স্ত্রী তো নেই। বার্নিং ঘাট থেকেই সোজা বাপের বাড়ি চলে গেছে শুনলাম। বার্নিং ঘাটে আমি যেতে পারিনি। রাত্রে আমার ফ্ল্যাট থেকেই ওদের রিলেটিভদের খবর দেয়া হয়েছে। ...আপনার প্রবলেমটা কী বলুন তো?

কনডোলেন্স মিটিং এ আমাকে বলতে হবে।

তাতে জড়ুলটা কি খুব জরুরি?

আপনি বুঝতে পারছেন না ম্যাডাম, আমি তো লোকটাকেই আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। এজন্যই আপনার হেল্প চেয়েছিলাম। এটা কাউকে বলবেন না আবার, ম্যাটার অফ সেম। দু-আড়াই বছর একসাথে থেকেও...।

এবার অন্য একটা বুদ্ধি আসে আমার মাথায়। আমি পরদিন কদমতলায় আদিত্যর কাছে যাই। আদিত্যকে গিয়ে বলি, বাবা আদিত্য, আমাকে ওই জামাপ্যান্টটা একটু দেখাও না, ওই তুহিনবাবুর জামাপ্যান্ট, যা তুমি ইস্ত্রি করে রেখেছ।

কী হোবে?

একবার দেখতাম, চোখের দেখা।

আদিত্য বার করে দেখাল। একটা বিস্কুট রং-এ ফুলপ্যান্ট, আর মেরুনের মধ্যে সাদা ডোরাকাটা হাওয়াই শার্ট। মেরুনের মধ্যে সাদা ডোরা...। কী আশ্চর্য, এই লোকটার সঙ্গেই সেদিন অটোর লাইনে ঝগড়া হয়েছিল। ঝগড়ার মধ্যে উনি একবার বলেছিলেন 'লাইনেই তো ছিলাম বাবা'। ওকি শঙ্খ ঘোষের কবিতার বইটা পড়েছিল? সেদিনের ওই ঝগড়ার ঘটনাটা কী রকম ডাইমেনশন পেয়ে গেল। আচ্ছা আদিত্য, তুহিনবাবুর থুতনিতে কি একটা জড়ুল ছিল?

জড়ুল ক্যা চিজ?

একটা আঁচিল টাইপের। আঁচিল জানতা হ্যায়? একটা ফুসকুড়ির মতো। ফুসকুড়ি সমঝা? এই যে এইখানে একটা ছোট্ট ইয়ে।

মাস্‌সা হোতে পারে। লেকিন আপ ওহি সেলুন সে পুছ লিজিয়ে...। ভাল কথা বলেছ আদিত্য। আমাদের সুরের মাঠে ঢুকতে গেলে মোড়ের মাথায় একটা ছোট্ট সেলুন আছে। ভিড় কম হয় বলে অনেকেই এখানেই চুলকাটার কাজটা সেরে নেয়। আমিই তো তাই করি। যে চুল কাটে তার নাম তিমির। চুল কাটতে কাটতে দেশের সমস্যার কথা বলে। ওর কথা শুনে কখনও মনে হয়েছে ও পাঁড় সি পি এম। কখনও মনে হয়েছে পিওর বি জে পি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিমির ওই যে তুহিনবাবু নামে এক ভদ্রলোক মারা গেলেন, তোমার কাস্টমার?

ও বলল, না।

ঠিক আছে। এতেই হবে। আজই লিখে ফেলব কাল ভোরবেলা বেরুতে হবে। দুর্গাপুর গোয়া থেকে কয়েকজন এক্সপার্ট আসছে ওদের চামচেগিরি করতে হবে ক'দিন। ঘরে ফিরে দেখি এক ভদ্রলোক বসে আছেন, বেশ বয়স্ক। আমায় দেখেই ভদ্রলোকটি বললেন, কী, চিনতে পারছ না বুঝি? চিনবি কী কইরা? যাওন আসন না থাকলে আপন মানুষও পর হয়।

আমি অবাক তাকিয়ে থাকলে তিনি বলেন আমি তর জ্যাঠা। তর দাদু অম্বিকাচরণ আর আমার দাদু ভবানীপদ আপন মামাতো-পিসতুতো ভাই। আমাদের গ্রাম ক্ষীরপাই, আর তগর গ্রাম ময়নাচক। নদীর এই পার আর ওই পার। নদী সাঁতার দিয়া মাঝনদীতে তর বাবা আর আমার বাবা আলাপ করত, তগ সব কাজ-পার্বনে আমরা ছিলাম, আমাগর সব কাজ-পার্বনে তোরা। পার্টিশনের পর একই সঙ্গে কলোনিতে। তগ ঘর, আমাগোর ঘর পাশাপাশি। তগ বাড়ি ডাইনের লংকার ফোড়নে আমরা কাশতাম। আচ্ছা বাই দি বাই, তর পাছায় কি দাগটা আছে? কাঁটা ভরতি বাবলা গাছের ডালের উপর বইস্যা পড়ছিলি। কী রক্ত। তোর চিক্কোইর এ ছুইট্যা আসলাম। আমি টাইন্যা বাইর করলাম কাঁটা, কিন্তু একটা কাঁটা ভাইঙ্গা গেল ভিতরে। জগবন্ধু ডাক্তার, এম এল এফ, অপারেশন কইরা বাইর করল কাঁটা। সব মনে পড়ে।

যাউক গা। তারপর কী হইল জানো?

আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই বলতে থাকলেন, তর বাবার ট্রান্সফার হইল বহরমপুর। তর বয়স তখন চাইর কিম্বা পাঁচ। সবাই চইলা গেল বহরমপুর। আমি ভাবলাম একটা প্লট ক্যান বেহুদা পইড়া থাকে, আমার শ্যালকরে থাকতে দিলাম। অফকোর্স তোমার বাবার পারমিশন নিয়া। আনফুরচুনেটলি সে প্লটটা ছাড়ল না। তার কাছ থিকা কিছু টাকা চাইয়া তোমার বাবারে দিতে গেলাম। সে রিফিউজ করল। এরপর তোমার বাবা অভিমানে আমার ঘরে আর পা দেয় নাই। আমিও কিন্তু আমার শ্যালকেরে ক্ষমা দিই নাই। আমার শ্যালকের সঙ্গে আমার কোনও বাক্যালাপ নাই আজ অবধি। সে যাউক গা। তোমার বাবার মৃত্যু সংবাদ পাইছি মৃত্যুর এক মাস পর। বহরমপুর গেছিলাম। তোমার মা, তোমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। তোমার ঠিকানা সেইখানেই পাইলাম।

এবার শুন তোর কাছে আসনের মূল কারণ। একবার তুই কই একবার তুমি কই মাথার ঠিক নাই।

আপনি তুই বলুন। আমি বলি।

শুন। আমার মাইয়ার বিয়া। একটাই মাইয়া। নাউ সি ইজ থার্টি টু। লেকচারার। এই যে চিঠি। পথ নির্দেশ আছে। টালির বাড়ি অখন দোতলা। আর শুন, আমার শ্যালকরে আমি নিমন্ত্রন করি নাই। আমাগোর ফ্যামিলির যে-কোনও কাজে তোগো ফ্যামিলির সবাই আসত, অ্যান্ড ভাইসা ভার্সা। আমার ছেলের বিয়ার সময় নিমন্ত্রণ করছিলাম, বাই লেটার, আসে নাই, তর বিয়ার সময় উই ওয়ার নট ইনফরর্মড।... আগামী রবিবার সকাল সকাল চলে যাবি। ক্যাটারার ফ্যাটারার করি নাই। নিজেরাই পরিবেশন করব। ইউ মাস্ট কাম।

আগামী রবিবার, এই রে, একটা কনডোলেন্স মিটিং আছে।

কনডোলেন্স কার?

খুবই নিকট লোকের। নেক্সট ডোর নেবার।

ওরা চলে গেলে আমি নেক্সট ডোর নেবারের শোক কথা লেখার জন্য ভাবতে বসি। আজই শেষ করে ফেলতে হবে। পরে আর হবে না। কাল ভোরেই দুর্গাপুর যেতে হবে।

রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় টাইম করা হয়েছে। শোক সভার একটা নোটিস কম্পিউটারে ছেপে দুশোটা কপি করিয়ে নিয়েছিলেন অনিলদা, এবং সব অ্যাপার্টমেন্টগুলির লেটার বক্স এ ফেলে দিয়েছিলেন। অনিলদা খুব এক্‌টিভ। তবে একটা ছোট্ট ভুল ছিল। সভার এস এ বি এইচ এ টাইপে সামান্য ভুলে এস এ কে এইচ এ হয়ে গেছে। ফলে উচ্চারণটা শোক সখা হয়ে গেছে। আগে কারুর চোখে পড়েনি। টি ভি-তে বাংলা সিনেমা আটটা অব্দি চলে বলেই সাড়ে আটটা করা হয়েছে।

আমি পৌনে আটটায় কম্যুনিটি হলে চলে যাই। অনিলদা এসে গেছে। আর দু-এক জন, অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা। অবন্তিকা সোম এল। বেশ ভাল পারফিউম। বলল, কী হল তুহিনবাবুর ছবি কোথায়? অনিলদা বলল, জোগাড় করতে পারিনি। তুহিনবাবুর ওয়াইফ এখনও বাপের বাড়ি থেকে ফেরেনি। বোধহয় শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ চুকিয়ে ফিরবে। একটা সাদা কাগজে কালো বর্ডার, ওখানে লেখা অকালপ্রয়াত তুহিন করচৌধুরির স্মৃতিতে। ওই কাগজটা একা বোর্ডে সেট করে রজনীগন্ধার মালা দেয়া হয়েছে। কায়েকটা ধূপকাঠি। আমার খদ্দরের গেরুয়া পাঞ্জাবি এবং পাজামা। পকেটে শোক কথা।

একজন দু'জন করে আসতে লাগলেন। আটটা দশে তিরিশ জন মতো হল। অনিলদা বললেন, এবার শুরু করা যাক। ভাবগম্ভীর পরিবেশ। অনিলদা গম্ভীর গলায় যা বলছেন তা আমার ভাবনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তা হলে আমি যাকে তুহিনবাবু ডেকেছি ঠিকই আছে।

অনিলদার পরই আমি। আমি কাগজটা বার করে পড়তে থাকি।

সুরবিহারের আবাসিকবৃন্দ, আজ আমরা মিলিত হয়েছি কোনও সমস্যা আলোচনা করবার জন্য নয়, কোনও প্রতিবাদ সংগঠিত করার জন্য নয়, আমরা মিলিত হয়েছি বিয়োগ ব্যথায়। আমরা স্বজন হারিয়েছি, আমরা কাতর, আমরা আমাদের বিষাদ বিনিময় করব।

কেউ অমর নয় পৃথিবীতে। সবাইকেই একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু ব্যথা তখনই বাজে, যখন কেউ অকালে চলে যায়।

আবাসিকদের মুখ দেখলাম। সবাই সায় দিচ্ছে, আসলে এই সব বাক্যগুলি আমার কিংবা অনিলদার শোক সভাতেও বেশ মানিয়ে যেত।

তুহিনবাবুর সঙ্গে আমার আড়াই বছরের পরিচয়। এর মধ্যে কথাবার্তা খুব বেশি হয়নি, তবে তার ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন। ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন কবি। তাঁর একটা কবি মন ছিল। শঙ্খবাবুর কবিতা ছিল জীবনযাপনে। তার পরিচয় আমি পেয়েছি।

ঠিক এইসময় ঢুকলেন তুহিনবাবু। না, তুহিনবাবু নয়, যাকে তুহিনবাবু ভেবেছি এইক'টা দিন। মেরুনের উপর সাদা ডোরাকাটা স্ট্রাইপ। থুতনিতে একটা ছোট্ট জড়ুল। এর সঙ্গেই সেদিন অটোর লাইনে।

আমি কাগজটা ভাঁজ করে ফেলি। বলি আর কিছু বলার নেই। হঠাৎ ঘেমে যাই। বসে পড়ি।

জানালার ঠিক পাশেই বসে আছে তুহিনবাবু। মেরুনের উপর সাদা ডোরা। আদিত্যর কাছে এই জামা দেখেছি। তুহিনবাবুর জামা।

ওই ছেলেটি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, উই হ্যাভ রাইটলি অবজারভ্ড। তুহিনবাবু কবি ছিলেন। আমরা কেউ জানতাম না। এই দেখুন। একটা সান্ধ্য পত্রিকা মেলে ধরল সে। 'আজকের কাগজ'। তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছোট করে বেরিয়েছে তরুণ কবির জীবনাবসান। এ সময়ের অন্যতম তরুণ কবি তুহিন করচৌধুরি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র বত্রিশ। তিনি সোপান ও দিশারী পুরস্কার পেয়েছিলেন।

মেরুন থেকে সাদা ডোরাগুলি বেরিয়ে এসে আমাকে পেঁচিয়ে ধরছে। আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াই, পা টলছে।

এক সঙ্গে হাজার হাজার গজ কাপড় তৈরি হয় হাজার হাজার গজ ডোরাকাটা মেরুন। আমি পাশের মেরুন জামাকে বলি, উঠি দাদা, একটু শরীর খারাপ লাগছে।

ঘরে যাই, চিঠিটা খুলি। চিঠির কোনায় হলুদের ফোঁটা।

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক নিবেদনমিদং মহাশয় ফরিদপুর জিলার ক্ষীরপাই গ্রামের অম্বিকাচরণ সরকারের জ্যেষ্ঠপুত্র মনোরঞ্জন সরকারের একমাত্র কন্যা...

হারিয়ে যাওয়া গ্রামনাম জড়িয়ে রেখেছে এখনও।

আমি বললাম, অঞ্জনা, তুমি কি যাবে ওই বিয়েবাড়িতে, ওই যে ভদ্রলোকরা এসেছিলেন..

এখন?

কাছেই, ট্যাক্সি পেলে পনেরো-কুড়ি মিনিট।

উঠল বাই, কটক যাই। আগে তো বলতে হয়। না, যাব না।

আমি যাব।

আমি পোশাক পালটাব। পাঞ্জাবি বার করি। ধুতিও। পা-জামাটা খুলি। অঞ্জনাকে ডাকি, আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি, বলি অঞ্জনা, অঞ্জনা, প্লিজ দ্যাখো তো আমার এখানে কিছু দাগ আছে কি না...

অঞ্জনা বলে, ধুৎ, কী করছ এসব। কিচ্ছু নেই, প্লেন। একদম মসৃণ।

তা হলে আমি?

শারদ বর্তমান, ১৯৯৬

গন্ধকাঁথা

সেজদা বমি করছে। বমির শব্দ পাচ্ছি। চোখের সামনে রোববারের কাগজের ডিটেকটিভ গল্প খোলা, টিভিও খোলা, সুমিতাও এখন অনেকটাই খোলা, দরজা খোলা নয়, বন্ধ। সুমিতা দেশলাই কাঠি দিয়ে আটকে থাকা রোববারের মাংস বার করছে দাঁত থেকে। মেয়েরা এসব করলে খুব বাজে লাগে। মেয়েদের কান খোঁচানো, নাক খোঁটা, এসব বিচ্ছিরি। আজ সকালে সুমিতা দাঁতব্রাশের ফ্লোরাইড যুক্ত ফেনা নিয়ে বলেছিল, টেঁটুল আর ঢনে পাটা এনো... অসহ্য লেগেছিল। তাকাইনি।

বমির শব্দ শুনলাম। সেজদার! আমার পুচকু বাচ্চাটা হাত পা ছুড়ছে মিকি মাউসের ছবিওলা তোয়ালের উপরে। একটু আগে ঘুম থেকে উঠল। রোববারের রবিবাসরীয়র ডিটেকটিভ বন্ধ করে বাচ্চাটার হাত-পা ছোড়া দেখতে থাকি। বাচ্চাটা হিসি করল মনে হয়। পা-দুটো উঁচু করে দেখলাম, হ্যাঁ, করেছে। তোয়ালে পালটে দিতে হবে। বেশ লাগে কিন্তু। পা-টা একটু উঁচু করে ভেজা তোয়ালেটা টেনে নিলাম, ঘরের কোনায় রেখে দিলাম। ওখানে আরও ভেজা কাঁথা-তোয়ালে আছে, আর ওখানে জমে আছে একটা গন্ধ। দেখি, ওখানে একটা প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও কেন ঘুরঘুর করছে ওখানে? প্রজাপতিদের শৈশবে কাঁথা জড়ানো পেচ্ছাপ থাকে না। শিশুটা হাত-পা ছুড়ছে। কেন আনন্দ, কী আনন্দ ওর এখন? একটা কাঁথা খুঁজতে থাকলাম, শুকনো। পরবর্তী হিসির জন্য। অনেক নরম নরম তোয়ালে রয়েছে। কাঁথা নেই। সুমিতার মা কয়েকটা কাঁথা সেলাই করে দিয়েছিলেন মরে যাবার আগে। বাচ্চাটা হবার দিন-পনেরো আগে সুমিতার মা মারা যান। ক্যানসার। গোটা পাঁচেক কাঁথা দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনটে আছে, দুটো মিসিং। হারিয়ে গেছে হাওয়ায়।

সুমিতার বক্তব্য হাওয়াতে হারাতেই পারে না, ইমপসিব্‌ল। বাইরে মেলেইনি ও। ও দুপুরবেলা কাঁথাগুলো ধোয় তারপর মেলে দেয়। ও নাকি ধুতে নেবার সময়েই পায়নি কাঁথা দুটো। অথচ সেদিন সকালেও নাকি ছিল। আমি শিয়োর, এটা সুমিতারই ক্যালাসনেস। নিশ্চই বারান্দায় মেলে দিয়েছিল, ক্লিপ আঁটেনি। নইলে পেচ্ছাপ মাখা ওই সব কাঁথা কে চুরি করতে আসবে? কাজের বউটা? ও তো চারটে বাচ্চার পর লাইগেশন করিয়েছে—তাও দু'বছর হয়ে গেল। সুমিতার কাছেই পাওয়া এই খবর। কাঁথা হারানোতে, কিন্তু সুমিতা দুঃখ পেয়ে ছিল খুব। পাবেই তো। ছোট্ট সুমিতার যখন বছর তিনেক বয়স, তখন নাকি ও ওর মায়ের পরনের হাতিছাপ শাড়ি দেখে বায়না করেছিল— ওই শাড়িটা ও পরবে। ওর মা ওর গায়ে পেঁচিয়ে দিয়েছিলেন শাড়িটা। সুমিতা সারাদিন পরে ছিল, কিছুতেই খুলতে দেবে না। রাত্রে ঘুমোলে ওর মা সরিয়ে দিয়েছিল ওই শাড়ি। মাঝরাত্তিরে নাকি সুমিতা আমার হাতি কোথায় গেল বলে কেঁদে উঠেছিল। আর সেদিনই নাকি ওর মা ভেবে রেখেছিলেন— ওই শাড়ি দিয়ে সুমিতার সন্তানের জন্য কাঁথা বানিয়ে দেবেন?

সেজদা বমি করছে।

কাল কি মাল-ফাল বেশি গিলেছে? আর পারা যায় না লোকটাকে নিয়ে। একটা নুইসেন্‌স। কাল রাত দেড়টার পরে শ্যামাসংগীত শুনেছিলাম। শোবার আগে একটা শ্যামাসংগীতের অভ্যাস সেজদার। সাধারণত নিজেই গায়, যেদিন বেশি গেলা হয়ে যায়, পান্নালালে কিশোরকুমার জড়িয়েও হচ্ছে না, সেদিন টেপটা অন করে শুড়ে পড়ে। টেপ-এ ভরাই থাকে, ক্যাসেট শেষ হলে নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। কাল রাত্রে স্বখাত সলিলে ডুবে মরি দিয়ে শুরু হয়েছিল। ভল্যুমটা একটু বেশিই। মা গো আনন্দময়ী নিরানন্দ কোরো না'র সময় আমি সেজদার ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে আসি।

আমার জানালার ওপাশেই সেজদার ঘরের জানালা। মাঝে একটা চার ফুটের বারান্দা। আমার ঘরে অক্রুর দত্ত লেন থেকে হাওয়া মাঝে মাঝে আসে, আমার ঘরের মধ্যেই একটু ঘুর ঘুর করে মন খারাপ করে অক্রুর দত্ত লেনেই ফিরে চলে যায় ফের। যদি আমার জানালাটা আর সেজদার জানালাটা একই সঙ্গে খোলা থাকে, তবে অক্রুর দত্তর হাওয়া সেজদার ঘর হয়ে বাঁকা রায় স্ট্রিটে ছুটে যেতে পারে। আগে যেত, এখন হয় না।

সেজদা বমি করছে।

বারান্দার দিকের জানালাটা খুললাম। একটা মাকড়সার জাল ছিঁড়ে গেল। বারান্দার ওপাশকে ওপাড় মনে হল। মেজদার জানালা বন্ধ। জানালার সবুজ কাঠে ভূতের ছবি। এইসব ভূতের ছবি-টবি আঁকিয়েছিল সেজদাই। সিঁড়ির দেয়ালে, বারান্দায়, বোধহয় সেজদার ঘরের দেয়ালেও। আমাদের বাসন মাজার ঝি-টা একটা বছর পাঁচেকের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসে। সেজদা একদিন ওই ছেলেটার হাতে একটা খড়ি ধরিয়ে দিয়ে বলে, অ্যাই ব্যাটা, আঁক, সারা বাড়িতে ছবি আঁক, যা মন চায় আঁক, জিলিপি দোব, গজা দোব, সারাটা বাড়ি যা মন চায় এঁকে কাগের ঠ্যাং, বগের ঠ্যাং এঁকে ভরিয়ে দে। ছেলেটা ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। সেজদা তখন বলেছিল, না আঁকলে প্যাঁদাব। ছেলেটা বারান্দার দেয়ালে এঁকেছিল দুটো গোল গোল। ওগুলো নাকি রসগোল্লা। দেয়ালে আঁকাবাঁকা দাগ। সেজদার বন্ধ জানালায় ভূত, নাকি সেজদাকেই এঁকে ছিল। কে জানে? মেজদা ক্যাডবেরি দিয়েছিল। ছেলেটার পছন্দ হয়নি বলেছিল, জিলিপি কই, জিলিপি?

এই যে দেয়ালগুলো নোংরা করাল সেজদা। কিছু বললাম না। বললেই ঝগড়া শুরু হয়ে যেত। বড্ড মুখ খিস্তি করে সেজদা। এটা সেজদার একটা টেকনিক। এই ভয়েই কিছু বলি না। খিস্তির প্রাবল্য বেড়েছে ইদানীং, বিশেষত আমার বিয়ের পর থেকে।— তা আমি কী করব? দাদা-দিদিরা মিলে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিল। আমি তো বললুম কত করে যে সেজদার বিয়েটা হয়নি, আমারটা থাক এখন। আসলে সেজদাটা হচ্ছে বাউণ্ডুলে টাইপের। কোনও কিছুই ঠিক করে করল না। আমার বাবা সব ভাইদেরই কারবার করে দিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু আমাকেই করতে হয়নি। অঙ্কে এইট্টির কমে কখনও পেতাম না। আমি বলেছিলাম কারবার করব না, চাকরি করব। পরীক্ষা দিয়ে এক চান্সে ব্যাংকে চাকরি পেয়েছি। বাবার ছিল চিরুনির কারবার। বড়দা-মেজদা ওটাই দেখে। সেজদাকে প্রেস করে দিয়েছিলেন। বাবা, সেজদা চালাতে পারেনি। মেশিনপত্র বেচে দিয়ে চানাচুরের কারবার। অফুরন্ত চাট, গাদা গাদা চানাচুর আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে রেগুলার মাল খাওয়া। চানাচুরের কারবারটাও ভোগে। এখন কী করে-টরে জানি না কিন্তু বাড়িতে ও থাকে না। একটা বাজে কথা মনে এল। কথায় বলে কুকুরের কাজও নেই, আবার অবসরও নেই। দাদারও সেই রকম। ক'দিন আগে আমার জামাইবাবুর হার্ট সার্জারি হল, এক মাস পড়ে ছিল নার্সিংহোম-এ, একদিনও সময় হল না গিয়ে একটু দেখে আসবার। আমার তিন দিদি। সেজদার পরই দিদিরা, দিদিদের পর আমি। সেজদা আমার চেয়ে বারো-চোদ্দ বছরের বড়। আমার যখন বিয়ে ঠিক হল সেজদা আমায় বলল, দেবু, ওভারটেক করলি কিন্তু। আমি কিন্তু বড়দাকে বলেছিলাম, সেজদার জন্য আগে কিছু করো। বড়দা বলেছিল, ও তো একটা উড়নচণ্ডী। তা ছাড়া ওর বিয়ের বয়স কি আর আছে? কে জানে দাদারা এরকম ভাবল কেন? আমার বিয়ের সময় আমি বত্রিশ ছিলাম, সেজদা ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ। এমন কী বেশি।

আমার বিয়ের পরই সেজদা কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠল। বাড়িতে মেয়েমানুষ নিয়ে আসতে লাগল। সেজদার ঘরে পর্দা ঝুলল। বাথরুমের বেসিনে পানসুপুরি-জর্দার কুঁচি মাখা গয়ের। ম্যা-গো...। ওরা সব ফ্ল্যাশটাও ঠিক মতো টানে না। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার। বাড়িতে বউ-এর কাছে মুখ দেখাতে পারি না। বউ বলল, কিছু একটা করো। কী করব আমি?

বাবাই ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। একতলায় বড়দা, দোতলায় মেজদা, তিনতলায় সেজদা আর আমি। আমরা দু'ভাই তখন ব্যাচেলার ছিলাম।। বাথরুম কমন।

দাদাদের বললাম। দাদারা বলল, একটা ফ্ল্যাট দেখে নে। এটা কোনও কাজের কথা হল।

একদিন সকালে সেজদা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সিঁড়ির সামনেটায় বাজারের থলি হাতে বলছে— হ্যাঁগো, শুনছ, কী আনব বলো। গলদা আনব? চারশো টাকা কিলোর? বাইরে উঁকি মেরে দেখি পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক মধ্যবয়সিনী, গালের ভিতরে পান, বাইরে মেচেতা, বলছে যা মন চায় এনো।

রান্নাঘরটা আমিই ব্যবহার করি। সেজদা হোটেলেই খায়। বারান্দায় একটা স্টোভ ও রেখেছে। মাঝে মাঝে ব্যবহার করে। দেখি ওই স্টোভের পাশে আলু কোটা। সেজদা বাজার থেকে এল। বলল—চম্পা, আমি পচা মাছ এনেছি, ইচ্ছে করেই। তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করো। প্লিজ, বউয়েরা যেমন ঝগড়া করে। মেয়েটা হি হি করে হাসছে। সেজদা ওকে জড়িয়ে ধরে বলছে— একটু মুখ করো চম্পা, একটু মুখ করো, আমি একটু সুখ করি।

দাদাদের সব বললাম। জানালাম এবার সুমিতাকে বাপের বাড়ি রেখে আসতে বাধ্য হব, সেটা ফ্যামিলির প্রেস্টিজের পক্ষে ভাল হবে না।

দাদারা একদিন সেজদার সঙ্গে বসল। আমিও ছিলাম। বড়দা বললেন, দ্যাখ সেজো, তুই আমাদের ফ্যামিলির প্রেস্টিজ ডুম করে দিচ্ছিস। বাইরের প্রস্ ঘরে ঢোকাচ্ছিস। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এসব বন্ধ কর।

সেজদা বলল, দ্যাখো বড়দা, তুমি পঁয়ত্রিশ বছর আগে বিয়ে করেছ। জীবনে মিনিমাম তিন হাজার বার করেছ। মেজদা, জানি তোমার ডায়বিটিস, তাও দু' হাজার বার করোনি কি? আর এই যে ছোট, সব সময়ই তো দরজা বন্ধ। আমি শালা জীবনে কিছুই পেলাম না, আর তোমরা আমায় এখন গীতা শোনাচ্ছ? যা করেছি বেশ করেছি।

এরপর থেকেই সেজদার সঙ্গে কারুর কথাবার্তা নেই। তবে সেজদাও আর নতুন করে প্রস্ আনেনি বাড়িতে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝেই রাত্রে ফেরে না। আগেও ফিরত না।

সেজদার বমির শব্দ আবার।

সুমিতা আমার চোখের দিকে তাকাল। আমি বললাম, দেখে আসি। সেজদার ঘরে ঢুকলাম কতদিন পর। টেবিলের ওপরে একটা লাল জবা শুকিয়ে এলিয়ে আছে। একটা সাদা কাগজ, পেনটা খোলা। শ্রীচরনেষু মা, ইতিপূর্বে তোমাকে... এটুকুই লেখা। মা? বারো বছর আগে স্বর্গে গেছেন। মায়ের একটা ছবি বিরাট বড় করে বাঁধিয়ে ছিল সেজদা। দেওয়ালে তাকালাম। ছবিটা রয়েছে। একটা প্ল্যাস্টিকের ফুলমালা। ছবিটার পায়ের কাছে সেজদার নিজের একটা ছবি সাঁটানো। ঘরের দেয়ালে ভূতের ছবি। তা ছাড়া কাঠকয়লায় লেখা, কুমু, তোমায় ভুলছি না ভুলব না। কুমু মানে কি সেজদার সেই বন্ধু কুমুদ দত্ত? নাকি ওই সব কুমুদিনী-টুমুদিনী। এই ধরনের লেখা তো শ্মশানে থাকে। সেজদার কাছে যাওয়াই মুশকিল। মেঝেতে বমি, চাদর-বালিশেও। আমি ওর কপালে হাত রাখি, অনেক দিন পর। চাপ দি। সেজদা চোখ খুলেই বন্ধ করে নেয়। খুব উইক হয়ে গেছে বমি-টমি করে। আমি ডাক্তার ডাকি।

ডাক্তার এসে জিজ্ঞাসা করল, ড্রিংক করেছিলেন? উত্তর নেই। তিন বার জিজ্ঞাসার পর সেজদার গলায় যে আওয়াজ বেরুল, তাতে আমি বুঝতে পারলাম সেজদা বলছে, ইয়েস। ভীষণ জড়ানো গলা। তার মানে এখনও নেশা রয়েছে, এত বমির পরও? আমি রেগে জিজ্ঞাসা করি ক'পেগ, অ্যাঁ? সেজদা ডান হাতটা একটু উঁচু করে পাঁচটা আঙুল দেখাল, এরপর বাঁ হাতটাও উঁচু করতে চেষ্টা করল, ওঠাতে পারল না। তখন ডান হাতটাই উঁচু করে পাঁচটা আঙুল দেখাল আবার। ডাক্তারবাবু বলল, বাঁ হাতটা নাড়ান তো দেখি, সেজদা পারল না। ডাক্তারবাবু কপাল কুঁচকোলেন। ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঠোকাঠুকি করলেন হাতে পায়ে। তারপর বললেন, বোধ হয় সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যান।

বড়দা-মেজদাকে ডাকি। অ্যাম্বুলেন্স ডাকি। অ্যাম্বুলেন্স এল। সেজদাকে ডাকি। সেজদার সাড়া

নেই। সেজদাকে ঠেলা মারি। সাড়া নেই। কানের সামনে মুখ নিয়ে বলি— সেজদা, আরও দু'পেগ খাবি? সাড়া নেই। তক্ষুনি মনে মনে দেয়ালে লিখে ফেলি সেজদা তোমায় ভুলব না। দেখি সেজদা নিশ্বাস নিচ্ছে। আমরা তিন ভাই ধরাধরি করে সেজদাকে স্ট্রেচারে তুলি। সেজদাকে স্ট্রেচারে তুলতে গিয়ে ওর বালিশ আর চাদর সরে যায়, বালিশের তলদেশ থেকে ফণা তোলে সেই হারিয়ে যাওয়া কাঁথাগুলি, আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়। সেই হাতি ছাপ কাঁথা। আমি বমি মাখা চাদর টেনে দিয়ে কাঁথাগুলিকে আড়ালে রাখি। সেজদা, তুই এই কাঁথাগুলি কেন চুরি করলি রে? কী লাভ তোর? সুমিতার মনে কষ্ট দিতে চেয়েছিলি?

অ্যাম্বুলেন্স-এ আমরা তিন ভাই। বড়দা একবার মেজদাকে জিজ্ঞাসা করল— সেজোর অ্যাকাউন্টটা কার সঙ্গে জয়েন্ট রে? মেজদা ঠোঁট উলটোল। আমি সেজদার দিকে চেয়ে থাকি। হা করা মুখ। একটা সামনের দাঁত পড়ে গেছে। কবে, কবে রে? সেজদা সামনের দাঁত দিয়ে দারুণ আখের চোকলা ছাড়াত। সেজদার চোখটা আধখোলা। আমি সেজদার চোখের দিকে চেয়ে হাসি মুখ করি। সেজদার চোখ নড়ে না, মুখ করে না। মুখ দিয়ে জোরে নিশ্বাস নিতে গিয়ে দুই ঠোঁট জোড়া লালার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। হাতটা ধরি। তোর হাত ধরে শিমুলতলার টিলা-জঙ্গলে ঘুরতাম। আংটিটা কোথায় গেল?

মা মারা যাবার পর মায়ের গয়নাগুলো ভাগাভাগি হয়েছিল আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে। ছ'টা কৌটোর মধ্যে গয়নাগুলো ভাগ করে রেখে লটারি হয়েছিল। সেজদার ভাগ্যে মুক্তার আংটি আর হিরের নাকছাবি উঠেছিল। অনেকটা সোনার মধ্যে বেশ বড়সড় মুক্তো, একটু নীলচে আভা। সেজদা ও-আংটিটা সবসময় পরে থাকত। আমি একবার বলেছিলাম রাত বিরেতে বাড়ি ফিরিস, আংটিটা না পরাই ভাল। সেজদা বলেছিল, তোকে জ্ঞান দিতে হবে না। সেজদার কি জ্ঞান আছে? বুকের কাছ কান নিয়ে সেজদার বুকের ধুকপুকি শোনার ইচ্ছে হল। সেজদার বুকে হাত রাখি। ধুকপুকি পাই। আমার আর সেজদার রক্ত একই গ্রুপের। বি-মাইনাস। আমার স্কুটার অ্যাক্সিডেন্টের সময় সেজদা রক্ত দিয়েছিল। সেজদাকে একবার বলেছিলাম—তোর রক্তের মধ্যে লাম্পট্য রয়েছে। সেজদা বলেছিল, আমার রক্ত তোর বডিতেও আছে, মনে রাখিস। আমিই দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, আই অ্যাম আনফর্চুনেট টু রিসিভ ব্লাড ফ্রম ইউ। তা ছাড়া তোর সেই রক্ত আর নেই। জেনে রাখ, হিমোগ্লোবিন একশো কুড়ি দিনে ভেঙে যায়।

সেজদা বলেছিল, কৃতজ্ঞতাটাও কি একশো কুড়ি দিনে ভেঙে যায় দেবু?

সেজদার হাত ধরি। হাতের কবজি। পাল্‌স পাচ্ছি না। আমি তোকে বড্ড অপছন্দ করি রে সেজদা, তবু চোখ জলে ভরে আসে কেন? হাসপাতাল কতদূর। কতদূর আর?

দুই

সেজদা বাড়ি ফিরছে। ওর বাঁ অঙ্গ পড়ে যাবে ভাবা হয়েছিল তা হয়নি। বাঁ হাতের মুঠোয় কিছু ধরতে না পারলেও একটু-আধটু নাড়াতে পারে। ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছিলেন ফিজিওথেরাপি করালে অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে। এখনও ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। যা কিছু আমাকেই তো করতে হবে।

সেজদা এখন গান গাইছে, মা আমার ঘুরাবি কত চোখ বাঁধা বলদের মতো। কিছুটা জড়ানো গলা, তবে মাল খেয়ে গলা জড়ানোর সঙ্গে এই অস্পষ্টতার কতটা তফাত। আজকাল কথা বলার সময় মুখ দিয়ে লালা গড়ায় সেজদার। হাসপাতাল থেকে ফিরে সেজদাকে যখন বিছানায় শোয়ালাম ফের, সেজদা আমার পিঠে হাত দিয়ে মুখের লালা সমেত বলল—ভাল ছেলের বাপ, ভাল থাক। তোর ছেলে যেন মেত্তুনজয় হয়। বোধহয় মৃত্যুঞ্জয় বলতে চেয়েছিল সেজদা। মৃত্যুঞ্জয়ী কোন মহাপুরুষ? নাকি অক্রুর দত্ত লেনের মৃত্যুঞ্জয় সাধুখাঁ? সরষের তেলের কারবার।

সকালে কাককে কচুরি খাওয়ায়। ওর জ্যাঠামশাইয়ের নামে দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা। বাইরের ঘরে জ্যাঠামশাইয়ের পাথরের মূর্তি। সেজদাও যে আমার ছেলের জ্যাঠামশাই...।

হাসপাতালে ভরতি হবার তিন দিন পর জ্ঞান এসেছিল সেজদার। তারপরেও দিন তিন-চার লোক চিনতে পারত না। যেদিন চিনতে পারল আমায়, জড়ানো গলায় বলেছিল, একটু কুমুকে খবর দে।

কে কুমু?

কুমকুম।

সে কোথায় থাকে?

অবিনাশ কবিরাজ লেন।

তখনও স্যালাইন চলছে।

তিন সপ্তাহ হাসপাতালে ছিল সেজদা। এর মধ্যে কম করে দশবার বলেছে, কুমুকে নিয়ে আয় একবারটি। ঠিকানাও দিয়েছিল। অসম্ভব। কী করে যাব ওখানে। শেষকালে সেজদা হাসপাতালের হাউসস্টাফকে নাকি একদিন বলেছিল সোনাগাছির দিকে যাতায়াত আছে ভাই? যদি যাও আমার একটা উপকার করবে? হাউসস্টাফটি আমাকে নালিশ করেছিল। সেজদার এই হাল দেখে শুধু ফ্যামিলি প্রেস্টিজ বাঁচাবার জন্য ওই কুমকুমকে খবর দেয়া করালাম। নিজে যাইনি। আমার এক বন্ধু আছে, অভয়, খুব ডেসপারেট। বিয়ের পর কনডোম কিনতে লজ্জা করত, ওকে নিয়ে কেনাতাম। ওকেই বললাম। ও বলল, নো প্রবলেম। একদিন হাসপাতালে এল ওই কুমু। কুমু কোথায়? এ তো চম্পা। সেজদা তো চম্পা বলেই ডাকত শুনেছি। সেই প্রায় বুড়ি, গালে মেচেতা। তবে চম্পা বুঝি আদরের ডাক?

সেজদার কপালে হাত বুলোল ওই কুমু কিংবা চম্পা। সেজদা বলল, এবার আমি সেরে যাব।

সেজদা গান গাইছে। বাড়িতে আজ ওই কুমু। সঙ্গে বোধ হয় কুমুর মেয়ে, বছর পঁচিশ বয়স হবে, আর বছরখানেকের একটি বাচ্চা। সকাল থেকেই নরক। খিস্তি, জোরে টেপ চালানো, স্টোভে রান্না সাঁতলানোর রসুন পিঁয়াজের গন্ধ...

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর একটা আয়া মতন রাখা হয়েছে। সেজদার রান্নাটাও করে দেয়। সুমিতা বাপের বাড়ি। বাচ্চাটার জন্যেই। বাচ্চাটাকে আদর করতে চাইত সেজদা, সুমিতা অ্যালাও করত না। ছেলেটাকে যখন তেল মাখিয়ে বারান্দার রোদ্দুরে রাখত, সেজদা নাকি জুলজুল করে দেখত—সুমিতা বলেছে। হাসপাতালেও সেজদা বলত, পুচকুটাকে একবারটি একটু কোলে করে নিয়ে আয়। একটু দেখব।

বউকে এসব বলিনি। বউকে ওই কাঁথার কথাও বলিনি। ওই হাতিছাপ কাঁথা। ওই কাঁথা নিয়ে কোনও কথা সেজদাকেও বলিনি, আর একটু সুস্থ হোক, চার্জ করব। কাঁথা ক'টা ফিরিয়েও আনিনি আমি। সেজদার বিছানায় থাকা কাঁথাগুলি সুমিতা কিছুতেই ইউজ করত না।

সেজদা গান গাইছে। এখন শ্যামাসংগীত নয়। জিন্দেগী এক সফর হ্যায় সুহানা... সেজদার সঙ্গে গাইছে ওই বুড়িকুমু, ওর মেয়েটাও। আজ আয়াটা নেই, বোধ হয় ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ওরা সব বারান্দায়। সেজদাও। সেজদা একটু-আধটু হাঁটতে পারে এখন। ফিজিওথেরাপি করালে আর একটু ভাল পারত নিশ্চই, করানো হয়নি। বাঁ হাতটা এখনও ভাল ভাবে নাড়াতে পারে না। একটা ফিজিওথেরাপিস্ট খোঁজ করতে হবে। গানটা কিন্তু ভালই গাইছে মেয়েটা। একটু উঁকি মারি। মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়। ওর নাকে ওটা কী? নাকছাবিটা কীসের? হিরের না? আমার মায়েরটা না? বারান্দায় যাই। মেয়েটা গাইছে, আলোর কণা ঠিকরে পড়ছে মেয়েটার নাক থেকে। মায়েরটাই তো। সেজদা বুঝি মায়ের ওই গয়নাটা ওকে দিয়ে দিয়েছে। ছিঃ। আমি সেজদার দিকে কটমট করে তাকাই। সেজদা চোখ বুজে থাকে। ডান হাত দিয়ে ওর ডান হাঁটুতে তাল দিচ্ছে— হাসতে হাসতে

জাঁহাসে গুজর। দুনিয়াকে তু পরোয়া না কর... সেজদা বলল, চুমকি মা, তুমি এবার একা একটা গান গাও। ওই মেয়েছেলেটার নাম বুঝি চুমকি? চুলে রিবন, কোলে বাচ্চা। ওই চুমকি বলল, ন-না—না, যেমন হচ্চে তেমন এক সঙ্গেই হোক। সেজদা বলল, আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল গা, গা নারে মেয়ে। চুমকি শুরু করল, বোল রাধা বোল...

ধুর থাকব না বাড়িতে। আজ দরজা এঁটেছিলাম, আর থাকা যাবে না, বড়দা-মেজদাদের তো এসব পোয়াতে হচ্ছে না, আমাকে দিয়েছে বাঁশ। সেরিব্রাল স্ট্রোকেও... ছিঃ বলতে নেই। নীচের তলায় বড়দার কাছে যাই। বলি, মায়ের স্মৃতিমাখা ওই হিরের নাকছাবিটার কথা। বড়দা মেজদাকেও ডাকল। আলোচনা হল। মেজবউদি তো বলেই ফেলল— অত যত্ন করে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রতিফল পাচ্ছ তো...। আমি বললাম, এই দুঃখেই ফিজিওথেরাপি করাচ্ছি না বউদি...। বড়বউদি বলল, দরকার নেই, একে তো নাচনি, তার উপরে ঢাকের বাড়ি আর নাইবা পড়ল। গুড় খেয়ে তোমার সেজদা পাটালি হাগে। আমরা মিটিং করে ঠিক করলাম, শত হোক, ভাই। ফেলে তো দিতে পারব না, সবাই মিলে টাকা দিয়ে, ছাতে একটা ঘর করে দিয়ে ওকে ওখানে চালান করে দেব। তিন তলাটায় আমিই পুরোটা থাকব। আমরা ভায়েরা পালা করে টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত পাঠিয়ে দেব। বাঁ অঙ্গ যেমন পড়ে গেছে, তেমনি থাক, পুরো ঠিকঠাক হয়ে গেলে আবার পেয়ে বসবে। মানে, গুড় খেয়ে পাটালি হাগবে। আর বাইরের মেয়েছেলে একদম ঢুকতে দেওয়া হবে না। মেজোবউদি বলল, নাকছাবিটা আমার কাছেই বেচতে পারত, ঘরের জিনিস ঘরেই থাকত। আমার নাকে ওটা দারুণ মানায়। একদিন পরেছিলাম, মা বেঁচে থাকতে। বড়বউদি বলল, যা না, ওই মাগীটার কাছ থেকে কিনে নে না। মেজবউদি বলল, পোবিত্তি হয় না।

বড়দার ঘরে খাওয়া দাওয়া করে বেলা তিনটে নাগাদ উপরে উঠেছি, একটু শোব। দেখি ক্যাওস্। সেজদার ঘরের জানালার সামনে চ্যাঁচামিচি। ওই চম্পাবুড়ি, আর ওর মেয়ে, যার নাকে আমার মায়ের নাকছাবি, দু'জনেই চ্যাঁচাচ্ছে, দরজা খোলো, খোলো বলছি, হারামির পো, বলছি খোলো... আর সব খিস্তি। আমায় দেখে ওই চুমকি বলল, দ্যাখো দ্যাখো, তোমার দাদা আমার ছেলেটাকে নিয়ে কী করচে। আমি জানালা দিয়ে দেখি সেজদা একটা গ্লিসারিন সাপোজিটার বাচ্চাটার পায়ুদেশে ঢোকাচ্ছে। প্যারালিসিস হয়ে যাওয়া বাঁ হাত দিয়ে গ্লিসারিন স্টিকটা বাচ্চাটার পিছনে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। পারছে না, পিছলে যাচ্ছে। দরজার ছিটকিনি বন্ধ। দেয়ালে ভূতের ছবি। আমি চেঁচিয়ে বলি—এসব কী পাগলামি হচ্ছে সেজদা, দরজা খোল। সেজদা শুধু আমার দিকে একটু নির্বিকার তাকাল। কিচ্ছু বলল না। গ্লিসারিন স্টিকটা ঢোকাবার চেষ্টা করতেই থাকল। শেষ পর্যন্ত গ্লিসারিন স্টিকটা চালান করে দিল ভিতরে। তারপর বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল—আমার বুকে হেগে দে সোনামণি। আমার গায়ে হেগে দে।

আমি ওই মেয়েছেলেগুলোকে বললাম, ব্যাপারটা কী? চুমকি বলল, বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। খাটে শুইয়ে দিয়ে বারান্দায় বসে পান সিগারেট খাচ্ছিলুম, হঠাৎ বাতাবিবাবু ঘরে ঢুকে ছিটকিনি বন্ধ করে দিল। তারপর দেখুন এইসব করছে!

মেজদার নাম বাতাবিবাবু? কত কী জানি না। কিন্তু গ্লিসারিন স্টিক ঢোকাচ্ছে কেন? গ্লিসারিন স্টিক সেজদার লাগে। ওর কনস্টিপেশন আছে।

বাচ্চাটা চ্যাঁচাচ্ছে। মেয়েছেলে দুটোও। আমি বলি, ভাল হচ্ছে না সেজদা, দরজা খুলে দে। সেজদা পাত্তাই দিচ্ছে না। লালাময় মুখে বলছে, গোপাল আমার, কলজে আমার, ফুসফুস আমার, অক্সিজেন আমার, হেগে দে সোনা, আমার সারা গায়ে হেগে দে।

বাচ্চাটা সশব্দে পায়খানা করে সেজদার বুকে। সেজদার মুখে ফোটে পদ্মফুল।

সেজদা বাচ্চাটাকে বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়িয়ে হলদে রং-এর অর্ধতরল ওই পদার্থের দিকে কেমন আনন্দে তাকাল। তারপর বালিশের তলা থেকে বার করে নিল হাতিছাপ কাঁথা। সেই কাঁথা।

যে কাঁথায় প্রয়াগ স্নান করা সন্ন্যাসীর মতো গা মুছল সেজদা। ছিটকিনি খুলল ডান হাতে, বাঁ হাতটা অসহায় ঝুলছে।

ওরা চলে গেল। বিকেল নেমেছে। ইলেকট্রোপ্লেটিং কারখানার অ্যাসিডের গন্ধ মেখে দখিনা বাতাস অক্রুর দত্ত লেন-এ ঢুকে পড়েছে। আইসক্রিমওলা বেরিয়ে পড়েছে। সেজদা গান গাইছে।

সেজদা গান গাইছে বাথরুমে। মনরে কৃষি কাজ জানো না। বাথরুমে জলের শব্দ। দরজা খোলা। সেজদা মলমাখা হাতিছাপ কাঁথা জলকাচা করছে। ধরছে দু'হাতে। বাঁ হাতেও। আশ্চর্য, থুপথুপ। থুপথুপ। জলের শব্দ। থুপথুপ। জলের ছিটে। থুপথুপ। হাতিছাপ। থুপথুপ। কাঁথার থেকে বেরিয়ে আসছে গান। সেজদা গান গাইছে।

শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৯৯৮

ডলার

বাসু আর আমি একসঙ্গে পড়তাম বিরাটি মহাজাতি নগর ইস্কুলে। আমি যখন ক্লাস ফাইভে, বাসু সিক্স-এ। পরের বছর বাসু সিক্স-এই থেকে গেল বলে আমরা সহপাঠী হলাম। ক্লাস সেভেনে ও আবার রয়ে গেল। ক্লাস সেভেনে মনে আছে, তারাপদবাবু স্যার ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে সিন্ধুসভ্যতা পড়ালেন। নগর নির্মাণ, বৈদেশিক বাণিজ্য, সিলমোহর, শিল্প সামগ্রী, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার—সব পড়ানো হয়ে গেলে তারাপদবাবু বললেন, এবার বলো কার মনে কী প্রশ্ন আছে। বাসু উঠে দাঁড়াল। বলল, স্যার, কিছুদিন আগেই যে বললেন, আগেকার যুগের মানুষেরা খুব নোংরা ছিল, কাঁচা কাঁচা মাংস খেত, ওরা আবার স্নানও করত? সাবান মেখে স্নান করত স্যার? ওই স্নানাগারের জল সাবান-সাবান হয়ে যেত? তারাপদবাবু প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ হাঁ করে ছিলেন। বোধহয় ভাবছিলেন—এই পঁয়চাল্লিশটা মিনিট ধরে কী করলাম আমি? তারপর লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওই স্নানাগারের কথা মনে হয় এই পুকুরে স্নান করতে করতে। বিরাটির মহাজাতি নগর কলোনির ভিতরের এই পুকুরটাকে আমি বলি পদ্মপুকুর। এখন যদিও পদ্মটদ্ম নেই, কচুরিপানা আছে কিছু, আমরা এই পুকুরেই স্নান করি ফাঁক পেলেই। ছোটবেলায় রোজই করতাম, আমাদের বাড়িতে টিউকল আছে, মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাপওয়াটারও আছে, তবুও পুকুরের নেশাটা ছাড়তে পারিনি। রবিবার দিনটায় পুকুরে আসা চাই। বেলা বারোটা নাগাদ স্নান করতে আসি, আর বাসুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। স্নান করতে আসবার সময় বাসুর কাছে একটা বালতি থাকে। ওই বালতিতে থাকে কাপড়চোপড়। বাসু পুকুরের সিঁড়িতে থুপিয়ে থুপিয়ে জামাকাপড় কাচে। যেগুলো কাচে তার একটাও ওর নয়। সব ভাল ভাল জামা-প্যান্ট। দামি। বাসু নিজে ফুলপ্যান্ট পরে না। পাজামা আর গেঞ্জিতেই দেখা যায় ওকে, মাঝে মাঝে হাওয়াইশার্ট। বাসু জামাপ্যান্ট কাচতে কাচতে রিলে করে—এটা বড়দার প্যান্ট। টেরিকটন। গোয়ালিয়র। দুটো প্লেট। এটা মেজদার। জিন্স। নিউপোর্ট। বহুত নোংরা করেছে। শালা, আগে দিতে পারোনি? এটা ছোটভাইয়ের। সাদা জামা সাদা প্যান্ট। এয়ারপোর্টের চাকরি। হেভি ফাট, লাটের বাট, উইলস ফোঁকে, গগলস চোখে।

বাসুর ছোটভাইটা এয়ারপোর্টের পোর্টার। মালপত্র টানাটানি করে। ফরেনারদের কাছ থেকে টিপস পায়। বাসু জামাপ্যান্ট কাচার আগে একটু পকেট-টকেট দেখে নেয়। কখনও পেয়ে যায় সিগারেটের প্যাকেট, তাতে একটা-দুটো সিগারেট অবশিষ্ট, কখনও পেয়ে যায় একটা আধুলি কিংবা এক টাকা দু'টাকার কয়েন। পেয়ে গেলেই গান গায়। ওলে ওলে, কিংবা মেহবুবা মেহবুবা। একদিন পেয়েছিল একটা কনডোম। ওটা ছিল ওর সেজদার। বাসুর সেজদা গাড়ির ড্রাইভার। আমি বললাম, কীরে বাসু? কী ব্যাপার? বাসু নির্বিকার। ও মোড়কটা ছিঁড়ে জল ভরতে লাগল। আমরা ক'জন পুকুরে ছিলাম। আমরা কয়েকজন বন্ধু। আমরা স্নান করি, টুকটাক গেঞ্জি জাঙিয়া কাচি আর গল্পগুজব করি। আমরা ঘাটে থাকলে মেয়েরা আসে না। প্রসূন বললে, কীরে বাসু, তোর সেজদা তো বিয়ে করেনি, পকেটে এসব কেন? বাসু ওতে জল ভরে গিঁট দিল। বাদল বলল, তুই জলই ভরে যা, দাদারা আসল জিনিস ভরুক। বাসু হঠাৎই এক হাতে জল ভরা কনডোম নিয়ে কেমন উদাস দার্শনিক হয়ে যায়। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে, সেজদা সেজদা, আমি ভাবছি তুই কবে ব্রেক ফেল করে দিবি তখন আমাদের ফ্যামিলিতে কেলো হয়ে যাবে। হে পুলিশ, তুমি ঠিক মতো

সিগন্যাল দিয়ো। তারপরই আবার বালতিতে হাত ঢোকাল। কে পুলিশ, আকাশে? ভগবান?

একদিন আমরা স্নান করতে এসেছি, প্রদীপ, বাদল, প্রসূন সবাই আছে ঘাটে, বাসু কাপড়জামা কাচছে, আর রিলে করছে। এই যে শালা মেজদার প্যান্ট, সিংগেল পকেট, সাইড পকেট, বিস্কুট কালার, ছোপছোপ দাগ, ভাল কামায়, তবু শালা মাক্ষীচুষ। পায়ের কাছটায় ফাটা, তবু শালা বলবে বাসুই ফাটিয়েছে। এবার বেশি যদি ডিংনেয়, এইসা দেব না, পাছা ফাটিয়ে দেব। আমার নাম বাসু—বলতে বলতে প্যান্টের পা ধরে পাছার দিকটা শানে আছড়াচ্ছে।

প্রদীপ বলল, এত আছাড় মারছিস কেন রে বাসু, ফেঁসে যাবে তো! বাসু বলল—মেজদাকে কেমন প্যাঁদাচ্ছি দেখ না। তারপর বাসু প্যান্টটাকে খুব চিপল, চিপবার সময় প্যান্টকে পাক খাওয়াতে হয়। বসু দাঁতে ঠোঁট চেপে প্যান্টটাকে পাক খাওয়ানোর সময় বলছিল, দেখে লে, হিম্মত আছে, মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। তারপর আর একটা বালতিতে ছুড়ে দিয়ে বলল—ফোট বে।

এর পরেরটা ছোটভাইয়ের। সাদা প্যান্ট। পকেটে হাত ঢুকিয়েই বাসুর মুখে হাসি। পকেট থেকে বার করে আনল হাত, ভাঁজকরা জিনিসটা ওর হাতের মুঠোয়। বলল—মার দিয়া। মুঠোটা খুলল। কাগজটা দেখে মন খারাপ হয়ে হেল বাসুর। যা শালা, এটা তো টাকা নয়...! বাসুর কাছ থেকে ওটা চেয়ে নিয়ে আমি দেখি। আমি বলি, টাকা নয়, টাকার বাপ। ডলার। এটা একটা দশ ডলারের নোট।

ওমনি প্রদীপ, বাদল সবাই বলে উঠল, দেখি দেখি...! লোভীর মতো সবাই দেখতে লাগল ডলারটা। বাদল ওটাতে হাত বুলোল । প্রদীপ বলল, বাসু, তুই বড়লোক হয়ে গেলি রে। দশ ডলারের দাম কত জানিস? বাসু জানে না । চেয়ে আছে। আমি বলি, চারশো বিশ। চারশো বিশ শুনে বাসু হাসে। ভাবে কোনও মজা । বাদল বললে—এটা আমায় দিয়ে দে বাসু, তোকে তিনশো টাকা দেব। প্রসূন বলল—মারে বাসু, এর এখন দাম চারশো কুড়ি কি পঁচিশ টাকা। তিনশো টাকায় দিতে যাবি কেন। না রে বাদল, বাসুকে ঠকাস না। বাদল বলল—বাসু যেখানে ভাঙাতে যাবে তারাই ঠকিয়ে দেবে, তারচে, আমিই যদি...

প্রসূন বলল, বাঃ! কী সুন্দর যুক্তি! প্রসূন বলল—আমায় দিস বাসু, আমি তো ব্যাংকে কাজ করি, তোকে ভাঙিয়ে দেব, তোকে কোথাও যেতে হবে না। তার আগে ঠিক করতে হবে তোকে, ডলারটা কি তোর ছোটভাইকেই ফেরত দিবি? এটা তো ওরই পকেটে পেয়েছিস।

বাসুর কপালে রেখা ফুটল। যেন চিন্তায় পড়ল হঠাৎ। ও যখন এক টাকা-দু' টাকা পায়,কী খুশি। চারশো কুড়ি শুনে ও ততটা আনন্দিত হচ্ছে না যেন। ও বোধ হয় অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই বলল—হেবি চিন্তার ব্যাপার হয়ে গেল। বাসু ডলারটা অন্য একটা কাগজে মুড়ে পা-জামার গোঁজে ভরে রাখল। ওর স্যান্ডো গেঞ্জির কলার নেই, নইলে এইসময় ও কলার ওঠাত। বাসুর আবার কাজে মন। হলই বা দশ ডলারের মালিক, কাজ তো করতেই হবে।

বাসুর ওই ছোটভাই এয়ারপোর্টের পোর্টার হবার সুবাদে বিদেশিদের কাছ থেকে বকশিশ পায়। কোনও সাহেব পকেটে খুচরো না থাকায় একটা দশ ডলারই দিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য দশ ডলার ওদের কাছে তেমন কিছু নয়। কিন্তু বাসু ওই অজানা সাহেবকে ভগবান ভাবছে।

বাসু এর পর থেকে কাপড় কাচার সময় ছোটভাইয়ের দামি প্যান্টটা খুব ভাল করে দেখে নিত, যদি আর একটা ডলার পাওয়া যায়।

আমরা মাঝে মাঝে বলতাম, কী রে বাসু, ডলারটা ভাঙালি? বাসু বলল—না, রয়েছে।

ভাঙাসনি কেন?

টাকার দাম দিনের দিন কমছে, ডলারের দাম দিনের দিন বাড়ছে।

কে বলল তোকে?

ছোড়দা ওর বন্ধুকে বলছিল, আমি শুনে ফেলেছি।

কী বলছিল?

বলছিল ওর অনেক ডলার জমে গেছে, তখন ওর বন্ধু বলেছিল, এখন হার্গিস ভাঙাস না। টাকার দাম কমছে।

বাসু ডলারের মালিক হলেও ওর জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্তন হয়নি। একইভাবে জ্যামাপ্যান্ট কাচে, একইভাবে রিলে করতে থাকে। তবে আজকাল রিলের ফাঁকে ফাঁকে বলে, এবার এইসান একখানা ড্রেস বানাব না, সব দাদারা হাঁ করে চেয়ে থাকবে। ঘিয়ে জামা, কালো প্যান্ট, ডবল পকেট, পকেটে কভার, কভারে বোতাম। যা দেখাবে না আমায়, হেভি, মডার্ন টেলার্স-এর পঞ্চাকে দিয়ে বানাব। এ ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন নেই। ওর ছোটভাই, যে আজকাল ডলার কামাচ্ছে, তারও দেখা যাচ্ছে পায়ের স্টেপিং চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে ও বিভূতিস্যারের সামনে বা উকিলবাবুর সামনে সিগারেট খেত না, আজকাল ওসব পরোয়া করে না। আর সব চে' চেঞ্জ হয়েছে আমাদের দামুদার। দামুদা ওর বাড়ির সামনে পেতলের নেমপ্লেট লাগিয়েছে—দামোদর গুছাইত, এক্সপোর্টার। মারুতি কিনেছে, পিছনের কাচে আলো চিড়িকবিরিক করে। কোল্ড ড্রিংক্স আর আইসক্রিম খেয়ে খেয়ে ওর ছেলেমেয়ের প্রায়ই গলাব্যথা হয়। ওর বউ আজকাল চার্নক সিটিতে বাজার করতে যায়। ও বিদেশে পাঠায় শুকনো ঝাউপাতা, অশ্বত্থপাতা, কুরচি ফল, কাশফুল এইসব। এসব দিয়ে নাকি ইনটেরিয়ার ডেকরেশন হয়। ও মাঝেমধ্যে মদটদ খেলে, জোরে-জোরেই বলে, কমুক, টাকার দাম আরও কমে যাক। ডলারের দর বাড়ার প্রতীক্ষায় থাকে। বাসুও কি তাই? বাসুও কি ডলারের আরও দাম বাড়ার প্রতীক্ষায় আছে? নইলে ওটা ভাঙিয়ে নিচ্ছে না কেন? আমরা তো দেখছি ওর জামাপ্যান্টের কী অভাব!

একদিন দেখি বাসু চুপচাপ বসে আছে রেল স্টেশনে। সেই নোংরা পাজামা, গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি। আমি ওর পিঠে হাত দি, বলি কী করছিস রে বাসু, এখানে একা একা? বাসু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর গেঞ্জিটা উঠিয়ে নিয়ে চোখে ছোঁয়াল। বুঝলাম দুঃখ হয়েছে। বললাম, কী রে, তোর ডলারটা হারিয়ে গেল নাকি? আমি তো জানি, বাসুর ইদানীংকার সব সুখস্বপ্ন ওই ডলারটাকে ঘিরে। বাসু ডলারের কোনও প্রসঙ্গ না তুলেই বলল—আমায় কেউ ভালবাসে না। আমি বললাম—কেন, আমরা তো বাসি। আমি? ও বলল, তোমরা তো আমায় মুরগি করো। আমি জানি, আমায় নিয়ে মজা করো। হঠাৎ অবাক হয়ে যাই আমি। এই বোধ ওর এল কোত্থেকে? আমি বলি, কে বলেছে তোকে নিয়ে আমরা মজা করি? বাসু বলল, পার্বতী বলেছে—পার্বতী। আমি বলি, পার্বতী কে? বাসু একটু ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, পার্বতীকে চিনিস না? আমাদের বাড়িতে থাকে, কাজ করে, আমার সেজদা ওর জন্যই তো ক্যাপ কেনে। মনে নেই, একদিন পকেটে পেয়ে গেছিলাম...।

ও চুপ করল। আমিও। এরপর কী কথা বলি? মাইকে ঘোষণা করল ডাউন ট্রেন চল্লিশ মিনিট লেট। স্টেশনে তো থাকতেই হবে, উপায় নেই।

বাসু বলল, লাইফটা মাইরি এক্কেবারে ভিততাল হয়ে গেল। একদিন শালা সুইসাইড করব, আর চিঠিতে লিখে যাব আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী...

কে দায়ী?

সব্বাই।

সব্বাই মানে? আমিও?

না, তুই কেন দায়ী হতে যাবি?

তবে যে বললি সবাই—

সবাই মানে আমাদের বাড়ির সবাই। ফ্যামিলির। এইস্যা একখানা চিঠি লিখে যাব না...

তোর কী দুঃখ রে বাসু?

বাসু হঠাৎই গলাটা একটু উঁচিয়ে বলতে লাগল—আমায় মাইরি সবাই যা ভাগ যা ভাগ করে। আজ বড়দার ঘরে লোকজন এল, মিষ্টি এনে দিতেই বাড়ি থেকে বার করে দিল আমাকে। মেজদাও বহুত হারামি। আমাকে মাছ দেয় না। আমার হপ্তায় চার দিন বড়দার ঘরে আর তিন দিন মেজদার

ঘরে খাবার কথা। মেজদা হল এক নম্বরের মক্ষীচুষ। এমনিতেই হপ্তায় এক দিন কম, তা বাদে ওর ঘরে খাবার পালা থাকলেই মেজদা ফ্যামিলি নিয়ে ফুটে যায়। শ্বশুরবাড়ি যায়, কিংবা হোটেলে খায়। আমি তখন বড়দার ঘরে খেতে যাই, বড়বউদি বলে—আজকে তো আমাদের নয়। আমি বলি, মেজদারা তো সব ফুটে গেছে। বউদি তখন একটা-দুটো রুটি তবু দিত, কাল দেয়নি। চুমমেরে বসে ছিলাম, তখন পার্বতী সব্বাইকে লুকিয়ে একবাটি ডাল ভাত কচুবনে রেখে এসে আমাকে বলেছিল—তাড়াতাড়ি যাও, কাক এসে পড়বে। ওই পার্বতী, আমার কেউ নয়, খেতে দিল, অথচ মায়ের পেটের ভাইরা সব বেইমানি করছে। আমি শালা সব পুড়িয়ে দেব। পুরো সংসার জ্বালিয়ে দেব। তারপর আমি নিজে পুড়ে মরব, নইলে পুলিশ আমাকে ধরে খুব প্যাঁদাবে। জ্বালিয়ে দেব শালা, একটি একটু করে পেট্রোল জমাচ্ছি, কাউকে বলিস না।

পেট্রোল জমাচ্ছিস?

জমাচ্ছি তো!

কোত্থেকে পেট্রোল জমাচ্ছিস?

সেজদার ঝাড়া মাল আমি ঝাড়ছি।

বাসু ব্যাপারটা আর একটু ব্যাখ্যা করলে আমি বুঝতে পারলাম যে বাসুর যে দাদা গাড়ি চালায়, মানে সেজদা, সে অনেক সময় গাড়িটা বাড়িতে নিয়ে আসে খাবার সময়। আসলে গাড়িটা তো ওর নয়, জেসপ কোম্পানির গাড়ি। আবার জেসপ কোম্পানির নিজস্ব গাড়িও নয়। জেসপ কোম্পানিতে গাড়ি ভাড়া খাটায় কমরেড বিকাশ সাহা, বাসুর সেজদা সেই গাড়িটাই চালায়। তেল খরচ কোম্পানির। মাইনেটা দেয় বিকাশ সাহা। বাড়িতে যখন গাড়িটা নিয়ে আসে, দুপুরের খাবার সময়, বাসুর সেজদা পেট্রোলের ট্যাংকিতে রবারের পাইপ ঢুকিয়ে টেনে কিছুটা তেল বার করে একটা পলিথিনে জমা করে। জাকিকেন ফুল হয়ে গেলে বেচে দেয়। পেট্রোলের দাম বাড়লে সেজদার খুব ভাল লাগে। খুব খুশি হয়। যেদিন কাগজে ছাপে পেট্রোলের দাম বাড়ল, সেদিন লাড্ডু নিয়ে আসে। আর বাসু একটা ছোট জারিকেনজোগাড় করেছে। সেজদার বড় জারিকেন থেকে বাসু পেট্রোল ঝেড়ে ছোট জারিকেনে জমা করে।

মাইরি, একদিন দেখে নিস, খবরকাগজে আমার নাম বেরোবে—পুরো দত্তবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে বাসুর আত্মহত্যা। আমার মাইরি একটাও ভাল ছবি নেই। কাগজে তো ছবিও ছাপায়। একটা ছবি ভাল করে উঠিয়ে রাখব নাকি স্টুডিওতে গিয়ে? আমি বলি, সেই ছবি রাখবি কোথায়? পুরো বাড়িটা তো পুড়ে যাবে, ছবিটাও। বাসু তখন বলে, ছবিটা যদি তোদের কারুর কাছে রেখে যাই?

আমি বলি, বাসু , বাড়িটা পুড়িয়ে দেবার আগে ডলারটা ভাঙা, আমাদের খাইয়ে দিয়ে যা...

বাসু বলে, তুই ভাবছিস বাসু ইয়ার্কি করছে। হার্গিস নয় আমার পাঁচ লিটারের জারিকেন প্রায় ভরে এসেছে। ওটা দিয়ে পুরো বাড়ি পুড়িয়ে দিতে পারি। কেন পোড়াচ্ছি না, জানিস! কাউকে বলিস না, পার্বতী দেশে গেলে তবে বাড়িটা পোড়াব। নইলে যে পার্বতীও পুড়ে যাবে। ও বেচারী কী দোষ করেছে বল...।

ট্রেন এসে গেল। আমি উঠে পড়ি।

এরপর আমাকে একটা ট্রেনিং-এর জন্য অফিস দিল্লি পাঠায়। তিন মাসের ট্রেনিং শেষ করে আমি ফিরে আসি। দমদম লীলা সিনেমা হলের সামনে বাসুর সঙ্গে দেখা। বাসুর পরনে স্বপ্নের পোশাক। ঘিয়ে জামা, কালো প্যান্ট, ডবল পকেট, পকেটে কভার, কভারে বোতাম। দু'হাত দু'পকেটে পুরে হিরো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাসু।

আমি বাসুকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ি। বলি, কীরে বাসু, ডলারটা ভাঙালি বুঝি?

হ্যাঁগো, ভাঙিয়ে ফেললাম।

তারপর জামাপ্যান্ট বানালি? কত পড়ল?

এ জামাপ্যান্ট ডলারের নয়। সেজদা দিল।

সেজদা মানে ড্রাইভার দাদা?

ইয়েস।

ও বুঝেছি, সেজদা দিল মানে সেজদার ঝাড়া পেট্রোল ঝেড়ে দিয়েছিস বুঝি?

নো।

তবে?

সেজদার ঝাড়া মাল থেকে আমি ঝাড়তাম, আমার ঝাড়া মাল ঝাড়তে এসেছিল পার্বতী। আমি জারিকেনটা রাখতাম আমাদের ছাগলের ঘরটায়। আমার মা ছাগল পুষত না, সেই ঘরটা এখনও আছে। আমি রাত্তিরবেলায় ছাতে বসে বসে বিড়ি খাচ্ছি আর এরোপ্লেন দেখছি, এমন সময় শুনি খড়খড় শব্দ। পাতা মাড়ানোর আওয়াজ। দেখি একজন আমগাছটার তলা দিয়ে ছাগলের ঘরে যাচ্ছে। আমি তো সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। এক্কেবারে হাতেনাতে ধরে ফেললাম পার্বতীকে।

সে কী রে? চোরের উপর বাটপাড়ি? পার্বতী আবার পেট্রোল ঝাড়তে গেল কেন?

নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেবে বলে। আমি বললাম—এ কী করছিস পার্বতী, বোকা কোথাকার, এত দামি পেট্রোল, দিন কে দিন দাম বাড়ছে, এসব নষ্ট করতে আছে? তখন পার্বতী কেঁদে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল—আমি পেগন্যান্ট হয়ে গেছি...।

কে করল, তুই?

এক চড় মারব। বাসু খুব রেগে গিয়ে আমায় বলল, সেজদার কাজ। সেজদা।

তারপর?

তারপর আমি স্ট্রেট সেজদাকে বললাম ওই রাত্তিরে। সেজদা আমাকে থাবড়া মারল। আমি বললাম, বলেই ফেললাম ওর প্যান্টের পকেটে কী পেয়েছিলাম। তা বাদে আমি ছাগলের ঘরে দু'দিন কী দেখেছিলাম। তারপর বড়দা মেজদা বলল, বাসু ফ্যামিলির প্রেস্টিজ বাঁচিয়েছে। যদি মেয়েটা কিছু করে বসত, সবাইকেই পুলিশে ধরত। বড়দা বলল, বাসু, তুই খুব ভাল কাজ করেছিস। কী চাস বল? আমি বললাম, কালো প্যান্ট, ঘিয়ে জামা, ডবল পকেট, পকেটে কভার, কভারে বোতাম...। সেজদাই কিনে দিল।

তারপর বাসু পকেটের কভার উঠিয়ে দুটো সিনেমার টিকিট বার করল। দিল তো পাগল হ্যায়। আমি আর পার্বতী। আমি বললাম , পার্বতী কই? বসু বলল, ওয়েট করছি। ও তো এখন আর আমাদের বাড়িতে নেই, অন্য বাড়িতে। ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আর ডলারটা?

ডলারের দামটা আরও বাড়ত, কিন্তু ধরে রাখা গেল না, ভৌমিক ডাক্তারের মাতৃমঙ্গল নার্সিংহোমে ওটা কাজে লেগে গেল। হা হা।

কথাসাহিত্য, ১৯৯৮

মানুষ রতন

রতন ধুতি পরে । ধুতিই পরে। ধুতি পরেই অফিসে যায়। রতনের সহকর্মীরা কেউ আজকাল আর ধুতি পরে না। রতনের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিয়ে, বিজয়া ছাড়া ধুতি পরে না কেউ, শুধু সাহিত্যের অধ্যাপক তারাশংকর ছাড়া। রতন ধুতির সঙ্গে ফুলশার্ট পরে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যেমন পরতেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এখনও এরকম পরেন। পাড়ায় যে-সমস্ত নতুন টেলারিং শপ হয়েছে, যেমন টিপটপ, লাভলি লুক এসব জায়গার চ্যাংড়া টেলাররা রতনের শার্ট বানাতে পারে না। ফলে প্রিয় টেলারিং-এর বাহান্ন বছর বয়সি প্রিয়নাথ সাহার কাছেই যেতে হয়। প্রিয়নাথও ধুতি পরে।

কাপড়টা কেমন প্রিয়নাথবাবু? গরমে আরাম হবে তো?

ফাস ক্লাস কাপড় স্যার। কত করে নিয়েছে?

জানি না। গিন্নি কিনেছে। ভিতরে পকেট বানাবেন।

সমস্ত জামায় ভিতরের পকেট বানায় রতন। ভিতরের পকেটে রাখা হয় না কিছুই। ভিতরের পকেটটা এমনি এমনি তৈরি করায়, অভ্যাসবশত।

হাফ শার্ট, না ফুল শার্ট স্যার?

ফুল। না কি হাফ করে দেবেন? পুরুলিয়া যাব তো, খুব গরম ওখানে।

পুরুলিয়া স্যার? খুব গরম। জল পায় না । হাহাকার। ওখানে কোনও ইনসপেকশন বুঝি?

না, ছেলেকে নিয়ে যেতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের ইন্টারভিউ। রিটিন পরীক্ষায় পাশ করেছে ছেলে। ন'হাজার পরীক্ষা দিয়েছিল, দুশো ছেলেকে ইন্টারভিউতে ডেকেছে। এই বাক্যটা বলতে বেশ ভাল লাগে রতনের।

পুরুলিয়ায় দেবেন? একমাত্র ছেলেকে আপনার। থাকতে পারবেন?

এই কথাটা শুনতেই হয়। শুনলেই মন খারাপ হয়ে যায়। তা ছাড়া প্রিয়নাথ এইমাত্র আর একটা কথা বলেছে। জল পায় না, হাহাকার। হাহাকার শব্দটা মনের ভিতরে কেমন যেন একটা দুঃখ তৈরি করে দেয়। হাহাকার মানে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা নিশ্চুপ ব্যাট, আঠা খুলে ঝুলে থাকা কপিলদেবের পোস্টারটা, ভাঁজ করা ছোট্ট টেবিলটা, বাঁটুল দি গ্রেট আর হাঁদাভোদার পাতা উলটে দিচ্ছে শুধু হাওয়া।

স্যার, একটু ঘুরে দাঁড়ান, ছাতিটা নি।

আজ বড্ড স্যার স্যার করছে প্রিয়নাথ। মাস ছয় আগে প্রিয়নাথের ছেলে রেলে ক্যাজুয়ালে চান্স পেয়েছে। রতনও রেলে কাজ করে। ক্লাস টু গেজেটেড অফিসার। প্রিয়নাথ বলেছিল, আমার ছেলেটা রেলে ঢোকার জন্য লাইন করেছে, ওই প্রদীপ মিত্তির-টিত্তিরদের ধরেছে আর কী. আপনিও তো বড় অফিসার, একটু দেখবেন, ওর নাম হল...

রতন বলেছিল, ওঁদের ধরলেই হবে।

চাকরিটা হয়েছে। এর পর থেকেই প্রিয়নাথ রতনকে বেশি করে স্যার বলা শুরু করেছে।

একটু লুজ ফিটিংস করি স্যার? গরমে আরাম হবে।

করুন।

বলি কী, একটা প্যান্ট করুন স্যার। প্যান্ট ছাড়া হয়?

আপনার হচ্ছে কী করে?

আমরা স্যার দর্জি-ফর্জি লোক, ধুতি পরেই চালিয়ে দিলাম। আপনাদের মতো লোকের কি প্যান্ট ছাড়া...

রতন বলল, আমিও চালিয়ে দেব।

রতন কেন যে ধুতি পরে এ নিয়ে তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়মহলে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। রতন কঞ্জুস তাই ধুতি পরে—এ সিদ্ধান্ত টেকে না। কারণ, ধুতির চেয়ে প্যান্ট ইকনমিক। রতন একজন খুব কনজারভেটিভ, গোঁড়া লোক,—একেবারে ভুল। রতন ব্রাহ্মণ সন্তান, কিন্তু পৈতে পরে না। অখাদ্য কুখাদ্যও খায় না, এমন নয়। প্যান্ট পরলে মানাবে না—বাজে কথা। রতন বেশ ছিপছিপে, একচল্লিশ বছর বয়সেও ভুঁড়ি হয়নি তেমন। লম্বা ধরনের গড়ন। তবে ও সর্বদা ধুতি পরে কেন? এ নিয়ে রতনকে প্রশ্ন করা হলেও এক কথায় ও কিছুই বলতে পারবে না। আসলে, ছোটবেলায় রতনরা খুব গরিব ছিল। রতনের এক পিসতুতো দাদার ছোট হয়ে যাওয়া জামা-প্যান্ট পরেই স্কুলে যেত রতন। তারপর রতন সহসা ঢ্যাঙা হতে লাগল। ওর পিসতুতো দাদার পুরনো ফুলপ্যান্ট রতনের গোড়ালির এক বিঘত উপরে এসে থেমে থাকত। রতনের সেই পিসিমা রতনকে একটা নতুন ফুলপ্যান্ট কিনবার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু রতন ফুলপ্যান্ট না কিনে সোভিয়েট সংস্করণের গোর্কীর মা এবং চেখভের কয়েকটি বাংলা অনুবাদ কিনে ফেলে। বাকি টাকায় একটা মোটা ধুতি কিনে নেয়। এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ওর পিসিমা যা টাকা দিয়েছিলেন, তা খুব একটা খারাপ ছিল না। ওইসব বইপত্তর কিনেও ও একটা সুতির সস্তা ফুলপ্যান্ট কিনতে পারত। তা হলে হাতে কাঁচা টাকা পেয়ে একটা ধুতি কিনে নিল কেন? এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে কুশারীবাবুর ইমেজ।

কুশারীবাবু স্যার ভূগোল পড়তেন। জলবায়ু ও প্রকৃতি পড়াতে পড়াতে বইতে না থাকা মানুষদের কথা বলতেন। মানুষের সমাজ গড়ার ইতিবৃত্ত বলতেন। ডারউইন আর এঙ্গেলস-এর কথা শুনল রতন। আখ চাষের পড়া হতে হতে কুশারীবাবু চলে যেতেন কিউবার আখের খেতে, তারপরই ফিদেল ক্লাস্ত্রোর গল্প। নীলনদ-হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং-এর বন্যার সঙ্গে মানুষের যুদ্ধের কথা বলতে বলতে কমিউন গড়ার গল্পে চলে আসতেন তিনি। দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো পৃথিবীর মানচিত্রের হলুদ-সবুজ-লাল-গোলাপি দেশগুলোর রং মুছে যেত কীরকম, সীমারেখা মুছে যেত। এ ভাবেই ক্লাস শেষের ঘণ্টা বড় অসময়ে বেজে যেত।

কুশারীবাবু স্যার ধুতি পরতেন। ধুতির সঙ্গে থাকত হালকা রঙের ফুল শার্ট । মুখটা সবসময় হাসি হাসি থাকত তাঁর। কেউ কোনও প্রশ্ন নিয়ে টিসার্চ রুমে গেলে খুব খুশি হতেন তিনি । ওঁর বাড়ি গেলেও। কুশারীবাবু টিউশনি করতেন না। গরিব ছেলেপুলেদের এমনিতেই পড়াতেন। আর অদ্ভুত রকমের সৎ লোক ছিলেন তিনি। এর বহু উদাহরণ রতনের কাছে আছে।

তো রতন ভেবেছিল বড় হয়ে কুশারীবাবুর মতো হবে। রতনের মানসিকতা বোঝা যাবে সে সময়ের ওর রাফ পাতার একটি পৃষ্ঠায়। একটি গাড়ি তিন ঘণ্টায় ১৫৪ কিলোমিটার যায়। ১৮ কিলোমিটার চলিবার পর দেখা গেল... যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের মধ্যে হঠাৎ সম্পর্কহীন দুটো লাইন—

গাড়ি চাই না বাড়ি
বড় হয়ে যেন হই
হরিপদ কুশারী।

রতনের বাড়ি-গাড়ি হয়নি ঠিকই। হরিপদ কুশারীও হতে পারেনি । হরিপদ কুশারীর যে আরও অনেক দিক ছিল, সে কথা রতনজেনেছিল হরিপদ কুশারীর মৃত্যুর পর। একদিন রেডিয়োতে মহাশ্বেতা দেবীর একটি সাক্ষাৎকার শুনছিল রতন। মহাশ্বেতা দেবী দুটো গান গাইলেন। গাওয়া শেষ করে বললেন, গান দুটি হরিপদ কুশারীর রচনা। উনি আই পি টি এ-তে ছিলেন। তারপর

কিছুদিন আগে হঠাৎই বন্ধুর বাড়ি পুরনো প্রবাসী পত্রিকা কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই এমনি এমনি ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ আবিষ্কার করল কুশারীবাবুর একটি লেখা...। কথায় আর কাজে এক, জীবনে আর ব্যবহারে এক, এরকম মানুষ বলতে রতনের জীবনে একজনই। হরিপদ কুশারী। রতনের ঘরের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ আর মনের দেওয়ালে হরিপদ কুশারী।

রতন তো কুশারীবাবুর মতন হবে ভাবল। ওর ধুতিও হয়েছে, চশমাও। সততা?

রতনের প্রথম চাকরি কানুনগো। ভূমিরাজস্ব দপ্তরে চাকরি । কিছু ক্ষমতা-টমতাও আছে গেজেটেড পোস্ট। ট্রেনিং চলাকালে একজন আই এ এস অফিসার ট্রেনিং-বক্তৃতায় ইংরেজিতে যা বলেছিলেন তার মোদ্দা কথাটা হল, আপনারা শুধু চাকরি করতেই আসেননি। আপনারা হচ্ছেন ভলান্টিয়ার। ভূমিহীনরা জমি পাবে কি না, বর্গাদারদের বর্গাস্বত্ব থাকবে কি না, গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে কি না, নির্ভর করছে আপনাদেরই উপর। রতন ওই চাকরিতে ঢুকে ভেবেছিল একটা সমাজসেবার চাকরি করতে পারছে। ছাত্রজীবনে বহু বন্ধুর শির ফুলে ওঠা গলায় যে কথা শুনেছে, মিছিলের পায়ে যে কথার ঘুঙুর বেজেছে, লাঠি আর বন্দুক যে কথাগুলি টুঁটি চেপে ধরতে চেয়েছে এতদিন, সেই কথাগুলিকে শরীর দেবে বলে সে জি টি রোডের ধারে বর্ধমান জেলার এক গ্রামে বাস থেকে নামল। ফার্স্ট পোস্টিং।

অফিস ঘরটা হল এক জোতদারের বৈঠকখানা। পায়খানাটি জোতদারের। পাতকুয়াটি জোতদারের। শহরে যাবার জন্য সাইকেলরিকশাটি জোতদারের। স্নানের পুকুরটি, বিশ্রামের জন্য গাছের ছায়াটিও জোতদারের। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াল জোতদারের ঘরে খেয়ে, জোতদারের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। রতন ভেবেছিল, দেখা যাক। সত্য যে কঠিন বড়, কঠিনেরে ভালবাসিলাম।

সত্যবাবু হলেন পেশকার। সত্য বিশ্বাস। একদিন বললেন , টি এ বিলটা করেননি স্যার, করে দিন। রতন বলল, আপনি করে দিন। সত্যবাবুর বিশ বছর চাকরি হয়ে গেছে। উনি অনেকগুলি কাগজপত্র নিয়ে এলেন। কোনও কাগজের তলায় উনি সই করলেন জনার্দন মাঝি, কোনও কাগজের তলায় রাধেশ্যাম মণ্ডল। পিওনকে ডেকে বললেন, অ্যাই ছ্যামড়া, এখানে একটা টিপসই লাগা। তারপর রতনকে বললেন , বাঁ হাতে একটা সই করুন স্যার, ধনা হাড়ি। রতন বলল, এগুলো কী হচ্ছে? সত্যবাবু বললেন, কেন? আপনার টি এ বিল? ভাউচার দিতে হবে না? কুলির ভাউচার, গোরুর গাড়ির ভাউচার, মালপত্র লোড করার, আনলোড করার...রতন বলল, আমি তো শুধু একটা সুটকেস নিয়ে এসেছি। সত্যবাবু বললেন, যা-চ্চলে। আপনি তা বলে সাবমিট করবেন না? পাওনা টাকা ছেড়ে দেবেন? আপনি এনটাইটেলড। কিন্তু রতন ছেড়ে দিল। ও না হয় ছেড়ে দিল, কারণ ওর চেতনায় কুশারীবাবুর ধুতি। কিন্তু সত্যবাবু? সত্য যে কঠিন বড়, ওর টি এ বিল? অন্যান্য স্টাফদের টি এ বিল? এই অফিসটা নতুন। সবাই বদলি হয়ে অন্য জায়গা থেকে এসেছে। ধনা হাড়ি, গোবর্ধন মাঝির নামে অথবা বিভিন্ন হাতের আঙুলের টিপছাপওলা ভাউচার সমন্বিত নিখুঁত টি এ বিল ফরোয়ার্ড করতে হয়েছিল রতনকেই। এর পর নানা সময় কনটিনজেনসির নামে, টি এ-র নামে বহু পেটি ভাউচার রতনের হাত দিয়ে পাশ হয়েছে। রতন ভেবেছে কী করা যাবে, এটা সিসটেম। সিসটেমের বিরুদ্ধে একা একা যুদ্ধ হয় না। তবে চাঁদনি রাতে একা একা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের পাশ দিয়ে বহে যাওয়া কাঁকর ছড়ানো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ভেবেছে ও তো সিসটেমেরই একটা নাটবল্টু। নিজের ব্যাপারে তবু ঠিক থাকবে। থাকবেই।

একদিন বর্ধমানে গেল রতন। অফিসের কাজে। স্টেশন থেকে রিকশায়। কিন্তু কেউ কি আর সঙ্গে করে কাগজ নিয়ে যায়?—যাতে লেখা থাকে রিসিভড রুপিজ এত ফ্রম শ্রী অমুক? ফিরে এসে টি এ বিল করার সময় সমস্যায় পড়ল রতন। রিকশা ভাড়াটা কী করবে? ছেড়ে দেবে? এভাবে কত ছেড়ে দেবে? অফিসের কাজেই না খরচ হয়েছে। করতে হল। বাঁহাতে লিখতে হল ধনঞ্জয় জানা। এই জালিয়াতিগুলি সরকারই করতে বলছে, রতন কী করবে। টি এ বিলটা পাঠানোর

সময় সত্যবাবু বলল, কী স্যার, এবার? পরের সপ্তাহে আবার যেতে হয়েছিল বর্ধমান। শীতকাল চনমনে রোদ্দুর। বেশ হাঁটতে হাঁটতেই চলে গেল অফিস। টি এ বিল-এ রিকশা দেখাল না। ভীষণ পুলক অনুভব করতে লাগল মনে মনে। পাঁচটা টাকার বদলে এতটাই আনন্দ। সত্যবাবুকে বলল রতন। সত্যবাবু বিড়ির ধোঁয়ায় হাসি মিশিয়ে বলল, আপনি স্যার যুধিষ্ঠির।

একবার হল কী, জরিপের কাজ করতে গিয়ে কম্পাস আর দু-একটা যন্ত্রপাতি মাঠে ফেলে রেখে চলে এল রতনরা। খোঁজ হবার পর স্পটে গিয়ে খুঁজে পেল না। গ্রামের ছেলেপুলেদের কাছে খোঁজ করেও পাওয়া গেল না । দোষটা রতনের নয়। আমিনবাবুর হেফাজতেই এইসব যন্ত্রপাতিগুলো থাকে। কিন্তু অফিসার হিসেবে দায়িত্বটা রতনেরই। চাঁদা করে নতুন যন্ত্রপাতি কিনতে হল। রতনকেই বেশি টাকা-পয়সা দিতে হল। এবার এই টাকা উশুল করার জন্য কিছু ফলস কনটিনজেনসি এবং ফলস টি এ বিল তৈরি করলেন সত্য বিশ্বাস। রতন সই করল। সত্যবাবু বললেন, লাইনে এসে গেছেন স্যার। রতনের ব্লাড প্রেশার ফল করল। ঘুম নেই। রতন ছুটি নিল।

ছুটি নিয়ে ক'দিন থাকবে বাড়িতে। ফিরতে হল। বাস থেকে নেমে কাঁচা রাস্তাটা মাঠ খামচে হাওয়া । ধুতিটা পতাকার মতো উড়ছে। একটা চা খেতে ইচ্ছে হল। পিচ রাস্তা আর কাঁচা রাস্তার মোড়েই চায়ের দোকান। বলল, একটা চা।

একটা কেক দিই স্যার?

কেক-টেক খেতে হবে না। মাসের শেষ।

আপনাদের আবার পরথম আর শেষ।

কথাটার মধ্যে যেন 'আদার মিনিং' আছে,—মনে হল রতনের। কথাটার ব্যঞ্জনার্থ ধরার চেষ্টা করতে থাকল রতন। চায়ের দোকানের পাশেই গমকল। গমকলের মালিক বিরূপাক্ষ সাঁতরা রতনের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। বলল, কাজটা করে দিয়েছেন তো স্যার?

কোন কাজটা?

ওই আমবাগানটা।

ওটা তো ডাঙা জমিতে কনভার্ট হয়ে গেছে।

তা তো হয়েছে, কিন্তু কাগজে আমবাগানই রাখবেন তো।

কেন?

পাঁচ হাজার টাকা দিলুম যে।

মানে?

সত্যবাবুর কাছে দিলুম নি, আমনার কতামতো?

হঠাৎই রতনের মাথার মধ্যে বাঁশবনের শিরশির। ঘুরিয়ে উঠল মাথা। বেঞ্চিতে মিনিটখানেক চুপচাপ বসে রইল রতন। তারপর হাঁটতে লাগল অফিসের দিকে। উড়তে পারলে ভাল হত।

বিরূপাক্ষ বলল, কিছু যে বললেন না স্যার...

বিরূপাক্ষ সাঁতরার অনেক জমি। একটা মৌজার এক পাশে ওর একটা বড় আমবাগান ছিল, দু'বিঘে পরিমাণ। জরিপ করতে গিয়ে রতন দেখেছিল ওই দাগে আমবাগান নেই, পুরোটাই ডাঙা জমি। চাষ হচ্ছে। অথচ রেকর্ডে লেখা 'বাগান'। 'বাগান' সিলিংয়ের আওতার বাইরে। জমি হলে সিলিংয়ের মধ্যে পড়বে। বাগান কী হল জিজ্ঞাসা করাতে বিরূপাক্ষ বলেছিল, গাছগুলি বুড়া হয়ে গিয়েছিল স্যার, ফল দিত না, মিছামিছি রেখে লাভ কী, কেটে দিইছি। রতন তখন 'বাগান' কেটে 'ডাঙা' লিখে দিয়েছিল। বিরূপাক্ষর এমনিতেই সিলিংয়ের বেশি চাষ জমি। এই দু'বিঘে যোগ হলে জমিটা ভেস্ট হবে, এবং কিছু ভূমিহীন জমিটা পাবে। রতন মনে মনে পুলকিত হয়েছিল। এ জন্যই তো এই চাকরিতে আসা।

রতন বুঝল সিলিং বাঁচাবার জন্য ওই ডাঙা জমিটাকে আগের রেকর্ড অনুযায়ী আমবাগান রাখার জন্য সত্য পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছে।

অফিসে পৌঁছেই সোজা সত্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করল রতন—বিরূপাক্ষ সাঁতরার কাছ থেকে পাঁচ হাজার নিয়েছেন?

নিয়েছি।

আমি তো জানি না।

এখন জানলেন তো।

মানে?

ওর কাজ করে দিয়েছি। আপনার এ-বাবদ আড়াই হাজার পাওনা। আমার মধ্যে কোনওরকম তঞ্চকতা নেই। আরও টুকটাক কিছু কাজ হয়েছে। আপনার মোট চার হাজার পাওনা হয়েছে এখন নেবেন?

কী যা-তা বলছেন। ওকে টাকা ফিরিয়ে দিন।

যা-তা আমি বলছি, না আপনি? আমরা এতগুলো লোক না খেয়ে মরব নাকি? সরকার কত মাইনে দেয়, অ্যাঁ? আমাদের ফেমিলি নেই?

বাজে কথা রাখুন। রেকর্ডে ডাঙা জমিই থাকবে। আমার অফিসে দুর্নীতি চলবে না।

দুর্নীতি চলবে না? আপনি ফলস কনটিনজেনসিতে সই করেননি? ফলস টি-এ বিল করেননি?

আবার ছুটি নিয়েছিল রতন। লো ব্লাডপ্রেশার। এর অল্পদিন পরেই রেলে ক্লার্ক-এর চাকরি পেয়ে কানুনগো পদ ছেড়ে দিয়েছিল।

এখান থেকে কী সিদ্ধান্ত হয়? রতন পালায়? পালিয়ে বাঁচল? কাপুরুষতা?

এ বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল। আসলে কোনটা যে কাপুরুষতা আর কোন ব্যাপারটা নয়, তা ছাই রতন কি সবসময় বোঝে? যেমন ধরা যাক রতনের পূর্বপ্রেমিকার সঙ্গে রতনের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর মন্তব্য। হ্যাঁ, রতনের জীবনে একবার প্রেম এসেছিল। লাইব্রেরিতে আলাপ। স্মার্ট, তুখোড়, মেধাবি একটি মেয়ের ধুতিপরা রতনকে কেন যে ভাল লেগেছিল রতনের কাছে তার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। রতন যখন এম এ ক্লাসে পড়ে, মেয়েটি বি এ অনার্স পড়ত। ওরা তিন বছর গল্প-টল্প করেছে, দু-তিনটে নাটক দেখেছে। ডায়মন্ডহারবারের গঙ্গার ধারে চার ঘণ্টা বসে থেকেছে। এর পর রতনের অন্তরঙ্গ কোনও বন্ধুর সঙ্গে এরকম কথাবার্তা।

বন্ধু। ওর সঙ্গে এতক্ষণ কী করলি?

রতন। গল্প।

কী গল্প?

কত কিছু। ও ছোটবেলায় ঝাড়গ্রামে ছিল। শালগাছ, লালমাটি...

তারপর?

আরও সব সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের গল্প, তাই থেকে সৌন্দর্য কী, সৌন্দর্যের কোনও ডেফিনেশন আছে কি না...

ডেফিনেশন বেরুল?

না।

চুমু-ফুমু খেলি?

না।

তুই একটা ভেড়ুয়া। কাপুরুষ।

পাঠক, আখ্যানটি এতক্ষণ নীরস চলছিল। এবার একটু মশলা এল বোধহয়। কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে রাখা গেল না। কারণ, রতনের সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি। বন্ধুদের মতে ওটা রতনের কাপুরুষতা।

মেয়েটি রতনকে লিখেছিল: আমি একজন একুশ বছরের মেয়ে। তোমাকে জানাচ্ছি, তোমাকে ভালবাসি। আমার জন্য পাত্র দেখা শুরু হয়ে গেছে। তুমি আমাকে রেজিস্ট্রি করে নাও।

রতন লিখল, আমি তোমার যোগ্য নই। তা ছাড়া আমার অনেক বার্ডেন। এখন বিয়ে করা সম্ভব নয়।

রতন তখন চাকরি করছে। ওর বাবা-মা-ভাইবোন আঁকশি বাড়িয়ে ধরেছে ওকে। দুটো বোনের বিয়ে বাকি, ভাইরা পড়ছে। রতন পালাল।

রতন বিয়ে করেছিল বত্রিশ বছর বয়সে। ওর বাবার পছন্দ করা বউ। রতন দেখতেও যায়নি। কেন যায়নি, তারও কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। রতন ওর বউয়ের সঙ্গে দশ বছর ঘর করছে। একটি ছেলেরও জন্ম দিয়েছে এবং ভালবাসাহীন সঙ্গমও করে যাচ্ছে, সঙ্গে কনট্রাসেপটিভ। রতনের সঙ্গে ওর বউয়ের সম্পর্ক কেমন তা ব্যাখ্যা করা খুবই মুশকিল। ওদের স্বামী-স্ত্রীর কয়েক মুহূর্তের সংলাপ তুলে দেওয়া যাক:

যাচ্ছি।

এসো। টিফিনটা খেয়ো।

ফলটল দাওনি তো?

একটু ছানা।

ডায়েরিটা[১] এনো মনে করে।

ঠিক আছে।

আসার সময় কলেজ স্ট্রিট[২] হয়ে এসো কষ্ট করে।

ও, হ্যাঁ। আনব।

আর ইয়ে, দেরি করিয়ে দিচ্ছি। ওটার কথাটা মনে আছে তো?

কোনটা?

ওই যে, ইয়ে, সার্টিফিকেটটা, পঞ্চায়েতের[৩]।

হ্যাঁ-হ্যাঁ।

আচ্ছা। দুর্গা দুর্গা। তাড়াতাড়ি[৪] ফিরো।

কথা দিতে পারব না।

কেন কী কাজ?

কৈফিয়ৎ দেব না।

নিশ্চয়ই দেবে।

না।

ঠিক আছে। দিতে হবে না। টুটুলের জন্য আগে এসো।

ও।

তুমি একটু না পড়ালে হয়?

হুঁ।

তাড়াতাড়ি চলে এসো। দুর্গা দুর্গা[৫]।

এই সংক্ষিপ্ত সংলাপের মধ্যে কতকগুলো ব্যঞ্জনাময় শব্দ আছে, পাঠকের সুবিধার জন্য সামান্য ব্যাখ্যা করা দরকার।

১। ডায়েরিটা হচ্ছে রতনের স্ত্রী সুতপার বাবার। সুতপার বাবা বিয়ের সময় ডায়েরিটা উপহার দিয়েছিলেন মেয়েকে। ওই ডায়েরিতে অনেক কোটেশন আছে। স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, রুশো, লিংকন, টলস্টয় ইত্যাদি। ওর বাবা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। সুতপার বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছেন। সেই ডায়েরিটা বাঁধাতে দেওয়া হয়েছে।

২। কলেজ স্ট্রিট যাবার দরকার হচ্ছে 'ছোটদের বিবেকানন্দ' বইটা আনবার জন্য। আর ক'দিন পর টুটুলের জন্মদিন। টুটুল ওদের ছেলে। জন্মদিনের উপহার দেবার আর একটা উদ্দেশ্য হল বইটা পড়া থাকলে রামকৃষ্ণ মিশনের ভরতি পরীক্ষায় কাজে লাগে।

৩। টুটুল এখন ক্লাস ফাইভে পড়ে। বাংলা মিডিয়াম স্কুলে। প্রাইভেট স্কুল। যে-সমস্ত স্কুলের নাম হয় কচি সংসদ, সবুজের মেলা, শিশুতীর্থ; যে-সমস্ত স্কুলের বিজ্ঞাপনে লেখা হয় এখানে যত্ন সহকারে ইংরেজিও পড়ানো হয়, যে-সমস্ত স্কুলের দিদিমণিরা খুব কম মাইনে পায়, সেরকমই একটা স্কুলে। গত বছর রামকৃষ্ণ মিশনে ভরতির পরীক্ষা দিয়েছিল, হয়নি। এ বছর আবার দেবে। আগের ক্লাসে। মানে একটা বছর নষ্ট করে, বয়স কমিয়ে, স্কুলের নাম পালটে।

এই বয়স কমানো, স্কুলের সার্টিফিকেট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন রতনেরই এক সহকর্মী। পঞ্চায়েত মেম্বার, এবং নবমঞ্জরী নামে একটি ওরকম স্কুলের সেক্রেটারি। ওর স্ত্রী ওই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। অর্থৎ ওরাই মালিক। উনি বললেন, রতনদা, আপনার মতো লোকের জন্য এটুকু করতে পারব না? আপনার মতো মানুষকে উপকার করার স্কোপই তো পাওয়া যায় না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব, ডোন্ট ওরি।

৪। আজকাল বাড়ি ফিরতে দেরি হয় রতনের। জনচেতনা মঞ্চ নামে একটা সংস্থার সঙ্গে বড্ড জড়িয়ে গেছে। বিজ্ঞান ক্লাব, বয়স্কশিক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ ধরনের কাজ হয় ওখানে। এসব কাজ করে তৃপ্তি পায় রতন। ভাবে, কুশারীবাবুর প্রতিনিধিত্ব করছে।

৫। রতনের বউ ওষুধ খাবার বা খাওয়াবার সময় বিষ্ণু বিষ্ণু, ঘুম থেকে উঠে নারায়ণ নারায়ণ, এবং ঘর থেকে কেউ বেরুলে দুর্গা দুর্গা বলে থাকে। প্রথম প্রথম রতন এসব একদম বরদাস্ত করতে পারত না। দুর্গা দুর্গা শুনেই আবার ঘরে ফিরে আসত। রতন কর্কশ স্বরে বলেছে যাবার সময় এসব বলবে না। সুতপা নিচু স্বরে তবু বলেছে। তারপর আস্তে আস্তে এসব মেনে নিয়েছে রতন, যেভাবে বাঁ হাতের ধনঞ্জয় জানা মেনে নিয়েছিল। ঠাকুর দেবতা নিয়ে সুতপার সঙ্গে কোনওদিন গুছিয়ে তর্ক করেনি রতন, যা দু-একবার কথা হয়েছে, তাতে সুতপা বলেছে ঈশ্বর হল ঘন হয়ে থাকা শুভবোধ। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে মানুষ খারাপ কাজ করে না। রতন তখন নাস্তিক ও আস্তিকের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটার কথা বলেছে, যেখানে আছে—শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো/শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভাল।

তা যাক। নাস্তিক বাপ আর আস্তিক মায়ের আদরের ধন টুটুল। এই টুটুলকে ভাল করে মানুষ করতে চায় রতন ও সুতপা। ভাল করে মানুষ করা বলতে আজকাল যা বোঝা যায়, তা হল ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ভরতি করানো, পিঠে ঝুলবে ছবি লাগানো ব্যাগ, কাঁধে একটু বেশি দামের ওয়াটার-বোটল, ব্যাগের টিফিন-বাক্সে ব্রেড-বাটার-সন্দেশ, আধা খাওয়া। বইয়ে ক্যাডবেরির গন্ধ, আঁকার স্কুল-টিনটিন-হিম্যান। আইসক্রিম খেয়ে টনসিল..।

কিন্তু রতন দেখেছে, একবার এক রাত্রের ট্রেনে, এক বস্ত্রহীন, শীতে কাঁপা একটি বালকের শরীরে নিজের চাদরটা পেঁচিয়ে দিল একজন মানুষ। রতন দেখল কুশারীবাবু আছেন এখনও। রতন দেখেছে একজন বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরবনের এক গ্রামে পড়ে থাকা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন, শেখাচ্ছেন, রতন দেখল কুশারীবাবু আছেন। ওর জনচেতনা মঞ্চের একজন অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ছোট ছোট কাগজে লিখে চলেছেন মানুষের কাজে লাগে এমন সব বিষয়, রতন বোঝে কুশারীবাবু থাকেন, থেকে যান। বালির ভিতরের জলের মতো, হাওয়ার ভিতরের গন্ধের মতো। আসলে কুশারীবাবুরা একটা ধারা। ঠিকই বহে চলে ভিতরে ভিতরে। রতনের ভাবতে ভাল লাগে ওর ছেলের মধ্যেও কুশারীবাবু বইবে। সুতপাও কি ওর হেডমাস্টার বাবাকে ওর ছেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়?

এবারে পাঠক, আপনারা দেখুন, দুই ভিন্ন মেরুর ভিন্ন মানুষ কীভাবে ওদের ছেলেকে নিয়ে সুস্বপ্ন

দেখে। এখনও দেখে এবং চায়, ওদের ছেলেটি সৎ এবং আদর্শবান হয়ে উঠুক। ছেলের ভালর জন্য রতন বাড়িতে সিগারেট খায় না। সুতপা টিভি খোলে না। রতন ছেলের হাত দিয়ে ভিখারিকে পয়সা দেওয়ায়, সুতপা মন্দিরে পয়সা দেওয়ায় এবং রতন নিজের সততার গল্প বলে থাকে।

এখন ওদের ধারণা টুটুল রামকৃষ্ণ মিশনে ভরতি হতে পারলে ছেলে সৎ এবং আদর্শবান হিসেবে গড়ে উঠবে এবং ছেলেকে সৎ বানাবার জন্য ফলস সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হচ্ছে ওদের।

এবারে আমরা মূল গল্পটিতে এসে গেছি। এতক্ষণ ধরে যা বলা হল, তা আসল গল্পটির ভূমিকা মাত্র। আসল গল্পটি খুবই ছোট।

টুটুল বড় বাড়িটার ভিতরে। ইন্টারভিউ দিচ্ছে। রতন ও সুতপা বাড়ির বাইরে গাছের ছায়ায়। অপেক্ষা করছে। মাঠ আঁচড়ানো গরম হাওয়ায় নড়ছে রতনের ধুতি, সুতপার শাড়ি। ওরা কেউ কোনও কথা বলছে না। গত ক'দিন ধরে অনেক কিছু শেখানো হয়েছে টুটুলকে। টুটুল পারছে তো? এবারও না পারলে কী হবে?

টুটুল আসছে। টুটুল হাসছে। মাঠের সবুজের ভিতরে টুটুলের নীল কেডস বৃষ্টির মতো। টুটুল এল। দু'জোড়া চোখ টুটুলের দিকে স্থির। টুটুল বলল, সব পেরেছি বাবা, স-ব।

সব?

হ্যাঁ। সব।

ইস্কুল?

মিথ্যে কথাটা ঠিক ঠিক বলে দিয়েছি বাবা। স-অ-ত্যি। কিচ্ছু ভুল হয়নি। কচি সংসদ বলিনি। বলেছি নবমঞ্জরী। ক্লাস ফোর।

রতন তখন কিছু চেপে ধরতে চাইছিল। গাছের ছায়া ছাড়া তখন কিছু ছিল না। সুতপা এবং টুটুল দু'জনই তখন ছায়ামাত্র ছিল এবং রতন নিজে, নিজের ছায়াকে টেনে টেনে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত এনে ট্যাক্সিকে সঁপে দিয়েছিল। ট্যাক্সিটা জ্যাম-ভিড় জেব্রা-ক্রসিং ঠেলে ঠেলে কলকাতার ভিতরে ঢুকছিল। তারপর আস্তে আস্তে ওদের পাড়ার দিকে এগুতে লাগল। সামনেই প্রিয় টেলারিং। দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়নাথ সাহা। রতন ট্যাক্সিকে থামতে বলল। আচমকা নেমে গেল ট্যাক্সি থেকে। প্রিয়নাথ সাহার দিকে এগুতে থাকল। টেবিলে পড়ে থাকা মাপের ফিতেটা দু'হাতে চেপে ধরল। তারপর বলল—আমাকে হাওয়াই শার্ট বানিয়ে দিন প্রিয়নাথবাবু, আর ফুলপ্যান্ট। বলেই টেবিলে নামিয়ে নিল মুখ। লোহার কাঁচিতে লোনাজল পড়ল। সুতপা আর টুটুল বেরিয়ে এল ট্যাক্সি থেকে। রতনের কান্নার মধ্য দলা পাকানো শব্দ— আমাকে মাপুন প্রিয়বাবু, মাপুন। সুতপা একবার অস্ফুটে বলল, 'কী হচ্ছে কী'। তারপর চুপ করে গেল। মানুষের কান্না। মানুষ কাঁদছে। মানুষ রতন।

টুটুল দেখছে। কী করবে ও এখন?

যুবমানস, ১৯৯৬

কল

পুজোর ছুটিটা কলকাতায় মামার বাড়ি কাটিয়ে বাবুদের ছেলেপিলারা গ্রামে ফিরল। সঙ্গে এনেছে হইবাজি গুটিকতক। ছোটবাবুর সম্বন্ধী রাত্রে ছাত থেকে বাজি ছুটালেন। আকাশ রোশনাই হল। বাড়ির তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুনিষ মাইন্দাররা হাঁ করে দেখল। বলাবলি করল বঃ, বিগিন গিয়া,— তাজ্জব কারখানা! বাবুদের ছোটছেলেটা একটা রেলগাড়ির মাথায় চাবি পেঁচিয়ে ছেড়ে দিল আর ভ্যাকর ভ্যাকর চলতে লাগল। কী জানি— কী বোঙার ভর আছে এতে। ছোটমেয়ে মঞ্জু দিদিমণি এনেছিল দু'জোড়া ইন্দুর। সাদা ফুটির মতো ফংফঙে রং। ঘন জালের খাঁচার মধ্যে ইন্দুর চারটে তুড়ুৎ ফুরুৎ ঝম্প করে। মঞ্জুদিদি ওই নিয়েই থাকেন। ছোলা দেন, ছাতু দেন।

সুবল কোঁড়া মজুমদার বাড়ির মাইন্দার। চাষের সময় চাষ, চাষ উঠলে ঝাড়াই মাড়াই— অন্যসময়ে গাইবলদের জাবনা দেয়া। কত্তাবাবুর সেবা, এটা ওটা ফাই-ফরমাস। রোজ সুয্যি ওঠার আগে হাজির দিতে হবে। রাত্রে ছুটি। একবেলা খাবার পায় সুবল। আর বছরে নগদা দুশো টাকা পাঁচ কিস্তিতে।

সুবলের এখন কাজ বেড়েছে। হুকুম হয়েছে রোজ পাতিকালে ইঁদুরের খাঁচার গু-নাদি পোষ্কার করতে হবে। খাবার জল পালটাতে হবে।

সুবল কোঁড়া দিদিমণির রগড় দ্যাখে। ইঁদুরগুলোর সাথে দিদিমণির কত মশকরা-ঠাট্টা, রং-তামাশা,— সার্কেস। ইঁদুরগুলোর আবার নাম লাগিয়েছেন তিনি,— নটি, পেটি, ফুলু, টুলু। ওরা ট্যাঁড়শ দানা ভালবাসে, কুসুম বীজ ভালবাসে, সুবল এইসব এনে দেয়। দিদিমণি এইজন্য সুবলকে ভালবাসেন। একদিন একটুকরো সর মাখানো পাউরুটি আর একদিন প্যাঁচ দেয়া মণ্ডা খেতে দিয়েছিল চুপি চুপি।

আশ্বিন গত হল। চাষের কাজ এখন আর নেই। ধানগুলো ক্রমশ রোদ্দুরের রং গিলতে লেগেছে এখন। হলুদ হলুদ প্রজাপতি আর ধানের রং মিলে যায়, মিশে যায়। ধানের শিষগুলো মোরগের ঝুঁটির মতো হিলহিল করছে। আর এক মাসের মধ্যেই ধানকাটা শুরু হবে। লোকের হাতে পয়সা আসবে। গদাই দাসের তেলেভাজার দোকান সকাল-সন্ধে ধোঁয়া উগরোবে। দু-চারটি ন্যাড়া কুকুর প্রতি বছরের মতো এবারও ছুটে যাবে দোকানের পাশে,— সেই ভিনগাঁয়ের বুড়িটা কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে এবারও আসবে নিশ্চয়ই,— ফুরুলিটা দিবি বাবা? না দিলেই শাপ-শাপান্ত— এ ফুরুলিতে ওলাওঠা হবে। ভেদিয়ার যে-বায়োস্কোপের ঘরটা কেবল অঘ্রাণ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত চালু থাকে, সেটার বাবুরা আসতে লেগেছে। চালে খড় দেয়া হচ্ছে। ছুতোররা এসে বারোয়ানির বেঞ্চিগুলোর লড়বড়ে পায়ায় পেরেক ঠুকতে লেগেছে। শুঁড়িখানা জমজমাট হয়ে উঠবে, হাঁড়িয়ার সঙ্গে কুড়মুড় ভাজা চিবুবে সব। বিড়ি ধরাবার জন্য পাঁচ সিকের খেঁচাকল কিনবে অনেকেই।

ধান পাকলে হই হই ট্যাঁড়া। তাতে কিন্তু সুবলের কিছু যায় আসে না। ওর তো নিজের চাষ নেই, নিজের গোলাও নেই,— তবু অঘ্রাণ এলে লোকের মুখে হাসি ফোটে শালুক ফুলের মতো টাটকা। ওটা দেখতে বেশ লাগে। ধান কাটা হয়ে গেলে যখন সমস্ত মাঠ খাঁ খাঁ করবে— শুধু মাঠে জেগে থাকবে কুষ্ঠক্ষত আঙুলের মতো ধান গাছের খোঁচাখোঁচা 'লাড়া' তখন মাঠের গোপন আনাচে কানাচে, ঢেলার পাশ আর ফাটল থেকে পায়রা-ঘুঘু-চড়াই এর সাথে খুঁটে খুঁটে একটা একটা করে ধান জড়ো করবে ন্যাংটো ছেলেপিলেরা। বাবুদের গোরু চরাতে গিয়ে সুবলের ছেলে-দুটোয় ধান কুড়োবে।

অঘ্রাণের জন্য এ কারণেই বসে থাকা। তারপর রাত্রি হলে কুয়াশা ঢাকা শিরশিরে জ্যোৎস্নায় তির-ধনুক হাতে মাঠে নামবে সুবল, গর্তের ভিতর থেকে ইঁদুরেরা তখন মাটির ওপর ধানের খোঁজে আসে। তখন ইঁদুর ধরবে সুবল। খাবার।

এই জন্যই অঘ্রাণ পানে চেয়ে থাকা সুবলের। সুবল পয়সা পেলেই বউ ছাড়াবে জরিমানা দিয়ে। আশ্বিনের কিস্তির টাকাটা ফুরুৎ হয়ে গিয়েছে কবে। পয়সা শালা ল্যাটা মাছের ছা, ধরে রাখা যায় না, ফুকো পেলেই পালায়। তাই অঘ্রাণের পয়সা পেয়েই শুঁড়ির দোকানে কিছু আগাম দিয়ে রাখবে।

অঘ্রাণ অবশেষে এল। দুমকা থেকে গা হাত উলটে কলজের দম আর শিরার টান পরীক্ষা করে বারোজন মাঝি-মেঝেন ভাড়া করে এনেছে বাবুরা— মেয়ামদ্দ সব নেমেছে ধানখেতে। আকাশে পাতলা সরসরে মেঘ। ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে ওদের ফ্যানারি। হাওয়ায় এক সাঁওতাল বিড়ি ধরাতে পারে না, কাঠি নিভে যায়, তাই বুকের কাপড় দু'হাতে মেলে হাওয়া আড়াল করে তার পরিবার।

সুবল আর পারে না, আর না। ওরও বউয়ের জন্য মন কেমন করে।

ওর পরিবার ওকে ছেড়েছে আজ দু'বছর হবে। সেবার বড় আকাল গেল। বোলপুরের হাট থেকে যে শাড়িটা কিনে ছিল ওর পরিবারের জন্য, জলে দিতেই একেবারে জালি। ছ'মাস না যেতেই ছিঁড়ল চার জায়গায়। একে জালি তায় ছেঁড়া, ওটা শরীরে প্যাঁচালে গতরের সবই দ্যাখা যেত। নিজেদের জাতের লোকদের নিয়ে চিন্তা ছিল না, কিন্তু কাজে বেরুলে বাবুদের ছেলে-ছোকরাগুলো এমন করে মুখ ফিরিয়ে তাকাত যেন চাটছে। ওর বউ বলেছিল— হয় আমার শরীরে গোবর নেপে রাখো কেনে, নয় একটা শায়া দাও।

— শালা ভাদ্র মাস বটে। গেঁড়োকচু ছাড়া পেটে জোটে না, শায়া কাপড়! বলিস কী?

শেষটায় বুদ্ধি করে সুবল ওকে বাপের বাড়ি রেখে এল, বাপের কাছে থাকলে পুজোর সময় একটা কাপড় পাবে ঠিকই।

সেবারই পুজোর ক'দিন পর বাবুর সম্বন্ধী সুবলকে নিয়ে গেল দুর্গাপুর। উনি রাস্তা তৈরির ঠিকাদার বটেন। দুর্গাপুরে মুনিষের দর খুব চড়া, গ্রাম থেকে নেয়াই সুবিধে। চলল সুবল দুর্গাপুর। ও হচ্ছে বছরে দুশো টাকায় কেনা মাইন্দার, যা হুকুম তা তামিল।

দুগ্‌গাপুরে কাটছিল মন্দ না, খেতে পেত। সন্ধে হলে পাকিমদ, 'শালার বোতলে ভরা।'

অঘ্রাণে সুবল দেশে ফিরতে চাইল, দেশে ফেরার জন্য ও কাঠবেড়ালের মতো হয়ে গেছিল, কিন্তু বাবুরা কাজের ক্ষতি করে ওকে ছুটি দিল না। ওর ফিরতে ফিরতে আষাঢ় হল। তখন দেশে ধান রোয়া হয়। তখন মুনিষ মজুরের খুব বাজার দর ওঠে। তখন সুবল বাইরে থাকলে বাবুদের নগদা মুনিষ রাখতে হয় ফের পয়সা দিয়ে। তাই সুবল দেশে ফিরতে পারল।

দেশে ফিরে সুবল ওর ভায়রাভাই মুরাইয়ের কাছে গালে হাত দিয়ে শুনল যে ওর বউ এসেছিল অঘ্রাণ মাসে— সুবলকে না পেয়ে মন খারাপের গাওনা গেয়ে গেছে ওর বোনের কাছে। ছেলে-দুটোকে বাবুবাড়ি কাজে লাগিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে ফের।

কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে সুবল দৌড়োল ওর শ্বশুরবাড়ির বনপাশ। সঙ্গে নিল দুর্গাপুর থেকে কেনা নকল সোনার বালা।

গিয়ে শুনল ওর বউ ধানকলে কাজ নিয়েছে। ওর কী রকমের কুটুম হল-গে ওই ধানকলের ধোঁয়াবাবু। ধানেতে ইস্টিম ঢুকোবার কাজ করে। তিনি লাগিয়ে দিয়েছেন কাজে।

ফিরে আসে সুবল। রাত্রে ছোটবেটার গায়ে ঘায়ে হাত বোলান করতে করতে বলে— তুদের মা এলনারে— রোস। তুদের অন্য মা এনে দুব কেনে— সুবলের বাচ্চাটা চিৎকার করে ওঠে হঠাৎ। সুবলের হাতটা পুঁজ-রক্তে ভিজে সরসর করে ওঠে— ভুল করে ওর ছেলের কাঁধের গোয়াল ঘরের টিন বেঁধা ঘা-এর উপর হাত সেঁধিয়ে দিয়েছে সুবল, রাগে না মমতায় কে জানে।

আহারে— ছোটমোটো রক্তমাংসের শরীরটায় মায়ের হাতের আদর নাই,— সুবলের মনে

পড়ে— ছোটটার জন্মের পর পালং-এর দুধ ছিল না। হাঁড়িয়ার সাথে ভাতের মাড় মিশিয়ে হাতের কেঁড়ো আঙুলে করে চুষিয়েছে পালং।

সুবলের ভায়রাভাই মুরাই। সে-ও বাবুবাড়ির মাইন্দা। সেই যাবতীয় খবরা-খবর দেয় সুবলকে। একবার বলল পালং সাঙ্গা করবে ধানকলের অন্য কাউকে। আর একদিন বললে সে নাকি রানিগঞ্জ চলে যাবে সেখানে রোজগার ভাল।

সত্যি বলতে দোষ কী— যখনই পালং-এর কথা উঠেছে তখনই সারা শরীরে যেন শালুক ফুল ফুটে ওঠে।— পালং এর সমস্ত দোষ ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে যায় সুবলের। পালংকে ছাড়া ও থাকতে পারবে না— সুবলের মনে হয়।

কেউ যদি শুধোয় সুবলকে— কীরে বউকে খালাস দেছিস নাকি? সুবল বলে, না হে বউ খালাস চায়নি এখনও। বলতে গর্ব লাগে সুবলের।

মুরাই একদিন খবর দিলে— বনপাশের ধানকল বন্ধ হয়ে গেছে— পালং-এর আর কাজ নেই। পরের হপ্তাহেই খবর দিলে ফের— পালং-এর পেট হয়েছিল— খসিয়েছে। তারপর— এই কিছুদিন আগে মুরাইকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে পালং— ও আসতে চায় সুবলের কাছে ফের।

ওহো— আ মরি চামুণ্ডোর দাসী, ফের তুই পরলি ফাঁসি,— ডিগ্ ডিগ্ ডিগ্ ঢুকুর ঢুকুর।— সুবলের মজা।

সন্ধে পর্যন্ত বকের ধ্যান করেছিল সুবল। পালং এল— ওর বউ। সন্ধের আলো-আঁধারিতে সুবল দেখল পালং-এর সারা চুলে ধানের কুঁড়ো, মুখে হাতে গায়ে খড়খড় করছে ধানের তুষ। সুবল দেখল চোখের ওপরকার ভ্রূ ধানের তুষে সাদা— চোখের নীচে মন খারাপের কাল রং। সুবলকে দেখেই সেই তুষ লেপটানো ভ্রূ কুঁচকোল পালং— উ অ...। তু বটে?— থুঃ থুঃ কেমন মরদ তুই?— মোকে বাপের কাছে থোয়া করে খিতে দিবার ভয়ে পলাইলি? মদ গিলে এসেছিল পালং। শামুকের ঢাকনা খোলার মতো— ঠোঁটটা ফাঁক করল পালং— শামুকের মাংসের মতো দলাপাকানো জিভে অদ্ভুত শব্দে আহত করল সুবলকে!— তা এখন এলি কেনে?— সুড়সুড়োচ্ছে? বুক থেকে কাপড়টা খসিয়ে শরীরটা সামনে এগিয়ে নিয়ে চিৎকার করল পালং— মাগ্ মানে কি শুধু এইগুলান্? এটা? এটা? পেটেতে ভীষণ জোরে থাপ্পর মারতে মারতে বলতে থাকে, প্যাটের জ্বালা কি কিছু নয়, বল, তু বল। হু হু করে কাঁদে পালং।

খোলা পেট সুবলের চোখের একহাত মাত্র দূরে ছিল। পালং যখন পেট চাপড়াচ্ছিল তখন ওই শব্দ, ওই চিৎকার, ওই রং ওই মদের গন্ধ নাইকুণ্ডলীর মধ্যেকার ধানের গুঁড়ো ওই কোমরের উঁচু হাড় মাছের কাঁটার মতো পাঁজড়ায় দামোদরের বানের আওয়াজ সর্বোপরি পালং-এর তুষ মাখানো মুখের মধ্যে দু'পাশে দুটো চোখের জলের ধারা কীরকম কালো রং-এ ফুটে উঠেছে। কুড়ুলের ফলার মতো দুটো স্তনের সামনে উবু হয়ে বসে থাকা সুবল কোঁড়া,— তির বেঁধা কাঠবেড়ালির মতো ক্রমশ নিঃসাড় হয়ে যেতে থাকে। বালা জোড়াটা ভয়ে মুঠোর মধ্যে লুকোয়। একবার বিড়বিড় করে বলতে চেষ্টা করে, আমার দোষ নাই রে... দোষ আমার লয় রে...

বুড়ো লগন দাস— সম্পর্কে সুবলের জ্যাঠামশাই। কোঁড়াদের সমাজে সব চেয়ে প্রাচীন লোক। সুবলকে আঙুল উঁচিয়ে সাফ বলে দিলে— উঁহু,— লস্টো মেয়াছেলা গাঁয়ে আনা চলবে না। আনতে হলে চল্লিশ টাকা জরিমানা চাই। অনেক কাকুতি মিনতি করলে সুবল। বুড়োর এক কথা। মদের দাম বেড়ে গেছে চল্লিশের কমে কিছুতেই নয়।

জারা আসছে— উত্তর থেকে কনকনে হাওয়ায় সারা গায়ে কাঁপন। চিতে বেড়ার গাছ লাল ফুলে ভরে গেল। বাবুদের 'লবান্' হয়ে তবে আরও কিছু টাকা পাবে সুবল। একগণ্ডা হাঁ এখুনি হাঁকিয়ে আছে। জরিমানার কড়ি জোগাড় করতে গেলে উপরি কিছু চাই-ই চাই।

অনেক ভেবে একটা মতলব আঁটলে সুবল। শম্ভু হাটির মতো কয়লার কারবার করলে কেমন হয়?

সন্ধের মধ্যে কাজকর্ম সেরে সুবল চলল লাইনের ধারে।

সুবল দ্যাখে শম্ভু হাটি পুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে। ট্রেনের শব্দ শোনে সুবল। একটা কঞ্চির আগায় সুতো দিয়ে একটা এক টাকার নোট বেঁধে— লাঠিটা হরধনুর মতো হাতে রাখে।

ট্রেনের ফোকাস বাতিতে দেখা যাচ্ছে শম্ভু হাটিকে। উঁচোনো হাতে কঞ্চির মাথায় তিরতির করে কাঁপছে টাকা। ড্রাইভার সাহেব ছোঁ মেরে তুলে নিল লাঠিটা— তারপর ঝপঝপ কয়লা পড়তে থাকে লাইনের পাশে পাশে। শম্ভু হাটির মাইনে করা হারু বাগদির বউ কয়লাগুলো ঝুড়িতে কুড়োবে।

সুবলের ওঠানো হাত থেকেও ছুটন্ত ড্রাইভার সপ করে টেনে নেয় কঞ্চিটা তারপর ঝপঝপ করে দু'বেলচা কয়লা ফেলে দেয় ড্রাইভার সাহেব। জয় ভগবান! সুবল বস্তায় ভরতে থাকে, আর অমনি হইবাজির মতো ছুটে আসে শম্ভু হাটি।— শালা হারামির পো— কাকে নিকেশ করে কয়লা কুড়োচ্ছিস, এ কয়লা আমার। সুবল বলে, এ আমার। আমি টাকা লাগিয়ে কয়লা লাবিয়েচি, দিব্যি গালছি।— শালা রেলের কয়লা চুরি তুই,— চ' মাস্টারবাবুর কাছে ইস্টিশনে। এ তো রেলের কয়লা। 'আমনারটাও তো রেলের কয়লা' সুবল মিন মিন করে। শম্ভু হাটি জোরসে বিড়িতে টান মেরে দূরে ছুড়ে ফেলে হুংকার দিল— আমার ইজারা লেয়া আছেরে বাঞ্চোত। চ' স্টেশনে,— মাস্টারবাবুর কাছে মোকাবেলা করে লিবি।

শেষ পর্যন্ত কয়লাটা বস্তায় পুরে শম্ভু হাটির কয়লার গাদায় পৌঁছে দিতে হল সুবলকে।

তারপর রোজ সন্ধেবেলা কয়লা কুড়োনো আর বস্তায় পুরে আড়তে পৌঁছে দেবার একটা চাকরিও পেয়ে গেল সুবল। আট আনা রোজ। কারণ হারু বাগদির বউ-এর সূতিকা হয়ে হাড় জিরজিরে শরীর হয়েছে। একাজ আর ওকে দিয়ে হবে না।

সুবল ভেবেছিল ওই উপরি রোজগারটা জমাবে।

কিন্তু দু-চার দিন পরপরই আট আনা এক টাকা চেয়ে নিয়ে খরচ করে ফেলছে সুবল।

গ্রামের ইস্কুলে কতগুলো ডাক্তারবাবু এলেন। ব্যাটাছেলে,— সাদা টুপি পরা মেয়েছেলে। শম্ভু হাটি একদিন বললে সুবলকে— তোর তো ট্যাকার দরকার সুবল,— হ্যাঁরে। বউ ছাড়াবি বলেছিলি।

তা তোকে আমি পাইয়ে দোব ট্যাকা।

একদিন আমার সাথে যাস ইস্কুলে। ডাক্তারবাবুরা একটা ইনজেকশান দেবে তোর পেটে। কিচ্ছু টের পাবি না। নগদা আঠারো টাকা পাবিরে সুবল হাতে হাতে। তারপর, ধর খাওয়া-দাওয়া, দুধ ফল তু জম্মে খাস্‌নি।

সুবল গেল শম্ভু হাটির সাথে। শম্ভু হাটিকে ওরা কিছু টাকা দিল। শম্ভু বলল, তু বোস। কিছু চিন্তা নাই। কাল পরশু— দু'দিন আমার কাজে ছুটি।

তারপর সেই ইস্কুল ঘরে জীবনে প্রথম তক্তপোষে তোশকের উপর শুল। ব্যাটাছেলে মেয়েছেলেরা মিলে তাকে ন্যাংটো করে দিল— ন্যাংটো হবার আগে পায়ের গোড়ালিতে চাপ দিয়ে কোমরটা উঠিয়ে বাধা দিয়ে টাকাটা চেয়েছিল...

তারপর শেষকালে পেটে সাদা ধবধবে ন্যাকড়া প্যাঁচানো অবস্থায় মুঠোতে আঠারোটা টাকা আর দুটো করে লেবু আর কলা নিয়ে যখন গাঁয়ে ফিরল তখন সবাই বললে— তু খাসি হয়ে গিছিসরে সুবল।

সুবলের হাতে এখন টাকা এসেছে। সে সমাজের মোড়লকে তেড়ে খবর পাঠালে— বউছাড়ানি জরিমানা দিয়ে দেবে সে। শম্ভু হাটির কাছে জমানো টাকার সাথে ওই আঠারো টাকা মিলিয়ে লগন দাসের সামনে ছুড়ে দিয়ে বুক থাবড়ালে। আমি বাপ্পের ব্যাটা বটি।

এরপর একদিন খড় জ্বালিয়ে আগুন করা হল। আগুনের চারিদিকে বসে মৌতাত হল খুব।

খাসির 'নাই ভুটুরি' খুব কষে রান্না হল সেদিন। তাড়ির সাথে মেশানো বোতলের মদ। বুড়ো লগন দাস তার হাত দুটো পেছনে রেখে কনুইয়ে ভর দিয়ে পা দুটো টানটান করে আগুনের উপর মেলে ধরে হাঁক পাড়লে, হারা কোঁড়ার ব্যাটা সুবল ওর লস্‌টো বউ ঘরে লিবে তার আজ্ঞা হয়...। সবাই সমস্বরে হেঁকে উঠল— আজ্ঞা হয় হে... তারপর সবাই হই হই করে চিৎকার করে উঠল। মুরাই দাস নেশার ঝোঁকে গান গাইল—

'ওরে ফের শুতে যাস যদি তু পর মরদের ঘর
তোর পাছাতে নোহার সেঁকা জেনে লে খবর
তুর গায়েতে পেসাব তুর মুখে ছাগের মল
মা মনসার সাপ দেবে তুর মাথাতে ছোবল।'

অনেক রাতে সব মিটল।

সুবল মুরাই দাসকে বলল— তোর শালি এলে এখন ক'দিন তোর ঘরেতেই থাকতে দিস তাকে। তারপর মাগ ভাতারে খেটেখুটে ভিটে তো সারিয়ে লিব।

আর তারপর থেকেই বাবুদের মোষের গা মুছতে মুছতে সুবল ভাবে পালং-এর খোলা পিঠে এলানো চুল। ভিটের চালে লাউয়ের মাচা, মুরগির ডাক, শামুক গুগলি নিয়ে এল ছেলেটা, এই সব ছবি দ্যাখে। এখন মাঘ মাস। বোরো ধানের চাষ চলছে বাবুদের জমিতে। এক দিনের জন্যেও ছুটি মিলছে না যে সুবল ওর বউকে নিয়ে আসবে ওর কাছে। ওর মনে হল— দিদিমণির ইঁদুরের সাথে ওর নিজের কোনওই তফাত নেই। তবে ইঁদুরগুলো খাঁচায় থেকেও পেটভরা খাবার পায়, ও তা-ও পায় না। যেমন বন্ধ খাঁচার মধ্যে সাদা ইঁদুরের খেলা দ্যাখেন দিদিমণি, তেমন বাবুদের উঠোনে সাঁওতালদের নাচের খেলা হয়, কোঁড়াদের লাঠিখেলা হয়।

তারপর অনেক কষ্টে এক দিনের ছুটি জোগাড় করে শ্বশুর ঘর গেল সুবল। বউ আসতে চাইলেও ওর শ্বশুর বললে এখন ছাড়বে না মেয়েকে। এখন আলুখেতে টানা কাজ করছে পালং, দু'পয়সা পাচ্ছে বুড়ো, এখন নয়। বলে দশই ফাগুন ভাল দিন। সেদিন যাবে পালং ওর ভাইকে নিয়ে।

১০ই ফাগুন মা মনসার জাগান। পুরো শীতকালটা গর্তের গভীরে শীতঘুম ঘুমিয়ে এই দিনেই নাকি জেগে ওঠে সর্পকুল। সেদিন কোঁড়াদের একটা পার্বণ। সে দিনটার আরও বড় পার্বণ সুবলের কাছে।

সেই দিনটা ঘনিয়ে আসতে লাগল ক্রমশ;

সুবল ঠিক করেছিল যেদিন ওর বউ ঘরে আসবে সেদিন ওর শালা, ভায়রাভাই মুরাইয়ের গোটা পরিবারকে ও কিছু খাওয়াবে। মদ তো হল। তার সাথে কী এ নিয়ে দিনকয় মহাচিন্তা করল সুবল। শেষকালে একটা বুদ্ধি বার করলে মাথা থেকে। আর সে মতলব কাউকে বলল না সে। কাউকেই বিশ্বাস নেই।

১০ই ফাগুন সক্কালবেলা বাবুদের খেসারি খেতে ফলিডল ছড়াচ্ছিল বাবুবাড়ির গোমস্তা দুকড়ি সামন্ত। সুবল তার কাছ থেকে একটু ফলিডল চাইল।

ফলিডল কী হবে রে, মরবি নাকি?

সে হলে তো বাঁচতাম। লগন দাসের ডিংলা গাছে বড় শুঁয়ো ধরেছে— তা দ্যাও না এট্টু।

ভাঁড়ে করে ফলিডল একটু নিয়ে বাবুবাড়ির সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে রাখল সুবল। বাবুবাড়িতে তখন ছোলা আর সরষে ঝাড়াইয়ের কাজ চলছিল উঠোনে। সন্ধ্যার গাড়িতে পালং আসবে তার ভাইকে নিয়ে মুরাইয়ের ঘরে।

এক ফাঁকে কিছু ছোলাদানা ফেলে দিল সুবল ভাঁড়ের ফলিডলের মধ্যে। তারপর ইঁদুরের খাঁচা

পরিষ্কারের সময় সেই ফলিডল মাখানো ছোলাগুলো মিশিয়ে দিল সাদা ইঁদুরের খাঁচার অন্য খাবারের সাথে।

দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই ইঁদুরগুলো মরতে শুরু করবে। সন্ধ্যার আগেই সবক'টা মরবে। মরে গেলে দিদিমণি ওগুলো ফেলে দেবে। তখন ওগুলো নিয়ে যাবে সুবল। নাড়িভুঁড়িগুলো ফেলে দিলে কোনও ভয় নেই। ফলিডলে মরা মাছ এরকম করে খেয়েছিল সুবল। কোনও অসুবিধে হয়নি।

বিকেলবেলা বাবু সুবলের খোঁজ করলে। জানতে পারলেন নাকি? সুবল ভয়ে ভয়ে গেল বাবুর কাছে। বাবু বললেন— যা দিকিনি সুবল একবার ছুট্টে জয়কেষ্টপুরে। ইদ্রিস ডাক্তারকে ডেকে নে আয়। গোরুটার খুব কাঁপুনি লেগেচে,— লালা গড়াচ্ছে। সাথে করে নে আসবি।

অন্য কাউকে পাঠান বাবু, আমি কাজ করছি,— কাজের ক্ষতি হবে কেনে।

আমার কাজ আমি বুঝব, মায়ের চেয়ে মাসি দড়। মুরাইয়ের পা খোঁড়া, কেষ্ট বুড়ো, যেতে-যেতেই রাত করবে।

জয়কেষ্টপুর প্রায় দুই ক্রোশ পথ। সুবল ছুটতে লাগল। রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে সাঁইসাঁই করে ছুটতে থাকে। বনপাশ থেকে পালং-এর ট্রেনও এখন ছেড়েছে, ঝমঝমিয়ে— এর আগেই পৌঁছতে হবে, পাখা থাকলে উড়ত সুবল খাল পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে।

ইদ্রিস বাড়ি ছিল না। ওর জন্য একটু বসতে হল। তারপর ইদ্রিস এলে ওকে নিয়ে চলতে লাগল। ইদ্রিস বারবার পেছিয়ে পড়ছে। পথে রেলগাড়ি চলে যাবার শব্দ শুনল। সুবল ইদ্রিসকে ফেলে বারবার এগিয়ে যাচ্ছে।

বাবুবাড়ি ঢুকেই দিদিমণির কান্না শুনতে পায় সুবল। যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে জিজ্ঞাসা করল সুবল, দিদিমণি কাঁদে কেন!

— কীসের মড়ক লেগে শখের বিলিতি ইঁদুরগুলো মরে গেছে রে।

— আহা চ্ চ্। ইংদুর গুলান কই, না— এমনি, মরার পর দেখতাম। আমিই গু-নাদি পোষ্কার করতাম কিনা। কথাগুলো যদিও বানিয়ে বলেছিল সুবল, বলার পরমুহূর্তেই মনে হয়েছিল কথাটা বানানো নয়, সত্যি, ভীষণ সত্যি কথা, ওর ইঁদুরগুলোর জন্য খুব কষ্ট হচ্ছিল।

— মরা ইঁদুরগুলো মুরাই নিয়ে গেছে।

প্রায় ছুটেই মুরাইয়ের বাড়ি ফিরল সুবল, বাড়িতে ভিড়। পালং আর ওর ভাই মেঝেতে শুয়ে ঝপটাচ্ছে। মুরাইয়ের বউ টিনের থালায় বাতাস করছে, কেউ জল ঢালছে। পালং-এর ডুরে শাড়ি জলে কাদায় একাকার।

কী হল কী?— কী হল?

ফ্যানারি পরা কোঁড়া মাগীমদ্দরা সবাই সুবলের দিকে কপাল কুঁচকে তাকাচ্ছে নাকি?

মুরাই বললে— কী জানি রে ভাই— তবু পালং এল, বসল। তারপর বাবু বাড়িতে মড়ক লেগে যে ইঁদুরগুলো মরে গেছিল ওগুলো নে এসেছিলাম তো,— পালং আসবার পর ভাবলাম নাড়িভুঁটিগুলো দিয়ে ক'টা বড়া বানাই কুটুম দুটোকে দিই, পরে তু এলে মাংস রান্না হবে। তা ওগুলো খেয়েই ওরা এমন ধারা করতে নেগেছে।

সুবল এবার ঝড়ের মতো ছুটল।

তেরাস্তার মোড়ে এসে থমকে দাঁড়াল ও। কোনদিকে যাবে সুবল। রাস্তার একমাথা গেছে বাবুবাড়ির দিকে। আরেক মাথা ডাক্তারবাবুর বাসার পানে। পেছনের রাস্তায় পালং মরছে।

পালং মরছে সুবলের জন্য। ঝড়ের নারকোলগাছের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে ইচ্ছে হল সুবলের, না, না, না। ওকে দুর্গাপুর নে গেল বাবুরা— বাবুদের পয়সা বাঁচানোর জন্য। ও মাইন্দার তাই ওর কথার দাম নেই। ও তো মাইন্দার হত না। ওর বাবাও চাষি ছিল। গোলা ছিল। হাঁস ছিল। ওর বাবা ছিল মাথা উঁচু করা অবাধ্য চাষি। বুড়ো লগন দাসের কাছে শুনেছে সুবল, বাবুরাই বিষ খাইয়ে বলদ জোড়াকে মেরে সুবলের বাপকে মাইন্দার বানিয়েছে।

তেমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে ক্রমশ দানোর মতো বিশাল হতে থাকে সুবল।
দীর্ঘ শীতের পর সাপেরা জেগে উঠছে। বাউরি পাড়া থেকে গান আসছে—

কেলে যারে যারে তুই চম্পাই নগর
দংশি এসো গা বালা লখিন্দর
যেতে লারব লারব চম্পাই নগর
চম্পাই নগরে আছে লোহারই বাসর...

সুবল এখন কোনদিকে যাবে? ডাক্তারবাবুকে আনতে গেলে টাকা চাই। টাকা চাইতে বাবুবাড়ি যেতে হয় আগে।

বাবুবাড়ি গিয়ে ও কী বলবে?

ডাক্তারবাবুকেও বলতে হবে যে ইঁদুরের পেটে ফলিডল ছিল।

বাবুবাড়ির গোমস্তার কাছ থেকে একভাঁড় ফলিডল চেয়ে এনেছিল সুবল।

একফোঁটা ফলিডল লগন দাস পায়নি ওর ডিংলা গাছের শুঁয়ো মারতে—

তেমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুবল। একেবারে কলে পড়ে গেছে সে। কলে কি এখন পড়েছে, কলে তো আটকানোই ছিল।

ও ক্ষোভে ওর মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে। কালো কালো পাথরের মতো শরীর কী রকম গোলাচ্ছে।

তেমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবে— এ কল থেকে বের হতে হলে এই তিন পথের একটাও নয়। অন্য রাস্তা চাই।

এখনই কলে পড়েনি সুবল, কলে সে পড়াই আছে। এ কল থেকে বেরুতে হলে বাবুদেরও কলে ফেলতে হবে।

সুবল ক্রমশ বিরাটাকার হয়ে উঠতে থাকে, তারপর বিরাট বিরাট লম্বা পায়ে দৈত্যের মতো ডাক্তারবাবুর বাড়ির দিকে চলতে থাকার ইচ্ছে হতে থাকে সুবলের। গিয়ে বলবে টাকার কথা পরে, আগে চলুন। যেতে হবে। নইলে আশেপাশে গান হচ্ছে—যারে যারে তুই চম্পাই নগর...।

'ভূমিসূত্র', ১৯৮১

ঢোঁড়া উপাখ্যান

দু'পাশের সবুজকে ছিঁড়ে রমারম চলে গেছে লাল রাস্তা। রু-রু-রু বাতাস। বংকা দাঁড়িয়ে পড়ে।

— একটা বিড়ি খাবার মন করে।

— ধুস। বিড়ি খাবি কীরে, চল পা চালিয়ে, স্যারের এখনও চ্যান খাওয়া হয়নি। নস্করীবাবু বলে। নস্করীবাবুর হাতের আঙুলে সিগারেট।

— না বাবু, এট্টু বিড়ি না ছাড়া চইলবে নি। এট্টু রোসো।

— 'এক পয়সার মুরগি তো চার পয়সার পুদ্‌গানি'— নস্করীবাবু নিজে নিজে হাওয়া আর ধানগাছের কাছে বলে। আড়চোখে অফিসারের দিকে একবার তাকায়। অফিসার তখন আকাশের মেঘে কুড়িমুড়ি দিয়ে বসা বোতলদৈত্যটাকে দেখছিল।

বংকার মাথা থেকে নস্করীবাবু বেডিংটা নামায়, কালো ট্রাংকটা নামায়। কালো ট্রাংকের গায়ে সাদা রঙে লেখা অমিতাভ মুখার্জি, ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসার।

— এখানে বসুন স্যার, এই ট্রাংটার উপর। একটু রেস্ট নিয়ে নিন, নস্করীবাবু বলল। নস্করীবাবু হল ভাসাদেউলে ক্যাম্পের আমিন।

— আপনার দুটো চিঠিই পেয়েছিলাম স্যার, আপনার লাস্ট চিঠিটায়, ডেটেড টোয়েনটি ফিফ্‌থ অগস্ট, লিখেছিলেন ফোর নুনে জয়েন করবেন। বেলা এগারোটা থেকে বসে আচি স্যার।

— দু'ঘণ্টা তো বসে রইলাম গুস্‌করায়, কাসেম-নগরের বাস নেই। গলসি থেকে তো স্টার্ট করেছিলাম সকাল সাড়ে সাতটায়।

আবার চলতে শুরু করে ওরা। আর কদ্দুর নস্করীবাবু?

— তা ধরুন আরও তিন কিলোমিটার টাক।

— হুঁ।

তার মানে দাঁড়াচ্ছে— ওর যেখানে থাকতে হবে, সেখান থেকে নিয়ারেস্ট বাসরাস্তা ৮/৯ কিলোমিটার দূর। কী আজব জায়গায় ট্রানসফার। অমিতাভ ভাবে।

— অফিসে কাজ-কম্মো হচ্ছে কিছু? অমিতাভ জিজ্ঞাসা করে।

— রাজা নেই তো রাজ্য চালাবেক কে? অফিসার কই?

— অফিসারটা কেমন?

— গেলেই দেকবেন।

— থাকব কোথায়?

— আমরা তো অফিসেই থাকি। আপনি অফিসার মানুষ, দেখুন...

— আচ্ছা, আনন্দ কোঙারের নাম শুনেছেন? গলসির আনন্দ কোঙার!

— মানে হাঁদুবাবু তো? কেন বলুন দেকি!

— না, এমনি। এখানেও ওনাকে চেনে?

— আমার ভায়ের একটা চাকরি করে দিয়েছিলেন তো, একটা এমেলের চিঠি এনে দিইছিল আমার সোম্বন্ধী। সেই চিঠি নিয়ে ওনার কাছে গেলাম, ব্যবস্থা হয়ে গেল। হাঁদুবাবু লোক খুব ভাল...।

অমিতাভ অনেকক্ষণ আর কোনও কথা বলে না। নস্করীবাবুও ঠিক বোঝে না সাহেব হঠাৎ চুম্ মেরে গেলেন কেন।

অমিতাভ এবার বংকার কাছে যায়।

— তোমার নাম বংকা?

— আজ্ঞা।

— বংকা কী?

— দাস।

গলার তুলসীমালার কণ্ঠি দেখে জিজ্ঞাসা করল, বৈষ্ণব?

— আমরা বলরামি।

— সেটা আবার কী?

— সেটা হল বলরামি।

— থাকা হয় কোথায়?

— থেকেও আছি গো, থেকেও নেই,

যেমন তুমি আর আমি রে ভাই—

চক্ষু মেলিলে সকল পাই

চক্ষু মুদিলে কিছু নাই।

নস্করীবাবু অমিতাভর হাত ধরে মৃদু টান দিল।

— ওকে বকাবেন না স্যার, ও একটা খ্যাপা। নিজেকে ভাবে রামচন্দ্র। আসলে ও জাতে হাড়ি।

— নাম তো বলল বংকা দাস।

— আরে দাস তো সবাই, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও দাস কালিদাসও দাস আবার বংকা দাসও দাস। ও হল নিরাপদ চ্যাটার্জির মাহিন্দার।

বংকা এবার রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে যায়। অমিতাভর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠতে নস্করীবাবু বলে— অনেক শর্টকার্ট স্যার, আবার রাস্তাতেই উঠব ফের।

ভাঙা জমি। পতিত। পাথুরে। কাঁটাঝোপ, তাতে হলুদ ফুল, মাঠের মাঝখান দিয়ে টায়ারের গভীর কারুকাজ।

— এটা কীসের দাগ নস্করীবাবু?

— মাটির তলায় তেল আছে ভেবে অনেক লোকজন আর বড় বড় গাড়ি এয়েছেল গত সাল। মাস তিনেক তোলপাড় করে চলে গেল।

মাঝে মাঝে গর্ত। মাটি ফুঁড়ে চাগিয়ে আছে পাথর। বংকা অনেকটা এগিয়ে গেছে। অমিতাভ হুচোট খায়। নস্করীবাবু চেঁচিয়ে ওঠে। লাগেনি তো স্যার? অ্যাই বংকা, কায়দা দেকাচ্ছিস! ফোঁপড়ি করে কে তোকে মাঠ ঠেঙে যেতে বলেছিল? রাস্তা দিয়ে গেলেই তো হত।

বংকা দাড়িয়ে যায়। বলে, আগে হাঁটনি, পাঁঠা কাটনি মাটি নিরোয়, পোয়াতির ধাই, এসব কম্মের যশ নাই।

নস্করীবাবু অমিতাভর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে কিছুটা ঘাড় বেঁকাল। যার মানেটা দাঁড়াল— দেখলেন তো, যা বলেছিলাম...

হলুদ টিনের পাতে কালো কালিতে লেখা— 'সেটেলমেন্ট হলকা অফিস। ভাসা দেউলে'। পাকা বাড়ি। দেয়ালে সদ্যমারা পোস্টার— কাসেমনগর ফুটবল মাঠে যাত্রাপালা— সিঁথির সিঁদুর। পরবর্তী আকর্ষণ ফুলনদেবী। টানা বারান্দা, তিনটে ঘর।

— এই যে স্যার অফিস ঘর। পাশের এই ঘরে আমরা কোনওরকমে থাকি, আর এই ঘরে রান্না।

— বাথরুম নেই?

— ওটা স্যার বাইরে যেতে হয়।

অমিতাভর কুঞ্চিত কপালে বিরক্তি চিহ্ন নস্করীবাবুর নজর এড়ায় না।

— আমিন আর নেই?

— আর একজন আছে স্যার, নারায়ণ গড়াই। দেশে গেচে।

— পেসকার?

— দেশে।

— পিওন?

— আসবে স্যার। এখন দেশে।

সকালবেলা উঠতে একটু দেরি হয়ে যায় অমিতাভর। বেশ ঝলমল করছে রোদ্দুর। বারান্দা জুড়ে গোটা দশ-বারো বাচ্চাকাচ্চা। নস্করীবাবুর খালি গা। অমিতাভর বসার চেয়ারটা বার করে বসে পড়াচ্ছে— স্বরে অ খিয় অক্ষ। দ খিয় দক্ষ...।

সকালবেলাটায় সামান্য টিউশনি স্যার।... নস্করীবাবু বলে।

অমিতাভর গায়ে তোয়ালে জড়ানো, হাতে টুথব্রাশ, বাইরে বেরুচ্ছে, এমন সময় ধুতি ও হাফ পাঞ্জাবি পরা ফরসামতো একজন, পাকাচুল, পুরো বডিটাই হাসছেন, হাতজোড় করে বললেন— আপনি বুঝি নতুন সেটেলমেন্ট অফিসার? নমস্কার। আমি নিরাপদ চ্যাটার্জি। অমিতাভ এক হাতের টুথব্রাশ অন্যহাতের সিগারেটের সঙ্গে লাগিয়ে মাথা নিচু করে।

নিরাপদবাবু বলেন— বাহ্য ফিরতে যাচ্ছেন বুঝি? যান। আমি বসচি।

— কিছু দরকার?

— সবসময় কি দরকার-অদরকার বিচের চলে? আমি আসি। খোঁজখপর করি।

— ও। ভাল কথা। আনন্দ কোঙারকে চেনেন? গলসির?

— হাঁদু কোঁয়ার? খুব করিতকর্মা লোক। কেন, কী হয়েচে?

— না, এমনি।

অমিতাভ বাইরে আসে। পর পর দশ-বারোটা কাঁচা ঘরের পরই আকাশের নীল মাঠের সবুজে মিশেছে। মাঠ দাপানো হাওয়া। ওর আর কিছু না। এখন একটু আড়াল চাই।

গলসিতে বেশ তো ছিল অমিতাভ। জি টি রোডের উপরই অফিস। উলটোদিকে বিডিও অফিসের স্টাফ কোয়ার্টার। এক ব্যাচেলর এক্সটেনশন অফিসারের কোয়ার্টারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে ছিল। স্যানিটারি ল্যাট্রিন ছিল, ট্যাপ ওয়াটার ছিল। সন্ধের পর পাশের কোয়ার্টারে গিয়ে, বউদি চা খাব...

গলসির সেটলমেন্ট অফিসে এক দুপুরবেলা এসেছিল আনন্দ কোঙার।

এই একটু আলাপ করতে এলাম, নিন, সিগ্রেট খান।

এক্কেবারে কচি বয়েস আপনার। ফাস্ট পোস্টিং।

কিছুদিন পরই তদন্তের কাজ শুরু হল। মাঠে গেল অমিতাভ।

ডি ভি সি-র খাল মাঠ এফোঁড় ওফোঁড় করে চলে গেছে। সেচের জলে বছরে তিনবার চাষ।

— ৬৭ নম্বর দাগ?

— শালি। দং আনন্দ কোঙার। পিং দীনবন্ধু। ৮০ শতক।

— ৬৯ নম্বর।

— শালি। দং বিভাবতী দেবী। স্বামী আনন্দ কোঙার ৫৫ শতক।

— ৭০ নম্বর?

— নিস্তারিণী দেবী। স্বামী রাধামাধব যশ। সাং বারাণসী। ৬৯ শতক। লিখুন বর্গা দখল আনন্দ কোঙার।

— সে কী কথা আনন্দবাবু, কী বলছেন? আপনি বর্গাচাষি?

আনন্দবাবু হাওয়াই শার্টের তিন নম্বর আর চার নম্বর বোতামের ফাঁকা দিয়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—

— আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বিধবা মামিমার জমি ভাগে চষি।

— আপনি নিজে চষেন?

— অতশত নিকেশ নিচ্ছেন কেন বলুন তো? গভর্নমেন্ট বলছে বর্গা রেকর্ড করতে, আপনি রেকর্ড করুন। যত রেকর্ড করতে পারবেন আপনার প্রমোশনের ভাল হবে।

— আমার প্রমোশন আপনাকে ভাবতে কে বলেছে?

— আচ্ছা, ঠিক আছে মশাই, বর্গা লিখতে হবে না। নিস্তারিণী দেবীর নামটাই লিখে রাখুন।

— আপনার মামিমা কোথায়?

— বললুম তো, কাশীবাসী। চাষ করে আমি ওনাকে টাকা পাঠাই।

— ওনার কত জমি আছে?

— তা বিঘে চল্লিশ হবে।

— টাকা পাঠিয়েছেন এমন মানিঅর্ডার রসিদ আছে?

— সেসব কি যত্ন করে রাখা করেছি?

— আপনার মামিমা ফসলের টাকা পেয়েছে, এমন চিঠিপত্র আছে কিছু?

জামার ভিতর থেকে হাত বের করে আনে আনন্দ কোঙার। সিগ্রেট ধরায়। অমিতাভ বলে, মামির নামের দলিল রয়েছে— তাতে কী হয়েছে? আদৌ আপনার মামিমা আছেন এমন প্রমাণ দেখান।

— তা হলে কাগজের জোরে করবেন না?

অমিতাভ ভিতরে ভিতরে বেশ থ্রিল্ড হচ্ছিল। সিলিং ফাঁকি দেয়া নিট ১৪ একর জমি বার করে ফেলেছে ও। অমিতাভ শিমোর নিস্তারিণী দেবী সম্পূর্ণ ফল্স্।

সন্ধ্যাবেলা আনন্দবাবু হাজির। হাতে এক বাক্স মিষ্টি।

— একা একা বসে আছেন, আরে বে-থা করুন ভাই। কেউ ঘরে এলে চা করে দেবারও কেউ নেই।

— ঘরেই এসে গেছেন? তা আপনার মামিমার চিঠিপত্র খুঁজে পেলেন?

— চিঠিপত্র খুঁজে পাওয়া কি খুব শক্ত ব্যাপার নাকি? দরকার হলে কাশী থেকে এক ডজন চিঠি লিখিয়ে আনতে পারি।

আনন্দবাবুর হাতটা ওর বুকপকেটের কাছে যায়। বলে, অতসব ফ্যাচাং-এর দরকার নেই। এটা ধরুন। দু' হাজার আছে।

অমিতাভ উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করেছিল— এক্ষুনি বেরিয়ে যান, টাকা দেখাতে এসেছেন!

আনন্দবাবু হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তারপর দাঁতমাজার আঙুলটা নাড়িয়ে বললেন— আমার নাম হাঁদু কোঁয়ার। আগুরির বাচ্চা বটি। আমিও দেখে নেব। কাজটা ভাল করলেন না।

পরে জেনেছিল হাঁদুবাবু একজন বিখ্যাত লোক। চারটে বাস লাইনে খাটে। বর্ধমান বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। কোল্ডস্টোরেজ আছে একটা। এখানকার গলসির স্কুলের জন্য জমি দান করেছিলেন উনিই, বর্ধমান শহরে থাকেন, ওখানে বাড়ি আছে, এখানে মাঝে মাঝে আসেন।

মাসখানেক পরে অমিতাভ খাকি খামে অশোক স্তম্ভ লাগানো রেজিস্ট্রি চিঠিতে জেনেছিল— গভর্নর ইজ প্লিজড টু ট্রানসফার শ্রীঅমিতাভ মুখার্জি, কে জি ও গ্রেড ওয়ান টু ভাসাদেউল হলকা অফিস ইন দি ইন্টারেস্ট অফ পাবলিক।

একটু আড়াল খুঁজছিল অমিতাভ। অবশেষে একটা ছোটমতো কালভার্ট পায়। আস্তে জল বইছে। এখানেই একটা পার্মানেন্ট ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? ওর অফিসে কিছু ইট পড়ে থাকতে দেখেছিল, ওখান থেকে দুটো ইট দুই হাতে নিয়ে গেজেটেড অফিসার হাঁটছে কালভার্টের দিকে, তখন বংকার সঙ্গে দেখা...

— কী ছ্যার, আপনার হাতে ইট? দেন দেন, আমার হাতে দেন, কোথায় নে যাব?

অমিতাভর বলতে লজ্জা করে কোথায় নিতে হবে। বলে, তোমার দরকার নেই। তোমার নিজের কাজে যাও।

বংকা যাবার সময় বিড়বিড় করে— আমি যাই তিনি তাই, যা তিনি তাই তুমি, বোবা কালায় কয় কথা, ইন্দুরে খায় বিড়ালের মাথা।

খ্যাপা নাকি? অমিতাভ ভাবে।

ইট দুটো নিয়ে কালভার্টের তলায় চলে গেল অমিতাভ। ইট দুটো পেতে নেয়। তলায় জল। নিরিবিলি। কাশফুল দুলছে।

ক'দিন পরে ওই কালভার্টের ওখানে যাবার সময় দেখে, একটি ১২।১৪ বছরের ছেলে ইট দুটো নিয়ে যাচ্ছে। অমিতাভ ঘাবড়ে যায়।

— আরে আরে এগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

— শান হবে। পা ধুবার শান।

— মানে?

— পা ধুয়া হবে, পায়ে কাদা মোট্টে লাগবে না।

নিরাপদবাবু রোজই প্রাতঃভ্রমণে বের হন। পঁচাত্তরেও সুন্দর স্বাস্থ্য। গোয়ালটা, মরাইটা, দিঘিটা, একটু তদারকি করে অফিসটায় আসেন। আসলে এটা তাঁরই তো বাড়ি। বড় ছেলেটা এখানে ডাক্তারি করবে ভেবে রাস্তার ধারে এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন, কিন্তু ছেলে বর্ধমান টাউনেই ডাক্তারি করে। ওখানেই একটা ছোট করে নার্সিংহোম বানিয়েছে।

নিরাপদবাবু জিজ্ঞাসা করেন— কী সাহেব, আপনি নাকি দুটো ইট দু' হাতে নিয়ে হাঁটছিলেন? ব্যায়াম করছিলেন নাকি?

অমিতাভ একটু হেসে নিয়ে ব্যাপারটা বলে। আর বলে— সব কিছু পারি নিরপদবাবু, মাঠে বসে ওইটে পারি না।

নিরাপদবাবু বললেন— ছ্যাঃ। আমারই তো আগে তত্ত্বতালাশ নেয়া উচিত ছিল। আপনি সিধে আমার বাড়ি চলে যাবেন। কোনও সংকোচ করবেন না।

— হুঃ। তা কি হয় নাকি? আপনার বাড়ি যাব ওইটে করার জন্য?

— শুধু ওইটি করার জন্য যেতে কে বলেছে? সবসময় যাবেন। আমার ছোটছেলেটি তো আপনারই বয়সি। বিকাশের সাথে আলাপ হয়েছে?

একদিন নিরাপদবাবুর সঙ্গে ওবাড়ি গেল অমিতাভ। পাঁচিল ঘেরা একতলা বাড়ি, উঠানে বিশাল মরাই, উঠানের কোনায় পায়খানাটাকে আঙুল উঁচিয়ে দেখালেন নিরাপদবাবু। ভালই হল, বাড়ি থেকে বেশ দূরেই আছে। বারান্দায় শস্যের ঘ্রাণ ও ইঁদুরমারার কল। নিরাপদবাবুর স্ত্রী দুধ মেরে ঘরে তৈরি করে ক্ষীরের নাড়ু ও বেশি মিষ্টি দেয়া চা দিলেন। বিকাশের স্ত্রীর চুড়ির শব্দ ও গলার স্বর শুনল। নিরাপদবাবুর ছেলে গোলগাল চেহারার বিকাশ বি কম পরীক্ষা দিয়েছিল, হয়নি। একটা ট্রাক্টরের জন্য ব্যাংক লোন চেয়েছিল, মায়ের দয়ায় হয়ে গেছে। গলায় ঝোলানো সোনার হারের লকেটে মিনে করা মা কালী স্পর্শ করে হাত কপালে ছোঁয়াল। শিগগিরি ট্রেনিংয়ে যেতে হবে হরিয়ানা। বিকাশ বাগানে নিয়ে গেল। সিগারেট বের করল। নিন স্যার। ধরান একটা। বিকাশের পরনে কর্ডের প্যান্ট এবং পলিয়েস্টার গেঞ্জি। আঙুলে প্রবাল।

জানেন স্যার, বাবার খুব আপত্তি, বলছে বামুনের ছেলে চাষ করতে নেই। ট্রাক্টর তো কী হয়েছে, ওটাও তো লাঙল, কলের লাঙল। আমি ওসব মানি না। যত সব কুসংস্কার, আপনার কী ওপিনিয়ন স্যার?

অমিতাভ বলল, পাঞ্জাব-হরিয়ানায় উঁচু জাতের এডুকেটেড ছেলেরাই তো চাষ করছে...

বিডিও সাহেব ঠিক এই কথাই বললেন আমাকে। উনি আমাকে নিজের ছোটভাইয়ের মতো ভালবাসেন। ট্রাক্টর ছাড়া আর উপায় নেই স্যার, মুনিষ মজুররা পলিটিকস করতে শিখে গেছে। আজ এটা দাও, কাল সেটা দাও... আর পড়তা পোষায় না। আমার স্যার একটু সুবিধা আছে, জমিগুলো সব একলপ্তে। দু'-একটা এক্সচেঞ্জ করতে হবে। একটু দেখবেন স্যার...

চিঠি পাঠিয়ে দেশে পালানো স্টাফদের অফিসে নেয় অমিতাভ। কুনুর নদীর পাড়ে মাপজোক শুরু করে। বড় আঁকাবাঁকা নদী। বেহুলা নাকি এই নদী বেয়েই লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় ভেসেছিল। মনসার অভিশাপে নদীটা এরকম এঁকেবেঁকে গেছে।

কাজ থেকে ফিরে এসে একটু রিলাক্স করার জো নেই। একটা ঘরে এক গাদা স্টাফ। ওরা কাগজে মোড়ানো বই পড়ে, টুয়েন্টি নাইন খেলে, অমিতাভর বইপত্র ওলোটপালোট হয়। বিদিশার চিঠিও সম্ভবত খুলে পড়েছে...।

— আপনি অফিসার মানুষ, এসব আমিন-পিওনদের সঙ্গে থাকেন কী করে বলুন তো? নিরাপদবাবু একদিন একা পেয়ে বলেন।

— কী করা যাবে, সরকারের তো কোনও ব্যবস্থাই নেই।

— তব্বেই বলুন সরকার কী করে এই অফিসারদের কাছে ভাল কাজ আশা করবে?

অমিতাভ কিছু বলে না।

এক কাজ করুন মুখার্জিবাবু। আমার বাড়িতে একটা বাইরের ঘর এমনি এমনি পড়ে আছে। এটা বাবার আমলে গদিঘর ছিল। নিজের মতো থাকবেন। কেউ ডিসটার্ব করবে না, চলুন দেখবেন ঘরটা।

অমিতাভ দেখল, ধুলো ভরতি তক্তাপোশ আছে, টেবিল আছে, দক্ষিণের জানালা আছে। জানালার ধারেই বক ফুল গাছের পাতার ঝিরঝির। খুব পছন্দ হল ঘরটা। প্রাইভেট এম এ পরীক্ষাটা সামনের বছরই দিয়ে দিতে হবে। অমিতাভ বলল— আপনার ভাড়া নিতে হবে কিন্তু।

— সে দেখা যাবে খন।

আবার বংকার মাথায় চাপল বেডিং আর কালো ট্রাংক।

অমিতাভ নস্করীবাবুদের কাছেই খেতে আসে। খাওয়া খরচ খুব কম পড়ে। নস্করীবাবুর বুদ্ধি অসাধারণ। সবজির মাঠে চেন পিওন নিয়ে যার নস্করীবাবু, বলে মাপ হবে।

— ভরা খেতে লোহার চেন চললে ফসল নষ্ট হয়ে যাবে না?

— তা কী আর করা যাবে, সরকারের কাজ। অবশেষে ফয়সালা হয়। চেন পিওন কুমড়োটা মুলোটা নিয়ে ফিরে আসে।

— এসব কি ঠিক হচ্ছে? এভাবে মিথ্যে কথা বলে...

নস্করীবাবু বলে— আমরা হচ্ছি স্যার আমিন। আহাম্মকের আ, মিথ্যেবাদীর মি আর নিমকহারামের ন মিলে হচ্ছে গে আমিন। আমাদের ছেলেপুলের সংসার। দেশে টাকা পাঠাতে হয়। আমাদের এইভাবেই ম্যানেজ করতে হয়।

বিকাশ একদিন একটা কেরোসিন স্টোভ দিয়ে গেল। 'চা-টা খাবেন স্যার, যখন ইচ্ছে হবে। একটু চা-চিনি রাখবেন, আমি আধসেরটাক করে দুধ দিয়ে যাব।'

— দুধ-টুঠ দরকার নেই, আমার তো লিকার চা-ই ভাল লাগে। অমিতাভ তাড়াতাড়ি বলে।

বিদিশাকে চিঠিতে জানায়— আগের অসহ্য অবস্থায় আর নেই, একটু বেটার আছি। নিজে রান্না করে খেলে কেমন হয়? সহজ রেসিপি পাঠিয়ে দিয়ো। অভ্যেস হয়ে যাওয়া ভাল, পরে অনেক স্ত্রী-স্বাধীনতা হবে।

বিকাশ ট্রেনিং-এ যাবে। দেউলেগড়ে পুজো দেয়া হল। দেউলেগড় মানে একটা ছোটখাটো

টিপি। এখানে নাকি একটা দেউল ছিল। কুনুরের বানে সেই মন্দির ভেসে গেছে। তাই এই গ্রামের নাম ভাসা দেউলে। বিকাশের কপালে চন্দন তিলক। ওর মা যাবার সময় কড়ে আঙুল কামড়ে দিল। মাথায় আলতো থুথু দিল। বিকাশের স্ত্রী কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। সে বিকাশকে পা ছুঁয়ে নমস্কার করল। বংকার মাথায় বেডিং। গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে উঠানে। অমিতাভর ঘরে এল বিকাশ। 'আমার বাবা রইল। বাবাকে দেখবেন স্যার। আর আপনার টুকটাক কাজকর্ম বংকাকে বলবেন, করে দেবে। অ্যাই বংকা, সাহেবের জলটল এনে দিবি।'

গোরুর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয় অমিতাভ। বিকাশ আস্তে আস্তে বলে— এই বংকাকে নিয়ে খুব ঝামেলা, কাজকম্ম কিচ্ছু করে না, খালি খ্যাপামি। পুরনো লোক, তাড়াতেও খারাপ লাগে—। গোরুর গাড়িতে বিকাশের মা, বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যাবে বোধহয়। আরও দু'জন মাহিন্দার, ওরা বর্ধমান পর্যন্ত যাবে বোধহয়। আর বিকাশের মামাতো ভাই, হাওড়া পর্যন্ত যাবে বোধহয়। বিকাশের চোখে গগলস। পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দুগ্‌গা— দুগ্‌গা।

কুনুর নদীর পাড় থেকে মাপজোক সরে আসছে গ্রামের দিকে। নিরাপদবাবু একদিন সন্ধ্যাবেলা অমিতাভর ঘরে ঢুকলেন। হাতে সামান্য কচলানি ভাব। কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তো মুখার্জিবাবু। তার পরে বললেন— আমার জমিতে কোনও গণ্ডগোল পাবেন না মুখার্জিবাবু। কোনও বর্গা চাষ নেই, যা ছিল উঠিয়ে দিয়েছি। মুনিষ-মাহিন্দার দিয়ে চাষ করাই। ছেলেটা তো নিজেই চাষ করবে বলছে। বামুনের ছেলের এই কাজটা কি ভাল হচ্ছে!

তা— খারাপ কী? অনেকেই তো করচে, পাঞ্জাবে টাঞ্জাবে...

আপনারা পাঁচজনে বলচেন বটে, কিন্তু মন সায় দেয় না। পরে লোক পাওয়া যাবে, কী বলুন, ট্রাক্টর চালাতে জানে এমন লোক মাইনে দিয়ে রাখলেই আর নিজেকে চালাতে হবে না কী বলুন। এরপর নিরাপদবাবু বলেন— একটা আমবাগান ছিল আমার, পৈত্রিক, তা বিঘা বিশেক ছিল। আম মোটে হয় না, কেবল জঙ্গল, তাই ওটা কেটে সাফ করে চাষের জমি বানিয়ে ফেলেচি। আগেকার রেকর্ডে ওটা আমবাগান দেখানো ছিল। এখন নতুন রেকর্ডে স্যার ওটাকে আমবাগানই রেখে দেবেন। জমি দেখাবেন না...

ব্যাপারটা বুঝল অমিতাভ। পরিবার পিছু ৫২ বিঘে হল জমির সিলিং। এর বেশি হলে সরকার নিয়ে নেবে। কিন্তু বাগান থাকলে সে জমি রাখা চলে।

নিরাপদবাবু ছেলেদের নামে আলাদা আলাদা জমি সিলিং পর্যন্ত রেখেছেন। এখন আমবাগানটা যদি জমি দেখানো হয়, সেই জমি সরকারের ঘরে চলে যাবার কথা।

কপাল কুঞ্চিত হয় অমিতাভর। বলে— তা কী করে সম্ভব! ওটাকে চাষের জমিই দেখাতে হবে।

অমিতাভর হাত চেপে ধরেন নিরাপদবাবু। বাইরে বকফুল গাছের ঝির ঝির। ঘরের সদ্য চুনকাম হওয়া দেয়াল থেকে উঠে আসা গন্ধের মধ্যে নিরাপদবাবু বললেন,— আপনি আমার ছেলের মতো, এটা করে দিতেই হবে...।

বিদিশাকে চিঠি লেখার জন্য ডাইরির কাগজ ছেঁড়ে অমিতাভ। বেশ কিছুদিন আগেকার লেখা একটা ছড়া পায়।

হাঁদুবাবু হাঁদুবাবু কোথায় তুমি থাকো?
সর্বত্রই থাকি আমি খবরটা কি রাখো?
হাঁদুবাবু হাঁদুবাবু করছ তুমি কী
এই দ্যাখো না পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছি!
হেরে গেলে হেরে গেলে কানুনগো মশাই,
দুয়ো তোমায়, দুয়ো তোমায়, দুয়ো দিয়ে যাই।

আরো যদি হাঁদুবাবু আসে শত শত
করব না আর করব না আর আবার মাথা নত।

ধুস যত্তসব চাইল্‌ডিশ ব্যাপার। পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে অমিতাভ। এবার চিঠিতে লেখে... ব্যাড্‌লাক। কলকাতা গিয়ে এবার তোমার সঙ্গে দেখা হল না। পুরী কেমন কাটালে জানিয়ো। জানো তো এখন নিজেই রান্না করছি। খাঁটি সরষের তেল পাচ্ছি। ঘানিতে ভাঙা, কলকাতায় ভাবাই যায় না। তরকারি ভাতে দিয়ে দিই, দু-চার ফোঁটা সরষের তেল দিয়ে দিই, ব্যস। বংকা নামে এক আজব লোক আমায় জলটল এনে দেয়। সর্বক্ষণ বিড়বিড় করে। চ্যাটার্জিবাবুদের গোয়ালঘরের পাশে থাকে। খড় বিচালিতেই শোয়। বলে ও নাকি বলরামি। অথচ গলায় তুলসী মালা। ব্যাপারটা বুঝি না। এই চাকরিটা ভাল লাগছে না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন নজরে রেখো। টুকটাক পড়াশুনো করছি। এম এ-টা হয়ে গেলে একটা স্কুলে অন্তত হয়ে যাবে। বলো?

বিকাশ ফিরেছে। গালের দু'পাশে লাল লাল ছোপ। চোখের তলায় কালি। আর একটু ফুলেছে।

একদিন বিকাশ বলে— সে কী, আপনি নিজে বাসন ধুচ্ছেন, আমার কিন্তু চোখ টাট্‌ছে। খুব খারাপ লাগছে দেখতে। আমি একটা লোকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বাসন-টাসন মেজে দেবে।

— হ্যারিকেনের চিমনিটা পরিষ্কার করা মহা ঝ্যামেলার...

— ওটাও করে দেবে। সব করে দেবে, যা চাইবেন। বিকাশের চোখ দুটো একটু ছোট ছোট হয়, ঠোঁটে আঁকাবাঁকা হাসি।

একটা মেয়েকে নিয়ে এল বিকাশ। নাম কুসুম। বংকারই মেয়ে। ছোট বাচ্চা আছে একটা। বাচ্চাটা হবার আগেই লিভার-পচা রোগে মরেছে ওর স্বামী।

ভোর। সারারাত শিশিরের সোহাগ পেয়েছে মাঠ। মাঠের মাটিতে তাই ট্রাক্টর-টায়ারের আলপনা। ট্রাক্টর এসেছে গ্রামে। উঁচু সিটে বসে বসে ঘটঘট চালাচ্ছে বিকাশ। লাল ট্রাক্টর চলছে কেঁপে কেঁপে। চাষ নয়, এমনিই চালাচ্ছে হয়তো, খুশির চালানো হয়তো, গায়ে ছাপ ছাপ গেঞ্জি। মুখে সিগারেট। জানালায় চোখ রেখে তক্তাপোশে শুয়ে আছে অমিতাভ।

কুসুম বাসন মেজে এনে রাখল। অমিতাভর দিকে তাকাল। ভাসা ভাসা চোখের তলায় কালি। চোখ কিছু বলতে চায়।

— কিছু বলবে?

— না।

— তবে?

— কিছু না, বলে কুসুম চলে যায়। শাড়ির আঁশটে গন্ধ বাতাসে লেগে থাকে।

নিরাপদবাবুর বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ে এবার জোর করে বিকাশের সঙ্গে অমিতাভকেও ভাঁইফোঁটা দিয়ে দিয়েছে। নেমন্তন্নও ছিল। মুরগি-টুরগি হল। বিকাশ ওর ঘরে নিয়ে গেল অমিতাভকে। এই প্রথম। বিছানায় সত্য কাহিনি, তদন্ত কাহিনি এইসব। চুলের কাঁটা, ফিতে। মা কালীর বিশাল ছবি ঘরের দেয়ালে।

— একটা জরুরি কথা ছিল অমিতাভদা।

আর স্যার নয়, অমিতাভ মার্ক করে।

— আমাদের জমিতে অনেক সিডুলকাস্ট অনেকদিন ধরে আছে, কিছু বলি না আমরা। কোথায় যাবে ওরা। গাঁয়ে মাপ এলে ওদের কে...

উঠে দাঁড়ায় অমিতাভ। প্লিজ বিকাশবাবু, এ ব্যাপারে লিখে দেব। কিচ্ছু করার নেই। অমিতাভ পা বাড়ায়।

— আরে তা তো দেবেনই, সে কথা হচ্ছে না, বসুন না! উইলস-এর প্যাকেট বাড়িয়ে ধরে বিকাশ। বলে— পুকুরপাড়ের ঝুপড়ি-টুপড়িগুলোকে আপনি আপনার আইনে যা খুশি করুন, আমি কিছু বলব না। আমার রিকোয়েস্ট হল কুসুমের প্লটটা নিয়ে। কুসুমের শ্বশুর যখন ওখানে থাকত, তখন রাস্তাটা ছিল না। পরে রাস্তাটা হয়েছে। ফলে ওর প্লটটা হয়ে গেছে রাস্তার ধারে। আমি ট্রাক্টরটা উঠোনে নিতে পারি না, স্পেস কই? ত্রিপল দিয়ে রাস্তায় ঢেকে রাখি। কুসুমের প্লটটা পেলে ওখানে একটা শেড করে ট্রাক্টরটা রাখব। আমার বাড়ির কাছাকাছিও হবে। ওটা আমার পেতেই হবে আমিতাভদা।

— আর কুসুম? কুসুম কোথায় যাবে?

— কুসুম? ওর কথা কি আমি ভাবব না ভেবেছেন? ওকে ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেব।

— ব্যবস্থাটা কী করবেন ঠিক করুন, তাতে কুসুম রাজি হোক, পঞ্চায়েতকে বলুন, তারপর দেখা যাবে।

অমিতাভ ওঠে। বিকাশ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। ফিরে আসবার সময় বিকাশের স্বগতোক্তি শোনে।

খুব দরদ হয়েছে দেখছি। ওকে আমিই তো ফিট্ করে দিয়েছিলাম।

মাঠে যাবার পথে নস্করীবাবু অমিতাভর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল— একটা কথা বলছি স্যার, মনে কিছু করবেন না। আপনার ঘরে যে মেয়েছেলেটা কাজ করে, তার একটু উনকুট্টি আছে। মাটির তলার তেল খোঁজার পার্টি এয়েছিল না গ্রামে, তাদের চঞ্চলবাবু নামে একজনের সঙ্গে খুব লটঘট করেছিল। বিয়ের পরই তো ওর স্বামী লিভার পচা রোগে শয্যাশায়ী, অথচ বাচ্চাও একটা হল। লোকে বলে... কিছু ব্যাড মাইন্ড করলেন না তো স্যার, অনেকে আপনাকেও নিন্দেমন্দ করে, আপনাকে ভালবাসি, তাই বললাম।

অমিতাভ কুসুমকে তাড়িয়ে দেয়।

কুসুম চুপচাপ দাঁড়িয়ে হাত কচলায়। ভাসা ভাসা চোখের দৃষ্টি অমিতাভর দিকে।

— কিছু বলবে?

কুসুম মাথা নাড়ায়।

অমিতাভ টাকাপয়সা হিসেব করে দিয়ে দেয়। দু' টাকা বেশি।

কুসুম তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

— কিছু বলবে?

কুসুম মাথা নাড়ায়।

— তবে যাও।

কুসুম চলে যায়। শাড়ির আঁশটে গন্ধ থাকে।

পরের দিন সকালেই দেখা গেল কুসুমকে ওর ঘরে মরে পড়ে আছে। মুখ থেকে গাঁজলা উঠছে।

অমিতাভ ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। কুসুমকে ছাড়িয়ে দেবার কথা কাউকে বলতে পারে না, নস্করীবাবুকেও নয়। মানুষের চোখ দেখলেই ভয় পায় অমিতাভ। দু-এক জন বেশ কড়া মেজাজেই অমিতাভকে জিজ্ঞাসা করেছে— কুসুমের কী হয়েছিল বলুন। অমিতাভ বলেছিল বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু জানি না। কুসুমের বাবা অমিতাভকে কিচ্ছু বলেনি। বংকা যেমন বিড়বিড় করে, তেমনি করত, মাঝে মাঝে বলত— মরণ নেকা ছিল। বলাই জানে, বেগুনপোড়ায় মরণ নেকা ছিল, কুসুম করবে কী? তেলের ভিতর মরণ নুইকে থাকলে কুসুম করবে কী?

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এল। কুসুমের পাকস্থলিতে পোকা মারার বিষ পাওয়া গিয়েছিল।

পুলিশ এনকোয়ারিতে এসেছিল— নিরাপদবাবুদের বাড়িতে। দুধ মারা ক্ষীরের নাড়ু ও চা যথারীতি ছিল। অমিতাভর ডাক পড়ল। অমিতাভ চকচক করে জল খেয়ে ওবাড়িতে গেল। ছুটি নিয়ে বাড়ি বসে থাকলেই হত। ওঘরে ঢুকবার আগেই গলা শুকিয়ে গেল আবার।

— আপনার ঘরে কাজ করত?

— হ্যাঁ।

— কিছু হয়েছিল নাকি?

— না।

— ফ্র্যাংলি বলুন মি. মুখার্জি, ধরুন না গসিপিং হচ্ছে। মেয়েটার শুনেছি ক্যারেকটার ভাল ছিল না। এরকম কোনও ঘটনা হয়েছিল যে ও আপনাকে অ্যাপ্রোচ করেছিল, আপনি রিফিউজ করেছেন।

— না।

— লাস্ট আপনার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল?

বিকাশ তাকাল অমিতাভর দিকে। একটা চোখ টিপল। বিকাশ পুলিশকে বলল— কুসুম মুখার্জিবাবুকে নাকি চঞ্চলবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছিল— কলকাতায় চঞ্চলবাবু নামে কাউকে চেনে কি না।

— চঞ্চলবাবুটি কে?

— ওই চঞ্চলবাবুর সঙ্গেই কুসুমের গণ্ডগোল ছিল। ওই যে ও ওন জি সি-র তেল খোঁজার পার্টি এসেছিল, ওদের চঞ্চলবাবু নামে একজনের সঙ্গে খুব লটঘট হয়েছিল। বাচ্চাটা নিয়েও কোশ্চেন আছে।

বিকাশ পুনরায় অমিতাভর দিকে তাকায়।

ন্যাচারালি, মুখার্জিবাবু বলেছিল— ও নামে কাউকে চেনে না।

— কেসটায় বেশ ঘ্যানাপ্যাচা আছে। কমপ্লিকেটেড। আসুন না থানায় আজকালের মধ্যে। ডোন্ট ওরি।

বিকাশ অমিতাভকে পরে বলেছিল— চিন্তা করবেন না স্যার, সব ম্যানেজ হয়ে গেছে।

কুসুমের ননদ থাকে পাশের গাঁয়ে। কুসুমের বাচ্চাটাকে সে নিল। পঞ্চায়েতের মিটিং-এ ঠিক হল— বিকাশবাবু মানবতার খাতিরে পাঁচশো টাকা কুসুমের ননদকে বাচ্চাটা মানুষ করার জন্য দেবে। বিধবা কুসুম যে জমিটায় থাকত ওটার মালিক তো আসলে চ্যাটার্জিরাই, ওদের থাকতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কুসুমের মৃত্যুর পর ওই জমির মালিক চ্যাটার্জিরাই। আইন অনুযায়ী এটাই ব্যবস্থা।

একজন চোয়াড় গোছের পঞ্চায়েতের লোক বলেছিল— কুসুম বিষ তো খেইচে, কিন্তু ওই কীটপোকা মারার বিষ সে পেল কোন থে?

বিকাশ বলে— হ্যাঁ। আমাদের বাড়িও ঝাড়পোঁছ করত কুসুম। অন্য বাড়িও কাজ করত। কোত্থেকে বিষ চুরি করেছে কে জানবে, আর চুরি করে খেলে আমরাই বা কী করব?

কুসুমকে ছাড়াই সেবারের নবান্ন হয়ে গেল। ধনে গাছে সাদা ফুল, সরষে গাছে হলুদ ফুল। কৃষ্ণচূড়া শিরিষ আর আমড়া গাছের পাতা ঝরল, আবার নতুন পাতা এল, বসন্তের হাওয়া এল, দু-চারটে কোকিল এল।

ও এন জি সি-র তেল খোঁজা গাড়ির চাকার দাগ মুছে গিয়ে এখানে ওখানে এখন ট্রাক্টরের চাকার দাগ। কুসুমের ভিটেয় এখন উঁচু অ্যাসবেসটাসের শেডের তলায় বিকাশের লাল ট্রাক্টর দাঁড়িয়ে থাকে।

আজ অমাবস্যা। সকাল থেকে মাইক বাজছে। বিকাশ আজ কালীপুজো দিচ্ছে। ট্রাক্টরটাকে জবাফুলের মালায় সাজিয়েছে। ওই শেডের তলায় কালীমূর্তি। থানায় ও সি, পঞ্চায়েতের লোকজন সবার নিমন্ত্রণ। অমিতাভদেরও অফিসসুদ্ধ নিমন্ত্রণ। রাত্রে জেনারেটর চালিয়ে ভি ডি ও শো হবে। মুনিষ মজুরেরা, যাঁরা ট্রাক্টরের কারণে অনেকেই কাজ পাবে না, সবাই আজ রাতে

ভি ডি ও দেখবে। অমিতাভ আজ কলকাতা যাচ্ছে, দিন পনেরোর ছুটিতে।

ঘর বন্ধ করে চাবিটা দিতে গিয়েছিল নিরাপদবাবুর কাছে। নিরাপদবাবু বললেন— বিকাশটা কী শুরু করেছে দেখেছেন? ট্রাক্টর ট্রাক্টর করে একেবারে পাগলপারা হয়ে গেল। কী করে কিছু ঠিক নেই। ও তো আপনার ভাইয়ের মতো, একটু বোঝান না।

কী বোঝাবে অমিতাভ? অমিতাভ কিছু না বলে চলে আসে।

একটু বসুন মুখার্জিবাবু। আপনার বাড়ির জন্য একটু সরষের তেল নিয়ে যান। নতুবা সরষে উঠেছে, সবে ভাঙা করিয়েছি।

অমিতাভ বলে— না, না, ওসব নেয়া যাবে না।

— কেনে?

— এতটা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

— সে আমি লোক দিয়ে দেব।

— না-না-না, তা হয় না। লোকে কী ভাববে, না-না, আমি এইসব নিতে পারব না।

নিরাপদ বললেন— তবে আর একটু বসুন, এক্ষুনি আসচি। একটা খাম নিয়ে এলেন। বললেন— সামান্য কিছু আছে, আপিত্য করবেন না। এটা মনে করুন আমার আশীর্বাদ। আপনি আমার ছেলের মতো... আমবাগানের কেসটা আপনি করে দিলেন। কিছু না দিলে অন্যায় হবে।

অমিতাভ চারিপাশে তাকায়। শুধু একটা টিকটিকি আছে দেয়ালে আর মাইকে 'জিলে লে— জিলে লে— ...' অমিতাভ খামটা পকেটে পুরে নেয়।

রাস্তার মুখটাতে বিকাশ। কপালে তেল-সিঁদুরের লাল তিলক। খালি গা। বলল— আজ রাত্রে থেকে যেতে পারতেন অমিতাভদা। ভি ডি ও আনছি। টারজন, শোলে, প্রেমনগর...

অমিতাভ হাঁটছে। কোকিল ডাকল। মাইকের গান। একটা সাপের খোলস পড়ে আছে।

বুকের ভিতরটা খচখচ করে ওঠে অমিতাভর। পকেটের ভিতর থেকে বার করে। গোনে না। চারিদিকের হা— হা— শূন্যতার মাঝে অ্যাটাচি বাক্সটা খোলে। খামটা ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়, সামনের একাকী তালগাছটা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

জলতেষ্টা পায় অমিতাভর। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে।

আরও তিনটে গ্রাম পেরুলে বাসরাস্তা।

কী বলতে চেয়েছিল কুসুম? বলতে গিয়ে বলেনি?

রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে বংকা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা ছিপি আঁটা পলিথিনের পাত্র। বংকা বলল— আপনার জন্য দাঁড়া হয়ে রইছি। মুনিব পাঠাইলেন। মুনিবের হুকুম— বাসে উঠে দিতে হবে। আর এই চিঠি।

'ঘানিতে ভাঙা সরষের তেল পাঠাইলাম। আপনার বাবাকে নমস্কার জানাবেন। বংকা বাসে উঠাইয়া দিবে। আপনার চিন্তা নাই।'

বংকা বলল— আপনি আগে রওনা হয়েছেন, আর আমি মাঠ ঠেঙে দৌড়ে কত আগে এসে গেছি দ্যাখো।

অমিতাভ ভাবে ওকে ফিরিয়ে দেবে। তারপরই মনে হয়, থাক না, এই পাগলটা ছাড়া পৃথিবীতে কেইবা জানছে আর, খাঁটি তেল, দিদির বাচ্চা হবে, খুবই কাজে লাগবে। মাও খুব খুশি হবে। বাবা তেলমুড়ি খেতে ভালবাসে। বিদিশাকেও এক শিশি দেবে। সেবার ডায়মন্ডহারবারের হোটেলে গরম ভাত পেয়ে একটু হলুদবাটা আর সরষের তেল চেয়ে নিয়েছিল বিদিশা। খুব ভালবাসে।

অমিতাভ বংকাকে বলে— আমি এসব একদম পছন্দ করি না, বুঝলে, পাঠিয়ে দিয়েছে কী আর করা যাবে, চলো।

বংকা চলে। চলতে চলতে বলে— বলাইয়ের কেমন চাতুরী,

বাবু আনলেন ধরি।

যে রাঁধে না তাকেও দেয়

আবার রাঁধুনি নেই তো রান্না হয়। খাও বাবু, ভাল তেল, তোমার তেলে দোষ নাই। তোমার কুসুম পানা গতি নাই। ভাঁড়ার থিক্কে আনি নিজ্জে ঢেলেছি।

— এসব কী বলছ বংকা?

— বলছি বাবু বলায়ের দহায়। আপনার তেলে বিষ নাই। আপনার কুসুম পানা গতি নাই।

— কুসুমের কী হয়েছিল জানো?

— মরণ হইছিল। মরণ। বলাই ডেকেছিল। গরিবের ঢ্যামনামি হইছিল। বেগুনপোড়া তেল দে মেখে খাবার শখ হইছিল। গরিবের ওই শখ হয় কেন?

— তারপর?

— আর জানি না। গুরুর মানা। না জেনে বলতে নাই। তবে এট্টু তেল চেয়েছিল, বেগুনপোড়া মেখে খাবে বলে আমাদের ছোটবাবুর কাছে, এট্টু তেল চেয়েছিল সেটা আমি নিজে শুনেছি গ— শুনেছি।

— তা তুমি একথা আগে বলোনি কেন?

— কতই তো বললাম। বোবায় বলল— কালায় শুনল। বাঁজা নারীর ছেল্যা হল। তোমরা আমায় পাগলা বলো, ছাগলা বলো, আমার কথার দাম কী?

বংকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, ভিটেটা ছাড়তে কুসুম, পিরথিমির ভিটেটাই ছাড়লি...

— তা তুমি এ কথা বলোনি কেন?

— তা বোবায় বলবে কালায় শুনবে, বাঁজা নারীর ছেল্যা হবে। আমায় বলে পাগলা ছাগলা, আমার কথার দাম কী?

সামনের গ্রামটা নিকটবর্তী হয়। বংকা বলে— আমার লাতিটার জন্য এট্টু তেল দেবে বাবু?

— তোমার নাতি?

— হ। আমার লাতি, মানে কুসুমের ছা, এই গাঁয়ে ওর পিসিমার কাছে আছে।

অমিতাভ বলে— নিশ্চয়ই দেব, যতটা খুশি নাও, কীসে নেবে? এই সব সুদ্ধু নিয়ে নাও।

বংকা বলে— এট্টু গাঁয়ে চলুন বাবু, এই তো সামনে।

কী আর করা যাবে। বংকার পিছু পিছু চলল অমিতাভ। রাস্তায় শুকনো বিষ্ঠার মধ্যে মরে থাকা কৃমি। সামনে গ্রাম।

এই যে, এই ঘর। ঘরে লতুন খড় দেছে দ্যাকো, আলকাতরা দেছে। পাঁচশো ট্যাকার খেলা। কুসুম মরেছে, এনাদের ঘরে ট্যাকা এসেছে, পাঁচশো ট্যাকাগো বাবু।

বংকা হাঁক দেয়। লাতিটারে একবার দ্যাকা দিনি, চোকের দ্যাকা দেখি এট্টু। এক মহিলা শিশুকে নিয়ে এল। রোগা গায়ে ছটফটায় বংকার নাতি।

— শিশি দে দেকি একটা, বংকা বলে। ঘর থেকে শিশি আসে। থ্রি এক্স রামের। বংকা বলে— মাটির তলায় তেল খোঁজার বাবুদের।

বাবুর থে তেল চেয়ে নিচ্ছি এট্টু। রসুন দে ফুট্টে লিবি। খুব দলাইমলাই করবি, বুজলি। বংকা তেল ঢালে শিশিতে।

আর একটু নাও না, ভরতি করে নাও, অমিতাভ বলে।

বংকা হাতের চেটোয় একটু তেল নিয়ে ছেলেটাকে মাখায়। দলমলে হবি ব্যাটা, ভীম হবি, ভীম, দুর্যোধন শালাকে দিব্বি— এক্কেবারে পটকে, হেঁ-হঁ হেঁ... আজকে হল হাপুস হাপুস কালকে হবে ভোজ, কার জিনিস কে লিয়ে পালায় খোঁজরে ব্যাটা খোঁজ... দলমলে হবি ব্যাটা দলমলে হবি...

বংকা আগে আগে চলে। দুটো ফড়িং-এর ভোঁ ভোঁ আর প্লাস্টিক পাত্রে হালকা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। আর মাইলটাক পথ। রাস্তায় একটা সাপ। চিৎকার করে ওঠে অমিতাভ। বংকা খুব শান্ত গলায় বলে— ঢোঁড়া। অমিতাভ বলে— এত সাপ কেন বল তো, কত খোলস দেখলাম। বংকা বলে— শীত ঘুমের পর এখন সাপেরা সব জাগতিছে। কিন্তু এটা ঢোঁড়া। সামনে গিয়ে জোরে লাথি মারে বংকা, সাপটা মাঠে গিয়ে পড়ে।

ঢোঁড়া সাপের বিষ নেই, তাই না বংকা?— অমিতাভ বলে।

— না, ঢোঁড়ার বিষ নাই। আগে ছিল। সব সাপের চেয়ে ঢোঁড়ার বিষ ছিল বেশি।

— তারপর?

— মা মনসা তো ঢোঁড়াটাকে পাঠাইলেন লখীন্দরের লোহার বাসরে। ঢোঁড়া সাপ নদী পার হচ্ছে— শুনুন তবে গল্পটা—

আঁকিয়া বাঁকিয়া ঢোঁড়া গাং পার হয়।
গংগা দেবী সে সময় কৌশল করায়।
সিরজিলেন মায়া মৎস্য ঢোঁড়ার সম্মুখে।
মাছের ঝাঁক দেখ্যে ঢোঁড়ার নোলা আসে মুখে।

ক্যানোনা, গংগা দেবী জানতেন, ঢোঁড়ার বিষ আছে বটে কিন্তু লোভটাও আছে বড়, ঢোঁড়া তখন কললে কী—

বিষ দন্ত খুলে ঢোঁড়া পদ্মপাত্রে রাখে
তারপর ছুট্যে গেল মাছের সম্মুখে।

ঢোঁড়া তখন সব ভুলে গেল বাবু। মা মনসা যে কাজের ভার দেছিলেন সব ভুলে গিয়ে মাছের পিছনে ছুটল ঢোঁড়া।

অমিতাভ বংকার মুখের দিকে তাকায়। বংকা নির্লিপ্ত। দূরের মাঠের দিকে চেয়ে ভাবলেশহীন বংকা বলে যায়—

বহু দূরে চলে গেল ঢোঁড়া। তারপর হল কী মায়া মৎস্য অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর ফিরে এল ঢোঁড়া। যে পদ্মপাতে বিষদাঁত রেখেছিল, সেখানে গিয়ে দেখে—

বোলতা ভীমরুল চেলা এবং পিঁপড়ি,
মৌমাছি কাঁকড়া বিছা নিছে লুট করি।

সেই বিষদাঁত আর সে পায় না। তারপর কেঁদে পেদে ও মনসার কাছে ফিরে গেল।

মা মনসা বলল— ছি— ছি— ছি, এত লোভ তোর? মাছের লোভে কাজ ভুললি?

অমিতাভ বংকাকে ফেলে এগিয়ে যায়। শুকনো ধানগাছের গোড়া ওর পায়ে খোঁচা দেয়। শূন্য মাঠের হা-হা উত্তপ্ত হাওয়ায় ওর কপালের ঘাম শুকোয়। মাথার মধ্যে হ্যাজাক বাতির শোঁ- শোঁ।

বংকা চেঁচিয়ে বলে— সেই থেকে ঢোঁড়ার আর বিষ নেই গ বাবু। যে মানুষ ঢোঁড়াকে দেখলে ভয়ে পালাত, সে মানুষ এখন ঢোঁড়াকে পায়ে মারে, পিষে মারে।

অমিতাভ মাঠের মধ্যে কিলবিল করে।

পরিচয়, ১৯৮৭

পেপসি আনে গাঁয়ের আলো

মুসুর ডাল আড়াইশো।

আর?

হলুদ গুঁড়ো ধনে গুঁড়োর প্যাকিট পঞ্চাশ পঞ্চাশ দ্যান। জিরে গুঁড়ো আছে, জিরে?

হ। আছে।

পঞ্চাশ গ্রাম দিবেন।

ভানুবাবু গলা চড়িয়ে বলে— জিরে একশো কুড়ি টাকা কিলো।

পঁচিশ গ্রাম দেন তা হলে।

ভানুবাবু হলুদের প্যাকেট বার করতে করতে বলে, তো বউয়ের কী হল রে খ্যাংড়া। গুঁড়ো মশলা লিচ্চিস যে বড়, বউ কয়েচে বুঝি, বাটনা বাটা লাইরব?

খ্যাংড়া বলল, কলির বউ...।

ভানুবাবু বলল, বললেই শুনতে হব্যে? মাথায় উঠোচ্ছিস। হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে।

ঠিক কথা বইল্লেন।

তা কী দেব? গুঁড়ো হলুদই দেব নাকি গোটা?

গুঁড়ো, জরি প্যাকিটের।

আচ্ছা, তাই নে, ভানুবাবু ভাবল— আমার কী, আমার তো ব্যবসা। খা।

এটা কী ঠাকুরমশাই? হরলিস?

ভানুবাবু একটু কটমট করে তাকিয়ে বলল— হ্যাঁ।

দাম কত?

বাহাত্তর টাকা। সেভেনটি টু। বুইজলি?

কমাটা নাই? কমা?

কমা মানে হচ্ছে দু' নম্বরিটা।

এসব জায়গায় নকল বোরোলিন, সানলাইট, লাক্স, রকমারি পাউডার এসব পাওয়া যায়। ফেরিওয়ালারা ঝুড়ি করে নিয়ে এসে ফেরি করে। ভানুবাবুও রাখে। এখানে কমা মালের ডিমান্ড আছে। তবে ভানুবাবু ফেরিওয়ালার কাছ থেকে নিতে যাবে কেন? খোদ বাঁকুড়ার মাল রাখে। বোরোলিনের কমা মালের নাম বোরোনিল ল্যাকমের নাম লাইক মি... এরকম। এ ছাড়া হুবহু লাক্স আছে, রেকসোনা-লাইফবয়-সানলাইট আছে। প্যাকেটটা সেম সেম। এসব মালে সেন্ট খুব জব্বর হয়।

হরলিস কমাটা নাই আইজ্ঞা?

হরলিক্স কমা হয় না। ভানুবাবু একটু খিঁচিয়ে ওঠে। সেদিনও খেতিস আটা গোলা। এখন হরলিক্স মারাচ্ছিস— মনে মনে বলে।

হামহাম সাবান দ্যান একটা।

কমাটা? নাকি আবার অরজিনাল কোম্পানির মাল চাই?

কমাটা।

খ্যাংড়া সমস্ত বাতাস সাবানটায় মাখিয়ে বুকের ভিতরে নিয়ে বললে, দেন একটা।

ভানুর অবাক অবাক লাগে।

পেট ডিগ ডিগ খ্যাংড়া ঘুরত মাঠে বিলে। খ্যাংড়ার মা কাজ করত ভানুবাবুর খুড়তুতো ভাইদের বাড়িতে। ঢেঁকিতে ধান ভানত, বাসন মাজত। খ্যাংড়ার পরনে এখন জঙ্গলছাপ জামা, ফুলপ্যান্ট। হাওয়াই চটি।

এই জঙ্গলছাপ জামা আর ফুল প্যান্ট গ্যাট চুক্তি মানছি না মানব না করতে গিয়ে কলকাতার ফুটপাত থেকে নিয়ে আসা। এগুলোও কমা মাল। সেকেন্ড হ্যান্ড। পরা জামাপ্যান্ট। অনেকে বলে মরা সাহেবের।

জিনিসগুলো বড় ঠোঙায় দিতেই খ্যাংড়া বলল, পেলাস্টিকে দ্যান না কেনে, জরি পেলাস্টিক।

ভানু ওকে মালগুলো পলিথিনে পুরে দেয়। খ্যাংড়া একটা গানের সুর ভাঁজছে, ভানু চিনতে পারে। সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম।

এই গ্রামে ইলেকট্রিক লাইন এসেছে পাঁচ-ছ বছর হল। ভানুবাবু টিভি কিনেছে বছর দুই। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট চোদ্দ ইঞ্চি। এদিকে গাঁয়ের ষোলো আনা থেকেও টিভি কেনা হল গত বছর। একুশ ইঞ্চি। মনসা মন্দিরের ভিতরে টিভিটা রাত্রে মা মনসার পাশে থাকে, বাইরে ডবল তালা। সন্ধেবেলা টিভিটা তুলে এনে বাইরের চাতালে রাখা হয়। এই চাতালে সাক্ষরতার ক্লাস হত। এখন ওসব হয় না আর। বংকু, শুকনো, কাঁকড়া, রুপো, যারা অ-আ-ক-খ শিখেছিল, ভয় ও-কারে ট-ভোট পড়তে শিখেছিল। নাম সই করতে পারত। এখন চর্চা নাই বলে অনেকেরই খরচা হয়ে গেছে। এরকম কেসও নাকি হয়েছে, লোন নেবার সময় সই করে নিয়েছে, ফেরত দেবার সময় সই পারছে না। কোন 'প্রহ্লাদ' হয়তো অভ্যাস বশে হাত ঘুরিয়ে ওরকম কঠিন নামটা এখনও লিখে ফেলে, কিন্তু ভয়ে আকার ত ভাত লিখতে পারে না। ক খ গ ঘ হাঁকতে পারে, কিন্তু কোনটা ক কোনটা খ শুধোলে ভ্যাতরাবে। সাক্ষরতা স্লোগানগুলি মুখে নিয়ে ছোটরা এখন ছোটে। বাঁকড়া জেলা দিল ডাক, নিক্ষরতা নিপাত যাক— বলে এখন জলে ঝাঁপ দেয় কিংবা শিরতোলা চালতাপাতা কিংবা আস্ত কোনও পেঁপে পাতার ডাঁটিটা নিশানের মতো উঁচিয়ে হাঁকে— সাক্ষরতার পেপসি ভাল/পেপসি আনে গাঁয়ের আলো। আসলে এটা আদতে ছিল সাক্ষরতার পিপাসা ভাল/পিপাসা আনে জ্ঞানের আলো। এই স্লোগানটা এই গাঁয়েরই অনিল স্যারের তৈরি। এই সৃষ্টির ক'দিন আগেই টিভিতে আলোর পিপাসা সিনেমাটা দেখানো হয়েছিল যারা খেলার ছলে সাক্ষরতার পেপসি ভাল চেঁচায়, তারা সত্যিকারের পেপসি দেখেনি এখনও, মনসাতলার শালখুঁটির পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বরফের খাঁজে খাঁজে ছড়িয়ে পড়া পেপসি-ফেনা দেখেছে টিভি-তে।

ভানুবাবু পৈতেটা দু' হাতে ধরে নামা-ওঠা করিয়ে পিঠটা চুলকে নেয়। ঘাম। পলাশগুলো শুকিয়ে গেছে, শিমুল ফুল ঝরে পড়েছে ভুঁয়ে, লাল লাল নিম পাতাগুলি সবুজ হয়ে গেল, শিমের দানাগুলো শক্ত। একটা ফ্যান কিনে নিলে হয়। ঝালর লাগানো পাখাটা মৃদু মৃদু নাড়াচ্ছেন ভানুবাবু। দোকানের নাম দিয়ে একটা সাইনবোর্ড লাগাবেন নাকি? লাগালে হয়। সবকিছু স্টোর্স। বিষ্ণুপুরে দেখে এসেছে এই নামের একটা দোকান। বেশ রং চং করা সাইনবোর্ড ঝুলবে, প্রোঃ ভানুদেব চক্রবর্তী, লাওই। গ্রামটার নাম লাওই। আদিনাম লাকি লাবণ্যবতী। এখন লাওই নামটাও চলে না আর। লাউই হয়ে গেছে। রাস্তাটা পিচের হয়ে যাবার পর দুটো বাস নেমেছে লাইনে। রাজীব আর জ্যোতি। একই মালিকের দুটো বাস। বিষ্ণুপুর-দুর্গাপুর, ভায়া সোনামুখি, লাউই-বড়জোড়া।

বাঁকড়ো ভাষায় ন-ল এর বাপ মা নেই। নাপিত এখানে লাপিত, নাতি লাতি, কিন্তু লাল হয়ে যায় নাল। লাওই হয়ে গেছে নাউই। ভানু চক্রবর্তীরা বাঁকুড়ার আদি লোক নন। আদি নিবাস পূর্বস্থলী, বর্ধমান জেলা। ভরদ্বাজ গোত্রীয় সদবিপ্র। বিষ্ণুপুরের রাজা আনিয়েছিলেন ভানুবাবুর প্রপিতামহকে।

মুড দেখি মুড, এক প্যাকেট। সাইকেল থামিয়ে একটা ছেলে চাইল। ঠোঙায় মুড়ে প্যাকেটটি দিল ভানুবাবু। ছেলেটি এ গাঁয়ে থাকে না। বোধহয় স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের লোক, নাকি

বেসিক ট্রেনিং কলেজ? ওখানে আবার ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। ছেলেটার বে' হয়েছে কি না কে জানে?

ভানুবাবু সবকিছু রাখে এই দোকানে। এসব জিনিসও। ভানুবাবুর বন্ধুস্থানীয়রা কেউ কেউ নেয়। নিলে এই সবই নেয়। চার আনায় তিনটির জিনিস নেয় না। বাউরি-বাগদি-সাঁওতালরা কোনওদিন চায়নি এসব। ভয়ে কিংবা লজ্জায় ল্যাদা। তবু সব জিনিসই গাবা করতেই হয়। এ থলকুলে একটিই দোকান যেখানে সবকিছু পাওয়া যায়। মুদি-মশলা, স্নো-পাউডার, খাতা-কলম। সারিডন, জেলুসিল, সিগ্রেট, বই— কী যেন এক মেয়েছেলেদের লেখা বই লজ্জাও রেখেছিল পাঁচ কপি, এক কপি এখনও আছে। ডুম আছে, হিটার আছে। সবই রাখতে হয়।

জমি জায়গা আর তেমন কোথায়। ছিল, তখন চার আনায় তিনটি পাওয়া যেত না। ভানুবাবুরা সাত ভাই। ভানুবাবুর ঠাকুরদার দুই স্ত্রীর গর্ভে মোট এগারোটি ব্রাহ্মণ পুত্র। ফলে রাজার দেওয়া জমিজমা ছতিচ্ছিন্নি। যজমানিতে ঠাটমান বজায় রাখা যায় না। ফলে এই বৈশ্যগিরি। এখন যজমানির চেয়ে দোকানদারিই আসল হয়ে গেছে। তবু যজমানি ছাড়া যায়নি। দোকানদার হলেও ঠাকুরমশাই বলে সবাই। দূর গ্রামে যেতে হয় পুজো-বিয়ে-শ্রাদ্ধ শান্তিতে। একটা মোপেড কিনতে হয়েছে। দূরে গেলে বড়ছেলেকে বসানো যায় না দোকানে, পড়াশুনোর হ্যাম্পার হয়। এলেবেলে পড়ে। ছোট শ্যালকটি এখানেই থাকে, ওই শ্যালকটিকেই দোকানে বসিয়ে যজমান বাড়ি যায় ভানুবাবু মোপেডে। দোকান বন্ধ রাখা চলে না। দোকানই লক্ষ্মী। সোনামুখীতে গিয়ে বেশ খাসা একটা সাইনবোর্ডের অর্ডার দিতে হবে। সবকিছু স্টোর্স। স্টোর্স না, ভাণ্ডার।

দুই

হিট্টার আছে বামুন মশায়, হিট্টার?

হিটার কী হবে রে খ্যাংড়া?

বুড়িটা খালি বাখনা করছে যে থাকতে লারছি বাবু, গরম ওম লাগা বাপু...

তো?

ওম দিব্যে, কাঠ কুথা? জঙ্গল কমিটি হয়েছে, আমি নিজেও তার মেম্বর বটি। তা বাদে ওম দিব্যেক কে? আমার ইস্তিরি তো দিবালিশি বেলবালা করছে আর মেঁয়াটা শুঁটি ঝুলায়ে ইস্কুলকে যাঁইছে। তাই মন করছি ঘরে একটা হিট্টার কিনে দুব।

হিটার কিনবি? আমার কী? ভানুবাবু ভাবে, আঘন মাসে চুঁটিয়ার ও সাত বউ। শালা, হঠাৎ পয়সার মুখ দেখেছে। এখন যা অবস্থা ছেলের চেয়ে নাদ লম্বা। ষাট টাকায় যা বিক্রি করে, পঁচাত্তর চাইল।

দ্যান আজ্ঞে ঠাকুরমশাই।

খুব তেল হয়েছে তোর— বলতে গিয়ে ভানুবাবু বলে— খুব দেখি শখ তোর, ভাল। আর জঙ্গল পোড়ানো তো খুব খারাপ কথা। পরিবেশ অশুদ্ধ হয়। কারবোন ছাই হয়, সবই তো কঁয়েছে রেডিয়ো টিভিতে।

হিটারের বাক্সটা বগলে নিয়ে খ্যাংড়া বাউরি হাঁটছে। ধরাটা যেন সরা। পায়ের ইস্টেপিং দ্যাখো— য্যানো থানার দারোগা— এমন ধারা পারত ক'বছর আগে? খ্যাংড়াদের গায়ে জামা উঠেছে। পায়ে হাওয়াই চটি। ঘরটা তো তেমনই আছে এখন। দাওয়া এক হাতও উঁচু নয়। খড়ের চালা। খড় কি পালটেছে? কে জানে! এই গাঁয়ের বাউরি পাড়ায় যাওয়া হয়নি বহুদিন। তবে পলাশডাঙা-ছাতিমটাড়ের বাউরি ঘরগুলোতে সব ভানুবাবুরই যজমান। পলাশডাঙা গাঁয়ে ৩৬ ঘর কায়েত, ৮ ঘর পোদ, ১২ ঘর বাউরি। বামুন নেই। ভানুবাবুর বাবার যজমান গাঁ গুলি সব সাত ভাইয়ের মধ্যে বন্দোবস্ত হয়েছে। ভানুবাবুর ভাগে ওই গাঁ দুটো পড়েছে। ওখানে বাউরিরাও

কায়েত বাড়ির দেখাদেখি নিজেদের পুজো-আচ্চা শ্রাদ্ধ-শান্তি ব্রাহ্মণ ডেকে করায়। ওই গাঁয়ে বাউরি বামুন আর নেই এখন। যেমন নেই পটের গান, যেমন নেই দিশি সরপুঁটি। সবই তো জাপানি পুঁটি। বাউরি বামুন বললেই মনে হয় না জাঙিয়ার বুক পকেট? বোঝো, বাউরি, অথচ বামুন। এই যে ব্যাটা খ্যাংড়া, সে-ও কিন্তু বাউরি বামুনের বংশ। বাউরিরা নিজেদের ঘরের কাজকর্মের জন্য নিজেদের লোকই রাখে। বাউরিদের মধ্যে যাঁরা বাউরিদের পুজো-আচ্চা শ্রাদ্ধ-শান্তি করে, তারাই বাউরি বামুন। মনু বলে গিয়েছিলেন শূদ্রদের দশকর্মাদি করার দরকার নেই। তা শুদ্দুররা শুনল কই? ওরা অন্নপ্রাশন করে। অন্নপ্রাশনের নাম দিয়েছে ভূজনা। শজারুর কাঁটা চুলে ঠেকায়, পায়েস খাওয়ার, মন্ত্র বলে আবার, সব্ব মঙ্গল শিবশিব সাধি...। বলতে চাইছে সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। পায়েস খাওয়ার সময় শিবপ্রণাম মন্ত্র কোন শাস্তরে লেখা আছে ওদের মনসাই জানে। আসলে সদবিপ্ররা শূদ্র বাড়িতে কাজ করতে যান না। মনুর নিষেধ। যে ব্রাহ্মণ এসব করে, তারা নীচে নেমে যায়। ভানু চক্রবর্তীর বাবার নাম পি এম বাগচির অনুমোদক মণ্ডলীর লিস্টে, বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ছিল। পরে কেটে যায়। কে জানে কেন? কেউ চুকলি করেছিল? নিকুচি করেছে উপরে ওঠার। যস্মিন দেশে দ্রুম নাস্তি এড়গুপি দ্রুমায়তে। বেশ করছে। শুদ্দুররা বুঝি ইয়ে নয়?

ভানুবাবু যখন ওই গাঁয়ে যজমানি শুরু করেছিলেন, তখনও বাউরি বামুন ছিল। কাশ্যপ গোত্রের। কাশ্যপ না ছাই। আসলে কচ্ছপ। বামুনদের মতো জেতে উঠবার জন্য কচ্ছপকে কাশ্যপ বানিয়েছে। তা, ওই বাউরি বামুনটা নিজেদের কাজ করত টুকটাক। নিজেদের জাতের কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধকর্ম করত নিজেদেরই মতো করে। তরিতরকারি দিয়ে মেখে বাপ-ঠাকুরদার নাম করে শালপাতে রেখে দিত। মাংসও দিত। আরে... মাংস তো মাস্ট। পূর্বপুরুষকে ভাল জিনিসটা দেবে না? এখন তো ওরা ভানু চক্রবর্তীকে ডেকেই কাজকর্ম করায়। ভানু চক্রবর্তীর বাবাই শুরু করেছিলেন। এখন এক ঘর দু'ঘর করে সবাই ভানুবাবুকেই পুরোহিত করেছে। এটা যখন একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। 'আমাদের ঘরের কাজকম্মে চক্রবর্তী বামুন ডাকি'— এই কথাটার মধ্যে কোথায় যেন অহংকার। পলাশডাঙার দেখাদেখি ছাতিমটারের বাউরিরাও নিজেদের কাজকর্ম ভানুবাবুকে দিয়ে করাচ্ছেন। ভানুবাবু পিন্ডিতে মাংস নিবেদন নিষেধ করেছেন। বরং তিল-মধুতে আতপচালের পিণ্ড মেখে মধুবাতা ঋতায়তে মন্ত্র পড়ান। ওদের দিয়ে ওঁ শব্দের উচ্চারণ করান না, ওটা পবিত্র প্রণব। উটা লস্টো করা চলবেক নাই। পিণ্ডে জল দেবার পর— অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং মন্ত্রটন্ত্র করিয়ে ভানু চক্রবর্তী যখন পিণ্ডসূত্রটি সরিয়ে ওঁ পিণ্ডং গয়াং গচ্ছত বলে পিণ্ডটাকে ঠেলে সরিয়ে বলেন তোর বাপরে পিন্ডি গয়াকে চইলল, তখন কাঁকড়া, পিংলারা হাতজোড় করে নমস্কার করে, বেশ লাগে দু' হাত যেন নমস্কার মার্কা ডিটারজেন্ট সাবানের প্যাকেটের ছবি।

ওরা দক্ষিণা যা দেয়, এমন কিছু না। মোপেডের তেল খরচটাও ওঠে না। এখন আর এসবে পড়তা পোষায় না, তবু করতে হয়। করতে বাধ্য।

গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে অভ্যাস পালটেছে। বিশ্বাসও। ওদের মধ্যে পুরোহিত নেই আর। পলাশডাঙার ইচ্ছাই বাউরি মরে যেতেই সব শেষ। ভানু চক্রবর্তীর বাবা কলাটা মুলোটা দক্ষিণা পেত। এখন আর এতে পোষায়? তিরিশ বছর আগে কলাটা মুলোটা, গুড় চিঁড়ের ফলার আর ঢেঁকিছাঁটা লাল চালের ছোট্ট পুঁটুলিতেই খুশি। স্বপাকে পেট ভরা ডাল ভাত একটু পোস্ত, রাত্রে টুকচাক দুধ, ব্যাস। এতেই জগদীশ্বরকে মঙ্গলময় বলতে মন করত। এখন ফ্যান লাগে, টেরিকটন লাগে, কেক লাগে, হরলিকস লাগে...। উঠোনের মাটির তুলসীমঞ্চগুলিও সব ইটের হয়ে গেল। ঠাকুরের সিংহাসনে ক্রমশ ফিট হয়ে গেল প্লাগ, ডুম জ্বলে। এখন ভদ্দরলোকের বাড়িতে কাজে গেলে দক্ষিণা বাড়ানোর কথা বলা যায়। শাস্ত্র অনুযায়ী যেখানে খড়ম দান করার কথা, বলা যায়— খড়ম আজকাল পরছে কে, বাটার কিংবা অজন্তার হাউই দিওগ জোড়াক। ছাতার ক্ষেত্রেও বলা যায়— ফোলডিং বুঝ? তবে ওই জিনিসটিও দিয়ো। বাউরি-বাগ্দিদের কি এসব বলা যায়? গত

তিরিশ বছরে ভদ্রলোকদের তুলনায় ওদের তেমন কিছু হয়নি। ওদের চ্যাংড়া-চোটারা এখন ফুলপ্যান্ট পরে বটে, জংলাছাপ জামা পরে বটে, কিন্তু কাঁসার বাসনগুলি সব অ্যালুমিনিয়াম হয়ে গেছে। ওরা অমিতাভকাট, মিঠুনকাট চুল ছাঁটছে। কেবল জেতে ওঠার ইচ্ছে। তাই ওদের দেহারীর নাম করেছে বামুন। সাঁওতালদের ঘরে কেন গণেশের ছবি? গণেশ ওদের কে? এই গাঁয়ের লখাই বাউরি, যুগল বাউরি পকেটে ঝুলিয়েছে সাঁইবাবা। সাঁইবাবা কি যুগলকে পাত্তা দেবে? ওরা মনসার কাছে ধর্মরাজের কাছে মানত করলেও ভানুবাবুদের নারায়ণের কাছেও পুজো দেবে। ছেলেরা সি পি এম-এর মিছিলে যাবে আবার বিয়েতেও পণ নেবে বাবুদের দেখাদেখি। হিটার নিয়ে গেল খ্যাংড়া— বাবুদের দেখাদেখি।

খ্যাংড়ারা সব বেলমালার কাজ করে। খ্যাংড়ার পরিবারই শুধু নয়, এই লাউই গাঁয়ের বাউরি ঘরের অনেকেই এই কাজে মেতেছে আজকাল। ওন্দা, বড়জোড়া, জয়পুর, সোনামুখির মুসলমান ঘরের মেয়েরাই এই বেলমালার কাজ করত। বেলের খোলা থেকে সাইকেলের স্পোকের মতো লোহা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বেলের খোলার থেকে ছোট ছোট গোল গোল কুঁচি বার করা হয়। মাঝখানে থাকে ছোট্ট একটা ছ্যাঁদা। এর ভিতর দিয়ে সুতো গলিয়ে দিয়ে মালা হয়। ওই মালা বোষ্টম বোষ্টমিরা পরে। কণ্ঠী বদল হয়। মুসলমানদের হাতে বোনা ওই মালা হরি মন্দিরে যায়। শ্রীকৃষ্ণ পরেন, পরেন শ্রীরাধিকা। ওই মালা মঞ্জুষায় যায়। মঞ্জুশ্রীতেও যায়। যায় দক্ষিণাপনে। মালবিকা তমালিকারা পরে। একদিন দেখা গেল টিভি-তে খবর পড়ছে সংযুক্তা সিংহ, গলায় বেলমালা। শহরে গিয়ে এইসব বেলমালায় লকেট ঝোলে। রং হয়, নকশা হয়। এই বেলমালার ডিমান্ড বেড়েছে খুব। টিভি-তে যেসব অচেনা অচেনা ঘর দেখা যায়, সেইসব ঘরে চেনা বেলমালার পর্দাও দেখা যায় ফ্যানের হাওয়ায় নড়ছে, ওগুলো কনক-লক্ষ্মী-পদিদেরই করা। ছান্দারের অভিব্যক্তিতে ট্রেনিং দেওয়া হয়। কাজ শেখায়। খ্যাংড়া বাউরি ট্রেনিং পেয়ে এসেছে। ও বেশ মালা গেঁথে গণেশের শুঁড় বানাতে পারে, পর্দা পারে, বাহারের মালা পারে, একটা একটা বেলমালা কুঁচি কাগজের মধ্যে সেঁটে ছবি তৈরি করতে শিখেছে। খ্যাংড়া ওর বিদ্যা ওর পরিবার আর পাড়াকে দিয়েছে। বেলমালা-কুঁচি ছান্দারে দিয়ে এলে পয়সা পাওয়া যায়। ছান্দারে ব্যবসায়ী আসে, ফড়ে আসে, বলে শুধু বেলমালা-কুঁচি কেন, ডিজাইন করো, ডিজাইনের মালা করো, পর্দা করো, নকশা করো, আমরা নেব। খ্যাংড়াদের বাউরি ঘর এখন এইসব করে। খ্যাংড়াই কাজ শিখিয়েছে। শহরের ফড়েরা লাউই গাঁয়ে এলে খ্যাংড়ার সঙ্গেই যোগাযোগ করে। মালবিকা তমালিকাদের জন্য এসব কিনে নিয়ে যায়। খ্যাংড়া কমিশন পায়। খ্যাংড়া জংলাছাপ কেনে, হামহাম সাবান কেনে, হিটার কেনে, খ্যাংড়ার বউ গ্যাঁদা কনক লক্ষ্মী পদিদের সঙ্গে কুরচা নদীতে টুসু ভাসাতে গিয়ে গায়—

আমার টুসু গাঁথে বেলমালা গ
বারো টাকা ড্যাজন পাবে
সিনেমার বিটিছিলার মতন গ
চ্যাপটা পানা নজেন খাবে

বাউরি বউরা বারো টাকা ডজন কেন, বারো টাকা শ'ও পায় না। বারো টাকা ডজন স্বপ্নে থাকে, তাই গানেও থাকে। কমা বোরোলিনের টিউবের মধ্যে ফরসা হবার স্বপ্ন থাকে যেমন, তবু যা পায় ওরা, তাতেই বছরে একটা অন্তত সিঁথির শাড়ি কিনতে পারে। সিঁথির শাড়ি মানে সিনথেটিক শাড়ি। খ্যাংড়া আগে চাষের কাজ করত। এখন আর করে না। কমিশনের টাকা আছে, তা ছাড়া মেয়েছেলেদের দিয়ে বেলমালার কুঁচি করিয়ে নিজেই করে গণেশের শুঁড় বা অন্যান্য নকশা। এইসব কাজের সময় রেডিয়ো চালিয়ে রাখে। বিবিধ ভারতী এত দুরে আসে না। একটা টেপরেকর্ট কিনতে হবে। না হয় উঠানের অর্জুনগাছটা বেচে দেবে। হবে। একে একে সব হবে। এখন হিটারটা হল যেমন।

গলায় একটু ঢেলে এসেছিল খ্যাংড়া।

হিটারের বাক্সটা ঘরের সামনের দাওয়ায় রাখে। বাঁকুড়া বাস স্ট্যান্ডের ম্যাজিশিয়ানদের মতো বাক্সটার দড়ি খুলল। বাক্স ঘিরে খ্যাংড়ার বোন, বউ, ঠাকুমা। খ্যাংড়া অবাক করে দেবে বলে আগে কাউকে বলেনি। আস্তে আস্তে খুলল বাক্সটা।

কন্দ আলুর পানা সাদা ইটা কী বটে?

লাইনে ইলেকটিরিক দিলেই আংরা উগালবে ইটা। ইটা হিট্টার বটে হিট্টার। রান্না হবেক, সব হবেক। কেরোসিনি লাইগবেক নাই, কাঠ-কুঠা কিছো লাইগবেক নাই।

হ?

তবে বইলছি কী?

ঘরে প্লাগ পয়েন্ট ছিল না। এইটিই মাত্র বাল্ব জ্বলার ব্যবস্থা ছিল ঘরে, আর একটি মাত্র সুইচ। ক'দিন আগেই খ্যাংড়া ছান্দার থেকে মিস্ত্রি আনিয়ে একটা পয়েন্ট করে রেখেছিল। ওখানে প্লাগ ঢুকিয়ে দিতেই আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠল তার। আর খ্যাংড়ার বউ উলু দিল।

খ্যাংড়া দাওয়ায় দাঁড়িয়ে চ্যাঁচায়, এসো, সব দেখে যাও কেনে, হিট্টার।

হিটার দেখতে জড়ো হল খ্যাংড়ার জ্ঞাতি, বউদিরা, পিসি, প্রতিবেশী।

গনগন করে লাল বেরুচ্ছে।

বেগুন পোড়াটা ইটায় খুব ডাহিডুলা হবেগ।

খ্যাংড়া বলল, তুমাদের সব্বায়রে চা খিয়াব। সব্বায়েরে। যাও— যে যার ঘর থেকে কাপ লিয়ে আস গা।

গলায় কেমন যেন জোর। কথাটা বলার সময় মনে হল আদেশ। হাতটা সামনের দিকে এগোনো, স্টেজে যেমন নেতাদের হাত।

বেশি চিনি দিয়ে চা হল। জড়ো হয়েছে কানাভাঙা কাপ, অ্যালুমিনিয়াম বাটি, গ্লাস। খ্যাংড়া ওর বউকে বলল, ঢাল। খলখল দুলে উঠল খ্যাংড়ার বউয়ের প্লাস্টিকের দুল। খ্যাংড়ার মনে হল ওর বউ দয়া ঢালছে কানাভাঙা কাপে। খ্যাংড়ার মনে হল, ও কীরকম ভদ্রলোক হয়ে উঠছে।

খ্যাংড়া হঠাৎ বুকে চাপড় মেরে বলল, সব আমার উপর নিভভর রাখ। তুয়াদের ভাল হবে। শোন বলি, কেউ আর কলকাতার বাবুদের বেলমালা দিবেক নাই। সব মাল আমাকে দিবে, আমি পয়সা দুব।

বেলমালাকে মাল বলল খ্যাংড়া। খুব সহজে। বেলমালার রেট বেড়েছে। ওরা জানে না এখন। খ্যাংড়া সোজাসুজি বাবুদের কাছে মাল বেচবে। সাপ্লাই বলে এটাকে, সাপ্লাই। এদের থেকে কম দামে কিনে বেশি দামে ওদের বেচবে। ওরা আরও বেশি দামে অন্য কোথাও, তারপর ওরা আরও বেশি দামে...

খ্যাংড়ার জ্ঞাতি খুড়ো আন্নন। আন্দোলনের সময় জন্ম। লবণ সত্যাগ্রহের সময় জমিদার বাড়িতে ইংরেজদের পুলিশ এসেছিল। ধরপাকড় হয়েছিল, জমিদারের ছোটছেলের মাথা ফেটে গেছিল পুলিশের লাঠিতে, সেটাই হল আন্ননের বছর। ওই সময়ে জন্ম ওর। উনিই বাউরিদের বামুন। উনিই পঞ্চায়েতের মেম্বার। বাউরিদের ৬০ ঘরের প্রতিনিধি। শ্রাদ্ধ-শান্তি-ভূজনা-দোষ কাটানো-মনসাপুজো উনিই করেন। এবার বাউরি পাড়ায় সরস্বতী পুজো হল, খ্যাংড়াই লিডার। বাউরি পাড়ায় সরস্বতী পুজো এই প্রথম। সাক্ষরতা আন্দোলনের রেজাল্ট বলা যায়। আন্নন বাউরি কিন্তু সরস্বতী পুজো করল না। কিছুতেই না। ভয়ে। ভানুবাবুকেও বলেনি খ্যাংড়া। সরস্বতী পুজো এমনি-এমনিই হল। ঢাক পেটা হল। মাইক বাজানো হল। ভাসানে লাচালাচি হল, ব্যাস। আন্নন বাউরি নিষেধ করেছিল। বলেছিল সরস্বতী হল বাবুদের ঠাকুরানি— ওসবে যাসনি বাবারা। কেউ শোনেনি। শোনা যাচ্ছে আন্নন বাউরি পঞ্চায়েতের আসছে ভোটে টিকিট পাবে না। বয়স হয়েছে। আন্ননের বড়ছেলে শঙ্কর বাপের কাছে পুজো-আচ্চার কাজকর্ম শিখেছে কিছু কিছু। কিন্তু বড্ড বোকা

বোকা ভাব। গেনু নামে যে মেয়েটার মনসার ভর হয়, তার পেটে হয়ে গেল। কার দোষ কার দোষ নিকেশের সময় শঙ্করা স্বীকার গেল। ও কী করে নেতা হবে?

চা খেয়েছ সব? আর একদিন খাওয়ার সঙ্গে কড়মড়িয়া বিস্কুট।

তিন

সাইনবোর্ড ঝকঝক। সবকিছু ভাণ্ডার।

ধূপকাঠি।

আর?

অগরু চন্ন

আর?

আর যা যা লাগে। আপনিই তো বইলবেন।

আমাদের যা যা লাগে, তোদের কি তার সব লাইগবেক তাই? আমাদের সোনা লাগে, রুপা লাগে, মধু লাগে, ঘি লাগে নতুন কাপড় লাগে, কুশ, কড়ি, সরা... তুই বরং আন্নকে শুধিয়ে আয়।

আন্নন খুড়ো থাক। আপনিই বলেন না কেনে, দিয়া দ্যান যা যা লাগে। সোনাটা রুপাটা বাদ। ভানুবাবু ফর্দ করতে থাকেন। কাপড় আর কড়ি এ দোকানে নাই। বৈঠকখানার ঘি-টা নাই। ডেয়ারি ঘি, খরচটা বেশি।

ডালডা দেন কেনে।

তা কি হয়। গব্য ঘৃত লাগে। খ্যাংড়া মাথা নাড়ায়। গ-য়ে গোরু। ঘ-এ ঘি।

অপঘাত মৃত্যু। লয়? প্রায়চিত্তির, টুয়া প্রায়শ্চিত্য করিস। করতে হয়।

বলেন, আপনিই করে দ্যান কী করতে হব্যেক। মায়ের কাজটা ভাল করে করব।

ভানুবাবু একটু মাথা চুলকে নিল। বলল, কী করে কী হল ব্যাপারটা টুকচু বল কেনে, শুনি। তোর মা'র মৃত্যু কথা শুনা অবধি মনে অহিবিকলি চইলছে।

কী আর বইলব। যা হইল তার কিছো থলকুল নাই। কত কইরে নামতা পড়া কইরলাম তুমি এই জিনিসটায় মোটে হাত দিওনি। যা দরকার মুখফুটে হাঁকবে খালি।

চা দরকার, গরম জল দরকার— বউ দিব্যেক। আর বউটাও বলিহারি। কলির বউয়ের গতর লড়ে না। হুক করা ইলেকটিরি, য্যাত পারছে জ্বালছে। হিট্টারে মাছ, ভাত, সব পাক কইরছে। রেতে...।

এইভাবে খ্যাংড়া জানাতে লাগল ওর ঘরে চা হয়, চায়ে দুধ থাকে, মাছ হয়, রাত্রে রান্না হয়...।

এসব ছাড়াও ভানুবাবু যে গল্পটি পেলেন এবং যে গল্পটি শুনতে শুনতে জিভ এবং টাকরার ঘর্ষণে চুক চুক শব্দ করছিলেন তা হল খ্যাংড়ার মা হিটার অফ হয়ে যাবার পর গোবর ন্যাকড়া দিয়ে হিটারটা মুছত।

হিটার হলেও ওটা উনুন বটে তো। রান্না হল শকড়ি। বাউরি বাগদিদের আবার শকড়ি কী? কিন্তু খ্যাংড়ার মা বামুনবাড়ি কাজ করেছে, দেখেছে রান্নার পর উনুন লেপা পোছা হয়। খ্যাংড়ারাও বাউরি বামুনের বংশ। লেপা পোছা হবে না?

তো কাল রাতে রান্নাবান্নার পর খ্যাংড়ার বউ বাসন ধুচ্ছিল বাইরে। খ্যাংড়ার মা তখন গোবর ন্যাকড়ায় লেপাপোছা করতে গিয়েছিল হিটার। জল ন্যাকড়া হিটারে ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার। কেমন একটা শব্দ, লাইট নিভে গেল। খ্যাংড়ার বউ দৌড়ে এসে ঘরে শুধু গোঙানি শুনল। কুপি জ্বালিয়ে দেখল মা কালিবর্ণ। খ্যাংড়া তখন বড়জোড়া, মিটিং। ব্লকে একজিবিশন হবে।

ভানুবাবু বলল, বুঝলি, আসলে হিটারটা অফই হয়নি। ডালটাল উপচে পড়ে ফিলামেন্টে

কারেন্ট আসছিল না। কিন্তু বডি কারেন্ট হয়ে গেছিল। কেন হিটারে করতে যাস। সবার সব পোষায়?

কুকুরের পেটে ঘি হজম না হবার প্রবাদ বাক্যটা বলতে গিয়েও থেমে যায়।

খ্যাংড়া বলে আপনার উটা কমা মাল ছিল কিনা, কী আর কইরব।

ভানুবাবু লক্ষ্য করল কী আর কইরবর পর আইজ্ঞা শব্দটা থাকার কথা ছিল। কিন্তু নেই। আর হিটারকে বলল মাল। হিটারটা সত্যিই কমা মাল ছিল। ষাট টাকার জিনিস পঁচাত্তরে বিক্রি করেছে। ভিতরে ভিতরে একটু খচখচ করছে ভানুবাবুর। কিন্তু এটা তো ব্যবসা। এটাও ধর্ম। ব্যবসার ধর্ম এটা। বাজার। দামে না পোষালে খ্যাংড়ার উচিত ছিল না এটা নেওয়ার। নিয়তি যদি এভাবেই আসে কী করা যাবে।

ভানুবাবুর দোকানের সামনে, সবকিছু ভাণ্ডারের সামনে খাটিয়াটা থামল।

খ্যাংড়া বলল— এক টাকার খই দ্যান ঠাকুরমশাই। তারপর বলল, একটু মন্তর পড়ে গঙ্গা জল ছিটা করে দ্যান। আসল বামুনের মন্তরে মায়ের সগ্গবাস হব্যেক।

তখন ভানুবাবু-রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ গোত্র, রাজ ব্রাহ্মণ, ভানু চক্রবর্তী হয়ে ভাবলেন এ গাঁয়ে বাউরি ঘরে কাজ করবেন কি না। কমা ব্রাহ্মণ হয়ে যাবেন না তো। খ্যাংড়া বলল, খাটিয়া নামাও।

ভানু চক্রবর্তীর সামনে, তখন খ্যাংড়া বাউরি একা দাঁড়িয়ে নেই, বেলমালার কাজ করা বাউরির বসত, আলো উজলিছে ওদের ঘরে। গুঁড়ো মশলা কেনা, কমা বোরোলিন কেনা বাউরি বাজার।

ভানুবাবু দেখলেন, খ্যাংড়ার মায়ের শুকনো শরীর কালো, কালো, ব্ল্যাক হয়ে গেছে ইলেকট্রিক লেগে। দেহ নয়, বডি। ভানুবাবু জল ছেটালেন ও গয়া গঙ্গা পুষ্করানি চ...

খ্যাংড়া বলল— মায়ের আসল কাজটা কিন্তু আপনাকেই কইরতে হব্যেক, কুন নিষেধ শুনব নাই।

আন্নন বাউরি লাঠি হাতে একা একা হেঁটে যাচ্ছে। ওর অনেক পিছনে মাটিতে, ঘাসে, কচুপাতায় লাগছে মুঠো থেকে পড়া কুচি কুচি ভদ্রলোক ভদ্রলোক সাদা সাদা খই।

শারদীয় অমৃতলোক, ১৯৯৬

কালীবাবু ও কালু

কালীবাবু সস্ত্রীক ইন্দ্রপুরী হাউসিং এস্টেটে গিয়েছিলেন কমরেড কানাই ঘোষালের ফ্ল্যাটে। অটোমেটিক লিফ্‌ট-এ সাত নম্বর বোতাম টিপতেই লিফ্‌ট চলছে সেভেন্‌থ ফ্লোরে। কী হাওয়া, 'আরে এসো এসো।' হাওয়ায় র-সিল্কের পর্দার উচ্ছ্বাস! হাওয়ায় লেনিনের ছবি দেওয়ালে দুলছে, ছৌ মুখোশ দুলছে, 'বোসো, বোসো', কালীবাবুর ডান হাত সোফার দিকে, সোফার কুশনে কোথাকার যেন ফোক আর্ট। 'ওগো দেখে যাও, কালীপদ এসেছে সস্ত্রীক।' কালীবাবু বসলেন, বিড়ি ধরালেন। কানাই ঘোষাল লুঙ্গি ও গেঞ্জিতে ছিলেন। কানাইবাবুর স্ত্রী খদ্দরের পাঞ্জাবিটা কানাইবাবুকে এবং টেরাকোটা অ্যাশট্রে কালীপদকে এগিয়ে দিয়ে কালীপদর স্ত্রীর দিকে চেয়ে হাসলেন। 'তবে এসেছ, বাব্বাঃ, শেষ কবে দেখা হয়েছিল য্যানো, মার্কাস স্কোয়ারে, সলিল চৌধুরির ফাংশনে, মনে আছে?'

ম্যাক্সি পরা একটি মেয়ে উঁকি দিতেই কানাইবাবু ওকে ডাকলেন। 'শ্রেয়া আমার পুত্রবধূ। বিয়েতে তোমাদের বলেছিলাম তো, এলে না।'

তখন চৌধুরি কেমিক্যালস-এ স্ট্রাইক চলছিল না। সে সময় খুব ঝামেলা চলছিল। তোমার ছেলে ফিরবে কখন, বহু বছর দেখিনি।

এখানে নেই তো, কোম্পানি ট্রেনিং-এ পাঠিয়েছে—বুদাপেস্ট।

বুদাপেস্ট? বাঃ আরও প্রমোশন হল বুঝি?

হ্যাঁ, এবার প্রজেক্ট ম্যানেজার হয়েছে।

কালীবাবু এবার তৈরি হয়ে নেন অবশ্যম্ভাবী পরের বাক্যটার জন্য... 'এই ছেলে যখন জন্মাল, আমি তখন জেলে, পার্টি ব্যান। ছ' বছর পর বেরিয়ে এসে দেখি রেখা কঙ্কাল হয়ে গেছে... জীবনে কম স্যাক্রিফাইস করিনি।'

রেখা, মানে, কালীপদবাবুর স্ত্রী। ভারতীকে পারিবারিক অ্যালবাম দেখাচ্ছিলেন। কালীবাবু ও কানাইবাবু ভাল চা আর খারাপ সমস্যায় জড়িত হয়েছিলেন। পেইন্ট কোম্পানিগুলোতে ধর্মঘট চলছে। কালীবাবু পেইন্ট অ্যান্ড ভার্নিস শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। পেইন্ট কোম্পানিগুলোর মধ্যে অনেকগুলি মালটিন্যাশনাল কোম্পানি আছে। ভারতে একাধিক ফ্যাক্টারি। ওরা অন্য প্রদেশের ফ্যাক্টরির প্রডাকশনে মার্কেট রেখে দিয়েছে। ওদের লেবাররা মোটামুটি ভাল বেতন পাচ্ছে। ওরা ধর্মঘট চালাবার বিপক্ষে। ছোট কোম্পানির লেবাররা জঙ্গি! ওরা মালিকের শর্তে স্ট্রাইক উইথড্র করতে রাজি নয়। দুটো বাইপারটাইট হয়ে গেছে, ট্রাইপারটাইট হবে। মিনিস্ট্রি থেকে চাপ আসছে উইথড্র করার জন্য। লেবার ইন্ডাস্ট্রির কোনও পোর্টফোলিয়োই কালীবাবুদের পার্টির মিনিস্টারদের হাতে নেই। এখন কালীবাবুর কী স্ট্যান্ড নেওয়া উচিত, আগামী মিটিং-এ এটা উঠবে, তার আগেই আলোচনার জন্য এই হাই লেভেলে আসা।

জানালায় কী হাওয়া—হাওয়া। নীচে কলকাতা শহর যেন ঝুলন সাজানো।

অ্যালবাম খুলে রেখা বলে যায়... এটা ১৯৪২-এর ভারত ছাড়োর সময়ের। এই যে ৫৫-তে জেল থেকে ছাড়া পাবার। মুখভরতি দাড়ি। ৬৭-তে বিধানসভায় প্রথম ঢোকা। ৬৯ সালে নির্বাচন জয়ের পর এই যে, ছেলে-বৌমার সঙ্গে আমাদের রঙিন ছবি ৮০-তে। এই যে ডেলিগেশনে মস্কো। ৮১-তে, তাই না? ...ওই দ্যাখো...সেই মস্কোর বিখ্যাত ঘণ্টা। রেডস্কোয়ার কী সুন্দর না। দিল্লিতে

ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে করমর্দনরত। মিসেস গান্ধীর বেগুনি শাড়ি রুদ্রাক্ষের মালা সব স্পষ্ট। এবার ছেলের বিয়ের ছবিগুলো দ্যাখো...

৮২-র নির্বাচনে কলকাতার একটি কেন্দ্র থেকে পরাজিত হয়েছিলেন কমরেড কানাই ঘোষাল। এখন পার্টি সংগঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন।

খুব হাওয়া। কোত্থেকে একটা অশ্বত্থপাতা জানালা দিয়ে ঢুকল।

আপনার ফ্ল্যাটটা সত্যিই খুব সুন্দর কানাইদা, কালীপদর স্ত্রী বলল।

আমার ফ্ল্যাটটা বলছ কেন ভারতী, আমার কি এসব পোষায়? ছেলে অফিস লোনের টাকায় ফ্ল্যাটটা কিনেছে, আমার ঘরে দ্যাখো গে যাও তক্তপোশেই শুচ্ছি... সেই বিড়িই খাচ্ছি।

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল কানাইবাবু। প্রাচীরের গায়ে গেঞ্জি ও জিন্‌স পরা টিন এজার। গেটের সামনে ইউক্যালিপটাস ও দারোয়ান।

গেট থেকে বেরিয়েই কালীবাবুর স্ত্রীর প্রথম কথাটিই হল— ন্যাকামি... ছেলের লোনে কেনা...।

কালীপদ বলে— থামোঃ।

ভারতী বলে যায়— তখন মিনিস্টার ছিল বলেই ছেলের ওই চাকরি, ফ্ল্যাট... যেন কেউ কিছু বোঝে না।

মিনিবাসে বসার জায়গা পেয়ে স্ত্রীর পাশে বসে কালীবাবু হাতে মৃদু খামচি সমেত শোনেন— 'আমাদের একটা ফ্ল্যাট হয় না?— এত ভাল দরকার নেই, নিজেদের একটা ফ্ল্যাট হলে বেশ ইয়ে হয়।'

মিনিবাসে চোখ বুজে কালীবাবু নিজেকে একটা ফ্ল্যাটে কল্পনা করছিলেন, ...আঃ, কেমন যেন লাগবে। কী কালীবাবু, কোথায় থাকেন? না—ইন্দ্রপুরী অ্যাপার্টমেন্ট বালিগঞ্জ, অ্যাঃ, এইসব ফ্ল্যাটে, গুড মর্নিং, সি ইউ— ইম্পসিবল।

মহিম হালদার লেনের বাসাবাড়িতে ঢুকেই প্রথমেই সোঁদা গন্ধটা পেয়ে যায়। গত বাইশ বছরের চেনা গন্ধ। উঠানে উচ্ছিষ্ট। সিঁড়ির মুখেই কমন বাথরুমটা।

বহু বছরের আত্মীয় গন্ধগুলিকে আজ ভারতীর দুর্গন্ধ মনে হয়, নোংরা মনে হয় আজ, খারাপ লাগে।

আচ্ছা, তুমি লোন পেতে পারো না?

শোধ করব কী করে?

আচ্ছা, আমাদের কত জমানো আছে একটু হিসেব করে দ্যাখো না—

ধুস।

দ্যাখোই না—

পুঁজিবাদের সংকট ও এ বছরের বাজেট'। বুকলেটটার প্রচ্ছদের পিছনে কীসব আঁকিবুকি কাটল কালীপদ। আমার চার হাজারও যোগ করে নাও, ভারতী বলল। কালীপদ ভারতীর দিকে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বলল— একটা ফ্ল্যাট কেনার ওয়ান টেন্‌থও নেই।

দেশের জমিটা বেচে দিলে?

কালীবাবুদের কিছুটা, পৈতৃক ধানী জমি আছে। জমিটা বর্গা দেওয়া আছে। বর্গা রেকর্ডিংও হয়েছে। কালীবাবু নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বর্গা রেকর্ডিং করিয়েছিলেন, যে কারণে গ্রামপঞ্চায়েত কমরেড কালীবাবু জিন্দাবাদ পোস্টার মেরেছিল।

কালীবাবুর জমিতে যার বর্গা ছিল তার নাম কালীচরণ। সে কালীবাবুর চরণে হাত দিয়ে বলেছিল, আপনার কেনা গোলাম হয়ে রইলাম। কালীবাবু ওর দু'হাত টেনে ওঠালেন।

ছিঃ গোলাম-টোলাম এসব কি বলছিস কালু... আমরা সবাই সমান।

কালীবাবু এখন জমিটা বিক্রি করতে চাইলে— বর্গা সমেত বিক্রি করতে হবে। ফলে জমির দাম অনেক কমে যায়। বর্গা না থাকলে দামটা পাওয়া যেত। কিন্তু বর্গা উচ্ছেদ করা কালীবাবুর পক্ষে কি সম্ভব?

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মালিক পক্ষ বলেন— ওয়াশিং অ্যালাউন্স বাবদ সামান্য কিছু এবং যৎসামান্য দুর্মূল্যভাতা বাড়াতে রাজি। সরকারের প্রতিনিধি দুর্মূল্যভাতা আরও কিছু বাড়াবার জন্যে অনুরোধ করে জরুরি কাজে বাইরে গেলেন। কালীবাবু বললেন— আমাদের আসল ডিমান্ড হল হেল্‌থ সিকিউরিটি। রং কারখানার খারাপ পরিবেশে কাজ করতে হয়। ফ্রি মেডিক্যাল এবং কমপেনসেটরি ফুড অ্যালাউন্সের ডিমান্ড থেকে আমরা এক চুলও নড়ছি না।

মালিকপক্ষের একজন কালীবাবুর চেয়ারের পাশে এসে বসলেন। বললেন— অন্য প্রভিনসের মাল বাজার দখল করে ফেলেছে। ধর্মঘট চলতে দিলে ছোট এবং মাঝারি কোম্পানিগুলো রুইন্‌ড হয়ে যাবে। এখন ধর্মঘট তুলে নিন, পরে আলাপ আলোচনা করা যাবে। এ ব্যাপারে, ডোন্ট মাইন্ড, আপনাদের জন্য টেন থাউজ্যান্ড খরচ করতে রাজি আছি। ভেবে দেখুন।

কালীপদ সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে। বলে— লাল ঝান্ডার ইউনিয়ন করি, কথাবার্তা ঠিক করে বলবেন।

কিছুদিন হয় কালীপদর স্ত্রীর কাছে মহিম হালদার লেনের এই বাসা নরকের মতো মনে হচ্ছে। বাথরুম গেলে বমি বমি লাগছে।

কালীবাবুকে ভারতী আজ নালিশ করল— আজ সকালে সিঁড়ির কোনায় ঘুঁটে রাখা নিয়ে মল্লিকবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ভারতীর ঝগড়া হয়েছে। মল্লিকবাবুর স্ত্রী যখন মুখ ঝামটি মেরে বলেছে— কত গল্প মারাও... সব মন্ত্রীই আমার কর্তার বন্ধু, কত শুনি, তা যাও না, সল্টলেকের ফ্ল্যাটে যাও। ভারতী বলেছে— যাবই তো, তোমাদের মতো ছোটলোকদের সঙ্গে আর থাকব না, মরে গেলেও না। আজ আমাদের কেয়াকে কী করেছে জানো? কেয়া যখন বাথরুম ছিল, ভজহরিবাবু উঁকি দিয়েছে।

ভারতের ৮৯ শতাংশ পরিবার পাকাবাড়িতে থাকে না, যারা পাকাবাড়িতে থাকতে পায়, তাদের ৭৪ শতাংশের পৃথক জলকল নেই। এটা অবশ্য স্ত্রীকে বললেন না কালীপদবাবু, তেমনি এটাও বললেন না গত দু' বছরে কালীবাবুর বন্ধুস্থানীয়দের মধ্যে বেশ কয়েকজন তো ফ্ল্যাট বাড়ি ম্যানিজ করেছেন, কয়েকজন মিনিবাস, দু-একজন রেশনের দোকান।

কানাইবাবু ডেকে পাঠালেন। কালীবাবু সাততলার ফ্ল্যাটে কলিংবেল টিপতেই হাওয়া। হাওয়ায় চুরুটের গন্ধ। সোফায় মন্ত্রী। বড় পার্টির মন্ত্রী। কালীপদ জানে সরকারি ফ্ল্যাট বিলির ব্যাপারে এনার কতটা ক্ষমতা।

কানাইবাবু বললেন— শিল্পে একটা পিসফুল অ্যাটমোসফিয়ার তৈরি করার ব্যাপারে আমাদের পার্টি নীতিগতভাবে সম্মতি দিয়েছে। মন্ত্রী চা কেড়ে নিয়ে বললেন— বিচ্ছিন্নভাবে এই ধরনের আন্দোলন শিল্প পরিবেশকে ডিসটার্ব করে। আমরা যৌথ উদ্যোগ যখন স্কিম হিসেবেই নিয়েছি, তখন আমাদের এই রাজ্যে এমন কিছু করা উচিত হবে না...

কালীপদ বুঝতে পারে না— কার মুখ থেকে এই কথা শুনছে— চেম্বার অফ কমার্সের কোনও চাঁই নয়, কমরেড বিকাশ মজুমদার, যার কথা শুনে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ তুচ্ছ করে...

কালীপদ বলে, পার্টির যা ডিসিশন হবে, আমি তাই করব।

কানাইবাবু বললেন, তুমি যা ডিসিশন নেবে, পার্টি তাই মেনে নেবে।

কালীপদ মাথা চুলকায়।

বুকের ভিতর জেট প্লেনের শব্দ, ফ্যান দাও, আল্লাহ আকবর—বন্দেমাতরম— ইয়ে আজাদি ঝুটা হায়— সব একাকার হয়ে যায়।

কানাই বললেন, বাই দি বাই, তুমি সেদিন ফোনে ফ্ল্যাটের কথা বলেছিলে না, ফ্ল্যাটের মালিককেই বলো।

মন্ত্রী বললেন— কানাইবাবু বলেছিলেন। পলিটিক্যাল সাফারারের কোটায় কয়েকটা ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে। সিক্সটি পার্সেন্ট ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। এই চিঠিটা নিয়ে ইমিডিয়েট দপ্তরে গিয়ে...

শুনুন কালীপদবাবু, একটা মালটিন্যাশনাল কোম্পানি নৈহাটিতে একটা পেইন্ট ফ্যাক্টরি করবে বলে জমি কিনেছে। এখন বলছে করবে না। আমরা বোঝাচ্ছি এই সময় স্ট্রাইকটা হঠকারিতা হবে। 'বুঝলেন না?'...

'বুঝলেন না' শব্দটার মধ্যে একটা স্ট্রেস পড়াতে কালীপদর কাছে ওটা একটা মাইল্ড হুমকির মতো লাগল।

পেইন্ট শ্রমিক ধর্মঘট মিটল। মূল দাবি মিটল না। খুচরো কয়েকটা কনসেশন শ্রমিকরা পেল। কালীবাবুদের পার্টির কাগজে এটাকে শ্রমিক-শ্রেণির বিরাট জয়লাভ হেডিং-এ খবর ছাপা হল।

কালীপদবাবু ইতিমধ্যে আবাসন দপ্তরে এসেছেন। পলিটিক্যাল সাফারারের কোটায় ফ্ল্যাট হয়ে যেতে পারে। জেল খাটার ডকুমেন্টটা খুঁজতে থাকেন। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।

কালীবাবু হিসাব কষে ফেলেছেন। ফর্টি পার্সেন্ট ক্যাশ ডাউন করতে হলেও আরও হাজার বিশেক দরকার। গ্রামের জমিটা...

আবাসন দপ্তরের অফিসারটি বলেন— যা করার তাড়াতাড়ি করুন। আপনার ফ্ল্যাটটা আর বেশিদিন ধরে রাখতে পারব না বোধহয়।

কালীপদবাবু দেশে গেলেন। সোজা কালীচরণের ঘরে। কালীপদবাবু বললেন— বড় বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছিলুম কালু। আমাকে বাঁচা—।

কেনে কী হিছে কমরেট?

কালীপদবাবু কমরেড কথাটা শুনে প্রবল আশ্চর্যান্বিত হল।

কালীপদ বলল— ভীষণ বিপদ রে, কলকাতার বাসাটা ভেঙে দিচ্ছে কর্পোরেশন। নতুন ফ্ল্যাট কিনতে হলে অনেক টাকা চাই। তুই স্বেচ্ছায় বর্গাস্বত্ব ছেড়ে দিলে তোকে কিছু টাকা দেব। তা ছাড়া, যদি চাস, একটা কারখানায় চাকরির ব্যবস্থাও চেষ্টা করে ফেলব। জমিটা ছেড়ে দে।

কালু এতক্ষণ চিন্তা করে। বলে— অন্য কমরেটদের জিজ্ঞাস জেনে নিয়ে বলব।

ব্যাপারটা কালীবাবুর খুব খারাপ লাগে না। গ্রামে বেশ চেতনা এসেছে, তা হলে এতদিনের আন্দোলন একেবারে বিফলে যায়নি।

কালু যদি আলটিমেটলি রিফিউজ করে, তবে তো ব্যাপারটা মিটেই গেল। ওকে তো আর জোর জবরদস্তি করবে না, মনের দিক থেকেও কালীবাবু খালাস। সরকার ক্ষমতায় আছে, অনেকেই গুছিয়ে নিচ্ছে। কালীপদ পারল না। তাতে কী হয়েছে? মহিম হালদার লেনের বাসাবাড়িই বা মন্দ কী? ভারতবর্ষে ৮৯ শতাংশ মানুষ কাঁচাবাড়িতে...

পঞ্চায়েতের প্রধানের সঙ্গে দ্যাখা। উনি আবার প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। ১৬ বিঘে ধানী জমি, হালে ছেলের একটা রেশন দোকান হয়েছে। উনি কালীবাবুকে খাতির-যত্ন করলেন। দুধমারা ক্ষীরের সন্দেশ খাওয়ালেন। সমস্যার কথা শুনলেন। বললেন— কালই করে দিচ্ছি।

পঞ্চায়েত প্রধান কালুকে ডাকা করালেন। বললেন— তুই হলি একটা বোকা হাঁদা, তুই তোত্‌ড়া বটিস। এ সুযোগ হারালে তোর ছেইল্যা তোকে বাখান কইরবে। জমিটা যে দামে বিক্রি হবে, তার দু'আনা তোর নামে ব্যাংকে রাখা করিয়ে দুব। ষোলো হাজার হলে দু' হাজার তোর, তা ছাড়া চাকরি পাচ্ছিস। কোথায়— না কলকাতা শহরে— মিছিলে কলকাতা গেলে তো হাঁ করে শহর দেখিস। কোটা দালান, বাইস্কোপ ঘর দেখিস, সেই শহরে থাকবি তুই, আর এই কাঁকইড়া জমিতে পাছিসটা কী তুই? না দিছিস সার জল, না পাছিস ফসল।

কালুর সঙ্গে আসা খাড়া চুলের তেড়িয়া ছেলেটা বলল— বুঝি, বুঝি। কমরেটই হন আর যেই হন, বাবু বাবু ভাই ভাই।

ওই ছেলেটির দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকল কালীপদ। কালীপদর বুকের ভিতর থেকে একটা হাত জন্ম দিল তখন। ওই অদৃশ্য হাত ছেলেটির পিঠে প্রশ্রয়ের মৃদু চাপড় মারতে থাকল। একেই তো চেতনা বলে। এতদিনের বামপন্থী আন্দোলন কিছুতেই মিছিমিছি নয়। কালীপদ কিন্তু আসলে স্থাণুই থাকে মাথা নিচু করে। এবং নিজেকে ঢেকে রাখবার জন্য একটা অলৌকিক আচ্ছাদন কামনা করতে থাকে।

কালু তখন বলে— শহরে তবে কাজ হব্যে বলতেছেন...

কালীবাবু মৃদু মাথা নাড়ে।

আড়াই হাজার লগদ বলতেছেন...

কালীবাবু মৃদু মাথা নাড়ে।

ঠিক আছে তবে, বর্গা ছেড়ে দুব কেনে...

কালুর মুখখানা তখন কাঁচাধানের শিষ চুরি হওয়া ধানমাঠের মতো।

পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন, শ' পাঁচেক ট্যাকা ওর হাতে দিয়ে দেন কালীবাবু। কালীবাবু দেয়। শুকনো শীর্ণ হাতে কালু টাকা ক'টা নেয়। মুঠো করে দলামোচড়া করে। তারপর ডুকরে কেঁদে ওঠে। প্রধান বলেন বিকেলে আসিস রে কালু। কাগজ তৈরি করাচ্ছি। ছাপ দিবি। কালু চলে যায়।

প্রধান কালীবাবুর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়ে বলেন, জমিটা কিন্তু আমার শালাকেই দিবেন। শালার জমিটা ওর লাগোয়া।

বিকেলে কালু আসে, টিপ ছাপ দেবে। কালুর কপালে মাটি; গায়ে, হাতে, পায়ে, কাদামাটির চিহ্ন, শুকিয়ে যাওয়া রক্তবিন্দু। কানের গহ্বরে শুকনো দুব্বো ঘাস। চোখ লাল।

এতক্ষণ তুই লুটিয়েছিলি বুঝি, গড়াগড়ি দিয়েছিলি তোর ওই ভূঁয়ে? জড়িয়ে ধরেছিলি বুঝি জে এল নম্বর তিনশো বারোর ওই মনভাসানি মৌজার সাঁইতিরিশ আর আটতিরিশ নম্বর দাগ? বিদায় জড়ানো। আর তখন ওই মাঠের আল, ঝরা ধান, ইঁদুর গর্ত, জমা জল, কাঁটানটে, উচ্চিংড়ে, আর কেঁচো কেন্নোর তাবৎ ইতিহাস, জল্পকথা আর মর্মবৃত্তান্ত বয়ে নিয়ে তোর চোখে বয়ে গেছে জল। রাগ হয়নি তোর? ক্ষোভ?

কালীপদর দু' হাত নড়ে ওঠে। সামনে এগোয়, বিস্তৃত হয়। কালুর দু' কাঁধ স্পর্শ করে। বলে— না।

কালীপদ পারল না। না পারার তুমুল আনন্দ নিয়ে ফিরে গেল মহিম হালদার লেনের বাসাবাড়িতে, নোংরা জল মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

ভারতবর্ষের ৮৯ শতাংশ মানুষ পাকাবাড়িতে থাকে না, যারা থাকে তাদের ৭৪ শতাংশের...

এবং এ সময়, ১৯৮৫

সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পরে...

আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আছে, যাদের পেছন পাকা না বলে আঁতেল বলি আমি। আমার আঙুলের গোমেদ নিয়ে মসকরা করে। আমার বাবাকে মান্য করা নিয়ে প্যাঁক দেয়। আমার জ্যাঠামশাই মারা গেলেন বলে দাড়ি কাটছি না, মাথায় তেল না দিয়ে শ্যাম্পু করছি, এতেও ওরা খারাপ দেখছে। জ্যাঠামশাই যখন এখন-তখন ছিলেন, তখনই আড়াইশো দিয়ে একটা ফাইবার চটি কিনে নিয়েছি, আরে বাবা নিয়ম। বহুদিনের পূর্বপুরুষের তৈরি করা নিয়মগুলি ব্যঙ্গ করা হল আঁতলামি। এখানে দু-তিন জন কলেজ জীবনের বন্ধু আছে, মাঝে মাঝে বাড়ি আসে। আমি গতকাল চিকেন ফিকেন খাইনি, শুধু চানাচুর দিয়ে খেয়েছিলাম অশৌচ তো, নিরামিষ খেতে হয়। তাইতে অজয় আর প্রতীক খুব হাসাহাসি করল। সত্যি বলতে কী বোতল আজকাল বাড়িতে রাখি। কখন কে আসে বলা যায় না তো। তবে বাবা থাকলে বোতল খোলা হয় না। আমি আমার বাবাকে খুব মান্য করি। বাবার সামনে সিগারেট খাই না। ঘরের অ্যাশট্রেও লুকিয়ে-টুকিয়ে রাখি। এখনও সিগারেটের প্যাকেট ওপেন ফেলে রাখি না। বউ যেমন ওর ছোট-জামা আলনায় রাখলেও ঢেকেঢুকে রাখে, ওরকম। আগে বাবার সামনে চা খেতেও সংকোচ হত। একবার ইস্কুলে পড়ার সময় চিরুনি দিয়ে চুলের সামনেটা উত্তমকুমার স্টাইলে একটু ফোলা-ফোলা করছিলাম, বাবা অ্যাইসা একটা থাবড়া মেরেছিলেন... সেই থেকে বহুদিন বাবার সামনে মাথাই আঁচড়াইনি আমি। আর এখন তো টাক-ফাক পড়ে মাথা আঁচড়ানোটাই সেকেন্ডারি হয়ে গেছে। কী দিন গেছে। পেছনের পকেটে চিরুনি থাকত আমার...।

তো অজয় একটু আগে একটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল, আমার বোনের। ছেলেটি এম এ পাশ বলল, ফিলজফিতে। কাজ করে কেরানির। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে। আমি মনে মনে বলি— কেরানি তো ইনকাম ট্যাক্সে— সেলস ট্যাক্সে হতে পারল না? ইউনিভার্সিটির কেরানি কী হবে? ফিলজফি-ধোয়া হলে কী হবে? অজয় বলল, ফ্যামিলিটা ছোট। মা, ছেলে পৈতৃক বাড়ি। ছেলেটাও সৎ।

অজয়কে তখন ফুটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু বাবার সঙ্গে কথা না বলে আমি কিছু করি না। বাবাকে হেভি মান্য করি। বউকেও বলা আছে বাবাকে হেভি মান্য করতে। বলেছি ম্যাক্সি পরা অবস্থায় যেন কখনও বাবার সামনে না আসে। আমি ফ্রিজে জলের জন্য যে বোতল রেখেছি, একটাও খালি মালের বোতল রাখিনি। সবই স্কোয়াশের।

আমি এখন ঝুলবারান্দায়, সরি, ব্যালকনিতে বাবার সঙ্গে হিসেব নিয়ে বসেছি। কোম্পানির হিসেব। নিউ এজ এন্টারপ্রাইজ। বাবার কপাল এখনও কুঁচকে আছে। বাবার সামনে কাগজ। আমি বাবাকে হিসেব দাখিল করেছি। বাবাকে তো হিসেবটা দাখিল করতেই হবে। কোম্পানিটা তো বাবার। বাবাই প্রোপাইটার। আমি হলাম ম্যানেজার। বাবা মাইনে বাবদ আমায় বেশ কিছু দিচ্ছেন প্লাস এধার ওধার করে আমি কিছু ম্যানেজ করি। আমার চলে যায়। সংসার খরচের জন্য বাবাকে কিছু দিই।

এই যে কোম্পানিটা, বেশি দিনের নয়। বছর পাঁচেকের। বেশ চলছে কিন্তু। আর এই গোমেদ, ছ'বছর ধরে পরছি।

বি এস সি-টা ফেল করলাম। প্র্যাকটিকালে ব্যাক। তখনই আমার মামা এক জ্যোতিষীর কাছে

নিয়ে গিয়ে এই আংটি পরিয়ে দিলেন। তার পরেরবার পরীক্ষায় ব্যাকটা ক্লিয়ার করে নিলাম। গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলাম। আমার ঘরের দেয়ালে আমার গ্র্যাজুয়েট হবার ছবি আছে। উকিলদের মতো গাউন পরা। স্টুডিয়োতে পাওয়া যায় শুনেছিলাম। পাড়ার স্টুডিয়োতে ওই গাউন ছিল না। সেই বিবেকানন্দ রোডের পুরনো স্টুডিয়োতে গিয়ে ছবি তুলিয়ে এনেছিলাম। বিয়ের পর বউ বলল, এসব ছবি আজকাল কেউ রাখে নাকি? লোক হাসবে। এখন ওখানে আমার আর বউয়ের ছবি আছে। পিছনে তাজমহল। ওই তাজমহলটা অবশ্য রিয়েল নয়, স্টুডিয়োর। আমার ইচ্ছে ছিল পিছনে মারুতি রেখে ছবি তোলার, বউ বলল, না, তাজমহল। রিয়েল তাজমহলে যাওয়া হয়নি এখনও। পয়সার মুখ তো এখন দেখছি, গত কয়েক বছরে। আসলে বাবা ছিলেন একটা ইস্কুলের মাস্টার। খুব একটা টিউশনিও করতেন না। ছোটবেলায় দেখেছি যুব-উৎসব কমিটি, বন্যাত্রাণ, ব্লাড ডোনেশন এসবে থাকতেন। কাস্তে হাতুড়ি মার্কা বই-টই পড়তেন। আমাদের আলমারিতে রাশিয়ার সব বইটই আছে। আমার ওসব পড়তে ভাল লাগে না। তো, বাবা রিটায়ার করার আগে বললেন, কিছু একটা কর। আমি আঙুল মচকানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনি। এরপর বাবার সঙ্গে বাবার এক ছাত্রের কোথায় যেন দেখা হয়। বাবার সেই ছাত্র ইঞ্জিনিয়ার। আগে চাকরি করত, কিন্তু হালে ব্যবসা ধরেছে। ওই ছাত্রটি বাবাকে হেভি ইয়ে করত। বলল— স্যার, আপনি রিটায়ার করেছেন যখন, আমার ব্যবসায় আসুন। হিসেব-টিসেব দেখে দেবেন, লোকজনের সঙ্গে কথা বলবেন...। আসলে বাবা তো খুব সৎ ছিলেন, তাই ওই ছাত্রটা বাবাকে কাজ দিয়েছিল। ওই ব্যবসা আসলে হচ্ছে কনট্রাক্টরির ব্যবসা। বাবা মাঝে মাঝে বলতেন, কীসব কাণ্ড কারখানা চলছে, বিবেকে লাগে। আমার মতো মানুষ কীভাবে হিসাবে গরমিল করে, কীভাবে অফিসারদের ঘুষ দেয়...

তিন বছর আগে বাবা নিজেই টেন্ডার জমা দিলেন। কনট্রাক্ট পেলেন। বাবা বলেন ভাবতেও পারি না আমার মতো লোক এইসব ব্যবসা করতে পারে। কিন্তু সোভিয়েত নাই। আমার মেরুদণ্ডও নাই। আর, কিছুদিন আগে আমার বিয়ের সময় বাবা বলছিলেন পণটন দরকার নাই, যা পারবেন দেবেন। আমি— বলতে পারেন একজন আদর্শবাদী মানুষ। তো, সেদিন এক অফিসার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, উনি বলছিলেন আপনার সঙ্গে কাজ করা মুশকিল। আপনার কেমন যেন সেকেলে সেকেলে ভাব। বাবা বলেছিল— না-না। এখন মুক্ত। মুক্ত অর্থনীতি। নীতি মুক্ত। নীতি নেই। বলতে গিয়ে একটু গলা কাঁপিয়ে ফেলেছিলেন বাবা। তারপর আমাকে ডেকেছিলেন। ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বার করে ওকে দিতে বলেছিলেন। আমি দিয়েছিলাম। তারপর ওই অফিসার চলে যাবার পর আমার চুলে বিলি কেটে বাবা বলেছিলেন, কীসব শেখাচ্ছি তোকে ছিঃ আমি না বাপ? আমার খুব লজ্জা লজ্জা করছিল। কতদিন পর বাবা আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন। বাবা এখন অবশ্য ওরকম করেন না। তবে মাঝে মাঝে কীসব পাগলামি করেন, কারণটা ধরতে পারি না আমি। আমার একজন মামা আছেন, একটা হাসপাতালের কর্মী। লিডার। বক্তৃতা দেয়। একদিন ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম আমি আর বাবা। একটা রিকশাওলাকে মামা কী যা-তা ভাবে কথা বলল। হাসপাতালের ক্যান্টিনের ছেলেকে মামা খুব হুকুম করছিল। বলছিল, যা সিগ্রেট নিয়ে আয়, যা পান নিয়ে আয়, যা জর্দা নিয়ে আয়, যা দেশলাই নিয়ে আয়... ছেলেটা বলল, একই দোকানে বারবার পাঠাচ্ছেন কেন, একবার বললেই তো হত। ওমনি মামা ছেলেটাকে মারল জোরে চড়...। বাবা চা খাচ্ছিলেন, উঠে গেলেন। আমিও পেছন পেছন গেলাম। বাবা গটগট করতে করতে হাঁটছেন আর বলছেন, এরা সব মানুষ? এই তো সব পেশা এদের আবার আত্মীয় পরিচয় দিতে হয়...।

এখন বাবার সঙ্গে হিসেব নিয়ে বসেছি। বাবার কপাল কুঁচকে রয়েছে। বাবা বলছেন, মিসলেনিয়াস সিক্স থাউজেন্ড? ডিটেল্‌স দে।

আমি বাইরে তাকাই। মাধবীলতা দোতলার ব্যালকনি ছুঁয়েছে। এই দোতলাটা নতুন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার সময়কার।

মহা ঝামেলায় পড়লাম তো। বাবা মাঝে মাঝে এমন ভাব করেন যে...। বাইরে তাকাই ফের।

পিলারটা পেল্লায় মোটা হয়েছে। মাধবীলতা কি পারবে ওটাকে জড়াতে। বাবা বললেন, মিসলেনিয়াসের কোনও মানে নেই। ডিটেল দে। একই দিনে ছ' হাজার টাকা মিসলেনিয়াস? ইয়ারকি?

আমি একটা মাধবীফুল ছিঁড়ে নিলাম, লম্বা বোঁটাটা হাতে নিয়ে ফুলের দিকে তাকিয়ে বলি— ব্যানার্জি সাহেবের জন্য খরচ হয়েছে।

ব্যানার্জি কে? জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার?

হ্যাঁ।

ওকে আবার টাকা দেবার কী হল। এ ই-র সঙ্গেই কথাবার্তা হয়ে আছে।

মানে...

কোনও মানে নেই। এরকম খরচ করলে ভাত জুটবে না। আমি এইসব ছাইপাঁস ব্যবসা করছি শুধু তোদের জন্য। নিজের যদি কিছু করতে পারতিস এসব করতে হত না আমার...। আমার খুব রাগ হল। হাতের ফুলটা দু' আঙুলে পিষে ফেললাম আমি। বাবা দেখলেন।

বাবা বললেন— তবে এই টাকাটাকে মিসলেনিয়াস হেড-এ দেখালি? মি. ব্যানার্জি, J E সিক্স থাউজ্যান্ড দেখালেই পারতিস। এই হিসাব তো তোর-আমার মধ্যে। আসলে মিসলেনিয়াস দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়। মিসলেনিয়াসের মধ্যেই যত গণ্ডগোল।

...বড্ড ঘ্যান ঘ্যান করছেন বাবা। পৃথিবীতে কতরকম মিসলেনিয়াস হয়ে যাচ্ছে, অথচ এই একটা মিসলেনিয়াস নিয়ে সেই থেকে ঘ্যানঘ্যান। উঠে যেতে ইচ্ছে করছে। বাবার অসম্মান আমি চাই না। তাই বসে থাকি। কোম্পানিটা বাবার। আমি একমাত্র পুত্র হতে পারি, আরও দুটো কন্যাও রয়েছে বাবার। বুড়ো বয়সে মানুষের মতি স্থির থাকে না। আমি অনেক একজাম্পল জানি। বাবাকে খচাই না।

বাবা আবার বললেন, তা টাকাপয়সা নিয়ে ব্যানার্জি বিল-টিল ছাড়বে তো?

আমি বলি, ব্যানার্জি সাহেবকে তুমি তো চেনো। এসেছে এ-বাড়িতে। ফরিদপুরের ফ্রিডম ফাইটার অবিনাশ ব্যানার্জির নাতি।

বাবার গলার স্বর পালটে গেল।

বাবা বললেন, ওকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলি?

আমি বললাম, ঠিক স্কোপ হয়নি এখনও।

বাবা বললেন, স্কোপ পাইনি বললে হয় না। করতে হয়। তোর দিদির বিয়ের জন্য তুই একটু চেষ্টাচরিত্র কর। আমি নিজে এখন বাসে-ট্রেনে আর পারি না। নইলে আমিই দেখতাম। ওই ব্যানার্জি, কী ব্যানার্জি যেন?

চঞ্চল।

হ্যাঁ, চঞ্চলের সঙ্গে অনুর ইয়েটা ভালই হয়। ছেলেটা লম্বা-টম্বা আছে। ফ্যামিলি ভাল। ওর দাদু ফ্রিডম ফাইটার। এক ডাকে সবাই চিনত। ওর বাবাও শুনেছি একজন দারুণ লোক। কমিউনিস্ট পার্টির লোক...

ঠিক এইসময় মোটর সাইকেলের ঘটঘট। দেখি ব্যানার্জি সাহেব। চঞ্চল ব্যানার্জি নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। স্টার্ট বন্ধ করেনি, আমায় ডাকছেন।

আমি দেখেই খুব খুশি হলাম। বললাম, অনেকদিন বাঁচবেন। এই এতক্ষণ আপনার কথাই হচ্ছিল। ব্যানার্জি সাহেব বললেন, খুব নিন্দে হচ্ছিল বুঝি?

আপনি কী যে বলেন, বলেই জিভ কামড়ালাম।

আমার জিভটা কামড়ানোই ছিল, তাই বাবাই বলল, কী সৌভাগ্য... আসুন, ওপরে আসুন।

আমি নীচে গেলাম রিসিভ করতে। ব্যানার্জি সাহেব মোটর সাইকেলের স্টার্টার বন্ধ করেছেন। আমি বললাম, ওপরে চলুন।

ব্যানার্জি সাহেব সিঁড়িতে উঠেই বললেন, মেয়েটা যা খায় না... দারুণ দিয়েছিলেন।

আমি বললাম, এই এসব পরে।

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, রাস্তাটা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তিন ইঞ্চি ডিপ করার কথা। দু' ইঞ্চি করেছিলাম। ব্যানার্জি সাহেবকে ফিট করেছিলাম। ব্যানার্জি কী কী পছন্দ করে আমি জানি। একটা ফিট করে দিয়েছিলাম। চাঁদিপুরে হোটেল বুক করে দিয়েছিলাম দু'দিনের জন্য। মেয়েটা পাঁচ হাজার নিয়েছিল।

ব্যানার্জি সাহেব ওপরে গিয়ে বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বাবা বললেন, থাক-থাক, সাহেব-সুবো মানুষ, প্রণাম করতে হয় না। তো এখানেই আসা হয়েছিল?

না, এধারে একটা জমি দেখতে এসেছিলাম, কিনব।

তোমাদের পৈতৃক বাড়ি আছে না?

আছে, কিন্তু নিজের একটা বাড়ি...

ভাল, ভাল। তা তোমার বাবা কেমন আছেন?

বাবা আজকাল একটু সাইকোলজিক্যাল পেশেন্ট হয়ে গেছেন।

মানে?

মানে, পার্টিটা ছেড়ে দিলেন, তবু পার্টি অফিসে গিয়ে নানারকম জ্ঞান-ট্যান দেন, ওরা পছন্দ করে না। বাড়িতে কেব্‌ল টিভি ঢুকতে দিচ্ছেন না। দাদার ছেলেটাকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভরতি করানো নিয়ে সমস্যা করছেন...

আসলে খুব আদর্শবাদী তো...

বলেই আমার দিকে ইশারা করলেন বাবা। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। আমার কানে কানে বললেন, অনুকে দেখানোর ব্যবস্থা কর।

আমি তো বাবাকে হেভি মান্য করি। বাবার কথা শুনতেই হবে। আমি ভেতরে যাই। অনুকে আমি বলতে পারব না— যা, সেজেগুজে চা নিয়ে যা। ও অনেকবার এসব করেছে। আর ভাল লাগে না ওর। ওকে কিছু বলতে গেলেই ও এমন অসহায় ভঙ্গিতে তাকাবে যে...। হয়তো শুয়ে পড়বে, নয়তো বাথরুমে ঢুকে বসে থাকবে।

আমার বউকে বলি। আমার বউয়ের সঙ্গে অনুর একটু ঝগড়া আছে। মাঝে-মাঝেই কথা বন্ধ থাকে। বউ হয়তো বলল, দামি সাবানটা বড্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। অনু হয়তো ভাবল ওকে উদ্দেশ্য করে এটা বলা হয়েছে। অনু হয়তো একটা নতুন সাবান কিনে নিয়ে এল। তারপর কয়েকদিন কথা বন্ধ। কিংবা বাবা হয়তো বললেন— বউমা, এটা অনুকে দিয়ো। বউ বলল, ও কোথায় অন্ধকারে মিশে আছে, খুঁজে পাচ্ছি না। বউ কিন্তু বলতে চায়নি অনুর রং কালো, আসলে অনু আজকাল একা একা অন্ধকারে থাকা পছন্দ করে। কিন্তু অনু ভাবল ওর রং সম্পর্কে খোঁটা দেওয়া হচ্ছে। আবার হয়তো কথা বন্ধ। আবার ক'দিন পরেই ভাব। এখন যতদূর জানি ওদের কথা বন্ধ। কারণ কালই বউ বলেছিল, টাকা জমাও, যত পারো জমাও, ওই বোনটিকে পার করতে কত লাগবে কিছু ঠিকানা নেই। তো, আমি আমার বউকে বললাম— অনুকে নিয়ে বারান্দায় একটু এসো। একটা পাত্র আছে...

কে পাত্র?

ব্যানার্জি।

কোন ব্যানার্জি? যার কথা বলছিলে?

হ্যাঁ।

আসলে আমি বউকে সব বলি। ব্যানার্জি সাহেবকে চাঁদিপুরে ফিট করে দেবার গল্পটা বউকে করেছিলাম। ব্যানার্জি বলেছিল, দুটো ফিট করুন। একসঙ্গে যাই, দুটো ঘর। আমি বললুম, না। এটাও বউকে বলেছিলুম। জানাতে চেয়েছিলাম, দ্যাখো আমার চরিত্র কেমন পোক্ত, গেলাম না। মুনমুন সেন বললেও না।

বউ বলল, ওই ব্যানার্জির সঙ্গে তোমার বোনের বিয়ে দেবে? দিতে পারবে?
আমি মাথা চুলকোই।
বউ বলল, তোমার বাবা সব জানেন?
আমি বললুম, সব জানেন না। কিছুটা জানেন।
কিছুটা মানে?
ওই একটু ঘুষ-টুস।
এটা জেনেও তোমার বাবা রাজি?
আসলে, সোভিয়েত ইউনিয়নটা ভেঙে পড়ার পর থেকে না...
সোভিয়েত ভাঙুক। আমি ভাঙিনি। আমরা। মেয়েদের তোমরা কী মনে করো, অ্যাঁ?—

বিকেলে দেখি অনুর সঙ্গে আমার বউয়ের খুব ভাব।
আমার গোমেদটা ঠিক করছে, না ভুল করছে বুঝতে পারছি না।

নন্দন, ১৯৯৩

রামযতনের বাগান

ওই এক কথা রোজ রোজ। ডাবুদা, অপিস চললেন? ও তো জানেই আমি অফিস যাচ্ছি, রোজই যাই, গত তিন মাস ধরে এ পথেই যাই। হেড অফিস থেকে বদলি হয়েছি গোডাউনে। গোডাউন কিপার, বলা যায় প্রমোশনই। বাস থেকে নেমে গ্যালিফ স্ট্রিটের খাল বরাবর হেঁটে গেলে চিৎপুর রোড। ওখানেই আমার গোডাউন। এটাই আমার পথ। আমি কোনওদিন চোঁ করে চলে যাই, ও দেখতে পায় না। রোদ্দুরে বা বর্ষায় ছাতা দিয়ে আড়াল করি মুখ, ও দেখতে পায় না। দেখতে পেলেই—

ডাবুদা, অপিস যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

ভাল আছ?

হ্যাঁ।

বউদি ভাল?

হ্যাঁ।

ছেলেটা?

হ্যাঁ।

আ-আ-চ ছা। ঘাড়টা বেশ খানিকটা কাত করে ও। আমার ভাল থাকার ইনফর্মেশনে ওর খুশির কারণ আমি বুঝি না, কিন্তু আমার ঝামেলা-ঝামেলা লাগে। কোনও কোনও দিন আবার দু'বেলাই দেখা হয়ে যায়। বাড়ি ফিরবার সময় ওই একই জিনিস, শুধু অপিস যাচ্ছেন-এর বদলে বাড়ি ফিরছেন?

এই স্বল্প সময়ের সংলাপ যখন চলে, তখন আমি কিন্তু দাঁড়াই না। চলতে-চলতেই উত্তর দিই। অনেকটা এগিয়ে গেলে শুনি— পরে একদিন অনেক গল্প করব, অ্যাঁ? ক্বচিৎ আমিই বলি— তুই ভাল আছিস তো জীবন?

জীবন তখন ওর জীবন-কাহিনি বলতে শুরু করে। যেমন, মেয়েটাকে নিয়ে তো জানোই কী ভুগছি, এদিকে আমারও গ্যাস্ট্রিক। কালো পায়খানা হল। এইসব পেট্রল-মবিলের গ্যাস পেটে যাচ্ছে না? গাঁদালি পাতার ঝোল খাচ্ছি ক'দিন। টিপিন কৌটো করে বউ এসে দুকুরবেলা দিয়ে যাবে। ...আমি আস্তে আস্তে পা চালিয়ে চলে যাই। ও বলতে থাকে...।

সেদিন আমাদের অফিসে ছিল 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা। ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, গ্যারেজটা আসতেই জীবন ধরল। আরে ব্বা-বা-বা... তোমার ছেলে বুঝি? বলেই এগিয়ে এল। তেল কালি মাখা গেঞ্জি, কালিঝুলি মাখা হাত, আদর করে আর কী। এরপর থেকে শুরু হয়েছে প্রেজেন্টেশন। কোনওদিন একটা পাকা পেঁপে দিয়ে বলে, রামযতনের বাগানে হয়েছে, ছেলেকে খাওয়াবেন ডাবুদা, লিভারটা ভাল থাকে। কিংবা এক গোছা কাঁঠালি চাঁপা দিয়ে বলে, নিন ডাবুদা, রামযতনের বাগানের।

বাগান শুনলেই একবার এ দিকটায় তাকাতে হয়। দেখি কাঁঠালি চাঁপা গাছটা কত বড় হয়ে গেছে, দেখি ফুলভরতি করবী, জবা, একঝাঁক কলাবতী গাছ। আমরা বলতাম রামযতনের বাগান। রামযতন ঢালু হয়ে জলের দিকে যাওয়া খালপাড়ে বেড়া বেঁধে ফুলগাছ লাগিয়েছিল। আমি

ছোটবেলায় দেখেছি রামযতন ভোরবেলায় ওর বাগানে খাটিয়া পেতে বসে থাকত। আমি ওর বুকের ঘড়ঘড় শুনতে পেতাম। রামযতন ছিল হাঁপানি-রোগী। মাঝে মাঝে ওকে দেখতাম কীরকম হাঁটুমুড়ে উপুড় হয়ে অনেকটা প্রণাম করার কায়দায় পড়ে থাকত খাটিয়ায়, ওটাই ওর ঘুমোনো। ও থাকত খালধারের পাশে বস্তির একটা খুপরি ঘরে। একটা কালি তৈরির ছোট কারখানায় কাজ করত রামযতন। ঠান্ডা লাগলে হাঁপানি বাড়ে বলে ঠিকমতো স্নান করত না। ফলে ওর পাকা গোঁফের রং কখনও দেখতাম সবুজ, কখনও লাল। ওই কারখানায় কখনও লাল কালি তৈরি হত, কখনও নীল বা সবুজ। রামযতনের চুল আর গোঁফের রং-ও সেভাবে পালটে যেত, ওর গায়ের চামড়ারও একটা অদ্ভুত রং হয়ে গিয়েছিল। যখনই সময় পেত রামযতন, খুটখুট করে বাগানের কাজ করত। ভোজপুরী না কী যেন ভাষায় গাছের সঙ্গে কথা বলত,— তোহার কা ভইল বা, তানি পানি লৈব? গাছে ফুল ফুটলে রামযতন ফুলেদের সঙ্গে হাসত, আমার মা ফুল তুলতে যেত বাগানে, রামযতন উঁচু গাছের ডাল নিচু করে দিত।

রামযতনের মরে যাওয়াটা এক রহস্য। আমার মা বিশ্বাস করতেন, ওর প্রাণ ছিল একটা স্থলপদ্ম গাছে। আমার বাবা ইসলামপুর থেকে এনে দিয়েছিলেন ওই ডাল। ওটা নিয়ে রামযতনের কী যত্ন, দুপুরে ছাওয়া করে রাখা, রাতে শিশির খাওয়ানো, জল দেওয়া। একদিন ডাল থেকে নতুন পাতা বেরুবার খবর দিতে এল রামযতন, সঙ্গে চারটে লাড্ডু। বাবার ইসলামপুরের ঠিকানা চেয়ে নিয়ে গেল, বাবাকে চিঠিতে জানাবে এই সুখবর। বাবা ওখানে বদলিতে ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই খুব ফুল ফুটতে শুরু করল, অনেক। রামযতন মাঝে মাঝে একটা বড় কলাবতী গাছের পাতায় নিয়ে আসত দু-চারটে স্থলপদ্ম ফুল। মা লক্ষ্মীর আসনে দিতেন। কিছুদিন পর গাছটা শুকিয়ে যেতে লাগল আর রামযতনের শরীরটাও। রামযতন খেত না, খেলেই বমি হত, বস্তির ছেলেদের বলত, ধরাধরি করে বাগানে নিয়ে যেতে। জীবন ছিল রামযতনের চ্যালার মতো। রামযতনকে বাগানে পৌঁছে দেওয়া আর ঘরে নিয়ে যাওয়া ছিল ওর ডিউটির মধ্যে। একদিন ভোরবেলা ওর সারা গায়ে অনেক শেফালি ফুল ঝরে পড়েছিল। ও মরে গিয়েছিল। স্থলপদ্ম গাছটা কাঠ কাঠ। আমি দেখতাম, ওই নিষ্পত্র স্থলপদ্ম গাছটা আকাশের দিকে শুকনো ডালপালা মেলে কেবলই হায় হায় করত। জীবন মাঝে-মাঝেই ওই শুকনো গাছটার গায়ে হাত বুলোত, তন্ময় হয়ে গাছটার কী দেখত কে জানে। ও খাল থেকে মাটির হাঁড়িতে তুলে আনত পাঁক, ঢালত ওই শুকনো গাছের গোড়ায়, জল দিয়ে স্নান করাত, মাটি খোঁচাত, ট্রাম ডিপোর পাঁচিল থেকে ঘুঁটে চুরি করে এনে গুঁড়ো করে দিত। আমি তখন সবে সিগারেট খাওয়া শিখেছি। রামযতনের বাগানের নিমগাছ তলায় লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছি, জীবন হঠাৎ চ্যাঁচাল, দেখুন, দেখুন ডাবুদা, গাছটার জীবন এয়েচে ফের। দেখি, ছোট ছোট দুটো সবুজ পাতার কুঁড়ি বেরিয়েছে গাছটার গা থেকে। জীবন পরদিন কিশোরকুমারের 'এক পলকে একটু দেখা, আর একটু বেশি হলে ক্ষেতি কী', গাইল বাগানে নেচে নেচে, ক্রমশ আর একটু বেশি পাতা গজাল আর বর্ষা এলে নতুন নতুন পাতায় ভরে গেল ওই গাছ। এ-সময় জীবন রক্তবমি করে।

জীবনের মা আমাদের বাড়িতে কাজ করত। মোক্ষদা না কী যেন নাম ছিল। ও আমার মা-র কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বউদি, আপনার পদ্ম গাছটা ডাইনি, আমার কচিকে খেল। জীবনের মায়ের ধারণা ছিল, জীবনের থেকে প্রাণ-পরমায়ু টেনে নিয়ে ওই মরা গাছটা বেঁচে উঠল। আর জি কর হাসপাতালে দেখানো হল। জীবনের মা একদিন এসে বলল, বুকের ফটোক তুলা হয়েছে। বুকের কাঠি পোকায় ধরেছে। মা আঁতকে ওঠে।— ওমা, যক্ষ্মা! পদ্ম গাছ তখন ফুলে ভরতি।

জীবনের মা তখন একদিন করল কী, রাত্তির থাকতে বাগানে গিয়ে পদ্ম গাছটার গোড়া থেকে কেটে দিল।

জীবন ওর মা-র সঙ্গে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসত। 'নাইলন শাড়ি আর পাইলট পেন উত্তমের পকেটে সুচিত্রা সেন' ওর কাছেই শিখেছিলাম। এক পলকে একটু দেখা আর একটু বেশি

হলে 'ক্ষেতি কী'? 'ক্ষেতি কী' বলার সময় অনেকটা ঘাড় ঝুঁকিয়ে দিত জীবন। জীবনই বোধহয় বয়সে আমার চেয়ে বড়, তবু ও আমাকে দাদা ডাকত। মা জীবনের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিল আমাকে। ও বড় কাশত। আমাদের লক্ষ্মী-ঠাকুরকে দেওয়া কলার টুকরো, শশার টুকরো চেয়েচিন্তে নিয়ে যেত জীবনের মা, জীবনকে ফল-ফলাদি খেতে বলেছিল ডাক্তার। জীবনের মা প্রায়ই এসে কান্নাকাটি করত, পাঁচটা ট্যাকা ধার দেন গো বউদি, জেবনকে দুধ খাবাতে কয়েছে, ডিম খাবাতে কয়েছে, মাইনে থেকে কেটে নেবেন। মা বলতেন, কত আর কাটব বলো জীবনের মা, মাইনে তোমার কবেই শেষ হয়ে গেছে। জানোই তো জীবনের মা, ডাবুর বাপ বাইরে থেকে নিজে খেয়ে যা পাঠায়, তাতে হয় না, বাড়ি ভাড়া, ডাবু-বাবলির পড়াশুনো, অন্য কারুর কাছে চাও।

জীবনের সঙ্গে দেখা হলে কেমন আছি ভাল আছি বলতে বলতে যদি একটু দাঁড়িয়ে যাই, ও বলে আসুন না ডাবুদা, বাগানটা দেখবেন, কেমন জবা লাগিয়েছি, বেগুনি রং, সাদা রং, হলুদ রংয়ের জবা,... আমার সময় হয় না, যাবার সময় অফিসের তাড়া, ফিরবার সময় সন্ধে হয়ে যায়, ছ'টা পর্যন্ত অফিস, বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে সাতটা, আমি না গেলে ছেলেটা পড়তে বসতে চায় না। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, একগাদা হোমটাস্ক।

সেদিন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। খালধারের রাস্তায় কোনও দোকান-টোকান নেই যে একটু দাঁড়াব। আমরা যে বাড়িটাতে থাকতাম, সেটা ভেঙে এখন চারতলা বাড়ি, আটটা ফ্ল্যাট। ওদের কাউকেই চিনি না, বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে আসতেই ছুটে যাই জীবনের গ্যারেজে। এসো ডাবুদা, একটা বনেট খোলা অ্যাম্বাসাডার থেকে ডেকে নেয় জীবন। গেট খুলে দেয়, বহুদিন পর জীবনের পাশে বসি।

বাড়ি ফিরছ?

হ্যাঁ।

ভাল আছ?

হ্যাঁ।

বউদি ভাল তো?

হ্যাঁ।

ছেলেটা?

হ্যাঁ।

তুমার বুনটা কেমন আছে গো? বাবলিদি? কতদিন দেখতে পাইনি।

ওরা গাড়ি কিনেছে।

তুমিও কেনো একটা ডাবুদা, না হয় সেকেন্ডহ্যান্ড, এখানে মাঝে মাঝে আসে। মালিককে বলেকয়ে কম দামে করে দেব।

গাড়ি? ধুস। কী যে বলিস জীবন!

কেন, কত ভাল চাকরি করো...

কী আর ভাল।

ওইসময় যদি নকশালি না করতে তবে আরও ভাল চাকরি করতে, তাই না ডাবুদা? ইস্কুলে ফাস বয় ছিলে তুমি, পল্টুদাকে মনে পড়ে ডাবুদা?

মনে পড়ে, কিন্তু মনে না পড়লেই ভাল। তবে তুমি ধারধোর করে কিনে লাও একটা, মাঝে মাঝে বার কোরো যেমন এরকম বিষ্টির দিনে, বউদি ঝা খুশি হবে না, ...বউদি তো এম এ পাশ, নয়?

হ্যাঁ।

হে-বি শিক্ষিত, নয়?

কে জানে।

কে জানে বলছ কেন? আই এ, বি এ, তারপর তো এম এ, সবার লাস্ট। হে-বি কঠিন নয়?
হ্যাঁ।
তোমার বাড়িটা মোজাইক পাথরের না ডাবুদা?
না রে, পুরোটা পারিনি।
তোমার বাড়িটা একদিন দেখতে যাব, অ্যাঁ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।
কী করে যাব ডাবুদা?
ওই তো, কামারহাটি নেমে একটা রিকশা নিবি, বলবি রবীন্দ্র কানন...
যাব একদিন রোববার দেখে। পরিবার নিয়ে যাব। তোমার বউ কথাটথা বলবে তো?
কেন বলবে না?
তবে বোধহয় অহংকার নেই মোটে।
তোর ছেলেটার খবর কী জীবন?
পাঁচ বছর চলছে। ক, খ-র বই কিনে দিয়েছি।
আমি খেতে পাই, না-পাই, ওকে ম্যাট্রিক পাশ করাব। মেয়েটাকে নিয়ে বড় ভুগছি ডাবুদা।
মেয়ে হল কবে?
সে-কী? জানো না? কতদিনি বলেছি তোমাকে, ওর মাথার খুলিতে জল জমেছে, ওর তো বয়েস এক বছর হয়ে গেল।
কই, বলিসনি তো?
তুমি ভুলে গেছ ডাবুদা, কত কাজে থাকো, হয়েছে কী, ওর ছ' মাস বয়স থেকেই ওর মাথাটা বড় হতে শুরু করেছে। আর জি কর-এ দেখালাম, বলছে ম্যাড্রাস না কোথায় কী হাসপাতাল আছে, ওখেনে চিকিচ্ছা ভাল হয়। কী করে দেখাব ডাবুদা, মটোর গ্যারেজে কাজ করে ক' পয়সা পাই বলো, মেয়েটা আর বেশিদিন বাঁচবে না গো, জানো, মেয়েটা বাবা ডাকতে শিকেছে।

আমি হাত বাড়িয়ে দেখি বৃষ্টির তেজ। বৃষ্টি ধরে এসেছে। জীবন বলে, দেরি হয়ে যাচ্ছে ডাবুদা? বউদি ভাবছে, নয়? এট্টু দাঁড়াও, তোমায় ক'টা বেলফুল তুলে দি। হেবি সুবাস গো, বালিশের পাশে রেখে দিয়ো।

জীবনের পিছু পিছু যাই আমি। ও বাগানে ঢোকে। আমি ঢুকি না। অন্ধকারে কী দরকার, সাপখোপ থাকতে পারে। কী বিশাল হয়ে গেছে নিমগাছটা, একটা কাঠবিড়ালি সুড়ুৎ পালাল। এই নিমগাছের ডালে দোলনা বানিয়েছিলাম। ওইখানে পল্টুদা রাখত মালপত্র। ওইখানে ছিল স্থলপদ্ম গাছটা। ...জীবন ফিরে আসে। বলে, একদিন একটু সময় করে এসো, একটা জিনিস দেখাব। এখন এই নাও। একমুঠো বেলফুল দেয়। টাটকা। আমি পকেটে রেখে বলি, জীবন, একদিন তোর মা ছুটে এসেছিল, আমার মাকে বলল, সব্বোনাশ, জীবন আমার রামযতনকে স্বপ্ন দেখেছে। ও আর বাঁচবে না। ...জীবন বলে— এখনও দেখি, স্বপ্নে নয়, এমনিতে, এই ধরো ফুলটুল ফুটলে, হাওয়ায় গাছের পাতা ঝ্যাকন নড়ে...। ফুলগুলো আলটিমেটলি আমি ফেলে দি ঠিক বাস থেকে নেমেই। কড্ড খোঁচা দিচ্ছিল। আর পারছিলাম না। জীবনটা যে কী...

মারহাট্টা খাল মজে গেছে। আগে লঞ্চ চলত, সুন্দরবনের লঞ্চ। ওই লঞ্চে করেই একদিন সুন্দরবন থেকে এখানে এসেছিল জীবনের মা আর এই খালধারেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল কলমিশাক তুলতে গিয়ে। যে লোহার পাইপ দিয়ে গঙ্গার মাটি যেত সল্টলেক ভরাট করতে, সেগুলো সরানোর কাজ চলছিল তখন, এখানে ওখানে লোহা-লক্কড়, জীবনের মায়ের মাথা ঠুকে গিয়েছিল এরকম এক লোহার টুকরোয়। বাঁচেনি।

ঠিক তার আগের দিন, মা ওকে বিদেয় করে দিয়েছিল— তোমার আর মুখ দেখতে চাই না, এত বড় আস্পদ্দা তোমার, এত বড় কথা বলতে পারলে?

স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের ঘটনাটা। আমি কলেজে পড়ি। ১৯৭১ সাল। কবিতা লেখার খাতার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে আমি লিখছিলাম ডাক্তারবাবুদের উদ্দেশে সতর্কবাণী। যে সমস্ত ডাক্তার রাত্রে রুগি দেখতে যাবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছেন, তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত ডাক্তারবাবু চার টাকার বেশি ফি নিচ্ছেন, তাঁদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে...

আমি তখন বিশ্বাস করতাম, সত্তরের দশক মুক্তির দশক। পল্টুদারা বুঝিয়েছিল কৃষক গেরিলারা আর কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতার দখল নেবে। আর তখন জঙ্গলময় ওই রামযতনের বাগানে গোপনে মজুত হচ্ছিল পাইপগান।

জীবনের মা সেদিন তিরিশটা টাকা দিল মাকে। বলল, বউদি এই ধরো তিরিশটা ট্যাকা, আমার বাসনটা দ্যাও। জীবন তোমাদের আশীর্ব্বাদে মতি সাহার মটোর কারখানায় কাজ করতিছে। এবার আমার বাসনটা দ্যাও। বাসন? কোন বাসন? মা খুব অবাক! সেই যে কাঁসার থালাটা গো, জেবনের অসুখের সময় বাঁধা দিলামনি? জেবনের ঝকন অক্ত বমি হল, বুকের কাঠি পোকায় ধরল, তকন চিকিচ্ছের জন্য দিলামনি?

মা বলল, ও ব্বাবা, সেই পাঁচ বছর আগেকার কথা ভুলেই গেছিলাম গো, সেটা বাসনের বাক্সেই আছে।

ছাঁৎ করে উঠল আমার বুকটা।

মা তক্তাপোশের তলা থেকে কেরোসিন কাঠের বাক্সটা টেনে নিয়ে বাসনপত্র নামাল। ফিরে এসে বলল, কই নেই তো তুমি ওটা ঠিক রেখেছিলে তো?

জীবনের মা আঁতকে উঠেছিল। কী যে বলো বউদি, পষ্টো রেখেছি...

মা বলল, আমরা কাঁসার বাসন ব্যবহারই করি না, অ্যালমনির বাটি, কলাই করা থালা আর ক'টা স্টিলের বাসন। এই তো, কাঁসাপেতল যা সামান্য আছে, সব ওই বাক্সয়। থাকলে ওখানেই থাকত, তুমি বোধহয় দাওনি।

এ কী কতা বলছ বউদি, তুমি ঝ্যাকন বললে, আর কত ধার নেবে জীবনের মা, কী করে শুধবে, মাইনের টাকা কবে শেষ হয়ে গেছে, আমি তখন ঘর থে কাঁসাটা নে আসনু। বলনু এটা ধরো, জেবনের ওষুধের জন্য কুড়িটা ট্যাকা দিতিই হবে, তুমি তখন দিলে। মা বলল,— আমারও পষ্ট মনে আছে, আমি রাখতে চাইনি ওই থালা, বলেছিলাম, না, থালাবাটি বাঁধা দিতে হবে না।

মিথ্যে বলব নি। তুমি বলেছিলে ওকথা। আর বলেছিলে, আরও তো বাড়িতে কাজ করছ, সবার থেকেই নাও, আমি বলনু, সবাই কি তোমার মতো লরোম কলজের লোক? তুমি কুড়িটা ট্যাকা দিলে, বাসনটা সরিয়ে রাখলে। মা ওকে বসিয়ে রেখে আবার খুঁজল। চৌকির তলা, আলমারির পিছন, এখানে-ওখানে। তারপর বলল, শোনো জীবনের মা, থালাটা হয় দাওনি, নয়তো পরে নিয়ে গেছ। যাবে কোথায়?

আমি প্রাণপণে চেপে রাখি আমার আর্তনাদ। জীবনের মা বলল, একটা থালা মেরে দিয়ে কি তুমি বড়নোক হবে বউদি? আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, মা হঠাৎ রেগে গেল। টাকাটা ওর মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, এতবড় আস্পদ্দা? আমি থালা মেরে দিয়েছি? আমার কাজ করতে হবে না। যেন আর মুখ না দেখি।...

থালাটা আমি চুরি করেছিলাম। আমি। মাত্র দিন দশেক আগে। আমি যে জানতাম না ওটা জীবনের মায়ের রাখা থালা। আমার টাকার বড় দরকার হচ্ছিল। বিভিন্নরকম কমিটমেন্ট ছিল আমার, টাকার দরকার। ওই বাক্সে আমাদের কিছু পেতল-কাঁসার বাসন আছে জানতাম। একদিন দুপুরে বাক্সের ভিতরে হাত দিয়ে যেটা উপরেই পেলাম টেনে নিয়েছিলাম। আর কিছুদিন আগে

বাবার জমানো ব্রিটিশ আমলের টাকা রুপোর দরে বিক্রি করে সুবিমলের জন্য ফলিক অ্যাসিড দেওয়া আয়রন টনিক কিনেছিলাম। সুবিমলের অ্যানিমিয়া হয়ে গিয়েছিল। ওই থালাটা যখন আমি ব্যাগে ঢোকাই এবং শ্যামবাজারের একটি দোকানে বিক্রি করে দিই, আমার বিবেক একটুও আহত হয়নি, কারণ একটা মহৎ কাজের জন্য আমি ওই কাজ করেছিলাম। থালা বিক্রির টাকায় আমি মাও সে তুং-এর নির্বাচিত রচনাগুচ্ছ কিনেছিলাম।

জীবনের মা 'যখন সবই আমার অদেষ্ট, আমার পোড়াকপাল' বলতে বলতে চলে যাচ্ছিল, আমি আমার মানসিক উত্তেজনা চাপবার জন্য মাও রচনার 'শত ফুল ফুটুক' খুলেছিলাম। পড়তে পারছিলাম না। ভেবেছিলাম মাকে ব্যাপারটা বলে দেব, কিন্তু পরদিনই তো জীবনের মা মরে গেল।

জীবন তো এসব জানে না, কিচ্ছু জানে না। ও আমাকে পাকা পেঁপে দেয়, বেলফুল দেয়। আমি ভালবাসায় এত রিক্ত হয়ে যাই যে অসহ্য বোধ হয়। পুরনো অন্যায় খোঁচা মারে। সেই কারণেই বোধহয় ওকে আমার এড়িয়ে চলা।

বাড়িতে গাঁক গাঁক। টিভিতে কোল্ড ড্রিংকস ফেনা ছড়াচ্ছে। ছেলের সামনে হি-ম্যান কমিকস খোলা, ঝুমুর মুখে মুসুর ডাল বাটার আস্তরণ ফ্যানের হাওয়ায় শুকোচ্ছে। ঝুমু বলল, এত দেরি করলে, বিভাসবাবু এইমাত্র চলে গেলেন। আমি বললাম, কিছু কি বললেন উনি? ঝুমু বলল, কেস কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে। হেড মিস্ট্রেস এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলেছে। ওরাও অঞ্জলি বসু নামে একটা ক্যানডিডেট পাঠাবে— খবর আছে। এক্ষুনি দেখা করো। আমি তক্ষুনি রিকশা নিয়ে বিভাসবাবুর বাড়ি ছুটলাম।

বিভাসবাবু এখানকার স্থানীয় গার্লস স্কুলের সেক্রেটারি। আমার স্ত্রীর চাকরির ব্যাপারে ওঁকে ধরেছিলাম। আমার স্ত্রী এম এ পাশ। বি এ যদিও পাশ কোর্সেই, পরে রবীন্দ্রভারতী থেকে এম এ করে নিয়েছিল। স্কুলের চাকরি এখন বিশাল ব্যাপার, সোজাপথে হওয়া মুশকিল। বিভাসবাবুকে অনেকদিন ধরে বলছি, হাজার আষ্টেক টাকা খরচ করব কথাও দিয়েছিলাম। বিভাসবাবু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একটা পোস্ট স্যাংশান করালেন। স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে রিকুইজিশন গেল। ওখানে আবার আমার বাল্যবন্ধু মধু রয়েছে, বাগবাজারের ছেলে। লাইন করলাম। কথা দিলাম দু' হাজার খসাব। এদিকে বিভাসবাবুর কাছে জানলাম হেড মিস্ট্রেসের নাকি নিজস্ব ক্যানডিডেট আছে। হেড মিস্ট্রেসও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিভাসবাবু বললেন, কেস তো গড়বড় হয়ে যাচ্ছে মশাই। অঞ্জলি বসুর নাম যদি এক্সচেঞ্জ পাঠিয়ে দেয়, তবে কী করব আমি? ও তো আবার অনার্স, এম এ। এম এ-তে ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট।

আপনি চেনেন মেয়েটাকে?

পাড়ায় থাকি, সোস্যাল ওয়ার্ক করি, চিনব না? সব্বাইকে চিনি আমি। মেয়েটির বাবা রিসেন্টলি এক্সপায়ার করেছেন। ওর দাদা স্বরাজ মিলের গোডাউন কিপার বোধহয়, মিল তো বন্ধ। আরও বোন আছে দুটো। হেড মিস্ট্রেসের কেউ হয় নাকি?

কিছু রিলেশন নেই, তবে ওর উপর খুব সিমপ্যাথিটিক। আসলে ওই উইডো হেড মিস্ট্রেস বড় ইগোইস্টিক। আমি যা করব তার উলটোটা ও করবেই। ওই বুড়ি নাকি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে। ওই মেয়েটাও থ্রু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে চলে এলে, বুঝতেই পারছেন, ওর সঙ্গে ফাইট করা খুব মুশকিল হয়ে যাবে।

হেভি ফাইটিং। বাড়ি ফিরে টিভির ওয়ার্লড নিউজে দেখি শ্রীলঙ্কার ফাইটিং, লেবাননের, ইরান-ইরাকের, সাউথ আফ্রিকার। এদিকে রামের সঙ্গে লব-কুশের ফাইটিং চলছে, কৌরবের সঙ্গে পাণ্ডবের। আলাদা আলাদা ফাইটিং কিন্তু একই ফেনোমেনান। স্বার্থ। আমি বেসিনের ঝাঁঝরিতে লেগে থাকা নড়ুলসের লম্বা ফিতে টেনে টেনে পরিষ্কার করি।

বাবা এসব কিছু দেখে যেতে পারেননি। এই বেসিন, শাওয়ার, বাথরুমের এই সাদা টালি, এসব

কিচ্ছু না। কামারহাটির এই জমিটা আগেই কেনা ছিল। গ্যালিফ স্ট্রিটের পুরনো বাড়িটা যখন রামবিলাস কালোয়ার কিনে নিল, আমাদের সব ভাড়াটেকেই কিছু কিছু পয়সাকড়ি দিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য। ওই উৎকোচের সঙ্গে নিজের কিছু সঞ্চয় মিলিয়ে কোনওরকমে বাড়ি করেছিলেন বাবা। দেয়ালে প্লাস্টারও ছিল না। আমি চাকরি পাবার পর একটা বছরও বাবাকে সুখ দিতে পারিনি। হার্ট অ্যাটাকে চলে গেলেন বাবা। তবে মাকে করেছি, যতটা পেরেছি। মায়ের পছন্দমতো একটা সুন্দর ঠাকুরঘর করে দিলাম। বোনের বিয়েটাও দেখে গেলেন, সুখেই ছিলেন মা, শুধু ঝুমুর সঙ্গে খিটিমিটি ছাড়া।

কীগো, কিছু ব্যবস্থা করো, চাকরিটা বেহাত হয়ে যাবে নাকি? বউ ম্যাক্সির ফাঁক দিয়ে পাউডার ঢালছিল।

ভাবছি তো।

ভাববার আর কীই-বা আছে তেমন। হেড মিস্ট্রেসের ক্যানডিডেটকে আটকাতে হবে। সুতরাং মধুর বাড়ি যাই। বিশ টাকার 'আবার খাব' সন্দেশ কিনি, বলি, এই যে মধুসূদন, বিপদভঞ্জন, আবার নতুন ঝামেলা হয়েছে একটা। ঝামেলাটার কথা বিস্তারিত বলি। মধুসূদন বলল, হ্যাঁ, ও দেখেছে, ফরসা রোগা একজন বিধবা মহিলা ক'দিন ধরে এমপ্লয়মেন্ট অফিসারের সঙ্গে ফুসুর ফুসার করছে। দেখা যাক, কেসটা কোথায় আছে। দিনতিনেক পরে আয়।

গেলাম। মধু বলল, ওই অঞ্জলি বসুকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যবস্থা পাকা। ওকে ইটিন্ডাঘাটে একটা স্কুলে ইন্টারভিউর জন্য পাঠানো হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী তিন মাসের মধ্যে আবার নতুন ইন্টারভিউর জন্য নাম পাঠানো চলবে না। আর তার পরের সপ্তাহে তোর মিসেসের ইস্কুলের কেসটা করা হবে। অঞ্জলি বসুর নাম অটোমেটিক বাদ পড়ে যাবে। অফিসার যদি অঞ্জলি বসুর কার্ড বের করতে বলে, আমরা আইন দেখিয়ে দেব। ওই কেসটা যে করে ওই ডিলিং ক্লার্কটা মহা ছ্যাঁচড়া। এক হাজারের কমে হবে না। রোববার দিন আয়।

রবিবার গেলাম। দাঁতে আটকে আছে মাংসের আঁশ, পকেটে টাকা। মধুসূদনের কাজের মেয়েটি বলল, ওনারা একটু ঘুমুচ্ছেন। বললাম, পাঁচটায় আসব। ঘণ্টাদেড়েক সময় রয়েছে হাতে। কী করব? তা হলে জীবনের গ্যারেজে যাই। দাঁতে সুড়সুড় করছে মাংস কুঁচি, পকেটে টাকা। অঞ্জলি বসুকে আটকাতে হবে।

অঞ্জলির বোধহয় চাকরিটা খুব দরকার। ওর দাদা বেকার। ওর দুটো বোন। ওর বাবা নেই। আমি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কর্মচারী, হালে প্রমোশন পেয়েছি, গোডাউন কিপার। অঞ্জলিকে আমার আটকাতে হয় কেন?

জানি না। এটাই নিয়ম। আনি মানি জানি না পরের ছেলে মানি না। সবাই তাই করে। সব্বাইয়ের দোহাই দিয়ো না। একদিন তুমিই না বলতে...

ওসব মনে করতে চাই না আর। আপাতত একটাই কাজ। অঞ্জলি বসুকে আটকাতে হবে।

ঠিক করে বলতে পারো কেন?

ওকে না আটকালে আমার বউ স্লিম হবে না, হল? দুপুরে ঘুমিয়েই মোটা হয়। মেয়েদের কাগজ থেকে পড়েছে ঝুমু। অঞ্জলিকে না আটকালে আমাদের কত শখ অপূর্ণ থেকে যাবে। পৃথিবীতে কে কার জন্য ভাবে! এরকম কত অঞ্জলি পচে যাচ্ছে এ সমাজে।

জীবন গ্যারেজে ছিল না। দেখি বাগানে রয়েছে। বাগানে ঢুকলাম। কাঁঠালি চাঁপা গাছটার তলায় বসলাম অনেকদিন পরে। জীবন নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়া খোঁচাচ্ছিল। আমাকে দেখে আশ্চর্য হল জীবন।

কী ব্যাপার ডাবুদা?

এদিকে যাচ্ছিলাম একটা দরকারি কাজে, ভাবলাম একটু দেখা করে যাই। অন্যদিন তো তাড়া থাকে, দুটো কথা বলতে পারি না। জীবন বড় খুশি হল।

ভাল আছ ডাবুদা?

হ্যাঁ।

ছেলেটা?

হ্যাঁ।

বউদি?

না।

কেন? না কেন?

না-না, ভাল আছে।

আচ্ছা জীবন, একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি মোটামুটি কন্ডিশনে কীরকম দাম হয়?

জীবন আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে রইল। গাছের পাতার শিরশির, শিরশির। তুমি কিনবে ডাবুদা?

না-না, কিনব না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

না-না, নিতে পারো, নেবেই তো, তোমরা সব পাড়ার ভাল ছেলে ছিলে। তোমরা কেন...

তোর মেয়েটা কেমন আছে রে জীবন?

খালি বমি করে। চোখটা বেরিয়ে পড়েছে গো।

কী করবি এবার?

কী আর করব, যদ্দিন থাকে...

মাটি তৈরি করছিস বুঝি? কিছু লাগাবি?

হ্যাঁ। ক'টা চন্দ্রমল্লিকা করব। এই রোববারটায় যা একটু টাইম পাই। অন্যদিন বড্ড খাটনি যায়। এত কাজ করি, মালিক সন্তুষ্ট নয়। বলে কাজ বুঝি না, যত ইসকুরুপ বল্টু খোলানো আর কিলিনিং পোষ্কার সবই আমায় দিয়ে করায়। বড় ইচ্ছে করে গিয়ার বক্সের কাজ, ইঞ্জিন কারবুরেটারের কাজ করি।...

বাগানটা কিন্তু বেশ সুন্দর করেছিস জীবন।

আমি আর কী করেছি। এটা তো রামযতনের বাগান। ওর কাজটাই তো আমি করছি। আমি না হলে অন্য কেউ করত। একটা বিড়ি ধরায় জীবন। আমার পাশে বসে। বলে, অনেকদিন পর তোমায় এভাবে পেলাম ডাবুদা, কত কথা মনে পড়ছে। লালমুখো সাহেবগুলো, সল্টলেকের মাটি পাঠাত যারা, মনে আছে?

মোসিসো, পিচকোমাতে...ঘুড়ি ওড়াত...

হরি সা-র বাড়ির ঝুলন মনে আছে ডাবুদা?

কী বিরাট পুতনা রাক্ষসী!...

পল্টুদাকে মনে আছে? জয়ন্ত, মনা? মনার ওই আলগা হয়ে যাওয়া হাতটা নিয়ে জয়ন্ত ছুটল, মনা তোর হাত নিয়ে যা...

থাম জীবন।

একটা জিনিস দেখবে ডাবুদা? জানি না কী অবস্থায় আছে এটা...

একটা কোদাল তুলে নেয় হাতে। বাগানের কোনার দিকে, যেখানে স্থলপদ্ম গাছটা ছিল, সেখানে এখন একটা কামিনী ফুলের গাছ। তার গোড়ার দিকটার মাটি কোপাতে থাকে জীবন। একটু পরেই কোদালের ফলায় কেমন যেন শব্দ দু' হাতে মাটি সরায় জীবন। একটা মরচে পড়া টিনের বাক্সের মতো কিছু বেরিয়ে আসে।

গুপ্তধন নাকি? এগিয়ে যাই। বাক্সটার চারপাশের মাটি তুলে নেয় জীবন। কী আছে রে জীবন? কী বের করছিস? জীবন কিচ্ছু বলে না। দু'হাত দিয়ে টেনে তুলতে গিয়ে বাক্সটা ভেঙে ভেঙে যায়। আসলে বাক্স নয়, একটা ছোট টিন, বিস্কুটের টিনের মতো। কোদালের আঘাত করতেই টিনের

দেয়াল ভেঙে গেলে ভিতরে পলিথিনে মোড়া কয়েকটা বই দেখা যায়। কর্মযোগ, তরুণের স্বপ্ন, রাষ্ট্র ও বিপ্লব আর মাও সে তুং-এর নির্বাচিত রচনাগুচ্ছ।

বই খুলে দেখি বিবর্ণ কালিতে আমার নাম। পৃষ্ঠাগুলো ভেঙে যাচ্ছে, হলুদ হলুদ। আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে জীবনের মুখের দিকে তাকাই। নিমগাছের ডালে ডেকে ওঠে কাক। জীবনের মুখটা প্রশান্তিতে ভরে আছে। তোমার বইগুলো দিয়ে দিলাম ডাবুদা।

তখন ভীষণ গণ্ডগোল। উনিশশো একাত্তর। জয়ন্তর দেহ খালের জলে ভাসছিল। পুলিশ ঘিরছে পাড়া। বাবা আমাকে নিয়ে গেল মুর্শিদাবাদ। পুরো একটা বছর ওখানে কাটাতে হল। ফিরে এসে দেখি আমার বইপত্তর কিচ্ছু নেই। মা বললেন, পুলিশের ভয়ে সব নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। স্কুলের প্রাইজের বইগুলো, নেতাজি-বিবেকানন্দর বইও পুড়িয়ে দিয়েছেন মা। ভেবেছিলাম কিনে নেব আবার। আস্তে আস্তে বই হারানোর দুঃখ ধূসর হয়ে গেল। ওইসব বই আর কেনা হয়নি।

বইগুলো আঁকড়ে ধরি আমি। খামচে ধরি। খামচে ধরি হারানো ইচ্ছের দিন। সারা শরীর শিরশির করে। কান্না কান্না লাগে। সেই কচি কচি পাতা গজানোর পর শুকনো স্থলপদ্ম গাছটার আনন্দ আমি বুঝে যাই। আমার গায়ে শিরশির করছে পাতা, চোখে দুলদুল করছে জল। ওই অবস্থায় আমি জীবনের দিকে নির্বাক চেয়ে থাকি।

জীবন বলে, তুমি ঝ্যাকন পালালে ডাবুদা, মাসিমা একদিন ডাকলেন। এক ব্যাগ বই দিয়ে বললেন, জ্বালিয়ে দিস। কাউকে বলিস না যেন, বই দেখলেই পুলিশ হেনস্থা করছে। একটু গাড়ির পেট্রোল ছিটিয়ে নিস। আমি বাগানে নিয়ে এলাম। বইগুলো নষ্ট করে দিতে খুব মায়া লাগল ডাবুদা, খুব কষ্ট হল। আমি তো লেখাপড়া জানি না ভাল, মলাটের ছবিতে দেখলাম স্বামীজির ছবি, নেতাজির ছবি, লেলিন, মাও। সারা দেওয়ালে দেওয়ালে তখন মাও সে তুং-এর ছবি গো ডাবুদা, পল্টুদারা তার নামে জিন্দাবাদ দিতে দিতে মরে গেল, আমি কি পারি পোড়াতে? ভাবলাম এসব থাক, পরে আবার একদিন ঠিক দরকার হবে। যে ক'টা আঁটল ওই ছোট টিনে, পেলাস্টিকে মুড়ে রেখে দিলাম। তারপর তো আর মওকাই পেলাম না যে তোমায় কথাটা ভেঙে বলব।

কী যে আতান্তরে পড়েছি আমি। আমার দাঁতে আটকে আছে মাংসকুচি, পকেটে খচখচ করছে টাকা, হাতে পলিথিন জড়ানো বইয়ের মমি।

মধুসূদন আমার বন্ধু। ও ঘুমোচ্ছিল। এতক্ষণে ওর ঘুম ভেঙে গেছে। ওর কাছে আমার যেতে হবে।

আজ আমি পারব না। কিছুতেই যাব না ওদিকে।

আমি টের পাই শুকনো গাছে নতুন পাতা গজানোর শিরশির। জীবন, জীবন রে...।

শারদীয় বসুমতী, ১৯৮৭

১১ই সেপ্টেম্বর

দুটো কাজ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। পাশপোর্ট আর ইউরিন রিপোর্ট। দুটোই পজিটিভ।

আমাদের বিদেশে যাওয়া হয়নি। এমনকী বাংলাদেশেও নয়। ভুটানকে যদি বিদেশ বলা যায় তো একবার আলিপুরদুয়ার থেকে ফেরার পথে ফুন্টসেলিং গিয়েছিলাম, আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই বিদেশে গেছে, ছবি তুলে এনে দেখিয়েছে, সেন্ট উপহার দিয়েছে,—ওহো, সেন্ট নয়, পারফিউম। ওমলেটকে মামলেট বলা ছেড়েছি, মানিব্যাগকে পার্স বলি, কিন্তু সেন্ট বলা ছাড়তে পারিনি এখনও, দিল্লি গেলেও কচৌড়ি না বলে কচুরি। খুব দামি, সাজানো, ঝলমলে দোকানে ঢুকতে আজও ভয় পাই, তবু মাঝে মাঝে ঢুকে যাই তবে অভ্যাস হয়নি এখনও, মাঝে মাঝে বাড়িতে চিজ আনি, কর্নফ্লেকস আনি, ভালবাসি না খেতে, আমার এখনও দুধমুড়ি বেটার লাগে, দই চিঁড়েও, তবু ওসব এমনি এমনি খাই। ছেলেটা অবশ্য ভালই বাসে, রচনা ততটা নয়। বোঝাই যাচ্ছে, রচনা আমার বউ-এর নাম। ক'দিন আগে রচনার জন্য একটা ক্রিম এনেছিলাম, বিদেশি, সাড়ে সাতশো টাকা দাম। আসলে গছিয়ে ছিল অফিসের সহমর্মী, সহকর্মীর চেয়েও বেশি। বস। উনি 'অ্যাময়' করেন। কে জানে কেন করেন, ওঁর তো অনেক টাকা। ওদের ডাবল ইঞ্জিন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে চাকরি করেন। গাড়িও আছে। গাড়িটা ওদের অফিসে পৌঁছে দিয়েই ভাড়া খাটাতে চলে যায়। গাড়ি থেকেও আয় আছে, প্লাস 'অ্যাময়'-এর আয়। আমাদের অফিসের অনেকেই এখন ওঁর টিমে আছে। অফিসটা অ্যাময়ময় হয়ে গেল। আমাকেও বলেছিলেন উনি 'অ্যাময়' করতে। অ্যাময় করানোর টুপি পরানোর নাম হচ্ছে কার্বনগেসিং আমাকে কার্বনগেসিং করানোর সময় আমার বস আমাকে ওদের সিঙ্গাপুর ভ্রমণের ছবিগুলো দেখিয়েছিল। বোধ হয় তখনই—আমার মনের গর্ভে বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছেটার গর্ভ সঞ্চার হয়। ভাবলাম বাংলাদেশ তো যাওয়াই যেতে পারে, এমন কী খরচা। থাইল্যান্ডও যাওয়া যায়। ব্যাংককের প্লেন ভাড়া দিল্লির মতোই তো। খুব ইন্দোনেশিয়া যেতে ইচ্ছে করে। ট্যুরিজম কোম্পানিগুলির বিজ্ঞাপন দেখতে শুরু করি। স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ছবিগুলো বিজ্ঞাপনে 'অ্যামাজিং আমেরিকা' দেখি। না, তাই বলে অ্যাময় করতে পারব না। এখনও আমি মাঝে মাঝেই বিড়ি খাই, বিশেষত যখন ফি বাজেটে সিগারেটের দাম বাড়ে। দাম বাড়লেই আমি সাধারণত এক বান্ডিল বিড়ি কিনে ফেলি, ভাবি ধূমপানের খরচটা মানে বাজে খরচটা কিছুতেই বাড়তে দেব না। কিন্তু সত্যি কথা বলছি ভাই, বেশি দিন হয়ে ওঠে না। আমাদের ডিএ-টাও বাড়ে কিনা, প্রাইস ইনডেকস এর সঙ্গে সঙ্গে তাই আর বিড়িতে বেশি দিন স্টে করা হয়ে ওঠে না। ছেলের হাত ধরে রাস্তায় বের হলে ভিখিরি পয়সা চাইলে পয়সা দি, ওর হাত দিয়েই দেয়াই। ও না থাকলে অবশ্য দিই না তেমন। জানি চার আনা আট আনা দিয়ে কোনও সমস্যার সমাধান হবে না বরং ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহ দেওয়া হবে। তাই বলে আমি জ্ঞান দিতেও যাই না—খেটে খেতে পারো না? আমাদের বাড়িতে এখন কাজের লোক আছে। যে ভাবে আমি মামলেট না বলে ওমলেট বলি, সেন্টের বদলে পারফিউম শিখেছি, বেশ্যার বদলে যৌনকর্মী শিখেছি, সে ভাবেই ঝি-চাকরের বদলে কাজের লোক শিখেছি। সে একটা বাচ্চা ছেলে। বছর দশেক বয়স। যদি বলেন শিশু শ্রমিক, আমি বলব হ্যাঁ, তাই। কিন্তু আমরা না দেখলে ছেলেটা শেষ হয়ে যেত। মেদিনীপুরের ছেলে কেশপুর অঞ্চলের, ওদের গণ্ডগোলের ফল তো সবাই জানে। ছেলেটির মা ছিল না। কারও সঙ্গে ভেসে গিয়েছিল। বাবা আর জ্যাঠা এক রাতে এক সঙ্গে খুন

হয়ে গিয়েছিল। ওই অনাথ ছেলেটিকে আমি দেখি। আমার বউ ওকে পড়ায়, আমার ছেলে যে আইসক্রিম খেয়েছে, ছেলেটিও সেই আইসক্রিম খেয়েছে। ও যদি আমাদের কাছে থাকে, ওকে পড়াব। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছে ও। সামনের বছর স্কুলে ভরতি করিয়ে দেব। ছেলেটিকে দিয়েছিল আমাদের অফিসের এক গ্রুপ ডি স্টাফ। বলেছিল, স্যার, আমাদের দেশের হাল খুবই খারাপ। কাগজে যা দেখেছেন তা কিছুই না। একটা ছেলে স্যার, মা-বাপ-জ্যাঠা কেউ নেই, ছেলেটাকে রাখবেন? বলেছিলাম, আনো। ছেলেটাকে দেখে খুব মায়া হল। কেমন অপু অপু দেখতে। হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার বাবাও আগে ফুল পাট্টি ছিল, এখন মিচুল করে লাল পাট্টি হয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, আমার বাবাও ফুল পার্টি ছিল বলতে কী বোঝাচ্ছে? আমাকে কি তৃণমূল ভাবল নাকি? জেরা করায় বুঝলাম আমার লিভিং রুমে উইপ্রো কোম্পানির ক্যালেন্ডারে জোড়া সূর্যমুখীর ছবি দেখেছে। আর 'মিচুল' করতে হয়েছিল বলেই— ওদের খুন হতে হয়েছিল, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে। সত্যপ্রিয় ঘোষ আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন। হ্যাঁ, লেখক, প্রাবন্ধিক সত্যপ্রিয় ঘোষ। এই লেভেলের কিছু লোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, এখনও দেখা হলে কথা হয়। ধীরেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। থাকগে। সত্যপ্রিয় ঘোষ একটু গল্প বলছিলেন। ওদের বাড়িতে একটি কাজের মেয়ে এসেছে, কেউ নিয়ে এসেছে। ওর দেশে খুব গণ্ডগোল। কেশপুর অঞ্চলেই ওদের ঘর। ওর রেকসিনের ব্যাগে দুটো ফ্রক ছিল। একটার রং লাল, অন্যটা সবুজ। ও জিজ্ঞাসা করেছিল কোন জামাটা পরলে ওকে কেউ মারবে না। থাকগে যাক। আমাদের ঘরে এখন যে-ছেলেটা থাকে কাজের লোক বলছি, হ্যাঁ, ও ঘর মোছে, আমার ফাইফরমাশ খাটে, আমার ছেলের তো কোনও বন্ধু নেই, একটাই তো ছেলে। গতবার মাধ্যমিক পাশ করেছে। ভালই করেছিল। তো ভীষণ ব্যস্ত। হায়ার সেকেন্ডারিতে যা প্রেসার। তবু যা হোক ছেলেটার সঙ্গে টুকটাক গল্প করে। ও, ছেলেটার নাম বলিনি এখনও,—অর্জুন। নামটা বেশ। কোথাও বেড়াতে গেলে ওকেও নিয়ে যাই। আমার ছেলেটা ভালই হয়েছে বলতে হবে। কমপ্লেক্স নেই। ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশে। সেদিন আমরা সবাই মিলে একটা বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম, বারুইপুরে। রাস্তায় একটা অদ্ভুত ধরনের গাছের ডাল কুড়িয়ে পেয়েছিল ছেলেটা। ও বাড়ি নিয়ে এসেছিল। অনেকটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মতো দেখতে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কী হবে এটা? কিছু বলে না, মানে আমার ছেলের কিন্তু খুব আর্টিস্টিক সেন্স। ও ওই ডালটার সঙ্গে প্লাস্টিকের ফুলটুল মিশিয়ে দিব্যি একটা 'ইকেবানা' করে ফুলদানিতে রেখে দিল। ইকেবানা জাপানি ব্যাপার। জাপান কখনও যাওয়া হবে না। ওখানে হোটেলের অনেক চার্জ। যখন হবে তো হবে, পাশপোর্টটা তো করি, এই ভেবে পাশপোর্ট-এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম। হয়ে গেল। তার পরই দুরু দুরু বক্ষে আইডিয়াল প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব এর কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছিলাম। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার শব্দটা বুকের ধুকপুকির শব্দের সঙ্গে বেশ মানিয়ে যায়। কাউন্টার থেকে মৃদু হেসে এক মহিলা খামটা দিল। দেখলাম পজিটিভ। প্রেগনেনসির কানফার্মেশনের জন্য ওই পেচ্ছাব পরীক্ষাটা দরকার ছিল। পেচ্ছাপ বললে খুব খারাপ শোনায়, আর প্রস্রাব তো বলাই মুশকিল। লেখাও। দেয়ালের নিষেধে প্রস্রাব বানান দেখেছেন? পস্রাব, প্রস্বাপ, প্রসাব এরকম নানারকম। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যখন ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে ছিলেন, হ্যাঁ, লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাই বলছি, উনি হঠাৎ একজন কর্তব্যরতা নার্সকে বলতে শুনলাম—তুমি গতকাল আমার কাছ থেকে পেচ্ছাপ চেয়েছিলে? নার্সটি বলল—সে তো ইউরিন। টেস্টের জন্য।—ওই একই হল। আর তোমার বন্ধু ডলি আমার কাছ থেকে কী চেয়েছিল জানো? গল্প। একটা গল্প শুনতে চেয়েছিল তা হলে, তোমাদের দু'জনের তফাতটা বোঝ।

এখন আমি এরকম লাইট টক করছি বটে, কিন্তু এরকম গল্প করার মতো মানসিক অবস্থায় আমি নেই। আমার স্ত্রী প্রেগন্যান্ট। আমার বয়েস এখন পঞ্চাশ, ছেলের আঠারো। এই বয়সে আমি বাবা হতে চলেছি। রচনা, মানে বউ বলেছিল ইউরিন টেস্টে কী হল ফোন করে জানিয়ে দিতে। আমি

ফোন করিনি। ফোনে খারাপ খবর দেয় কেউ? ইউরিন রিপোর্টটা জামার পকেটে। পাশপোর্টের পাশে। আচ্ছা, এটা ভুল হতে পারে না? কতই তো শুনি প্যাথলাজিকাল টেস্টে ভুল হয়। আর এক বার করাব? কী ঝামেলাতেই না পড়লাম। আমার বউ এর বয়েস এখন পঁয়তাল্লিশ। ওর চুলে পাক ধরেছে। মেহেন্দি করেছে। আমার অফিসের অবস্থাও ভাল নয়। রক্তে কোলেস্টেরল বেশি, একটা দাঁত পড়ে গেছে, দুটো নড়ছে। ব্যাপারটা এমন যে ও নিয়ে কারুর সঙ্গে পরামর্শও করা যায় না। আমার সেরকম বন্ধু নেই। ছোটবেলার বন্ধুদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আর তেমন যোগাযোগ নেই। অফিসের কলিগদের মধ্যে এ ব্যাপারে পরামর্শ করার মতো সম্পর্ক কারুর সঙ্গেই তৈরি হয়নি। পাড়ায় যেসব পড়শিদের সঙ্গে জঞ্জাল ফেলা কোথায় হবে, কিংবা বিজয়া সম্মিলনীতে আশাকণ্ঠী ডাকা হবে নাকি বাংলা ব্যান্ড ডাকা হবে নিয়ে আলোচনা করা যায়, তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার বাবা হওয়া উচিত কি না আলোচনা করা যায় না। ওই যে সত্যপ্রিয় ঘোষের কথা বলেছি, তাঁকে শ্রদ্ধা করি, অনেক উপদেশও নিই, যেমন ছেলেকে কোন স্কিমে পড়াব, অ্যালোপাথি ভাল না আয়ুর্বেদ ভাল। এই যে ১১ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টারকে ভেঙে দিল, এর ইমপ্যাক্ট কী হতে পারে এ নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু এখন আমি বাবা হলে কী এর ইমপ্যাক্ট এ নিয়ে ওঁর মতো লোকের সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। আমার মেজ শ্যালকের সঙ্গে ইদানীং আমার ভাব হয়েছে। এক সঙ্গে রাজস্থান ট্যুর করে এলাম। ওর সঙ্গে দেশি মুরগি ভাল না কি ব্রয়লার তাই নিয়ে আলোচনা করা যায় কিন্তু ওর বড়দির এ বয়সে মা হওয়া উচিত কি না আলোচনা করা যায়? ছেলেটা আমার চেয়ে পনেরো বছরের ছোট। আসলে এরকম কোনও কথা ছিল না। আমরা বহুদিন ভাইবোন জীবন কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল। এ জন্য আমি দায়ী নই। দায়ী ১১ই সেপ্টেম্বর। যে দিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভেঙে পড়েছিল। রাত ন'টা নাগাদ খুলেছিলাম টিভি। তখনই দেখলাম আমেরিকা আক্রান্ত। বলে কী? আমেরিকা আক্রান্ত? সি এন এন, বি বি সি, সব চ্যানেলে দেখাচ্ছে কী ভাবে ধসে পড়ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। ছবিগুলোর তলায় ক্যাপশান আমেরিকা অ্যাটাকড। পেন্টাগনের উপরেও বিমান হানা হয়েছে। পেন্টাগনেও। সেই পেন্টাগন? সি আই এর সদর দপ্তর? আমরা যে বলতাম সদর দপ্তরে কামান দাগো, পেন্টাগন উড়িয়ে দাও। ওগুলো তো সব আঠারো বছর বয়সের স্বপ্ন ছিল। আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি। তখন আত্মাকে স্বপনে সঁপেছিলাম। ভূপেশ, মানিক, পল্টু, বরেন, শ্যামল...। ভূপেশটা মারা গেছে। তখনই। বরেন ছিল জেলে, চার বছর। ওর হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে দিয়েছিল মেরে। এখনও খুঁড়িয়ে হাঁটে। ছোট্ট স্টেশনারি দোকান আছে। বরেনের কাছে যাই এখনও কখনও সখনও। এখন আর পুরনো দিনের কথা তোলে না। আমি তো আরও নয়। ভেবেছি এতদিনে সব চুকে টুকে গেছে।... সেই পেন্টাগনে বিমান হানা? কারা? কারা রে বরেন? মনে মনে বলি। আল-কায়দার কথা তখনও বলছে না। টিভিতে ওই দৃশ্যটা বার বার দেখাচ্ছে। একটা এরোপ্লেন এল, জয়ধ্বজার মতো মাথা উঁচুনো বাড়িটার গায়ে ধাক্কা মারল, আগুন, ধোঁয়া এবং বাড়িটা ধসে পড়ল। তখন মুখে 'ইশ' বলেছিলাম, কিন্তু আমার সত্তার ভিতর থেকে আঠারো বছর বয়সটা হাততালি দিচ্ছিল বেশ বুঝতে পারছিলাম। আঠারো বছর তো কবে শেষ হয়ে গেছে তবু কেন আসে, মাইরি তবু কেন আসে? ওই যে বিমানটা, যেন স্বপ্নের যেন রূপকথার। সেই তিরিশ-বত্রিশ বছর আগেকার পোষা স্বপ্নটাকে বয়ে নিয়ে এল যেন। বার বার দেখাচ্ছে সেই অলৌকিক বিমান। আমি দেখছি। রচনা বলেছিল, ইশ, কতলোক মারা গেল...। আমি বলেছিলাম, কতলোক মারা গেছে ভিয়েতনামে, চিলি-পেরু-বলিভিয়া-আর্জেন্তিনা-ইরাকে? রচনা বলেছিল, তাই বলে নিরপরাধ এই সব লোকগুলোকে...। ভিয়েতনামের লোকরাও তো নিরপরাধ ছিল। আমি বলি। বলেই ভাবলাম এটা কোনও যুক্তি নয়। অন্যায়ের বদলে অন্যায় নয়। খুনের বদলা খুন নয়। রক্ত-রাজনীতি থেকে বহুদূরে সরে এসেছি তো। তবু আমার বুকের ভিতরে লুকোনো কোন কন্দহরের গুহায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা আঠারো বছরের দুষ্টু ছেলে ঘাড় নাচিয়ে হাততালি

দিয়ে বলে—বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। আর পঞ্চাশ বছরের আমি শশব্যস্ত হয়ে ওকে বলি, অ্যাই, কী হচ্ছে, চুপ, চুপ। বারবার সেই—অলৌকিক বিমানটিকে দেখাচ্ছে টিভির পর্দায়, যে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল আমেরিকার জয়ধ্বজা। কে রয়েছে? কে চালাচ্ছে ওই আত্মঘাতী বিমান? ওখানে ভূপেশ রয়েছে, ভূপেশ। সেই ভূপেশ, আমার বন্ধু। কলেজ হোস্টেল থেকে তুলে নিয়ে খুন করা হয়েছিল ওকে। সেদিন মানে ১১ই সেপ্টেম্বর বেশ রাত্রি পর্যন্ত টিভি দেখেছিলাম। দেখলাম বিধ্বস্ত পেন্টাগন, দেখলাম আমেরিকা প্রেসিডেন্টের ফ্যাকাশে মুখ তখন শরীর জুড়ে বয়ঃসন্ধির হাততালি। রচনাকে আদর করতে ইচ্ছে করল। খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করল। বিধ্বস্ত আমেরিকার সামনে সেদিন আমাদের বিরল সঙ্গম। সম্ভবত সেই রাত্রেই গর্ভবতী হয় রচনা। সম্ভবত কেন বলছি, ইউরিন টেস্ট তো পজিটিভ। কিন্তু রচনা যে এ ভাবে এ বয়সে গর্ভবতী হয়ে যাবে আমি ভাবতেই পারিনি। ও গত এক বছর ধরেই মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘেমে উঠত। মাঝে মাঝেই বলত খুব গরম লাগছে। আমি তো জানি, ওসব হচ্ছে প্রি-মেনোপজ সিনড্রোম। রচনাও জানত এসব বন্ধ হয়ে আসছে। এমনিতেই বোধ হয় পিরিওড কিছুটা অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল, তাই পিরিওড মিস করাটাকে আমল দেয়নি। মুশকিলটা হল বমি শুরু হবার পর। সকালবেলার বমি। মর্নিং সিকনেস। রচনা বলেছিল, ব্যাপারটা যে অন্যরকম লাগছে। অন্যরকম বলতে যে ও প্রেগন্যানসি বোঝাতে চাইবে সেটা আমি আদৌ ভাবিনি। কিন্তু রচনাই বলল— না গো, আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না, সেই রকম মনে হচ্ছে। সেই রকম মানে? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। রচনা বলল— আঠারো বছর আগে, খোকন হবার সময় যেরকম লেগেছিল। এমা, আমার এবার কী হবে...। এরপর যা হয়,— ডাক্তার দেখানো, ইউরিন টেস্টের অ্যাডভাইস...। ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে দেখাইনি। লজ্জা করেছিল। একটু দূরের এক অচেনা ডাক্তারকে দেখিয়ে ছিলাম। ওই ছোকরা ডাক্তার খুব মুখ টিপে হাসছিল। সেই হাসির মধ্যে লেখা ছিল এখনও বেশ রসে বশে আছেন দেখছি...। ডাক্তার কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, আমিই আগ বাড়িয়ে বলেছিলাম—এখন আর আমাদের ওই সব হয় টয় না, হলেও মাসে দু'মাসে এক আধ বার—। আসলে ওর তো থেমেই গেছে...। ডাক্তারটা একবার আমাকে দেখছে, একবার রচনাকে, আর মুচকি হাসছে। তারপর বলল—থেমে গেছে মনে হয়, কিন্তু থামে না। থেকে যায়। ইউরিনটা করিয়ে নিন। সেই ইউরিন করিয়েছি, এটা নিয়ে বাড়ি যাব। এখন যেখানে থাকি, জায়গাটার আগে নাম ছিল সুরের মাঠ। মানে সুরদের মাঠ। সুর পদবিওলা পরিবারের অনেকটা নাবালে জমি ছিল এখানে। অনেকটাই ডোবা, কচুরিপানার জঙ্গল, ঘাস জঙ্গল, এইসব। শামুক-ঝিনুক খুব হত বলে শামুক খেতে পাখি আসত, আরও সব শীতের পাখি। অনেক সাদা সাদা বক। এখন ডোবা ভরাট হয়ে ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে। ঘাস জঙ্গল নেই। লাইটপোস্ট। শুকনা ঘাস দ্বারা শৌখিন দ্রব্য তৈরি শিক্ষা দেয়া হয়। বিজ্ঞাপন। এখানে এখন জিম, সাইবার কাফে, পিৎসা কর্নার, লাফিং ক্লাব। যারা বাড়িতে, আপিসে কখনও হাসেন না, ভোরবেলায় ওয়ান টু থ্রি বলে হাসেন। এখন ওই সুরের মাঠের নাম হয়ে গেছে সুরবিহার। সুরবিহারে ঢুকতে গেলেই একটা আর্ট কলেজ। ইনডিয়ান আর্ট কলেজ। আগে এই আর্ট কলেজটা ছিল ধর্মতলা স্ট্রিটে, আর এই বাড়িটা ছিল দমদম মতিঝিল কলেজের হোস্টেল। হোস্টেলটা উঠে যাবার পর আর্ট কলেজটি এই বাড়িতে চলে আসে। আমি ছিলাম দমদম মতিঝিল কলেজের ছাত্র। ওই হোস্টেলে আসতাম। বন্ধুরা ছিল। ওখানে অনেকেই হোস্টেলের দেয়ালে পোস্টার মারত গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো, কৃষি বিপ্লব জিন্দাবাদ, চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, পেন্টাগণের সদর দপ্তরে কামান দাগো। ওখানে ভূপেশ ছিল, শ্যামল ছিল, বরেন ছিল। ওই হোস্টেলে অনেক সময় কাটিয়েছি আমি। টেবিল বাজিয়ে গান করেছি হেই সামালো ধান হো কাস্তেটা দাও শান হো। সেই সঙ্গে আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি কিংবা নিঝুম সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়। ভূপেশটা বেশ গাইত। ওই সত্তরের দশকটা এক আশ্চর্য দশক। যত সব দারুণ প্রেমের গান, এ সময়েই দারুণ সব নাটক, সিনেমা, আবার ওই সময়েই সাঁইবাবা, পাড়ায় পাড়ায় শনি পূজার ঠেক, জীবন যৌবন, সুন্দর

জীবন, এইসব পত্রিকা। মতিঝিল হোস্টেলেই ওই ধরনের পত্রিকা দেখি। দেশব্রতীও। মতিঝিল কলেজের ওই হোস্টেলের দক্ষিণের জানালা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসত, আর জানালা দিয়ে দেখা যেত কচুরিপানাময় জলা জমি। হোস্টেলের কয়েকটা ছেলে ওই জলা জমিতে কেন যেন যেত। ওখানে পুলিশ দুটো বন্দুক খুঁজে পেয়েছিল। সি আর পি-র কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া বন্দুক। হোস্টেল রেট হয়েছিল। বরেন তখনই ধরা পরে। ভূপেশ ছিল না। এরপরই হোস্টেলটা বন্ধ করে দেয়া হয়। ভূপেশ কিন্তু দমদম অঞ্চলেই থাকত। একটা বাড়ি ভাড়া করেছিল। ওর আসল বাড়ি ছিল তমলুক। ভূপেশ বি এস সি পরীক্ষাটা দিল না। ওই অঞ্চলের সংগঠনের দায়িত্বটা অনেকটাই ছিল ভূপেশের উপর। ভূপেশ গোপনে দেখা করত আমার সঙ্গে। ভূপেশ একটা স্বপ্ন দেখিয়েছিল। খুব সুন্দর একটা সমাজের। এজন্য একটু কষ্ট, একটু রক্তক্ষয়। সে তো সব যুগেই হয়ে এসেছে। আমিও স্বপ্নে হারিয়ে যেতে শুরু করলাম। তখনই বাবা আমাকে দিল্লি পাঠিয়ে দিল মামার কাছে। ভূপেশ দিল্লির ঠিকানাটা জানতে পেরেছিল, আমাকে চিঠিতে লিখেছিল—দিল্লিতেই কাজ কর। লাল কিল্লা পর লাল নিশান মাঙ্গ রহা হায় হিন্দুস্থান।

ঠিকানা দেয়নি, তাই শ্যামলকে একটা উত্তর দিয়েছিলাম। এর কিছুদিন পরই একটা মিটিং হয় কবরডাঙায়। যেসব ডাক্তারবাবুরা বেশি ফি নিচ্ছেন তাদের কী করা হবে তাই নিয়ে। এইসব পরে শ্যামলের কাছেই শুনেছি। শ্যামল বলেছিল ভূপেশ আমার পাঠানো চিঠিটার উত্তরে আমাকে নাকি একটা চিঠি লিখেছিল, তাতে দিল্লির কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কিছু নাম ঠিকানা ছিল। চিঠিটা ওর পকেটেই ছিল। মিটিং থেকে ফেরার সময় পুলিশ ওদের ধরে। ভূপেশ তক্ষুনি ওর পকেট থেকে আমাকে লেখা চিঠিটি খেয়ে নেয়। এ ভাবেই ভূপেশ আমাকে বাঁচায়। এরপর পুলিশ ওকে নিয়ে যায় সুরের মাঠে। শ্যামল পালিয়েছিল, কিন্তু ভূপেশ আর ফেরেনি। সে সময় সুরের মাঠ ছিল বধ্যভূমি। এরপর তো বহুদিন কেটে গেছে। অনেক শহিদ বেদির ফলকের অক্ষরমালা বিবর্ণ হয়ে গেছে। রাজা গেছে রাজা এসেছে। মতিঝিল কলেজের ওই হোস্টেল এখন আর্ট কলেজ। পিছনের সুরের মাঠ ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে সেজে এখন সুরবিহার। এই সুরবিহারেই আমার বাড়ি। ফ্ল্যাট নয়, বাড়ি, একতলা। ৮০০ স্কোয়ার ফিট। ওখানে জমি কিনি বেশ কয়েক বছর আগে। তখন সদ্য সদ্য ডোবা ভরাট চলছে। আমি দু' কাঠা জমি কিনি। এখনকার দামের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় সস্তাতেই জমিটা কিনেছিলাম। আমাদের সবার পেটে তখন চর্বি জমতে শুরু করে দিয়েছে। বিপ্লব করতে যাওয়া একদা তরুণদের ক্ষত চিহ্নগুলি মসৃণ হয়ে গেছে ততদিনে, নন্দনও হয়ে গেছে, ওখানে চোয়াল ঝুলিয়ে বিদেশি সিনেমা দেখছি আমরা, তখনই অফিস থেকে লোন টোন নিয়ে বাড়ি করতে শুরু করি। হ্যাঁ, ছোট করে ভিত পুজোও করতে হয়েছিল। আর ভিত খোঁড়ার সময় একটা কঙ্কাল উঠে এসেছিল। হ্যাঁ, কঙ্কাল। কঙ্কাল! না-না, ওটা ভূপেশের নয়, ভূপেশের কেন হতে যাবে? এই মাঠে আরও কত মার্ডার হয়েছে। মজুরেরা গোটা কঙ্কালটা উঠিয়ে একটা বাবলাগাছের তলায় রেখে ছিল। কাঁটা সাজানো বাবলাগাছের চারিপাশে তখন অনেক প্রজাপতি। ওই কঙ্কালটাকে দেখব না ভেবেও দেখেছিলাম। ওর চোখ ছিল না। ওখানে তীব্র শূন্যতা ছিল। ও কি ভূপেশ? আমাকে লেখা চিঠিটা ও খেয়ে ফেলেছিল। তারপর ও মরে গেছে। আমাকে লেখা না পাঠানো চিঠিটা ওই কঙ্কাল শরীরের ধূসরে লেখা আছে। সারা কঙ্কাল জুড়ে চিঠি। ওঃ। কাউকে বলিনি সে কথা। বউকে তো নয়ই। কঙ্কালটাকে কারা যেন নিয়ে গেল ডাক্তারি ছাত্রদের কাছে বিক্রি করে দেবে বলে। ওই কঙ্কালের কথা মাথায় আসতেই, ও কিছু না ও কিছু না, ভূপেশের কেন হতে যাবে ভাবতে ভাবতে বাড়ি করে ফেললাম, হোয়াইট সিমেন্ট, বাথরুমে মার্বেল, কমোড, গ্লেজড টাইলস, রান্নাঘরে একজস্ট ফ্যান, ব্যালকনি, বার। দিব্যি কাটছিল। ভালই ছিলাম। সুরের মাঠের নাম পালটে সুরবিহার বানিয়ে, ফ্ল্যাট অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে, দেবদারু লাগিয়ে, দোলনা লাগিয়ে মর্নিংওয়াক করে দিব্যি আছি। গাড়ি কিনবার কথাও ভাবছি। ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াব। ক্যাপিটেশন ফি যদি না দিতে হয় তবে গাড়িটা কিনেই ফেলব। কম্পিউটার কিনেছি। কম্পিউটারের

আমি সামান্য কিছু জানি। ছেলে আমার চেয়ে বেশি জানে। মাঝে মাঝে আমরা দু'জনে ইন্টারনেটে ঢুকি। একটা ভ্যান হুসেনের জামাও কিনে ফেলেছি হুট করে। বউ সেদিন চুল ছোট করে কেটে এল। হকার উচ্ছেদে আমার সায় আছে। বুদ্ধবাবু বেশ চালাচ্ছেন মনে হয়। কাশ্মীরে পাকিস্তানিরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া উচিত। এরই মধ্যে ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার টেঁসে গেল, পেন্টাগনে বিমান হানা, আমার বউএর ইউরিন টেস্ট পজিটিভ।

আমি কী করব এবার?

এই বয়সে রচনার গর্ভ আবার নতুন করে কিছু রচনা করতে যাবে নাকি। মাথা খারাপ? ওটাকে অ্যাবরেট করতে হবে। এখন তো বেআইনি নয়, একটা ভাল নার্সিংহোম ঠিক করতে হবে, আর একজন ভাল গাইনি। কোনও রিস্ক নেয়ার সিন নেই।

আমি বুক পকেটে পজিটিভ নিয়ে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি পায়চারি করছি, বাড়িতে ঢুকছি না। গেলেই রচনা জিজ্ঞাসা করবে, তখন কী বলব? তারপরই ফিসফাস হবে কিছুক্ষণ। ছেলেকে তো এসব বুঝতে দেয়া যায় না। ঢুকলেই রচনা জিজ্ঞাসা করলে আমি বলব পরে পরে। আমাদের দুটো ঘর। এক ঘরে আমরা, অন্য ঘরে ছেলে। আর অর্জুন থাকে লিভিংরুমে। ছেলে রাত বারোটা সাড়ে-বারোটা অব্দি পড়াশুনা করে। আমরা অনেক দিন ধরেই আমাদের ঘরের দরজা আটকাই না। কোনও গুহ্য কথা বললে ব্যাটাচ্ছেলে ঠিকই শুনতে পাবে। কাল বলব। সকালে ছেলে কোচিং-এ যায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবছি কোন নার্সিংহোমে যাব। ছেলেকে কী গুল দেব। যদি বলি একটা ছোট্ট টিউমার হয়েছে, অপারেশন হবে। কোথায়? না ইউটেরাসে। ছেলে কি বুঝে যাবে? কী ফ্যাসাদেই না পড়লাম। স্রেফ একটা বিমান হানা আমার বউকে গর্ভবতী করে দিল? ভাবছি, আর পায়চারি করছি। এমন সময় দেখি আমাদের কম্যুনিটি হলের সামনে লাল কালিতে লেখা একটা পোস্টার: 'অন্ধ্র, বিহার আর নেপালের কমরেড, লাল সেলাম'। সে কী? আমাদের কলোনিতে নকশাল? থামেনি এসব? ডাক্তারটা বলেছিল থেকে গেছে মনে হয়, থামে না। আবার আর একটা। মাও সে তুং জিন্দাবাদ। এতক্ষণ খেয়াল করিনি। একটা গ্যারেজের গায়ে আরও। অন্ধ্র আর বিহারের কৃষক সংগ্রাম দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও। আবার ওই ভিতরের কন্দহরে লুকিয়ে থাকা আঠারো বছর হাততালি দিয়ে ওঠে। আমি বলি, এসব সন্ত্রাস। সন্ত্রাস! বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এখানেই POTA আসছে, POCA আসছে। আঠারো বছর বলে, তোদের বাঁধন যতই শক্ত হবে...। আমি ওকে বলি ঝামেলা করিস না, তুই যা, তোরা এখন সন্ত্রাস। ওই আল কায়দা, হিজবুল, লস্কর-ই তৈবার মতন। ভুল ছিল, ভূপেশ, তোরা ভুল ছিলিস।

এখন কাগজে প্রায়ই নকশালদের খবর। এম সি সি। জনযুদ্ধ...। থানা দখল, রাইফেল লুঠ এইসব খবর। হিজবুল, লস্কর-ই-তৈবা, জৈস-এ-মহম্মদ—আল কায়দার সঙ্গে মিশিয়ে। নেপালে কোকাকোলার কারখানা ধ্বংস করল মাওবাদীরা। আমি সন্ত্রাস চাই না। শান্তিতেই আছি। নিজের বাড়ি। আমার খাবার জলে আর্সেনিক নেই, আমার ছেলে এইট্টি এইট পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে, আমার অফিস চিকিৎসার সব খরচ দেয়। টাকাও জমেছে। ফরেন যাব। দিব্যি আছি। গাড়িও কিনব। আগে এই উটকো ঝামেলাটা মিটিয়ে নিই।

বাড়ি যাই। বউয়ের চোখ উৎসুক। আমি মুখে আঙুল দিই। রচনা জিজ্ঞাসা মাখিয়ে একটাই শব্দ উচ্চারণ করল—খারাপ?

আমি মৃদু মাথা নাড়ি। সব কিছু গম্ভীর হয়ে যায়। টিউবটার আলো, ভারী পর্দা, এমনকী ফুলদানিতে রাখা প্লাস্টিকের রজনীগন্ধাও তখন গম্ভীর। সুখের ডাইনিং টেবিলে কোনও কথা নেই। ছেলে বলল, এবার বোধ হয় টেরোরিজম খুব ইম্পরট্যান্ট। এসে কম্পোজিশন বইতে টেরোরিজম নেই।

আমি কোনও জবাব দিই না। ছেলে বলল, বাপি, ক্ষুদিরাম কি টেররিস্ট ছিল? জবাব দিই না।

এসময়ের আঠারো বছর জবাব খোঁজে। শুয়ে পড়লাম। নীল আলোটা কী গম্ভীর। রচনা আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলে, আমার কী হবে? আমি মাথায় হাত বুলিয়ে বলি, খুব ভাল জায়গা থেকে করিয়ে আনব। যা লাগে লাগবে। এক দিনের তো মামলা। ঘুমোও। আমি ঘুমোতে চেষ্টা করি। রচনাও করে বোধ হয়। একটু পরেই কান্নার শব্দ শুনি। ওর মুখে হাত চাপা দিই। থামো কান্না থামো। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলি, খোকন শুনে ফেলবে। ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘুম ভাঙাল ভূপেশ।

দেখি হাঁটুর উপর ধুতি, খালি গায়। অনেকটা বালক বীরের মতো দেখতে। হাতে তির-ধনুক। বলে—কীরে শালা ভুঁড়িওয়ালা ভেবেছিস সব থেমে গেছে? আমি আসছি আবার। আমি এখন তোর বউএর গর্ভে আছিরে।

উঠে পড়ি। জল খাই। গম্ভীর নীলে রচনা ঘুমোচ্ছে।

ও রচনা, পুনর্জন্ম বিশ্বাস করো তুমি?

রচনা চোখ খোলে।

ঘুমোওনি বুঝি? আমিও না।

রচনার মাথায় হাত রাখি। বলি, বলো না, পুনর্জন্ম হয়?

রচনা কিছু বলে না। গম্ভীর নীলে দেখি রচনার চোখের কোনায় চিকচিক জ্বলে জানি না জানি না জানি না। রচনার মাথায় হাত রাখি। বলি, বড্ড ভাবছ তুমি। বলছি তো কিচ্ছু না। কিউরেটিং মেশিন বেরিয়েছে। অ্যাবরশন করিয়ে দেব। খোকন স্কুলে যাক, কালই প্ল্যান করব সব। একদম মাথা ঠান্ডা করে।

রচনা বলে, এত দিন পর যে আসছে ওকে আমরা মারব, প্ল্যান করে মেরে ফেলব। এটা কোনও সন্ত্রাস নয় তো? বলো?

বলি, ঘুমোও। দীর্ঘশ্বাস। আমাদের দীর্ঘশ্বাসের সন্ত্রাস।

সকাল হলে ছাদে যাই। দেখি ভোরের রোদ্দুর মেলে ধনুক পড়ে আছে একটা। ছোট্ট একটা ধনুক। বালক বীরের বাহুর মাপে তৈরি। খুব ভয় পেয়ে সরে আসি। দূর থেকে দেখি। হ্যাঁ। ধনুক। সেই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মতো কাঠটা। বারুইপুরের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল অর্জুন। খোকন ওটাকে ইকেবানা করেছিল। এখন ওই কাঠের দু'পাশ কাপড়ের পাড় দিয়ে জুড়ে ধনুক করেছে কে?

শারদ অনুষ্টুপ, ২০০২

ডাকিনিতন্ত্র

স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে সরসিজ পণ্ডা। লোধাশুলির চরণ দাস সিংহ উচ্চ বিদ্যালয়ে পোস্টিং। সরসিজের দেশের ঘর বালিচক-এ। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্স-এ এম এস সি।

বালিচক অঞ্চলে গণবিজ্ঞান আন্দোলন করে, এমন যে কয়েকটি সংগঠন আছে। একটি সংগঠনই ভেঙে এখন তিন-চারটি হয়েছে। প্রথম সংগঠনটি যার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল, তার নাম ষড়ানন পণ্ডা। সরসিজের জ্যাঠামশাই তিনি।

ষড়ানন পণ্ডা নিজে পইতে ছেড়েছিলেন, বাড়ির শালগ্রাম শিলার গায়ে মুরগির মাংস ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন। পবিত্র শালগ্রামটির সংস্কার হয়নি আর। ম্লেচ্ছস্পর্শে কী করে শালগ্রামের সংস্কার হয়, তার বিধান জানা থাকলেও নিষিদ্ধ মাংস স্পর্শে কী ভাবে ভগবানের শোধন হবে তার বিধান ওই অঞ্চলের ব্রাহ্মণকুলের জানা ছিল না। শিলাটিকে কংসাবতীতে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। সরসিজের বাবা মারা গিয়েছিলেন সরসিজের বাল্যবয়সে। জ্যাঠামশাই ষড়ানন তাই ছিলেন বাড়ির কর্তা। সরসিজের পইতে দেওয়া হয়নি। ষড়ানন পণ্ডা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। এখন রিটায়ার করেছেন। চক্ষুদান এবং দেহদানের অঙ্গীকার করা আছে। এরকম বাড়ির ছেলে সরসিজ।

সরসিজ সে ভাবে অ্যাকটিভিস্ট নয়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার মানসিকতা খুব একটা প্রশ্রয় দেয় না। ভেবেছিল, এম এস সি পাশ করে পি এইচডি করবে, তারপর বিদেশে পাড়ি দেবে। এন আর আই হবে। তারপর মাঝে মধ্যে দেশের বাড়িতে ফিরে গ্যারেজ-কমোড-ব্যালকনি-ম্যাজেনাইন-লন শোভিত বাড়িতে ডলারগর্বে গ্রাম্য শোভা দেখবে। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর নামে লাইব্রেরি করবে, বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে ডোনেশন দেবে। কিন্তু অনার্সের রেজাল্ট খুব একটা ভাল হল না। কোনও রকমে এম এস সি হল যদিও, ফার্স্ট ক্লাস হল না। এম এস সির পর আই টি বা কম্পিউটারে হায়ার স্টাডিও করতে পারত হয়তো, কিন্তু এস এসসি-টা দিয়ে দিল এবং লেগেও গেল। মাইনেপত্রও খারাপ নয়। আপাতত এটাই চলুক, ডব্লু বি সি এস-টায় বসতে হবে। 'পাত্রী চাই'-এর বিজ্ঞাপনে এমএসসি, ডব্ল বি সি এস, উদার মনের সুদর্শন পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী যে-কোনও বর্ণের উপযুক্ত পাত্রী চাই। কোনওরকম পণ বা যৌতুকের প্রশ্ন নেই— "এরকমও খুব খারাপ লাগবে না।" ব্যাংক কর্মচারী বা স্কুল শিক্ষক পাত্র চাই"-এর চেয়ে অনেক ভাল। তবে 'আমেরিকায় কর্মরত'-র সঙ্গে তুলনা হয় না। স্কুল শিক্ষক থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

একটা দুই ঘরের বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে সরসিজ। প্রাচীর ঘেরা বাড়িটা একটু নির্জনে। ভালই লাগে ওর। কিছু গাছ আছে। বাড়িওলা এখানে থাকে না। বোধহয় বাগানবাড়ি করবে ভেবেছিল। ওপরে টিনের চাল। শিক্ষকরা বেশির ভাগই স্থানীয়। সাইকেলেই যাওয়া আসা করে। দু'জনের মোটর সাইকেল আছে। এস এস সি-র মাধ্যমে সরসিজই প্রথম এই স্কুলে। সরসিজ রান্নাবান্না করেই খায়। রান্নাবান্না জানত না। এখানে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিতে রান্না করে। রান্নাঘর তো একটা ল্যাবরেটরিই। এক্সপেরিমেন্ট, অবজার্ভেশন এবং কনক্লুশন।

একবার হাট থেকে দু'কেজি চাল কিনেছিল এমন, তাতে বড্ড কাঁকর। ভাত রান্নার পর দাঁতে বার বার কাঁকর পড়ছে। খাওয়াই গেল না। বাকি চালের কাঁকর বাছার সময় নেই, ধৈর্যও নেই।

স্কুলের পিয়োন সোনারামকে ঘরে ডেকে নিয়ে বলে— চালগুলো নিয়ে যাও, বড় কাঁকর। সোনারাম বলে, কাঁংকর তো অসুবিধা কাঁই? হান্ডিয়া বনা করেন আইজ্ঞা। সোনারামের দেশ একেবারে ময়ূরভঞ্জ লাগায়ো একটা গ্রামে। লোধাশুলি থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরে। ওখানে ওড়িয়া কথাবার্তাই চালু। লোধাশুলির কথ্য বাংলার সঙ্গে ওড়িয়ার তফাত খুব বেশি নেই।

সরসিজ বলে—হান্ডিয়া? কিন্তু আমি তো হান্ডিয়া করতে পারি না।

সোনারাম বলে— পারুনাস্তি? মু আপনাকু দেখাই দিবি। খুব সহজ বটে আইজ্ঞা। আপনার ঘরে হউনি? মা বহিন সব্বু জানি থিব।

না সোনারাম। আমাদের ওধারে হান্ডিয়া চলে না।

সোনারাম আশ্চর্য হয়।

হান্ডিয়া মানে হল হাড়িয়া। ভাতের পচাই। এধারে হাড়িয়ার বেশ চল। লোধাশুলির দক্ষিণে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলা। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। সাঁওতাল, ভূমিজ, সর্দার, মাহাতোরাও আছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মেয়েরা চকচকে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকে। হাড়িয়া বিক্রি করে। হাটেও পর পর হাড়িয়ার পসরা। একদিন খেয়েছিল সরসিজ। হাড়িয়া নয়। রসি। হাড়িয়ার ওপরের অংশটা। বেশ লেগেছিল। বিয়ারের মতন। কিন্তু রাস্তা ঘাটে খেতে পারে না সরসিজ। স্কুল শিক্ষক কিনা।

সোনারাম হল সাঁওতাল। সোনারাম মুর্মু। বয়স পঁয়তিরিশের মতো। ও স্কুলের ঘণ্টা বাজায়। নোটিস বিলি করে। গেটেও বসে। স্কুলেরই একটা ঘরে ও থাকে। রান্না করে খায়। সোনারাম যখন বলল, হাড়িয়া তৈরির কায়দা ও দেখিয়ে দেবে, সরসিজ রাজি হয়ে গেল।

কিলোখানেক চালের ভাত হল। ভাতকে ঠান্ডা করে বাখরগুলির গুঁড়ো মাখিয়ে, ঝাঁকিয়ে সামান্য জলের ছিটে দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে বলল, তিন দিন পরে খুলি দিবে আইজ্ঞা।

পরদিন সরসিজ দেখল, হাঁড়িটা বেশ গরম। দ্বিতীয় দিন ততটা গরম নয়। তৃতীয় দিন ঢাকনি খুলল। ভাতের ওপর কিছুটা জল। জলের মধ্যে বুটবুটি কাটছে এবং একটা মিষ্টি গন্ধ।

সরসিজ তো জানে কার্বোহাইড্রেট যদি ফারমেন্ট করে তা হলে জল, অ্যালকোহল আর কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। ভাতের ওপর এই যে জলীয় অংশ, এতে আছে অ্যালকোহল আর জল। আর বুটবুটি কাটছে যেটা, সেটা হল কার্বন ডাই-অক্সাইড। আর বাখরগুলিটা নিশ্চয়ই ইস্ট। ফার্মেন্টিং এজেন্ট। ভাতগুলো একদম নরম হয়ে থাকে। ওই জলীয় অংশের সঙ্গে মেখে নিলে হয়ে যায় সোনারামদের হান্ডিয়া। খাদ্যও হল, নেশাও হল।

সোনারামই খোঁজ নিয়েছিল। বলেছিল, দেখিলে কি স্যার? মনে হউচি পকাই গেছে। সরসিজ বলেছিল— হ্যাঁ। সন্ধ্যার পর এসো।

সরসিজ খেয়েছিল রসি। ওপরের অংশটা। সোনারাম হান্ডিয়া। সরসিজ বলল— ই সব ইস্কুলে আবার বাখান করিস না। সোনারাম বলে, কাহিকি? আদিবাসী সব্বু খাউছন্তি স্যার। খাইলে দোষ নাহি। ইটা খাইদ্যটা বটে। খালি ডিউটি টাইমে ন খাইলেই হব স্যার।

সরসিজ বলেছিল— তবুও। বলিস না কাউকে। এটা তোর আমার মধ্যেই থাক।

সরসিজ গোপন কথা বলে সোনারামকে। বলে, আমার জ্যাঠা বিয়ে করলনি। সংসার করলনি আমাদের ভাইবোনদের দেখে গেল। আমাকে পড়াল। বিড়ি সিগারেট পান মদ তাড়ি হাড়িয়া কিছো ছুঁলোনি, আর আমি পাষণ্ডটা ভাবছি জ্যাঠা মরলে সম্পত্তি বেচে মটরসাইকিল হাঁকড়াব, ফ্রিজ কিনব, খাটের ওপর স্পঞ্জের গদি রাখব। কারণ, আমি তো বিহা করার সময় পণ-দহেজ লিব না, তাই সব আগে করে লিব। জ্যাঠার সম্পত্তি বিকে। জ্যাঠার মরণ চাই মনে মনে হে। হায় রে হায়। মোকে মার। মোর গায়ে মুতে দে।

সোনারামও গোপন কথা বলে। বলে, মোর গোটে হিলি অছি। মা যেমতি। বড়দাদার স্ত্রিরি। দাদা মরি গলা বাহাঘর পরে পরে। হিলি রহিগলা।

সোনারাম ওর বউদির কথা বলছে। ওরা বউদিকে বলে হিলি। সোনারামের দাদার মৃত্যুর পর ওর বউদি ওদের সংসারেই আছে। সোনারামের আরও এক দাদা আছে। চাষবাস ওই দাদাই দেখে। বড়দাদা মৃত্যুর পর বউদি দাদার অংশটুকু পেয়েছে। কিন্তু সাঁওতালদের প্রচলিত নিয়মে ওই সম্পত্তির ভোগ দখলের অধিকারটুকু যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিন। সম্পত্তি হস্তান্তর করার অধিকার নেই, বিক্রি করার অধিকার নেই। কাউকে দান করারও অধিকার নেই। মৃত্যুর পর বউদির সম্পত্তি ভাইদের হয়ে যাবে।

সোনারাম বলে, মু আইজ্ঞা পাপিষ্ঠ। মোর মা যেমতি, সেমতি মোর হিলি কিন্তু। মু মঝরে মঝরে তার মৃত্যু চাহে। ছিঃ। তার মরণ পরে তার জমি জাগা মু বেচি দেই কিরি কোঠা ঘর বানাইবি ভাবে। মু পাপিষ্ঠ। মুকে সাসপেন্ড করি দিয়ন্তু। চাবুক মারো। চাবুক! মু ছুকা হড়াম টা...।

সোনারাম মুর্মু আর সরসিজ পণ্ডার মধ্যে একটা বেশ বন্ধুত্ব তৈরি হয়। সোনারাম মাঝে মাঝে সরসিজের ঘরে আসে, ঘরের হাঁড়িতে কেমিস্ট্রি হয়, আর মনের কথা বিনিময় হয়।

দুই

দুটো কুড়ি বেজে গেল, তবু ঘণ্টা পড়ল না। দুটো দশ-এ ঘণ্টা পড়ার কথা। গতকালও ছুটির ঘণ্টা পনেরো মিনিট আগে মেরে দিয়েছে সোনারাম। সরসিজ ক্লাস থেকে বেরিয়ে দেখল, সোনারাম গালে হাত দিয়ে কিছু ভাবছে। সরসিজ ওকে ডেকে হাতের ঘড়িটা দেখাল।

কিছু দিন হল সোনারামের সঙ্গে আড্ডা হচ্ছে না। আসলে সরসিজই নিষেধ করেছে। আসলে জানাজানি হয়ে গেছে। ইংলিশ স্যার হাতছানি দিয়ে একদিন কাছে ডেকে কানে কানে বললেন, শুনলাম আপনি রসিক লোক। আমি তো কাছেই থাকি। আই অলসো লাইক। ঘরে চলে না। প্লিজ কল মি আইজ্ঞা, সামটাইমস। বাট হান্ডিয়া ইজ ভেরি ব্যাড। ইংলিশ ইজ গুড। আই অলসো শেয়ার করিবি, হেঁ হেঁ।

পরের দিনই অঙ্কের স্যার বললেন— সোনারামের খুব আস্কারা হঞ্রিছি। তাকু মু গোটে সামান্য কাজের জন্য বজার যেতে বললাম— ও রিফিউজ করে দিল। ওর খুব রস হইচি। আমাদের স্যারেরাই যদি উর সঙ্গে মদ খাবে, তবে উ তো গাছে চড়বেই...।

সোনারামকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল সরসিজ— ওরা সব জানল কী করে? তুমি নিশ্চয়ই সব রটিয়েছ।

সোনারাম ঠোঁট ওলটায়। বলে, কাউকে বলেনি ও। হয়তো কেউ ঘরে ঢুকতে বেরোতে দেখে থাকবে।

এরপর থেকে সোনারামের সঙ্গে একটু দূরত্বেই থাকে সরসিজ। কাঁকর চালের সদ্ব্যবহার হয় না আর।

সোনারাম গত ক'দিন ধরে কীরকম মন মরা। কাজে ভুল হচ্ছে, ঘণ্টা দিতে ভুলে যাচ্ছে। সরসিজ ছুটির পর জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী হয়েছে সোনারাম? সোনারাম বলল— স্যার, বড় বিপদ। আপনাকে বলব ভাবছি ক'দিন ধরে। আজি যাইবি স্যার, ছুটির পর? সরসিজ বলে, এসো...।

সোনারাম আসে। বলে, বড় বিপদ আইজ্ঞা!

কী বিপদ?

সোনারাম যা বাখান করে তা হল— ওর হিলি, মানে বউদিকে ওর গ্রামের লোকেরা ডাইন সাব্যস্ত করেছে এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেছে।

ওর দাদা বলেছে, ও এত টাকা কোথায় পাবে। এই টাকা সোনারামকেই জোগাড় করে দিতে হবে আগামী সাত দিনের মধ্যে।

জরিমানার টাকা না দিতে পারলে সমাজ থেকে এক-ঘরে করে দেবে। গিরা করে দেবে।

তা তুমি এখন কী চাও? সরসিজ জিজ্ঞাসা করে।

সিটাই তো ভাবুচি। এত্তে টংকা...! যদি বুঝাই সুঝাই কিছু কম হেই পারে...।

যদি কিছু কমে হয় টাকাটা দিয়ে দেবে?

হ।

তা হলে তো তুমি স্বীকার করে নিচ্ছ যে, তোমার বউদি ডাইন।

হ।

হ মানে? তুমি মানছ তোমার বউদি ডাইনি?

আইজ্ঞা।

আইজ্ঞা মানে? তুমি বিশ্বাস করো ডাইনি আছে?

হ।

এবং মানছ তোমার বউদিও ডাইনি?

না মানি কী উপায়?

কেন?

সবু একা কথা কহুচি যে। ডাউরা বিৎ করা হেইচি, তেলখড়ি হেইচি, ওঝা, জান, সব্বু কহুচি মোর হিলি ফুল মতি ডাইন। মোর তো গোটে সমাজ অছি...

ওইসব ডাউরা বিৎ ব্যাপারটা কী বুঝতে পারে না সরসিজ। জিজ্ঞাসা করে।

সোনারাম অবাক হয় এই সহজ ব্যাপারটা জানে না বলে। সোনারাম বোঝায়—ঢাউরা বিৎ, তেলখড়ি,—এইসব।

সরসিজ যা বোঝে তা হল—কে ডাইনি সেটা নিশ্চিন্ত করার জন্য কোনও জলাশয়ের ধারে গাঁয়ের প্রতি পরিবারের নাম করে একটা করে কুসুম গাছের ডাল পোঁতা হয়। প্রতি ডালে তেল-সিঁদুরের ফোঁটা দেয়া হয়। তারপর চাল ছড়িয়ে মন্ত্র পড়া হয়। কয়েক ঘণ্টা পর দেখা হয় কোন ডালের পাতা শুকিয়ে গেছে। সেই শুনকনো হয়ে যাওয়া ডালটা যে পরিবারের নামে পোঁতা হয়েছিল সেই পরিবারেই ডাইনি আছে,— এরকমই ভাবা হয়।

যদি দুটো ডালই শুকিয়ে যায়? বা তিনটে?

কেন তেল খড়ি? সোনারাম বলে। ও জানায়— জানগুরুরা কাঁঠালপাতায় মুখ দেখতে পায়।

ও। সরসিজ এবার কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। কম ভোল্টেজের আলোয় সরসিজের নাকের ডগায় একবিন্দু ঘামে বিস্ময় ফুটে আছে।

সরসিজ বলে, আচ্ছা, তোমার বউদি যদি ডাইনই হয়, তবে জরিমানা দিয়ে দিলে ও কি আর ডাইন থাকবে না?

সোনারাম বোঝায়, জরিমানাটা হল যা যা ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, সে জন্য। যেমন, গাঁয়ের হড়-হপনের অসুখ-বিসুখ, কোড়াকুড়িগুলোর পেটখারাপ, দুটো গরু মরে গেছে। এর তো ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। এইসব ক্ষতি হচ্ছিল বলেই তো জানগুরুর কাছে খড়িতেলা করা হইল। সে পষ্ট দেখল ফুলমতি। বলল ফুলমতিই গরু খাইছে।

সরসিজ বলে— তুমি যে বললে তোমার বউদি তোমার মায়ের মতো যত্ন করেছে...

সোনারামের কপাল কুঁচকে যায়। সরসিজ যেন খারাপ ছাত্র, বোঝালেও বোঝে না। বলে, চাঁদেরও পূর্ণিমা-অমাবস্যা আছে, জানেন না?

তিন

সরসিজদের গ্রাম বালিচকে আদিবাসীর সংখ্যা কম। বিজ্ঞান ক্লাব-ট্লাব থাকলেও নানাবিধ কুসংস্কার আছে। কিন্তু বালিচক এলাকায় ডাইন টাইন নেই।

এই যে কুসংস্কারের কথা উঠল, এটা থেকে বেরিয়ে আসাটা সহজ নয়। সরসিজের জ্যাঠামশাই যেমন। উনি নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেননি। কিছু বিজ্ঞানকর্মীকে খাইয়েছিলেন। গৃহপ্রবেশ করলেন, যাত্রা নাস্তি, ত্রয়হোস্পর্শ, অকাল যোগ ইত্যাদি যাবতীয় অশুভ যোগ দেখে। সেই তো পঞ্জিকা দেখতেই হল।

এ ঘটনা জ্যাঠামশাই জানলে চোঙা টোঙা নিয়ে ছুটতেন। থানায় জানাতেন। বাড়ি গিয়ে এই ঘটনাটা বলবে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু জ্যাঠামশাই যখন জিজ্ঞাসা করবে, তখন তুই কী করলি, কী বলবে? বলবে, এক হাজার টাকা ধার দিয়ে দিলাম, জরিমানার টাকা।

কিন্তু কী-ই বা করতে পারে সরসিজ? ওর তো পার্টি নেই। পেছনে মানুষ নেই। একমাত্র প্রশাসনকে জানাতে পারে। ঝাড়গ্রাম বার্তায় চিঠি লিখতে পারে, নিজে একটা ডায়েরি লিখতে পারে।

সোনারাম কিন্তু বিশ্বাস করে বসে আছে, ওর হিলি ডাইন। কারণ ওঝারা নানান পরীক্ষা করেই এই রায় দিয়েছে। এখন যে জরিমানাটা দিতে হবে, সেটা কৃতকার্যর খেসারত হিসেবে। ওই মহিলাকে সাবধান করে দেবে যেন আর কখনও এসব না করে।

কিন্তু এরপরও যদি আবার কিছু হয়? যদি গোরু মরে? মানুষের যক্ষা হয়? গোরু গাভীন না হয়? বাচ্চাদের তড়কা হয়? তা হলে কি আবার ডাইন সাব্যস্ত হবে সোনারামের বউদি? তখন কী শাস্তি হবে?

সরসিজ হেডমাস্টারমশাইকে বলে ঘটনাটা।

হেডমাস্টারমশাইয়ের নাম নিত্যানন্দ মাইতি।

উনি বলেন, ওদের সমাজে তো এইসব আছেই...। সরসিজ বলে— আছে বলেই থাকবে?

আপনি কী করতে চান তবে?

সরসিজও ঠিক জানে না, ও কী করতে চায়? আসলে ও এ নিয়ে আলোচনা চায়। কিন্তু হেডস্যারের কথাবার্তায় মনে হচ্ছে উনি এসব নিয়ে তেমন কিছু বলতেও চান না।

সরসিজ দু'বার আঙুল মটকে বলল— স্যার, একবার প্রেসিডেন্টকে বললে হয়।

স্কুলের প্রেসিডেন্ট? উনি কী করবেন?

শুনেছি, উনি ভাল লোক। তা ছাড়া ওনার যত হোল্ড, যদি বিডিওকে বলে দেন, থানাকে বলে দেন, যদি সোনারামের গ্রাম পঞ্চায়েতের থ্রুতে ওই সব ওঝা টোঝাদের হুমকি দিয়ে দেন...

ওনার আর খাই দাই কাজ নাই, ইসব ব্যাপারে ঢুকবেন। আমি বলতে পারব না।

আমি যাব?

যান না, কে নিষেধ করেছে?

আমাকে তো চিনে না...

চিনিয়ে দিবেন আপনি। এস এস সি-র পাঠানো মাস্টার। আপনার স্পেশাল ইজ্জত।

আর একটা কথা স্যার।

হুঁ।

বলছিলাম কী, আমাদের স্কুলে তো আদিবাসীরাই বেশি, আমরা যদি মাঝে মধ্যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি, এইসব ওঝা, জানগুরু, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে—

কী বলবেন? বলবেন, 'ওঝা ভলা নুয়ে, ডাকতর 'ভলা' এইসব তো? দেখুন, সোনারামদের গাঁয়ে গিয়ে কি বলবেন— কেরোসিনের আলোয় পড়লে চোখের ক্ষতি, ইলেকট্রিকের লাইটে চোখ ভাল

থাকবে? এটা তখনই বলা চলে, যখন মানুষ বিদ্যুৎ পেয়ে গেছে এবং কিনতে পারছে। ব্যাপারটা বুঝলেন?

সরসিজ কিছুটা মাথা নাড়ে। পুরোটা নয়।

স্কুলের প্রেসিডেন্টের নাম সুকদেব সিং। ক্ষত্রিয়। সম্ভবত বিহারে আদিবাড়ি। এখানে কয়েক পুরুষ আছেন। পাজামা-পাঞ্জাবি পরেন। সাদা চুল। অনেকটা জর্জ ফার্নান্ডাজের মতো দেখতে। একটা দোতলা লম্বা ধাঁচের বাড়ি। যাঁর নামে স্কুল, সেই চরণদাস সিংহ তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন। ওদের এখন ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা। একতলায় অফিস।

অফিসঘরে স্বামী বিবেকানন্দের একটা ছবি। সরসিজ নিজের পরিচয় দিল।

প্রেসিডেন্ট বললেন, কী হল? স্কুলের কিছি গড়বড় হল?

সরসিজ বলল— না স্যার। সেইজন্য আসিনি। সরসিজ কারণটা বলল। প্রেসিডেন্ট শুনলেন। তারপর বললেন, বিডিও বা থানাকে বললে কিছি লাভ নাই। ইসব ব্যাপারে উরা মাথা ঘামায় না। যতক্ষণ খুন না হচ্ছে, ততক্ষণ উরা কুন অ্যাকশান নিবে না। ইসব অঞ্চল প্রধান কিংবা গ্রাম প্রধানের কাজ। ইসব নিয়ে কেউ কিছি ভাবে না। আপনি ইসব ভাবছেন বলে বহুত ভাল লাগছে। কাল একবার আসেন। পরেশবাবু আসবেন একটা কাজে। আমার গেস্ট হাউসেই থাকবেন। আঙুলটা ওপরের দিকে দেখালেন প্রেসিডেন্টজি। পরেশবাবু কে চিনেন তো? পরেশ কিসকু। পার্টির জেলা কমিটির লোক। খুব ইনফুলুয়েন্স আছে। কুন গ্রাম হচ্ছে উটা?

পত্রাশোল।

উ। আচ্ছা এক্কেবারে উড়িষ্যা বর্ডার।

পরেশ কিসকুর পরনে অফ হোয়াইট সাফারি স্যুট। ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীরা যেমন পরেন। চোখে গগলস। এই ভাদ্রের গরম কালে সাফারি স্যুট পরে ঘামছেন। প্রেসিডেন্ট বলছিলেন, ছ' মাসের মধ্যেই একটা এ সি লাগিয়ে দেবেন।

গেস্টরুমেই দেখা করেছিল সরসিজ। সঙ্গে প্রেসিডেন্টজিও ছিলেন। প্রেসিডেন্ট বললেন, ইনি আমাদের স্কুলের নতুন মাস্টারজি। ডাইন-টাইন নিয়ে আপনাকে কিছি কথা বলতে চান।

সমস্যাটার কথা বলেছিল সরসিজ। সবিস্তারে। পরেশবাবু হাসছিলেন।

শেষকালে সরসিজ যখন বলল— সোনারাম কেন দেবে জরিমানা? জুলুম? কোন সংবিধানে আছে এই শাস্তি? ঠিক তখনই ডান হাতটা সামনে দু'বার নাড়িয়ে কথাটা থামান পরেশ কিসকু। বলেন—হ। আদিবাসীদের সংবিধানে আছে ই সব। আদিবাসী গুলানের পরম্পরায় আছে। ট্র্যাডিশনে আছে।

পরেশবাবু কেমন যেন উত্তেজিত।

পরেশবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করলেন। গর্দানের ঘাম মুছলেন। একটু হাসলেন। উত্তেজনা চেক করলেন। বললেন— আমাদিগের ও ধরম কথা আছে। একটা কাহিনি শুনেন তবে। আমাদিগের বড় দেবতা হলেন মারাং বুরু। একবার কী হল, আদি যুগে স্ত্রীজাতির অত্যাচারে কাহিল হয়ে সব সাঁওতাল বেটাছেলেগুলা মারাংবুরুর কাছে গেল। বলল মেয়েছেলেরা বড় অত্যাচার করছে, কিছু অ্যাকশন লেন। মারাংবুরু সি সময় বড় বিজি ছিলেন। বুলেন পরের পূর্ণিমার রাতে তুরা আয়, সব শুনব। কিন্তু মেয়েছেলেরা সব জেনে গেল। পূর্ণিমার দিনে তারা উদের মরদগুলাকে দিন ভর হাড়িয়া পিয়াল। ভাল ভাল চাখনা রেঁধে দিল। পুরুষ হড়গুলি সারা দিন পাওয়া পিয়া করে বেহুঁশ হয়ে গেল। আর সব মেয়েগুলান করল কী, সব পুরুষের পোশাক পরে নিল, কালো ছাগলের দাড়ি কেটে গোঁপ তৈরি করল, মাথায় পাগড়ি বাধল। তারপর সব মারাংবুরুর কাছে গেল। মারাংবুরু উদের ব্যাটাছেলে মনে ভেবে ত্রাণমন্ত্র শিক্ষা দিয়ে দিল। মেয়েরা ওই মন্ত্র পেয়ে গিয়ে পুরুষদিগের

উপর অ্যাপ্লাই করতে থাকল। পুরুষরা আরও বেশি করে টর্চার হতে থাকল। তখন উদের মনে পড়ল আরে, মারাংবুরুর কাছে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু উরা তো যায়নি, মহা ভুল হয়ে গেছে। তারপর পুরুষরা সবাই মিলে আবার মারাংবুরুর কাছে গেল। মারাংবুরু বহুত আশ্চর্যিত হল। বলেন, আরে আবার কী হল রে। হামি তো তুদের ত্রাণমন্ত্র দিই সারিচি। আবার এলি কেন? পুরুষরা বলে, সেদিন হামরা আসতে পারি নাই, অনেক হাড়িয়া পিয়ে লিয়েছিলম, অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা করেন, হামাদিগকে ত্রাণমন্ত্র দান করেন। মারাংবুরু তখন বুঝতে পারেন, মেয়েছেলেরা সব চাতুরী করে গেছে। মারাংবুরু তখন নারীসমাজের উপর বহুত গোঁসা করেন। আর প্রতিকার হিসাবে পুরুষদের জ্ঞান বিদ্যা দান করেন।

সেই থেকে নারী ডাকিনিদের বিরুদ্ধে পুরুষ জ্ঞান বিদ্যা অ্যাপ্লাই করছে।

পরেশবাবু হাসতে থাকেন।

সুকদেব সিং উঠে দাঁড়ান। বলেন, ইসব গল্প কথা আপনি ভি বিশোয়াস করেন?

পরেশবাবু বলেন, আমি করি কি না করি সিটা বড়ো কথা নয়। আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতির ভেতরে এই বিশ্বাস আছে। আদিবাসীদের তো সব গেছে। আপনারা আপনাদিগের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়েছেন উদের ওপরে। তাই যেটুকু আছে, তা উরা ছাড়বে কেন? সহজে ছাড়বে নাই। আর সংবিধান কথা কহিছেন? মুসলমানদিগের জন্য যদি পারসোনাল ল বোর্ড থাকতে পারে, তবে আদিবাসীদেরও থাকতে হবে।

তার মানে পরেশবাবু, আপনি ডাইনতন্ত্রের বিরোধিতা করেন না? সুকদেববাবুর কাতর প্রশ্ন।

বললাম তো, আমি ইসব মানি না। কিন্তু আমার কথার দাম ইতো টুকু হে, ইতো টুকু।

বাঁ হাতের আঙুলের মুদ্রায় ক্ষুদ্রতা বোঝানোর চেষ্টা করেন পরেশবাবু।

নিজেকে ছোট ভাবতে নাই, স্বামী বিবেকানন্দজি বলেছিলেন। আপনি আপনার নিজের মতো চেষ্টা করেন। উটা আপনার ধরম হবে।

বিবেকানন্দজি এ ভি বলেছিলেন, খালি পেট মে ধরম নেহি হোতা হ্যায়।

আপনার আবার খালি পেট কোথায়? হে হে—

ব্যাপারটা লঘু করার চেষ্টা করলেন প্রেসিডেন্ট।

না। ভুল করছেন, আমি আমার পার্সোনাল কথা বলছি না। আমাদের আদিবাসীদের কথা বলছি। রিফর্ম করার চেষ্টা অনেক হয়েছে। সারদাপ্রসাদ কিসকু, মহাদেব মাহাতো, এরকম অনেকে বহুত করেছে। কী হয়েছে? কুসংস্কার সবার আছে। সাহেবদিগেরও আছে। বিলাত আমেরিকাতেও আছে।

সুকদেব সিং সহজে ছাড়ছেন না। উনি আবার বললেন, আছে, কিন্তু থাকাটা তো ঠিক নয়। ইসব দেখলে অন্তত প্রটেস্ট উঠানো উচিত। বন্ধ করা উচিত। এই যে আমাদের মাস্টারজি, ইয়ংম্যান। ইনিও তো নিজে এগিয়ে আসছেন। উকে মদত করুন। কম সে কম উদের পঞ্চায়েতকে একটা চিঠি দিয়ে দিন, পঞ্চায়েতকে বলে দিন যা অ্যাকশন করার করতে। থানাকে একটা চিঠি দিন। যা দৌড়ঝাঁপ করার এই মাস্টারজিই করবে।

পরেশবাবু শুনলেন। একটু চুপ করে থাকলেন। বললেন, আপনি আমাদের নিজেদের লোক সিং সাব। বুঝেন না? সামনে ইলেকশন আসছে। ই সময় উদের পরম্পরার বিরুদ্ধে, উদের প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিলে উরা সব পটান হই যাবে না? ঝাড়খণ্ড পার্টির সুবিধা হই যাবে না? ওই অঞ্চলে কেবল দুই-তিনটা গ্রামেই আমাদিগের পঞ্চায়েত। আশেপাশে ঝাড়খণ্ড পার্টি। আর তা ছাড়া, পত্রাশোলের গাঁয়ের যে মাঝি, সে নিজেই গ্রাম প্রধান। ই কথা ইবার থাক। ইবার অন্য কথা কহেন।

সরসিজ হাল ছেড়ে দিল। এটুকু যে করেছে, এ জন্যই ভেতরে ভেতরে সে একটা শ্লাঘা অনুভব করল। নিজের অ্যাকাউন্টে কিছু ভাল কাজ জমা পড়ল। জ্যাঠামশাইকে বলা যাবে। আর

জ্যাঠামশাইয়ের প্রপার্টির উত্তরাধিকারই শুধু নয়, কাজেরও তো কিছু উত্তরাধিকার দরকার। এই যে চেষ্টাটুকু হল, এইটুকুই বা ক'জন করত?

চার

সোনারামের পরিবার জরিমানার টাকা দিয়ে দিয়েছে। এক হাজার টাকা ধার দিয়েছে সরসিজ। মাসে দুশো করে শোধ করে দেবে।

জরিমানার টাকায় গাঁয়ের সবাই মিলে ভোজ খায়। মদ খায়।

সরসিজ ডাইন সম্পর্কিত বহু তথ্য সংগ্রহ করে। ঝাড়গ্রাম থেকে একটি বিজ্ঞান পত্রিকা বের করে সরসিজের বন্ধু তরুণ ষড়ঙ্গী। ওই পত্রিকায় একটা লেখা দেওয়া যাবে। সরসিজ ওর ডায়ারিতে বিভিন্ন সময়ে লেখে:—

শুধু অশিক্ষিত নয়, শিক্ষিতরাও অনেকেই ডাইনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আমাদের স্কুলের ক্লার্কের নাম সিংরাই মুর্মু। বি কম পাশ। তার বক্তব্য এরকম— ডাইনি হল আমাদের মহা জ্বালা। ডাইনের জন্য লোকে শত্রু হচ্ছে, কুটুমের দুয়ার বন্ধ হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। ডাইনি না থাকলে আমাদের অনেক সুখ থাকত। আমাদের সরকারি অফিসাররা তো অনেক পড়াশোনা করে ডব্লু বি সি এস পাশ করেছে। ওরা যে কী করে ডাইনি সম্পর্কে এত ভুল বুঝে কে জানে। এইসব হাকিমরা বলে, ডাইন নাকি নেই। ডাইন যে আমাদের খায়, ওরা বিশ্বাস করে না। বলে—কই, দেখি, আমার আঙুলটা খাক, তবে তো বিশ্বাস করব। ওদের কী করে বুঝাই ছুরি বঁটি দিয়ে তো ডাইন খাচ্ছে না। ওরা রক্ত শুষে নিচ্ছে, কেউ দেখতে পাচ্ছে না। ডাইনরা রাতে জমা হয় জাহির স্থানে, কিংবা কোনও বনে। যাবার সময় নিজের পুরুষের কাছে একটা ঝাঁটা রেখে চলে যায়। পুরুষমানুষ ওই ঝাঁটাকেই নিজের মেয়েমানুষ ভাবে। ডাইন...

স্কুলের অঙ্কের স্যারের নাম নিরঞ্জন মাহাতো উনি ভাবেন, ডাইনরা রক্ত শুষে খেতে না পারলেও নজর দিতে পারে। উনি বলছেন, চোখ একটা লেন্স। লেন্সের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো যদি এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে ফেলা যায়, তবে আগুন জ্বলে ওঠে। ঠিক তেমনি করেই যদি কোনও শিশুর ওপর চোখ দিয়ে ফোকাস করা যায়, যদি দৃষ্টিশক্তিকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ফেলা যায়, তবে সেক্ষেত্রেও অলৌকিক ফল দেবে। ডাইনি, ওঝা, গুনিনরা প্রতিদিন নিজেদের দৃষ্টিশক্তি নানা উপায় বাড়ায়। মাঝে মাঝে ওরা টেস্ট করে কেমন হল। গাছের লাউ বা কুমড়োর ওপর এক্সপেরিমেন্ট করে। যদি লাউ বা কুমড়ো পচতে শুরু করে, তখন সে বুঝতে পারে, ওর কিছুটা সাকসেস হয়েছে। তারপর মানুষের ওপর প্রয়োগ করে। একেই বলে নজর লাগা।

আমি বলি— লেন্স, মানে কনভেক্স লেন্স আলোকে কনসেনট্রেট করে, এটা ঠিক। কিন্তু চোখ তো আলোকে কনসেনট্রেট করে সামনে নয়, পেছনে। রেটিনায়। ওটা চোখের মণির পেছনে থাকে। চোখ তো আলোকে সামনের দিকে ফেলতে পারে না, কারণ চোখ কোনও আলোর উৎস নয়...

বলে জীবনবিজ্ঞানের স্যারের দিকে তাকাই। সমর্থন চাই। উনি চুপ করে থাকেন।

জান বিদ্যা কী করে এল সেই গল্প পরেশবাবুর কাছ থেকে শুনেছিল সরসিজ।

যারা জানবিদ্যায় পারদর্শী তারাই জানগুরু। জান, ভকত, সখা, মাতি, দেওড়াদের জনসাধারণ থেকে কিছুটা বেশি জ্ঞানী বলে মনে করা হয়। দেওড়া বা দেহুরা হচ্ছেন ধর্মীয় পুরোহিত। ওঝারা রোগব্যাধি সারান।

সাঁওতাল সমাজের প্রধান হলেন মাঝি। জগমাঝি হলেন নৈতিকতার রক্ষক, পারাণিক হলেন মাঝির সহকারী। দোহুড়া বা নাইকে হলেন পূজারি। ওঝা হলেন চিকিৎসক। সখা হলেন ওঝার সহকারী। জানগুরু মন্ত্র ইত্যাদির প্রয়োগ করেন।

কোনও মানুষের অসুখ বিসুখ হলে ওঝার কাছে যাওয়াই নিয়ম। ওঝা তাঁর জ্ঞানমতো

গাছগাছড়ার ওষুধ দিলেন। যদি ভাল হল তো ভাল। যদি না ভাল হল তো, শালপাতায় তেল পড়া করে বুঝলেন কোনও বঁগা (বোংগা) অনিষ্ট করছে কি না, বা নজর লেগেছে কি না। অপদেবতা বা বঁগা ছড়ানোর ক্ষমতা গাছগাছড়ার নেই। নিজের জানা মন্ত্রে ওই বঁগা ছাড়ানোর চেষ্টা হল। যদি এর পরও রোগ না সারে, তবে ওঝার অধ্যায় শেষ। তখন জানগুরুর কাছে যাওয়া হয়।

জানগুরুর কাছে যাওয়ার সময় নিয়ে যেতে হয় সরষের তেল। জানগুরু দুটি শালপাতাতে তেল মাখাবে, আর মন্ত্র পড়বে।

জেলা গেজেটিয়ারে উদাহরণ হিসেবে এরকম একটা মন্ত্র আছে। 'তেল তেল রায়ে তেল, মাম তেল, কুসুম তেল, ই তেল পড় হায়েতে, কী উঠো, ডান উঠো, ভূত উঠো, ফু সিন উঠো, বিষ উঠো, কে পড়হে, গুরু পড়হে, গুরু আগতা মন্ত্র পড়হে।' এলাকা এবং জানগুরু ভেদে মন্ত্র পালটে যায়। এবং মন্ত্র সাধারণত গুপ্ত থাকে। বংশ পরম্পরায় ওই মন্ত্র চলতে থাকে।

জানগুরু মন্ত্র পড়ে, পাতাটাকে ভাঁজ করে কিছুক্ষণ মাটিতে রাখে। তারপর খুলে দেখে। তাই দেখে বলে—নজর, না বঁগা, না বাস্তু দেবতা নাকি ডাইন। যদি বঁগা হয়, তবে দেখে নেয় কোন বঁগা। যদি জজম বঁগা হয়, তবে তার জন্য মুরগির রক্ত দিয়ে পুজো করে মানত করতে হয়, আর জান মন্ত্র পড়ে জজম ছাড়ায়। বাঁখেড় করে। বাঁখেড় মানে মিনতি। যদি কালনা বঁগা হয়, তাকে ছাড়ানোর কায়দা আলাদা। যদি বাস্তু দেবতা হয় তবে চাল ছিটিয়ে পুজো করতে হয়। যদি ডাইনি হয়, তখন খোঁজ করতে হয় কে ডাইনি। গ্রামে যদি একাধিক অসুখ-বিসুখ-অঘটন হয়, তখন বহু ক্ষেত্রেই ডাইনের কাজ ভাবা হয়। তেল মাখানো শালপাতার গায়ে নাকি ডাইনের ছবি ফুটে ওঠে। জানগুরু সেই ছবির একটা বর্ণনা দেয়। এই থেকে একটা ধারণা করে গ্রামের লোকেরা।

এরপর আরও নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য একটা ক্রিয়া আছে। তার নাম 'ঢাউরা বিৎ' বা ডাল পোঁতা।

ডাইন সম্পর্কিত লোক-বিশ্বাসটা এইরকম—কেউ কেউ ডাইনি হয়েই জন্মায়, কেউবা জন্মের সময় ডাইনি না হয়েও অন্য ডাইনির কাছ থেকে ডাইনি বিদ্যা শিক্ষা নেয়। কিংবা কোনও মেয়ে অমাবস্যা রাত্রে বঁগা আহ্বান করে ডাকিনি হবার প্রার্থনা জানায়। যদি জমম বা ছিপাড়ি বঁগা কৃপা করে, তো ডাইনি বিদ্যা পাওয়া যায়। একবার দীক্ষা হয়ে গেলে অমাবস্যার রাত্রে এলো চুলে উলঙ্গ অবস্থায় ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে বঁগার সঙ্গে মিলিত হতে পারলে ডাইনদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে।

পাঁচ

সোনারাম ইচ্ছে করলেই প্রতি শনিবার দেশে যেতে পারে না। কারণ স্কুল পাহারাও ওর দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। তবু মাঝে মধ্যে যায়। সোমবার স্কুল শুরু হবার আগেই চলে আসে। এই শনিবার ও দেশে গেছে। দেশে ওর বউ আছে, দুটো ছেলে আছে। সোমবার চলে গেল, সোনারাম ফেরেনি। মঙ্গলবারও ফিরল না। হেড মাস্টারমশাই সরসিজকেই জিজ্ঞাসা করল— কী ব্যাপার? আপনার সোনারামের কী হল? আসছে না কেন? যেন সোনারামকে জিম্মা নিয়েছে সরসিজ।

মঙ্গলবার রাত এগারোটা নাগাদ সরসিজের দরজায় ধাক্কা। দরজা খোলার আগে জানলা দিয়ে টর্চ মারল সরসিজ। দেখল সোনারাম।

দরজা খুলতেই সোনারাম লুটিয়ে পড়ল সরসিজের পায়ে।

স্যার, বঁচাই দেন। মোর হিলিকু মারি দিবে।

কী হয়েছে ঠিক করে বলো। সরসিজ সোনারামকে ওঠায়। ওর মুখ থেকে, সারা শরীর থেকে মদের গন্ধ। মহুয়া।

মু পাপিষ্ঠাটা...।

জানি তো তুমি পাপিষ্ঠ। কী হয়েছে বলো।

সোনারাম যা বলল, তা সংক্ষেপে দাঁড়ায়— আগামীকালই ওর বউদিকে মেরে ফেলা হবে। কারণ ওদের গ্রামে দুটো গোরুর বাঁট থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। একজন রক্তপায়খানা করে মারা গেছে, আর কুমোর ঘরের একজন লোকের কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছে। আবার জানগুরুর কাছে গিয়েছিল গাঁয়ের লোক, একই কথা বলেছে। আবার ঢাউড়া বিৎ করা হয়েছিল। ওদের পরিবারের নামে যে ডালটা, সেটাই শুকিয়ে গিয়েছিল। তারপর কেবল ফুলমতীর নামে আলাদা ঢাউড়া বিৎ করা হয়েছিল। ওই ডালটাও শুকিয়ে গেছে। সুতরাং অকাট্য প্রমাণ। এবার দশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল।

তখন সোনারামের ওপরের দাদা আর সোনারাম পরামর্শ করে ঠিক করল, এর চেয়ে ফুলমতীকে মেরে ফেলাই ভাল। গাঁ মাঝি বলল, আরও একজন জানগুরুর পরামর্শ নেওয়া হোক। জামডি গ্রামে অন্য এক জানগুরুর কাছে যাওয়া হল। কিন্তু ওই জানগুরুর ফুলধাড়িয়াকে আগেই বলে রেখেছিল সোনারামের ওপরের দাদা। ওই জানগুরুও তেলখড়ি করে বলে দেয়— গোলমুখ, বিধবা, কেন্দু গাছের পাশে ঘর। বয়স দুই কুড়ি।

সুতরাং ফুলমতী না হয়ে যায় না। দু'জন জানগুরু একই কথা বলেছে, এরপর আর কথা হয় না। কালই মারা হবে। সুতরাং ওকে যে ভাবেই হোক বাঁচান। বউদি আমার জন্য অনেক করেছে।

সরসিজ বলে, তুমিই তো বলেছিলে তুমি ওর মৃত্যু কামনা করো। ও মরে গেলে ওর জমি তোমরা দু' ভাই বিক্রি করবে...। সোনারাম বলে, কহিথিলি, কহিথিলি। ভুল কহিথিলি। পাপ কথা কহিথিলি...। মারাংবুরু জানে ওর বউদি কত ভাল। মুরগি রান্না হলে সবাইকে ভাল মাংস দিয়ে ও শুধু গলাটা খেয়েছে। সোনারামের বিয়ের পরপর সোনারামকে চুপি চুপি মুরগির ডিম খাইয়েছে। বলেচে, তোমার এখন দরকার...। এই বউদির মরণের মিটিং-এ সায় দিয়েছে সোনারাম।

সোনারামের চোখের জলে মাঝরাত্তিরের তারার আলো পড়েছে। ও বলছে—স্যার, মু পাপিষ্ঠ। মু খারাপ। ইবার আমার হিলিটারে বাঁচান স্যার।

সরসিজ বলে, আমি কী করে বাঁচাব? তা হলে তো পুলিশকে বলতে হয়।

যা ভাল বুঝেন।

ঠিক আছে। বাড়ি যাও।

সরসিজ এরপর জল খেয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারত, কিন্তু ঘুম এল না। মাথার মধ্যে ওর জ্যাঠামশাই ষড়ানন পণ্ডা কেবল বলতে লাগল—এবার দেখি তুই কী করিস। আমার সম্পত্তি নিবি, বিছানায় স্পঞ্জ লাগাবি, মোটর সাইকেল হাঁকড়াবি। বদলে কিছু দিবি না? কিছু না?

সকালবেলা স্কুলে গিয়ে সোনারামের সঙ্গে দেখা করল সরসিজ। বলল, থানায় চলো।

কাল রাত্রের সোনারাম এখন আর নেই। পেটের মহুয়া এতক্ষণে মূত্র হয়ে গেছে। সরসিজ বলল—চলো সোনারাম, থানায় চলো।

সোনারাম বলে— মু যাইবিনি স্যার, মু থানায় নালিশ করিচি শুনিলে সব্বু মোকে মারি পকাই দিবে। আমি বললাম, ওসব হবে না। তোমার বউদির কেস। তোমাকে যেতেই হবে। এফ আই আর না হয় আমিই করব।

থানায় গেল ঠিকই। কিন্তু পথে কোনও কথা বলল না সোনারাম। আবার এটাও বলল না যে, থানায় যাবার দরকার নেই। ও সি তখন জিলিপি খাচ্ছিলেন। লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি। বয়েস বেশি নয়। তিরিশের ঘরেই যেন। সরসিজ বলল, অসময়ে এসে ডিস্টার্ব করলাম স্যার। কিন্তু কিছু করার নেই, আসতেই হল। আমি এখানকার স্কুলের শিক্ষক। আজই একটা ডাইনি হত্যার কথা আছে, প্লিজ কিছু করুন।

কোথায়?

পত্রাশোল গ্রামে।

জামডি হিলাডি পত্রাশোল?

সরসিজ সোনারামের দিকে তাকায়। সে মাথা নাড়ে।

সরসিজ বলে—এর বউদিকেই ডাইন করা হয়েছে।

ওসি জিজ্ঞেস করে—খড়িতেলা হয়ে গেছে?

সোনারাম মাথা নাড়ে।

ওসি-র নাম লেখা আছে ঘরের সামনে। সঞ্জয় প্রামাণিক।

ওসি বলে, বাঘমুণ্ডি থানায় আমার যখন পোস্টিং ছিল, একজনকে বাঁচিয়েছিলাম। পরে ওই মেয়েটার অঙ্গনবাড়িতে চাকরি হয়েছে।

তা হলে একেও বাঁচান। সরসিজ বলে।

এই কাজগুলিই তো পুলিশ জীবনের বোনাস। এখানে এসেছি আট মাস হল। এ ধরনের কেস এই প্রথম। একটা এফ আই আর করতে হবে।

সরসিজ লেখে— বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল, পত্রাশোল গ্রামের হীরারাম মুর্মুর বিধবা স্ত্রী ফুলমতী মুর্মুকে ডাইনি সন্দেহে... সইটা সরসিজই করে। সোনারামকে দেখিয়ে বলে, ওকে ইনভলভ করছি না। ওর বিপদ হবে।

ওসি দু-একটা ফোন সেরে নেয়। ইউনিফর্ম পরে নেয়। ড্রাইভারকে ডেকে পাঠায়। পনেরো মিনিটের মধ্যেই রেডি হয়ে যায় সঞ্জয়বাবু। সঙ্গে আরও দু'জন কনস্টেবল।

জঙ্গল, পাহাড়, উঁচু-নিচু লাল পথ।

সরসিজ বলল, আপনাকে দারুণ লাগল। এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বেন ভাবতেও পারিনি।

ওসি বলল, আপনাকেও দারুণ লাগল স্যার। একজন গ্রুপ ডি স্টাফের ফ্যামিলির জন্য এভাবে এগিয়ে আসা...

আমি নিজে না এসে যদি সোনারাম আপনার কাছে আসত, এ ভাবে অ্যাকশন নিতেন?

অন্যরা কী করত জানি না, আমার কথা বলতে পারি, আমি একই ব্যবহার করতাম। বুঝলেন না? নাপিতের ছেলে। এই ফার্স্ট জেনারেশন ক্ষৌরকর্ম ছেড়ে পুলিশে এসেছি। উৎসাহটা একটু বেশি। আরে বাবা, পুলিশে ঢুকেছি যখন কামাই হবেই। কিন্তু এসব কাজে না বেরোলে নিজের দেশটাকে জানা হয় না। গভর্নমেন্ট থেকে ঘন ঘন সার্কুলার আসছে—মাওবাদীদের সম্পর্কে অ্যালার্ট থাকো। জানগুরুদের ব্যাপারে অ্যালার্ট থাকো, ডাইনি মারার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নাও—এসব কিন্তু আসে না...। আমি একবার একটা জানগুরুকে ধরে, ওদের মন্ত্রগুলো স্টাডি করেছিলাম। কী আশ্চর্য জানেন, ওই মন্ত্রের মধ্যে সাঁওতালি শব্দের চেয়ে বাংলা শব্দ বেশি। এসব নিয়ে বোধহয় কোনও রিসার্চ হয়নি, বুঝলেন...।

একটা নুড়ি ভরা নদী পার হল জিপ। নুড়ি খুঁড়ে বালি, বালি খুঁড়ে জল বের করছে বালক-বালিকা। ওসি বলছেন, সব সময়েই যে সম্পত্তির জন্য ডাইন মারে, তা কিন্তু নয়। এমনি বিশ্বাস থেকেই এটা করে। অসুখ বিসুখ না সারলে। অসুখ বিসুখ রোগব্যাধি হলে আগে তো ওষুধই খায়। জড়িবুটির ওষুধ। ওষুধে কাজ হলে তো ডাইনির প্রশ্নই আসে না। আসলে কী জানেন, আমাদের দেশে রোগেরও অভাব নেই— রোগীরও অভাবে নেই। অভাব শুধু ডাক্তার আর ওষুধের।

মাথা বোঝাই শুকনো ডালপালা নিয়ে বুড়োবুড়ি চলেছে লোধাগুলি। হোটেলে বেচবে। জ্বালানি। বারো দু' গুণে চব্বিশ কিলোমিটার হাঁটতে হবে।

ওসি বলছে—পুলিশের গাড়ি দেখলেই কিন্তু গ্রামের লোকজন পালিয়ে যাবে। খুঁজে পেতে জানগুরুকে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে, কিন্তু লাভ হবে না। কেস দেওয়া যাবে না। খুন হলে কেস দেওয়া যায়। থ্রি হান্ড্রেড টুতে ফেলা যায়। পুলিশ চলে গেলেই মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে। মেয়েটাকে বাঁচাতে গেলে ওকে আগে সরিয়ে ফেলতে হবে। ওকে নিয়ে আগে একটা ভাল জায়গায় রাখুন। তারপর জানগুরুকে ধরে ওকে ভয় দেখিয়ে অন্যরকম তেলখড়ি করাতে হবে। জানগুরু বলবে, ও এখন আর ডাইন নয়।

পত্রাশোল পৌঁছল গাড়ি। পরিপাটি করে নিকোনো মাটির বাড়ি। বাড়ির বাইরে রং, ভিতরে বিবর্ণ।

পুলিশের গাড়ি দেখে কেউ পালাল না। ওদের ভয় কী? গাঁ মাঝি নিজেই যখন নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি। গ্রাম প্রধান বেরিয়ে এল। নাম ধানুকা মাঝি। অকুতোভয়। আরও দু-একজন বেরিয়ে এল—কড় হেলা?

এরা ওড়িয়াই বলে। সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় বাংলা, বিহারে হিন্দি, ওড়িয়্যাতে ওড়িয়াই বলতে হয় ওদের।

ওসি-র সেভাবে ওড়িয়া রপ্ত হয়নি এখনও। ও বাংলাতেই বলে— এখানে নাকি আপনারা একজনকে ডাইনি সাব্যস্ত করেছেন।

ওরা চুপ। এ ওর দিকে চায়।

একজন বলতে চাইল, ডাইনকে তো ডাইন বলতেই হবে। এর মধ্যে আর আশ্চর্যের কী আছে?

গাঁ মাঝি বলছে, আমরা এমনি এমনি ডাইনি বলিনি। ঢাউড়া বিৎ হয়েছে। ওই দেখুন। একটা জলজমা নাবাল জমির দিকে আঙুল। কতগুলো ডাল পোঁতা। বলে, দেখন্তু ফুলমতীর নামে সাকেৎ করা ডাল ঝুঁকাই যাইচি।

ওসি বলে, এসব বুজরুকি ছাড়ো। এসব ডাইন করা চলবে না। দেশে আইন আছে। পুলিশ আছে। সব ক'টাকে ধরে নিয়ে যাব।

ওরা কোনও কথা বলে না।

ফুলমতীর ঘর কোনটা দেখাও। সঙ্গে চলো।

ওরা ঘর দেখিয়ে দেয়।

ঘরে সোনারামের বড়ভাই মোতিরাম নেই। ও বোধ হয় পালিয়েছে।

কোথায় ফুলমতী?

ফুলমতী ঘরেই ছিল। ফ্যাকাসে সিন্থেটিক শাড়ি পরা। বিমর্ষ।

ওসি বলে, একে তোমরা ডাইনি বলছ? কেন? তোমাদের ঘরের বউ না ও?

একজন বলল, ও অমাবস্যার রাত্রে একা একা জঙ্গলে যায়। আমরা দেখেছি।

থামো। যতসব আজগুবি। যাদের অসুখ বিসুখ করেছে, তারা হাসপাতালে যাও। ঠিক মতো ডাক্তার দেখাও। ফুলমতীকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। ক'দিন পর ফেরত দেব। তখন যেন কোনও অসম্মান না হয়।

ফুলমতীকে বলল— যাও। প্রাণে বাঁচতে চাও তো গাড়িতে ওঠো।

ছয়

ইস্কুল ঘরে মেয়েছেলে একা কী করে থাকবে? তাই সরসিজের বাড়িতেই রইল ফুলমতী। জ্যাঠামশাইকে একটা জম্পেশ করে চিঠি লিখল সরসিজ। সব কীর্তি সবিস্তারে লিখল। বেশ গর্ব অনুভব করছে সরসিজ। জ্যাঠামশাইয়ের যদি বয়েস কিছু কম হত, একটা বিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যেত। ডাইনি বিয়ে করতে জ্যাঠামশাই সাগ্রহে রাজি হয়ে যেত। জ্যাঠামশাইয়ের জীবনে একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট হয়ে যেত। সব খবরের কাগজে একটি বড় নিউজ হত। সরসিজও একটা বলার মতো কথা পেত— জানেন, আমার জেঠিমা একজন ডাইনি...।

আজ পাঁচ দিন। পাশের ঘরে ফুলমতী থাকে। সোনারাম চাল ডাল এনে দিয়েছে। একটা কেরোসিন স্টোভও। ফুলমতী নিজেই রান্না করে খায়। দরজা সারাদিন বন্ধই রাখে। কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। সরসিজ কান পেতে কান্না-টান্না শোনার চেষ্টা করেছে। তাও শোনেনি। স্নান-টান কখন করে, সরসিজ জানে না। সরসিজ স্কুলে গেলে হয়তো করে নেয়। বাইরে একটা কুয়ো আছে।

কিন্তু এখানে ক'দিন রাখা যাবে? একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। বিডিওকে চিঠি লিখেছেন সঞ্জয় প্রামাণিক। স্কুলের প্রেসিডেন্টকে ভাল লোক মনে হয়েছিল সরসিজের। ওঁকে জানিয়েছিল ঘটনাটা। উনি বললেন, কাজটা তো থিয়োরিটিক্যালি ভাল। কিন্তু প্রাকটিকাল হল না। নিজে এভাবে ইনভলভ হলেন, ভাল কথা, কিন্তু নিজের বাসায় কেন রাখলেন? গভর্নমেন্টের ঘাড়ে দিয়ে দিন।

সরসিজ বলল, আপনিও একটু চেষ্টা করুন।

রাত্রে ঘুম আসছিল না সরসিজের। দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আর কতদিন এভাবে রাখা যাবে? ফুলমতীর বয়স এমন কিছু বেশি নয়। সন্তান-টন্তান হয়নি। পাশের ঘরে একা। কে কী ভাবে ফাঁসিয়ে দেবে ঠিক নেই। প্রেসিডেন্ট ঠিকই বলেছিলেন। কাজটা ঠিক হয়নি। সোনারামও এখন অন্যরকম। গম্ভীর। আনমনা। গত পাঁচ দিনে দু'দিন মাত্র এসেছে। কী করা উচিত? সোনারামকে কি কালই বলে দেবে তোমার হিলিকে নিয়ে যাও, যা করার করো।

আচ্ছা, মেয়েটার যদি বয়েসটা আরও কম হত, কুড়ি-বাইশ হত এবং ডাইন ডিক্লেয়ার্ড হত, তা হলে কি ওকে পার্মানেন্টলি বাঁচাবার জন্য বিয়ে করতে পারত সরসিজ? নিজেকেই প্রশ্ন করে ও।

পাগল—না মাথাখারাপ? নিজেই উত্তর দেয়। দূর থেকে ট্রাকের হর্নের শব্দ আসছে ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে মিশে। প্যাঁচার ডাকও শোনা যায় মাঝে মাঝে। কয়েক দিন রাত্রে শেয়ালের ডাকও শুনতে পেয়েছে সরসিজ।

বিছানার পাশে জানলাটা খোলা। জানলা দিয়ে অন্ধকার আসছে গলগল করে। গাঢ় অন্ধকারে কয়েকটা তারা যেন দিশেহারা। আজ কি অমাবস্যা? নিঝুম সরসিজ আকাশ তারার দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটা শব্দ হল। দরজার কবজার। পাশের ঘরের দরজাটির ব্যবহার হত না বলে দরজায় শব্দ হয়। ফুলমতী দরজা খুলেছে? দরজার পাল্লা বন্ধ করার শব্দটাও শোনা গেল। ফুলমতীও বুঝি নির্ঘুম? ও কি এখন বারান্দায় একা বসে থাকবে?

জানলার পাশ দিয়ে একটা শরীর চলে গেল। ছায়ামূর্তি। ফুলমতীই। একটিই বাথরুম রয়েছে বাড়িতে। তবে ওরা বাথরুমে অভ্যস্ত নয় বলে বাইরেই যায়।

জানলা দিয়ে অন্ধকার আসে, আর নৈঃশব্দ্য। ভাদ্র বাতাস থম মেরে আছে।

আর কোনও শব্দ নেই। পায়ের আওয়াজ নেই, পাতার খসখস নেই, অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ফুলমতী ফিরছে না কেন?

সরসিজ বিছানা ছেড়ে উঠল। জানলার শিক ধরে দাঁড়াল। মনে হল অন্ধকারের ভেতরে আরও একটা অন্ধকার দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে।

সরসিজ টর্চটা নেয়। আস্তে আস্তে দরজা খোলে। টর্চটা জ্বালায় না। পাশের ঘরের দরজা খোলা। ও আস্তে আস্তে বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। পায়ের তলায় পরে নেয় রহস্য নৈঃশব্দ্য। চরাচর অন্ধকার।

প্রাচীরের ধারে চারখানি বড় শালগাছ ডালে ডালে অন্ধকার মেখে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই আর একটি ছোট গাছ যেন। সরসিজ টর্চের বোতাম টেপে। আলোয় কেঁপে ওঠে একটা মনুষ্য শরীর। নিরাবরণ। দু'হাত আকাশের তারার দিকে তোলা। টর্চ নিভিয়ে দেয় সরসিজ। ডেকে ওঠে— ফুলমতী! এই প্রথম নাম ধরে ডাকল সরসিজ।

থম মারা ভাদ্র হাওয়ায় হালকা হিম। বনজ গন্ধ। প্যাঁচার ডাক। সরসিজ শাল গাছগুলির দিকে এগিয়ে যায়। আবার টর্চের আলো ফেলে।

দু' হাতে শরীর ঢেকে শাল গাছতলে বসে আছে উলঙ্গিনী ফুলমতী।

সরসিজ বলে, তুমি কি সত্যিই ডাইনি, ফুলমতী?

ফুলমতী কান্না থামিয়ে বলে, ডাকিনিটিও হই পারিলি নি যে... ডাকিনিটি ও হই পারিলি নি যে...

আলো নেভায় সরসিজ।

অন্ধকারের মধ্যে আরও এক অন্ধকার উঠে দাঁড়ায়। কেবল বলে— দয়া নাই।

সরসিজ বলে— যাও, কাপড় পরে নাও।

একটু পরে সরসিজ ফুলমতীর ঘরের সামনে দাঁড়ায়। বলে, তুমি ডাইন হতে চেয়েছিলে?

হ।

কেন?

না হেলে কন করিবি মু? মোর তো কিছি নাই। কেহ নাই। কিছি করিবার নাই যে...।

ও বলতে চাইছিল, ও যদি সত্যিই ডাইনি হতে পারত, তবে, তবু তো কিছু ক্ষমতা পেত, শক্তি পেত, বাঁচার একটা মানে পেত, কিছুই পায়নি যে সারাজীবন। কোনও অধিকার। সবাই যখন ডাইনি বলছেই ওকে, তা হলে সত্যি-সত্যিই ডাইনিই হয়ে উঠুক না কেন।

সেই প্রার্থনাই করছিল এই ভাদ্র অমাবস্যায়— জজম বঁগা, ছিপাড়ি বঁগার কাছে, মাঝ আকাশের তারার কাছে, থম মারা বাতাসের কাছে।

গল্পগুচ্ছ, শারদ ২০০৫

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৫২, কলকাতায়। স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র। পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ.।

দেশলাই-এর সেলস্‌ম্যান হিসেবে কর্মজীবন শুরু। নানা জীবিকা বদলের পর বর্তমানে আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে লেখালেখির শুরু। প্রথম গল্প 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও ছোট পত্র-পত্রিকাতেই লিখেছেন বেশি। প্রথম গল্প সংকলন 'ভূমিসূত্র' (১৯৮২)। প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী' প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পূজা সংখ্যায় (১৯৯২)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট লেখকরূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

দ্বিশতাধিক ছোট গল্প ও একাধিক উপন্যাসের লেখক স্বপ্নময় তাঁর 'অবন্তীনগর' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন বঙ্কিম পুরস্কার (২০০৫)। এছাড়াও পেয়েছেন মানিক স্মৃতি পুরস্কার, তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার, গল্পমেলা, ভারতব্যাস, আনন্দ-স্নোসেম ইত্যাদি পুরস্কার।

লেখালেখি ছাড়াও গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

.....

প্রচ্ছদ সৌরীশ মিত্র

স্বপ্নময় এক কলমে দু'বার লেখেন না। তাঁর প্রতিটি গল্পই নতুন স্বাদের— কি বিষয়বস্তুতে, কি আঙ্গিকে। বিশেষত নতুন নতুন আঙ্গিক উদ্ভাবনে তিনি অক্লান্ত। লেখকের এই নবতম গল্পসংকলনে গৃহীত গল্পগুলি আধুনিক বাংলা কথাশিল্পের পরম নিদর্শন।

9 788177 565768